অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার

[সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ১২৭৯ (১৮৭২) হইতে
১৩২৪ (১৯১৭) সালে লিখিত সমগ্র রচনারাশির সমাবেশ]

Sarkar, Aksaychandra

সম্পাদক

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের

বংশলতা

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সন্মৌলিক

[1] ১৮১৫ খৃস্টাব্দে হরিদ্বার গিয়েছিলেন। [2] ইনি হুগলী জেলার খন্যান-এর নিকট শর্শা গ্রাম-নিবাসী নশিরাম মিত্রের প্রথমকন্যা সোনামণিকে বিবাহ করেন। ইনিই ১৮২৮ সালে সহমৃতা হন। [3] গঙ্গাচরণের সহিত গয়া গিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা হুগলী জেলার দেবানন্দপুর-নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মজুমদার। [4] অবিবাহিত ও অধিক বয়সে মৃত।

ভূমিকা

বিদ্যজ্ঞনগণ সমীপে আমার নিবেদন এই যে,
আমি বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক শব্দসাগর, নামক এই
সুক্ষুদ্র পুস্তক খানি, নীতিবোধ, হিতোপদেশ,
বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার,
কাদম্বরী, (প্রথমভাগ) আরবীয়োপাখ্যান, তত্ত্ববোধিনী
পত্রিকা, সম্বাদ প্রভাকর পত্র, অন্নদা মঙ্গল,
দ্বিতীয়ভাগ বর্ণপরিচয়, জীবনচরিত,
অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক, দ্বিতীয়ভাগ
চারুপাঠ, এই কয়েক খানি পুস্তক হইতে
দুরূহ শব্দ সঙ্কলন পূর্ব্বক তদর্থ সরলভাষায়
লিখিত হইয়াছে

অধীন
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সরকার

শকাব্দা ১৭৭৮
২৮এ আশ্বিন

৩২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'শব্দসাগর'-এর ভূমিকা-পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিরূপ (facsimile)

সূচী

পরিচিতি

পিতাপুত্র ১—৮২ পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ ৮৩—১৯৬ পৃষ্ঠা

পূজার গল্প ও কৌতুক-কৌমুদী ১৯৭—২৪৮ পৃষ্ঠা

সমালোচনা ২৪৯—৩৫২(গ) পৃষ্ঠা

পরিচিতি

প্রথমেই আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা বলি। ১৩৩০ সালে 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধে আকুমার সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিয়াছিলেন, 'অক্ষয়চন্দ্রের রচনারাশি তাঁহার প্রণীত বিবিধ পুস্তক-মধ্যে এবং নানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিক্ষিপ্ত রচনারাশিকে মণিমুক্তার সহিত তুলিত করা যাইতে পারে। ... যিনি তাঁহার সমগ্র রচনারাশি একসঙ্গে প্রকাশ করিবেন, তিনি নিজে যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন, তেমনই বাঙ্গালীর ধন্যবাদ-ভাজন হইবেন। আমাদের সে সৌভাগ্য হইল কৈ?'

সাহিত্যাচার্যের সমগ্র রচনাবলি একত্র প্রকাশ করিয়া আমরা যে সত্যই প্রচুর আত্মপ্রসাদ ও যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; তবে এই প্রকাশে আমরা যে বাঙ্গালীর 'ধন্যবাদভাজন' হইবার মত কোন কাজ করিয়াছি, তাহা আমরা স্বীকার করি না; কেন-না আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির তথা সকল বাঙ্গালা-ভাষাভাষীর পক্ষে এই বিক্ষিপ্ত বহুমূল্য 'মণিমুক্তাগুলি' সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য কর্ম। এই দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁহার অমূল্য রচনারাশি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে আমাদিগকে স্বতঃপ্রণোদিত করিয়াছে। ৪৬ বৎসর পূর্বে (১৩২৪) সাহিত্যাচার্যের মৃত্যু হইয়াছে; এই দীর্ঘ কাল আমরা যে আমাদের একান্ত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে অবহেলা করিয়াছি, তজ্জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত, দুঃখিত, অনুতপ্ত; সুতরাং ধন্যবাদের পরিবর্তে আমরা সত্যই বঙ্গবাসীর নিকট হইতে তিরস্কার পাইবার যোগ্য। আমরা একান্ত দুঃখের সহিত আমাদের এই ক্রটি স্বীকার করিতেছি।

সাহিত্যাচার্যের সমগ্র রচনারাশি ১২৭৯ (১৮৭২) হইতে ১৩২৪ (১৯১৭) সাল অর্থাৎ ৪৫ বৎসর-মধ্যে লিখিত। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে, এখন হইতে প্রায় ৯১ বৎসর পূর্বে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ৪৫ বৎসর পূর্বে, তাঁহার পরলোক-গমনের দেড় মাস আগে, তাঁহার লেখা বন্ধ হয়; সুতরাং এই সুদীর্ঘ কালে রচিত লেখার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক 'গ্রন্থরাজির বিশ্লেষণ'-এ এই রচনাগুলির পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে।

সমগ্র রচনাবলি প্রকাশের সময়-অনুসারে পরপর (chronologically) সাজানো হয় নাই—হইয়াছে বিষয়-বিভাগে গ্রন্থাকারে।

'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার'-এ আছে—১) পিতাপুত্র ২) প্রবন্ধ ও নিবন্ধ ৩) পূজার গল্প ও কৌতুককৌমুদী ৪) সনাতনী ৫) সমালোচনা ৬) স্মৃতিতর্পণ ৭) রূপক ও রহস্য ৮) উদ্ভট কথা ৯) কবি হেমচন্দ্র ১০) অনুশীলনী ১১) তিনটি অভিভাষণ ১২) কিশোর সাহিত্য ১৩) ম্যাকবেথ ও হ্যামলেট ১৪) দেশাত্মবাদ ১৫) শিক্ষানবিশের পত্র ১৬) গোচারণের মাঠ ১৭) কবিতা ও গান এবং ১৮) মহাপূজা। এই ১৮খানি পুস্তকের মধ্যে ১, ৩, ৪, ৭, ৯, ১৫, ১৬ এবং ১৮ সংখ্যক পুস্তক ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাকি ১০খানির এই প্রথম প্রকাশ। এই আঠারখানি পুস্তক ব্যতীত সাহিত্যসম্ভারে আরও আছে—'সূক্তিসমুচ্চয়' বা 'সাধারণী' হইতে উদ্ধৃত ছোট ছোট স্মর্তব্য উক্তি এবং 'পরিশিষ্ট'।

এইভাবে প্রায় শতাধিক রচনা অক্ষয় সাহিত্যসম্ভারে সংগৃহীত হইয়াছে এবং **আবশ্যক-অনুযায়ী বর্জাইস (ছোট) টাইপে পাদটীকা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকার-প্রদত্ত পাদটীকা স্মল পাইকা (বড়) টাইপে ছাপা হইয়াছে।**

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১২৫৩ সালে ২৭-এ অগ্রহায়ণ (১৮৪৬, ১১ই ডিসেম্বর) বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক, সমালোচক ও সাংবাদিক

সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার কদমতলা, চুঁচুড়ায় তাঁহার মাতামহ হরগোবিন্দ বসুর বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যাচার্যের পৈতৃক ভিটা এই বাড়ীর অতি নিকটে গঙ্গার ধারে। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত মহাদেব এখনও ক্যাঁকশিয়ালি (আধুনিক সভ্য ভাষায় 'কনকশালী') বটতলার ঘাটে অবস্থিত আছেন। পিতা গঙ্গাচরণ সরকার এই বটতলার ঘাটের ওপর ছোট একখানি চালাঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশবে, গঙ্গাচরণের যখন ৫ বৎসর বয়স্, তাঁহার পিতা রামবল্লভ সরকার মারা যান এবং তাঁহার স্ত্রী সোণামণি ক্যাঁকশিয়ালি ঘাটের এই বটতলায় সহমৃতা হন। গঙ্গাচরণ ছিলেন সিনিয়র বৃত্তিধারী, আইনের পরীক্ষোত্তীর্ণ সবজজ (তখনকার ভাষায় 'সদরআলা'), সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক।

দশ বৎসর বয়স্ পর্যন্ত সাহিত্যাচার্য পিতার সহিত উলা বা বীরনগরে বাস করেন। 'পিতাপুত্র'-এ তাঁহার বাল্যজীবন ও বাল্যশিক্ষা-বিষয়ে প্রচুর আলোচনা আছে। হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের ভর্তি হইবার খাতা (Admission Register) হইতে জানা গিয়াছে, ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে তিনি হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে (Third Year Class) ভর্তি হন। হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় (নবম বার্ষিক) শ্রেণী হইতে কলেজের অধ্যক্ষ রবার্ট থোয়েট্‌স-এর (Robert Thwaytes) বিশেষ অনুমতি পাইয়া তিনি ১৮৬৩ সালে এন্‌ট্রান্‌স্ পরীক্ষা দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পরীক্ষার্থীর মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী, প্রতিবেশী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ও (পাটনা বিজ্ঞান কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রায়সাহেব শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা) এই বিশেষ অনুমতি পাইয়াছিলেন। পরীক্ষায় অক্ষয়চন্দ্র প্রথম, নন্দলাল দ্বিতীয় এবং ১০ম শ্রেণীর ছাত্র সৈয়দ আমীর আলি (Syed Ameer Ali) তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ইনিই পরে মুসলমান আইন গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন এবং বিলাতের প্রিভি কাউন্‌সিলের সদস্য হন। স্মরণ রাখা ভাল, তখন ভারতে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই মাত্র এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—বিহার, উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৮৬৪ সালে চুঁচুড়া স্টেশন হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে 'সুগন্ধা' গ্রামের গোপীকৃষ্ণ রায়-এর (এখন রায়েরা 'বসু' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন) কন্যা সৌদামিনীকে সাহিত্যাচার্য বিবাহ করেন। এই সুগন্ধার রায়েরা ছিলেন দেশপ্রসিদ্ধ কবিরাজ।

অতঃপর তিনি হুগলী মহ্‌সীন কলেজ হইতে ১৮৬৫ সালে এল. এ., ১৮৬৭ সালে বি. এ. এবং ১৮৬৮ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন।

এল. এ. পাস করিবার পরবৎসর ১৮৬৬ সালে অক্ষয়চন্দ্র 'হুগলী কলেজের লাইব্রেরী পরীক্ষা' উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কৃত হন। প্রত্যেক সরকারী কলেজের লাইব্রেরীতে যতগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় লিখিত পুস্তক থাকিত, সেই সমুদয় পুস্তকের বিষয়বস্তু হইত পরীক্ষার বিষয়। ইতিপূর্বে দ্বারকানাথ মিত্র, যিনি পরে হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছিলেন, হুগলী কলেজ হইতেই লাইব্রেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। মাত্র এই দুইজন কৃতী ছাত্রই লাইব্রেরী পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে পরীক্ষার কঠোরতা উপলব্ধি করিয়া জেনারল এডুকেশন কমিটি (General Education Committee) এই পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেন।

অক্ষয়চন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়া এম. এ. পরীক্ষার জন্যই সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং পিতার অনুমতি লইয়া হিন্দু হোস্টেলের জনৈক এক-প্রকোষ্ঠবাসী (roommate) বি. এল. পরীক্ষার্থীর যাবতীয় পুস্তকের সাহায্যে বি. এল. পরীক্ষা দিয়াছিলেন। বি. এল. পরীক্ষার একখানিও পাঠ্যপুস্তক তিনি ক্রয় করেন নাই। আসলে তিনি ছিলেন দর্শনশাস্ত্রে 'অনার্স্ ইন আর্টস্—এম. এ.' পরীক্ষার ছাত্র। প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের তৃতীয় (শেষ) বার্ষিক শ্রেণীতে আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৯ সালে বি. এল. পাস করেন।

তখন বি. এ. পাস করার ঠিক পর বৎসরে এম. এ. পাস করিতে পারিলে Honours in Arts—M. A. পাস করা হইত, আর যাহারা বিলম্বে পাস করিত তাহাদিগকে শুধু 'এম. এ'. বলা হইত। বি. এ. পরীক্ষায় তখনও অনার্স্ প্রচলিত হয় নাই।

সাহিত্যাচার্যের বি. এল. পরীক্ষা শেষ হয় ১৮৬৮, ৬ই জানুয়ারী। তিনি সেই দিনই এম. এ.র ফি জমা দিতে গেলে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাটক্লিফ (J. Sutcliffe) সাহেব ঘোরতর আপত্তি করেন, কেন-না ইতিপূর্বে অন্য কোন ছাত্র বি. এল. ও এম. এ. (অনার্স্ ইন আর্টস্ ত নয়ই) একই বৎসরে পরীক্ষা দেয় নাই (অবশ্য তাঁহার পরেও কেহ দেয় নাই)। যাহা হউক ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি এম. এ. পরীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি এম. এ. পরীক্ষায় Elements of Jurisprudence-এ পাইয়াছিলেন ১০০-র মধ্যে ২৩ নম্বর, কিন্তু বি. এল. পরীক্ষায় সেই একই বিষয় Jurisprudence-এ পাইয়াছিলেন ৭১ নম্বর; তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে বি. এল.-এর বিষয় ছিল 'পুরো' Jurisprudence—এম. এ.-র ন্যায় 'Elements' of Jurisprudence নয়!

তখন রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি বিশপ কলেজের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সর্বাপেক্ষা কর্তৃত্ব-সম্পন্ন সভ্য ছিলেন। ভাইস্-চ্যান্সেলার-এর অনুপস্থিতিতে তাঁহাকেই সভাপতির আসন অধিকার করিতে হইত। অক্ষয়চন্দ্র এম. এ. ও বি. এল.-এর মার্কশীট লইয়া শিবপুরে গিয়া ব্যানার্জি সাহেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি—হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ওকালতী ক'রবে, না অধ্যাপক হবে?' অক্ষয়চন্দ্র উত্তর করিলেন যে তিনি ওকালতী করিবেন। তখন ব্যানার্জি সাহেব আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তবে আর তুমি এ নিয়ে রাগারাগী ক'রছ কেন?—মাথায় শাম্‌লা চড়িয়ে মাথা ঠাণ্ডা কর গিয়ে!'—বলিয়াই অক্ষয়চন্দ্রের পিঠ চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। কিন্তু সাহিত্যাচার্য পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। 'গুণ হ'য়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়।'

সাহিত্যাচার্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার স্বগ্রামবাসী একটি যুবক হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট গিয়া তাঁহাকে সাহিত্যাচার্য-সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে দিন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথার উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন—

'তখন আমি বহরমপুরের উকীল, অক্ষয়বাবু ওকালতী করিতে বহরমপুরে আসিলেন। একদিন তাঁহার সঙ্গে প্রসিদ্ধ দার্শনিক মিল-এর মতবাদ বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। আমি বলিলাম, "অক্ষয়বাবু, আপনি মিলের বড্ড গোঁড়ামী করেন।" তিনি একটু গম্ভীর হইয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, তা করি; তবে না প'ড়ে জ্যাঠামী করার চেয়ে প'ড়ে গোঁড়ামী করা ভাল।"—আমি তাঁহার মত স্পষ্টবক্তা কম দেখিয়াছি।'

সাহিত্যাচার্য স্বয়ং লিখিয়াছেন—

—আমি যখন যৌবনের প্রারম্ভে মিল, কোম্‌ৎ, স্পেন্‌সার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যগণের মতবাদে মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ করিলাম, তখন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে তিনি (পিতা) আমাকে সমরে আহ্বান করিলেন। মিলের মায়াবাদ (Permanent Possibility of Sensation) লইয়া, কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ লইয়া, হার্‌বার্ট স্পেন্‌সারের সমাজতত্ত্ব লইয়া আমরা পিতাপুত্রে ঘোরতর তর্কবিতর্ক করিতাম।—

ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৮ সালেই অক্ষয়চন্দ্র বহরমপুরে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার পিতা বহরমপুরের সদর মুন্সেফ। মাত্র ৫ বৎসর তিনি ওকালতী করিয়াছিলেন। ওকালতীতে তিনি বিশেষ কৃতকার্য হইলেও ১৮৭৩ সালে তাঁহার মাতাঠাকুরানী থাকমণির বায়ুরোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহাকে ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া জননীর সেবার জন্য চুঁচুড়ায় আসিয়া বাস করিতে হয়। তিনি তাঁহার জনক-জননীর একমাত্র সন্তান, এবং জনক-জননী ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন বয়স্থ আত্মীয় বা আত্মীয়া ছিলেন না।

এই বহরমপুরেই তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়ের সূত্রপাত; এই বহরমপুরেই ১২৭৯, ১লা বৈশাখ (১২.৪.১৮৭২) সমাজ-সমালোচনা-বিষয়ক তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ 'উদ্দীপনা' বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গে 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের পরিচয় ক্রমে বয়ঃপার্থক্য অতিক্রম করিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল।

১২৮০ সালে ১১ই কার্তিক (২৬.১০.১৮৭৩) চুঁচুড়ার নিজের বাড়ী হইতে অক্ষয়চন্দ্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাধারণী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু বঙ্গদর্শনের সহিত সাধারণীও কাঁটালপাড়ার বঙ্গদর্শন-যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত হইত। অক্ষয়চন্দ্র সাধারণী সম্পাদন করিতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একযোগে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন। তিনিই প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' করিতেন।

১২৮১ সালে শ্রাবণ মাসে অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া কদমতলায় নিজের বসতবাড়ী-সংলগ্ন স্বতন্ত্র বাটীতে 'সাধারণী যন্ত্রালয়' স্থাপন করিয়া সাধারণী মুদ্রণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সরল ভাষায় রাজনীতি আলোচনা করিবার জন্য এবং জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিবার জন্য সাধারণী পরিচালিত হইত। ইহাতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের আলোচনাও থাকিত প্রচুর, আর সাধারণীর বৈশিষ্ট্য ছিল নির্ভীক, নিরপেক্ষ অথচ সরল, সরস সমালোচনা। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের হাতেখড়ি হয় এই সাধারণীতে। ১২৯১ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত হইয়া সাহিত্যাচার্য 'সাধারণী যন্ত্রালয়' ৩৬ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন। ১২৯৩ সালে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভবানীপুর এল. এম. এস. কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. মহাশয়-সম্পাদিত 'নববিভাকর' পত্রিকা সাধারণীর সহিত মিলিত হয়। সাহিত্যাচার্যই এই 'নববিভাকর-সাধারণী' সম্পাদন ও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

ইতিমধ্যে ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে তিনি 'নবজীবন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নির্জীব হিন্দুসমাজে সজীবতা আনয়ন করিবার জন্য, বাঙ্গালীর প্রাণে সনাতন ধর্মের সত্য আলোক বিকিরণ করিবার জন্য এবং বাঙ্গালীকে নবজীবন প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে নবজীবন পত্রিকার প্রকাশ।

সাধারণী ও নবজীবন সাহিত্যাচার্যের কীর্তিস্তম্ভ। এই নবজীবন ও সাধারণীতে বাঙ্গালার অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর সাহিত্যিক শিক্ষালাভ হইয়াছিল। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি সাহিত্যরথীগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে অক্ষয়চন্দ্র তাঁহাদের সাহিত্যগুরু; সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার সময়োচিত অমূল্য উপদেশ, পরামর্শ, উৎসাহ এবং সর্বোপরি রচনার যথোপযুক্ত সংশোধন ও পরিবর্তনই তাঁহাদের ভবিষ্য সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুতে ১৩২৪ সালে লিখিয়াছিলেন, 'আমাদের সাহিত্য জীবনের একটা বড় অবলম্বন, বড় সহায় চলিয়া গেল। কোনকিছু লিখিলে, কোনকিছু বলিলে যাঁহার মুখের স্তুতিনিন্দা শুনিবার জন্য আমরা আশাপথ চাহিয়া থাকিতাম, যিনি পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মতন শাসন করিয়া, পড়াইয়া—লেখাইয়া—বুঝাইয়া আমাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগী করিয়াছিলেন,—সখা, মিত্র, দাদা, গুরু, আচার্য অক্ষয়চন্দ্র আমাদের সাহিত্য-জীবনের এক প্রধান অবলম্বন ছিলেন। ... আর চট্টগ্রামে ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে (১৩১৯) সাহিত্যাচার্যকে সভাপতিরূপে বরণ করিতে গিয়া প্রগাঢ় রাজনীতি-বিশারদ প্রবীণ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বিঘোষিত করিয়াছিলেন, 'আচার্য অক্ষয়চন্দ্র শুধু আমার সাহিত্যগুরু নহেন,—তাঁহার সাধারণী পড়িয়াই আমি রাজনীতির ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষপড়া পর্যন্ত শিখিয়াছি।'

নবজীবন ৫ বৎসর এবং সাধারণী ১৩ বৎসর প্রকাশিত হইয়া ১২৯৬ সালে বন্ধ হইয়া যায়। তখন সাহিত্যাচার্যের স্ত্রী মৃত্যুপথযাত্রিণী।

অক্ষয়চন্দ্রের তৃতীয় কীর্তি 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ'। হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায়

ইহা প্রথমে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয় ; পরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস-এর পদাবলী, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৮১)। ইহাদের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে। প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হইবার পূর্বে কোন কোন পদাবলী আংশিকভাবে বটতলার ছাপায় পাওয়া যাইত; কিন্তু বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে রাশি রাশি পুঁথি সংগ্রহ করিবার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া এই বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ কাব্য-সংগ্রহই অক্ষয়চন্দ্র প্রথম প্রকাশ করেন।

প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র (বঙ্গদর্শন, ৩য় খণ্ড) লিখিয়াছিলেন—

'যে কার্যে ইহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা গুরুতর, সুকঠিন এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহারা সে কার্যের উপযুক্ত ব্যক্তি। উভয়েই কৃতবিদ্য এবং অক্ষয়বাবু সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। তিনি কাব্যের সুপরীক্ষক, তাঁহার রুচি সুমার্জিত এবং তিনি বিদ্যাপতি কাব্যের মর্মজ্ঞ। দুরূহ শব্দসকলের ইহারা যে প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ সাধুবাদ করিতে পারি।'

ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া 'ভারত-রাজরাজেশ্বরী' (কাইসার-ই-হিন্দ) উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে লর্ড লিটন-এর অধিনায়কতায় ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে যে প্রথম দরবার হইয়াছিল, সেই দরবারে সাধারণী সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং দরবারে উপস্থিত ছিলেন। 'দিল্লীর প্রথম দরবার—ইংরাজের আমলে' 'দেশাত্মবাদ'-এ মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৭৬ সালে প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্যামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে এবং দেশমান্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ দেশভক্তগণের উদ্যোগে যে ভারত-সভা (Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু ইহার প্রথম সম্পাদক এবং অক্ষয়চন্দ্র প্রথম সহকারী সম্পাদক। এই সভাই জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অঙ্কুর। সমগ্র ভারতবর্ষে জনমত গঠন করিবার পক্ষে সুরেন্দ্রনাথের ভারতভ্রমণ ও ওজোময়ী বক্তৃতা, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়মাবলীর পরিবর্তন-প্রসঙ্গে আন্দোলন করিবার উদ্দেশ্যে জনপ্রিয় ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ-এর বিলাত-গমন এবং সম্পাদক-দ্বয়ের অক্লান্ত কর্মকুশলতাই চারপাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারত-সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

'... He (Akshaychandra) was prominently connected with the Indian Association in its early days, and took a leading part in ensuring success of the second session of the Congress in Calcutta in 1886. He was a leading figure in connection with the Rent Bill agitation and worked in earnest co-operation with the Editor of the paper (Bengalee) as a sturdy champion of the rights of ryots.'

তারপর বহুবৎসর যাবৎ 'জমিদারী পঞ্চায়ৎ' সভার সম্পাদকরূপে অক্ষয়চন্দ্র যে কিরূপ পরিশ্রম ও যোগ্যতার সহিত কার্যপরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা আজ এই আত্মবিস্মৃত জাতি ভুলিয়া গেলেও বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস কখনও বিস্মৃত হইবে না। কিন্তু যখনই গভর্নমেণ্ট হিন্দুর সনাতন ধর্মে হস্তক্ষেপ করিয়া আইন পাস করিতে গিয়াছেন, তখনই তিনি গভর্নমেণ্টের সহিত সহযোগিতা ত্যাগ করিয়া নানা প্রকারে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এইজন্য বিধবা-বিবাহ এবং সহবাস-সম্মতি আইনের বিপক্ষে তিনি ভীষণভাবে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন। জনমত অগ্রাহ্য করিয়া লর্ড কার্জনের সময়ে বঙ্গভঙ্গ হইলে যেমন দেশবাসী স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, সেইরূপ সহবাস-সম্মতি আইন পাস হইলেও ভারতবাসী প্রথমবার স্বদেশী ব্রত লইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রথম স্বদেশীব্রত ভারতবাসী অধিক কাল পালন করে নাই,—কেবল বঙ্গমাতার দুইজন কৃতী সন্তান সেই ব্রত একনিষ্ঠভাবে আজীবন পালন করিয়াছিলেন —একজন তাৎকালিক রাজকীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সার্থকনামা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আকুমার দেশভক্ত অক্ষয়চন্দ্র। ১৮৯১ হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ২৬ বৎসর তিনি পারতপক্ষে কোনকিছু বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বা ব্যবহার করেন নাই; দেশী ছাতা পাওয়া যায় না, তাই

তিনি এই দীর্ঘ কাল ছাতাও ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার এই স্বাদেশিকতা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ব্রতগ্রহণের পর প্রথম ৭ বৎসর তাঁহার পরিবার-মধ্যে ডাক্তারী ঔষধ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত রাখীবন্ধন-দিবসে সাহিত্যাচার্যের অধিনায়কতায় ও উৎসাহে চুঁচুড়ার গ্রাম্য দেবতা ৺ষণ্ডেশ্বরের ষোড়শোপচারে পূজা হইয়াছিল, স্বরচিত সঙ্গীত নগরের পথে পথে গীত হইয়াছিল, বৃদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র স্বহস্তে মন্দির-চত্বরে সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণকে চিঁড়া, মিঠাই প্রভৃতি বিতরণ করিয়া জনসেবায় অপরাহ্ণ কাল পর্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সঙ্গীতটি 'কবিতা ও গান'-এ মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্যাচার্য মামলা-মোকদ্দমা করা অতিশয় ঘৃণা করিতেন; বলিতেন, ইংরাজের কোর্ট ধর্মাধিকরণ নয়। ওখানকার মাটি মাড়াইলে ভদ্রসন্তানের ধর্মহানি হয়, তাহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয়—তাহার ইহকাল, পরকাল দুই খোয়া যায়। তাঁহার একটি ছোট পত্তনি মহল ছিল, কিন্তু কখনও বাকি খাজনার নালিশ পর্যন্ত করেন নাই। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, এমন কি মহামান্য শিক্ষাগুরু প্রভৃতি বহু বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি অনেক সময় ঋণ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা শিশির-কুমার ঘোষ এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ভিন্ন অপর কেহই তাঁহার ঋণ পরিশোধ করেন নাই। তবুও তিনি কাহারও নামে কখনও নালিশ করেন নাই। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার মহানুভবতার পরিচায়ক, কিন্তু বাঙ্গালীর অতিশয় কলঙ্কের কথা।

দেশে ক্রমেই নিষ্ঠাবান্ সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতের অভাব ঘটিতেছে, কাজেই হিন্দুর নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে ও শাস্ত্রোক্ত বিধি-অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে না লক্ষ্য করিয়া এবং শাস্ত্রানুশীলন যাহাতে বহু-বিস্তৃতি লাভ করে—এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় বাড়ীর সংলগ্ন স্বতন্ত্র দুইটি বাড়ীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই চতুষ্পাঠীর নামকরণ করিয়াছিলেন 'অমর চতুষ্পাঠী'। প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অমর চতুষ্পাঠী বহুতর ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়া বাঙ্গালার যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

চতুষ্পাঠী-স্থাপন ও উহার প্রতিপালন করা ভিন্ন শিক্ষা-বিস্তারকল্পে তাঁহার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা। ১৮৮০ সালে চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় 'হিন্দু স্কুল' উঠিয়া গেলে তিনি ইহার যাবতীয় আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম ক্রয় করেন এবং 'সাধারণী এচ্. ই. স্কুল' স্থাপিত করিয়া প্রায় দশ বৎসর যাবৎ এই স্কুল পরিচালনা করেন। সাধারণ তত্ত্বাবধান করা ভিন্ন তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ২।৩ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। সাধারণী কার্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে এই স্কুল উঠিয়া যায়।

১৮৮৮, ৬ই নভেম্বর বিসূচিকা রোগে তাঁহার পিতার কদমতলার বাড়ীতে মৃত্যু হয়; ১৮৯০, ১৬ই ডিসেম্বর কলিকাতায় তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়, এবং ১৮৯২ সালে তাঁহার মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর হইতে বর্ষের পর বর্ষ গিয়াছে আর তাঁহার বুকের এক একখানি পাঁজরা খসিয়া পড়িয়াছে। সে বড় মর্মন্তুদ করুণ কাহিনী।

১৯০৭, ২৩-এ সেপ্টেম্বর বেদান্তবিশারদ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-সম্পাদিত তথাকথিত রাজদ্রোহসূচক 'সন্ধ্যা'র মামলার শুনানি আরম্ভ হয়। উপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে ব্যারিস্টার সি. আর. দাশকে (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে) বাঙ্গালা সরকারের তদানীন্তন অনুবাদক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যকে অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলির অনুবাদ-সংক্রান্ত জেরা করিবার জন্য অক্ষয়চন্দ্র তিন দিন ধরিয়া যুক্তি, নির্দেশ ও উপদেশ দেন। সংবাদপত্র-পাঠক দিনের পর দিন দেশবন্ধুর বাঙ্গালা সাহিত্য তথা পদাবলী-সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, নিপুণতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে নির্বাক্ হইয়াছিল। এই মন্ত্রণা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮, বেথুন রো, কলিকাতায় দেশপ্রেমী কার্তিক-চন্দ্র নান মহাশয়ের বাড়ীতে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুসারে (New Regulations) ১৯০৯ সাল হইতে অবশ্যপাঠ্য-বিষয়রূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরীক্ষা গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়।

সাহিত্যাচার্য সেই ১৯০৯ হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ৯ বৎসর বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রশ্নপত্রকার ও পরীক্ষক ছিলেন। তখন বাঙ্গালায় অনার্স বা এম. এ. পরীক্ষা প্রবর্তিত হয় নাই।

১৩২৪ সালের ১০ই আশ্বিন (১৯১৭, ২রা অক্টোবর) ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার জন্মস্থান কদমতলা, চুঁচুড়ার বাড়ী হইতে সাহিত্যাচার্য অনন্তে প্রয়াণ করেন। মৃত্যুর দেড় মাস পূর্বে—'ভায়াদের ভ্রাতৃভবন ও ভ্রাতৃভাবনা' অভিধেয় তাঁহার শেষ-রচনা 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যথার্থ ই আজীবন সাহিত্যসেবী ছিলেন—মাতৃভাষার এরূপ একনিষ্ঠ অনন্তকর্মা সাধক সত্যই বিরল।

সাহিত্যাচার্যের সোদরপ্রতিম সাহিত্যশিষ্য পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলি, **'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মনীষা ও প্রতিভার শেষ চন্দনখণ্ড ভাসিয়া গেল—এই শেষ!'**

ঊনবিংশ শতকের শেষ ত্রিপাদে বাঙ্গালার অবস্থা

সাহিত্যাচার্যের জীবনের মোটামুটি পরিচয় প্রদান শেষ হইল। এইবার সাহিত্য-ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিষয়ে,—যেমন শিক্ষা, সাধনা, আচার, অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিবার অগ্রে তাঁহার জন্মের (১৮৪৬) ২০ বৎসর পূর্ব হইতে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকারে বাঙ্গালীর অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা বিশেষ দরকার। তিনি কিরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, কিরূপ সমাজে বর্ধিত হইয়া কর্মক্ষেত্রে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ের বাঙ্গালার পরিপ্রেক্ষণিকা, পটভূমি ও পরিস্থিতির মোটামুটি ধারণা পূর্ব হইতে হওয়া একান্ত আবশ্যক। সুতরাং ঊনবিংশ শতকের শেষ ত্রিপাদে বড়লাট বেন্টিংক হইতে বড়লাট কার্জন-এর কার্যকাল (১৮২৮ হইতে ১৯০০ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত এই ৭০।৭৫ বৎসরের বাঙ্গালার অবস্থার মোটামুটি অনুশীলন হওয়া উচিত। কেন-না এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, কৃষ্টি, সাহিত্য ও রাজনীতির যেরূপ পরিবর্তন হইয়াছিল সেরূপ পরিবর্তন পূর্বে ও পরে কখনও হয় নাই। আর এই অভূতপূর্ব রূপান্তর বুঝিতে না পারিলে সাহিত্যাচার্যের সমগ্র জীবনের তথা অক্ষয় সাহিত্যসম্ভারের বিশেষত্ব, নূতনত্ব ও মনীষার উন্মেষ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব হইবে।

সিপাহী-সমরের সময় হইতেই কৃষকগণের ওপর নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হয়; কিন্তু ১৮৬০ সালে প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইলে রেভারেণ্ড লঙ সাহেবের একমাস জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। কলিকাতায় যেরূপ ঘোরতর আন্দোলন ও আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, সেরূপ পূর্বে আর কখনও হয় নাই। তখন সঙ্গীত বাঙ্গালায় জীবন্ত—প্রাণবন্ত। পথেঘাটে গীত হইতে লাগিল—

নীল বানরে সোণার বাঙ্গলা
ক'রল এবার ছারখার,
অসময়ে হরিশ ম'ল—
লঙের হ'ল কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার॥

হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদক তেজস্বী, মনস্বী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উৎপীড়িত, নির্যাতিত চাষীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তীব্র ভাষাপ্রয়োগে নীলকরদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

তখন সাহিত্যাচার্য স্কুলের ছাত্র। জনসাধারণের দুঃখ, কষ্ট, উৎপীড়ন, অত্যাচার পুস্তকে বা পত্রিকায় আন্দোলন করিলে যে প্রভূত ফল পাওয়া যায়, এ কথা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিভোগী ২য় আকবর শাহ তখন দিল্লীর তথাকথিত সম্রাট্; তিনি মহাত্মা রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধি দিয়া তাঁহার সরকারী বৃত্তি হ্রাসের তদ্বির করিবার জন্য ১৮৩০ সালে ইংলণ্ডে পাঠাইলেন। ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে রাজা রামমোহন সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে যান।

তখন পাদরীরা হিন্দুদিগকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। প্রথম প্রথম কৃষকেরা এবং সাহেবদের চাপরাশি, খানসামা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেদেরই তাঁহারা খৃস্টান করিতে পারিতেন। তৎকালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। ক্রমে তিনিও খৃস্টান হইলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ও প্রণোদনে মধুসূদন দত্ত ও দানবীর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃস্টান হইলেন; পরে কৃষ্ণমোহন অনেককে খৃস্টান করিতে লাগিলেন। ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তিনি নিজের কন্যার সহিত জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বিবাহ দিলেন। কলিকাতায় প্রবল হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

রামমোহন বিলাত যাইবার পূর্বেই ১৮২৯ সালে কলিকাতায় 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাহা শেষে আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়। তিনিই লর্ড বেন্টিংক-এর দ্বারা 'সতীদাহ' বা 'সহমরণ' প্রথা আইন করাইয়া রোধ করাইয়াছিলেন। অতঃপর সুয়েজখাল কাটা হইয়া বিলাত যাওয়া সুগম হওয়ায় অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীরা বিলাত যাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গিয়া খুব আদর-আপ্যায়ন, খাতির-যত্ন পাইয়া দেশে ফিরিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বিলাতেই স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাদরীরা 'রেভারেণ্ড' করিয়া দিয়া হেঁদোর কাছে নেটিভ খৃস্টানদের জন্য নূতন গির্জা তৈয়ার করাইয়া তাঁহাকে উহার কর্তা করিয়া দিলেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee), রেভারেণ্ড লালবিহারী দে প্রভৃতি তৎকালপ্রসিদ্ধ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত মনীষিগণ একে একে খৃস্টান হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন নিজের কন্যা মনোমোহিনীর সহিত ক্যাপ্টেন হুইলার-এর বিবাহ দিলেন। বাঙ্গালীর মেয়ে এই প্রথম খাঁটি বিলাতী সাহেবকে বিবাহ করিল। দর্শনশাস্ত্রে এবং ইংরাজী ও ল্যাটিন সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ই. এম. হুইলার ইহাদেরই সন্তান।

তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার, অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার দক্ষিণহস্ত, দত্তজার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সেই সমাজের মুখপত্র। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে মতবিরোধ হওয়ায় তিনটি বিভিন্ন দল সৃষ্ট হইল। কিন্তু এক দল ভাঙ্গিয়া তিন দলই হউক আর সম্প্রদায়-মধ্যে বিভিন্ন মতবাদই দেখা যাউক, তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপ, প্রতিপত্তি, প্রাধান্য দেখে কে?

তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (১৮৫৭), ডেভিড হেয়ার সাহেবের যুগ চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু যুবকদের খৃস্টানধর্ম গ্রহণে ভাটা পড়িয়াছে। জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া কৃতবিদ্য বাঙ্গালী যুবক আর বড়-একটা খৃস্টান হইতেছে না। তাহারা দলে দলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে সিনিয়র স্কলার সুধী রাজনারায়ণ বসু-প্রমুখ ইংরাজী শিক্ষিত বহুতর ব্যক্তি ব্রাহ্ম হইলেন। 'আর্যধর্ম'-প্রবর্তক পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী পঞ্জাব হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তর-পশ্চিমের মধ্য দিয়া, বিহারের বক্ষ ভেদ করিয়া দিগ্বিজয় করিতে করিতে আসিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশপূর্বক তাঁহার নব সম্প্রদায়ের ধর্ম-প্রবাহে বাঙ্গালা ভাসাইয়া দেওয়া ত দূরের কথা—বাঙ্গালার এক জনকেও নিজ ধর্মমতে টানিতে পারিলেন না—তিনি হতাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মধর্ম বাঙ্গালায় বিশেষতঃ কলিকাতা, ঢাকা, মৈমনসিং, খুলনা, কুচবেহার প্রভৃতি স্থানে শিকড় গাড়িয়াছে—কাহার সাধ্য তাহাকে নড়ায় বা টলায় বা ক্ষুণ্ন করে?

ইতিমধ্যে বিলাত যাওয়ার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে আর জাতিচ্যুত—সমাজচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেই চলিবে। অধিকন্তু আচারে বিচারে, পোষাকে পরিচ্ছদে দস্তুরমত সাহেব বনিবার সুবর্ণ সুযোগ মিলিবে। মনে রাখিতে হইবে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয়গণের মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ন। প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের 'চিরসুন্দর গল্প মনে পড়িয়া গেল। বিলাত হইতে ফিরিয়া তখন কেহই কাপড় পরিতেন না—সকলেই, কি-বাড়ীতে

কি-বাহিরে, সকল সময় সাহেবী পোষাক পরিতেন। ঐ যে আমরা কাহাকে কাহাকেও কাপড় পরিতে দেখিয়াছি, সে বঙ্গভঙ্গের পরে—স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করায়—১৯০৫।০৬ সালে।

ক্রমে কলিকাতায় আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে সিটি কলেজ খুলিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশন খুলিলেন, সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় রিপন কলেজ খুলিল; তিনি মেট্রোপলিটন ও রিপন উভয় কলেজে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কলিকাতায় স্ত্রীশিক্ষারও ধূম পড়িয়া গেল,—বড়লাটের আইন সচীব বিটন (Bethune) সাহেব বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তাহার পর বেথুন কলেজে অধ্যয়ন করিয়া কাদম্বিনী বসু (পরে ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী) ও চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাস করেন। ইঁহাদের পূর্বে অন্য কোন মহিলা বি. এ. পাস করেন নাই। এই উপলক্ষে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিলেন—

হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন
অই বেশ, ও-উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি 'বাঙালীর মেয়ে'
তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও প্রবল পরিবর্তন হইল। রানী ভিক্টোরিয়া 'ভারত-রাজরাজেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ করিলেন, (১৮৭৭), বিধবা বিবাহ আইন-সঙ্গত হইল (১৮৫৬)। ব্রাহ্মদের জন্য বিবাহ-সংক্রান্ত আইন প্রবর্তিত হইল (Civil Marriage Act III, 1872)। বোম্বাই-এ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইল (১৮৮৫)। লর্ড লিটনের সময়ে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে Vernacular Press Act পাস হইল। অবশ্য এই আইন ইংরাজি ভাষায় লিখিত পত্রিকাগুলির উপর প্রযুক্ত হইল না। ফলে রাতারাতি বাঙ্গালা অমৃত-বাজার পত্রিকা ইংরাজি Amrita Bazar Patrikaয় রূপান্তরিত হইল। সাধারণীর প্রথম অবস্থায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এই কারণে ইংরাজিতে লিখিত হইত। প্রথম ৪।৫টি editorial লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র, পরে লিখিতেন সাহিত্যাচার্য স্বয়ং। অবশ্য কয়েক মাস পরে এই প্রথা বন্ধ হইয়া যায়। লিটনের অব্যবহিত পরবর্তী লাট সাহেব লর্ড রিপন Vernacular Press Act তুলিয়া দেন। অতঃপর সহবাস-সম্মতি আইন-সংক্রান্ত বিধি সংশোধিত হইল (Act X, 1891)। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে শুনিয়াছি, এই সহবাস-সম্মতি আইন প্রবর্তন লইয়া সেই সময় ভারতে, বিশেষভাবে কলিকাতায়, যেরূপ প্রবল আলোড়ন-আন্দোলন হয়, বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন তাহার কাছে যৎসামান্য বলিয়া মনে হইয়াছিল।

ঠিক এই সময়েই সরকার বাহাদুর এক ভয়াবহ নৃশংস কাজ করিয়া বসিলেন, যাহার ন্যায় বীভৎস ব্যাপার ইতিপূর্বে বৃটিশরাজত্বে কখন ঘটে নাই—ইংরাজরাজ তোপের মুখে মণিপুর রাজ্য ভূমিসাৎ করিলেন, রাজা কুলচন্দ্রকে বন্দী করিয়া আন্দামানে চালান দিলেন; সেনাপতি টঙ্গেল ও টিকেন্দ্রজিৎকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইলেন। 'বঙ্গবাসী'র তথাকথিত বিদ্রোহসূচক প্রবন্ধগুলি এই দুই কারণেই লিখিত হইয়াছিল। তৎপূর্বেই ১৮৮৬ সালে সমগ্র ব্রহ্মদেশ বৃটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে বাঙ্গালায় এবং বিশেষভাবে মান্দ্রাজে আর এক ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইল—থিওসফি বা পরাবিদ্যা; অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালী এই দলভুক্ত হইলেন। ইতিপূর্বেই ফরাসী দার্শনিক আগস্ট কোমৎ-এর মতবাদ বাঙ্গালার বহুতর শিক্ষিত ব্যক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ফ্রিমেশন্‌রি (Freemasonry) নামে এক বিশেষ ভ্রাতৃ-ভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ অনেক সুধীসজ্জন।

তখন, লিখিতে লজ্জা করে, বাঙ্গালার ব্যভিচার উৎকট বিকট মূর্তি ধারণ করিয়াছে। কি শিক্ষিত ব্যক্তি, কি ভূম্যধিকারী, এমন কি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যভিচার দোষে দুষ্ট। কলিকাতা এবং মফস্বলের শহরগুলিতে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ও বারবোষিতার বাড়াবাড়ি

ও ছড়াছড়ি; আর সঙ্গে সঙ্গে মদমাতালের এলাহি কাণ্ড। আমরা সেই সমাজের ঘৃণ্য বীভৎসতার চিত্র প্রদর্শন করিতে অসমর্থ, সে সকল লিখিয়া কাগজ-কলম অপবিত্র করিতে পারিব না। তাই মাত্র দুইজন বিশেষজ্ঞের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

মহামান্য শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার 'আত্মচরিত'-এ লিখিয়াছেন—

'আমি পাড়ার * ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (ইনি পরে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া শান্তিপুরে অনেকদিন কার্য করিয়াছিলেন), প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের † গোলদীঘিতে মদ খাইতাম এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস ‡ হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিককাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপ্‌কাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন কার্য মনে করিতাম।' (৩য় সংস্করণ, ১৯৫২; পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬)

আর সাহিত্যাচার্য স্বয়ং লিখিয়াছেন—

—আমরা তখন কলেজ ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলাম, তখনকার বিভীষিকা আপনাদের কাছে একটু বলি; সন্ধ্যার পর আমরা যেখানে যাইতাম সেইখানেই সুরাসেবনের অনুরোধ অতিথির সংবর্ধনা করিত। বিবাহাদি ক্রিয়ায় প্রায়ই সর্বত্র মদের ঢলাঢলি হইত। ঐ যে কলেজ স্কোয়ার বা গোলদীঘি—উহার চারিদিকে প্রস্তুত কুক্কুট-মাংস বারোচোদ্দখানা দোকানে বিক্রীত হইত। ... তখন আমাদের সম্মুখে কদমতলার পুষ্করিণীতে প্রতি রবিবার বেলা ১টার পর ১০/১২টি যুবক মদ্যপানে বিভোর হইয়া মহিষের মত জলে সন্তরণ দিতেন। শনিবার রাত্রি ছিল আশঙ্কার আধার—কখন কাহার বাড়ীতে কিরূপ অত্যাচার হয়, তাহা কেহই গণনা করিতে পারিত না। তখন ছিল—

> 'গো টু হেল হিন্দুয়ানি
> ব্যাড শাস্ত্র আর কি মানি,
> ম্যাড হ'য়ে আর কি থাকিব?
> ভেরি গুড, চল তবে
> ডুবিয়া ভবের টবে
> রোস্ট খানা সকলে খাইব।'

কথায় যা, কাজেও তাই। তখনকার ভাবগতিক দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না যে, এই বাঙ্গালি আবার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বাঁচিয়া থাকিয়া বাঙ্গালা ভোগদখল করিবে। মনে হইত, এই পুরুষেই শেষ—পিণ্ডান্তপিণ্ডশেষ।

তাহার পর ব্যভিচার; জেলার নগরে নগরে অনেক সম্ভ্রান্ত কর্মচারী, উকীল, মোক্তারের রক্ষিত স্ত্রীলোক ছিল; সন্ধ্যার পর ঐরূপ স্থানে আমোদ-প্রমোদের উপায় না থাকিলে বিষয়ী লোকের সম্ভ্রমই থাকিত না। হঠাৎ কোন জেলার সদরে উপস্থিত হইলে ও পরিচিত লোক না থাকিলে বেশ্যালয়ে বাসা লওয়া ব্যতীত ভদ্রলোকের উপায় ছিল না। এখন আমরা সেই দুর্দিনের দারুণ দুর্দশা কাটাইয়া

এইবার সে যুগের ভাল দিক্‌টির উল্লেখ করিব। সাহিত্যাচার্যের বাল্য ও কিশোর কালে বাঙ্গালার সর্বত্র সকলের মনে যে পূর্ণমাত্রায় সন্তোষ বিরাজ করিত তাহার যথাযথ বিবৃতি তিনি পিতাপুত্রে প্রদান করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের পাড়ার অতিদুঃখী পঞ্চু চাটুয্যে মহাশয়ের যে করুণার্ত অথচ সন্তোষব্যঞ্জক জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। —সেই 'চাটুয্যে মহাশয়ের ঘরে কিছু নাই, সকাল সকাল সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া আট-হাতী কাপড়খানির কোঁচাটি বামহাতে ধরিয়া, ডান হাতে তুড়ি দিতে দিতে নিজের পদস্থ চটির তালে গুন্‌গুন করিয়া গান করিতেছেন ও একটু প্রকাশ্য পথে পাদচারণা করিতেছেন' প্রভৃতি সমাজ-মধ্যে সন্তোষের উজ্জ্বল বর্ণনা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ অনুভব করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান

---

* পটল ডাক্তার। ১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† হিন্দুকলেজের, বর্তমান হিন্দুস্কুলের।

‡ সে সেনেট হাউস আর নাই।

অসন্তোষের নিদারুণ বীভৎস মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিতে পাঠককে অনুরোধ করি (৩৭ পৃষ্ঠা)।

বঙ্গদর্শন ও নবজীবনের প্রকাশ

১৮৭২ সালে যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট আর সাহিত্যাচার্য সেখানকার নবীন উকীল। তখন বহরমপুর বিদ্বজ্জনমণ্ডলী-দ্বারা পূর্ণ ছিল। পিতাপুত্রে এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিয়াছেন—

'বাঙ্গালা সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের স্থান কত উচ্চ, তাহা না বুঝিলে বাঙ্গালী লেখক ও বাঙ্গালী পাঠক বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন না। বিস্মৃত গ্রীক সাহিত্যের পুনঃপ্রাপ্তিকালে যেমন য়ুরোপে প্রতিভাপুনঃ-প্রদীপ্তি বা renaissance, বাঙ্গালায় তেমনই ইংরাজী শিক্ষার ফলে ও ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিভাপুনঃপ্রদীপ্তি। সেই নূতন যুগের যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অপ্রকাশিত আত্মচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন—ইংরাজীতে ভাবপ্রকাশদক্ষতা অর্জন করাতেই বাঙ্গালীর শিক্ষার সার্থকতা। কিন্তু অল্পদিনেই তাঁহার সে ভ্রম অপনোদিত হয়। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিয়া তাহার জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইলে, সে কাজ সাহিত্যের দ্বারা করিতে হইবে এবং সে কাজ কাহারও একার নহে। সেই জন্যই তিনি বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করিয়া দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং সর্বপ্রথমেই যাঁহাদিগকে সহকারী করিয়া লইয়াছিলেন—তরুণবয়স্ক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহাদিগের একজন।'

বঙ্গদর্শন প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে এই তরুণ অক্ষয়চন্দ্র-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু সুপণ্ডিত জগদীশনাথ রায়কে ইংরাজীতে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

'...... I have got a lot of contributors, who have promised to write and can write, in Dinabandhu, Hemchandra, Krishnakamal Bhattacharjya, Taraprasad Chatterjee and a young man whom you don't know, but whose intellectual life, I think, I have greatly influenced, for good or for evil, and whose inherent gifts presage something great for him in future. His name is Akkhay Sarkar.'

অনেকেই জানেন, কবিবর রবীন্দ্রনাথের যখন ২৩ বৎসর বয়স্ তখন সাহিত্যাচার্য তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, '... ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে।' আর অক্ষয়চন্দ্রের যখন ২৬ বৎসর বয়স্, যখন পর্যন্ত তাঁহার কোন লেখা বাহির হয় নাই, তখন বঙ্কিমচন্দ্র উপরি-উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বলিতে ইচ্ছা করে, বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র উভয়েই জহরী ছিলেন—রতনে রতন চিনে।

বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় সাহিত্যাচার্যের 'দশমহাবিদ্যা' প্রকাশিত হয়। এই দশমহাবিদ্যায় তাঁহার প্রতিভা ইতিহাস- ও পুরাণ-প্রসঙ্গে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি লিখিতেছেন—

—আমার বোধ হয় যে, এই ভারতবর্ষের দশ দশাই দশ মহাবিদ্যা। এক্ষণে সপ্তমী দশা চলিতেছে, সেই দশার প্রতিমূর্তিই ধূমাবতী মূর্তি। প্রথম দুই দশায় **কালী ও তারা** মূর্তি।—আর্য-দস্যু-বিবাদ লইয়া যখন ভারতবর্ষ প্রত্যহ রক্তে স্নান করিত।...তাহার পর **ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী** দুই মূর্তি। ... এখন রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে রাজ্ঞী অভয়দানে সকলকে তুষ্ট করিতেছেন। এক্ষণে ভারত—রাজ্ঞী, এক্ষণে ভারত—শান্তি। তাহার পর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ... ভারত যোগিনী, ভারত **ভৈরবী**। ... ষষ্ঠী দশায় তন্ত্র-প্লাবন। **ছিন্নমস্তা** মূর্তি।...ভারতমাতার এক্ষণে **ধূমাবতীর** দশা।... বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই; রুক্ষকেশা, রুক্ষাক্ষা; দন্ত বিরল হইয়াছে; শোকেতাপে দৃষ্টি কুটিল হইয়াছে, যেন সকল আশ্রয়-পরিচ্যুতা হইয়া পুরাতন ভগবান

রথে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, হায়! সেই রথের উপরি কাক বসিতেছে!...

মাতা আবার বগলা মূর্তিতে দেখা দিবেন। ভারত-মাতা আবার রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন, ভারতমাতা আবার স্বভূষণে ভূষিতা হইবেন।...বগলা সিদ্ধবিদ্যার মন্ত্রে সকলে সিদ্ধ হইবার উপায় অবলম্বন কর।... ইহার পরেই ভারতের মাতঙ্গী মূর্তি। ভারতমাতা আপনার চিরপরিচিত দয়ার বশবর্তিনী হইয়া সেই করকবলিত শত্রুকে বিমুক্ত করিয়াছেন; আত্মরক্ষার্থ খড়্গচর্ম ধারণ করিয়াছেন; শাসনাস্ত্র পাশাঙ্কুর পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন। রত্নপদ্মাসনে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ভারতমাতা বহুকাল এ ভাব গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি ইহার পরেই মহালক্ষ্মীরূপে ভবে দেখা দিবেন। ...ভারত-মাতার যুগ-যুগান্তরের মলরাশি শ্বেতহস্তিগণ অমৃতবারি-সেচনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারতমাতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয়দান করিতেছেন। আহা কি শুভ দিন! শরীরে রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার জয়ধ্বনি কর। ভারত-মাতার অভিষেক হইতেছে। মাতা—যোগিনীমূর্তি, যাত্রীমূর্তি, এমন যে ভুবনে অতুলা ভুবনেশ্বরী মূর্তি, মাতা তাহা গ্রহণ করেন নাই; মা এখন মহালক্ষ্মীভাবে শোভা পাইতেছেন; সকলে জয়ধ্বনি কর।—

কিন্তু দশমহাবিদ্যার শেষে অক্ষয়চন্দ্র লিখিলেন—

—সম্মুখে কি দেখ দেখি—ঐ দেখ মাতার সেই ভগ্নযান রথোপরি কাক বসিয়া আছে, ডাকিতেছে ক—অ—অ—অ, ক—অ—অ—অ—অ; দেবীর ক্ষুৎপিপাসার্দিত ভ্রূকুটিপাতে অন্তর্দাহ হয়, আর সহিতে পারি না!

মাতর্বগলে আবিরাবিঃ।—

স্মরণ রাখিতে হইবে, সেই 'ধৃত-মুদ্গর-বৈরিজিহ্বাম্', সেই 'শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্' বগলাদেবীরই আবির্ভাব অক্ষয়-চন্দ্র প্রার্থনা করিতেছেন।

অক্ষয়চন্দ্রের এই লেখা ১৮৭৩ সালের, আর বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লেখেন ১৮৮১ সালে—আট বৎসর পরে। আনন্দ-মঠের মাতৃমূর্তি—মা ছিলেন, 'সর্বাঙ্গসম্পন্না—সর্বভূষণ-ভূষিতা—জগদ্ধাত্রী।' আর আজ মা—'কালী—অন্ধকার-সমাচ্ছন্না—কালিমময়ী। হৃতসর্বস্বা, সেইজন্য নগ্নিকা।' তাহার পর মা যা হইবেন—'দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপাতে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণীবিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।' মনে রাখিতে হইবে, হুবহু এই মাতৃমূর্তিই বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তরের ১১শ সংখ্যায় (১৮৭৪, আনন্দমঠ-প্রকাশের সাত বর্ষ পূর্বে) 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে চিত্রিত হইয়াছিল। সুতরাং মাতৃমূর্তি-স্বরূপ দুর্গা প্রতিমাই বঙ্কিমচন্দ্রের আরাধ্যা দেবী, এইরূপে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উন্মেষ হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে কাশিম-বাজারে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের দেশাত্মবোধের মূলসূত্রটি ঋষিকল্প রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সর্বপ্রথম দেশবাসীকে ধরাইয়া দেন। বৈজ্ঞানিক ডারুইন যখন তাঁহার বিবর্তবাদ বিজ্ঞানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, তখন সে মতবাদ তাঁহার সমসাময়িক কবি টেনিসন-এর কাব্যেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। Great men think alike ছাড়া আমরা আর কিছুই বলিতে চাহি না।

অনেকেই জানেন, 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'য় বঙ্গদর্শনের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমন নির্ভীক, নিরপেক্ষ অথচ সরস সমালোচনা ইহার পূর্বে বঙ্গসাহিত্যে দেখা যায় নাই। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের শেষের দিকে এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ১২৮১ সালের মাঘ মাসে (১৮৭৪) বঙ্গদর্শনের 'সম্পাদকীয় উক্তি'র শেষ অংশে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন—

'আমাদের স্থূল বক্তব্য এই যে, আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে বা যাহা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসম্বন্ধে সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে না, কোন কোন গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা পূর্বপ্রথানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব।'

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৮৮৪ সালে সাধারণী প্রেস কলিকাতায় উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। তখন কলিকাতার কলুটোলায় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসম্রাট্‌রূপে বিরাজমান। তাঁহার বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্য-সভা হইত। উপস্থিত থাকিতেন—চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রভৃতি। মধ্যে মধ্যে আসিতেন বারাসত হইতে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমানের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং চট্টগ্রামের নবীনচন্দ্র সেন। অক্ষয়চন্দ্র নিয়মিতভাবে প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে ত বটেই এবং অন্য দিন অন্য সময়েও বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরিয়া সে এক অভূতপূর্ব মজ্‌লিস। এই সাহিত্যসেবার সভায় নানা আলোচনা ও পরামর্শের ফলে নবজীবনের উৎপত্তি। পিতাপুত্রে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধের জন্মদাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—

'His Navajivan was instrumental to no small extent in bringing about the Hindu revival of his times.'

জীবনের বৈশিষ্ট্য

সাহিত্যক্ষেত্রে

ভাষা

সাহিত্যাচার্যের ভাষা-সম্বন্ধে প্রথমেই শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালের লেখা উদ্ধৃত করিতেছি।—

'অক্ষয়চন্দ্রের ভাষার একটা অনন্যসাধারণ শক্তি ও সরলতা আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর এ বস্তুটি তাঁহার নিজস্ব। কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শব্দসম্পদের পরিচয় দান করিয়াছেন, গদ্য-লেখাতে অক্ষয়চন্দ্র সে সম্পদেরই প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। সুললিত, সহজ-বোধ্য, বিবিধ রসোদ্দীপক শব্দধারার সৃষ্টিকুশলতায় বাংলা লেখকদিগের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও হয়েন নাই।... শব্দের যে একটা নিজস্ব মোহিনী প্রভাব আছে, সুযোজিত ধ্বনিধারায় যে একটা মাদকতা-সঞ্চারিণী শক্তি আছে, এও তো সত্য। সাহিত্যিক মাত্রেই রসাত্মক বাক্য যোজনা করিতে যাইয়া স্বল্পবিস্তর পরিমাণে এই মাদকতা-সঞ্চারিণী শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া থাকেন। এ অধিকার যাহার নাই, তিনি চিন্তাশীল হইতে পারেন, বহু জ্ঞানের অধীশ্বর হইতে পারেন, বহু তত্ত্বের আবিষ্কর্তা হইতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিক হইতে পারেন না।...যে লেখকের শব্দসম্পদ্ যত বিশাল ও সেই শব্দরাশির যথাযোগ্য যোজনায় নিপুণতা যাহার যত বেশি, সাহিত্যজগতে তিনি তত শ্রেষ্ঠ—সাহিত্যাচার্য উপাধি পাইবার উপযুক্ত। এই হিসাবে অক্ষয়চন্দ্রকে ন্যায়তঃই সাহিত্যাচার্য বলিতে পারা যায়। বাংলা গদ্য-রচনায় এমন তুবড়ী ফুটাইয়া তুলিতে আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া জানি না।...

এক সময়ে অক্ষয়চন্দ্র যে বাংলা শব্দকে লইয়া বিচিত্র রসের খেলা খেলিয়াছিলেন, আর সে খেলাতে বাঙালী চকিত, পুলকিত, স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সে জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টিতে আজিও অক্ষয়-চন্দ্র অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য ভোগ করিতেছেন।...'

(নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩২০)

সাহিত্যাচার্যের ভাষা-সম্বন্ধে আমরা আরও দুইচার কথা বলিব। তিনি তাঁহার সাহিত্য-উপাসনায় এক অপূর্ব প্রতিমা গঠন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সর্বাগ্রে সেই প্রতিমা দর্শন করিয়া দেবীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

—দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, তৎপার্শ্বে উপবীত-বক্ষে গণেশমূর্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতীস্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূরচূড়া, টেরিকাটা কার্তিকস্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহা দেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরূপী মদনমোহন—সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার উপাসক।... —

তিনি নিজেই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনাবলি পড়িয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অন্নদা-মঙ্গলের (ভারতচন্দ্রের) ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর ও রসপ্রাহিতা অক্ষয়কুমারের (তত্ত্ববোধিনীর) গাম্ভীর্য,

বিদ্যাসাগরের প্রসাদগুণ এবং সর্বোপরি মদনমোহনের সেই সুন্দর, সতেজ, সরল, সহজ, মিঠাকড়া, মোলায়েম, জলের মত পরিষ্কার স্বচ্ছ ভাষা তিনি এতদূর আয়ত্ত করিয়াছিলেন, নিজস্ব করিয়াছিলেন, আপনার করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই-না তাঁহার ভাষা এমন সহজ, সরল, প্রাঞ্জল—গুরুগম্ভীর অথচ হৃদয়গ্রাহী—প্রসাদগুণে ও ওজোগুণে ওতপ্রোত, প্রাণবন্ত—রসে ভরপুর, ভাবে অনুপ্রাণিত—শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন।

সাহিত্যাচার্য লিখিয়াছেন—

---ভাষায় তেজ, আবেগ, বল, জীবন, প্রাণ আনিতে বা রাখিতে হইলে লিখিত ভাষায় কথিত ভাষায় অধিকতর সংশ্রব রাখিতে হইবে। সকল বিষয়েই আমরা প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি, যদি ভাষায় বা সাহিত্যে একটু প্রাণ রাখিতে পারি বা আনিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা ক্রমে সকল বিষয়েই প্রাণ পাইতে পারি।··· প্রাণ নিম্নস্তরে। নিম্নস্তরের ভাষা আমাদিগকে লইতেই হইবে।··· ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে তাহা সাধারণের বোধগম্য করা আবশ্যক, আর ভাষাকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাতে রসসংযোগ করা আবশ্যক। রসময়ী ভাষাই সাহিত্যের আধার।··· বঙ্গভারতী বাণীমাতা আমার অনন্তরূপিণী। তুমি যে ভাবে তাঁহার পূজা করিবে সেই-ভাবেই সিদ্ধিলাভ করিবে। যখন যে-লক্ষ্যে ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজন, ভাষাকে সেই লক্ষ্যসিদ্ধির উপযোগিনী করিতে হইবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে সেইরূপ তুলিতে-পাড়িতে পারি। কিন্তু তাহাতে সাধনা চাই, কায়মনঃপ্রাণে মাতৃভাষার সেবা করা চাই। সেবা-ধর্মের গুণই এই যে, ঐকান্তিক সেবক সেবার বলে সেবিতকে আপনার বশে আনিতে পারে। সকলেই দেখিয়া থাকিবে, পুরাতন ভৃত্য ধারাবাহিক সেবার গুণে প্রভুকে আপনার বশে রাখে।—

উপরি উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি নির্দেশ, প্রতিটি উক্তি যে সাহিত্যাচার্যের লেখার যে-কোন স্থান পাঠ করিলেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা বলা বাহুল্য। 'উদ্দীপনা', 'দশমহাবিদ্যা', 'গ্রাবু' প্রভৃতি তাঁহার যৌবনে লিখিত ২।৫টি প্রবন্ধ ভিন্ন বাকি সমস্ত রচনাবলি সংস্কৃত-বাহুল্য-বর্জিত সহজ, সরল, অনায়াস-বোধগম্য প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত।

শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিয়াছেন—

'অক্ষয়চন্দ্র প্রচলিত দেশীয় ভাষা কখনও ত্যাগ করিতেন না—সংস্কৃত শব্দের পার্শ্বেই তাহাকে স্থান দিতেন এবং তাহার প্রয়োগফলে রচনার সরসতা ও শক্তি বর্ধিত করিতেন। ··· তাঁহার রচনা খাঁটি রচনা—তাহাতে নকল ছিল না। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, দেশবিদেশের সাহিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিন্তু অর্জিত ও সম্ভৃত জ্ঞান তিনি সাহিত্য-সেবায় প্রযুক্ত করিয়াই আনন্দ লাভ করিতেন। তাই তাঁহার রচনারীতি মনোজ্ঞ, তাঁহার রচনা মনোহারী।

আজকাল আমরা সাহিত্যে—রচনায় যে প্রকৃত শিল্পীর নৈপুণ্যের অভাব অনুভব করি, অক্ষয়চন্দ্রের রচনায় সে অভাব নাই। তিনি অতি ক্ষুদ্র রচনাও সরস ও সুন্দর করিতেন। তাই তাঁহার রচনা চিরসুন্দর এবং তাহা বাঙ্গালা রচনার অন্যতম আদর্শ হইয়া থাকিবে।'

বাঙ্গালা ভাষায় প্রাদেশিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

'বাঙ্গালার কোন প্রদেশের লোকে বলে, "কল্লুম", কোন প্রদেশে "কল্লেম", কোথাও "কল্লাম," "কন্নু"। কোন প্রদেশ-বিশেষেরই ভাষা ব্যবহার করা হইবে না,—যাহা লিখিত ভাষায় চিরপ্রচলিত তাহাই ব্যবহৃত হইবে।'—সাহিত্যাচার্যেরও ঠিক এই মত এবং উভয়েই তাঁহাদের সমগ্র গ্রন্থাবলি-মধ্যে কোথাও প্রাদেশিক চল্‌তি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন নাই—কথোপকথনের ভাষাতেও নয়।

রচনায় চিন্তার মৌলিকতা

প্রথমেই মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের একটি উক্তির প্রতিবাদ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—

'অক্ষয়চন্দ্রের চিন্তার মৌলিকতা না থাকিলেও ভাষার একটা অনন্যসাধারণ শক্তি ও সরলতা আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব।'

'চিন্তার মৌলিকতা' অর্থে আমরা বুঝি, যাঁহার চিন্তার ধারা নিজস্ব—পরস্ব নহে,—সে ধরণের, সে ধারার, সে শ্রেণীর চিন্তা পূর্বে অন্য কেহ নিজের লেখার মধ্যে প্রকাশ করেন নাই। মৌলিকতার ইংরাজী প্রতিশব্দ originality—যাহা নকল নয়, চর্বিতচর্বণ নয়, (চিন্তার বেলায়) নিজের চিন্তা হইতে উদ্ভূত—অপরের অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মৌলিকতার অর্থ এই সংজ্ঞার দ্বারা বিচার করিলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার সাহিত্য-সম্ভারের অধিকাংশ রচনার মধ্যে যে চিন্তার ধারা প্রবাহিত দেখিতে পাই, তাহা মৌলিকতায় পরিপূর্ণ, ওতপ্রোত, মাখামাখি। আমাদের ধ্রুব ধারণা, এত মৌলিক চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প ব্যক্তিই লিখিয়াছেন। আমরা কতকগুলি প্রবন্ধের নামোল্লেখ মাত্র করিয়া পাঠকগণের ওপর বরাত দিতেছি তাঁহারা যেন এইসব প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং আমাদের এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি কবিবার প্রয়াস পান।—

উদ্দীপনা, দশমহাবিদ্যা, পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব, গগন-পটো, ভূমিকম্প, সমগ্র ভারত, তোমরা যদি আর্য হও—আমরা অনার্য, চুল্লি না নির্বাণ হয়, ভাই হাততালি, সিংহের উপাধি-বিতরণ, জন্তুধর্মী মানব, গ্রাবু, বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম, বাঙ্গালির দুর্গোৎসব প্রভৃতি। এই সকল প্রবন্ধের যে-কোন একটি অবহিত হইয়া পড়িলেই সাহিত্যাচার্যের চিন্তার মৌলিকতা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তাঁহার এই সকল মৌলিক প্রবন্ধনিচয় বিভিন্ন সময়ে লিখিত বলিয়া, প্রবন্ধে লেখকের নাম না থাকায় এবং এতকাল নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ছিল, তাই বিপিনচন্দ্রের সেইগুলি পড়িবার সুযোগ হয় নাই, অথবা পড়িলেও সাহিত্যাচার্যের লেখা বলিয়া ধরিতে পারেন নাই।

আমাদের প্রতিবাদের যাথার্থ্যের সপক্ষে শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষের অভিমত উদ্ধার করিতেছি।—

'অক্ষয়চন্দ্র যে-কোন বিষয়ে রচনা করিতেন, তাহাতেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য সপ্রকাশ হইত এবং তাহাতেই মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাইত।'

লিখন-ভঙ্গি

আবার বিপিনচন্দ্রের লেখা উদ্ধৃত করিতেছি।—

'এবারতে—ইংরাজীতে ইহাকে style বলে—অক্ষয়চন্দ্র এক সময়ে অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আজকাল তো, বলিতে গেলে, দু'চারজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখাতে ভিন্ন এবারত বস্তুটাই বাংলা সাহিত্য হইতে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে।'

আমরা সাহিত্যাচার্যের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত রচনা হইতে মাত্র ছয়টি অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার যে একটি নিজস্ব এবারত বা বাক্যবিন্যাসরীতি বা সাহিত্যাচার্যের ভাষায় 'লিখন-ভঙ্গি' ছিল তাহাই সপ্রমাণ করিব। এই সকল উদ্ধৃত অংশ পড়িলেই তাঁহার লিখন-ভঙ্গি, তাঁহার অসাধারণ শব্দসম্পদ্ ও চিন্তার অপূর্ব ধারা, তাঁহার লেখার ভাব ও ব্যঞ্জনা, দ্যোতনা ও রসাবেশ, সৌন্দর্য ও মাধুর্য পাঠকের মনে সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে।

—আকাশের কি বুঝি, আকাশের কি লক্ষণা করিতে পারি?—কিছুই পারি না; কিন্তু আকাশ সকলেই বুঝে। রস সেই আকাশের মত সর্বব্যাপী, সর্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছে।

ঐ-যে নবোঢ়া কিশোরী প্রথম-সমাগম-অবসরে প্রফুল্ল যুবক স্বামীর শয্যাপার্শ্বে খট্টাঙ্গদণ্ড ধরিয়া ক্ষৌম বসনে বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া, ব্রীড়া-বিকুঞ্চিত-অঙ্গে বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর ঐ-যে তরুণ যুবক পূর্ব হইতে পুষ্পবাসিত শয্যায় শয়ান আছে, মৃদু মৃদু দক্ষিণ পদ কম্পন করিতেছে, আর মুচকি মুচকি হাসিয়া তরুণীর লজ্জা-তরঙ্গ লক্ষ্য করিতেছে, ভাল ইহারাই কি রস বুঝিয়াছে, আর আমরা এই প্রৌঢ় বয়সে কি তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না? —ঐ-যে প্রবাসগামী পতিপার্শ্বে প্রণয়িনী কি বলিতে গিয়া বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারিল না, সরমে মরমের কথা তাহার বলা হইল না, সেই প্রণয়ী-প্রণয়িনী কি রস বুঝিয়াছিল, আর আমরা কেহ কিছুই বুঝি না? — ঐ-যে অর্ধযুবতী, অর্ধকিশোরী, অর্ধঅবগুণ্ঠনবতী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি সুঠাম সুগোল মাতৃস্তন বিকশিত

করিয়া দূরস্থিত কথঞ্চিৎ চলচ্ছক্তি-বিশিষ্ট শিশুসন্তানকে সাগ্রহ আহ্বান করিতেছে, আর সন্তান উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে, টলিতে টলিতে দৌড়াইতেছে—ঐ বঙ্গজননী আর ঐ বঙ্গশিশুই কি রস বুঝিয়াছে, আর আমরা কেহ বুঝি না? —আর ঐ-যে

'বঁধুর বাঁশী বাজে ঐ বিপিনে
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল,
সুধা বরিষিল শ্রবণে'—

ঐ বংশীধর বন্ধু আর অবশ-অঙ্গিনী গোপীগণই কি রস বুঝিয়াছিলেন, আর আমরা কেহ বুঝি না? তা কেন?—'ঘন-বিজন কানন বা তরুশূন্য মরুদেশ, প্রখররশ্মিপ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময় বা ঘোরা দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরী, তরুণ যৌবন বা পরিপক্ব প্রবীণকাল—সর্বস্থানে, সর্বাবস্থায় পরাৎপর পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য-সৌন্দর্য সাক্ষাৎকার করিয়া ভক্তিমানের চিত্ত রসসঞ্চারে ভক্তিভরে পরিপ্লুত হয়।'

(১৩১৯)—

*

—সাহিত্য- বা রস-রচনা শিখিতে হয়। সাহিত্য একটি প্রবাহ। ইহার উৎপত্তি ও পরিণতি জানিতে পারা না যাউক, একটু চেষ্টা করিলেই ইহার গতি বুঝিতে পারা যায়।

গঙ্গোত্তরী দেখি নাই, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমও দেখি নাই। দেখিয়াছি হরিদ্বারের সেই প্রাণমনঃ-শীতলকারিণী স্বল্পতোয়া খরতর-স্রোতা নীলধারা; দেখিয়াছি কানপুরের সেই তটশালিনী সুন্দর জাহ্নবী; দেখিয়াছি প্রয়াগের সেই নীলবাহিনীর সহিত শ্বেতবাহিনীর বিচিত্র সঙ্গম। দেখিয়াছি তীরস্থ হর্ম্যরাজি-বিরাজিত, লক্ষ লক্ষ স্নানার্থীর সমাবেশে অলঙ্কৃত কাশীতলবাহিনী গঙ্গা; দেখিয়াছি গ্রীষ্মের পাটনা-ভাগলপুরের অগাধ সৈকতে লুপ্তপ্রায় দেবসরিৎ; দেখিয়াছি জঙ্গীপুরে ক্ষুদ্র কাষ্ঠমঞ্চে গঙ্গা পার হওয়া; দেখিয়াছি জরাজীর্ণ তীরস্থ শবদেহের মত বহরমপুরের পশ্চিম তীরস্থ ভাগীরথী,—বহরমপুর হইতে তমলুকের মোহানা পর্যন্ত সমস্তই দেখিয়াছি—কহলগাঁয়ের সেই অপূর্ব প্রপাত; কালীগঞ্জ-কাটোয়ার সেই ফণিকুণ্ডলীর মত বাঁওড়, দশহরার সেই হলহলা, আম-কাঁটালের ছড়াছড়ি, বারুণীতে সেই বালকগণের সহিত স্নানার্থীর অপক্ব আম্র লইয়া হুড়াহুড়ি, আহ্নিকের ছটা, স্নানের ঘটা, ব্রীড়াময়ীর লজ্জা, যুবতীর সজ্জা, শঙ্খঘণ্টারব, স্তোত্রপাঠ, শিবপূজা, বিস্তৃত শবভয়ঙ্কর শ্মশান, আর ভক্তের ভজন-ভাব-ভরিত নয়ন-মনোরম দেবালয়—এ সকলই দেখিয়াছি। এখন বলিতে পারি যে আমাদের তলবাহিনী, কলবাহিনী ভাগীরথীর ভঙ্গি কিরূপ, পুণ্যতোয়ার পুণ্যের পরিমাণ কিরূপ হয়। এরূপ না করিয়া কলিকাতার কলতলায় দিনান্তে দুইবার কুলকুচা করিয়া গঙ্গার মহিমা-বর্ণন করিতে যাওয়া যেরূপ হাস্যকর বিক্রমপ্রকাশ ও বিড়ম্বনা, আর বঙ্গীয় যুক্তাক্ষরযুক্ত দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিয়াই বাঙ্গালায় বহি লিখিতে যাওয়া সেইরূপ বিড়ম্বনা ও ধৃষ্টতা। (১৩১৮)—

*

—এই ম্যালেরিয়া-ভারাক্রান্ত প্রদেশের নিভৃত নিকেতনে ভগ্নস্বাস্থ্য-দেহে পড়িয়া পড়িয়া শাদার উপর কালোর দাগ চড়াইতেছি—ইহাতেও সুখ বেশি, না দুঃখ বেশি? গণিতে জানিলে, না ভুলিলে, দুঃখ অপেক্ষা সুখের পরিমাণ অনন্তগুণে বেশি। এই চারিদিকের নিবিড় জঙ্গল,—হইতে পারে ম্যালেরিয়ার সুতিকাগার—কিন্তু ইহার অনন্ত সৌন্দর্য চক্ষুতে ত ধরে না। এ হরিৎশোভা স্বর্গেও দুর্লভ। আর ঐ কৃষ্ণগোকুলে পাখীর গালভরা আওয়াজের প্রাণভরা সম্মোহন—তাহারই কি তুলনা হয় নাকি? আর এই কৃষ্ণা রজনীর প্রদোষ-অন্ধকারে যখন আমাদের অতি নিকটস্থ মঙ্গল গ্রহের উজ্জ্বল পিঙ্গল বর্ণচ্ছটা নিকট-প্রতিবেশী নীলাঞ্জননিভ শনি গ্রহকে উপহাস করিয়া প্রকাশ পায়, আর চতুর্দিকে হীরকচক্ষু টিপিটিপি মেলিয়া নক্ষত্রসমূহ সেই পরিহাস, উপহাস নিয়ত লক্ষ্য করে, শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে সেই সকল জ্যোতিষ্কপুঞ্জের খেলা—এ সকল পর্যবেক্ষণের অসীম আনন্দ কি পরিমাণের সামগ্রী? (ভাদ্র, ১৩১৬)—

*

—ভারত কেহ দেখিয়াছ কি? তুমি অসাড় কোটি হস্তের দুইখানি হস্ত দেখিয়াছ, আমি অর্বুদ অচল ভগ্ন পদের

একটি পদ দেখিয়াছি, তিনি অগণিত রক্তস্রাবী ক্ষতের একটি ক্ষত দেখিয়াছেন। কেহ হিমালয়ের উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া আলুলায়িত কেশরাশিতুল্য বনরাজির একদেশ দেখিয়াছেন, কেহ-বা কুমারিকা অন্তরীপ-তটে উপবিষ্ট হইয়া তুলারাশি-বহনকারী ঘোররাবী সুনীল সিন্ধুর আন্দোলনে অন্তরে অন্তরে মন্দ আন্দোলিত হইয়া ভারতের পদ-নখর গণনা করিয়াছেন। তুমি দক্ষিণ-সাহাবাজপুরে এক দিনের দীর্ঘ নিঃশ্বাসধ্বনি শুনিয়াছ, অথবা দাক্ষিণাত্যের দুর্দিনের হাহাধ্বনি তোমার কর্ণগোচর হইয়াছে। কবি এক দিনের মলিন মুখচন্দ্রমার পাণ্ডুরচ্ছবি সন্দর্শন করিয়া হৃদয়পটে চির-অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, আর আমি দিল্লী-দরবারের সেই নিষ্পন্দ, নিশ্চল, বাষ্পভর ভাব ভাবিয়া এখনও বিচলিত হই।

কিন্তু তুমি, আমি, তিনি, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহা একদেশ মাত্র, ভারত-কণা মাত্র ;—সমগ্র ভারত, সম্পূর্ণ ভারত ভারতের সন্তান দেখে নাই, দেখে না—দেখার আশা হৃদয়ে ধারণ করে না। (১২৮৯)—

*

তুমি আমি সকলেই সরলের প্রশংসা করি, সরলতা ভালবাসি। ভালবাসি সরলা বালিকার রূপ, অদন্ত শিশুর মধুর হাসি, ফুলের সুগন্ধ, ফলের মিষ্টতা ; ভালবাসি প্রেমের অশ্রু, দয়ার দ্রাবকতা ; ভালবাসি সরলের সরলতা। এই বনভূমিতে বনস্পতি-মণ্ডলীর বিলাস-লীলা কিন্তু বড়ই জটিলতাময়ী। শাখায় শাখায়, শাখায় লতায়, লতায় লতায়, ক্ষুপেতে গুল্মেতে, লতায় পাতায় এমন জটিলভাবে জড়াজড়ি—তলভূমিতে এতই জঙ্গল যে সেই জটিলতায়, সেই জঙ্গলে হাতীর উপর হাতী, তাহার উপর হাতী থাকিলেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জটিল জঙ্গলময়ী বনভূমি দিনেই অসূর্যম্পশ্যরূপা—অন্ধকার নিশীথে কি বিভীষিকাময়ী, মনে করিতেও অঙ্গ কণ্টকিত হয়। (১৩১৫)—

*

—সেই মূর্তি কি ক্ষেমঙ্করী, কেমন শান্তিময়ী, কেমন নিষ্কামে কার্যকরী, কেমন কোমলে কঠোর—যেন ইহকালে পরকালের ছায়া ; সে সৌন্দর্যে বিলাস নাই, সে কোমলতায় আবেশ নাই, সে ললিতভৈরবে গিটকিরি, কবৃতপ নাই ; সে বেহাগে 'ঢলিয়া পড়ি—ধর ধর' নাই। সে মূর্তি আপনাতে নির্ভর করিতে জানে—করিতে পারে ; বিনামূল্যে সংসারের সেবা করে ; তাঁহার কাছে ভোগের সহিত সেবার বিনিময় নাই ; তাঁহার কর্মই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম, তাঁহার ধর্মই প্রকৃত হিন্দুধর্ম, তাঁহার জীবন মহাব্রত ; তিনিই যথার্থ ব্রতচারিণী, ব্রহ্মচারিণী—তিনি নারী হইয়াও দেবী।···হিন্দু বিধবার সংসার-পালনী ধাত্রীমূর্তি, ব্রহ্মচারিণী-মূর্তি ইউরোপের কবিরা বুঝেন নাই, ইউরোপের শাস্ত্রজ্ঞেরা জানেন না। বিধবার মর্যাদা ইউরোপ জানে না। ননেরিতে* ব্রহ্মচর্যের অনুকরণ করিতে গিয়া ভ্রংশীকরণ করিয়াছে। সংসারস্থিতা ব্রহ্মচারিণীর সংসার-নির্লিপ্তামূর্তি, সংসার-সেবিকার সংসার-কর্ত্রীমূর্তি, দাসীর দেবীমূর্তি—এ বৈচিত্র্য, এ রহস্য ইউরোপে বুঝে না, জানে না। ইউরোপের সাহিত্যে নাই, কবিত্বে নাই, ধর্মে নাই—সমাজে নাই।

সেই রুক্ষকেশা, সামান্যবেশা, দেবসেবানুরতা, ভোগ-রাগবিরতা, অতিথি-সৎকারকারিণী, পরিবার-প্রতিপালিনী—সেই সেবার কর্ত্রী, সর্বজনের ধাত্রী—ব্রতধারিণী, ব্রহ্ম-চারিণীই ত এই বঙ্গসমাজ রক্ষা করিতেছেন। তুমি, আমি—আমরা ত সকলেই এক দিকে উদরের দায়ে ব্যস্ত, অন্য দিকে পৃষ্ঠের ঘায়ে বিব্রত। কেবল হিন্দুর বিধবাই হিন্দুর ধর্মরক্ষা করিতেছেন, হিন্দুয়ানি রক্ষা করিতেছেন—নহিলে এত দিন আমাদের নিত্যসেবা উঠিয়া যাইত, ঠাকুরঘর ড্রইং রুম হইত, তুলসীমঞ্চে ক্রোটন বসিত—শালগ্রামে বিলিয়ার্ড হইত ; গৃহে ব্রাহ্মণ-ভোজনের পরিবর্তে ক্লাবে ডিনার দিতাম, প্রাত্যহিক আতিথ্যের বদলে পুয়র ফণ্ডে সাব্‌স্ক্রাইব (subscribe) করিতাম, মুষ্টিভিক্ষুককে যষ্টি দিতাম।—তাহা যে আজিও হয় নাই, চুণাগলি যে আজিও

* Nunnery

চুণাগলিই রহিয়াছে—এখনও রুইকাত্‌লার রাস্তা হয় নাই—সে কেবল ঐ বিধবার ব্রতপালনের ফলে। (১২৯২)—

কাহারও লিখন-ভঙ্গি বা স্টাইল কথায় বলিয়া বা ভাষায় লিখিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। তাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে লিখিত ছয়টি লেখার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতে হইল। তাহাকেই লিখন-ভঙ্গি বলি যাহা পাঠ করিলে বা যাহার পাঠ শুনিলে কে-যে ঐ লেখার লেখক তাহা আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় না—লেখা হইতেই লেখকের নাম স্বতঃই মনে পড়িয়া যায়—'হাঁ, এ যে অক্ষয় সরকারের লেখা তাতে কোন সন্দেহ নেই।' অবশ্য, যাঁহার লেখার স্টাইল ধরিবার চেষ্টা করিতেছি, তাঁহার অন্ততঃ দুইচারটি লেখার সহিত পূর্বপরিচয় থাকা দরকার। কিন্তু এই যে লেখা পড়িয়া লেখককে চিনিতে পারা—এমন লেখক যে-কোন সাহিত্যে কয়জন মিলে? বাঙ্গালায় অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, হরপ্রসাদ প্রভৃতি লেখকগণকে ছাড়িয়া দিলে, সাহিত্যিকগণের মধ্যে কয়জনের নিজস্ব বিশেষ লিখন-ভঙ্গি আছে?

সমালোচনা

সমালোচনা-প্রবৃত্তি সম্ভবতঃ সাহিত্যাচার্যের শৈশবেই অঙ্কুরিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন—

—(উলায় থাকিতে) প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হইল। ··· গেজেট কথাটা আমি তৎপূর্বে শুনিয়াছিলাম। 'বাঙ্গালা গেজেট' দেখিয়াও ছিলাম। এডুকেশন কথাটা তৎপূর্বে আমার কর্ণে উঠে নাই। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই কথাটা কি?' বাবা বলিলেন, 'ওটা ইংরাজি কথা—অর্থ শিক্ষা।' আমি বলিলাম, 'তবে শিক্ষা গেজেট বলিল না কেন?' পিতা একটু হাস্য করিলেন। শৈশবে আমার সমালোচনার প্রবৃত্তি দেখিয়া হয়ত একটু আহ্লাদিত অথচ বিচলিত হইতেছিলেন। আজি পঞ্চাশ বৎসর কথাটা শুনিতেছি, কিন্তু শিক্ষাবিভাগের মুখপত্রের নাম এডুকেশন গেজেট—এ বিড়ম্বনা-কণ্টক এখনও প্রাণে খচ্‌ করিয়া উঠে।—

এই লেখা ১৩১১ সালের; পরে ১৩১৮ সালে তিনি লিখিতেছেন—

—সমালোচনা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। অথচ প্রতিদিন দেখিবেন, সাহিত্য পত্রপত্রিকায়, রাজনৈতিক ও সামাজিক খবরের কাগজে সমালোচনা নাম দিয়া কিম্ভূতকিমাকার বিড়ম্বনা বাহির হইতেছে,—পড়িলে সমালোচকের উপর কেবল অশ্রদ্ধা হয়, আর কিছুই হয় না। না-গ্রন্থখানি কিরূপ তাহা বুঝা যায়, না-সমালোচক কি বলিতেছেন, তাহা বুঝা যায়; যদি কখন বুঝা গেল ত তিনটি কথা বুঝা যায়—১) লেখক গ্রন্থকারকে সার্টিফিকেট দিতেছেন আর আশীর্বাদ করিতেছেন। আশীর্বাদ করিতেছেন বলিয়া সমালোচক লেখকের গুরু, আর ক্রীতদাসের ন্যায় তোষামোদ করিতেছেন বলিয়া তিনি দাস। সুতরাং কেহ রাগ না করিলে, এই সকল সমালোচনাকে গুরুদাসী বলা যাইতে পারে। ২) আর একটা কথা বুঝা যায় যে, লেখকে ও সমালোচকে অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু কি কি বিষয়ে মতভেদ তাহা কিছুই জানা যায় না—মতসামঞ্জস্য ত পরের কথা। ইহাকে মতভেদী বলা যাউক। ৩) আর একপ্রকার কণাধারী,—বিমান অর্থে আকাশ হইতে পারে না; বিষণ্ণ শব্দের শেষের অক্ষর দুইটি ণত্ব নহে—একটি মূর্ধন্য, একটি দন্ত্য; পিতামাতা ভুল—মাতাপিতা বলিতে হইবে। প্রধানত এই তিন প্রকার—গুরুদাসী, মতভেদী ও কণাধারী সমালোচনা ছাড়া অন্যরূপ সমালোচনা আর প্রায়ই দেখা যায় না।

তাহাতেই বলিতেছি, প্রকৃত সমালোচনা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। যখন বয়স্‌ ছিল, সময়-সুযোগ ছিল, প্রবৃত্তি ছিল, তখন পাপমুখে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি, আমি প্রকৃত সমালোচনা করিবার যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিতাম। একখানি মাসিক, একখানি সাপ্তাহিক—নিজের দুইখানি কাগজ ছিল, সেইজন্য কতকটা প্রথার দায়ে আর মাতৃভাষা স্বর্গাদপি ভালবাসি—সেই মাতৃ-অঙ্কে আবর্জনা না লাগে, এইরূপ একটা দুরাকাঙ্ক্ষার বশে নিরপেক্ষ, নির্ভীক, প্রকৃত সমালোচনা করিবার নিয়মিতরূপে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তে হি নো দিবসা গতাঃ। সে দিন আর নাই। সে

দুরাকাঙ্ক্ষা ত নাই-ই, অধিকন্তু ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে, সমাজে হউক, সাহিত্যে হউক, চরিত্রে হউক, কেবল দোষ-দর্শন অভ্যাস করা একটা মহাপাপ। পাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি, দুর্বল বলিয়া পারি না—কমলী ছোড়্‌তি নেহি।—

আমরা সর্বান্তঃকরণে সাহিত্যাচার্যের এই উক্তি সমর্থন করি—তিনি যে বাঙ্গালার অদ্বিতীয়, 'নিরপেক্ষ, নির্ভীক, প্রকৃত' সমালোচক ছিলেন, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি যে শুধু 'দোষদর্শন' করিতেন, গুণদর্শন করিতেন না বা লেখকের গুণের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতেন না, তাহা ত নহে। দুই ছত্রে সমালোচনা হইলেও তাহার এক ছত্রে লেখার দোষগুণ উভয়ই প্রকাশ পাইত। নির্ভীকভাবে, স্পষ্ট ভাষায় কুলীশ-কঠোর অথচ কান্ত-কোমল, বাহ্যতঃ তীব্রতিক্ত অথচ স্বাদে মধুর সমালোচনায় তিনি যে সিদ্ধহস্ত, সুনিপুণ, সুদক্ষ ছিলেন, ইহা একসময়ে একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিতেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

—আর একজন বলেন, বঙ্কিমবাবু মিষ্ট লঙ্কার আচার; আর বঙ্গদর্শন সেই আচারের হাঁড়ি—খানিক মিষ্ট লাগিবে, খানিক অম্লরসময়; অম্ল শুধু খাইতে ভাল লাগে না, কিন্তু ভাল খাইবার সময় অম্ল না হইলে চলে না। তবে ঝালের ভাগটা যাহার অদৃষ্টে পড়িবে, তাহার হাড়ে হাড়ে ঋ-ঋ করিবে।—

ইহা কি নিজেকে উপলক্ষ করিয়া লেখা নাকি? কেন-না বঙ্কিমচন্দ্র যে চার বৎসর বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন সেই চার বৎসর 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' সাহিত্যাচার্যই করিতেন—বঙ্কিমচন্দ্র শুধু দীর্ঘ সমালোচনা করিতেন।

বঙ্গদর্শনের সমালোচনা-সম্বন্ধে বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন—

'বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রই যেন, আমার মনে হয়, সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ছিলেন। তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আর সকলেই অবসর মত সাহিত্যসেবাকে জীবনের মুখ্য কর্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই জন্য এক সময়ে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রধান সহায় হইয়া উঠেন। সেকালের বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের কোন কোন রচনা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বলিয়া সন্দেহ হইত। গ্রন্থসমালোচনার ভার অনেকটা বোধ হয় অক্ষয়চন্দ্রের উপরেই অর্পিত ছিল। সম্ভবতঃ কোন কোন সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের "ছাপ"ও থাকিত। সেইসব সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে তাঁহাদের মত এমন করিয়া প্রখরে মধুরে মিলাইতে, এমন করুণ-কঠোর কশাঘাত করিতে আর কেহ পারিতেন কিনা, সন্দেহ। "মালঞ্চ-নিবাসিনা মধুসূদন সরকারস্য"কে এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরেও ভুলিতে পারি নাই। আর আমার পরলোকগত বন্ধু আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "হেলেনা কাব্যে"র ভূমিকায় যে অত্যুক্তি ছিল, তাহার প্রতি বঙ্গদর্শন যে তীব্র বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছিলেন,—সে বিদ্রূপের মধ্যে কতবিধ রস উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও মনে আছে। ফলত বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন-প্রচার বন্ধ হইয়া অবধি বাংলা সাহিত্যে সেরূপ সমালোচনার নিপুণতা আর কোথাও দেখিতে পাই নাই।'

মালঞ্চ-নিবাসিনা মধুসূদন সরকারস্য এবং হেলেনা কাব্যের সমালোচনা-সম্বন্ধে আমরা একটি কথা বলিতে চাই। এই দুই বিষয়েই বিপিনচন্দ্র একটু ভুল করিয়া বসিয়াছেন। এই উভয় সমালোচনাই প্রকাশিত হইয়াছিল বঙ্গদর্শনের ষষ্ঠ খণ্ডে (১২৮৫); তখন বঙ্কিমচন্দ্র বা অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গদর্শনে সমালোচনা করিতেন না। তখন সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র। তাছাড়া মধুসূদন সরকারস্য সমালোচনায় বঙ্গদর্শন লিখিয়াছিলেন, "পুস্তকের নাম সুশিক্ষিত চরিত। প্রথম টাইটেল পেজে দেখিলাম—'পাবনান্তর্গত মালঞ্চী নিবাসীনাম্ শ্রীমধুসূদন সরকারস্য প্রণীত প্রকাশিতঞ্চ।...' আমাদিগের পরামর্শ শ্রীমধুসূদন সরকার মহাশয়ং একটু একটুং মধ্যম-নারায়ণ তৈলং সেবনং করিবেনং।"—ইহা ত 'তীব্র বিদ্রূপ-বর্ষণ' নয়,—ইহা প্রবল ছ্যাবলামির বারিপাত। বঙ্কিমচন্দ্র তথা অক্ষয়চন্দ্র সমালোচনা করিতে গিয়া প্রচুর বিদ্রূপ-বর্ষণ করিতেন সত্য, কিন্তু কোথাও কণামাত্র ছ্যাবলামি ছড়ান নাই। রহস্য ও রসিকতা, ভাঁড়ামি ও ছ্যাবলামির পার্থক্য তাঁহারা উভয়েই ভালভাবে জানিতেন।

আর বিপিনচন্দ্র ঐ যে বলিয়াছেন, বঙ্গদর্শনের প্রচার বন্ধ হওয়া অবধি বাংলা সাহিত্যে সেরূপ সমালোচনার নিপুণতা আর কোথাও তিনি দেখেন নাই—এ উক্তিও ভুল। ১২৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন, কিন্তু সাহিত্যাচার্য ১২৮০ হইতে ১৩১৮। '২০ সাল পর্যন্ত সাধারণী, পূর্ণিমা, সাহিত্য, ভারতবর্ষ, নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় বহুতর সমালোচনা লিখিয়াছিলেন—যেগুলি তাঁহার দক্ষ হস্তের 'নিপুণতা'র পরিচায়ক। সম্ভবতঃ বিপিনচন্দ্রের এই সকল পড়িবার সুযোগ হয় নাই।

সাহিত্যাচার্যের সমালোচনায় নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার উদাহরণ দিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবকাল হইতেই সাহিত্যাচার্য তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন। কলিকাতায় বাস করিবার সময় মহর্ষির কাছে যাওয়া-আসা তাঁহার প্রায়ই ঘটিত। রবীন্দ্রনাথ একটু একটু করিয়া যেমন সাহিত্যের উদ্যানে ফুটিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রতি সাহিত্যাচার্যের স্নেহ-ভালবাসাও তেমনই বাড়িতে লাগিল—ক্রমে উহা ভক্তি ও শ্রদ্ধায় গিয়া দাঁড়াইল। এমন কি ১২৯২ সালে নবজীবনে 'সুখের হাট ও সৌন্দর্যের মেলা' প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া সাহিত্যাচার্য রবীন্দ্রনাথের (তখন তাঁহার বয়স্ ২৪ বৎসর) উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

—রবীন্দ্রবাবু তাঁহার আলোচনা নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্তমান। কথাটা বড়ই ঠিক—কিন্তু আরও একটু বাড়াইয়া লওয়া যায়। বিশ্বের প্রত্যেক বিঘাতে বা প্রত্যেক কণাতে শুধু বিশ্ব বর্তমান নয়—স্বয়ং বিশ্বনাথ বর্তমান।—

এই সঙ্গে মনে রাখা ভাল যে, রবীন্দ্রনাথের 'রাজপথ' ও 'ভানুসিংহের জীবনী' নবজীবনেই প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ তথা রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন সময়ে অনেক কিছু লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সবই কবিবরের গুণপনা ও সুখ্যাতিতে ভরা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের বয়স্ যখন মাত্র ২৩ বৎসর, তখনই সাহিত্যাচার্য তাঁহার প্রবন্ধে 'ভাই হাততালি'তে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, 'এ ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে।' এই অমোঘ বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সফলতা লাভ করিয়াছিল তাহা আজ অনেকেই জানেন।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' যখন প্রবাসীতে বাহির হইতেছিল, তখনই সাহিত্যাচার্য লিখিয়াছিলেন—

—গোরা গল্পে মানব-চিন্তার যেরূপ বিশ্লেষণ হইতেছে, সেরূপ বিশ্লেষণ বাঙ্গালা ভাষায় নাই-ই, ইংরাজিতেও অল্প দেখা যায়। ভিক্টর হুগোতে আছে। এইরূপ বিশ্লেষণে রবিবাবু অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতেছেন। এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানব-চিন্তার ব্যবচ্ছেদ করা অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দর্শীর কার্য। কিন্তু এরূপ ব্যবচ্ছেদ দর্শনের অঙ্গ, বোধকরি কাব্যের অঙ্গ নহে। কাব্যানুমোদী চান (synthesis) প্রতিমা, তাহাতে সূক্ষ্ম শিল্প অবশ্যই থাকা চাই, কিন্তু সে সমস্ত শিল্প প্রাপ্তকেন্দ্র হইয়া সংযতভাবে থাকিবে।… এই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া যদি দুইচারিটি প্রতিমা ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে গোরার গল্প সমধিক আদরের সামগ্রী হইবে।—

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল-এর 'এষা'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে সাহিত্যাচার্য বড়াল কবির ও রবীন্দ্রনাথের উভয়ের সদ্যো-বনিতা-বিয়োগ-বিধুর কবিতার অতুল্য তুলনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইবার পর সাহিত্যাচার্য লিখিয়াছিলেন—

—রবিবাবুর কবিতা, এটি-না-হয়-ওটি, সকলকেই কখনও-না-কখনও মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার সম্মান করিতে তাঁহার দেশবাসী পরাঙ্মুখ হয় নাই—স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র নিজ গলদেশে গ্রহণ না করিয়া কুসুমমালারূপিণী যশের মালা রবিবাবুর গলদেশে দিয়াছিলেন; প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনে রবিবাবুই সভাপতি হন; সাহিত্য-পরিষৎ এবং এই টাউনহলের সভা তাঁহার উপযুক্ত সংবর্ধনা করিয়াছে। স্বয়ং লাটসাহেব তাঁহাকে ভারতের তথা এশিয়ার রাজকবি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার একটি ক্ষুদ্র কবিতাকণা 'গীতাঞ্জলি' যাই বিলাতি বাটখারার ওজনে চড়িয়া আপনার গৌরব কাঞ্চন-মুদ্রায় স্থির করিল অমনই মহা শোরগোল পড়িয়া গেল।… কিন্তু বাস্তবিক মনীষিমাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন, রবিবাবু বেশি সার্থকও হন নাই,

তাঁহার সর্বনাশও হয় নাই। তিনি আমাদের যে রবিবাবু, সেই রবিবাবুই আছেন; তাঁহার 'নৈবেদ্য' প্রকৃতই নৈবেদ্য; তাহার ভিত্তি পৃথিবী 'পরে হইলেও কাঞ্চনশৃঙ্গের মত উজ্জ্বল শুভ্র কান্তি লইয়া সেই কাব্য নিয়তই রাজরাজেশ্বরের স্বর্গস্থ সিংহাসনাভিমুখে উন্নীত হইয়া আছে। তাঁহার গীতাঞ্জলি পরম পিতার পূজার উপকরণ, সাধকের সাধনার সামগ্রী, ধাতুচক্রে তাহার গৌরব বাড়াইতে-কমাইতে পারিবে না। যাহারা গিনি গণনা করিয়া সকল বিষয়েরই গৌরব অবধারণ করে, তাহারা যে-ভাবে বুঝিয়াছে সেই ভাবেই বুঝুক, আমরা কেন বিশুদ্ধ সাহিত্যের শুভ্র যশের পরিমাণ ঐ ভাবে করিব?—

রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য-সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

—রবিবাবুর নৈবেদ্য আমি মাথায় করিয়া লইয়া দেবী সরস্বতীর পাদপীঠ-সম্মুখে নৃত্য করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি।—

তিনি আরও লিখিয়াছেন—

—কবি যেমন আর একজন কবিকে আয়ত্ত করেন, আমরা তেমন কখন পারি না। কবি গেটে শকুন্তলার সৌন্দর্য দশ পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ করেন, কিন্তু আর একজন কবি রবীন্দ্রনাথ সেই কয় পঙ্‌ক্তি বুঝাইয়া দিলে, তবে আমরা সেই সমালোচনা সম্যক্ বুঝিতে পারি। ভিক্টর হুগো বুঝাইলে তবে সেক্সপিয়ার বুঝা গেল। রবীন্দ্রনাথ বুঝাইলে, তবে কুমার-শকুন্তলা বুঝিতে পারিলাম।—

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'-সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন কটূক্তি করিলেন—'ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমাছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধহয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।'—তখন সাহিত্যাচার্যের প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছিল—

—শেষের 'দগ্ধ করা' কথাটি ছাড়া আর সকল কথাই আমার শিরোধার্য।··· তবে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, 'রবিবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে।' তাহাই যদি হয়, সে কবিতা সদোষ হইল বটে, কিন্তু একেবারে দগ্ধ করিবার উপযুক্ত কি?—

অথচ সাহিত্যাচার্যই লিখিয়াছেন—

—'অচলায়তন'-এর আসল জিনিস পঞ্চকের গানগুলি। ···বাস্তবিক পঞ্চককে বালক রবীন্দ্রনাথ বলিয়া মনে হয়। ···আসল কথা পঞ্চকের গানগুলি যেমন সুন্দর প্রাণস্পর্শী হইয়াছে, পাত্রগণের কথাবার্তা তেমনই নীরস, একঘেয়ে, ছড়ানো—কোনরূপ কাব্যের অনুপযুক্ত হইয়াছে।··· অচলায়তনে আছে কেবল একরূপ বিকৃত হিন্দুয়ানির উপর নপুংসকের নৃত্য ও লাঞ্ছনা। গানগুলি ছাড়া সমস্ত পুস্তকখানি রবিবাবুর একেবারে অনুপযুক্ত।—

এইবার অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফোয়ারা'র সমালোচনা-বিভ্রাটের কথা উল্লেখ করিতেছি। সকল দিক্ হইতে দেখিলে, সকল রকমে এই সমালোচনা অক্ষয়চন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি। লেখকের গুণাবলি প্রদর্শন করা, দোষ উদ্ঘাটন করা, এবং লেখার ভালমন্দ বিচার করাই-না সমালোচকের প্রধান কর্তব্য? আর সর্বোপরি সমালোচকের ভাষাটি হইবে মার্জিত, সুরুচি-সম্পন্ন, সহজ, সরল, ঝরঝরে— যে ভাষা পড়িবামাত্র সমালোচকের উদ্দেশ্য পাঠক ও গ্রন্থকারের মনে স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়। আর ভাষায় ফুটিয়া উঠিবে না সমালোচকের কটূক্তি, মন্দভাষণ, ক্রোধান্ধতার লক্ষণ এবং ছ্যাবলামি, ইয়ারকি, ভাঁড়ামি বা ন্যাকামি। তবেই সমালোচনার যদি কিছু কাজ হয়। কিন্তু উচিত কথা শুনিতে, খাঁটি কথায় কাণ দিতে, যথার্থ উক্তি পরিপাক করিতে কয়জন পারেন? নিজের দোষ চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলে, সুপরামর্শ দিলে, সদুপদেশ দিলে কয়জন অন্ততঃ মনে মনে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া উপদেষ্টার ওপর দ্বেষ না করিয়া কৃতজ্ঞ হইতে পারেন?

কিন্তু এই অনুপম, আদর্শ সমালোচনার বিপরীত ফল হইল—ইহার অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব না বুঝিয়া বা ভুল বুঝিয়া বা আত্মম্ভরিতা ও অহমিকার আধিক্যে অধ্যাপক মহাশয় প্রবীণ সমালোচকে কটূক্তি করিতে তথা বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই সুদীর্ঘ সমালোচনার শেষের দিকে সাহিত্যাচার্য লিখিয়াছিলেন—

—ললিতবাবুর জীবনে যথেষ্ট রস আছে, কিন্তু সে রসের পরিপাক এখনও হয় নাই। রসে বড় বেশি তরলতা

আছে; কাজেই চাঞ্চল্য আছে, চাপল্য আছে। এই তরলতা আছে বলিয়া অনেক সময় তাঁহার রচনায় কেন্দ্র স্থির থাকে না। ··· ললিতবাবুর মত শিক্ষিত লোককে উপদেশ দিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমার নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, ভালবাসার সঙ্গে আশঙ্কা যদি না আসিত ত আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতাম না।···

ভাষা একটা অঙ্গচ্ছদ, তবে শম্বুকের শঙ্খের মত। শঙ্খ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে শম্বুকও নষ্টপ্রাণ হয়। তবে অঙ্গচ্ছদের আবার অঙ্গচ্ছদ লইয়া ললিতবাবু বড় খুঁটিনাটি করেন। ফোয়ারার মধ্যেও সেইরূপ আছে; সেগুলিতে হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। এই খুঁটিনাটি থাকিলে এবং টেনেবুনে রঙ্গরস লিখিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিব, এ ভাবটি মন হইতে ললিতবাবু দূর করিতে পারিলে এবং বন্ধনীর মায়া কাটাইতে পারিলে ললিতবাবু একজন ভাল লেখক হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস তিনি পণ্ডিত লোক, লেখাপড়া জানেন; আমার বিশ্বাস তাঁহার প্রাণ আছে; আমার বিশ্বাস ছন্দের পারিপাট্যসাধনে তিনি সুপারগ; আমার বিশ্বাস অনেকের অপেক্ষা তিনি দেশের অবস্থা বা দুরবস্থা ভালরূপ জানেন; আমার বিশ্বাস তিনি কাঁদিতে জানেন—তবে তিনি সুপথে যাইতে শিখিলে ভাল হইবেন না কেন?—

আর যায় কোথায়! সাপের লেজে পা পড়িয়াছে। ললিতবাবু এই সব উপদেশ সহ্য করিতে পারিলেন না, ফোঁস করিয়া ফণা তুলিয়া ছোবল মারিলেন। তাঁহার মনে হইল তবে কি তিনি তখন পর্যন্ত কুপথে চলিয়াছেন? প্রবীণ সমালোচকের 'ভাই হাততালি'র লেখকের এ কি বিসদৃশ ব্যবহার! এ-যে হাততালির পরিবর্তে, বাহবার বদলে তাঁহাকে নিরুৎসাহ করা। তাই তাঁহার 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' যখন পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল তখন তাহাতে বিষোদ্গার করিয়া তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।—

'কেহ-বা বৃদ্ধ বয়সে ধর্মের "সনাতনী পন্থা"র সন্ধানে আছেন (বিস্পষ্ট বিসর্গ পন্থার "আ"-কার দেখিয়া অবিদ্যার ঘোরে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় পুংলিঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গ-জ্ঞান ঘটিয়াছে), "আকারান্ত মেয়েলিঙ্গ!" ধরিয়া "আত্মা-দেবী"র স্তুতি করিতেছেন'; ইত্যাদি অনেক কিছু বিষ-বিদ্রূপবাণ সাহিত্যাচার্যের ওপর বর্ষিত হইয়াছিল। পাঠক, লক্ষ্য করিলেন কি ললিতবাবুর 'সেই বন্ধনীর মায়া'? আমাদের একান্ত অনুরোধ, পাঠক যেন এই সুদীর্ঘ, সাধু, সমীচীন সমালোচনার শিরোনামা—'ললিতবাবু ও বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন, করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, কেন অনেকের ধ্রুব ধারণা যে সাহিত্যাচার্য ছিলেন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সমালোচক; 'কবি হেমচন্দ্র', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', 'জয়দেব' প্রভৃতি লেখা তাঁহার সমালোচন-নিপুণতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে সব সময় তাঁহার সমালোচনায় চিনির শক্ত কোটিং থাকিত না,—নির্মোকমুক্ত কটু, তিক্ত, কষায় রস মিষ্টমধুর রসের মিশ্রণও জ্বলজ্বল করিয়া ফুটিয়া বাহির হইত।

অশ্লীলতার উপর খড়্গহস্তত্ব

সাহিত্যাচার্য অশ্লীলতার ওপর খড়্গহস্ত ছিলেন। ঘুণাক্ষরে অশ্লীলতা দেখিতে পাইলে অথবা উহার অল্প একটু আঘ্রাণ পাইলে, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিতেন। লিখিতেছেন 'দশমহাবিদ্যা' প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনের জন্য; সংস্কৃত ধ্যান হইতে এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' হইতে অনেক স্থল তাঁহাকে উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। তিনি লিখিতেছিলেন, 'ষষ্ঠী দশায় তন্ত্র-প্লাবন। ছিন্নমস্তামূর্তি। স্বার্থপরতা ও স্বার্থশূন্যতা উভয় যোগ-নিষ্পন্না কঠোর বাতুলতা, নৃশংসতা, শোণিত-স্পৃহা, কুৎসিত কাম-প্রবৃত্তি, নির্লজ্জতা—এইগুলি এ মূর্তির সমবায়ী কারণ। ইহার সংস্কৃত ধ্যান সংস্কৃতই থাকুক।'—বলিয়াই জবাকুসুম-সঙ্কাশং রক্তবন্ধুক-সন্নিভং—ধ্যানের এই প্রথম ছত্র উদ্ধৃত করিয়াই, আর দ্বিতীয় ছত্র উদ্ধৃত করিলেন না, '···' বিন্দু বসাইয়া বাদ দিয়া গেলেন।

*

'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে সাহিত্যাচার্য লিখিয়াছেন—

—আমি সামান্য ব্যক্তি, এখনও 'জলজীবন্ত' রহিয়াছি,

আমার সম্বন্ধেও বিস্তর মিথ্যাকথা শুনিতে পাই। তাহাতে আবার আমার পিতৃদেবকে লইয়া টানাটানি করা হয়। গোপাল উড়ের টপ্পার পরিশিষ্টে লিখিত আছে…'এক সময়ে উমেশ-ভুলোর মধ্যে মনোবাদ ঘটিয়াছিল; ফলে গোপাল উড়ের যাত্রার দুইটি দল হইল। শুনা যায়, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চুঁচুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা বিখ্যাতনামা ৺গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের নিজ বাড়ীতে এই উভয় দলের বায়না করিয়া এ বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন।'—সর্বৈব মিথ্যা। এ মিথ্যায় আবার একটু ক্ষতি আছে। আমাদের বাড়ীতে তৎকাল-প্রসিদ্ধ সমস্ত যাত্রার দলের গাহনা হইয়াছিল, অথচ পিতৃদেব কখন গোপাল উড়ের গান বাড়ীতে দেন নাই। কেন দেন নাই, অনেকে বুঝিতে পারিবেন। তবে আবার তিনি বিবাদ মিটাইবার জন্য সেই দলের বায়না করিবেন কেন?—

'কেন দেন নাই' কথাটি লক্ষণীয়—বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতার উল্লেখ না করিয়া শুধু ইঙ্গিত মাত্র।

*

'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী' নামক প্রহসন সমালোচনা করিতে গিয়া সাহিত্যাচার্য লিখিলেন—

—প্রথম অঙ্কে দেখিলাম যে কলিকাতার কোন বিখ্যাত ভদ্র বংশের গ্লানি আছে। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখিলাম, বেশ্যালয়ে মদ্যপানের বর্ণনা। আর আমরা পড়িলাম না। বোধকরি কেহই অতদূর পড়িবেন না। কতদিনে এই সকল ঘৃণিত পুস্তক-প্রণয়ন রহিত হইবে?—

সাহিত্যাচার্য সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন', ৩য় ভাগ। সুদীর্ঘ সমালোচনা—শতমুখে প্রশংসা। তিনি লিখিতেছেন—

—প্রাসঙ্গিক ভাল কথা গ্রন্থে বিস্তর আছে, মন্দ কথাও আছে। কবি অবাধ লেখনীতে লিখিতে গিয়া কোন কোন স্থলে আপনাকে বেয়াড়া বয়াটে বানাইয়াছেন। কেবল ইয়ারকি হইলে আমরা কথা কহিতাম না, কিন্তু এক-আধ স্থলে নিতান্ত ব্যলীকতা আছে। তৃতীয় ভাগে ৫০০ পৃষ্ঠার পর একটি গল্প আছে। হীরেন্দ্রবাবু* সমস্ত গ্রন্থের প্রুফ দেখিয়াছেন, তিনি একজন সমীচীন ব্যক্তি; এই দুই-এক পৃষ্ঠা বাদ দিলেই ভাল করিতেন।—

লক্ষ্য করিতে হইবে এখানে 'ব্যলীকতা' শব্দটি, অশ্লীলতা-পরিহারের কি অপূর্ব উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে এই দারুণ দাঁতভাঙ্গা শব্দটিকে বাছিয়া বাছিয়া প্রয়োগ করিয়া। 'বেয়াড়া বয়াটে' শব্দদ্বয়ের আশ্রয় লওয়া হইয়া গিয়াছে, কাজেই এখন আর সাধারণতঃ অপ্রচলিত খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার না করিলে অশ্লীলতা এড়াইবার উপায় ছিল না।

*

—রসকাদম্বিনী অর্থাৎ সংস্কৃত অমরু শতক কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ।

সংস্কৃত অমরু শতক কাব্য আদিরসপ্রধান। প্রকৃত আদিরস জগতের একটি দুর্লভ পদার্থ। ইহা পবিত্র, বিশুদ্ধ, অমূল্য। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এই আদিরস চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইংরাজিতে নানা স্থানে চমৎকার আদিরস পাওয়া যায়। অন্ধ কবি মিল্‌টন যখন ইদন উদ্যান-মধ্যে প্রথম নবদম্পতীকে সৃষ্টি করিয়া মনোহর গন্ধবাহী প্রভাত-কালে তাহাদিগের দৃশ্য উন্মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাতে কি অপূর্ব আদিরস সংঘটিত হইয়াছে।… এই চিত্র সর্বাধিক মনোহর, ইহা অতুল্য—অমূল্য। সেইজন্য আদিরসের প্রধানত্ব।

কিন্তু এই আদিরসের বিকৃতি আছে—পৈশাচিকী বিকৃতি আছে। একটি সামান্য কথায় বলে যে, মন্দ দ্রব্য কোনরূপে সেবন করা যায়, কিন্তু ভাল দ্রব্য মন্দ হইলে তাহা একেবারে অসহ্য হয়। ঘোল খাওয়া যায়, কিন্তু দুধ ছিঁড়িয়া গেলে তাহা আর কাহার সাধ্য যে গলাধঃকরণ করে।… অমরু শতকের অনেকগুলি শ্লোক নিতান্ত … মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, অমরু শতক অশ্লীলতা-দোষে দূষিত—এমন কি ইহার মঙ্গলাচরণ-সূচক প্রথম শ্লোকটিই কিঞ্চিৎ অশ্লীল। সেই অশ্লীল ছত্রটি পরিবর্তন

* গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর আমার জীবন মুদ্রিত হইয়াছিল; প্রসিদ্ধ দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমার জীবন সম্পাদন করিয়াছিলেন।

করিয়া বঙ্গদর্শন-পাঠককে (পাঠিকাকে নয়) আশীর্বাদছলে সেই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম।

[এখানে 'পাঠিকাকে নয়' কথাটি প্রণিধানযোগ্য।]

এই অলকগুলি ললাটে পড়িছে ঝুলি,
মণিময় কাণবালা দোলে ঝল্‌মলে,
বিন্দু বিন্দু ঘর্মজল ফুটে যেন মুক্তাফল
তিলক পুঁছিয়া যায় সেই ঘর্মজলে।
ছলছল মিটিমিটি সেই কামিনীর দিঠি,
অলস আবেশে আর শ্রম প্রেমভরেতে
মুখখানি হোক তারি তোমার মঙ্গলকারী
কি কাজ কেশব শিব ব্রহ্মাদি দেবেতে ?

*

সাহিত্যাচার্য অন্যত্র লিখিয়াছেন—

—আর কাব্য-নাটক-নভেল যদি ভাল না হয়, তাহাতে মশ্‌লা বাঁধিতেও নাই ; কেন-না মশ্‌লার সঙ্গে অন্তঃপুরে উঠিয়া সেই পবিত্র ক্ষেত্রে পূতিগন্ধ বিস্তার করিবে।—

*

উড়িষ্যার চিত্র, সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা যতীন্দ্রমোহন সিংহ-প্রণীত 'ধ্রুবতারা'র প্রথম সংস্করণের দীর্ঘ সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রবন্ধ-শেষে সাহিত্যাচার্য লিখিতেছেন—

—স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী দেখার খাতিরে আমরা বনজঙ্গল বেড়াইতে স্বীকার, কিন্তু মিস্টার চকারভর্তির ঝোড় নূতন সংস্করণে যেন একেবারে কাটিয়া ছাঁটিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ। চকারভর্তি একটা কিম্ভূতকিমাকার বীভৎস পাপিষ্ঠ, কাব্যজগতের পয়োনালীতেও উহার স্থান হইতে পারে না। সমাজে যাহা আছে তাহার সমস্ত কি তবে লিখিতে হইবে ? নিশ্চয়ই না। শ্মশানের চিত্র দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু পুরীষের চিত্র হয় কি ? তা হয় না। বাস্তবিক চকারভর্তি এই পুস্তকের কলঙ্ক—এ কলঙ্ক যতীনবাবু এবার যেন মুছিয়া ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবতী যায় যাউক, তাহাতেও গ্রন্থের ক্ষতি হইবে না।...

গ্রন্থকার গুণী, তাঁহার রচনায় সহস্র গুণপনা আছে ; তবে কেন কতকগুলা আবর্জনায় এ হেন অপূর্ব গ্রন্থ মলিন হইয়া থাকিবে ? সেইজন্য আবার বলি, পাপের চিত্র কমাইয়া দাও, পুণ্যের চিত্র জলন্ত হইয়া উঠুক ; পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীর কলগান আমরা সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়া মনঃপ্রাণ আরও জুড়াইতে থাকি।—

যতীন্দ্রমোহনের জীবদ্দশায় ধ্রুবতারার ১০।১২টি সংস্করণ হয়, কিন্তু সাহিত্যাচার্যের এই যথার্থ অনুরোধ বরাবরই উপেক্ষিত হইয়াছিল ; অথচ যতীন্দ্রমোহন ৪. ৪. ১৩১৪ তারিখে চুয়াডাঙ্গা হইতে সাহিত্যাচার্যকে লিখিয়াছিলেন—

'... এই পুস্তকে (ধ্রুবতারা) যে সকল দোষ দেখেন, তাহা আমাকে সরলভাবে জানাইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। আপনার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী ও বহুদর্শী সমালোচকের নিকট আমার অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। এখন আমার লেখার দোষ জানিতে পারিলে আমি ভবিষ্যতে সাবধান হইতে পারিব।...'

শিক্ষা ও সাধনায়

এইবার আমরা সাহিত্যাচার্যের শিক্ষা ও সাধনার বিষয় আলোচনা করিব। তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ পর্যন্ত 'উলা'য় কাটিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার বাঙ্গালা শিক্ষা খুব ভাল ভাবেই হয়। পিতাপুত্রে তিনি এই বাল্যশিক্ষা-সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখিয়াছেন ; এমন কি যে সকল পুস্তক ও পত্রিকা তিনি পড়িয়াছিলেন, সেগুলির প্রত্যেকখানির পরিচয়ও দিয়াছেন।

তিনি তৎকালে যে সকল বই পড়িয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে যে সকল পুস্তকে যে সব দুরূহ শব্দ থাকিত সেইগুলি একখানি খাতায় একদিকে লিখিতেন এবং তাহাদের প্রত্যেকটির শব্দার্থ পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া তাহার পার্শ্বে লিখিয়া রাখিতেন। এমনি করিয়া কয়েকখানি খাতা হইয়াছিল এবং সেইগুলি একত্র হইয়া 'শব্দসাগর' নাম পাইয়াছিল। মূল শব্দসাগরখানি সরকার বাড়ীতে আছে ; ইহার 'ভূমিকা'-পৃষ্ঠার প্রতিলিপি সাহিত্যসম্ভারের প্রারম্ভে মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্যাচার্য পিতাপুত্রে আরও লিখিয়াছেন—

—বাঙ্গালা লেখাপড়ায় আমার প্রবৃত্তি, পন্থানুসরণ, শিক্ষায় সাহায্য, ভ্রমে সংশোধন প্রধানত তাঁহা (পিতৃদেব) হইতেই। ··· হাস্যে ও গাম্ভীর্যে আমার শিক্ষালাভ। বাল্যকালে কর্তব্যের কঠোরতায় বা শিক্ষকের তাড়নায় ভয়ে ভয়ে দায়গ্রস্ত হইয়া আমাকে শিক্ষালাভ করিতে হয় নাই।—

সাহিত্যাচার্যের পিতার প্রত্যহ বহুতর কাজ থাকিলেও পুত্রকে শিক্ষাদান তিনি তাঁহার সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কাছারীর সময় ছাড়া দিবারাত্র তিনি পিতার সঙ্গে থাকিতেন, উভয়ে একত্র স্নান, আহার, শয়ন করিতেন। 'তাঁহার সেই সন্ধ্যার সরগরম মজলিসের আমি বিনীত অথচ নিয়ত শিশুসভ্য ছিলাম।' সাহিত্যাচার্যের আচার-ব্যবহার শিক্ষার প্রধান উপকরণও তাঁহার পিতৃদেব। এই সকল শিক্ষা—চরিত্রগঠন যেমন দৃষ্টান্তে হয় এমন আর কিছুতেই নয়। তাই বাল্যকাল হইতেই পিতার দৃষ্টান্তে তিনি সরল, মিষ্টভাষী, মিতাচারী হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

অতি শৈশব হইতেই গান-বাজনা, ক্রিয়াকর্ম, পূজার্চনা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি দেখিয়া-শুনিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিবার ও শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ ও সুবিধা উলায় থাকার সময় হইতেই সাহিত্যাচার্যের যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছিল। তখন উলায় বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় অতিশয় ক্রিয়াবান্ পুরুষ বাঙ্গালায় কম দেখা যাইত। বারমাসে সত্যই তের পার্বণ হইত এবং নিত্য নিয়মিত অতিথিশালাও ছিল। স্নানযাত্রা, রথ ও জগদ্ধাত্রী পূজায় মহাধূমধাম হইত। তখন উলায় উত্তম গায়ক, পাখোয়াজী, ঢুলী, সানাইদার, ভাল চিত্রকর, ঠাকুরগড়া কুমার ছিল। সুতরাং বুঝিতে পারা গেল, সুকুমার কলাশিল্পের পরিচয় পাইয়া বালক অক্ষয়চন্দ্র আনন্দের সহিত প্রচুর শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তারপর চুঁচুড়ায় বাসকালে—কিশোর ও যৌবনকালে—যাত্রাগান, পাঁচালি-হাফ্‌আকড়াই প্রভৃতি শুনিবার ও উপভোগ করিবার তিনি যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন।

সাহিত্যাচার্য লিখিয়াছেন—

—পূজাপার্বণে চুঁচুড়ার উৎসব নগরে ধরিত না। সুরধুনী-তীরে লোকে লোকারণ্য হইত। গঙ্গাবক্ষে শতশত তরণী সুসজ্জিত আরোহী অঙ্কে লইয়া বাচ খেলিয়া বেড়াইত। কার্তিক পূজার বিসর্জনের দিন, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত 'ভোলানাথ', 'ভোলানাথ' ধ্বনিতে চুঁচুড়া আনন্দ বিঘোষিত করিত। গাজনের সময় ৺ ষণ্ডেশ্বরতলা পিত্তলময়ী* ঢক্কার নিনাদে গোরাবারিকের জয়ঢাককে ধিক্কার দিত।—

এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল, তখন এণ্ট্রান্স, এল. এ. ও বি. এ. পরীক্ষার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্য রীতিমত অধীত হইত এবং বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক পরীক্ষা গৃহীত হইত। স্কুলে বা কলেজে সংস্কৃত পড়ানো হইত না। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম এম. এ. নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি পরে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী এবং শেষে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস্-চেয়ারম্যান হন, তিনিই হুগলী মহ্সীন কলেজে সাহিত্যাচার্যের বাঙ্গালার অধ্যাপক ছিলেন। সাহিত্যাচার্য হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণির নিকটে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এল. এ. পরীক্ষা দিয়া তিনি তাঁহার পিতার কাছে 'আরা'য় ছিলেন এবং পরে আরও দুইবার ছুটিতে আরা গিয়াছিলেন। সেখানে পিতার কাছারীর সেরেস্তাদারকে তিনি বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা পড়াইতেন আর সেরেস্তাদার মহাশয় তাঁহাকে উর্দু অক্ষরে মুদ্রিত 'চাহার দরবেশ' পড়াইতেন। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সাহিত্যাচার্যের লেখার মধ্যে আরবী, পারসী, উর্দু প্রভৃতি শব্দ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভিন্ন অন্য কোন লেখকের লেখায় এইসব বিদেশী শব্দের এত প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। নিম্নে কয়েকটি শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল।

দোরস্ত, আহেলে-মামলা, দৌলত্-দৎপত্, জান্, মাত্, খোদা, আরজ, ফতোয়া, পেশ, মস্‌গুল, দস্তুর-মোতাবেক, মুলাকাত, ফুরসৎ, নেহি, মুস্কিল, আসান, নকিব, এত্তালা, কস্‌রৎ প্রভৃতি।

---

* ডাচ গভর্নর-দত্ত সুবৃহৎ ঢাক, যাহা মাটিতে বসাইয়া এখনও বাজানো হইয়া থাকে। যে সুদীর্ঘ বাড়ীতে এখন কাছারি, জজ সাহেবের কোয়ার্টার্স প্রভৃতি অবস্থিত, তখন সেই বাড়ী গোরা ব্যারাক ছিল।

অতি বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যাচার্য তাঁহার পিতার নিকট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বুঝিতে এবং বুঝিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। খুব ছোট বেলায় ঘোর ঝঞ্চার সহিত বজ্রস্ফোট হইলে তাঁহার বুক ধড়্ফড় করিত, কিন্তু সেই বুকের ভিতর তবু তিনি একরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেন। পিতার নিকট শুনিতেন, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র-তারকা—সকলই মহাশৃঙ্খলায় আবদ্ধ ও নিয়োজিত—আকাশের সৌন্দর্য বুঝিতেন, শৃঙ্খলা মানিয়া লইতেন।

তিনি লিখিতেছেন—

—পিতা দেখাইতেন, দুঃখের অপেক্ষা সুখ অনেক গুণ বেশি। কথাটি বেশ করিয়া আপনার ভূয়োদর্শনে মিলাইয়া বুঝিয়া লইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, জগৎ সুন্দর, সুশৃঙ্খল; পরে বুঝিয়াছিলাম, ভগবান্ মঙ্গলময়।—

জগৎ সুন্দর, সুশৃঙ্খলাপূর্ণ; জগতে দুঃখের অপেক্ষা সুখের মাত্রা অনেক পরিমাণে অধিক,—এইসব কথা তিনি তাঁহার রচনার বহু বহু স্থলে লিখিয়া গিয়াছেন।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—

—যখন মানুষ শান্তির অন্বেষণ করে, তখন দৈবক্রমেই হউক আর যেরূপেই হউক, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা-লাভ করিলে তাহার শান্তি হয়। আসল কথা, সুখ দৌড়ঝাঁপে নহে, রাজনীতিতে নহে, ভারত-উদ্ধারে নহে, সুখ—পারিবারিক শান্তিতে। এ কথা বাঙ্গালার অতি প্রাচীন কথা। বাঙ্গালার মজ্জাগত কথা। বাঙ্গালি কিছুকাল পূর্বেও এই কথা বুঝিত বলিয়া বাঙ্গালি পারিবারিক অধিষ্ঠানের যেরূপ সুশ্রীকতার সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছিল, এমন কেহ কখন পারে নাই। অতি সামান্য আয়ে বাঙ্গালি দেবতা-অতিথির সেবা করিয়া, গৃহপ্রাঙ্গণ সুপরিষ্কৃত রাখিয়া, দেহে স্বাস্থ্য, মনে স্ফূর্তি পরিপোষণ করিয়া, কিছুকাল পূর্বেও অতি স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছে। এইটিই বাঙ্গালির গৌরব ছিল।—

ধর্মকর্ম ও আচারবিচারে

এইবার সাহিত্যাচার্যের ধর্মকর্ম, আচারবিচার প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইবে। বলা বাহুল্য, এই সকল বিষয়ে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতামতের সহিত তাঁহার মতামত প্রায়ই মিলিবে না। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই সব বিষয়ে বাঙ্গালীর সবকিছু বদলাইয়া গিয়াছে; সময়ে সকল বিষয়ের পরিবর্তন হয়—স্বীকার্য; কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ আশ্চর্যজনক। তাই এইসব বিষয় আলোচিত না হইলে আমরা সাহিত্যাচার্যের লেখার গূঢ় মর্ম বুঝিয়া উঠিতে পারিব না।

সাহিত্যাচার্য ছিলেন খাঁটি হিন্দু—পরম বৈষ্ণব। পরম বৈষ্ণব বলিতেছি কেন, না আধুনিক টিকি-তিলক-কণ্ঠিধারী, মৎস্যভোজী, শ্মশ্রুগুম্ফমুণ্ডিত তথাকথিত বৈষ্ণব তিনি ছিলেন না। তাঁহার মাথায় শিখা ছিল বটে, কিন্তু তিনি তিলক-কণ্ঠি ধারণ করিতেন না, মাছ খাইতেন না। তাঁহার মুখমণ্ডলে শ্মশ্রুগুম্ফ শোভা পাইত। 'বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম-সম্বন্ধে তিনি যে ধর্মমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই মত তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন এবং আজীবন পালন করিয়া গিয়াছেন।

বৈষ্ণবের প্রধান সাধন প্রেমভক্তি। বৈষ্ণবের মতে ভগবানে প্রেমভক্তিই সদ্গতির প্রধান উপায়। বৈষ্ণব বলেন—যিনি যেমন বুঝেন, তাঁহার সেইভাবেই সাধনা করা উচিত, কিন্তু আমি বুঝি ঈশ্বর আনন্দময়, প্রেমময় নায়ক। নায়কে নায়িকার যেরূপ প্রেমভক্তি, ঈশ্বরে সেইরূপ ঐকান্তিকী প্রেমভক্তিই সদ্গতির প্রধান সাধক। শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম—তিনেতেই একটি পাল্‌টি-প্রকৃতি ভাব আছে, অথচ বিনিময়ের ভাব নাই। শ্রদ্ধাভক্তিতে স্নেহ মিলে প্রেমে প্রেম পাওয়া যায়, ইহাই পাল্‌টি-প্রকৃতি ভাব। পাল্‌টি-প্রকৃতি ভাব থাকিলেই সাম্যভাব আসিয়া পড়ে। এই পাল্‌টি ভাব ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকার মত সেব্য ও দাস্য ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করাই বৈষ্ণবের একান্ত ধর্ম, মুখ্য কর্ম, আন্তরিক বিশ্বাস।

সাহিত্যাচার্য লিখিতেছেন—

—এই অসংখ্য সূর্যচন্দ্র-পরিব্যাপ্ত বিশ্বমণ্ডল যাঁহার আনন্দের উপাদান ··· তিনি যে তোমাতেই তাঁহার প্রেম সীমাবদ্ধ করিবেন, এ তোমার কেমন আব্দার? তবে হৃদয়ে যদি বাস্তবিকই ভক্তি থাকে, এতটুকু আব্দার করিতে

পারি বটে যে তুমি অনন্ত হইয়াও সর্বদৃক্‌, আমি ক্ষুদ্র হইয়াও যেন তোমার চরণে শরণ পাই।

এই জন্য রাধিকা বলিয়াছেন,

ভুল না, ভুল না, নাথ!
মিনতি করি আমি হে!
অন্যেরও অনেক আছে,
আমার কেবল তুমি হে!
তোমারও অনেকও আছে,
আমার কেবল তুমি হে!

এই সামান্য কয়টি কথায় প্রেমভক্তির কেমন মনোহর উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের কেমন সুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।—

ভক্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ রাধিকা। কিন্তু বাঙ্গালী বৈষ্ণবের একজন ঐতিহাসিক আদর্শ আছেন। তাঁহার জন্মভূমি ভারতের মধ্যে বাঙ্গালা প্রসিদ্ধ ভক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ। তিনি ভক্তির ঐতিহাসিক অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। স্বয়ং ভগবানের ভক্তরূপে অবতারের কথা অতি বিচিত্র। সাহিত্যাচার্যের ইচ্ছা ছিল এই বিচিত্র পবিত্র কথা বিস্তারিতভাবে বুঝাইবার, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। অজরচন্দ্র কৃষ্ণনগর যাইবেন (১৯০৭) শুনিয়া সাহিত্যাচার্য তাঁহাকে পত্রে লিখিয়াছিলেন—

—...ওখান হইতে ৺নবদ্বীপও দেখিয়া আসিতে পারিবে। শাক্তদিগের পোড়া-মা-তলা আর বৈষ্ণবের মহাতীর্থ পুরনো কুঞ্জ বা পুরনো আখড়া—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াজির প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ।—

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাহিত্যাচার্য পিতার নিকট হইতে বুঝিয়াছিলেন, জগৎ সুন্দর, সুশৃঙ্খল; ইহা হইতে পরে বুঝিয়াছিলেন, ভগবান্ মঙ্গলময়। এইরূপেই তাঁহার হৃদয়ে বৈষ্ণব ধর্মের বীজ উপ্ত হয়; দশবৎসর বয়সে উলা হইতে চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিয়া স্কুলে পড়িবার সময়েই বৈষ্ণব সাহিত্য এবং সংকীর্তনের দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়। তাঁহাদের বৈঠকখানায় গুরুদাস বাওয়াজি কীর্তন করিতেন, তিনি একমনে হাঁ করিয়া শুনিতেন; আর যেদিন গোষ্ঠ গান হইত সেদিন তিনি বড়ই আনন্দিত হইতেন। এই সময়ে বৈষ্ণব সাহিত্য-সম্বন্ধে তাঁহার আর একরূপ শিক্ষা হইতে লাগিল। প্রতিবাসী বর্ষীয়ান্ জগমোহন নিয়োগী মহাশয় প্রত্যহই অপরাহ্নে দুইপাঁচজন প্রতিবাসী লইয়া চৈতন্যচরিতামৃত নিজে পাঠ করিতেন, কখন-বা শুনিতেন। বালক অক্ষয়চন্দ্র জগমোহন ঠাকুরদাদার পার্শ্বে বসিয়া বিভোর হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত পান করিতেন। পরে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'-এ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কর্তৃক উদ্ধৃত একটি মাত্র পদপাঠে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। ইষ্টমন্ত্র যেমন প্রকাশ করা নিষেধ, সেইরূপ এই পদটি যে কি, তাহা তিনি কখনও প্রকাশ করেন নাই। তাহার পর বহরমপুরে গোটা গোটা অক্ষরে হাতের লেখায় একখানি 'পদকল্পতরু' এবং বিদ্যাপতির পদাবলী পড়িয়া এই অঙ্কুর বর্ধিত হয় এবং তিনি প্রচুর আনন্দ পান। আর এই আনন্দের ফলস্বরূপ 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ'-এর প্রথম প্রকাশ এবং বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্মের উপরে একটি ও জয়দেবের উপর দুইটি প্রবন্ধ-রচনা।

সাহিত্যাচার্য নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' সমালোচনার অবসরে লিখিয়াছেন—

—অতি বালককাল হইতে পিতৃদেব আমাকে ভাবপ্রবণ করিয়া তুলেন। একটি গল্প বেশ আরম্ভ করিয়া, একটি ভাল লোককে এমনই বিপন্ন করিয়া তুলিতেন যে, আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতাম না। প্রত্যহই সেইরূপ হইত; প্রত্যহই বুঝিতাম, গল্প বাবার বানানো মিথ্যা কাহিনী, তবু কিন্তু প্রত্যহই আমাকে কাঁদিতে হইবে। যৌবনের পড়াশুনাও সেই দিকে—সেই করুণ রসের দিকে প্রবাহিত হইল। পত্নীর সমক্ষে সমগ্র লীয়র অনুবাদ করিয়া পাঠ করিয়াছি। লীয়রের সঙ্গে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছি। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণ ভরিয়া সেবা করিতে লাগিলাম; এত কান্না বুঝি আর কোথাও নাই। সংযোগে বিয়োগে সমান কান্না। মিণ্টনে কান্না নাই, ও ভাল লাগিল না; মাইকেলে আছে, ভাল লাগিল। ক্রমে কান্নাই আমার সাহিত্যের কষ্টিপাথর হইয়াছে।—

সাহিত্যাচার্যের ও তাঁহার পিতার গুরুকরণ হয় নাই—তাঁহারা দীক্ষা লন নাই। সাহিত্যাচার্যকে কোনরূপ নিত্যকর্ম, যেমন সন্ধ্যাহ্নিক, পূজার্চনা, স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি করিতে দেখা যায় নাই। তিনি দিনের মধ্যে ২।৩ ঘণ্টা

পায়ের উপর পা দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং প্রায়ই মনে মনে, কখন-বা গুন্‌গুন করিয়া হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি তারকব্রহ্ম নাম করিতেন। বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত, বৈষ্ণবী পূজা—বলিদান হইত না—আখকুমড়াও নয়।

আর, একটা কথা বলিয়াছি, সাহিত্যাচার্য ছিলেন 'খাঁটি হিন্দু'। সে কাহাকে বলে? খাঁটি হিন্দু বলিলে সাধারণতঃ বুঝা যায়—যিনি হিন্দুশাস্ত্রে তথা আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী; আত্মার অবিনশ্বরত্বে, জন্মান্তরে বিশ্বাসী; আচারনিষ্ঠ, স্বধর্মপালনকারী, সদাচারী; ভগবানের নির্লিপ্ততায়, সুতরাং তাঁহার অবতারত্বে বিশ্বাসবান্। তিনি খাঁটি হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু কোন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁহার বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা অথবা বীতরাগ ছিল না; সকল সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সদ্ভাব, সৌহার্দ্য তথা আন্তরিক হৃদ্যতা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন সকল সম্প্রদায়ের আদরের 'অক্ষয়বাবু'—সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিত, ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত।

এইখানেই বলিয়া রাখি, সাহিত্যাচার্য যাহাকিছু বলিতেন বা লিখিতেন, তাহাই তাঁহার অনুভূত, আত্মলব্ধ ও সত্য বলিয়া পরিজ্ঞাত। তাঁহার চিন্তা, জ্ঞান, উপলব্ধি একরূপ এবং কথায় অথবা লেখায় সেইগুলি বিপরীতধর্মী, কিংবা মুখে এক আর কাজে আর এক—এরূপ দ্বৈধভাব কখন তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

তিনি পৌরাণিক ধর্মে এবং প্রতিমাপূজায় বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। উলায় তাঁহাদের বাসাবাড়ী, তবু সেখানে প্রতিমা গঠন করিয়া সরস্বতী পূজা হইত, আর চুঁচুড়ায় হইত কার্তিক পূজা এবং পরে দুর্গোৎসব ও কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। তিনি লিখিয়াছেন—

—আমাদের বাড়ীতে ৺পূজায় সম্ভবাতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্য হইত। ঠাকুরগঠনে, চিত্রে, সাজসজ্জায় দেশীয় শিল্প উৎসাহ পাইত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ, ভদ্র দরিদ্র-ভোজনে আমরা যশ পাইতাম, আশীর্বাদ পাইতাম। ভাল যাত্রাগান কীর্তনে উৎসব উছলিয়া উঠিত।—

এই দুর্গাপ্রতিমা-প্রসঙ্গে একটি হাসির কথার উল্লেখ করিতেছি। স্বগ্রামবাসী মহেশ পটো চালচিত্র অঙ্কন শেষ করিয়াছে। চিত্রিত করিয়াছে শিব-বিবাহ। সাহিত্যাচার্য পটোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেখ, ঐ যে কালোদাড়িওলা সুপুরুষ এঁকেছ, উনি কে? আর সবাইকে চিন্‌তে পারছি, কিন্তু ওঁকে ত পারছি না।' মহেশ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, 'সে কি বাবুমশাই, আপনি ওঁকে চিন্‌তে পারছেন না? আমাকে আপনি অবাক্ করলেন—উনি দেবর্ষি নারদ।'—'তবে ওঁর কালোদাড়ি কেন? নারদের ত এতকাল শাদা দাড়িই দেখে এসেছি।'—'বাবু, এবার আপনি হাসালেন! আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এটা শিবের বিয়ে—তখন ত বাবুমশাই, নারদের দাড়ি পাকেনি।' উপস্থিত সকলেই অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। হাসির রোল থামিলে সাহিত্যাচার্য পটোকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, মহেশ, বল ত, আমাদের বাড়ীর ঠাকুর গড়্‌তে অন্য বাড়ীর চাইতে চারগুণ বেশি মজুরি নাও কেন?' —'বাবু, আবার ভুল বুঝলেন। আপনার বাড়ীর চালচিত্রে শিবের বিয়ে আঁকলুম—দেবতারা সব গিশ্‌গিশ করছেন, ভূতেরা দলে দলে জনে জনে নাচছে; অন্য বাড়ীতে যেমন মজুরি পাই, তার মতন চালচিত্র আঁকি। যে বাড়ীতে সব চাইতে কম পাই, সেখানকার চালচিত্রে কি আঁকি জানেন?—আঁকি একধারে একখানা জগন্নাথের রথ, মাজে লম্বা কাছি, আরধারে গোটাকতক পেটরোগা আর পেটমোটা ভুঁড়ো লোক প্রাণপণে রথ টানছে—যেন চিৎপটাং হ'য়ে পড়ে আরকি। আর আপনার কি আঁকলুম, না তেত্রিশ কোটি দেবতা ভূতপ্রেত নিয়ে শিবের বিয়েতে বরযাত্র চলেছেন।' আবার হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।

শাস্ত্রের বিধিনিষেধ সাহিত্যাচার্য মনে মনে চিন্তা করিতেন, বিচার করিতেন, আজীবন শাস্ত্রার্থ ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। পিতার মৃত্যু-সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—

—সময়ে সময়ে পুত্রের ঔর্ধ্বদেহিক কার্য পিতাকে করিতে হয়। এই কথা লইয়া ভাবিতাম, আমাদের শাস্ত্র কি কঠিন, কি কঠোর, কি নৃশংস। আজি পিতাকে স্নান করাইয়া, নব যুগ্মবস্ত্র পরাইয়া, কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্র দিয়া, চিতায়

উঠানো হইয়াছে, আমি দক্ষিণহস্তে বটজটা ধরিয়া দূরে দাঁড়াইয়া সেই নৃশংস শাস্ত্রের কথা ভাবিতেছি; মনে করিতেছি, আজি আমার যদি এইসকল অবশ্য কর্তব্য না থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ভূতলশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকিতাম; উঠিতেও পারিতাম না, কেহ উঠাইতেও পারিত না। আজি শাস্ত্রই ত আমাকে উঠাইয়াছে, দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে, কর্তব্যে ব্যস্ত করিতেছে; তবে শাস্ত্র নৃশংস কেন? শাস্ত্র মানিলে শাস্ত্র মহোপকারী।—

পিতার মৃত্যুর প্রসঙ্গে তিনি যে সদুপদেশটি পিতাপুত্রে লিখিয়া গিয়াছেন এবং যাহা সনাতনীর উপসংহারে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বহুমূল্যজ্ঞানে উদ্ধৃত করিতেছি।

—দারুণ বিসূচিকা ব্যামোহে একদিনের পীড়ায় হঠাৎ পিতার মৃত্যু হইল। আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। ··· দ্বিতীয় রাত্রি একঘুমের পর চিন্তা আসিল, ভাবিতে লাগিলাম,—দেখা যাউক, আমার বয়সী বা আমার অপেক্ষা বয়সে বড়, আমাদের এখানে, এমন কয়জনের পিতা বর্তমান আছেন। দুইঘণ্টা মনে মনে খতিয়ান করার পর দেখিলাম, একজনের মাত্র আছেন—অন্নদা মুখোপাধ্যায়ের। ···ভাবিলাম, তবে আমি 'ভাগ্যহীন' কিসে।

সকল সময়ে এইরূপ খতিয়ান করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বাস্তবিক আমরা ভাগ্যহীন নহি—সংসার দুঃখময় নয়। দুঃখ আছে বৈকি, দুঃখ না থাকিলে পরমধর্ম যে-সেবা সে-সেবা কাহাকে লইয়া চলিবে? আমরা যদি সেবাপরায়ণ হইয়া সেবার গৌরব বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝিব দুঃখ কিরূপ অকিঞ্চিৎকর। এইরূপ চিন্তা করিতে শিখিলে মন প্রফুল্ল হইবে, হৃদয়ে ধর্মভাব পরিপুষ্ট হইবে। ভিজা কাঠ হেঁটমুখ করিয়া কষ্টে একবার ধরাইতে পারিলে সেই আগুনে কাঠও শুকায়, আগুনও জ্বলে এবং তেজ ক্রমেই বাড়িতে থাকে; ধর্মভাব হৃদয়ে একবার দেখা দিলে, সেই ধর্মই ধর্মকে রক্ষা করে, বর্ধিত করে।—

সাহিত্যাচার্য হিমালয়ের কেদার-বদ্রি ও পশুপতিনাথ ভিন্ন সমগ্র ভারতের এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার প্রায় সকল তীর্থ পরিক্রম করিয়া যেখানে যাহাকিছু কৃত্য সেগুলি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সকল তীর্থস্থান-ভ্রমণের তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—তীর্থস্থানে দেবাদি দর্শন; পূজার্চনাদি করা তিনি যেমন হিন্দুর কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, তেমনি ঐ সকল দেবায়তনের এবং তন্নিকটস্থ স্থানের কারুকার্যপূর্ণ চারুশিল্পের অপূর্ব স্থাপত্য ও পুরাতত্ত্বের নিদর্শন দেখিয়া বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হিন্দুর অতীত গৌরব স্মরণ করাও হিন্দুর উচিত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই তীর্থক্ষেত্রগুলিই না সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া আজ এই মহা অধঃপতনের যুগেও বিশাল ভারতকে একতাসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। 'প্রবন্ধ ও নিবন্ধ' হইতে 'সমগ্র ভারত' পড়িতে পাঠককে অনুরোধ করি।

সাহিত্যাচার্য ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন-প্রমুখ দুইএকজন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে, সর্বকর্ম ছাড়িয়া দিয়া, এমন কি তাঁহার সাধের সাহিত্য-সেবায় অবহেলা করিয়া তিনি তাঁহার মাহারা শিশুসন্তানকে শ্রীগোপাল-জ্ঞানে লালনপালন করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

'পত্নীবিয়োগের পর অক্ষয়দাদা একাধারে ছেলেমেয়ের জনক-জননী সাজিয়া অপোগণ্ড শিশু পুত্রকন্যাগণকে মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের সে একটা অপূর্ব কীর্তি—যে দেখিয়াছে সেই অক্ষয়চন্দ্রের অপূর্ব একনিষ্ঠায় ও কর্তব্য-পালনে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।'

তাঁহার ইচ্ছা ছিল বাড়ীতে একটি গোপালঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি সেই বিগ্রহটির নিত্যসেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁহার এই চিরপোষিত একান্ত বাসনা সফল হয় নাই। বাড়ীর একআধজন তাঁহার এই মনোভাব অবগত থাকায় ১৩৪৫ সালে সরকার বাড়ীতে কালো কষ্টি-পাথরের একটি শ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং তাঁহার বামপার্শ্বে সাহিত্যাচার্যের শ্বেতমর্মরের একটি ছোট মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য সেবাপূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষ্ণবলরামের ন্যায় শ্বেতকৃষ্ণ বর্ণের এই মূর্তি দুইটি বাস্তবিকই অতি মনোরম।

সাহিত্যাচার্য কিরূপ ভক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন তাহার একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। ১৩১৭ সালের ৫ই মাঘ তিনি চুঁচুড়া হইতে এলাহাবাদে অজরচন্দ্রকে চিঠি লিখিয়াছিলেন—

—গত একাদশীর দিন তোমার জ্বর হয়, পূর্ণিমা-প্রতিপদ পর্যন্ত ছিল। তাহার পর আর নাই। এবারকার পালাটা কাজেই সেইখানে কাটাইয়া আসা ভাল। ... ভগবানের আশীর্বাদে এই কয়দিন জ্বর না হইলেই হইল। ... 'মাঘে প্রয়াগে' যখন রহিলে, যে-দিন আপনাকে বেশ সমর্থ বোধ করিবে, সঙ্গমে স্নান করিবে এবং গরীবদুঃখীকে কিছুকিছু দিবে। উহারা ভগবানের দূত, সেই অঞ্জলি তাঁহার শ্রীচরণে পৌছাইয়া দেয়।

তুমি লিখিয়াছ, 'মনের নৈরাশ্যভাব অনেক কাটিয়া গিয়াছে।' নৈরাশ্য আবার কিসে? যখন ভগবানের নাম করিয়াছ, তখন আর নৈরাশ্য থাকিবে কেন?—

সামাজিক পরিবর্তন ও নিত্যধর্মে

সমাজের পরিবর্তন-বিষয়ে সাহিত্যাচার্যের মতামত আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে 'সনাতনী'র 'পূর্বপীঠিকা' হইতে কিয়দংশ উদ্ধার করা ভাল।

—যেমন পেষণীচক্রে একটি অপরিবর্তনীয় কীলক কেন্দ্রে রাখিয়া পাথর ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ কি সমাজে, কি ধর্মে, কেন্দ্রপদার্থ স্থির থাকে,—সেইটিকে বেষ্টন করিয়া, রক্ষা করিয়া নানা পদার্থ ঘুরিতে থাকে। কিন্তু বিবাহ যে আট প্রকার ছিল? ছিল বৈকি। কিন্তু একটা কথা স্থির ছিল, নারী যেভাবেই পুরুষকে পাইয়া থাকুক, তাহাকে লইয়াই তাহার যাবজ্জীবন কাটাইতে হইবে। ... মনু হইতে এখন পর্যন্ত বিবাহের অনেক ছাদের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ভিতরের ঐ যে সারকথা, তাহা একই ভাবে আছে। ... ধর্মের পরিবর্তন নাই বলিয়াই, ভালমন্দ-বিচারকালে ধর্মকে সাক্ষি-স্বরূপ বা কষ্টিপাথর-স্বরূপ মনে করিতে হয়। আর সকল পদার্থেরই পরিবর্তন হইয়া থাকে, সুতরাং বিচারকালে আর কোন পদার্থকেই কষ্টিপাথর মনে করা ভ্রম। এইরূপে বিবেক বা চিত্তশুদ্ধি কষ্টিপাথর হইতে পারেন না; কেন-না কামাস্কাট্কাবাসীর বিবেকের সহিত আমার বিবেকের মিল নাই। ... নারীর সতীত্ব বা পাতিব্রত্যশক্তি সনাতনী। ঐটি অব্যাহত রাখিয়া নারীজাতির উন্নতি করিতে হইবে।... সুখদুঃখের—উপরের ত্বকের কথা,—সেবা পরমধর্ম, অপরিবর্তনীয় কেন্দ্র। এই কেন্দ্রজ্ঞান থাকিলে বুঝা যায় যে, সেবার সুবিধার জন্যই সুখদুঃখের তারতম্য এবং অবস্থিতি।—

এখন দেখিতে হইবে, বিবাহ, নারীধর্ম, নিত্যধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে সাহিত্যাচার্যের মতামত কিরূপ ছিল। হিন্দুবিবাহের সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ, আচারবিচার তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন এবং যথাসাধ্য পালন করিতেন। তিনি অথবা তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কেহই কায়স্থ সভার নির্দেশ-অনুসারে উপবীত গ্রহণ করেন নাই। তাই কায়স্থের উপনয়ন-গ্রহণের সর্বপ্রধান নায়ক 'বিশ্বকোষ'-প্রণেতা, উপবীতী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবার প্রাক্কালে তিনি পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুমতি লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'সে (হিন্দুবিবাহ) এক অদ্ভুত কথা। ভাবী বংশধরগণের প্রাপ্তি-কামনায় আমরা ভূতপুরুষগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া তবে বর্তমানকে গ্রহণ করি। আভ্যুদয়িক, কুশণ্ডিকা, গর্ভাধান—তিনটি কার্যে একটি বিবাহ। সোজা কথায় বিবাহের জন্য আমরা শ্রাদ্ধ করি।'

তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সকল অনুষ্ঠানই যেমন দুই দিক্ দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়, হিন্দুর বিবাহও সেইরূপ দুই দিক্ দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়। —একটি পার্থিব উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা বা পুত্রোৎপাদন বা প্রেতপুরুষদিগের পিণ্ডদান—কিন্তু এ সবই ত আত্মতোষণের উপকরণ। কিন্তু হিন্দুবিবাহের অতি উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে। হিন্দুবিবাহ অবিচ্ছেদ্য —মরণান্ত কাল পর্যন্ত, এমন-কি পরলোকেও এই বন্ধন অটুট থাকে।

তিনি বহুবিবাহ কখনই সমর্থন করেন নাই—পুরুষ বা স্ত্রীর একপত্নীত্ব বা একস্বামিত্ব সর্বতোভাবে সমর্থন করিতেন, বিধবা বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। সমগ্র পুরাণ-ইতিহাস হইতে মাত্র চারিটি বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—মদনপত্নী মায়াবতী, বালীপত্নী তারা, রাবণপত্নী

মন্দোদরী এবং অর্জুনপত্নী নাগকন্যা উলুপী। মদনপত্নী মায়াবতী—দেবতা, বিশেষতঃ তিনি পূর্ব-পতিকেই দ্বিতীয়বার পতিরূপে পাইয়াছিলেন; তারা, মন্দোদরী ও উলুপী—বানরী, রাক্ষসী ও নাগকন্যা। অনার্য নারীর অনার্য কাণ্ড আর্যগণের অনুকরণীয় নহে।

বিধবা বিবাহ-বিষয়ে তিনি আরও লিখিয়াছেন—

—কথা হইতেছে, বর্ণাশ্রমীর উচ্চশ্রেণীর বিধবা-মধ্যে পুরুষান্তর-গ্রহণ কখন প্রচলিত ছিল না—থাকিলে তাহার মন্ত্র থাকিত, সম্প্রদানের বিধি থাকিত, সম্প্রদানকালে কোন্ গোত্রের উল্লেখ করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট বলা থাকিত, আরও কত কি থাকিত। দেখুন, এক দত্তক-গ্রহণ, কোটির মধ্যে একজনকে গ্রহণ করিতে হয় কিনা সন্দেহ, কিন্তু তাহার কত বিধি, বিধান, বিচার দেখুন দেখি—আর বিধবার বিবাহ হইলে কোন্ পক্ষের সন্তান কিরূপ ভাগে কোন্ স্বামীর বিষয় পাইবে, তাহার কোন কথাই নাই কেন ?—

এই প্রসঙ্গে 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা', 'হিন্দুর পরিণয় প্রথা' ও সনাতনীর 'হিন্দু বিবাহের ব্যবস্থা' পরিচ্ছেদটি পাঠ করা ভাল।

সাহিত্যাচার্য ছিলেন স্ত্রী-পুরুষে সাম্য-স্থাপনের সম্পূর্ণ বিরোধী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে রুষো (Rousseau) একজন মহা পণ্ডিত ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র নারীধর্ম-সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে রুষোর মত উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। উহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইল।

The whole education of women ought to be relative to men. ... Her dominant passion is virtue. A virtuous woman is almost the equal of the angels. ... A woman should remain a woman. It would be folly to wish for the cultivation of man's qualities. ... In short, femenine studies should relate exclusively practical matters. ... Our education is more pedantry : every thing is taught us against nature. Nature must be studied and consulted, so that she may be assisted and we have saved the detriment of thwarting her.

স্ত্রীপুরুষের একত্র শিক্ষা বা অবাধ মেলামেশা তিনি একেবারেই অনুমোদন করিতেন না; বৌদ্ধধর্ম নষ্ট হইয়া গেল—বুদ্ধদেব শেষ বয়সে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বৌদ্ধ বিহারে একত্র বাস করিবার অধিকার দেওয়ায়; তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন তাঁহার ধর্মে অনাচার প্রবেশ করে নাই, কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগে বৌদ্ধধর্মের ব্যভিচার ও অনাচার কে না জানে? শ্রীচৈতন্যের পবিত্র বৈষ্ণবধর্মও তাঁহার তিরোধানের পর নেড়ানেড়ীর কুৎসিত, কদর্য, নক্কারজনক রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর মাথা কি হেঁট করায় নাই? সুতরাং স্ত্রীপুরুষের একত্র মেলামেশা যত কম হয় ততই দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে তথা পারিবারিক জীবনের পক্ষে মঙ্গলকর ও শান্তিপ্রদ—ইহাই ছিল সাহিত্যাচার্যের অবিচলিত অভিমত।

নিত্যধর্ম-পালন-সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়া লিখিতেছেন—

— ··· যত মতভেদ থাকুক, হিংসা না করা, মিথ্যা না বলা, পরস্বাপহরণ না করা, আর ভোগসাধন ত্যাগ করা—এই কয়টি বিষয় যে 'যম', তাহা স্থির আছে। এখন এস দেখি! ভাইসকল, দাদাসকল, বাপসকল, আমরা সকলে কায়মনোবাক্যে ঐ চারিটি যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করি।

আমরা আপনারা যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করিব। আমাদের সন্তানসন্ততিগণ যাহাতে ঐরূপ অনুষ্ঠানে রত হন, পোষ্যবর্গের মধ্যে অনুগত ব্যক্তিরা যাহাতে ঐরূপ করেন এবং যদি আমাদের প্রকৃত শিষ্যসেবক কেহ থাকেন, তবে তাঁহারাও যাহাতে অহিংসাদি ধর্ম পালন করেন, সে বিষয়েও কায়মনোবাক্যে, দৃষ্টান্ত-উপদেশাদির দ্বারা চেষ্টা করিব। যদি মরণকালে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আমি নিয়ত যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছি, অনেক সময় কৃতকার্য হইয়াছি, আর পাঁচটি যুবাপুরুষকে সেইরূপ অনুষ্ঠানে রত রাখিয়া চলিলাম—তবে কি সুখের মৃত্যুই-না হইবে!—

এইবার 'গ্রন্থরাজির বিশ্লেষণ' করিতে পারিলেই আমার কর্তব্য শেষ হয়; কিন্তু তৎপূর্বে আর একটি কাজ বাকি আছে—সাহিত্যাচার্যের পৌত্র, অজয়চন্দ্রের পুত্র, সাহিত্যসেবী শ্রীমান্ অজিতচন্দ্র-লিখিত 'সমাজ- ও পরিবার-

মধ্যে ঠাকুরদাদা'র আসল রূপটি এইস্থানে পাঠকগণের সম্মুখে সানন্দে উপস্থাপিত করা। শ্রীমান্ তাহার পিতামহের সাহিত্যসম্ভার-অধীত ও তাহাদের সরকার বাড়ীর ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ পারিবারিক ঘটনাবলির খাতা হইতে সংগৃহীত তথ্যের এবং পিতার মুখে শোনা কয়েকটি বিবৃতির সমষ্টিই এই পরিচয়।

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, মনীষী গঙ্গাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমান্ অজিত পর্যন্ত চারপুরুষ বঙ্গবাসীর সেবা করিয়া আসিতেছেন; এইরূপ অব্যাহত পুরুষানুক্রমিক সাহিত্য-সাধনা আমি অন্য কোথাও দেখি নাই। ভগবানের আশীর্বাদে শ্রীমান্ অজিতের সাহিত্যসেবা উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হউক, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বংশের প্রাচীন গৌরবশ্রী আবার নবীনত্ব লাভ করিয়া উজ্জ্বল, প্রতিভাদীপ্ত—যশোধন্য হইয়া উঠুক।

সমাজ- ও পরিবার-মধ্যে ঠাকুরদাদা

'তোমারি চরণ করিয়া শরণ
চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি ভাবেতে হেরিব তোমায়—
ধরি এই মনোরথে।'

১

পূজনীয় পিতামহের জীবন মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—জীবনের প্রথম ২৬ বৎসর (১২৫৩ হইতে ১২৮০) বালককাল, পাঠ্যাবস্থা ও ওকালতী; দ্বিতীয় ১৭ বৎসর (১২৭৯-১২৯৬) অনন্যকর্মা হইয়া সাহিত্যময় জীবন-যাপন; তৃতীয় বা শেষ ২৮ বৎসর- (১২৯৭-১৩২৪) সম্বন্ধে পিতাপুত্র-এর প্রারম্ভে ঠাকুরদাদা নিজেই লিখিয়াছেন—

—প্রৌঢ়ে ও বার্ধক্যে আমার জীবন—যমেমানুষে টানাটানির পালা; কখন যম জিতিতেছে, কখন আমি জিতিতেছি। কলিকাতা, কটক, চুঁচুড়া, ইটোয়া, বৈদ্যনাথের ঘরের কোণে, নিভৃতে, নীরবে, বিনা-আড়ম্বরে এই যে রুষ-জাপান সমর, ইহার বিবরণ তোমাদের পড়িতে ভাল লাগিবে কেন? অন্তত ভাল লাগিবে না, আমি বুঝিয়াছি; সেইরূপ বুঝিয়া আমি লিখিতে যাইব কেন?—

কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁহার জীবনের এই দিক্‌টি আলোচিত হইলে ঠাকুরদাদা লোকটি কেমন ছিলেন, জীবনের মধ্যকাল হইতে কিরূপ নিদারুণ দুঃখকষ্ট তিনি অকাতরে হাসিমুখে সহ্য করিয়াছিলেন—এ সকল বিষয় জানিতে পারিলে তাঁহার চরিত্র, তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার সেবাধর্ম, তাঁহার ধৈর্য, তাঁহার সহিষ্ণুতা প্রভৃতি জানিবার ও বুঝিবার পক্ষে আমাদের বিশেষ সুবিধা হইবে। লক্ষ্য করিয়াছি, অধিকাংশ জীবনীতেই এই অংশ—এই চরিত্রগত অংশ—ভাল করিয়া দেখানো হয় না।

১২৯৫ সালে তাঁহার পিতৃদেব গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের চুঁচুড়ার কদমতলার বাড়ীতে বিসূচিকা রোগে

হঠাৎ মৃত্যু হয়। ১২৯৭ সালের ১৭ই শ্রাবণ চুঁচুড়ায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, আমার কাকা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অচ্যুতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; সঙ্গে সঙ্গে আমার পূজনীয়া ঠাকুরমা মরণাপন্ন পীড়িত হন। সেই চলৎশক্তিহীন রোগিণীকে সুচিকিৎসার জন্য নৌকা করিয়া কলিকাতায় ৪৩নং সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে আনা হয়। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হইল না, সাড়ে চারমাস অসুখে ভুগিয়া ১২৯৭, ২রা পৌষ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতিপূর্ণ আদরের 'অসাধারণী', নবীনচন্দ্রের সশ্রদ্ধ সোহাগের 'বৌঠাকুরানী' তিনটি পুত্র ও চারটি কন্যা রাখিয়া ৩৬ বৎসর বয়সে অকালে সতীলোকে প্রয়াণ করিলেন। যমে মানুষে টানাটানির পালা সুরু হইল। তখন ঠাকুরমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স্ ১৬ বৎসর, কনিষ্ঠা কন্যার বয়স্ ৩ বৎসর এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স্ মাত্র সাড়ে চার মাস। তখন ঠাকুরদার সংসারে এমন কোন আত্মীয়া ছিলেন না যিনি ঐ ছোট শিশুটিকে দুধ খাওয়াইয়া মানুষ করেন। তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনেক চেষ্টা করিয়া একজন সৎজাতীয়া ধাত্রী (wet-nurse) নিযুক্ত করিতে এবং শিশুটিকে লালন করিতে হয়।

তখন ঠাকুরদাদার বয়স্ ৪৩ বৎসর। তখনকার দিনে বিপত্নীক হওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বার বা তদধিক বার দারপরিগ্রহ করা সমাজ-মধ্যে স্বাভাবিক প্রথায় দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি বহুতর আত্মীয়-স্বজনের উপদেশ, উপরোধ, অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া এই চিরাচরিত প্রথা পালন করিলেন না—মরণান্তকাল পর্যন্ত বিপত্নীক রহিলেন। তিনি যে শুধু দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন না তাহা নহে, তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান্ ব্যক্তি সে সময়ে অতি অল্পই দেখা যাইত। তখন অধিকাংশ সম্পন্ন সপত্নীক ব্যক্তিরই বাঁধা বারযোষিৎ থাকিত, এবং এই গণিকাদের সংখ্যা যাঁহার যত বেশি হইত সমাজ-মধ্যে তাঁহার মানমর্যাদা, গৌরবগরীমা তত বাড়িয়া যাইত। আর তখন ইংরাজী-শিক্ষিতের অধিকাংশই মদ্যপ ছিলেন। তবে কবি নবীনচন্দ্র লিখিয়াগিয়াছেন যে, কিন্তু অক্ষয়দাদা ছিলেন সে রসে বঞ্চিত। (কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে) 'সন্ধ্যা হইল, ভৃত্য আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে দুইটি মোমবাতির শেজ রাখিয়া গেল। সঙ্গে সুরাদেবী অধিষ্ঠিতা হইলেন এবং অক্ষয়বাবু ছাড়া আমরা তিনজন (নবীনচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র) তাঁহার সেবা আরম্ভ করিলাম।' ('আমার জীবন' ২য় ভাগ, ৩৬৬ পৃষ্ঠা।) ঠাকুরদাদার চারিত্রিক যশঃ-সৌরভ তাঁহার সাহিত্যিক গৌরবকে যেন একটু ক্ষুন্নই করিয়াছিল!

কাকা শিশু অচ্যুতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলেন গলনালী হইতে অন্নবহ নালীর (alimentary canal) শেষ পর্যন্ত ঘা লইয়া। নানাবিধ চিকিৎসায় কোন ফল হইল না, চিকিৎসকগণ জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলেন; অগত্যা পিতামহ রীতিমতভাবে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করিয়া একাগ্র-চিত্তে শিশুর চিকিৎসা নিজেই করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাধের সাহিত্যসেবায় জলাঞ্জলি দিয়া দুই বৎসর দিবারাত্র নিয়মিত চিকিৎসা, অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষার দ্বারা তিনি শিশুটিকে নীরোগ করিলেন; এই প্রথমবার যমেমানুষের টানাটানির যুদ্ধে (tug of war) ঠাকুরদাদা জয়ী হইলেন!

২

ঠাকুরদাদা যখন অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত এবং রুগ্ণ শিশু-সন্তানকে লইয়া মহা বিপদ্‌গ্রস্ত তখন সহবাস-সম্মতি বিল (Age of Consent Bill) লইয়া সমগ্র ভারতে প্রধানতঃ কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। এই বিলটিকে উপলক্ষ করিয়া 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ইংরাজ সরকারের অসৎ অভিপ্রায় ও কার্যকলাপ-সম্বন্ধে তীব্র আলোচনাপূর্ণ পাঁচটি প্রবন্ধ যথাক্রমে ২৮.৩, ১৬.৫ এবং ৬.৬.১৮৯১ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে দুইটি ঠাকুরদাদার লিখিত। ফলে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যানেজার ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিণ্টার অরুণোদয় রায়কে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পোরা হইল এবং তাঁহাদিগকে জামিনও দেওয়া হইল না। এই ব্যাপার লইয়া কলিকাতায় হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। ইহার পূর্বে ভারতে রাজবিদ্রোহিতার অভিযোগে কোন সংবাদপত্র অভিযুক্ত হয় নাই। তাই বঙ্গবাসীর এই মামলা The First Seditious Case in India বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক-এর 'কেশরী' পত্রিকার বিরুদ্ধে মকদ্দমা ও তিলক মহারাজের কারাদণ্ড পরে ঘটিয়াছিল।

'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইয়াছেন শুনিবামাত্র ঠাকুরদাদা, তখনও তিনি কলিকাতার বাসায় বাস করিতেছিলেন, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ, 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র গিরিশচন্দ্র বসুকে লোকমারফৎ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শুধু হিসাব ও গ্রাহকদের নামের খাতাপত্রগুলি রাখিয়া, বাকি সমস্ত কাগজপত্র দিয়া কয়লার বদলে ইস্টিম্-মেশিন চালাইবার ব্যবস্থা করেন এবং যতক্ষণ না কাগজের সামান্য টুকরাটি পর্যন্ত পুড়িয়া যায়, ততক্ষণ যেন এইভাবে মেশিন চলে। সেই দিনই পুলিশ তদন্ত করিতে আসিয়া দেখিল, মাত্র কয়েকখানি খাতা ভিন্ন অন্য কোন কাগজপত্র কার্যালয়ে নাই। সুতরাং অভিযুক্ত প্রবন্ধগুলির লেখকগণের নাম চিরদিন অজ্ঞাত হইয়া রহিল।

অতঃপর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর ডব্‌লু. সি. পেথেরম (Petheram) জুরির সাহায্যে এই মামলার বিচার আরম্ভ করেন ১৮৯১, ২৫এ আগস্ট। স্ট্যাণ্ডিং কাউন্‌সেল মিস্টার পুগ (Pugh), উড্‌রফ ও ইভান্‌স গভর্মেন্টের পক্ষে এবং মিস্টার জ্যাক্‌সন, এন. এন. ঘোষ, গ্রাহাম ও এস. পি. সিংহ বঙ্গবাসীর পক্ষে মামলা চালাইয়াছিলেন। এই অভিযুক্ত পাঁচটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত মর্ম লিপিবদ্ধ হইল—

ইংরাজ তুমি পাশব বলে বলীয়ান্ বলিয়াই ভারতবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পার না। জানি, তোমার রাইফেল, বেওনেট ও গুলিগোলা আছে, তাই তুমি আমাদের অযথা অপমান করিতেছ। তোমার রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রেল ও স্টিমার দুর্ঘটনা প্রভৃতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে; কিন্তু তুমি এ সব অনর্থপাত দূর করিবার চেষ্টার পরিবর্তে তোমার অনুকম্পা বালিকা-বধূর কাল্পনিক দুঃখ মোচনে নিযুক্ত। তুমি শুধু আমাদের সামাজিক প্রথায় বাধা দিতে তৎপর। তুমি ভারতবাসীর দেহ নিষ্পেষিত করিতে পার, কিন্তু তাহাতে তাহাদের মন আক্রান্ত হইবে না। তোমার আগমনের পূর্বে ঔরংজেব ও কালাপাহাড়ের দুর্ধর্ষ অত্যাচারের ফল বৃথাই হইয়াছিল। ৩০ বৎসরের মধ্যে ভারতের খাদ্যমূল্য চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতের মৃত্যু অনিবার্য। ভারতের জমি উর্বরা, কিন্তু এক উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তির কঙ্কালে পর্বত তৈয়ার হইতে পারে। পেটের জ্বালায় বাপ-মা নিজেদের ছেলেমেয়ে খাইয়া পেট ভরাইতেছিল দেখিয়াও তুমি নির্বিকার ছিলে। স্বীকার করি, রাজদ্রোহী হইবার ক্ষমতা আমাদের নাই, কিন্তু স্মরণ থাকে যেন, আমরা সেই দলের লোক নয় যাহারা বলে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাজদ্রোহী হওয়া অন্যায়।

তখন চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাঙ্গালা সরকারের অনুবাদক। বিচারক-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি আদালতে প্রকাশ্যভাবে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, দুই একটি লেখার ভাব, ভাষা, ভঙ্গি দেখিয়া এবং 'তখন দূরে গেল জটাজুট, কমণ্ডলু দূরে' ইত্যাদি উদ্ধৃতির আধিক্য দেখিয়া মনে হয়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ব্যতীত এই প্রবন্ধ লিখিবার লোক বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় নাই।

এই মামলা কয়েক মাস চলার পর জুরিরা একমত না হওয়ায় বিচারকের নির্দেশে পরবর্তী সেসনের জন্য মামলাটি স্থগিত রাখা হয় এবং আসামীরা জামিনে ছাড়ান পান। কিন্তু বড়লাট ল্যান্সডাউনের আদেশে পরে সরকার এই মামলা তুলিয়া লইয়াছিলেন। [I. L. R. 1891, 19 Cal. 35.]

এখানে এত কথা লিখিবার তাৎপর্য এই যে ইংরাজ-রাজের ভণ্ডামী দেখিয়া অমন যে বিষম শোকার্ত ও নানারূপে বিড়ম্বিত ঠাকুরদাদা তিনিও বিচলিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে কুলীশ-কঠোর লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। দুর্জয় তাঁহার বিক্রম, অসাধারণ তাঁহার সহগুণ, অভূতপূর্ব তাঁহার স্পষ্টবাদিত্ব। মনে রাখিতে হইবে, ১৬.১২.১৮৯০ তারিখে ঠাকুরমা মারা যান, আর বঙ্গবাসীতে ঠাকুরদাদার লিখিত প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ২৮.৩.১৮৯১।

৩

১২৯৯ সালে চুঁচুড়ায় ঠাকুরদাদার মাতৃদেবী, আমার প্রপিতামহীর মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার পিতামাতার

একমাত্র সন্তান—নয়নের মণি—চারবৎসর পূর্বে হঠাৎ যাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে,—দুই বৎসর পূর্বে অকালে যাঁহার পত্নী চলিয়া গিয়াছেন।

১৩০৩ সালে তাঁহার মধ্যম পুত্র, আমার চির-আরাধ্য পিতা অজরচন্দ্র ১১ বৎসর বয়সে প্লীহা, যকৃৎ ও জ্বরে আক্রান্ত হন এবং দুই বৎসর ক্রমান্বয়ে রোগভোগ করিবার পর তাঁহাকে মধুপুরে বায়ুপরিবর্তনের জন্য ৩।৪ মাস রাখা হয়; কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনা হয় এবং জীবনের কোনরূপ আশা না থাকায় কলিকাতার প্রধান প্রধান চিকিৎসক, বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের পরামর্শে ১৩০৫ সালে ঠাকুরদাদা বাবাকে যুক্তপ্রদেশের (অধুনা উত্তরপ্রদেশ) ইটোয়া শহরে লইয়া যান। তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন হুগলী জেলার হাঁড়ালকৃষ্ণপুর-নিবাসী ঠাকুরদাদার বন্ধু আনন্দনাথ মুখোপাধ্যায় ও ৮ বৎসর বয়স্ক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আমার কাকা পূজ্যপাদ অচ্যুতচন্দ্র। ইটোয়ায় বাবার চিকিৎসা হইতে থাকিল হকিমী (ইউনানী) মতে ; সে বড় কঠোর চিকিৎসা—তাঁহাকে প্রায় ৬ মাস জল খাইতে দেওয়া হয় নাই, জলের পরিবর্তে পানীয় দেওয়া হইত যমুনার চড়ায় যে ছোট ছোট ঝাউগাছ জন্মায় সেই টাট্‌কা গাছের পরিস্রুত তরল পদার্থ (distillate)। ঠাকুরদাদা জলের কলসীটি ছোট গা-আলমারির মধ্যে চাবিবন্ধ করিয়া চাবিটি সর্বদা নিজের সঙ্গে রাখিতেন এবং নিজেদের জল খাইবার দরকার হইলে চাবি খুলিয়া স্বহস্তে জল বাহির করিয়া লইতেন। চিকিৎসা ও সেবাযত্নের গুণে রুগ্‌ণ বালক ক্রমে নীরোগ হইতে লাগিল, কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখা গেল তাহার সর্বাঙ্গ অস্বাভাবিকরূপে ফুলিয়া উঠিয়াছে, জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠাকুরদাদার মাথায় বিনা মেঘে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হকিমসাহেব বলিলেন, রোগী নিশ্চয়ই জল খাইয়াছে। চিকিৎসা চলিতে লাগিল কিন্তু জ্বর বা ফুলা কিছুই কমে না, এবং ইহার কোন কারণও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তারপর একদিন যখন বালক পায়খানায় গিয়াছে, তখন ঠাকুরদাদা উহার দরোজা ফাঁক করিয়া দেখিলেন, রোগী গাড়ুর নলে মুখ দিয়া চোঁ চোঁ করিয়া জল খাইতেছে। আর যায় কোথা। ঠাকুরদাদা বাবাকে সেই অশুচি অবস্থায় টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন—সে প্রহারের আর শেষ নাই ; আনন্দদাদা ছুটিয়া আসিয়া অতি বিনীতকণ্ঠে বলিলেন, 'দাদা, জানি তুমি পণ্ডিত, বিদ্বান্‌, শিক্ষিত আর আমি মূর্খ, অশিক্ষিত, পাড়া-গাঁয়ের একটা ম্যাড়া—সবই জানি ; তবু একটা কথা স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞেস করি, তুমি এই মা-মরা ছেলেটাকে এখানে এনেছ কি কর্‌তে, ভাল ক'রে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, না মেরে ফেল্‌তে।' তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নিমেষমধ্যে নির্বাপিত হইল—ঠাকুরদাদা স্বহস্তে জল ঢালিয়া দিয়া পুত্রের শৌচের ব্যবস্থা করিলেন। আর সেই দিন হইতে গাড়ুও চাবিবন্দী হইল। যতদিন ইটোয়ায় ছিলেন তিনি নিজের হাতে জল ঢালিয়া দিয়া সেই ১৩ বৎসরের ছেলের জলশৌচ করাইয়া দিতেন।

ঠাকুরদাদার ছিল অতিশয় ক্রুদ্ধ প্রকৃতি, হঠাৎ প্রচণ্ডবেগে রাগিয়া উঠিতেন—কিন্তু সে খড়ের আগুন—পরক্ষণেই রাগ জল হইয়া যাইত,—আবার সেই স্বাভাবিক ধীর, স্থির, প্রশান্ত, সৌম্যমূর্তি, যেন কোনকিছুই ঘটে নাই। আর রোগের সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার 'অতলস্পর্শ' হৃদয় বাৎসল্যে, কারুণ্যে, স্নেহে সদাই টল্‌মল করিত।

পিতৃদেব ত রোগমুক্ত হইয়া বাড়ী আসিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন চুঁচুড়ার বাড়ীতে থাকিতে দেওয়া হইল না—তাঁহাকে বৈদ্যনাথ-দেওঘরে রাখিয়া দিয়া দেওঘর হাইস্কুলে ভর্তি করা হইল। ৩।৪ বৎসর পরে তাৎকালিক হেডমাস্টার মধুসূদনের জীবনচরিত-লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু কলিকাতায় চলিয়া আসায় স্কুলের অধ্যাপনা খারাপ হইয়া গেলে বাবাকে কলিকাতায় হিন্দুস্কুলে ২য় শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়, পরে তিনি বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন করেন—তাঁহার পঠদ্দশায় তাঁহাকে আর চুঁচুড়ার পৈতৃক বাড়ীতে বাস করিতে দেওয়া হয় নাই—পাছে আবার ম্যালেরিয়া ধরে।

তারপর চার বৎসর রোগভোগ করিয়া ঠাকুরদাদার বিবাহিত জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার জ্যেঠামশাই পূজনীয় অমরচন্দ্রের মৃত্যু হয় (১৩০৭)। তখন কালাজ্বরের আবিষ্কার হয় নাই, যেগুলি আসল কালাজ্বর সেগুলিরও চিকিৎসা হইত প্লীহাযুক্ত

জ্বর বলিয়া এবং অধিকাংশ রোগীই মারা পড়িত। জ্যেঠা-মশাইয়ের অ্যালোপ্যাথী ও কবিরাজী চিকিৎসা চলিল কিন্তু বিশেষ ফল হইল না দেখিয়া চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বজরায় করিয়া গঙ্গার ওপর কয়েক মাস হাওয়া খাওয়ানো হইয়াছিল, পরে পুরীতে ও কটকে তাঁহাকে দীর্ঘকাল রাখা হয়; শেষে কটকেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কটক হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর নিকটে ঘোড়ার গাড়ী হইতে নামিতেই ঠাকুরদাদার দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয়, আমাদের 'জ্যেঠা', আমাদের পরিবারভুক্ত পূজার্হ গিরিশচন্দ্র কর-এর সঙ্গে ঠাকুরদাদার প্রথম দেখা হয়। তিনি জ্যেঠাকে অবিচলিত গম্ভীর ভাবে 'জীবন্ত খবরের কাগজের মত' বলিলেন, 'গিরিশ, অমরকে কটকে দিয়া আসিলাম।' মহাশোকগ্রস্ত মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির পৌত্রের মৃত্যু-সম্বন্ধে ঠাকুরদাদা লিখিয়াছেন—

—উঠিতে একটু বেলা হইয়াছে,—দেখি খুড়া মহাশয় স্বচ্ছন্দে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন। একটু দুঃখিতের মত ভাবে বলিলেন, 'কাল তোমাদের ঘুমের বড়ই ব্যাঘাত হইয়াছে।' তাহার পর আর দুঃখ নাই, ক্লেশ নাই, খানিকটা জীবন্ত খবরের কাগজের মত বলিলেন, 'কাল রাত্রিতে আমার একটি শিশু পৌত্র মারা গিয়াছে।' বলিহারি সেই গাম্ভীর্য, বলিহারি সেই ধৈর্য ('স্মৃতিতর্পণ')।—

মহা শোকের সময় শিরোমণি মহাশয়ের গাম্ভীর্য ও ধৈর্য বেশি, না ঠাকুরদাদার বেশি আমি বলিতে পারিব না।

এইখানে ঠাকুরদাদার আর দুইটি সন্তানের কঠিন পীড়ার কথা বলিতেছি। কাকা বিশেষ পীড়িত হওয়ায় তাঁহাকে দীর্ঘকাল দেওঘরে রাখিয়া তিনি চিকিৎসা করান; আর আমার ছোটপিসীমা হেমবরণী প্লীহাজ্বরে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় কলিকাতার কলুটোলার প্রসিদ্ধ হকিম আবদুল লতিফ সাহেব ৩ মাস যাবৎ তাঁহার চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে নীরোগ করেন। পরে তাঁহার বিবাহ হইলে ঠাকুরদাদা দেওঘরে স্বীয় বাড়ীর সংলগ্ন জমির অর্ধাংশ তাঁহাকে দান করিয়া তথায় স্বামিসহ ছোটপিসীমার বাস করিবার সুবিধা করিয়া দেন। হায়! ১৩৬৭ সালে তিনি দেওঘরে নিজের বাড়ীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। পাছে বাঙ্গালায় বাস করিলে আবার কন্যাটি অসুস্থ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় ঠাকুরদাদা স্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁহার স্থায়িভাবে বসবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

আমি এতক্ষণ যে সকল কথার আলোচনা করিলাম, এ সকল ঠাকুরদাদার সেবাধর্মের এবং শৈশবে মাতৃহারা সন্তানগণের প্রতি আন্তরিক স্নেহমমতার চরম দৃষ্টান্ত নয় কি?

১৩১০ সালে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে তিনটি শিশুসন্তান রাখিয়া চুঁচুড়ায় আমার মেজপিসীমা হেমমলিনী ৭ দিনের জ্বরে মারা যান। এই সন্তানগুলির লালন-পালন-ভার ঠাকুরদাদার ওপরেই পড়ে, তিনিই দৌহিত্রী দুইটির বিবাহ দেন।

দুই বৎসর পরে ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসে তাঁহার জীবনে এক বিষম দুর্ঘটনা ঘটে—কোননগরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা হরিপ্রসন্ন বসুর মৃত্যু হয়; তিনি তিন বৎসর রোগে ভুগিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুসময়ে ঠাকুরদাদা উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে জামাতার মৃত্যু হয়; ঠাকুরদাদা ভিন্ন বাড়ীর অন্য সকল পুরুষ যখন গঙ্গাতীরে শ্মশানে গিয়াছেন, তখন বড়পিসীমা হেমনলিনী আফিং খাইয়া বসেন। কিন্তু এই উপর্যুপরি বিপদেও ঠাকুরদাদা ধৈর্যচ্যুত হন নাই,—তখনই তিনি চিকিৎসক ডাকাইয়া কন্যাটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং সারারাত্রি ঘুম বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া টহল দেওয়াইয়া রাত কাটাইয়া দেন এবং তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন। কোননগর হইতে ছেলেদের কাছে ফিরিয়া ঠাকুরদাদা এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন যেন সংবাদপত্র পড়িতেছেন—সেই ধীর, স্থির, নির্বিকার—সেই অচল, অটল, গম্ভীর মূর্তি, শুধু ঠোঁট দুইটি নড়িতেছে। এরূপ দারুণ শোকে এই ধৈর্য-ও গাম্ভীর্য-ধারণ প্রকৃতই বিরল।

আবার এই ঘটনার দুই বৎসর পরে তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা, আমার মেজপিসেমশাই মণিলাল মিত্র এবং ১৩২১ সালে তাঁহার তৃতীয় জামাতা, আমার সেজপিসেমশাই কার্তিকচরণ ঘোষ দেহত্যাগ করেন। ঠাকুরদাদা এই দুই প্রবল শোকও অকাতরে বীরের ন্যায় সহ্য করিয়াছিলেন,

কিন্তু আমি ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম। তবে পিতামহের মৃত্যুর পর ২৫-এ আশ্বিন, ১৩২৪ তারিখে 'নায়ক'-এ তাঁহার সাহিত্যশিষ্য পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি লিখিয়াছিলেন দেখুন—

'অক্ষয়দাদা সময়ে লোকান্তরিত হইয়াছেন। দুই পুত্র রাখিয়া, পৌত্রদিগের মুখ দেখিয়া, সোণার সংসার পাতিয়া রাখিয়া তিনি সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর হিসাবে ইহা সুখের মৃত্যু—এমন মৃত্যুর জন্য আমাদের ক্ষোভ নাই। মরিতেই ত হইবে, এমনই ভাবে মরিতে পারিলে হিন্দু আমাদের মনে তেমন ব্যথাবোধ হয় না।

তাহার পর এত দিনে অক্ষয়দাদা জ্বালা জুড়াইলেন—অমরের শোক, জামাতৃশোক,—সকল শোকের হাত এড়াইলেন। সংসারে আসিয়া তাঁহাকে সকল রকমের সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। বাপ-মায়ের একপুত্র হইবার সুখ তিনি ষোলআনা ভোগ করিয়াছেন, তাহার পর পত্নীবিয়োগ হইতে জ্যেষ্ঠপুত্র বিয়োগ, জামাতৃবিয়োগ—বিয়োগের আর বাকি ছিল না।··· এতদিন পরে সব জ্বালাযন্ত্রণা শেষ হইল।'

৪

পরদুঃখানুভূতি, পরসেবাপরায়ণতা ও বন্ধুবাৎসল্য যে পিতামহের অন্তঃকরণে প্রবল মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, তাহার তিনটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সাহিত্যাচার্যের প্রতিবেশী ও পরমবন্ধু বামাচরণ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র ২৪ বৎসর বয়সে মারা গেলেন—প্রায় দুইমাস বসন্তরোগে পীড়িত হইয়া।—সর্বাঙ্গে দগ্‌দগে ঘা হইয়া গিয়া দেহের অনেক স্থান গলিয়া পচিয়া গিয়াছিল—দুর্গন্ধে রোগীর নিকট যাওয়া দায়। ঠাকুরদাদা রোগীকে প্রত্যহ দেখিতে যাইতেন। বাবার মুখে শুনিয়াছি, তিনি পিতার নিকট গিয়া জানাইলেন, মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া যাইবার লোকাভাব হইতেছে—তিনি কি শববাহক হইবেন; তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই ঠাকুরদাদা বলিয়া উঠিলেন, 'নিশ্চয়ই, দেরি ক'রো না—এখনি যাও।'

*

তাঁহার সেবাপরায়ণতার পরিচয় তিনি স্বয়ং পিতাপুত্রের শেষে উল্লেখ করিয়াছেন।

—ইংরাজিতে কয় পঙ্‌ক্তি লেখা পিতার একখানি কার্ড পাইলাম। ৺শ্যামাপূজার সময় তুমি বাড়ী আসিবে, এখানে বড় ওলাউঠা হইতেছে। তাঁহার হৃদয়ে ওলাউঠার ভাবগতি জানিতাম। বাড়ী আসিলাম। আসিয়া দেখি, পিতার মুখ আধখানা হইয়াছে। আমাদের কদমতলা পল্লী ও কাঁকশিয়ালি ওলাউঠায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশিনী একটি দুঃখিনী মুমূর্ষু অবস্থায়। সেবা পায় নাই, চিকিৎসা হয় নাই। নিজে তাহার ঘরদ্বার পরিষ্কার করিয়া দিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সেইদিনই বুঝা গেল, সে রক্ষা পাইল। পিতা এই সংবাদে মহা উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহার আনন্দে আমারও আনন্দ হইল।—

[এই পোস্টকার্ডখানি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।]

এই আনন্দের তিন দিন পরে পরম বিষাদপাত হইল—গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় বিসূচিকা রোগে মারা গেলেন, কিন্তু দুঃখিনী 'সুমী' আরও প্রায় ৮।১০ বৎসর জীবিত ছিল।

*

অশ্লীলতার ওপর সাহিত্যাচার্যের প্রবল বিরাগ ও ঘৃণার উল্লেখ করিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয় কবি নবীনচন্দ্রের নাম করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন নাই যে নবীনচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন সমবয়সী, দুইজনে এত ভালবাসা ছিল যে উভয়ে হরিহর আত্মা ছিলেন বলিলে বাড়াইয়া বলা হয় না। এরূপ বন্ধুবৎসলতা সাধারণতঃ দুর্লভ। একবার সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় চুঁচুড়ার একজন পটোর আঁকা 'দেবগোষ্ঠ' ছবি দেখিয়া কবিবর এতই মোহিত হন যে, স্ত্রীর ফটো আনাইয়া লইয়া সেই পটোকে দিয়া স্ত্রীর প্রমাণ মাপের তৈলচিত্র আঁকাইয়া লন। এই উপলক্ষে কবিকে মাসাধিক কাল সরকারদের কদমতলার বৈঠকখানায় বাস করিতে হইয়াছিল। তবে সাহিত্যাচার্য যে নবীনচন্দ্রকে নিজের সহোদর জ্ঞান করিতেন, অতিশয় ভালবাসিতেন তাহা সকলে জানিতে পারে যখন তিনি চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ

পড়িতে আরম্ভ করেন। বেশ গুরুগম্ভীর স্বরে, জোর গলায়, ধীরে ধীরে পড়িয়া যাইতেছিলেন—

—বাস্তবিক আমি চট্টগ্রামের প্রায় কিছুই জানি না। জানিতাম সেই একজনকে—চট্টগ্রামের একমেবাদ্বিতীয়ং সেই নবীনচন্দ্র সেনকে। জানিতাম কেন বলি, তাঁহার সহিত বিশেষ বন্ধুত্বই ছিল। কিন্তু সে নবীন ত আর নাই। শোককাহিনী আর বাড়াইব না। আমার বড় পান্‌সে চোখ,—

বলিয়াই ঝর্‌ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। মিনিট দুই পরে অল্প সাম্‌লাইয়া লইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

—আমার বড় পান্‌সে চোখ, অশ্রুবর্ষণী লেখনী এখনই সভা নষ্ট করিবে। বরং এমন করিয়া বলি, যিনি হাসিতে হয় হাসুন, আর যিনি কাঁদিতে হয় কাঁদিতে থাকুন। —আজি আমার এই কৃষ্ণমূর্তির বামপার্শ্বে সেই নবনীত-নিন্দিত-কান্তি, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, স্ফূর্তমুখশ্রী, সুবিন্যস্ত-কেশ-কলাপ, জলভরা—প্রাণভরা বিশাল চক্ষু, যদি বসাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আপনারা সেই অপূর্ব যুগল মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইতেন। কিন্তু সেই নিত্য-নবনীতশ্রী আর ত দেখিতে পাইব না।—

৫

ঠাকুরদাদার সূতিকাগারে একটি দুঃখজনক অথচ হাস্যোদ্দীপক ঘটনা ঘটিয়াছিল। একশত বৎসর পূর্বে পাকা ঘর অথবা মেটে ঘর আঁতুড়ের জন্য ব্যবহার হইত না। বাড়ীর অন্দরমহলের আঙিনার একপাশে লতাপাতার আচ্ছাদন দিয়া হাওয়াবাতাস না ঢোকে এমন একটুখানি ঝোপ্‌ড়ি বা ঘর মাটির ওপর তৈয়ার হইত, কেন-না আঁতুড় উঠিয়া গেলে, যেখানে আঁতুড় ঘর তৈয়ার হইয়াছিল, সেখান হইতে সাত কোদাল মাটি তুলিয়া ফেলিয়া দিলে তবে সেইস্থান পবিত্রীকৃত হইত। ঠাকুরদাদার সূতিকাগারও এইভাবে স্যাঁৎসেতে মাটির ওপর তৈয়ার হইয়াছিল।

২৭-এ অগ্রহায়ণ তাঁহার জন্ম, তখন পল্লীগ্রামে দারুণ হাড়ভাঙ্গা শীত। একদিন শেষরাত্রিতে যখন শিশুর বৃদ্ধা একচক্ষুহীনা ধাত্রীমাতা শিশুর মাথায় সেঁক দিতেছিল, তখন শিশু হঠাৎ অতিশয় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—বাড়ীর গৃহিণীদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রবীণা মুরুব্বিয়ানা চালে শয্যা হইতে বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে বাচ্চার বড় শীত ক'রছে, ভাল ক'রে চেপে চেপে সেঁক দে তো।' তৎক্ষণাৎ প্রবীণার আদেশ পালিত হইল, কিন্তু ধাইমা বুঝিতে পারিলেন শিশুর মাথায় সেঁক যত চাপিয়া চাপিয়া দেওয়া হইতে লাগিল, শিশুও তত বেশি বেশি জোরে চীৎকার করিয়া ক্রমে নীলবর্ণ ধারণ করিল। তখন গৃহিণীরা সকলে সেইখানে জড় হইলে দেখা গেল, যে-পুঁটুলি দিয়া মাথায় সেঁক দেওয়া হইতেছিল, তাহার সহিত একখানা জ্বলন্ত অঙ্গার রহিয়াছে—ধাত্রী দেখিতে পায় নাই। কি সর্বনাশ! শিশু বাঁচিয়া উঠিল বটে, কিন্তু যাঁহারা ঠাকুরদাদাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তাঁহার মাথার মধ্যস্থলের খানিকটা জায়গার রং আর্সোলার রংএর মত, আর তাহার মাঝখানে সবুজ রংএর একটা ছোট ফোঁটা ছিল।

এইখানেই বলিয়া রাখি, তখনকার সূতিকাগৃহের এই দুরবস্থা দেখিয়া ঠাকুরদাদা অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিতেন, ফলে তাঁহার সন্তানদের সূতিকাগৃহের জন্য দোতলায় রোদবাতাসভরা শয়নকক্ষ ব্যবস্থা করিয়া তিনি আত্মীয়-স্বজনের তথা প্রতিবেশীর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

*

আমার প্রপিতামহ গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় যে সামান্য কথায় রসের অবতারণা করিতে পারিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত পিতাপুত্রে আছে। একটি ঘটনায় ঠাকুরদাদা জড়িত ছিলেন বলিয়া আমি এখানে সেটিরও উল্লেখ করিতেছি।

একদিন সরকার মহাশয় তাঁহাদের বাড়ীর সদর দরোজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একটি ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মশাই, অক্ষয়বাবুর বাড়ী কি এইটি?' সরকার মহাশয় শিরঃ-সঞ্চালন-পূর্বক গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে, না।'

ভদ্রলোক ফিরিয়া ১০।১২ হাত চলিয়া গেলে তিনি হাকে ডাকিয়া নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখাইয়া সেইরূপ গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'দেখুন, এ বাড়ী অক্ষয়বাবুর নয়—এ বাড়ী তাঁর বাবার।' এবং সঙ্গে সঙ্গে 'অক্ষয় একবার বাইরে এস ত, এক ভদ্রলোক তোমাকে খুঁজছেন।' বলিয়া ডাক দিয়াই তাঁহার চিরাচরিত অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

*

ঠাকুরদাদাও যে ঠিক তাঁহার পিতার ন্যায় সামান্য কথায় এইরূপভাবে রসের সঞ্চার করিতেন, তাহারাও দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একদিন ৭।৮ বৎসরের একটি প্রতিবেশী বালক কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরদাদার কাছ দিয়া যাইতেছিল। তিনি সস্নেহে অথচ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, অমূল্য, কাঁদছিস কেন, কি হ'য়েছে?' কান্না আরও বাড়িয়া গেল; অমূল্য বলিল, 'দেশো আমায় "বাপতুলেছে"।' —ঠাকুরদাদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বালকটি রাগিয়া গিয়া বলিল, 'আমায় গাল দিয়ে অপমান ক'রল আর তাই শুনে আপনি হাসছেন?' তিনি পুনরায় অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, 'হাসছি কেন জানিস্? হাসছি আমার ছেলেদের কেউ কখনো "বাপতুলতে" পারবে না ব'লে।' ছেলেটি কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ে হতবাক্!

ঠাকুরদাদা বেশ মোটাই ছিলেন, আর অমূল্যজ্যেঠার বাবা আনন্দদাদা ছিলেন ছিপ্‌ছিপে মানুষটি!

*

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ঠাকুরদাদার হাতে তাঁহার 'কালিদাস ও ভবভূতি' বইখানি দিয়া অতিবিনয়ের সঙ্গে বলিলেন, 'আমার একান্ত অনুরোধ, বইখানি যেন আপনি আগাগোড়া পড়েন।' সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাদা সহাস্যে উত্তর দিলেন, 'আপনি ব্রাহ্মণ, প্রকারান্তরে আমার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছেন! ভাল!' আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোড়হাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। উপস্থিত সকলে প্রবল বেগে হাসিয়া উঠিলেন। বইখানি ছিল আকারে কিছু মোটা—হয়ত ২০০।২৫০ পৃষ্ঠার বই। ঠাকুরদাদার সমালোচনার মধ্যে এইরূপ স্বল্প কথায় প্রচ্ছন্ন রসাভাবের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

*

ঠাকুরদাদা মধ্যাহ্নে দোতলায় নিজের শয়নঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন, বাবা সেখানে উপবিষ্ট। কে-যেন আসিয়া সংবাদ দিল সুরথবাবু তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, বারবাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো।' সুরথবাবুকে দরোজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, 'আপনি কাপড় প'রে এসেছেন, দেখছি; কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হাতে। বসুন।' বাবা ত বিস্ময়ে নির্বাক্।—সুরথবাবুর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া পিতার এ কি অদ্ভুত উক্তি!

একটু গোড়ার কথা বলি। সুরথলাল বসু ঠাকুরদাদার জ্যেষ্ঠ জামাতার দাদা; তিনি ডাক্তার। তখন সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কখনও ডাক্তারবাবুকে সরকার বাড়ীতে আসিতে দেখা যায় নাই। আর হুগলীর ইটাচোনার স্বনামধন্য, গণ্যমান্য ব্যবসায়ী বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু ছিলেন ঠাকুরদাদার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি; তখন অনেকেই জানিত যে কুণ্ডু মহাশয় ঠাকুরদাদাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন।

একঘণ্টা ধরিয়া পারিবারিক নানা সাধারণ কথাবার্তা হইল, কিন্তু ডাক্তারবাবু কাপড় পরিয়া আসায় যে কি গোলযোগ ঘটিয়াছে বা তিনি কি কারণে সরকার বাড়ী আসিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোন কথার উত্থাপনই হইল না। তিনি জলযোগ করিয়া বিদায় লইলে বাবা ঠাকুরদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা কি। তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, 'কিছুই বুঝতে পারিস্‌নে বুঝি? বিজয়নারায়ণবাবুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য একজন ডাক্তার চাই—কাগজে বিজ্ঞাপন বার হ'য়েছে, তাই আমাকে সুপারিশ ধ'রতে আমাদের বাড়ীতে সুরথবাবুর এই প্রথম পদার্পণ।' বাবার মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুরদাদার এই অদ্ভুত inference ও intuition-এর

পরিচয় পাইয়া তাঁহারা সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন, আর এই প্রসঙ্গ লিখিতে গিয়া আজ আমিও কি কম অভিভূত, বিস্মিত, আনন্দিত।

*

কাকার বিবাহ। গায়েহলুদের ঠিক আগের দিন এক বিভ্রাট ঘটে। ঠাকুরদাদার স্বাক্ষরিত ৫০০৲ টাকার একখানি চেক্ লইয়া বাবা ও তাঁহার একজন প্রতিবাসী বন্ধু চুঁচুড়া হইতে সকাল ৮৷৷৹ টার ট্রেনে কলিকাতায় গেলেন গায়েহলুদের যাবতীয় বাজার করিতে। চেকের সই না মেলায় টাকা সংগ্রহ করিতে তাঁহাদের বেলা ৪টা বাজিয়া যায়। তখন রাত্রি ১২টা-১টায় শিয়ালদা হইতে একখানা ট্রেন ছাড়িত, তাঁহারা সেই ট্রেনে কাঁকিনাড়ায় আসিয়া, মাঝির ঘুম ভাঙ্গাইয়া নৌকা করিয়া গঙ্গাপার হইয়া যখন বাড়ী পৌঁছিলেন, তখন কাঁকিনাড়ার চটকলে ৩টার বাঁশী বাজিতেছে। পরদিন গায়েহলুদ—সরকার বাড়ীতে লোক আর ধরে না। সদর দরোজা এবং ভিতর বাড়ীতে ঢুকিবার দরোজা দুই বন্ধ করা হয় নাই—ভেজানো আছে। সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ, যে যেখানে একটুখানি জায়গা পাইয়াছে, সে সেইখানেই শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে—সারা বাড়ী ঘুমে অচেতন।

বাবা বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই দেখিলেন, ছাদের ওপর নিচু আল্‌সের ধারে খাড়া হইয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা বসিয়া আছেন; সেখান হইতে ভিতর বাড়ীর দরোজা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। দরোজা খোলার শব্দ শুনিয়াই ঠাকুরদাদা আল্‌সের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সয়লা এলি?' (বাবার ডাকনাম ছিল সয়লা)—তখন কণ্ঠ তাঁহার ব্যাকুলতা ও কাতরতায় গদ্‌গদ—বিকম্পিত। সন্তানের অমঙ্গল-আশঙ্কা অতবড় সাহসী, তেজস্বী, নির্ভীক পুরুষকেও বিনিদ্র অবস্থায় পথপানে নিবদ্ধদৃষ্টি করাইয়া সারারাত ঠায় বসাইয়া রাখিয়াছিল।

*

কাকার বিবাহের একটা কথা বলা হইল, এইবার বাবার বিবাহের অন্ততঃ একটা কথা না লিখিলে ভাল দেখায় না। এই কথা বলিয়াই আমার বলা শেষ করিতেছি।

আষাঢ় মাস। দারুণ গরম—বিকট গুমোট। বিশ্বকোষ-প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব পূজনীয় নগেন্দ্রনাথ বসুর কন্যার সহিত বাবার বিবাহ। প্রেসবাড়ীর সুদীর্ঘ হলে বরবেশে তিনি উপবিষ্ট। উভয় পক্ষীয় নিমন্ত্রিত সাহিত্যসেবি-সমাগমে হলঘর গম্‌গম করিতেছে। বরকর্তা ঠাকুরদাদাও আসরে উপস্থিত আছেন। রাস্তার লোকে বলাবলি করিতেছে, আজ এখানে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ সভা আছে—নৈলে এত সাহিত্যিকের জটলা কেন।

এমন সময় আসরে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একি! আপনার পায়ে মোজা কেন?' নটগুরু সোজাসুজি উত্তর না দিয়া দীনেশচন্দ্রকে পাল্‌টা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, আমার পায়ে মোজা কি কখন দেখেন নি?' দীনেশচন্দ্র উত্তর দিতে-না-দিতেই ঠাকুরদাদা গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ, আমি দেখেছি, তবে সে একপায়ে!' গিরিশচন্দ্র হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন। ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া সকলে স্তম্ভিত। শেষে দীনেশচন্দ্রের অনুরোধে ঠাকুরদাদা হেঁয়ালি ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন যে, 'সধবার একাদশী'র অভিনয়ে মাতাল নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশবাবু একপায়ে মোজা পরিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন। উপস্থিত সকলে, এমন কি যিনি বর-না-চোর—তিনিও, হাসিয়া উঠিলেন। আমিও এখানে মধুরেণ সমাপয়েৎ নীতি অবলম্বন করিলাম।

ঠাকুরদাদা, প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তোমার তিরোধান হইয়াছে; আজ তুমি যেখানেই থাক-না-কেন, আশীর্বাদ কর, তোমার এই নাতিটি তোমাদের সুনামে যেন কখন কলঙ্ক-কালিমা না মাখায়।

সরকার বাড়ী
কদমতলা, চুঁচুড়া
৩ মাঘ ১৩৬৯

শ্রীঅজিতচন্দ্র সরকার

গ্রন্থরাজির বিশ্লেষণ

১ পিতাপুত্র-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। ইহাতে আছে—সাহিত্যাচার্যের পিতৃদেব গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের ও তাঁহার নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী, এবং উভয়ের জীবনের যে ভাগের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ তাহার বিশদ বিবরণ। এই জীবনী লিখিতে গিয়া সেই সময়ের, উনবিংশ শতকের মধ্যসময়ের, শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বহুতর বিষয়ের আলোচনা অতি সুন্দর, সুললিত ভাষায় করা হইয়াছে। এক শত বৎসর আগেকার বাঙ্গালার একখানি হুবহু ছবি নিপুণ শিল্পীর তুলিতে চিত্রিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু সাহিত্যাচার্যকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে মুদ্রিত হইল।

কলিকাতা
২৩এ কার্তিক ১৩১১

ভায়া,

…এমন অপূর্ব পিতাপুত্র আমি দেখি নাই। আমাদের মধ্যেও এমন পিতাপুত্র দেখি নাই। পিতা পিতা বটেন, অথচ যেন পুত্র। পুত্র পুত্র বটেন, অথচ যেন পিতা। পিতা পিতা বটেন, অথচ যেন ভাই। পুত্রও পুত্র বটেন, অথচ যেন ভাই। পিতা পিতা বটেন, অথচ যেন বয়স্য। পুত্রও পুত্র বটেন, অথচ যেন বয়স্য। পিতা পিতা বটেন, অথচ কি নহেন তাহা বলিতে পারি না,—হাড়ে হাড়ে বুঝি যেন সবই। পুত্রও পুত্র বটেন, অথচ কি নহেন তাহা বলিতে পারি না,—হাড়ে হাড়ে বুঝি যেন সবই। পুত্র পিতাকে ভক্তি করেন, পিতাও পুত্রকে ভক্তি করেন। পিতাপুত্রের এরূপ মিশ্রণ আমি আর দেখি নাই। এরূপ অপূর্ব মিশ্রণ দেখি—ঠিক কথা বলিব—হাসিও না—দেবতার মধ্যে, হরগৌরীতে, কৃষ্ণকালীতে, কৃষ্ণরাধায়। পিতাপুত্রের এরূপ মিশ্রণ মনুষ্য-মধ্যে একটা ঘটনা। এরূপ ঘটনার তোমার লিখিত কাহিনী মানব-সাহিত্যে বোধ হয় আর নাই। জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মকাহিনীতে বাপের গৌরব দেখি। কিন্তু পুত্র অক্ষয়ের পিতা গঙ্গাচরণের কথার সহিত তুলনায় তাহা উল্লেখযোগ্যই নয়। 'পিতাপুত্র'-এ বাঙ্গলা সাহিত্য অতুলনীয় সামগ্রী পাইয়াছে এবং বাঙ্গালী জীবনপথে অমূল্য আদর্শ লভিয়াছে।

সুখ্যাতি করিতে বারণ করিয়াছ। তাই সুখ্যাতি করিলাম না। সত্যমাত্র জ্ঞাপন করিলাম।

তোমার দাদা শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

২ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ—এই সংকলনে সাহিত্যাচার্যের সর্বোৎকৃষ্ট গুরুগম্ভীর রচনাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে,—যেমন উদ্দীপনা, দশমহাবিদ্যা, গগন-পটো, বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম, পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব, বঙ্কিমচন্দ্র, হিমালয় বনভূমি—দার্জিলিং, উলা বা বীরনগর প্রভৃতি। আর ইহার মধ্যেই 'তুকারাম ও চৈতন্যদেব' নামে অপ্রকাশিতপূর্ব রচনাটিও মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেগুলি ১২৮১ সালের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল, সেইগুলির সম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

'…এমন অনেক পাঠক থাকিতে পারেন যে, অক্ষয়বাবুর বিশেষ পরিচয় জানেন না। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিব যে,…তাঁহার প্রণীত প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্যলেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।'

৩ পূজার গল্প ও কৌতুককৌমুদী—সাহিত্যাচার্যের মৃত্যুর অল্পদিন পরে 'মোতিকুমারী' নামে একখানি বই ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে ছিল—'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত 'মোতি-কুমারী' নামে Haggard-এর Pearl Maiden নামক উপন্যাসের ভাবানুসরণ, 'পূজার গল্প' অভিধেয় একটি মনোরম ছোটগল্প এবং ৫টি রসরচনা। এবার মোতিকুমারী গল্পটি অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার-এ মুদ্রিত হইল না। গ্রন্থের গোড়ায় পূজার গল্পটিকে স্থান দিয়া, ঐ ৫টি রচনা লইয়া এবং ৫টি নূতন হাস্যরসাত্মক রচনা যোগ করিয়া সংকলনটির এই নূতন নামকরণ হইল।

'রূপক ও রহস্য'-এর অন্তর্গত অনেকগুলি রচনা এই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত, কিন্তু সেইগুলিকে আর ঠাঁইনাড়া করা হয় নাই। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় 'পঞ্চানন্দ' শীর্ষক রসরচনা রসরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবন্ধে তাঁহার নাম ছাপা হইত না। সাহিত্যাচার্যও বঙ্গবাসীতে মাঝে মাঝে 'পঞ্চানন্দ' লিখিতেন, —তিনিও প্রায় নিজের নাম লিখিতেন না, কখন কখন 'বঙ্গবিলাস সমজ্‌দার'—এই ছদ্ম নাম থাকিত। 'হাতে হাতে ফল' নামে একখানি প্রহসন সাহিত্যাচার্য ও ইন্দ্রনাথ একযোগে লিখিয়াছিলেন; এই পুস্তকখানি বঙ্গবিলাস সমজ্‌দার-প্রণীত বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। পঞ্চানন্দে লেখকের নাম মুদ্রিত না থাকায় সাহিত্যাচার্যের লিখিত ৫টি রচনা বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী'তে ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে একটি 'নাত্‌নীর ভাবনায় পঞ্চানন্দ'-এর লেখকের নিজের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি তাঁহার কদমতলার বাড়ীতে আজও রক্ষিত আছে। পঞ্চানন্দের এই ৫টি প্রবন্ধের মধ্যে ৪টি এই সংকলনে এবং ১টি 'দেশাত্মবাদ'-এ যোজিত হইয়াছে। কমলাকান্তের দপ্তর সাধারণের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য বিবেচনা করায় কমলাকান্তের দপ্তর হইতে 'চন্দ্রালোকে' রচনাটিকেও সাহিত্যসম্ভারে পুনর্মুদ্রিত হইল।

বঙ্গসাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম প্রকাশ সম্ভবতঃ 'পূজার গল্প'—১২৯৩ সালে 'নবজীবন'-এর ৩য় বর্ষে। ৭০ বৎসর পূর্বে লেখা হইলেও ইহাতে ছোটগল্পের সমস্ত গুণই—সকল লক্ষণ ও বিশেষত্বই—পুরো মাত্রায় বর্তমান। ৪. ৮. ১৩২৪ তারিখের দৈনিক 'বসুমতী'তে লিখিত হইয়াছিল—'পূজার গল্প' চমৎকার রচনা। গল্পে যে অক্ষয়বাবুর এমন কৃতিত্ব ছিল, অনেকে জানিতেন না। এ যেন নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত মনোরম চিত্র—মৌলিকতায় মনোহর—খাস বাঙ্গালার নিখুঁত ছবি।'

সাহিত্যাচার্যের রসরচনাগুলি ব্যঙ্গে উজ্জ্বল, হাস্যে মধুর, গাম্ভীর্যে গভীর, রসে ভরপুর—আন্তরিকতায় টল্‌মল। রসরচনায় তাঁহার বৈশিষ্ট্যের কথা অজরচন্দ্র রূপক ও রহস্যের 'গ্রন্থপরিচয়'-প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তবু একটি বিষয়ে আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দিনকাল এমনই পড়িয়াছে যে, রসের কথা খোলাখুলি বুঝাইয়া না দিলে কেহ রস বুঝিতেই পারেন না। 'হলধর ঘটক', 'কুঞ্জ সরকার' যে, কোন দিনই মর্ত্যভূমি পবিত্র বা অপবিত্র করেন নাই, এ কথা উল্লেখ না করিলে চলিবে কি? তাঁহারা যে শুধুই রসের মূর্তি—ব্যক্তিবিশেষ নহেন, এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবার একটু গূঢ় তাৎপর্য আছে। রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই-এর আদর্শে সাহিত্যাচার্য নবজীবনে 'দিগম্বর ভট্টাচার্য' নামে একটি প্রবন্ধে লেখেন—দিগম্বর ভট্টাচার্য যেন রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ব্যক্তি, তিনি যেন রাজার ব্রহ্মসঙ্গীতের শক্তিবিষয়ক পাল্‌টা জবাব দিতেন। বিড়ম্বনা দেখুন—বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর গান'-এ দিগম্বর ভট্টাচার্যের জীবনী ও গান ছাপা হইয়া গেল! কিমাশ্চর্যং অতঃপরম্‌!

'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিয়াছিলেন —'অক্ষয়চন্দ্র জাত্‌ সমালোচক। সমালোচক বলিয়াই তিনি সাধারণ্যে সুপরিচিত। কিন্তু তিনি যে রসপূর্ণ গল্প লিখিতে পারিতেন, এ সংবাদ বোধকরি অনেকেই জানেন না।' আর ২৪. ১১. ১৯১৭ তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—...The style throughout is humorous as a sparkling fountain, picturesque as an evening sky and musical as a rippling. ...

৪ সমালোচনা—যে ছোটবড় প্রায় ৪০টি রচনা এইভাগে সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলিকে 'প্রবন্ধ ও নিবন্ধ' বা 'অনুশীলনী'-ভুক্ত করা হয় নাই। বঙ্গদর্শন, নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন, নবজীবন, জাহ্নবী, আর্যাবর্ত, ভারতবর্ষ, মৃন্ময়ী, বসুধা, সাহিত্য, পূর্ণিমা, জন্মভূমি প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় সমুদয় দীর্ঘ সমালোচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আর 'বঙ্গদর্শন' ও 'পূর্ণিমা'য় প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত সমালোচনার নির্বাচিত অংশও ইহাতে আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্যাচার্যের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত 'সমালোচনা'-প্রসঙ্গে তাঁহার সমালোচনাশক্তির পরিচয়জ্ঞাপক বহু উদাহরণ ইতিপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সাহিত্যাচার্য তাঁহার সাহিত্য-জীবনে তিন শতাধিক পুস্তক, পুস্তিকা ও মাসিক পত্রিকার সমালোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, তিনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সমালোচক। সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সেই সার্থক উক্তি 'অক্ষয়চন্দ্র জাত্ সমালোচক' আবার মনে পড়িতেছে।

৫ সনাতনী—যাঁহারা কিঞ্চিৎ সনাতনপন্থী তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, 'সনাতনী'ই অক্ষয়চন্দ্রের অক্ষয় রচনা, শ্রেষ্ঠ অবদান, বঙ্গভাষার অতুল্য সম্পদ্। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার অনাবিলতায়, চিন্তার গভীরতায়, সামাজিক বিচার-বিশ্লেষণে, সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন মতবাদ-নিরপেক্ষতায় এবং সনাতন ধর্মের ঐকান্তিকতায় এই গ্রন্থ যে সাহিত্যাচার্যের অপূর্ব, অনুপম, অভূতপূর্ব সৃষ্টি, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। সনাতনপন্থী না হইয়াও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বিলাতফেরৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সনাতনী-পাঠে মুগ্ধ হইয়া অযাচিত-ভাবে সাহিত্যাচার্যকে লিখিয়াছিলেন—

'সুরধাম' নন্দকুমার চৌধুরীর লেন
কলিকাতা—১লা মার্চ—১৯১২

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার 'সনাতনী' আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি। এ প্রকার পুস্তক বহুকাল পড়ি নাই। কাজের কথা, ধর্মের কথা, সার কথা, দেশের হিতের কথা সনাতনীতে আছে। এবং এমনভাবে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা হইয়াছে, যাহাতে মনে হয়, দেশের শিক্ষিত চিন্তাশীল ধর্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রই 'সনাতনী'-পথ অনুসরণ করিবে। পুস্তকখানি মনোযোগপূর্বক আদ্যোপান্ত পড়িলে লেখকের ঐকান্তিকতা, আগ্রহপূর্ণ সরলতা এবং ধর্মনিষ্ঠার প্রভাব পাঠককে অনুপ্রাণিত ও শ্রদ্ধান্বিত করে। সনাতনী পড়িয়া ইহাও মনে হয়, যেখানে ধর্ম আছে সেখানে সবই আছে। আজ আমাদের দেশে ধর্ম বড়ই ক্ষুণ্ণ—তাই সাহিত্য নিষ্প্রভ, প্রাণহীন; জীবন মলিন ও অপ্রফুল্ল; সর্বকার্যে প্রায় অসরলতা, কপটতা। মানুষ সদাই ভীত, চিন্তাকুল—আমার কি হইবে, আমার ছেলের কি হইবে এই ভাবনাতেই ব্যাকুল। জীবনে ভগবানের উপর নির্ভরতা চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং নিজের ভাবনাতেই আকুল। সর্বকাজেই নিরুৎসাহ আসিয়া দেখা দেয়। আমরা এখন ভগবান্—ঈশ্বরের ঐশ্বর্যে অবিশ্বাসী; বিশ্বাস, অনুরাগ, আস্থা, শ্রদ্ধা কেবল পার্থিব ধনে—সচ্চরিত্রে, সত্যনিষ্ঠায় শ্রদ্ধা নাই;—যাহাকিছু আশাভরসা ধনোপার্জনে, যাহাকিছু সম্মান ও সমাদরো ধনীর চরণযুগলে। আর সে চরণযুগল স্বর্ণবণিকেরই হউক না কেন বা তৈলজীবীরই হউক কেন। যে সমাজে গুণের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া ধনের গৌরবকে বর্ধিত করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে, সে সমাজে কোনপ্রকার প্রকৃত হিতকর কার্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; সাহিত্য তো কখনই উন্নত বা পরিপুষ্ট হইতে পারে না।

আপনার 'সনাতনী' আমি পড়িয়াছি, আমার সহধর্মিণী ও কন্যাও পড়িয়াছেন। আমার বন্ধুবর্গকেও পড়িতে অনুরোধ করিয়াছি। আমার বড়ই ইচ্ছা যে এই পুস্তকখানি F.A. ও B.A. ক্লাশের বাঙ্গালার Text book বা Syllabus-এর মধ্যে থাকে। এই সনাতনীর সমালোচনা, চর্চা বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী এবং মাসিক পত্রিকাতে অন্ততঃ বৎসরখানিক ধরিয়া প্রকাশিত হউক। আমি এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিব।

ভবদীয়
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[এই চিঠিতে শব্দের নিচের লাইনগুলি লেখকের নিজের হাতে টানা। 'পরিশিষ্টে' 'জীবন সরকার-সম্বন্ধে Mr. D. L. Roy-এর টিপ্পনী' দ্রষ্টব্য।]

৬ স্মৃতিতর্পণ—মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, কবি নবীনচন্দ্র, হিন্দুহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র, দ্রবময়ী চণ্ডালিনী প্রভৃতি ৮টি পরলোকগত ব্যক্তির উদ্দেশে লিখিত মর্মন্তুদ, হৃদয়দ্রাবী, অশ্রুঝরা শোকগাথাগুলি পড়িলে বুঝা যায় সাহিত্যাচার্যের প্রাণ কিরূপ কুসুমকোমল ছিল; সামান্য নিরাভরণা পল্লীরমণী চণ্ডালীর জন্যও তাঁহার প্রাণ লেখনীমুখে অশ্রুপাত করিত।

—সর্দারনী যখন বিশ বৎসর পূর্বে আমাকে এই গল্প বিবৃত করে, তখন তাহার পদ্মপলাশলোচন অশ্রুপূর্ণ হইয়া-

ছিল ; আমি আজি লিখিবার সময়ে অশ্রুবিসর্জন করিতেছি। কেন, তোমরা বলিতে পার ?—

প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিয়াছেন, 'যে-দিন বাঙ্গালী এই "কেন" বুঝিবে, সে-দিন বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয়ে বাঙ্গালীরই নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইবে।'—যথার্থ উক্তি।

২৫.৭.১৮৮০ তারিখে প্রজাবন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুতে 'সাধারণী' পত্রিকায় সাহিত্যাচার্য লিখিয়াছিলেন,—

—নীলদর্পণের প্রণেতার জন্য দরিদ্র প্রজারা কাঁদিতে থাকুক, লীলাবতীর জনকের জন্য কুলীনকন্যা কাঁদিতে থাকুক, আমরা দীনবন্ধুবাবুর জন্য কাঁদিতে থাকি।—

'পৃথিবীর সুখদুঃখ'-এ মনীষী চন্দ্রনাথ বসু ছোট একটি ছত্রে সাহিত্যাচার্যের হৃদয়ের যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন—'অক্ষয়চন্দ্রের হৃদয় যে অতলস্পর্শ।'

৭ রূপক ও রহস্য—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার-লিখিত 'গ্রন্থ-পরিচয়' অতি উপাদেয় প্রবন্ধ ; সুন্দর, সহজ ভাষায় তিনি গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পিতৃদেবের পরিচয় পরিষ্কাররূপে দিয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতার সহিত এবং পিতার প্রণীত রচনাগুলির সহিত পাঠককে ভালভাবে পরিচিত করাইবার যে প্রভুত চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

এইরূপ রসরচনাবলির একত্র সমাবেশ বাঙ্গালা সাহিত্যে ভূতপূর্ব বলিয়া পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে সাহিত্যসমাজে প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—সকল সংবাদপত্র ও মাসিক-পত্র একবাক্যে ইহার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিল। 'বঙ্গবাসী'র সুদীর্ঘ সমালোচনার মধ্যে লিখিত হইয়াছিল (৮.৮.১৩৩০)—

'বঙ্গের সাহিত্যশার্দূল স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন ঢের, কিন্তু তাঁহার খুব কম লেখাই পুস্তকাকারে সুরক্ষিত আছে। সম্প্রতি অক্ষয়চন্দ্রের কতকগুলি অমূল্য লেখা একত্রিত অবস্থায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, কারণ সেসব লেখা পুস্তকাকারে উদ্ধার করা যদি না হয়, তাহা হইলে এ সকল লেখা-লোপের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু অমূল্য রত্ন লোপ পাইয়া যাইবে। তাই আজ অক্ষয়চন্দ্রের এই নূতন গ্রন্থ-প্রকাশে এত আনন্দ হইল ; ...।'

আর ২৫.৪.১৩৩০ তারিখের 'বিজলী'-তে প্রকাশিত হইয়াছিল—

'রূপক ও রহস্যের প্রবন্ধ ও কবিতাগুলো বহুপূর্বের পুরাতন লেখা হইলেও চিরন্তন সত্যের নূতনত্বে মণ্ডিত। আমাদের জাতিগত দুর্বলতার অনেক ঔষধ তিনি হাসির আবরণে—চিনির আবরণে কুইনাইনের মত দিয়েছেন। রূপক ও রহস্য ত্রিফলার মত ত্রিদোষনাশক,—এতে আধি-ভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভণ্ডামীর তিন রকম "মেকীর"-ই উপকার হ'বে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে রূপক ও রহস্য অমর হ'য়ে থাকবে।'

রূপক ও রহস্যে ৩৬টি রচনা পূর্বে স্থান পাইয়াছিল, এখন দয়া পাগলিনী, ধূপছায়া প্রভৃতি আরও ৫টি প্রবন্ধ ইহাতে সংযোজিত হইল।

৮ উদ্ভট কথা—'নবজীবন'-এর ২য় ও ৩য় ভাগে লিখিত হইয়াছিল। সহজ, সরল ভাষায় মনস্তত্ত্বের প্রগাঢ় চিন্তাপূর্ণ চুলচেরা আলোচনা করিয়া সাহিত্যাচার্য গ্রন্থশেষে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

মহর্ষি পতঞ্জলের মতে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যোগের এই আটটি অঙ্গ ক্রমে ক্রমে সাধনা করিতে হয়। ঐগুলি জাতি, দেশ, কাল, সময়—এ সকল নির্বিশেষে সার্বভৌম মহাব্রত—সর্বাবস্থায় একান্ত অনুপালনীয়। সব শেষে লিখিত হইয়াছে—

—আমরা আত্মশক্তিতে দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসবান্ হই, ইহাই আমাদের প্রার্থনা,—আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে আমরা আত্মশুদ্ধির জন্য যত্নবান্ হই, ইহাই আমাদের প্রার্থনা—কেবল যোগেযাগে হঠাৎ যোগী হইব, এরূপ ধারণায় বিড়ম্বিত না হইয়া আমরা যাহাতে যম-নিয়মাদির ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া নষ্ট মনুষ্যত্ব পুনর্লাভ করি, তাহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।—

৯ কবি হেমচন্দ্র—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

নং ৩৫। হেমচন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির সভাপতি রাজশ্রী প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে লিখিত এবং গ্রন্থস্বত্ব সমিতিতে অর্পিত হইয়াছিল। গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা'য় সাহিত্যাচার্য লিখিয়াছিলেন—

—কীর্তির্যস্য স জীবতি। কীর্তিই জীবন। মহাপুরুষগণের কীর্তি-কীর্তনই তাঁহাদের প্রকৃত জীবনী। কবির কবিত্ব-কীর্তনই কবির জীবনী। প্রধানত সেইরূপ জীবনী লিখিতেই চেষ্টা করিয়াছি।—

বিদেশীর প্রতি ঘৃণা, দ্বেষ, বিরূপতা বা এককথায় জাতি-বৈর এবং স্বাদেশিকতা, স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশভক্তি বা এককথায় প্রকৃত দেশাত্মবোধ—এই দুই বিশিষ্ট ভাবধারার তুলনা ও বিবৃতি 'কবি হেমচন্দ্র'-এর বিশেষত্ব। ফলে গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে সাহিত্যাচার্যের প্রকৃত স্বদেশানুরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১০ অনুশীলনী—পশুবৃত্তি, অহঙ্কার, কৃষ্ণনগরের রাজবংশ, চাকরি—মুসলমান ও ইংরাজ আমলে সেনাবিভাগে, মুসলমান রাজত্বে হিন্দুর প্রভুত্ব, মনুষ্যের ভোজ্য, বিদেশে ও স্বদেশে প্রভৃতি প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। পড়িলেই বুঝা যাইবে, এই লেখাগুলির সঙ্গে প্রবন্ধ ও নিবন্ধভুক্ত লেখাগুলির বিশেষ পার্থক্য আছে।

১১ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন-উপলক্ষে লিখিত **তিনটি অভিভাষণ**—প্রথম অভিভাষণটি চুঁচুড়ার পঞ্চম অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি (১৩১৮), দ্বিতীয়টি চট্টগ্রামের ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি (১৩১৯) এবং তৃতীয়টি কলিকাতার সপ্তম অধিবেশনে অব্যবহিত পূর্ববর্তী অধিবেশনের প্রাক্তন সভাপতি-কর্তৃক পঠিত হয় (১৩২০)। তিনটি অভিভাষণই দেশাত্মবোধে ওতপ্রোত আর কপালে করাঘাতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

১২ কিশোর সাহিত্য—'আলোচনা' (১২৮৯), 'সাহিত্য-সাধনা' (১৩৩০); 'সাহিত্য-পাঠ' (২য় সংস্করণ, ১৩৩১)—এই তিনখানি বই-ই সাহিত্যাচার্যের যাবজ্জীবন লিখিত রচনারাশির মধ্যে যেগুলি কিশোর ও বালকগণের পাঠোপযোগী সেইগুলির সংকলন, এবং ছেলেদের জন্য বিশেষভাবে লিখিত কতকগুলি রচনার সমষ্টি। ঐ সকল সংকলিত মূল প্রবন্ধগুলি সাহিত্যসম্ভারে যথাযোগ্য স্থানে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া এই তিনখানি পুস্তক গ্রন্থাবলিতে স্থান পায় নাই, তবে কিশোরগণের পাঠোপযোগিরূপে লিখিত গদ্য- ও পদ্য-রচনাগুলি এইবিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩ ম্যাকবেথ ও হ্যামলেট—'নবজীবন'-এর ৪র্থ ও ৫ম ভাগে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাকে আমরা 'সমালোচনা'র অন্তর্ভুক্ত করিতেও পারিতাম—কি অপূর্ব চুলচেরা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচন, অনুশীলন ও বিচার-বিশ্লেষণ।

সাহিত্যাচার্য সেক্সপিয়ারের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার গ্রন্থাবলি অবহিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত তিনি যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এই ক্ষুদ্র পুস্তক তাহারই পরিচায়ক।

জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরচন্দ্র তখন বৈদ্যনাথ-দেওঘরে ছিলেন; সাহিত্যাচার্য তাঁহাকে পত্রে লিখিলেন—

—সয়লা অচুকে * পড়াইবে ও লিখাইবে। বাঙ্গালা বই সকলকে শুনাইয়া পড়িবে। ইংরাজি Shakespeare নিজে নিজে পড়িবে। প্রথমে ভাল লাগিবে না, এখানটা-সেখানটা পড়িবে, তিন দিনের দিন ভাল লাগিতেই হইবে। কোন্‌টা কাহার ভাল লাগিবে তাহা বলা যায় না, কিন্তু কোনোটা-না-কোনোটা ভাল লাগিতেই হইবে। Try first second class plays—Julius Cæsar, Romeo Juliet, Antony and Cleopatra. দেওঘরে ইংরাজি বাঙ্গালা কেতাবের অভাব নাই। রাজনারায়ণবাবু, গঙ্গাধরবাবু * ইহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বহি পড়িবে।—

ম্যাকবেথ ও হ্যামলেটের একস্থানে সাহিত্যাচার্য লিখিয়াছেন—

—পাপের পরিণাম প্রদর্শন উভয় নাটকেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। ম্যাকবেথ নাটকে পাপের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি,

* 'সয়লা'—অজরচন্দ্রের ডাকনাম, 'অচু'—কনিষ্ঠপুত্র অচ্যুতচন্দ্রের। রাজনারায়ণ বসু—শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ, সুসাহিত্যিক ও প্রচ্ছন্ন প্রগাঢ় রাজনৈতিক। গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়—তখনকার ভবানীপুর এল. এম. এস. কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক—এককালে শত শত ছাত্র যাঁহার Grammar and Composition পড়িয়া ইংরাজী শিখিয়াছিল।

আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে দেখানো হইয়াছে—দুঃখজনকতা গৌণভাবে আছে। হ্যামলেট নাটকে পাপের আধিপত্য, দুঃখজনকতা, সংক্রমণ বিশেষরূপে দেখানো হইয়াছে—পরিপুষ্টি গৌণভাবে আছে। আধিপত্য উভয়েই সমান; পরিণাম একরূপ হইয়াও স্বতন্ত্র।—

আর গ্রন্থ শেষ করা হইয়াছে,

—আপাতত সেক্সপিয়ারের ঐ মূল মন্ত্র মনে রাখিলে আমরা ইউরোপীয় দর্শনবিদ্যারূপিণী ডাইনীর রক্তশোষণ হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইতে পারি। মন্ত্রটি আবার বলি,

স্বর্গে মর্ত্যে কত বস্তু দেখ বিদ্যমান,
স্বপ্নের বিজ্ঞান তার না পায় সন্ধান।

১৪ দেশাত্মবাদ—ইহাতে মাত্র ছয়টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে—দিল্লীর প্রথম দরবার (ইংরাজের আমলে), অভাগা মলহার রাও, কল্পিত রাজভক্তি, স্বাভাবিক নেতা, প্রার্থনা (লর্ড লিটন-সমীপে), স্বদেশী এবং বিগতবর্ষ (১২৮৩)। তবে দিল্লীর প্রথম দরবার স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে পারিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির সম্বন্ধে আমরা শুধু বলিতে চাই যে, ইহার প্রতি ছত্র দেশাত্মবোধে ওতপ্রোত। 'কবি হেমচন্দ্রের' পরিচয়-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, জাতি-বৈর ও প্রকৃত দেশাত্মবোধ এক নয়। সাহিত্যাচার্যের লেখার মধ্যে যে জাতি-বৈর কোথাও দেখা যায় না, এমন কথা আমরা বলি না, তবে যেটুকু দেখা যায়, সে কেবল স্বদেশবাসীকে সচেতন করিবার প্রয়াস—ঠিক জাতি-বৈর নয়। 'মহাপূজা'য় শ্রীদুর্গাকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিয়া বসিলেন—

—তোমার অনন্ত লীলা—তুমি সিংহবাহিনী; শ্বেত সিংহে ভর করিয়া আমাদের সর্বস্ব হরণ করিয়াছ, বল মা, তবে এখন কি দিয়া তোমার পূজা করি?—

*

—বাঙ্গালির বড় সাধের দুর্গোৎসব দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল। ... আবার বৈদেশিক শাসনকর্তৃগণ বিচার বিক্রয় করিতে, অত্যাচার বিলাইতে, সদাচারের অভিনয় করিতে এবং কদাচার নিবারণ করিতে যত্নবান্ থাকুন।—

এইসব জাতি-বৈরের দৃষ্টান্ত নয়—দেশবাসীকে তাহার শোচনীয় অবস্থার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেওয়া।

দেশাত্মবাদ-এ এই কয়টি রচনা ছাড়া 'রূপক ও রহস্য'-শ্রেণীভুক্ত প্রবন্ধ, যেমন—তোমরা যদি আর্য হও, আমরা অনার্য; চুল্লি না নির্বাণ হয়; সিংহের উপাধি-বিতরণ প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং 'পূজার গল্প ও কৌতুককৌমুদী'র অন্তর্গত কয়েকটি রচনা স্বদেশপ্রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আসল কথা, সাহিত্যাচার্য যখন যাহাকিছু লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেখানে সুযোগ পাইয়াছেন সেইখানেই তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি রঙ্গরহস্য করিতে গিয়াও লিখিয়া বসিলেন—

—গরীবের তেলনুণের বাটা চড়ানই রাজনীতি।—

*

—ইস্টাম্পের যে ব্যবসা, তাহার নাম ন্যায়রক্ষা।—

*

—ইংরাজ জাতি হ'ল জ্ঞাতি—উপার্জনের অংশ চায়।—

*

—ইতিহাস অর্থ—এই হাসো। 'সিরাজদ্দৌলার আদেশে অন্ধকূপে ১২৪ জন ইংরাজ হত হন', 'লক্ষ্মণসেন পলায়ন করায় মুসলমানের বঙ্গবিজয় সমাধা হইল', 'গুজরাট ও গুজরান্ওয়ালার যুদ্ধে ইংরাজ বিশেষ জয়ী হইলেন'; এই সকল হাসির কথা বলিয়াই ইতি-হাস নামে গণ্য।—

*

—রে তালতলার চটি! ইংরাজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরিল না।...তুই কিনা ইংরাজের মস্তক থাকিতে, স্কট্লণ্ডীয়ের বিশাল বক্ষ থাকিতে, ইটালিয়ের সুন্দর দেহ থাকিতে—এত জাতির এত অবয়ব থাকিতে—তুই কিনা, চটি! সেই নীচস্য নীচ বাঙ্গালির পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলি! তোর দুর্দশা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

*

—সঙ্গে সঙ্গে আরও ভাবি যে, তোমাদের দেশের এত কসাই, কামার, চামার, ছুতার এ দেশে যদি রাজপদ পাইয়া আসিতে না পারিত, তাহা হইলে হয়ত আমাদের এখনকার মত জীবন্তে দিবারাত্র জবাই হইতে হইত না,—দিবারাত্র

হাতুড়ির ঘায়ে ইস্পাতের পাত হইতে হইত না;—আর বুকের উপর অনবরত দু'মুখো করাতের হড়্‌হড়ানি-ঘর্‌ঘরানিতে এত জ্বালাযন্ত্রণা, রক্তপাত ও মর্মচ্ছেদ হইত না।—

*

—স্বাস্থ্যের বদলে রাস্তা পেয়েছি,
জোরের বদলে জ্বর,
তস্কর বদলে টেক্সর দারোগা—
সঙ্গে আসেসর।
বিষয় বদলে বিচার মিলেছে,
বৈভব বদলে টাইটেল,
মান বদলে নাম গেজেটে
কিংবা মামলা লাইবেল।
পঞ্চায়ৎ বদলে লাঞ্ছনা হ'য়েছে—
জজের গোলাম জুরি,
শাসন বদলে শোষণ চ'লেছে—
দেহি দেহি ভূরি।
রাজত্ব বদলে বাণিজ্য হ'তেছে,
কোটির বদলে লক্ষ,
অযুত বদলে নিযুত লইয়া
ভাণ্ডার ভরিছে যক্ষ।—

'সাধারণী'র পাতায় পাতায় রাজনীতির ছড়াছড়ি। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

—বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালিবাবু সক করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করেন, তার রাজনীতি-জড়িত সাহিত্যের সক মিটাইবার জন্য সাধারণীর জন্ম।—

আর পিতাপুত্রের গোড়াতেই তিনি লিখিয়াছেন—

—যৌবনে সাধারণীতে যেরূপে তথাকথিত রাজনীতির চর্চা করিয়াছিলাম সেরূপভাবে, সেরূপ কথায় যদি এখন পুনরাবৃত্তি মাত্র করি তাহা হইলে বার্ধক্যে শ্রীঘরবাসের বিবরণ আবার ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে। তাহা ত পারিব না।—

এখন সাধারণী হইতে ঐ সব রাজনীতি-সংক্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করিলে হয়ত শ্রীঘরবাসের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে দুইটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি—

—আমরা বিপ্লবপ্রয়াসী। বিপ্লবই জগতের জীবন। শান্তিই মৃত্যু, শান্তিই নির্বাণ। এ নির্বাণপদ চাই না,—এ শান্তি চাই না, সুতরাং আমরা বিপ্লবপ্রয়াসী।—

—সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডীয়রা ভারতবর্ষে অদ্যাপি কায়েমী পত্তন করেন নাই। জ্বর, বসন্ত, ওলাউঠা, মহামারী, গ্রীষ্ম, আতপ আমাদিগকে এতদিন এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছে। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে ইহারা ভারতবর্ষে চির-বিরাজমান রহুক।—

আর অধিক উদাহরণ দিয়া পুঁথি বাড়াইব না। সাহিত্যাচার্যের দেশভক্তির কথা স্মরণ হইলেই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অমর উক্তি মনে পড়ে—

কতরূপ স্নেহ করি
দেশের কুকুর ধরি—
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

ইহাই ত প্রকৃত দেশাত্মবোধ—দেশের কুকুরকে এত ভালবাসি, তাহাকে লইয়া এতই প্রমত্ত যে বিদেশের ঠাকুরের দিকে ফিরিয়া চাহিবারও অবসর পাই না।

সাহিত্যাচার্যের দেশাত্মবাদ ছিল বিশুদ্ধ, নির্মল, খাঁটি—ছিল না তাহাতে পান, ভেজাল, মেকি।

১৫ শিক্ষানবিশের পদ্য—মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালে। ৩য় খণ্ড বঙ্গদর্শনে ইহার সুদীর্ঘ সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

' "অক্ষয়চন্দ্র সরকার" এই নামযুক্ত গ্রন্থ এই প্রথম প্রচারিত হইল।...এই পুস্তকের অধিকাংশই বায়রনের অনুবাদ ও অনুকরণ। যাঁহারা ইংরাজি বুঝেন না তাঁহারা বায়রনের অনুবাদ হইতেও স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করিতে পারিবেন।...আর এ শিক্ষা সৎশিক্ষা।...'

তাহার পর তিনি মূল ইংরাজী ও তাহার অনুবাদ নিচেয় নিচেয় উদ্ধৃত করিয়া

Roll on, thou deep and dark Ocean roll,
সুনীল গভীর সিন্ধো কল্লোলিয়া চল,
Ten thousand fleets sweep over thee in vain;
লক্ষ পোত বক্ষে তব বৃথা ভাসি যায়!

লিখিয়াছেন—

'ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজি পদ্যের এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ আমরা আর কোথাও দেখি নাই।'

শিক্ষানবিশের পদ্য-এর পাণ্ডুলিপিতে সাহিত্যাচার্যের নিজের হাতে যে তারিখ লেখা আছে তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি 'বন্দীর বিলাপ' (Prisoner of Chillon) লিখিতে আরম্ভ করেন ৬।৫।১৮৬৯ এবং লেখা শেষ হয় ২৮।৫।১৮৭০ তারিখে অর্থাৎ বন্দীর বিলাপ প্রায় তের মাসের মধ্যে অবকাশমত অল্প অল্প করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

ঠিক এইরূপভাবে অবসরমত সাহিত্যাচার্য গোল্ডস্মিথ-এর ট্রাভেলার-এর (Traveller) অর্ধেকের ওপর ছন্দে অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনুবাদ অসম্পূর্ণ বলিয়া আমরা কয়েক ছত্র মাত্র তাঁহার খাতা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

যেমন কৃপণ নর আপন ভাণ্ডারে
নিরীক্ষণে পরীক্ষা করে বারে বারে,
উলটি পালটি মুদ্রা করিয়ে গণন—
কিছুতেই পরিতৃপ্ত নাহি হয় মন,—
মুদ্রাধারে স্তূপাকার নিরখিয়া ধন
আনন্দ-সাগর-নীরে হয় নিমগন,
কিন্তু পুন দুঃখে করে নিশ্বাস পতন—
নাহি হইয়াছে ধন মনের মতন,—
সেইভাব আবির্ভাব হৃদয়ে আমার
হরিষে সরস সাধে বিষাদ আবার,
একবার হেরি হ'য়ে হরষিত মতি
ঈশ্বরের অনুগ্রহ—মানুষের প্রতি;
পুনরায় ভাবি মনে কোথা সুখী নর,
সংসারের সুখ অকিঞ্চিৎকর।
মনে মনে এই আমি করি অনুমান—
ধরার মাঝারে যদি থাকে কোন স্থান,
ভ্রমণের সব আশা দিয়া বিসর্জন
যাইব তথায় যথা জুড়ায় জীবন—
মনের সুখেতে কাল নিরন্তর হরি
স্বজাতীয় লোকে সুখী নিরীক্ষণ করি।

সাহিত্যাচার্য অতিশয় বায়রন-ভক্ত ছিলেন। বায়রনের বহু কবিতা এবং গোল্ডস্মিথের 'পরিত্যক্ত পল্লী'র সমুদয় তাঁহার মুখস্থ ছিল।

১৬ গোচারণের মাঠ—বহু বৎসর যাবৎ পাঠ্যপুস্তক-রূপে নির্দিষ্ট ছিল। ১২৮৫ সালে সমগ্র গ্রন্থ সাধারণীতে প্রকাশিত হয়, পরে ১২৮৭ সালে পুস্তিকাকারে ইহার প্রথম প্রকাশ। যুক্তাক্ষর-বর্জিত পয়ার ছন্দে রচিত একখানি পল্লীচিত্র। কাব্যে, ছন্দে ও স্বভাবের সৌন্দর্য-বর্ণনে বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় ক্ষুদ্র কাব্য। যে পটভূমিতে ইহার প্রকাশ, তাহাতে ঘাসেভরা মাঠ, বেউড় বাঁশের ঝাড় ও চারদিকে

'ছোট ছোট শৈলমালা আকাশের গায়,
নিবিড় মেঘের মত বেশ দেখা যায়;'

প্রভৃতির একত্র সমাবেশ দেখিয়া অনেকে সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এ পল্লীচিত্র কোথাকার—বাঙ্গালায় ত এরূপ দৃশ্য দেখা যায় না? উত্তরে আমরা বলি, সাহিত্যাচার্য বৈদ্যনাথ-দেওঘরে বসিয়াই গোচারণের মাঠ লিখিয়াছিলেন। মিলাইয়া দেখিবেন, এই ক্ষুদ্র কাব্যের চিত্রগুলি হুবহু বৈদ্যনাথের।

'ডাহিনে গহন বন—নীরব, বিশাল,
একপদে যোগসাধে কত শত শাল;
পাছে কেহ গোল করে, এই ভয়ে তারা
সারি সারি তাল-তরু রেখেছে পাহারা।'

আর পল্লীবধূর বর্ণনায়—

'দু'হাতে দু'গাছি কড় গায়ের গহনা,
নাহি বেশ, রুখু কেশ, মলিন-বসনা;
কপালে সিঁদুর হেরি মনে লয় হেন—
শীতঋতু-রাতিশেষে শুকতারা যেন;
সতীভাব, সরলতা ভাসালো নয়নে,—
অশোক বনের সীতা কৃষক-ভবনে।'—

প্রভৃতি পদ্যাংশ একসময়ে সমানে বালক-যুবা-বৃদ্ধের মুখে মুখে ফিরিত।

রসরাজ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'অক্ষয়চন্দ্র "গ্রাবু"তে যশস্বী হইয়াছেন, সে যশ গোচারণে গাঢ়

হইয়াছে।' আর সাবিত্রীতত্ত্ব, শকুন্তলাতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্ববিদ্ চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—

'আমাদের শেষ পয়ারপ্রিয় ছিলেন অক্ষয় ভায়ার সর্বজন-সম্মানিত পিতা রসসাগর গঙ্গাচরণ। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয় আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত আমাদের ঘরের ও মরমের কথা পড়িতেছি। আর মনে করিলে সেই রকম কবিতা লিখিতে পারেন অক্ষয় ভায়া নিজে। বিশেষ বঙ্গ ও বাঙ্গালীকে তিনি যেমন জানেন ও বোঝেন ও ভালবাসেন, তেমন আর কেহ নহেন। সুতরাং মনে করিলে তিনি বঙ্গের কথা অতুলনীয় কবিতায় লিখিয়া যাইতে পারেন…।'

সাহিত্যাচার্য সময় সময় পয়ারে এবং গানে ছেলেদের এবং বন্ধুবান্ধবদের চিঠিও লিখিতেন। এইরূপ একটি গান 'কবিতা ও গান'-এ এবং 'পদ্য-পত্র' নামে একটি কবিতা 'রূপক ও রহস্য'-এ মুদ্রিত হইয়াছে।

১৭ কবিতা ও গান—১৪টি কবিতা ও গানের সংকলন। এ ছাড়া অনেকগুলি কবিতা 'রূপক ও রহস্য'-এ এবং 'কিশোর সাহিত্য'-এ মুদ্রিত হইয়াছে। সাহিত্যাচার্য গদ্যে ও পদ্যে সব্যসাচী ছিলেন, বলা যাইতে পারে; তবে মনে রাখিতে হইবে, অর্জুনের দুই হাতও সমান চলিত না।

১৮ মহাপুজা—পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'পুরাতন কথা' নামে গ্রন্থের ভূমিকা পড়িলেই গ্রন্থের পরিচয়, এবং ধর্ম তথা পূজার্চনাদি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপবিষয়ে গ্রন্থকারের ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও অনুরাগ বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

'…আচার্য অক্ষয়চন্দ্রের জীবনের ১৩ বৎসরের পরিশ্রম-জাত দুর্গোৎসব-সম্বন্ধে অপূর্ব রচনাসকল মন্থন করিয়া, বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি প্রবন্ধে নিবন্ধ করিয়া, তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ অজরচন্দ্র সরকার এই ভাবমঞ্জুষার সৃষ্টি করিয়াছেন।'

আর প্রবন্ধ-শেষে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন—

'যাইবে কি মা,—এই মহামোহের মহাজাড্য অপসারিত হইবে কি? যে-বাঙ্গালী তোমাকে জগদারাধ্য জগদ্ধাত্রীতে পরিণত করিয়াছিল, মৃন্ময়ীরূপশালিনী তুমি,—তোমার চিন্ময় রূপের বিভা শব্দশক্তির সাহায্যে ফুটাইয়া বঙ্গভূমিকে সমালোকিত করিয়াছিল, তাহাদিগকে চিনিবার এবং চিনাইবার চেষ্টায় তাহাদেরই বংশধর ও সৃষ্টিধরগণ আবার সমুদ্ধ হইবে কি? এ সাধ পূর্ণ হইবে কি না জানি না!—এই সাধ পূর্ণ করিবার বাসনায় অনন্তের তীরে দাঁড়াইয়া এই পিতৃপক্ষের দিনে শ্রদ্ধার এই তিলাঞ্জলি দিলাম।'

১০৮, রাজা বসন্তরায় রোড **শ্রীকালিদাস নাগ** (ডক্টর)
কলিকাতা—২৯ ১৭.১.১৯৬৩

পিতাপুত্র

পিতাপুত্র

৺রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুরের

ও

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকারের

জীবনী

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার-প্রণীত

'বঙ্গভাষার লেখক', প্রথম ভাগ

'বঙ্গবাসী'-স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের উদ্যোগে
ও ব্যয়ে বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক
শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা ৩৮৷২ নং ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী
ইলেকট্রো মেসিন-প্রেসে'
শ্রীনুটবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

সন ১৩১১ সাল।

পিতাপুত্র

৺রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর ও শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

১

আমার নিজের ও পিতৃদেবের জীবনী লিখিতে আমি অনেকদিন হইতে অনুরুদ্ধ ছিলাম; সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এবং শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতি আমাদের সাহিত্য-জীবনের কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সকল অনুরোধ-রক্ষার চেষ্টা করিতেছি।

আপনার জীবনী, আপনি লেখা,—বড়ই কঠিন ব্যাপার। বিশেষ আমি কোন কাজ করিলাম না, কোন কর্ম করিলাম না, আমার আবার জীবনী কি?

যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন Rule of Three খুব সত্বরে কষিতে পারিতাম। Bernard Smithএর শামুকের (snail) অঙ্ক অনেকে কষিতে পারে নাই, আমি কসিয়াছিলাম—এই সকল কারণে আমাকে তখন Genius বলিত। এ সকল কথা কাগজে, কালিকলমে বা ছাপাইয়া জগতে প্রচার করা, ভাল কি মন্দ তাহা ত বুঝিতে পারি না।

যৌবনে 'সাধারণী'তে যেরূপে তথাকথিত রাজনীতির চর্চা করিয়াছিলাম, সেরূপ ভাবে, সেরূপ কথার যদি এখন পুনরাবৃত্তি মাত্র করি, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে শ্রীঘরবাসের বিবরণ আবার ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে। তাহা ত পারিব না; সুতরাং যৌবনের কীর্তির-অকীর্তির পুনরালোচনা চলে না।

প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে আমার জীবন—যমে মানুষে টানাটানির পালা। কখন যম জিতিতেছে, কখন আমি জিতিতেছি। কলিকাতা, কটক, চুঁচুড়া, ইটোয়া, বৈদ্যনাথের ঘরের কোণে, নিভৃতে, নীরবে, বিনা আড়ম্বরে—এই যে রুষ-জাপান সমর, ইহার বিবরণ তোমাদের পড়িতে ভাল লাগিবে কেন? অন্তত ভাল লাগিবে না, আমি বুঝিয়াছি সেরূপ বুঝিয়া আমি লিখিতে যাইব কেন?

অতএব আপনার জীবনী লিখিব না। পিতৃদেবের জীবনীর দুই-চারি কথা বলিব, আর তাঁহার ও আমার জীবনের যে ভাগের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ, তাহাও কিঞ্চিৎ লিখিতে চেষ্টা করিব। আমার সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ বিষয়ে শিক্ষার কথাই বলিব, পরীক্ষার কথা একটু-আধটু থাকিবে মাত্র।

২

একটা কথা গোড়ায় বলিয়া রাখা ভাল। অনেক বয়সে পিতৃদেবের মুখে সে কথাটা শুনিয়াছিলাম। পেন্‌সনপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃদেব ঢাকা হইতে যখন আসেন, তখন মহা আড়ম্বরে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। সেইরূপ একটি বিদায়-সভার মুখপাত্র বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ পিতৃদেবের প্রশংসাকল্পে বলিয়াছিলেন যে, গঙ্গাচরণবাবু গুরুতর রাজকর্মের ভার লইয়াও বঙ্গসাহিত্য-সেবা হইতে কখন বিরত থাকেন নাই, প্রত্যুত যত্নপূর্বকই বঙ্গসাহিত্য-সেবা করিয়াছেন। এইজন্য সাধারণত বাঙ্গালিরা, বিশেষত ঢাকাবাসীরা, তাঁহার কাছে ঋণী এবং একমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে অক্ষম। বাগ্মিপ্রবর বিশেষ দক্ষতা-সহকারে ঐ কথার ব্যাখ্যা করেন এবং সভাস্থ সকলেই করতালির দ্বারা পিতৃদেবের প্রশংসা কীর্তন করেন। সকল বক্তার সকল কথা শেষ হইলে পর পিতৃদেব উত্তরে বলেন, 'আপনারা আমাকে ভালবাসেন, সুতরাং প্রশংসা করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র

নহে। ঐ সকল প্রশংসাবাদ আমি ভালবাসার পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। তবে বঙ্গসাহিত্য-সেবার জন্য আমার যে প্রশংসা হইয়াছে, তাহাতে আমি বিস্মিত। মাতৃ-সেবা না করিলে অধর্ম আছে, সেবা করিলে যে কিছু বাহাদুরী বা প্রশংসা আছে এ কথা আমি জানি না, ও মানি না।'—ঐ কথাই সর্বাগ্রে সকলের নিকটে আমিও বলিতেছি। মাতৃভাষা সেবার কথা বলিব, কিন্তু বাহাদুরীর জন্য অথবা প্রশংসা-প্রয়াসে বলিয়া কেহ গ্রহণ করিবেন না। এ বয়সে এতটুকু বুঝিতে পারি যে, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষের মত একজন, শতজন, বা সহস্রজন বাঙ্গালা ভাষার চর্চা করেন না বলিয়া, আমি করি, তুমি কর, তিনি করেন—আমাদের কিছু বাহাদুরী বা গৌরব নাই।

৩

আমাদের অন্তত সাত-আট পুরুষের, ওলন্দাজি চুঁচুড়ার বাহিরে গঙ্গার ধারে, বাস ছিল।

* প্রায় শতবর্ষ পূর্বে (সংবৎ ১৮৭২, বঙ্গাব্দ ১২২২, খৃস্টাব্দ ১৮১৫) আমার বৃদ্ধপিতামহ পর্যায়ের গদাধর সরকার মহাশয় (কেবলরামের ভ্রাতুষ্পুত্র) ৺হরিদ্বার তীর্থে গমন করেন। হরিদ্বারের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত আশারাম লকড়ীওয়ালার পূর্বপুরুষের খাতা হইতে এইটি জানিতে পারি এবং গদাধরের লিখিয়া দেওয়া কুলজিনামা পাই,—পাইয়া আমাদের কুলজিনামা সংশোধন করিয়াছি। সেই সংশোধিত কুলজিতে লক্ষ্যের বিষয়, আমার পিতামহ হইতে গদাধরের পিতা পর্যন্ত চারি পুরুষের চৌদ্দটি নামের মধ্যে আটটি রামনামযুক্ত। আমাদের বংশ বৈষ্ণববংশ, কিন্তু স্পষ্ট শ্রীকৃষ্ণ নাম নাই বলিলেও চলে—মদনমোহন ও জনার্দনে প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন, থাকুন। কিন্তু ওই চারি পুরুষে রামনামের বাড়াবাড়ি। আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠিত মহাদেব আছেন, কিন্তু শিবনামের সম্পর্কশূন্য। কেন এরূপ হয়, বুঝা যায় না, তবে রামনামের আতিশয্য যে অনেক কুলজিতেই আছে, এটি আমি বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছি; আপনাদের কথায় বিশেষ করিয়া বলিলাম মাত্র।

আরও লক্ষ্যের বিষয়, শতবর্ষ পূর্বে গদাধরের সুদূর তীর্থযাত্রা। তখন বারাণসীর পর হইতে অযোধ্যা, হরিদ্বারাদি দেশে ইংরাজের রাজত্বই হয় নাই।—সম্পূর্ণ অরাজকতা বিকট মূর্তিতে চারিদিকে বিরাজিত। দস্যু-তস্করের মহাপ্রাদুর্ভাব, পথঘাট কিছুই নাই। হরিদ্বার একেবারে জঙ্গল—একটিও বাড়ীঘর সেখানে ছিল না; কেবল ব্রহ্মকুণ্ড বলিয়া একটি স্থান নির্দিষ্ট ছিল। বড় ভক্তিমান্ পুরুষ না হইলে সেই সুদূর জঙ্গলে কেহ তীর্থ-যাত্রা করে না।*

৪

আমার ঠাকুরদাদা ইংরাজি নবীশ ছিলেন। এই জন্য তাঁহার নাম ছিল রামবল্লভ মাস্টার। কথিত আছে, রামবল্লভ মাস্টার ঘাসের ফুলের পর্যন্ত ইংরাজি নাম জানিতেন। পিতার মাতামহালয় খন্যানের নিকট শর্শা। আমার ঠাকুরমা ছেলেবেলা Amateur শিশু-কবির দলে 'কবির গান' বাঁধিয়া দিতেন।†

ত্রিশ সালের বন্যার বৎসর বন্যার সময় অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৩০ সালের আশ্বিন মাসে, পিতৃদেবের জন্ম হয়। অনেকেরই এখনও মনে থাকিতে পারে যে অতি

* দুইটি তারকা-চিহ্নের মধ্যে অবস্থিত এই অংশ সাহিত্যাচার্য পিতাপুত্রের একখানি কপিতে নিজের হাতে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, উহার দ্বিতীয় সংস্করণে এই অংশ পুস্তকে সংযোজিত করা; কোন্ স্থানে সংযোজিত হইবে তাহাও সেই কপিতে নির্দেশ করা আছে। কপিখানি সরকার বাড়ীতে এখনও আছে।

† গঙ্গাচরণ সরকারের মাতামহের নাম নন্দিরাম মিত্র। তাঁহার তিন কন্যা—সোণামণি, সুদোমণি ও স্বরূপমণি। সোণামণি গঙ্গাচরণের মাতা, কাঁকশিয়ালি বটতলার রামবল্লভ সরকার তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই সোণামণিই সহমৃতা হন।

সামান্য কথাতেও পিতৃদেব রসের অবতারণা করিতে পারিতেন। তাঁহার জন্ম-সময়ের এই ঘটনা লইয়া তিনি বলিতেন,—

'ওহে! তোমরা যদি আমার কেহ জীবনী লিখিতে যাও, তবে তোমাদের আরম্ভ করিবার বড় সুবিধা হইবে। স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারিবে যে, "দামোদর নদের ও ভাগীরথী নদীর যুগপৎ ভীষণ প্লাবনে যখন সমগ্র বঙ্গভূমি জলে জলময়, অধিবাসীরা যখন স্বীয় স্বীয় ধন-প্রাণ আবাস-ভবন লইয়া মহা ব্যাকুল, তখন সেই কূলপ্লাবিনী সুরধুনীর তটভূমি হইতে অতি নিকটে কাঁকশিয়ালির একটি কুটীরে একটি সদ্যঃপ্রসূত কৃষ্ণবর্ণ শিশু তদীয় কৃষ্ণবর্ণা মাতার অঙ্ক শোভিত করিয়া বিকট ক্রন্দন করিতেছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি।'

ত্রিশ সালে অর্থাৎ এখন হইতে আশী বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা লেখার চর্চা ছিল,—গুরুমহাশয়ের পাঠশালে, ব্যবসাদারের খাতায় আর আত্মীয়-স্বজনকে (বন্ধুবান্ধবকেও নয়) পত্র লেখায়; পড়ার চর্চা যথেষ্ট ছিল। কেবল পাঠশালে বসিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিত। বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদি মুদিখানার পাটে বসিয়া, পুরোহিত-ঠাকুর শিবের মন্দিরের ধারিতে বসিয়া, মোসাহেব মুকুয্যে মহাশয় বড়মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে দশবার জন শ্রোতৃমণ্ডলি-মধ্যে, কৃত্তিবাস, কাশীদাস পাঠ করিতেন। গোস্বামী ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরের দাওয়ায়, বাবাজী ঠাকুর আখড়ার আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, বৈষ্ণব গৃহস্বামী পূজার দালানের দরদালানে সেইরূপ শ্রোতৃমণ্ডলি-মধ্যে চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিতেন। এতদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামেশ্বরের শিবায়ন, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ এইরূপই নিয়ত পঠিত হইত।

এই ১২৩০ সাল ইংরাজি ১৮২৩ সাল। এই সময় হইতে সাধারণের শিক্ষার উপর গভর্নমেন্টের নজর পড়িল। কার সাহেব-কৃত Review of Public Instruction গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম বিভাগে দেখা যায়—

Previous to 1823 comparatively little had been done for the advancement of Native Education. The number of Institutions was very limited, and they attracted very little interest. There was no organized system of superintendence. All matters connected with education were under the general control of the Government. But about this time the subject of Native Education began to receive a greater share of attention.... In July, 1823, several of the most experienced officers of Government residing in Calcutta were formed into a Committee of Public Instruction.

কলিকাতায় তরঙ্গ উঠিল বটে, কিন্তু সে তরঙ্গ চুঁচুড়ায় আসিতে ১২।১৩ বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে পিতার বাল্যজীবনে একটি বিষম সঙ্কট-ঘটনা ঘটিয়াছিল,—পিতৃদেবের বয়স্ যখন পাঁচ বৎসর, হাতেখড়ি হইয়াছে বা হয় নাই, তখন আমার ঠাকুরদাদার মৃত্যু হয়; ঠাকুরমা সহমৃতা হন। আমাদের নিকটে বটতলার ঘাটে, এই কাণ্ড হয়। সে বটগাছটি এখন আর নাই বলিলেও চলে; এই বৎসর প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে।* সেই 'কাঁকশিয়ালি' ঘাটের বটবৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া ১২৯১ সালের ১৬ই বৈশাখের 'সাধারণী'তে পিতৃদেব যে পদ্য লেখেন তাহার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

* বর্তমানে গাছটির ঝুরি হইতে একটি বেশ বড় গাছই হইয়াছে।

৬

আরো তুমি এই স্থানে, দেখিয়াছ সন্নিধানে,
কত সতী লয়ে মৃত পতি।
স্বামিভক্তি-অনুবলে, চিতার জ্বলন্তানলে,
হাস্যমুখে হইয়াছে সতী ॥
তরু তব জানা আছে, তনুত্যজে তব কাছে,
পতিসঙ্গে যে সব রমণী।
তার মাঝে এক সতী, পতিব্রতা গুণবতী,
এ দাসের ছিলেন জননী ॥
বহুকাল হ'ল গত, বৎসর অর্দ্ধেক শত,
তদুপরি আর পাঁচ ছয়।
গতাসু হলেন পিতা, মাতা হন সহমৃতা,
শৈশবেতে আমি নিরাশ্রয় ॥
এ ঘটনা বহুদিন, হয়েছে কালেতে লীন,
পুরাকথা-মাঝে প্রবেশিত।
আমি কিন্তু নাহি ভুলি, শ্মশানের সেই চুলি,
মম হৃদে আছে জাগরিত ॥
সেই কাণ্ড দরশন, করিবারে অগণন,
নরনারী হ'ল উপস্থিত।
তীর তট উপকূল, আবরিল নরকুল,
ঘাটে তরী কত উপনীত ॥
আইল বিধর্মী কত, মুসলমান শত শত,
আর কত ফিরিঙ্গী ইংরাজ।
দারোগা মুহুরী সনে, ইষ্ট বুঝি হৃষ্টমনে,
অগ্রসর হয় বর্কন্দাজ ॥
জনতার পারাবার, নদী তটে সুবিস্তার,
কোলাহলে উথলে কল্লোল।
বহুল বিকচ ছাতা, উত্তাপে রাখিতে মাতা,
জনার্ণবে তরঙ্গ-হিল্লোল ॥
হেথা হয়ে ভক্তিমতী, সাত পাক ফিরি সতী,
লয়েছেন চিতায় আসন।
রক্তচেলী পরিহিতা, সিন্দূরে শোভিছে সিঁতা,
মুক্তকেশী অপূর্ব দর্শন ॥
গলে দোলে পুষ্পমালা, প্রেতভূমি করি আলা,
শবপাশে শোভিছে সুন্দরী।
শ্মশানে শঙ্কর যেন, ঘোর ঘুমে অচেতন,
বামে বসে আছেন শঙ্করী ॥
নয়ন প্রফুল্ল অতি, ভাতিছে ভক্তির জ্যোতি,
মুখোপরি হর্ষের উচ্ছ্বাস।
অটল বিশ্বাস মনে, লভিবে পতির সনে,
অবিলম্বে স্বর্গে চিরবাস ॥
পরে সতী এ জগতে, ঐহিক বান্ধব হ'তে,
একে একে লইয়া বিদায়।
পুত্রে আশীর্বাদ করি, পতিশব বক্ষে ধরি,
প্রেমানন্দে শুলেন চিতায় ॥
মম হাতে নুড়া জ্বলে, মন্ত্র-দ্বারা পূত হ'লে,
মুখে আমি দিলাম ফেলিয়া।
অনেক স্বজন আসি, দেয় তবে তৃণরাশি,
বাড়ে অগ্নি প্রবল হইয়া ॥
পর্বত প্রমাণ হয়ে, শত শত শিখা লয়ে,
ভীমাকারে জ্বলিল অনল।
হরিবোল দেয় লোকে, আমি ভয়ে কিংবা শোকে,
ফেলিলাম নয়নের জল ॥*

৭

এই সহমরণের পর সরকারদের সংসারে রহিলেন একজন ষাট বৎসরের বৃদ্ধ মদনমোহন সরকার আর তাঁহার শিশুপৌত্র গঙ্গাচরণ। সে বেশ সংসার নয়! কিছু দিন পরে পিতা অবশ্য পাঠশালে যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে পাঠশালার সংস্করণে মিশনরিরা কোথাও কোথাও মনোযোগী হইয়াছিলেন। একজন আমেরিকান মিশনরি মিস্টার আদাম (Adam) চুঁচুড়ার পাঠশালা সংস্করণের প্রধান উদ্যোগী হন।

* সাহিত্যাচার্যের পৌত্র শ্রীমান্ অজিতচন্দ্রের লেখা 'সতীর দেশ' গল্পটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার অস্বাস্থ্যের কল্যাণে বৈদ্যনাথ-দেওঘরে এখন অনেকেরই গতিবিধি হইয়াছে। বৈদ্যনাথে পাদ্‌রিনী বুড়ী মেমকে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। একখানি ছোট ঠেলাগাড়িতে বুড়ী মেম আধ-শোয়া আধ-বসা ভাবে আছেন; দুই জনে সেই গাড়ি টানিতেছে, আর এক জন ছাতা ধরিয়া তাঁহার মুখে ছায়া করিয়া গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতেছে। তিনি (Miss Adam) মিস আদাম। তাঁহারই পিতা মিস্টার আদাম চুঁচুড়ার পাঠশালার প্রথম সংস্কারক, অথবা বিশুদ্ধ প্রণালী-সঙ্গত পাঠশালার সংস্থাপক; আমাদের বাড়ীর নিকটে মনসা-তলার কাছে, সেইরূপ একটি পাঠশালা ছিল। তাহাতে পিতা পড়িয়াছিলেন। সেই পাঠশালে পিতার সহাধ্যায়ী *যদুনাথ বসুর এই বৎসর মৃত্যু হইয়াছে। সাধারণ পাঠশালা হইতে এই সকল পাঠশালার প্রভেদ ছিল যে, এখানে ষত্ব-ণত্ব বা বর্ণশুদ্ধি শিখিতে হইত এবং ছাপার বই পড়িতে হইত। বাবার বাঙ্গালা শিক্ষার এই সূত্রপাত। যদিও পাঠশালার সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিতে গভর্নমেণ্ট ১৮৩৫ অব্দে ঐ আদাম সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু এই সকল পাঠশালার প্রণালী গভর্নমেণ্টের ভাল লাগিল না। রিপোর্টে লেখা হইয়াছে, 'The plan of Village Schools had been tried at Chinsurah, Dacca, Bhagalpur, Saugor and in the Ajmeer district; but in every instance, the result was unsatisfactory and discouraging.' ইংরাজির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা চালানো স্থির হইল। ইহার বহু পূর্ব হইতেই চুঁচুড়াতে স্কুল ছিল '১৮১৪ খৃস্টাব্দে খৃস্টান মিশনরি রেবরেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিশনরি স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় (অর্থাৎ বঙ্গদেশের) ইংরাজি স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব গভর্নমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা সফল হয়। পরে কোন বিশিষ্ট হেতুবশত সেই সাহায্য রহিত হয়।' তাহার পর প্রাতঃস্মরণীয় মহম্মদ মহ্‌সিনের বিপুল সম্পত্তির একাংশের সরকার বাহাদুর ট্রস্টি হইলেন। ১৮৩৬ অব্দে ১৬ই শ্রাবণ চুঁচুড়াতে College of Mohammad Mohsin খুলিল। ইহাকেই এখন হুগলী কলেজ বলে; যে দিন খুলিল সেই দিনই পিতা স্কুলে ভর্তি হইলেন। শুনিয়াছি, সে দিন কলেজ খুলিয়াছে—ছেলেরা পড়িতে যাইতেছে—দেখিবার নিমিত্ত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তখন ভর্তি হওয়ার কোনরূপ সেলামি ত লাগিতই না, স্কুলের মাহিনাও ছিল না,—কাগজ, কলম, কালি, খাতা, পড়িবার সমস্ত পুস্তক অধ্যক্ষেরা ছাত্রগণকে বিনামূল্যে দিতেন। তখন ছিল শিক্ষাদান, তাহার পর এতকাল চলিল শিক্ষা-বিক্রয়, এখন আবার শুনিতেছি শিক্ষার অতিরিক্ত দাম চড়াইয়া লাট সাহেব নাকি শিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন—সস্তার তিন অবস্থা আর থাকিবে না।

* সরকারদের নিকট-প্রতিবেশী ছিলেন।

৮

পিতৃদেবকে শিক্ষার জন্য কখন কিছু ব্যয় করিতে হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। এখনকার দিন হইলে সেই অসহায় নির্ধন বালকের লেখাপড়াই হয়ত হইত না।

মদনমোহন মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে পিতার বিবাহ দিয়া যান।* তাঁহাদের সংসারে আমার মাতা, মাতামহী এবং প্রমাতামহী ছিলেন মাত্র; শিশু পিতৃদেব তাঁহাদের অভিভাবক হইলেন, আর তাঁহার শ্বশ্রূ ও শ্বশ্রূমাতা অভিভাবিকা রহিলেন। আমরা এখন যে বাড়ীতে

* গঙ্গাচরণ সরকার থাকমণিকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ১২৪৬।৪৭ সালে (ইং ১৮৩৯ ৪০) এই বিবাহ হয়। বিবাহের সময় গঙ্গাচরণের বয়স্ ১৬।১৭ বৎসর এবং থাকমণির বয়স্ ১১।১২ বৎসর ছিল। থাকমণির পিতার নাম হরগোবিন্দ বসু। থাকমণির বিবাহের সময় হরগোবিন্দ জীবিত ছিলেন না। হরগোবিন্দের নিজের হাতে লেখা একখানি বিক্রয়-কোবালা হইতে জানা যায়, লক্ষ্মণ বসুর পুত্র আনন্দীরাম বসু, তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ বসু। ১২৩৭ সালের ১৬ই আশ্বিন এ দলিল রেজেস্ট্রি করা হয়।

কদমতলায় বাস করি, এই বাড়ী তাঁহাদের ; আর যে কুটীরে পিতা ভূমিষ্ঠ হন, সেই জায়গাগুলি আমাদের আছে ; তাহাতে একঘর প্রজা এবং একটি শিবের মন্দির আছে। সে স্থানটি গঙ্গার অতি নিকটে।

১৮৩৬ সালে পিতৃদেব স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন। ১৮৪৫ সালে জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষাতে বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বোধকরি '৪৬ সালে সিনিয়ার বৃত্তি পান। হুগলী কলেজে মাতৃভাষা শিক্ষা ভালরূপই হইত—পিতৃদেবদিগের সময়েও হইত, আমাদের সময়েও হইয়াছিল। আমাদের সময়ে যে ভালরূপ হইত, তাহার সাক্ষী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। মধ্য-সময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী বঙ্কিমবাবু ছিলেন। প্রথম সময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী হুগলীর হরচন্দ্র ঘোষ* ছিলেন। পিতৃদেব সেই সময়ে কলেজে অধ্যয়ন-কালেই যে ভালরূপ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন, তাহার ধাতুময় সাক্ষী (medal) আমাদের বাড়ীতে আছে। তাহার এক পিঠে গঙ্গার ঘাটের উপর হুগলী কলেজের ছবি, অন্য পিঠের মাঝখানে *Gunga Churn Sircar* এবং বৃত্তাকারে BENGALEE ESSAY. 1845 ক্ষোদিত আছে ; আর মেডেলের চারিধারে (rim) ক্ষোদিত আছে PRESENTED BY D. J. MONEY ESQ^R^ C. S.

ইতিপূর্বে ইংরাজি-অভিজ্ঞের বাঙ্গালা ভাষার অনভিজ্ঞতার একটা বিদ্রূপাত্মক গল্প ছিল। লোকে বলে কোকিলের স্ত্রীলিঙ্গ লিখিতে হইলে তাঁহারা নাকি লিখিতেন 'মেদী কোকিল'। এ দুর্নাম প্রধানত এ কলেজে হরচন্দ্র ঘোষ- ও পিতৃদেব-কর্তৃক দূরীকৃত হয়। যে ফিরিঙ্গী বাঙ্গালার লাঞ্ছনা এখন অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, সে লাঞ্ছনা প্রথমে তিনিই প্রচার করিয়াছিলেন।

* ইনি শেষ-জীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। ইনি 'ভানুমতী চিত্তবিলাস', 'কৌরববিজয় নাটক', 'রাজতপস্বিনী' (গল্পকাব্য) প্রভৃতি ৬।৭খানি পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

* Bearers, especially your bearers, are notorious for making noise and breaking the peace of the College. Herewith I beg to add my best compliments.

—বাহকগণ বিশেষত আপনার বাহকগণ হয় খ্যাত্যাপন্ন করিতে গোল, ভাঙ্গিতে কুশল কলেজের। আর ইহার সহিত যোগ করি ও মান্যরাণী আমার উত্তম সেলাম তাহাতে।—*

হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ লিওনিডাস ক্লিণ্ট (Leonidas Clint) সাহেবের বাঁশবেড়ের রানীকে লেখা একখানি ইংরাজি পত্রের মোসাবিদা হইতে ঐ কলেজের কেরানী জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ অতি উজ্জ্বল বাঙ্গালা অনুবাদ করেন ; তাৎকালিক পরম মেধাবী ছাত্র, আমার পিতৃদেব গঙ্গাচরণ সরকার তখনই তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলেন এবং পরে তাহা কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার অনন্ত গল্পের মধ্যে প্রচার করেন। এই অপূর্ব ইতিহাস সকলে জানেন না। অতএব লোকহিতার্থ তস্য পুত্র অধম শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, আমি ইহা লোকজগতে অদ্য প্রকাশ করিলাম।

৯

ভাষায় রসসঞ্চার হইলে তখন তাহাকে সাহিত্য বলা যায় ; ভাষায় লেখাপড়া সৃষ্টি হইবার পূর্বে সাহিত্য-সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। সাহিত্যের সর্বপ্রথম অবস্থা গান। গানের সঙ্গে কখন কখন ছড়া থাকে। গান ও ছড়া একত্র আমরা পাঁচালি বলি। বাঙ্গালার আদি গীতিকাব্য সংস্কৃত-প্রধান গীতগোবিন্দ জয়দেব, মৈথিলি-প্রধান বিদ্যাপতি। খাঁটি বাঙ্গালা গীতিকাব্য চণ্ডীদাস। সর্বপ্রধান পাঁচালিকার কৃত্তিবাস ; পরে মুকুন্দরাম ও কাশীদাস। শ্রীগৌরাঙ্গের পর হইতেই বাঙ্গালায় এক প্রকার খুচরা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। খুচরা

* ছাপা অংশ সংশোধিত করিয়া এই তারকাচিহ্নদ্বয়-মধ্যস্থিত অংশও পিতাপুত্রের সেই সংশোধিত কপিতে নিজের হাতে সাহিত্যাচার্য লিখিয়া গিয়াছেন।

বলিয়া তাহাকে 'কড়চা' বলে। সেইগুলি ছাড়িয়া দিলে, প্রথম গদ্যলেখক রাজীবলোচন রায়। তিনি আন্দাজি ১৭২৫ খৃস্ট অব্দে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় গদ্যগ্রন্থকার রামরাম বসু। তিনি প্রতাপ আদিত্যের জীবনচরিত লেখেন। এই দুই গ্রন্থই বিলাতে লণ্ডনে ছাপা হয়; এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। দুইখানির একখানি সমগ্র গ্রন্থও আমরা দেখি নাই। কিছু কিছু অংশ নানাস্থান হইতে দেখিয়াছি মাত্র। তৃতীয় গদ্যগ্রন্থকার মৃত্যুঞ্জয় *তর্কালঙ্কার। ১৭৬২।৬৩ খৃস্ট অব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় তাঁহার জীবনকাল-যাবৎ মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, খনের চাটুতি, শ্রীকরের সন্তান। মেদিনীপুরে তখন এক ভাগ বাঙ্গালা, এক ভাগ হিন্দী, এক ভাগ উড়িয়া, সুতরাং মেদিনীপুরে একরূপ ত্র্যহস্পর্শ ভাষা প্রচলিত ছিল। মৃত্যুঞ্জয় নাটোর-রাজের সভা-পণ্ডিতের নিকট তখনকার-অর্ধ-বাঙ্গালার-রাজধানী নাটোর নগরে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং পরে যৌবনে কলিকাতায় বাস করেন; সুতরাং তাঁহার ভাষা একরূপ পঞ্চগব্যময়ী হইবে তাহা আর বিচিত্র নহে। তাহাতে দধিদুগ্ধের সহিত গোমূত্র, গোময়ের অসদ্ভাব নাই। নাই থাকুক, তথাপি হিন্দু সংস্কারবশে আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী গদ্যসাহিত্য অতি পবিত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছি। পবিত্র-ভাবেই গ্রহণ করিতে পাঠককে অনুরোধ করিতেছি। মৃত্যুঞ্জয় কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টে চীফ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮০০ অব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি সিবিলিয়নদের বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশ-ভাষা শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে, মৃত্যুঞ্জয় সেই কলেজে দেশীয় ভাষা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত হইলেন।*

মৃত্যুঞ্জয় 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ও 'রাজাবলী' নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং সংস্কৃত হইতে 'পুরুষপরীক্ষা' ও হিন্দী হইতে 'বত্রিশ সিংহাসন' অনুবাদ করেন। ১৮৩৫ সালে প্রথম কাউনসিল অব এডুকেশন বসিল।* পনের জন সভ্যের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও প্রসিদ্ধ রসময় দত্ত দুইজন মাত্র বাঙ্গালি।

বঙ্গবিদ্বেষী মেকলে সাহেব এই সভার সভাপতি। সেই বৎসরেই মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হইল। কিন্তু তাঁহার 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ও 'পুরুষ পরীক্ষা' স্কুল-কলেজে পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইল। এই দুই গ্রন্থই কলেজে অধ্যয়ন-কালে পিতার ও তাঁহার সহাধ্যায়ীদের প্রধান সম্বল ছিল। ঐ প্রবোধ চন্দ্রিকার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি।

'ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে, তাহার ভার্যার নাম গতিক্রিয়া, পুত্রের নাম ঠক। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধূলা অঙ্গার পূরিয়া, উপরে এক আধ সের ঘি দিয়া, দেশে দেশে শহরে শহরে অনিয়মিত-বেশে

* এখন দেখিতেছি তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও বলে।

* Lord Wellesley, finding the Civil Servants imperfectly acquainted with the languages of the country, established the College of Fort William in Calcutta in the year 1800... ... ... Able Pundits were retained : and various works in Bengalee and other languages, were compiled and printed : and thus a new impulse was given to the improvement of the country. The learned Mrityunjoy, a native of Orissa, was appointed chief of the Native Department, and reflected high honour on the Institution by his great talents etc., etc., etc.

Marshman's History of Bengal,
Section xviii, page 252.

* হুগলী কলেজ প্রথম হইতেই এই কাউনসিলের তত্ত্বাবধানে রহিল।

The Superintendence of, the general Committee, now called the Council of Education, was confined to the institutions in Calcutta, including the college at Hoogly and its Branch Schools.

ভ্রমণ করিয়া ঘড়া শুদ্ধ তৌলাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে, তবে তাহাকে দেয় না, বলে যে এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত, দেবতাদের হোমের উপযুক্ত, আমি এ ঘড়া হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না।···বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কেহ কহে আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন, দুই এক সের আজ্য যদি দিতে তবে লইতাম, অধিক হবির কার্য নাই।···(বিশ্ববঞ্চক) তাদৃশ সর্পিকুম্ভ মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল।'—পাঠক দেখিবেন হৈয়ঙ্গবীন, আজ্য, হবি—ঘৃতের এই তিনটি প্রতিশব্দ বক্তাদের অবস্থোচিত না হইলেও কেবল ছাত্র-শিক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। আর এক স্থানে দেখুন—

'উজ্জয়িনীপতি মহারাজ কাশ্মীর তুরঙ্গমী কথার সমস্ত তাৎপর্য অবগত হইয়া কালিদাসকে হস্তে ধরিয়া বেলাবসানে উপবনে চলিলেন। উদ্যানে গিয়া জাতী, যুথী, মালতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা, শেফালিকা, পাটল সেবন্তিকা, নাগকেশরী, পুন্নাগ, সরোজ, কুমুদ, কহ্লার, কেতকী, চম্পক, কনকচম্পক, টগর, গন্ধরাজ, বক, করবীরাদি পুষ্পমালঞ্চ-শোভাদর্শনে ও ভ্রমরগণগুঞ্জিত কোকিলাদির গানেতে ও সুশীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ বায়ু সুখস্পর্শেতে ও শিষ্টালাপামৃত রসধারাতে পরমাপ্যায়িত কালিদাসকে সানন্দচিত্তে প্রতিশ্রুত পারিতোষিক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া স্বস্থানে বিদায় করিয়া স্বয়ং সন্ধ্যাদি নিত্য ক্রিয়া করিতে দেবালয়ে গমন করিলেন।'—এখানেও দেখিবেন কতকগুলি নাম শিখাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় নবাঙ্কুরিত বঙ্গগদ্য-সাহিত্যের একজন প্রথম পথ-প্রদর্শক। তাঁহার আশ্চর্য প্রতিভাবলে তিনি স্বয়ং ভাষার সকলরূপ গতি, সকলরূপ পন্থা স্বয়ং দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন এবং সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। নানারূপ রচনাভঙ্গি প্রবোধ চন্দ্রিকায় বিরাজমানা। এক এক স্থানের রচনা-ভঙ্গিতে শুদ্ধ হইতে হয়। 'শার্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জনাকর্ণন, বিসঙ্কট-বদন-ব্যাদন, বিকট-দংষ্ট্রা-কড়মড়ি, ঘন ঘন লাঙ্গুলাঘাতে চট চট শব্দ, ভীম লোচনদ্বয়ের ঘূর্ণনেতে অত্যন্ত সংত্রস্ত'—বাস্তবিকই যেন পাঠককে হইতে হয়। আবার 'তরুণী-স্তন-সুন্দর-ইন্দীবর কৈরব-কোরক, সুন্দরী-মুখ-মনোহর, আন্দোলিত ফুল্লরাজীব, নির্মল সুস্নিগ্ধ জল, পুষ্করিণী-তটস্থলে বটবিটপি-ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান-সময়ে'—যেন সত্য সত্যই আমরা শীতল সমীরণ-সঞ্চারে সুস্নিগ্ধ হই। মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গগদ্যের একজন আদি গ্রন্থকার বলিয়া সামান্য নহেন, তাঁহার রচনায় আমরা এখনকার শাখা-প্রশাখা-ময়ী বঙ্গভাষার সকল অঙ্গের অঙ্কুর দেখিতে পাই।

অন্যতর পাঠ্য পুস্তক পুরুষ-পরীক্ষা। এখানি বিদ্যাপতি-রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। এই গ্রন্থের কোন-না-কোন অংশ প্রতিবর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠ্য বলিয়া নির্ধারিত হওয়াতে উহা সর্বপরিচিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ পুস্তক-সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না।

মৃত্যুঞ্জয় যে সময়ে অপোগণ্ড বঙ্গগদ্যের লালন-পালন-ভার গ্রহণ করেন, তৎকালে সত্য সত্যই ভাষা পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকার মত অনাদৃতা, ধূল্যবলুণ্ঠিতা, বিষয়ী ব্যক্তির অবহেলায় ম্রিয়মাণা, সংস্কৃত পণ্ডিত মণ্ডলীর ঘৃণায় অবজ্ঞায় রোরুদ্যমানা। সেই সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মত প্রতিভাশালী পণ্ডিত 'তুমি সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাষা' বলিয়া আদর করিয়া, গৌরব বাড়াইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, কোলে না লইলে এবং ক্রমাগত শৈশবকাল কোলেপিঠে করিয়া মানুষ না করিলে, আজি এই সাগর-তরঙ্গের তেজোধারিণী, অক্ষয়-ভূষণে ভূষিতা, হেম-ভূষণে জড়িতা, বঙ্কিম-ভঙ্গিমা-শালিনী অপূর্ব দেবীমূর্তি দর্শন করিয়া, পবিত্র শ্রীচরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারিতাম না।

১০

কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য ঐ দুখানি প্রধান পুস্তক ছিল। তদ্ব্যতিভিন্ন পিতৃদেব সংস্কৃত হিতোপদেশ কলেজেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। হিতোপদেশের সেই সংস্করণে ইংরাজি ও বাঙ্গালা অনুবাদ ছিল। এই গ্রন্থ ১৮৩০ সালে ছাপা হয়। সংস্কৃতভাগ লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের

তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়। ইংরাজি অনুবাদক কে তাহা বলিতে পারি না। ম্যাক্সমুলার বলিতেছেন,—

'The reason why I preferred the text of Lakshmi Narayan Nyayalankar, the Bengali editor and translator of this Indian School-book, to any single Ms. of the Hitopadesa, was, as I stated before, of a purely practical nature—I wished there should be, as far as possible, a certain uniformity in the text-books used in England and in India.'

সেই সময় বটতলায় ছাপানো ছাড়া বাঙ্গালায় আর কোন পদ্যগ্রন্থই প্রকাশিত হয় নাই। বটতলার কাশীদাস, কৃত্তিবাস, বত্রিশ-সিংহাসন,—সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা পদ্যে অনূদিত অদ্ভুত রামায়ণ, শিশুরামের কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি সকল পদ্যগ্রন্থই পিতৃদেব পাঠ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র একরূপ অভ্যস্তই ছিল। তখন ইংরাজি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির কিরূপ চর্চা হইত, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কলেজের উচ্চতর ও নিম্নতর শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

SENIOR CLASSES

LITERATURE

Milton.

Shakespeare.

Becon's Essays.

" Advancement of Learning.

" Novum Organum.

MORAL PHILOSOPHY AND LOGIC

Smith's Moral Sentiments.

Steward's Philosophy of the Mind.

Whateley's Logic.

Mill's Logic.

HISTORY

Hume's England.
Mill's India.
Elphinstone's India.
Robertson's Charles V.

MATHEMATICS

Potters' Mechanics.

Evan's Three Sections of Newton.

Hymer's Astronomy.

Hall's Differential and Integral Calculas.

JUNIOR CLASSES

LITERATURE

Richardson's Selections from English Poets.

Addison's Essays.

Goldsmith's Essays

MORAL PHILOSOPHY AND LOGIC

Aborcrombie's Intellectual Powers.

" Moral Powers.

Whateley's Easy Lessons in Reasoning.

HISTORY

Russell's Modern Europe.

Tytler's Universal History.

MATHEMATICS

Euclid, Six Books.

Hind's Algebra.

" Trigonometry.

১১

১৮৪৫ সালে তৎকালিক ইংরাজি কৃতবিদ্যগণের মধ্যে বাঙ্গালা রচনায় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া পিতা যে মেডেল পাইলেন, তাহা হইতেই তাঁহার চাকরীর সূত্রপাত হইল। ১৮৪৬ সালে তিনি মাসিক ৪০৲ টাকা সিনিয়ার স্কলারসিপ পাইতেছিলেন, আর চুঁচুড়াতে এবং কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন। তখন আইনের সকল বিষয়ে অধ্যাপনা হুগলী কলেজে হইত না, কোন কোন বিষয়ের শিক্ষা কলিকাতায় গিয়া করিতে হইত এবং পরীক্ষা কলিকাতাতেই হইত। এই সময়ে নদীয়ার কালেক্টারির সেরেস্তাদারী পদ শূন্য হইল। কালেক্টার আলেন্‌জোমনি

সাহেব মেডেলিস্ট গঙ্গাচরণকে নিয়োগপত্র দিয়া সে পদে একেবারে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন। ১৮৪৬ সালে ২৬-এ মে এই নিয়োগ হইল। সুতরাং বহুদিন স্কলারসিপ ভোগ করা, পিতৃদেবের ভাগ্যে হয় নাই। সেই ২৬-এ মে ১৮৪৬ সাল হইতে, ১৮৮২ সালের ৩১-এ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৬ বৎসর ৭ মাসের কিছু অধিক কাল সমানে একটানে তিনি সরকারী চাকরী করেন। ৭৫৲ টাকায় আরম্ভ করেন; শেষের তিন বৎসর ১,০০০৲ টাকা পাইয়া চাকরী শেষ করেন।

নিয়োগ আরম্ভ—১৮৪৬, ২৬ মে

নদীয়ার কালেক্টারির সেরেস্তাদার	—বেতন		৭৫৲
"	"	পেস্কার "	৫০৲
কৃষ্ণনগর কলেজের	শিক্ষক	"	৪০৲
"	জজ আদালতের হেডক্লার্ক	"	১০০৲

নিয়োগ শেষ—১৮৪৯, ১২ জুন;

অর্থাৎ ৩ বৎসর ১৮ দিন পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে থাকেন এবং আমলাগিরি ও শিক্ষকতা করেন। এই কালের মধ্যে একদিনও বিরাম ছিল না। একনাগাড় চাকরী ছিল। এই সময়ের অর্থাৎ কৃষ্ণনগরে পিতা যখন ছিলেন তখনকার একটি হাস্যকর ঘটনার কথা এই স্থলেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

কৃষ্ণনগরে জনকয়েক ভদ্রলোক জুটিয়া আপোশে সর্তি খেলিতেছিলেন, কতকগুলি কাপড়-চোপড় 'মাল' ছিল। দুইজন দুইটি হাঁড়ি হইতে 'টিকিট' তুলিতেছিলেন। কাহারও কাহারও নাম ডাকার পর মাল উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে একটি হাঁড়ি হইতে টিকিট একখানি তুলিয়া একজন পড়িলেন 'গঙ্গাচরণ সরকার', অন্য হাঁড়ি হইতে আর একজন শাদা কাগজের মোড়া খুলিয়া বলিলেন, 'ফর্শা'। পিতা মহা আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'আমার বাপমায় আমায় আদর করিয়াও কখন 'ফর্শা' বলেন নাই। আমি এমন সভামধ্যে 'ফর্শা' সাব্যস্ত হইলাম, ইহা অপেক্ষা আনন্দ আর কি হইতে পারে?'

পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে গেলে পর, ১৮৪৬ সালে ২৭-এ অগ্রহায়ণ চুঁচুড়ার বাড়ীতে আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের সময় বা অন্নপ্রাশনের সময় পিতৃদেব বাড়ী আসিতে পারেন নাই। ছুটি পান নাই। এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি আইনের শেষ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। শেষ পরীক্ষার পাসের ফল—সদর দেওয়ানির ওকালতী বা মুনসেফী। ১২ই জুন, ১৮৪৯ কৃষ্ণনগরের জজ আদালতের হেডক্লার্কের কর্ম শেষ হইল। ১৩ই জুন ১৮৪৯ অর্থাৎ পর দিন হইতেই, মুনসেফী চাকরী আরম্ভ হইল। মুনসেফ হইলেন ঐ নদে জেলারই চৌকি হাঁসখালির। কাছারী হাঁসখালিতে হইত না, হইত উলায় বা বীরনগরে। ১৮৫৬ সালে উলায় মহামারী পড়িল, তেমন মহামারী ইদানীং দেখা যায় না। উলা তখন খুব গণ্ডগ্রাম ছিল বটে কিন্তু প্রত্যহ দুই তিন শত করিয়া লোক মরিলে গ্রামের গৌরব আর কত দিন থাকে? ঐ বৎসর পূজার ছুটির পর, পিতৃদেব কাছারী উঠাইয়া রানাঘাটে লইয়া আসেন। সেই অবধি এখনও রানাঘাটে মুনসেফী আছে।

১২

মহামারীর পূর্ব পর্যন্ত উলা* অতি সভ্য স্থান ছিল। বহুতর ভদ্রলোক এই স্থানে বাস করিতেন। কায়স্থ পরিবারের সংখ্যা আঙ্গুলে গণা যাইত, কিন্তু সেই কায়স্থগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন। তখন হইতে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্তি ছিল, তাহার পরে 'অধিকার উক্ত', 'বেদান্ত', 'সৃষ্টি' প্রভৃতি নানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি এখনও জীবিত আছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা বহুতর ছিল। মাঝের পাড়ায়, উত্তর পাড়ায় কতকগুলি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণও ছিলেন। আর বহুতর নবশাখ, শৌণ্ডিক, পটো, বাইতী, চুয়ুরী প্রভৃতি জাতির অনেক লোক ছিল।

উলার বামনদাসবাবুর তখন প্রবল প্রতাপ। প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক জায়গায় জল খায়, তিনি স্বয়ং অতিশয় ক্রিয়াবান্ পুরুষ ছিলেন। বার মাসে তের পার্বণ ও

* 'প্রবন্ধ ও নিবন্ধ'-এ 'উলা বা বীরনগর' দ্রষ্টব্য।

নিত্য নিয়মিত অতিথিশালাও ছিল; স্নানযাত্রা, রথ ও জগদ্ধাত্রী পূজায় মহা ধুমধাম হইত। রথের আট দিন, দিবারাত্র এক দিকে যেমন নাচ, গাওনা, যাত্রা, কবি হইত, অন্য দিকে সেইরূপ মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' শব্দে ভুরি ভোজন চলিত। স্নান-যাত্রার সময় সত্য সত্যই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সমাগম হইত। তখন রেল হয় নাই, স্টীমার-চলাচল ছিল; সেই সময়ে দূরদেশাগত এক এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জন্য কত-যে পাথেয় ব্যয় হইত, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। আমি তখন অতি বালক, এখন জু-বাগানে গিয়া যেমন সিংহ দেখি, উলায় আগত দ্রাবিড়ী, সুরাটী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে তখন সেই ভাবেই দেখিতাম; সেই জন্য বেশ মনেও আছে।

উলায় তখন সঙ্গীতের চর্চা খুব ছিল, প্রসিদ্ধ গান-বিলাস মহাশয়ের পুত্র হরচন্দ্র তখন বিদ্যমান। দুই তিন জন ভাল মৃদঙ্গী ছিলেন; দীনে ঢুলী ছিল; কয় জন বেশ ভাল সানাইওলা ছিল, নাম মনে পড়িতেছে না। অধিকাংশ ভদ্রলোকই মিষ্টভাষী, সদালাপী ও সুরসিক ছিলেন। এখন যেমন দশজন এক সঙ্গে একস্থানে বসিলেই—বৃষ্টি হইল না, কুয়াসায় আম কাটিয়া গেল, ইউনিভারসিটি বিলে সর্বনাশ করিল, বঙ্গচ্ছেদে উত্তমাঙ্গ ছেদ হইল, ছেলে বেটা অবাধ্য, চাকর বেটা কেবল ঘুমায়,—অকারণ সকারণ—সময়ে অসময়ে—এইরূপ কথারই জল্পনা হইয়া থাকে, তখন সেরূপ কদাচিৎ হইত। তখন দশজন একত্র হইলে, সঙ্গীতের চর্চা হইত, খোসগল্প চলিত; কেহ-কেহ-বা বড় বড় কেস্‌সা, কাহিনী বলিলে সকলে শুনিত, সেই গল্পের রস উপভোগ করিত, আনন্দ পাইত, আনন্দ দান করিত।

সন্ধ্যার পর পিতৃদেবের বাসায় মহা মজলিস্ হইত। মন্ত্রণাগৃহ নহে; দুঃখ-দারিদ্র্য-জ্ঞাপনের স্থান নহে; পরনিন্দা, পরকুৎসা প্রসার করিবার কেন্দ্র নহে; দুর্বিষহ রাজনীতি চর্চা করিবার ক্ষেত্র নহে; রাণ্ডির ব্রাণ্ডির প্রমোদভবন নহে; কিন্তু মজলিস্, ভরপুর মজলিস্—গম্‌গমে মজলিস্। জুলুস্ শব্দ হইতে মজলিস্। জল্‌সা শব্দে উজ্জ্বলতা। সেই মজলিস্ কতই-না উজ্জ্বল! তাহাতে আনন্দই কত! সেরূপ হাসির গড়্‌রা, সেরূপ আনন্দের উচ্ছ্বাস—আর ত এখন কোথাও দেখিতে পাই না। ছেলে-পুলেরা কখন দেখিতে পাইবে কি না তাহাও বলিতে পারি না।

এই শান্ত মজলিসে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের চর্চা বিশেষরূপে হইত। সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঁচিশ, জীবনচরিত প্রকাশিত হইল; তিনি 'কৃষ্ণনগরের মূলপুস্তক দৃষ্টে' ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ প্রকাশিত করিলেন। তারাশঙ্করের কাদম্বরী প্রকাশিত হইল। এই সকল পুস্তক এবং সেই সময়ের অন্যান্য পুস্তক—ভাল অক্ষরে ছাপায়, ভাল সংস্করণে যেমন প্রকাশিত হইত, পিতা একখণ্ড ক্রয় করিতেন; আর এই সান্ধ্য সম্মিলনে পঠিত, আলোচিত, আন্দোলিত হইত। সেই সাহিত্যের আন্দোলনে আনন্দের ফুয়ারা উঠিত।

আমার মনে পড়ে, যে দিন তারাশঙ্করের কাদম্বরীর প্রথমে পাঠ আরম্ভ হইল। শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় আসিতেছেন, পথিমধ্যে বাল্মীকি সগৌরবে পরশুরামের অবতারণা করিয়াছেন। যৌবনে তাহা পাঠ করিয়াছিলাম, সে গৌরবও বোধ হয় ভুলিতে পারি। প্রৌঢ়ে রসিকদাস কীর্তনীয়া মহাগৌরবে মহা-আড়ম্বরে জয়দেবের 'বদসি' গানের অবতারণা করিয়াছিল, তাহাও হয়ত ভুলিয়া যাইব, কিন্তু বাল্যে সেই-যে পিতৃদেব-কর্তৃক কাদম্বরী-পাঠ, তাহার গৌরব, তাহার মর্যাদা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না। সেই-যে শ্রোতৃবর্গ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, তামাক টানিতে ভুলিয়া গিয়া, হুঁকাহস্তে, বিস্ফারিত নয়নে, একমনে একধ্যানে, পিতৃদেবের মুখপানে চাহিয়া আছেন, আর যেন সর্বাঙ্গে কাণ পাতিয়া, সেই কাদম্বরী-সুধা পান করিতেছেন, সাহিত্য-সেবার সেরূপ জাঁক-পসার, সেরূপ তন্ময়তা, সেরূপ একাগ্রতা কখন ভুলিতে পারিব না। মনে পড়িতেছে, 'শূদ্রক নামে অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন অতিবদান্য মহাবল

পরাক্রান্ত প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। বিদিশানাম্নী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। যে স্থানে বেত্রবতী নদী বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবার সেই গলাভরা আওয়াজ, প্রাণভরা উৎসাহ, আনন্দ-পূর্ণ চক্ষু, আর শ্রোতাদের সেই ঐকান্তিক আগ্রহ,—সকলই মনে পড়িতেছে। তখনকার সাহিত্য-সেবা যেন দেবতার পূজা। এখনকার আমাদের সাহিত্য-সেবা যেন এনাটমিক্যাল ডিসেক্‌সন্—অস্থি-মাংস-চর্মের ব্যবচ্ছেদ। একখানি সাহিত্য-গ্রন্থ পাইলে, আমরা করি কি, দুই ছত্র পড়িতে না পড়িতেই সমালোচনার ছুরি বাহির করিয়া তাহার ভাষা চিরি, তাহার ভাব চিরি, তাহার অলঙ্কার চিরি, ইতিহাস চিরি, খণ্ড খণ্ড করি, তাহার পর আবার বোতলে পুরিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠাইয়া দিই। বলি, আমি ত সামান্য ডাক্তার, এই করিয়াছি। তুমি সাহিত্য-জগৎ,—কেমিক্যাল একজামিনার, রাসায়নিক পরীক্ষক,—তুমি একবার এসিড দিয়া, ঘৃণা দিয়া, অবজ্ঞা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ-না-কেন, ইহার মধ্যে কি আছে। আমাদের এখনকার কালের সাহিত্য-সেবা এইরূপ, আর তখনকার সেই কাদম্বরী-পাঠ যেন বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের আরতি। সাহিত্য তখন উপভোগের সামগ্রী, আরাধনার বস্তু। কত আয়োজনে কত যত্নে, কত পরিশ্রমে, তখন সাহিত্য-সেবা হইত। সাহিত্য-সেবায় লোক ভক্তিতে গদ্‌গদ হইত, আনন্দে অশ্রু-পরিপ্লাবিত হইত। ভক্তি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস এই সকল লইয়া তখন সাহিত্যসেবা, সাহিত্যচর্চা, সাহিত্য-পূজা। এখনকার মত ছুরি কাঁচি বঁড়শি লইয়া সাহিত্য-ভেদ, সাহিত্য-বেধ, সাহিত্য-ব্যবচ্ছেদ তখন ছিল না। হায়! আমরা কি সাহিত্য-সেবাই শিখিয়াছি !!!

১৩

পিতৃদেব স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া, অধিনায়কতা করিয়া, তাৎকালিক শিক্ষা-বিভাগ-পরিচালিত করিয়া উলা গ্রামে তিনটি বাঙ্গালা পাঠশালা ও একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এই জন্য তাঁহাকে সভা করিয়া বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তখন ইংরাজিতে রামগোপাল ঘোষ বড় বক্তা। কিন্তু ইহার পূর্বে স্কুল-স্থাপনের জন্য বা এইরূপ কোন কারণে কেহ-যে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এমন কথা শুনি নাই। সেই বক্তৃতার উদ্বোধনভাগের নমুনা দিতেছি।

'অদ্য রজনী কি সুখদায়িনী! যে-রজনীতে আমরা বৈষয়িক ব্যাপারের ব্যস্ততা হইতে নিরস্ত হইয়া ক্ষণিককাল সুখে সংবরণ-করণ-কারণ এক অতিশয় সদালোচনায় প্রবৃত্ত-চিত্ত হইয়াছি। যে-রজনীতে এই বীরনগরের ভাবী সৌভাগ্যের সমুন্নতি-হেতু অত্রত্য সাধু ও সমৃদ্ধ জনসমাজের সমাগমন হইয়াছে। যে-রজনীতে মদীয় বহুদিবসীয় মনোরথ পূর্ণ হওনের বিলক্ষণ সুলক্ষণ সমীক্ষণ করিয়া মম মানস আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে।'

বিলক্ষণ, সুলক্ষণ, সমীক্ষণ লিখিতে গিয়া পিতার পৌত্র* হাসিলেন। সে কথা ত পোপ সাহেব বলিয়াছিলেন,—

'We think our fathers fools, so wise we grow,
Our wiser sons shall surely think us so.'

ভাষা পুরুষে পুরুষে পরিবর্তন হইতেছে। ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যে, মৃত্যুঞ্জয়ের স্থানে স্থানে, তারাশঙ্করের সমস্ত, এইরূপ বিলক্ষণ সুলক্ষণ অনুপ্রাসে ভরা। তখন বাঙ্গালা গদ্যের শিশুকাল। তখন পায়ে দিবে চারগাছা মল,—কোমরে দিবে বোরপাটা, নিমফল,—কাণে দিবে বীর-বৌলি,—পিঠে ঝুলিবে ঝাঁপা,—হাতে দিবে বাজুবন্দ,—মাথায় দিবে পুঁটে—বেড়াবে ছুটে ছুটে,—তখন কি অলঙ্কার এড়ানো যায়?—না, বালচাপল্যের নিবৃত্তি হয়? তাহা ত হয় না। হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া, মাগধী এখনও অলঙ্কারের ছটা লইয়া বিব্রত। আমরা যে কাটাইয়া উঠিয়াছি—আড়ম্বরশূন্য, অলঙ্কারশূন্য, সহজ, সরল,

* পিতাপুত্রের শেষ-অংশ ভিন্ন সমগ্র গ্রন্থ গ্রন্থকার মুখে মুখে বলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র শ্রীঅজরচন্দ্র লিখিয়া লইয়াছিলেন।

অথচ সতেজ, সুন্দর গদ্য লিখতে আমরা যে পারি, সেই ত বাঙ্গালির কৃতিত্ব, সেই ত বাঙ্গালির গৌরব। তাহাই ত বাঙ্গালির মহতী কীর্তি।

এই তিনটি বাঙ্গালা স্কুলে প্রায় ৫০০ ছাত্র হইল। সংস্কৃত কলেজ হইতে কাব্য-সাহিত্য উত্তীর্ণ এক জন করিয়া ছাত্র প্রধান শিক্ষক, অর্থাৎ হেড পণ্ডিত। নিম্নতর শ্রেণীর জন্য এক জন করিয়া গুরুমহাশয় আর এক জন করিয়া জরিপ-ও পরিমিতি-অভিজ্ঞ বাঙ্গালা শিখাইবার পণ্ডিত। তখন বাঙ্গালা দেশে নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয় নাই, জরিপজানা দ্বিতীয় পণ্ডিতের বড়ই অভাব হইল। উলারই একটি ভদ্র লোককে পিতা জরিপ শিখাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে দক্ষিণ পাড়ার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। দক্ষিণ পাড়ার বারইয়ারী পূজার বৃহৎ আটচালায় ঐ বাঙ্গালা স্কুল হইত। সেই আটচালা আমাদের বাসার অতি নিকটে ছিল। ঐ দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় স্কুলের সময়ের পূর্বে এবং পরে আসিয়া পিতৃদেবের কাছে পাঠ গ্রহণ করিতেন। ছয় মাসে তাঁহার শিক্ষা হইল। ইন্‌স্পেক্টর প্রথমে তাঁহাকে প্রোবেশনরী পদ দিলেন, পরে পরিমিতির পরীক্ষা করিয়া পাকা পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনি উলার ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়; তিনি পাখোয়াজে সিদ্ধহস্ত। মিঠে হাত এবং তালে দোরস্ত। তখনকার কালের আর এক জন লোক বাঁচিয়া রহিয়াছেন, সেই জন্য এই কথাটা এত দীর্ঘচ্ছন্দে বলিলাম।

ইংরাজি স্কুলে চারি পাঁচ জন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। হেড মাস্টার হইলেন পিতার একজন ছাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি, পিতৃদেব কৃষ্ণনগর-কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। এই সকল মাস্টার-পণ্ডিত-সমাগমে, আমাদের সেই সান্ধ্য সভা আর এক প্রকার জমাট হইল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সমাগমে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা হইতে লাগিল এবং যে দিন হেড মাস্টার মহাশয় আসিতেন সে দিন সেক্সপিয়ার প্রভৃতিরও চর্চা হইত। সঙ্গীতের চর্চা নিত্যক্রিয়া ছিল। পিতৃদেব ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাখোয়াজ শিক্ষা করিতেন। সভাভঙ্গের পর গুরুশিষ্যে মিলিয়া এই কাণ্ড হইত; রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া যাইত; তৎপূর্বেই আমি অবশ্য শয়নাগারে গমন করিতাম।

এই যে স্কুল-পাঠশালা-প্রতিষ্ঠা ইহাতে পিতৃদেবের কৃতিত্ব ত ছিলই, সরকার বাহাদুরের সাহায্য এবং উৎসাহদান বিলক্ষণ ছিল। সংস্কৃত কলেজে তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় অধ্যক্ষ। তিনি সেই অধ্যক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা স্কুল স্থাপনের, রক্ষণের ও শাসনের ভার কয়েকটি জেলার মধ্যে পাইয়াছিলেন। হেড পণ্ডিত তিন জনকে তিনি পাঠাইয়া দেন। নদীয়া জেলার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন, পাণ্ডুয়ার নিকট বেলুনের রামলাল মিত্র। তিনি সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র। কাজ চালানো মত ইংরাজি অবশ্য জানিতেন; কি ইংরাজি, কি বাঙ্গালা, কি পেনে, কি শরে—তিনি মুটকলমে, কলমের উপর তর্জনীর ভর দিয়া লিখিতেন। উড়েরা সকলেই এইরূপ লেখেন; বাঙ্গালা টোলের ছাত্রেরা কখন কখন ঐরূপ লেখেন। সাহায্য-প্রাপ্ত-স্কুল-স্থাপনের জন্য ভার পাইলেন হজ্‌সন্ প্রাট। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র। সেই সময় বাঙ্গালাময় স্কুল বসাইবার ধুম পড়িয়া গেল। এখানে স্কুল, সেখানে স্কুল, চারিদিকে স্কুল, বিদ্যাবিতরণের জন্য সরকার বাহাদুরের ব্যগ্রতা ও ব্যয়-বাহুল্য-দর্শনে লোকে বিস্মিত হইল, মহাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। এখনকার দিনে হইয়াছে, মাছি পড়িয়াছে জাল গুটাও গুটাও। লেখাপড়া শিখিয়া লোকে বিদ্রোহী হইতেছে, বাচাল হইতেছে; লেখাপড়ার বিস্তার কমানই ভাল। তাই এখনকার দিনে সেই পুরানো কথাগুলি মনে পড়ে, আর মনে হয়, সেই এক দিন, আর এই এক দিন। যেমন সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় বসিল, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে হজ্‌সন্ সংবাদপত্রে সাহায্যদান করিতে অগ্রসর হইলেন। তৎপূর্বে যে সংবাদপত্র ছিল না এমন নহে এবং সংবাদ-পত্রের যে প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল না তাহাও নহে। তবে গভর্নমেন্টের কথা লোককে বুঝাইবার জন্য একখানি

সংবাদপত্রের প্রয়োজন বোধ হওয়াতে গভর্নমেণ্ট ওব্রাইনন্ স্মিথকে সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, ওব্রাইনন্ স্মিথ সংবাদপত্র প্রকাশিত করিলেন।

তখন খৃস্টানির সংবাদপত্র ছিল, জ্ঞানকিরণোদয় প্রভৃতি। ধর্মের জন্য ছিল,—এক পক্ষে সমাচারচন্দ্রিকা, উহা দৈনিক; অন্য পক্ষে ছিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, উহা মাসিক। আর সাধারণ সংবাদ-বহন ও রসভাষ-সঞ্চালনের জন্য ছিল,—এক দিকে প্রভাকর, অন্য দিকে ভাস্কর। তখন আমি চন্দ্রিকা দেখি নাই। পড়িতাম তত্ত্ববোধিনী ও মাসিক প্রভাকর। দৈনিক প্রভাকরে সংবাদ-আদি থাকিত আর সরিফ্‌সেলের বিজ্ঞাপন থাকিত। উহা আমি বড় পড়িতাম না। প্রতি মাসের প্রথম দিনের প্রভাকরে প্রচুর পদ্য থাকিত। তাহাই পড়িতাম, নাড়িতাম-চাড়িতাম, মুখস্থ করিতাম। প্রতি বৎসরের ১লা বৈশাখের প্রভাকর অবয়বে ছয় ভাগের কলিকাতা গেজেটের মত পুরু। সংবৎসরের প্রধান ঘটনাবলী, রংবিরং পদ্যে, ঈশ্বর গুপ্তের সেই সরল সতেজ লেখনীতে প্রকাশিত হইত।

১৪

পূর্বেই বলিয়াছি, ১৮৪৬ সালে অগ্রহায়ণ মাসে আমার জন্ম হয়। ১৮৫৬ সালের আশ্বিন মাসে উলা ছাড়িয়া আসি। তখন আমার বয়স্ পুরো দশ বৎসর হয় নাই। ইতিমধ্যে তিন বারকার বার্ষিক প্রভাকর আমি পড়িয়াছিলাম, অর্থাৎ সপ্তমবর্ষে আমি প্রভাকর পড়িয়াছি, বুঝিয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি। ঐ তিন বৎসরের মধ্যে অন্নদামঙ্গল, তিনখণ্ড চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, কাদম্বরী, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের অরবীয়োপাখ্যান ও সেক্সপিয়ার হইতে অপূর্বোপাখ্যান, পাল বর্জিনিয়া প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম। Honi soit qui mal y pense.*

এই নয় বৎসর-মধ্যে তিন জন ডেপুটি ইনস্পেক্টরকে উলায় দেখিয়াছিলাম। এক জনকার নাম করিয়াছি—বেলুনের রামলাল মিত্র; দ্বিতীয়—কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি কৃষ্ণনগরের ব্রজবাবু বলিয়া বিখ্যাত এবং পরে কৃষ্ণনগরে স্বয়ং স্কুল স্থাপনা করেন। তৃতীয় ব্যক্তি গরিফার চন্দ্রশেখর গুপ্ত; বিখ্যাত বি. এল. গুপ্তের পিতা। ইঁহার পত্নী অর্থাৎ বি. এল. গুপ্তের মাতা সুন্দর সাধুভাষায় বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন। আমি তাঁহার লেখা পত্র তৎকালে দেখিয়াছিলাম; একটু বেশি সাধুভাষা তাহাতে ছিল,—'পদবীতে পদার্পণ' প্রভৃতি বেতালপঁচিশী পদ সেই পত্রে ছিল। তাহা থাকুক, কিন্তু লেখা অতি প্রাঞ্জল, সুন্দর ও সরল। পিত. সেই পত্র আদর্শরূপে আমার মাতাকে দেখাইয়াছিলেন, আমার বেশ মনে পড়িতেছে। কলিকাতার খবর তখন ত জানিতামই না, এখনও ভাল জানি না। তখনকার কালে আমাদের গঙ্গার দুধারের পল্লীর মধ্যে বেহারীবাবুর মাতার মত কেহ যে লিখিতে পারিতেন, এমন বোধ হয় না। ১৮৫৬ সালে মার্চ মাসে চন্দ্রশেখর গুপ্ত মহাশয় উলার বিদ্যালয় সকল পরিদর্শন করিতে যান। অবশ্য আমাদের বাসাতেই ছিলেন। আমি কোন স্কুলে পড়িতাম না, গুপ্ত মহাশয় আমাকে পৃথক্ পরীক্ষা করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়-লিখিত 'জীবনচরিত' পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে পারিতোষিক দেন। সে বইখানি আমাদের বাড়িতে আজিও আছে।* এখানি তৃতীয় বারের ছাপা। প্রথম বারে ১৭৭১ শকে ভাদ্র মাসে ছাপা হয়। দ্বিতীয় বারে ১৭৭৩ শকে চৈত্র মাসে, আর তৃতীয় বারের এই সংস্করণ ১৭৭৭ শকের বৈশাখ মাসে ছাপা হয়। প্রাইজ পাইয়া অবশ্য আমি জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলাম। ফোকাল ডিস্টানস্ পদার্থটা কি, কাহাকে বলে, তাহা অবশ্য তখন কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু বাঙ্গালা শিখিয়াছিলাম—'আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি।' পঞ্চপাদিক মানে বুঝিয়াছিলাম যাহার পরিমাণ পাঁচ ফুট। ইত্যাদি ইত্যাদি। বহুপরে শুনিয়াছি, যে সময়ে জীবনচরিত রচিত হয়, সে সময়ে

* Evil to him who evil thinks.

* এখন আর নাই।

কৃষ্ণবন্দ্যের বা রেভারেণ্ড কে. এম. বানার্জীর বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য-স্থিরীকরণ-বিষয়ে একাধিপত্য ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই জীবনচরিত তিনি নাকি ভাষা-দুষ্ট বলিয়া দূরীকৃত করেন এবং পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানারূপ চেষ্টা করিয়া তবে জীবনচরিতকে পাঠ্য পুস্তক-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে সফলকাম হন।

গরিফার চন্দ্রশেখরবাবুর কথা পড়াতে গরিফার একজন তৎকালিক গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহার গ্রন্থের কথা মনে পড়িল। ১৮৫২ সালে গরিফার বৈদ্য শ্রীনন্দকুমার রায় ব্যাকরণদর্পণ নামে একখানি পদ্য ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। আমি মুখে মুখে সন্ধি করিতে শিখিয়াছিলাম; আর এই ব্যাকরণদর্পণ পড়িয়াছিলাম ও অনেক স্থানই মুখস্থ করিয়াছিলাম। ব্যাকরণদর্পণের ছন্দের লক্ষণগুলি বেশ সুন্দর।

চারি চারি বর্ণ সারি তিন চারি রয়,
কহি শেষ, অবশেষ দুই শেষ হয়।
সারি সারি মিল ধারি বর্ণ চারি পাবে,
সর্ব শুদ্ধ বর্ণ চৌদ্দ ইথে লব্ধ হবে।
চতুঃসপ্ত বর্ণে দশান্তে বিহারি,
ভুজঙ্গ প্রয়াতে হবে হ্রস্ব চারি।

নন্দকুমার রায়-কৃত আর একখানি পুস্তক সেই সময়ে পাঠ করিয়াছিলাম। সেখানি অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের বঙ্গানুবাদ। যেখানে সংস্কৃত শ্লোক আছে, বঙ্গানুবাদে সেই সেই স্থলে পয়ার বা ত্রিপদী ছিল। লেখা অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত। সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ এইখানি বোধ করি, সর্বপ্রথম হইবে। আমি তখন নাটকের কায়দা, কারচুপি—সে সকল কিছুই জানিতাম না। পিতা বুঝাইয়া দিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। ভাষা ছাড়া আর কিছু যে কেতাবে বুঝিতে হয়, তাহা আমি বুঝিতাম না; তবে ভাষা বুঝার পরে আমার সেই বালক-হৃদয়ে যে-কিছু রসগ্রহ হইত না, এমন কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। কৃষ্ণবন্দ্যের ভাষাও ত ভাষা; তাহা পড়িতে একেবারেই ভাল লাগিত না; আর বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভারতচন্দ্র, নন্দকুমার ইঁহাদের সে ভাষাই-বা পড়িতে ভাল লাগিত কেন? অক্ষয়কুমারের কথা সকল—অতি গভীর, লেখা—প্রগাঢ়, ভাব—গম্ভীর, তবু সে ভাল লাগিত, অথচ কৃষ্ণবন্দ্যের রাজোপাখ্যান কেবল গল্প বই ত নয়, তাহা ভাল লাগিত না কেন? কাজেই বলিতে হইতেছে, আমি বালজীবনে যে কেবল ভাষাই শিখিতেছিলাম এমন নহে, না বুঝিয়া না শুঝিয়া, একটু একটু সাহিত্যও শিখিতে ছিলাম। রস-রচনা কাহাকে বলে তখন না বুঝি, কিন্তু রসের স্বাদ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতেছিলাম। প্রভাকরের পদ্য উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য না হইলেও সহজ সরস রচনা বটে। নন্দকুমারের শকুন্তলার অনুবাদ খুব সহজ না হইলেও সরল সরস রচনা।

আমার জন্মের দুই বৎসর পূর্বে—১২৫৩ সালে আমার জন্ম হয়—১২৫১ সালে, মহাত্মা রাজনারায়ণ মিত্র 'কায়স্থ-কৌস্তভের' প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রচারিত করেন। আমার জন্মের দুই বৎসর পরে ১২৫৫ সালে তৃতীয় সংখ্যার কায়স্থ-কৌস্তভ প্রকাশিত হয়। কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রতিপাদন ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তৃতীয় পৃষ্ঠায় নারায়ণের পদতলস্থ 'একবিংশতি চিহ্নের চিত্র-বিচিত্র রূপ প্রকটিত' ছিল। আমি অতি শিশুকালে সেই সকল অপূর্ব চিত্র-বিচিত্র পাইয়া মনের সহিত কায়স্থ-কৌস্তভ লইয়া খেলা করিতাম। সে পুস্তকখানি এখনও আমার আছে; সে তৃতীয় পৃষ্ঠার ছবিগুলিও আছে।* ৬০ বৎসর পূর্বে এরূপ পরিষ্কার চিত্র ক্ষোদিত হইত, আমার সে বইখানি না দেখিলে, আপনারা বিশ্বাস করিবেন না। যাউক সে কথা, আসল কথা কায়স্থ ক্ষত্রিয় এই কথাটা মাতৃদুগ্ধের সহিত আমার উদরস্থ হইয়াছে। তখন এ বিষয়ে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, আঁন্দুলের রাজারা এই বিষয়ে নাকি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বিল্বপুষ্করিণীর পীতাম্বর তর্কভূষণ, শোভাবাজারের সভাপণ্ডিত ভগবান্‌চন্দ্র ন্যায়রত্ন, কোননগরের তারাচরণ তর্কবাগীশ, সোনামুখীর বৈদ্যনাথ

* এখন আর নাই।

ন্যায়ালঙ্কার, ভাটপাড়ার হলধর তর্কচূড়ামণি, সংস্কৃত কলেজের জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি এতদ্দেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব-বিষয়ে মত প্রদান করেন। আমি অতি বালক-কালে এই সকল কথা গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম। কায়স্থকৌস্তুভ প্রকাশের ৬০ বৎসর পরে, এখনও সেই কথা সমানে চলিতেছে। এখনকার কায়স্থসভায় আমি কয়দিন যাতায়াত করিয়াছিলাম। আমার বোধ হইতেছে ৬০ বৎসর পূর্বে কথাটা যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়, ব্রাত্য হইয়াছে, যাগ-যজ্ঞাদি করিলে সেই ব্রাত্যত্ব খণ্ডিত হইতে পারে। আমি বুঝিতে পারি না যে পঞ্চাশ-ষাট বৎসর অন্তর এ কথাটা এরূপ করিয়া আলোড়ন করার ফল কি। যদি হিন্দু বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কর, যদি জাতি বলিয়া কোন সত্য পদার্থ আছে মানিতে পার, তবে এ কথার আন্দোলনে অর্থ আছে, নতুবা 'তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে।'

১৫

তখন পদ্যে যেমন প্রভাকরের প্রসার, গদ্যে তেমনই তত্ত্ববোধিনীর গৌরব। ১৮৪৩ সাল হইতে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়। ১ম ভাগ ১ সংখ্যা হইতে তত্ত্ববোধিনী আমাদের বাটীতে ছিল। এক দিকে অক্ষয়কুমারের ভাষা হইতে যেমন গম্ভীর রচনার ভঙ্গি শিক্ষা করিলাম, অন্য দিকে গুপ্তের সেই সরল চটুল চক্‌চকে পদ্যের ভাষাও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন প্রভাকরের প্রভূত পসার। লোকে কথায় কথায় প্রভাকরের পদ্য আওড়াইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করে, তামাসা করিতে হইলে প্রভাকরের ভাষায় বলে।—এই গৌরব এই আদর দেখিয়া বালক-হৃদয়ে একরূপ বুঝিয়াছিলাম যে, সহজ সরল বাঙ্গালা একটা ফেল্‌না জিনিস নয়। অক্ষয়কুমার হইতে এক দিকে যেরূপ মুখস্থ করিয়াছিলাম—'ঘন বিজন কানন বা তরুশূন্য মরুদেশ, গভীর সিন্ধুগর্ভ বা জনাকীর্ণ রাজধানী, প্রখর রশ্মিপ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন-সময় বা ঘোরা দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরী, তরুণ যৌবন বা পরিপক প্রবীণ কাল, সুশীতলসমীরসঞ্চালিত প্রভাত-সময় বা বিহঙ্গকোলাহলকলিত শ্রান্তিহর সায়ংকাল—সর্বস্থানে, সর্বকালে, সর্বাবস্থায় পরাৎপর পরমেশ্বরকে সাক্ষি-স্বরূপ দেখিয়া, ভক্তিমানের চিত্ত ভক্তিভরে দ্রবীভূত হয়।' অন্য দিকে সেইরূপ,—

'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত—ব্যাপ্ত চরাচর।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥'

ইত্যাদি এবং 'বিবিজান চলে যান লবেজান্ করে' ইত্যাদি মুখস্থ করিয়াছিলাম। তাহার ফল এই হইয়াছে, সহজ বাঙ্গালা আমি এখনও ফেল্‌না জিনিস মনে করি না।

যে সাহায্যপ্রাপ্ত সংবাদপত্রের কথা বলিতেছিলাম তাহা এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ। এখনও সেই সাহায্য চলিতেছে কিন্তু সে আকার নাই, সে প্রকার নাই। এখনকার দিনের মত নয়, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অক্ষরে ছাপা প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হইল, আমার বেশ মনে পড়িতেছে। ওব্রাইনন্ স্মিথ স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক; কালিদাস মৈত্র সহ-সম্পাদক। তাঁহার দুই তিন জন আত্মীয় উলায় থাকিতেন, তাঁহারা হর্ষে, গৌরবে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন,—সকলে একটু ঠাণ্ডা হইলে, আমি চুপি চুপি তাহা হইতে যাদব-মাধবের কথোপকথন পাঠ করিতে লাগিলাম। গেজেট কথাটা আমি তৎপূর্বে শুনিয়াছিলাম। বাঙ্গালা গেজেট দেখিয়াও ছিলাম। এড়ুকেশন কথাটা তৎপূর্বে আমার কাণে উঠে নাই। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই কথাটা কি?' বাবা বলিলেন, 'ওটা ইংরাজি কথা—অর্থ "শিক্ষা"।' আমি বলিলাম, 'তবে শিক্ষা গেজেট বলিল না কেন?' পিতা একটু হাস্য করিলেন। বোধ হয় শৈশবে আমার সমালোচনার প্রবৃত্তি দেখিয়া, তিনি হয়ত একটু আহ্লাদিত অথচ বিচলিত হইতেছিলেন। আমি পঞ্চাশ বৎসর কথাটা শুনিতেছি কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের মুখপত্রের নাম এড়ুকেশন গেজেট—এ বিড়ম্বনা-কণ্টক এখনও প্রাণে খচ করিয়া উঠে।

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ,

শিক্ষা-বিস্তারের সহায়ক এবং বাঙ্গালা পাঠ্য-পুস্তকের প্রণেতা। কিন্তু আমার বর্ণপরিচয় 'বর্ণপরিচয়ে' হয় নাই। আমরা প্রথমে স্কুলবুক সোসাইটির বর্ণমালা পড়িয়াছিলাম। তাহাতে ছিল 'জল পড়ে, ছাতা ধর।' মদনমোহনের শিশুশিক্ষা পড়িয়াছিলাম। তাহাতে ছিল, 'কাল কাক ভাল নাক।' 'পাখী সব করে রব।' 'কটু বাক্য কহা অনুচিত।' 'বেণী বড় দুরন্ত বালক।' 'ধার্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার।' আমরা দশ জনে এখন কত রকম বাঙ্গালা লিখিতেছি। কেহ ঝাড়-ঝঙ্কার দিতেছি; কেহ ফুলে-ফলে শোভিত করিতেছি; কেহ প্যাঁচের পর প্যাঁচ লাগাইয়া ভাষার কায়দা-বিন্যাসে গোলকধাঁধা করিতেছি। কিন্তু মদনমোহনের সেই সুন্দর, সতেজ, সরল, সহজ, মিঠা-কড়া, মোলায়েম, জলের মত পরিষ্কার, স্বচ্ছ ভাষা লিখিতে পারি কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রভৃতি পড়ি নাই বটে; সেই সময়ে পড়িয়াছিলাম, তাঁহার বেতাল-পঁচিশ। আমি মনে করিতেছি, উহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। বেতাল-পঁচিশ হইতেও নানা স্থানে মুখস্থ করিয়াছিলাম,—'যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র দশাননের বংশ ধ্বংস করণাভিপ্রায়ে মহাকায় মহাবল কপিবল-সাহায্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবোপরি কীর্তি হেতু সেতু সংঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনী-বল্লভ প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক ভূরুহ উত্থিত হইল, তদুপরি এক সকল-লোক-ললামভূতা সর্বাঙ্গসুন্দরী চার্বঙ্গী বীণাবাদনপূর্বক গান করিতেছেন।'

দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, তৎপার্শ্বে উপবীত-বক্ষে গণেশমূর্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতী-স্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ুর-চূড়া, টেরি-কাটা কার্তিক-স্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহাদেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরূপী মদনমোহন,—সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার উপাসক। অনর্থক পিতৃগৌরব বৃদ্ধির জন্য পিতৃদেবকে মধ্যস্থানে অধিষ্ঠিত করিতেছি, এমন কেহ মনে করিবেন না। বাঙ্গালা লেখাপড়ায় আমার প্রবৃত্তি, পন্থানুসরণ, শিক্ষায় সাহায্য, ভ্রমে সংশোধন প্রধানত তাঁহা হইতেই। তবে অন্য পঞ্চ দেবতার উপাসনা অতি শৈশবেও যেমন করিয়াছি, এখনও তেমনি করিতেছি।

তারাশঙ্করে ঝঙ্কার খুব। ঝঙ্কারে সুর তাল ডুবিয়া থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাদম্বরী-পাঠে মুগ্ধ হইতাম, স্তম্ভিত হইতাম, বিস্মিত হইতাম। কিন্তু কখন নিজের জিনিস বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত, তবে প্রাণে লাগিত না। কিন্তু অন্নদামঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর, অক্ষয়কুমারের গাম্ভীর্য, বিদ্যাসাগরের প্রসাদগুণ তখন হইতেই প্রাণে বাজিত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত। তখন অবশ্য জানিতাম না, কাহাকে বলে প্রসাদগুণ, কাহাকে বলে ওজোগুণ। এখনও বেশ জানি, সে কথা বলিয়া বুড়ো বয়সে অধর্ম সঞ্চয় নাই করিলাম।

আর প্রাণে লাগিত না কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদন-মোহন প্রভৃতি সকলের পূর্বে বাঙ্গালার লেখকরূপে অবতীর্ণ হন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সে হইল আমাদের জন্মের বহু পূর্বে; তাহার পর আমাদের এল.এ., বি.এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালার পরীক্ষক তিনিই ছিলেন। তাঁহার লিখিত বাঙ্গালা বহুকাল পুনঃ পুনঃ এন্ট্রান্সের কোর্স ছিল, কিন্তু সেই-যে ছেলেবেলা কৃষ্ণবন্দ্যী বাঙ্গালা প্রাণে লাগে নাই, ভালবাসি নাই, সেইরূপ কখন উহা ভালবাসিতে পারি নাই। এখন বুঝিয়াছি কৃষ্ণবন্দ্যের বাঙ্গালায় প্রাণ নাই বলিয়া প্রাণে লাগে নাই। তাঁহার লেখা পণ্ডিতি বাঙ্গালা, কিন্তু তাহাতে না আছে ভঙ্গি (স্টাইল), না আছে রস, না আছে আবেগ। মৃত্যুঞ্জয়ের পরে সকল গদ্যলেখকের অগ্রে, কৃষ্ণমোহন ইংরাজিতে বাঙ্গালায়, কোথাও ইংরাজির অনুবাদ বাঙ্গালায়, কোথাও বাঙ্গালার অনুবাদ ইংরাজিতে, কোথাও ইংরাজি বাঙ্গালা দুই সংস্কৃতের অনুবাদে,—এই ভাবে দ্বিভাষিক গ্রন্থ সংখ্যাদিক্রমে, ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করেন। তাহার বাঙ্গালা নাম বিদ্যাকল্পদ্রুম, ইংরাজি নাম Encyclopædia Bengalensis. শৈশবে আমি তাহার তৃতীয় খণ্ড পড়িয়াছিলাম। সেই খণ্ড মাত্রই

আমাদের বাড়ীতে ছিল, তাহাতে ছিল Arnold লিখিত রোমের ইতিহাসের কিয়দ্ অংশ, ইউক্লিডের জ্যামিতির কতকটা অনুবাদ। আর রাজদূত বলিয়া একটি গল্পচ্ছলে ধর্মকথা। আমি অবশ্য কেবল বাঙ্গালা ভাগই পড়িতাম। জিওমেট্রির বাঙ্গালাও পড়ি নাই, সে হিজিবিজি ক, খ, গ আমার ভাল লাগিত না।

১৬

থাক এখন আমার কথা। পিতার সাহিত্য-সেবার আর একটি অঙ্গ বলি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কবির গান প্রৌঢ়াবস্থা পাইয়াছে। হরু, নিলু প্রভৃতি ঠাকুরেরা,—চিন্তে, ভোলা প্রভৃতি ময়রারা,—বলাইচাঁদ, উদয়চাঁদ, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি আমাদের নিকটস্থ বৈরাগী কবিওয়ালারা—সকলেই প্রায় অন্তগত। এক দিকে চিন্তামণি, অন্য দিকে পরাণচন্দ্র বাদ-বিবাদ করিয়া কোনরূপে বাঙ্গালার আসর রক্ষা করিতেছিলেন। যাত্রার গানে বদন তখন ওস্তাদ হইয়াছেন; গোবিন্দ অধিকারীর তখন খুব জাঁক-পসার; গোপাল উড়ের তখন মৃত্যু হইয়াছে, প্রসিদ্ধ নৃত্যকারী কেপে ধোবা সেই দল তখন জাঁকে-জমকে রক্ষা করিতেছে। আর তখন জাঁক-পসার পাঁচালীর। গুরুদুম্ব, গঙ্গালস্কর তখন চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কথার ছটায়, শব্দের ঘটায় দাশরথি তখন বাঙ্গালা আচ্ছন্ন করিয়াছেন; আর আমাদের নিকটে চুঁচুড়ায় গাওনার জোরে, সুর-তালের বলে, সন্ন্যাসী তখন দাশরথির সমকক্ষতা করিতেছেন। এই সন্ন্যাসীর দলে একজন তবলা-বাদ্যকার ছিলেন ঠাকুরদাস সরকার, আমাদের অতি নিকট-প্রতিবাসী। উলায় থাকা-সময়ের মধ্যে, এই ঠাকুরদাসের অনুরোধে, পিতা তিন চারি পালা পাঁচালীর গান তাঁহাকে রচনা করিয়া দেন। ঠাকুরদাস সন্ন্যাসীর দল হইতে ভাঙ্গিয়া আসিয়া, রচনার বলে পৃথক্ দল করিয়াছিলেন। এক পালা শিবের বিবাহ; দ্বিতীয় পালা শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ; তৃতীয় পালা বিরহ; চতুর্থ পালা আগমনী। আগমনীর ছড়া মনে পড়ে না, গান বলিতে পারি। পাঁচালীর একটু নমুনা দিতেছি।—

শিব-বিবাহের উপক্রমণিকা

ভবানীর লীলাখেলা ভাবনা-অতীত।
যে ভাব ভাবিয়া ভব আপনি মোহিত॥
দেখ, দক্ষালয়ে দেহ করি পরিহার।
হিমাচলে লীলাছলে কুমারী-আকার॥
মহীয়সী মায়া তাঁর অপরূপ গণি।
মেনকারে মা বলেন জগতজননী॥
গিরিরানী কন্যা হেরে আনন্দ অন্তরে।
উমা নাম দেন তাঁর অসীম আদরে॥
পৌরজনগণ সবে পুলকে পূর্ণিত।
আনন্দে অচলালয় সদা আমোদিত॥
বাড়িছেন শৈলবালা সম শশিকলা।
দিন দিন গিরিপুরী করেন উজ্জ্বলা॥

ঐ পালার একটি গানেরও নমুনা দিতেছি—

(আজি) গিরিবাসে যান হর সাজি বর;
আনন্দ অপার, পরিহিত বাঘাম্বর,
শিরে শোভে শশধর, উথলিয়া গঙ্গাজল
ঝরিছে ঝর ঝর।
অমর সকলে হইয়া মিলিত,
অশেষ আমোদে কত আমোদিত,
বরযাত্র যান সবে বরের সহিত,
যাহার বাহন যেই তাহাতে করি ভর।
কেটেতাক্, কেটেতাক্ বাজনা বাজিছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ভূতগণ নাচিছে।
বম্ বম্ গালবাদ্য সকলে করিছে,
কোলাহলে কুতূহলে বলিছে হর হর॥

তখন বৈঠকি মজলিসে চুপির দেওয়ান মহাশয়ের, মুর্শিদাবাদের কালী ভট্টাচার্যের, নদীয়ার রাজা শিবচন্দ্রের, আর বাঙ্গালায় বহুপূর্ব হইতে প্রচলিত রামপ্রসাদ, নীলকমলের শ্যামাবিষয়িণী গীতি প্রায়ই গীত হইত।

পিতার রচিত কতকগুলি শ্যামাবিষয়ের গান বিশেষ প্রচারিত হইয়াছিল। লক্ষ্য করিয়াছি যে পিতৃদেব-কৃত একটি শ্যামাবিষয়িণী গীতি রামপ্রসাদের গানের মধ্যে (অবশ্য রামপ্রসাদের বলিয়াই) ছাপা হইয়াছে। গানটি এই—

পূরবী—একতালা

কে রে কাল কামিনী বাস-পরিহারিণী।
চরণে তরুণ অরুণ-নিকর, নখর-নিভাতি নিন্দি নিশাকর,
উরু রম্ভা-তরু নাভি মনোহর, নৃকর কটিতে কিঙ্কিণী॥
পীযূষ-পূরিত-পীন-পয়োধর পানে পুলকিত সুরাসুর নর,
করে শোভে অসি মুণ্ডাভয়-বর, কিবা নর-মুণ্ডমালিনী॥
তড়িৎ জিনি হাস্য সুচারু বদনে, খঞ্জন-গঞ্জন যুগল নয়নে,
শিশু-শব সব শোভিত শ্রবণে, কিবা আধশশি-ভালিনী॥
হেরে কাল কান্তি এলো কুন্তলে, কাদম্বিনী কাঁদে
বরিষণ-ছলে,
বামা গঙ্গাধর-হৃদি-হ্রদজলে, শোভে যেন নীল-নলিনী॥

পিতার বালক-কালে গঙ্গাধর নাম ছিল; আমাদের বাড়ীর পাটাতেও ছিল। বৃদ্ধদিগকে গঙ্গাধর বলিতে আমি শুনিয়াছি। স্কুলে গঙ্গাচরণ লেখানো হয়—সুতরাং চাকরিতে, কাজেই সর্বত্র, তিনি গঙ্গাচরণ বলিয়াই পরিচিত। গানের ভনিতায় 'গঙ্গাধর' দিলে রস হয়, অনেক সময়ে শ্লেষে রস বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য পিতৃদেব-কৃত সমস্ত ভনিতাযুক্ত গানে গঙ্গাধর ভনিতাই আছে।

অনেকগুলি কৃষ্ণবিষয়ক গানও ছিল। পুঁথি বাড়িয়া যায় বলিয়া নমুনা দিলাম না, তবে একটি কৃষ্ণবিষয়ক গান আমি গোবিন্দ অধিকারীকে আসরে গাহিতে শুনিয়াছি, সেটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ভৈরবী—যৎ

ভুবন ভুলালে হরি! লীলার ছলেতে,
সুরাসুর নরনাগ না পায় ভেবে মনেতে॥
চক্রপাণি নীরদতনু, কভু হাতে শর-ধনু,
কভু ব্রজে বাজাও বেণু, চরাও ধেনু গোঠেতে॥
যা'র প্রভু ধর পায়, কাঙ্গালিনী কর তায়,
কাঙ্গালিনী তব কৃপায়—বসে সিংহাসনেতে॥

বৈঠকি গানে তখন টপ্পা গানেরও জাঁকজমক খুব। রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু টপ্পার রাজা। এক দিকে শ্রীধর কথকের, অন্য দিকে ছাতুবাবুর টপ্পারও চল্‌তি সে সময় খুব ছিল। পিতৃদেব কতকগুলি উৎকৃষ্ট টপ্পা গীত রচনা করেন। অনেকগুলি সে সময়ে খুব চলিত ছিল। দুই একটি এখনও চলিত আছে। স্বনামপ্রসিদ্ধ সুলেখক আমাদের স্বগ্রামবাসী, আমার সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর গান করিয়া থাকেন।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি

রমণি! তোমার গুণে সুখময় এ সংসার,
জগতমোহিনী তুমি জগতের অলঙ্কার!
তুমি যদি এ মহীতে বিধুমুখে না হাসিতে,
শশিশূন্য নিশিসম হত সব অন্ধকার॥
তুমি ধনি যেই নরে নাহি হের প্রেমভরে,
নরপতি হয় যদি—সংসারে সন্ন্যাস তার॥

গারা ভৈরবী—মধ্যমান

না হয়ে পুরুষ যদি রমণী হইতে,
প্রেম যে কেমন ধন তবে প্রাণ জানিতে।
প্রাণ-প্রেম পরস্পর পুরুষে তা স্বতন্তর,
নারীর জীবন কিন্তু কেবল তার প্রেমেতে।
দেখ হে পুরুষ যত থাকে নানা কাজে রত,
ধন, মান, আর কত অভিলাষ করে চিতে!
রমণী নহে তেমন, প্রেমে মাত্র তার মন,
সে ধনে বঞ্চিত হ'লে, জানে কেবল কাঁদিতে॥

তখন যাহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত বলিত, সেরূপ গানও কয়েকটি পিতৃদেব রচনা করেন। দুইটি নমুনা-স্বরূপ দিতেছি—প্রথমটি সন্দেহ-দূরীকরণার্থ, যথা—

মালকোশ—আড়া

ভাবিতে তাঁহারে মন কেন রে সংশয়,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর সদা দেয় পরিচয়।
দিবসেতে দিবাকর, রজনীতে নিশাকর,
আর যত তারাগণ ভ্রমে আর এই কয়,—

'এক সর্বশক্তিমান্ যিনি ব্যাপ্ত সর্বস্থান,
আমা সবার নির্মাণ সেই প্রভু হতে হয়।'
যদি বল, তারা সবে, ভ্রমে সতত নীরবে,
কেমনে সঙ্গীত তবে তাঁরি গুণ কয়?
কিন্তু রে অবোধ মন, কর জ্ঞান-কর্ণার্পণ,
সে অপূর্ব কীর্তন শুনিবে নিশ্চয়।
ভাবিতে তাঁহারে মন নাহিক সংশয়,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর সদা দেয় পরিচয়॥

দ্বিতীয় গানটি ভক্তিভরে,—

সাহানা বাহার—যৎ

আশ্চর্য তোমার কার্য বাক্যমনের অতীত,
ভাবিলে আনন্দ-সিন্ধু হয় মনে উচ্ছ্বসিত।
এই দেখি প্রভাকরে ভুবন উজ্জ্বল করে,
ক্ষণেক বিলম্ব পরে সব তম আচ্ছাদিত।
কভু প্রভু, অকস্মাৎ হয় ঝঞ্ঝাবজ্রপাত,
কভু মন্দ মন্দ বাত সৃষ্টি করে আমোদিত
এইরূপে তবাদেশে কাল-প্রদেশ বিশেষে,
প্রকৃতি বিবিধ বেশে হয় প্রকাশিত!
তুমি প্রভু মূলাধার, যা কর তা চমৎকার,
তব মহিমা অপার, তব কার্যে পরিচিত।

১৭

ব্রহ্মসঙ্গীতের কথায় সেই সময়কার ব্রাহ্মধর্মের কথা বলিতে হইতেছে, আর পিতার সহিত ব্রাহ্মধর্মের সম্পর্কের কথাও বলিতে হইতেছে। পিতা তত্ত্ববোধিনী সভায় নিয়মিত চাঁদা দিতেন; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়মিতরূপে গ্রহণ করিতেন, পাঠ করিতেন, আলোচনা করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম পুস্তক আমাদের বাড়ীতে ছিল প্রথম সংখ্যা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল; আর পূর্বেই বলিয়াছি, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ছিল। হিন্দু ব্যবহারে, ব্রাহ্ম ব্যবহারে যে কিছু পার্থক্য আছে, এরূপ কথা শৈশবে আমি জানিতাম না। পিতার ব্যবহারেও কিছু বুঝিতাম না। পত্র কিংবা কোন কিছু লিখিবার পূর্বে আমি তখন যত লোককে জানিতাম, সকলেই লিখিতেন—'শ্রীশ্রীদুর্গা' বা 'শ্রীশ্রীহরি।' কেবল পিতা লিখিতেছেন—'শ্রীশো জয়তি।' ইহা যে কেবল পত্রের শিরোভাগে লিখিতেন এমন নহে, সকালে কোন-কিছু লিখিবার পূর্বে, একখণ্ড শাদা কাগজে দুই পঙ্‌ক্তিতে লিখিতেন শ্রীশো জয়তি। আমি অতি বালক-কালেই, সাধারণ হইতে এই বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম; কখন জিজ্ঞাসা করি নাই। পিতার সুহৃদ্‌বর্গ-মধ্যে কখন কখন কোন কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঐ কথা ধরিলে, পিতা বলিতেন, 'শ্রীশঃ কি কোন দেবতারই নাম নহে?' ও-কথা ঐ রূপেই শেষ হইত।

উলায় আমাদের বাসা বাড়ী। তবু সেখানে প্রতিমা গঠন করিয়া সরস্বতী পূজা হইত। এক শ্রীপঞ্চমীতে সেই স্থানে আমার হাতেখড়ি হয়, বেশ মনে আছে। আমাদের বাসার অতি নিকটেই মুন্‌সেফি কাছারী ঘর, মেটে আটচালা, খড়িটি করা। সেই কাছারীর খড়িটি করা দাওয়ার চারিদিকের মেজেয় আমি হাতেখড়ির পরদিন, খড়ি দিয়া বড় বড় ক খ লিখিয়া ঘুরিয়াছিলাম, আমার বেশ মনে আছে। উলায় সরস্বতী পূজা হইত, দেশে হইত কার্তিক পূজা। পরে, দুর্গোৎসব হইত। সে ত পরের কথা। এখন কেবল ব্রাহ্মধর্মের সহিত পিতার সম্পর্ক দেখাইবার জন্য এই কথা পাড়িলাম। তখন ধর্মের টানে না হউক, তত্ত্ববোধিনীর ভাষার মায়ায় অনেকেই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। অক্ষয়-কুমার,—বিদ্যাসাগর,—বাঙ্গালার দুটা বাঘা-ভাল্‌কো লেখক, তত্ত্ববোধিনীতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তত্ত্ববোধিনীতে প্রত্নতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এই সকলের নিয়মিত আলোচনা হইত। স্বদেশহিতৈষী সাহিত্যানুরাগী সকলেই তত্ত্ববোধিনীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। আর যদিও প্রথমে রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তত্ত্ববোধিনীতে পৌত্তলিকতার বিরোধ প্রকাশিত হইত না। তখন হিন্দুধর্মের ব্রণ বা বিস্ফোটকরূপে একরূপ ব্রাহ্মধর্ম স্ফীত হইয়া উঠে নাই। মধ্যে সেইরূপ

হইয়াছিল বটে, এখন বোধ হইতেছে সে ভাব আর নাই।

ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা-পদ্ধতি খৃস্টানির মত। সপ্তাহে সপ্তাহে, স্থান-বিশেষে সমবেত হইয়া আচার্যের অধিনায়কতায় সর্বশক্তিমানের শক্তি, মঙ্গলময়ের মাঙ্গল্য স্মরণ করাই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা। তাহাতে হিন্দুর বিরক্তিবোধ করিবার কিছু ছিল না, কখন করেও নাই। অনাচারের আড়ম্বরে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে; সেটা কলিকাতাতেই বেশি, মফস্বলে সে তরঙ্গ প্রায় যায় নাই। কৃষ্ণনগরে যৎকিঞ্চিত গিয়াছিল বটে; হুগলী, বর্ধমানে কিছুমাত্র ছিল না। অনাচারের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। অনাচারকে ধর্মের অঙ্গ মনে করিতে হইবে, এমন বিড়ম্বনাবুদ্ধি তখনকার কালে আমাদের পরিচিত কাহারও মধ্যে ছিল না। দীর্ঘশিখা-শোভিত, ত্রিপুণ্ড্রকধারী ব্রাহ্মণপণ্ডিত-মণ্ডলী-মধ্যে, অথবা তুলসী-ত্রিকণ্ঠি-গল-ভূষণ গোস্বামী প্রভুকে লইয়া পিতৃদেব তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতেন; সকলেই আগ্রহে শ্রবণ করিতেন; এবং লিখিত কথার ভক্তিপূর্বক আলোচনা করিতেন। তবে রাজা রামমোহন রায় অনাচারী ছিলেন, বিলাতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়, ব্রহ্মবাদ যাহার তাহার জন্য নহে, কলিকাতার ব্রাহ্মগণ জাতি মানেন না, আচার-বিচার কিছু মানেন না, এ সকল কথাও সময়ে সময়ে হইত। পূর্বেই বলিয়াছি, বামনদাসবাবুর ক্রিয়াশীলতায় বীরনগর গ্রাম সনাতন ধর্মের এক প্রকার কেন্দ্রভূমি ছিল, কিন্তু পিতৃব্যের স্বভাবগুণে সেই কেন্দ্র-ভূমিতে তত্ত্ববোধিনীর প্রতিপত্তি-প্রচারের ত্রুটি হয় নাই।

তত্ত্ববোধিনী-দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্যের সহিত ব্রাহ্মধর্মের বিশেষ একটু সম্বন্ধ ছিল। তত্ত্ববোধিনীতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই লিখিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ব্রাহ্ম লেখক বলা যাইতে পারে না; অক্ষয়কুমার দত্তকে বলিতেই হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই সাধু বাঙ্গালার লেখক; উঁহাদের দুইজন হইতেই বাঙ্গালা গদ্যের গৌরব, সে বাংলা সাধু বাংলা। কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমে লেখনী চালনা করেন, পন্থা প্রদর্শন করেন,—প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। পূর্বে বলিয়াছি, আমি ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য পড়িতাম, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রচলিত বাঙ্গালা অবহেলার সামগ্রী নহে। তাহার পর সেই সময়েই যখন প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিকপত্র' পড়িতে পাইলাম, তখনই বুঝিলাম যে, সহজ, সরল, চলিত বাঙ্গালায়, বাঙ্গালা দেশের কথা, বাঙ্গালির ধর্মের কথা, বাঙ্গালির সদাচার অনাচারের কথা, হাসি তামাসার কথা লিখিলেও সুপাঠ্য গ্রন্থ হয়। অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তুতে জ্ঞানের কথা পড়িতাম; সকল কথা বুঝিতে পারিতাম না। বিদ্যাসাগরের বেতাল-পঁচিশে পূর্বকালের কথা পড়িতাম। 'পূর্বকালে উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্বসেন নামে এক নরপতি ছিলেন।' 'বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে এক নরপতি ছিলেন'—এইরূপ সকলই সে কালের কথা,—ছিলেন আর করিয়াছিলেন। কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুরে এই কালের, এই বাঙ্গালির প্রাত্যহিক জীবনের কথা, ঘরকন্নার কথা, সমাজের কথা, সহজ কথায় দেখিতে পাইলাম। সেই শিশুজীবনে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের গাম্ভীর্যে, রচনাচ্ছটায়, ভাবের ধটায় ভুলিয়াছিলাম। টেকচাঁদের বিনা আড়ম্বর সরলতায়ও সেইরূপ বিমুগ্ধ হইলাম। গদ্যের গঙ্গাযমুনাস্রোত, আর ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যের সরস্বতী আমার বাল্যজীবনের প্রয়াগস্থলে সমানে বহিতে লাগিল। আমি সেই মহা সঙ্গমতীর্থে মহানন্দের সহিত হাসিতে হাসিতে কৃতার্থতা লাভ করিলাম।

ধর্মচর্চার জন্য খৃস্টানদের বাঙ্গালা মাসিকপত্র ছিল। কলিকাতার ধর্মসভার মাসিকপত্র ছিল। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের চর্চা হইত। কিন্তু সামাজিক কথা লইয়া মাসিকপত্রে আন্দোলন প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথম করেন। 'মাসিকপত্রে' খণ্ডশ প্রকাশিত হইত,—'আলালের ঘরের দুলাল', 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়', এবং 'রমারঞ্জিকা'। পরে এই তিনখানি পৃথক্ পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আলালের ঘরের দুলালে সমাজের সর্বাঙ্গীণ চিত্র আছে। ভাল মন্দ দুই আছে। মদ খাওয়া প্রবন্ধে, মদের দোষ

নানাভাবে, গল্পের ডালপালা দিয়া বুঝানো হইয়াছে। রমারঞ্জিকায় হরিহর-পদ্মাবতী দম্পতী-মধ্যে আপনাদের কন্যার শিক্ষার বিষয়ে কথোপকথনচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে। এতৎপূর্বে কাদম্বরীকার তারাশঙ্কর স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া গবর্নমেন্ট হইতে দুই শত টাকা পুরস্কার পান। তাহাতে সেকালে হিন্দুমহিলাগণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল. ইহাই দেখানো হয় এবং একালেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া উচিত, ইহাও বলা হয়। রমারঞ্জিকাতে মিত্র মহাশয় সেই কথারই বিশদরূপে এবং বিস্তারিতভাবে সমর্থন করেন। আমি উভয় গ্রন্থই সমাদরের সহিত পড়িয়াছিলাম। আমার মাতৃদেবী লেখাপড়া জানিতেন ; সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা লইয়া এত গণ্ডগোল কেন, সেটা বড় বুঝিতে পারি নাই। মনে মনে ভাবিতাম বেটাছেলে যেমন লেখাপড়া শিখিবে, মেয়েরাও ত সেইরূপ লেখাপড়া শিখিবে, তবে আবার ইতরবিশেষ কেন ।

বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ মিত্র হইতে এইটি যে কেবল শিখিয়াছিলাম এমন নহে, শব্দের ছটা, ঘটা না করিয়া, সোজা কথাতেও যে অনুপ্রাস আসে, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আলালের ঘরের দুলালের আরম্ভ 'বৈদ্যবাটীর বাবুরামবাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন।' এত টেনে-বুনে অনুপ্রাস নয় ; শব্দের ঘটাছটায় মিলন নয় ; সহজ কথা সহজে বলিতে গিয়া অনুপ্রাস হইয়াছে।

টেকচাঁদের সারল্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম বটে কিন্তু কেহ বলিয়া না দিলেও তাঁহার গ্রাম্য দোষ—তখন নামটাম না জানিলেও—একটা দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। 'শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই,—ওগো মরমেতে মরে রই,—টক্—টক্—পটাস—পটাস, মিয়াজান গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে, টিটকারি দিতেছে ও শালার গোরু চলতে পারে না বলে, লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।'—এই লেখা আমার আপনা হইতেই ভাল লাগে নাই। তাহার পর যখন পিতৃদেবের সমক্ষে ঐ অংশ পাঠ করিলাম, তিনি শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। সেই একরূপ সমালোচনা। আমি বুঝিলাম এরূপ লেখা প্রশংসনীয় নহে।

১৮

এইরূপ হাস্যে ও গাম্ভীর্যে আমার শিক্ষালাভ। বালককালে কর্তব্যের কঠোরতায় বা শিক্ষকের তাড়নার ভয়ে ভয়ে দায়গ্রস্ত হইয়া আমাকে শিক্ষালাভ করিতে হয় নাই। সেই আমার পরম সৌভাগ্য ; এ সৌভাগ্য অনেকের অদৃষ্টে হয় না। এ সৌভাগ্যের সংযোজক পিতৃদেব। স্বদেশে বিদেশে বহুতর শিক্ষকের কাছে নানারূপ শিক্ষালাভ করিয়াছি। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকে সিদ্ধকাম শিক্ষক আছেন, আপনিও দিন কতক সখের শিক্ষকতা করিয়াছি, আর পাঁচটি পুত্রকন্যা থাকাতে সর্বদাই শিক্ষকতা করিতে হয়, কিন্তু এ পর্যন্ত সেই পিতৃদেবের মত শিক্ষক আমি আর দেখিলাম না। পুত্র পিতাকে সার্টিফিকেট দিতেছে, সে সার্টিফিকেটের মূল্য বড় কম, তাহা বুঝি। কিন্তু তাঁহার জীবনীর দশ কথা লিখিতে বসিয়াও যদি এই কথাটা না লিখি, তাহা হইলে মহা অধর্ম হয়, মনে করি। তাঁহার গুণের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হইল না বলিয়া অধর্ম নহে, এই কথাটা ছাড়িয়া দিলে জীবনী-লেখার যে প্রধান উদ্দেশ্য তাহাই বিফল হইয়া যায়। একটি জীবনের ঘটনা হইতে দশটি জীবন আংশিক গঠিত হইতে পারে।

আজিকালি শিক্ষকতা দুর্লভ সামগ্রী হইয়াছে। পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি বালকগণের স্বাভাবিক শিক্ষক ; তাঁহারা অনেক সময়েই আপনাদের কার্য লইয়া ব্যস্ত থাকেন। পুত্রের শিক্ষা-দানরূপ অকার্যে কাজেই তাঁহারা মনোযোগ দিতে পারেন না। স্কুলের শিক্ষকেরা ডাইরেক্টার বা প্রিনসিপাল কি বলেন, কি করেন, কি ভাবে কোন্ কার্য করিতে বলেন, সেই চিন্তাতেই আকুল ; ছাত্রগণ কোন কথা প্রকৃত প্রস্তাবে শিখিতেছে কি না, তাহা অনুধাবন করিবার সময় তাঁহাদের নাই, প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় না। কাজেই ছেলেপিলের শিক্ষা এখন একটা বিশেষ বিড়ম্বনার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। পিতার বিচার আচার, আমোদ

প্রমোদ, শিক্ষা পরীক্ষা প্রভৃতি শত কার্য থাকিলেও, আমাকে শিক্ষাদান তাঁহার সর্ব প্রথম এবং সর্ব প্রধান কার্য বলিয়া মনে করিতেন। কাছারীর সময় ছয় ঘণ্টা ছাড়া, বাকি আঠার ঘণ্টা, আমি নিয়তই তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। একত্র স্নান করিতাম, একত্র আহার করিতাম, একত্র শয়ন করিতাম, তাঁহার সেই সন্ধ্যাকালের সরগরম মজলিসের আমি বিনীত অথচ নিয়ত শিশুসভ্য ছিলাম। কখন বলেন নাই যে, 'অক্ষয়, তুমি ও-ঘরে গিয়া পড়গে।' গান গল্প হাসি মস্করা, শিশু বলিয়া সমানে ভোগী হইতে পারিতাম না, কিন্তু ভাগী হইতাম। তোমরা বলিবে, ইহাতে শিক্ষার কি হইল? আমি বলি, তুমি সবজজ বাহাদুর বা ডেপুটি মহাশয় অথবা উকীল-প্রবর, তুমি দিন কত তোমার একটি ছেলেকে এইরূপ সহবত করিয়া রাখ দেখি, দেখিবে যে-সৎশিক্ষা এখন তুমি অসাধ্য মনে করিতেছ, উহা সুসাধ্য হইয়া উঠিবে।

একজন প্রবীণ আত্মীয় যদি একটি সুকুমারমতি শিশুকে নিয়ত নিজের সঙ্গে রাখেন এবং সে কি করিতেছে না করিতেছে, তৎপ্রতি অনেক সময় দৃষ্টি রাখেন, তবে সেই বালকের সাধ্য কি যে সে সেই প্রবীণের প্রদর্শিত পন্থা হইতে অল্পমাত্র বিচলিত হইবে। তাহার উপর, যদি সেই প্রবীণের মনে কোন প্রকার ছাঁচ থাকে, তবে সেই বালকের তরল মন সেই প্রবীণের ছাঁচে কাজেকাজেই ঢালাই হইবে। একজনকার ছাঁচে আর একজনকে ঢালাই করাই—প্রকৃত গুরুমুখী এবং গুরুমুখী শিক্ষাই শিক্ষা। বালকের শিক্ষা অনুকরণ; গুরু ভাল হইলে, সেই শিক্ষা যত গুরুমুখী হয়, ততই প্রবলা ও উজ্জ্বলা হয়। অতএব প্রথম কথা শিক্ষা গুরুমুখী হওয়া চাই এবং সে জন্য গুরুর সাহচর্য একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সাহচর্য সর্বদা বাঞ্ছনীয় বলিয়া শাসন সামান্যত বাঞ্ছনীয় নহে। সে কালে শাস্ত্র যখন সজীব ছিল, তখন সমস্ত শাসনই শাস্ত্রে ছিল। পিতামাতার শাসন, রাজার শাসন, প্রভুর শাসন, শাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য ছিল না। কোথাও পিতা, কোথাও প্রভু, কোথাও রাজা শাস্ত্রের শাসন মাত্র পুত্রের প্রতি, ভৃত্যের প্রতি, প্রজার প্রতি পরিচালনা করিতেন। সুতরাং তখন ছিল শাসন—কর্তব্যকর্মের একটি অঙ্গ। এখন হইয়াছে অনেক স্থলে অনিষ্ট আশঙ্কায় ক্রোধের পরিচয়। আমার প্রতি সাহচর্যের শাসন ছাড়া অন্যরূপ শাসন প্রায়ই ছিল না; তবে পিতার অপ্রীতি বা ক্রোধকে আমি বড়ই ভয় করিতাম। নিয়ত সাহচর্যে প্রীতি জন্মায় বা বর্ধিত হয়। আর সম্পর্ক-গৌরবজনিত একটি ভয়ভয়ভাব সেই প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সেই জন্য পিতামাতা গুরুজনের কাছ হইতে, সাহচর্য থাকিলেই, শিক্ষা অতি সহজেই হয়। ক্রীত শিক্ষক বা বেতনভোগী স্কুল মাস্টারের কাছে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের এখনকার কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিষ্কর্মা পিতা পিতৃব্য যদিও আপনারা বালককে শিক্ষা দিতে স্বচ্ছন্দে পারেন, তথাপি তাহা না দিয়া একজন প্রাইভেট টিউটারের হস্তে শিশুকে সমর্পণ করেন।

১৯

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একজন বাঙ্গালি ভদ্রলোকের একটি ভাল চাকরী হইলে, বিদেশে তাঁহার বাসায় আর দশ জন আত্মীয়-অনাত্মীয় ভদ্রসন্তান থাকিতেন। তাঁহাদের প্রকার উদ্দেশ্য কাজকর্মের উমেদারী। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা আপনা আপনি পাকাদি ক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিয়া লইতেন, অপরেরা হাটবাজারের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি করিতেন। তখন ভাল চাকর, অল্প বেতনে যথেষ্ট পাওয়া যাইত। পাচক ব্রাহ্মণ অল্প বা অধিক বেতনে, একেবারেই পাওয়া যাইত না। কৃষ্ণনগরের বা বর্ধমানের রাজবাড়ীতে বেতনভুক্ পাচক ব্রাহ্মণ ছিল না, এমন কথা বলিতেছি না বা বাঙ্গালার কোন বড়মানুষের বাড়ীতে বেতনভুক্ পাচক ছিল না, তাহাও বলিতেছি না, তবে সাধারণত বড় বড় উকীল, মোক্তার বা হাকিমের বাসায় যেরূপ ঘটিত, তাহাই বলিতেছি। আসল কথা ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান বেতন লইয়া পাচকতা করা অত্যন্ত হীনবৃত্তি মনে করিতেন। সুতরাং সে বৃত্তি সহজেই গ্রহণ করিতেন না। আমাদের বাসায়

যখন আমার মাতা ও অন্যান্য মেয়েছেলেরা থাকিতেন, তখন আমি ও পিতা আমরা অন্তঃপুরে পরিবার-মধ্যে পাচিত অন্নগ্রহণ করিতাম। যখন তাঁহারা না থাকিতেন, তখন বহির্বাটীতে ঐ উমেদার গোষ্ঠীগণের পাচিত অন্ন আমরা সমানে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতাম। উমেদারগণের মধ্যে আহার বেলোয়াঁ গ্রামবাসী দীননাথ বসু আমার ঠাকুরদাদা সম্পর্কে ছিলেন। তিনি প্রাতঃকালে পিতার সমক্ষে, পৃথক্ আসনে বসিয়া, আমাকে কাছে লইয়া কষামাজা শিখাইতেন। পিতার দৃষ্টি আমাদের উপরে থাকিত; আমাদের মধ্যে সকল কথা তিনি শুনিতে পাইতেন ও শুনিতেন। সেই সময়ে তিনি দশজনের সঙ্গে নানা কথায় এবং নানাকার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও আমাদের নাতি-ঠাকুরদাদাকে কখন নজর-ছাড়া, মনছাড়া করিতেন না। ইহাও একরূপ প্রাইভেট টুইশন; কিন্তু দোতলা বৈঠকখানায় বাবুমহাশয়, আর দালানের পাশে নিচের ঘরে স্যাঁত্যা মেজেয়, সেগুনের টেবিলের দুই পার্শ্বে ছাত্র এবং 'সার',—সেই একরূপ প্রাইভেট টুইশন।

পিতা শয়নে ভোজনে আমাকে সঙ্গী করিতেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ঐ সব সময়ে আমি ছিলাম তাঁহার সঙ্গী; আমার খেলার সময়, তিনি আমার সঙ্গী হইতেন। প্রত্যহ বৈকালে আমার সমবয়স্ক স্কুলের ছেলেরা আসিয়া জুটিত, আমরা হাতে তৈয়ারি কাঠের ব্যাট ও সেলাই করা ন্যাকড়ার বল লইয়া ব্যাটম্‌বল খেলিতাম। পিতা কাছারী হইতে বাসায় গিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, হাত মুখ ধুইয়া, জল খাইয়া, আমাদের খেলায় যোগ দিতেন। কখন ব্যাট দিয়া বল মারিতেন, কখন বোলারের কার্য করিতেন; অন্য খাটাখাটুনী কখন খাটিতেন না। তাঁহার মত গুরুজনের পক্ষে সেরূপ হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া আমরা বুঝিয়া লইয়াছিলাম।

এক এক দিন সান্ধ্য মজলিস—আমাকে লইয়াই হইত। ছেলেবুড়ো আমরা সকলে মিলিয়া, পরস্পরকে হিঁয়ালী জিজ্ঞাসা করিতাম। কিছুকাল পরে দাঁড়াইয়া গেল যে, আমি একলা অভিমন্যুবৎ এক পক্ষ, আর মহামহা সপ্তরথী সকলেই আমার বিপক্ষ। কিন্তু অভিমন্যুর মত সকল সময় আমার পরাজয় হইত না; আমি এক এক দিন লবকুশের গৌরব রক্ষা করিতাম; আমার পেটে সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রহেলিকা গজ গজ করিত। ইংরাজি তখন শিখি নাই, বলিলেই হয়, সুতরাং ইংরাজি হিঁয়ালীর ধার ধারিতাম না। কিন্তু—

১। একবর্গ-সমুদ্ভূতশ্চতুর্বর্গ-ফলপ্রদঃ।
অনুলোম-বিলোমেন স দেবঃ পাতু বঃ সদা॥

২। আয় বেরাদর আজব দিদম্ চাররঙ্গী জানোয়ার—
শের পঞ্জ, চশ্‌মে আহু, ফীল্ গর্দন, বাঙ্‌খর।

৩। প্রথম অক্ষর নিলাম না, শেষের অক্ষর সেই—
নিরাকার নির্মাত্র ভেদ মাত্র এই।
মধ্যের অক্ষর কহি শুন রায়,
পাপী লোকে ব'ললে স্বর্গে তরি যায়॥

৪। হরি হ্যায়, গুণকরি হ্যায়, নও লাখ মোতি জড়ি হ্যায়।
বাবুজি কা বাগ্‌মে দোশলা উড়্‌কে খড়ি হ্যায়॥*

প্রভৃতি সংস্কৃত, পারসী, বাঙ্গালা, হিন্দী বহুতর প্রহেলিকা আমার কণ্ঠস্থ ছিল; ক্রমে এমন হইল যে, আমাকে আর কেহ হেঁয়ালীতে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। নয় দশ বৎসরের একজন বালক, প্রকাণ্ড প্রহেলিকা-বাজ,

* ১। একবর্গ (পাঁচটি করিয়া বর্ণ লইয়া যে বর্গ, সেইরূপ একই বর্গ) হইতে উদ্ভূত এবং চতুর্বর্গ-ফলপ্রদ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গদাতা) সেই দেবতা অনুলোম ও বিলোমের দ্বারা (অর্থাৎ সোজা ও উল্টো দিক্ হইতে পড়িলে যাহা হয়, সেই দুই রূপেই) তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এই প্রহেলিকার উত্তর 'নন্দনন্দন'।

২। হে বন্ধু, আমি আজ এক আশ্চর্য জন্তু দেখিয়াছি—(যাহার) বাঘের মত থাবা, হরিণের মত চোখ, হাতীর মত ঘাড় এবং গাধার মত গলার স্বর।—উত্তর 'ব্যাঙ'।

৩। উত্তর—'নারায়ণ'।

৪। সবুজ (বর্ণ), গুণকর, নয় লক্ষ মুক্তা ও শালজড়ানো বাবুজীর বাগানে দাঁড়াইয়া আছেন উত্তর—'ভুট্টা' বা 'বুটো'।

বিদ্যাদিগ্‌গজ হইয়া উঠিয়াছে। সান্ধ্য মজলিসে এক এক দিন আমাকে লইয়া শুভঙ্করীর চর্চা হইত। ক্রমে স্ফূর্তির সহিত চালনার গুণে, আমি শুভঙ্করীতেও কীর্তিস্তম্ভ হইয়া উঠিলাম।

আমাদের মুনসেফি কাছারীর একজন উকীল ছিলেন—গুপ্তিপাড়ার নিকট আয়দার রামচন্দ্র দত্ত। তিনি দীর্ঘাকার, বলবান্, তেজস্বী পুরুষ। বাঙ্গালায় দলিল-দরখাস্ত আদি নাকি অতি সারগর্ভ ভাষায় সংক্ষেপে লিখিতে পারিতেন। একথা পিতৃদেবের মুখে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছিলাম বলিয়া বলিতেছি। সেরূপ ভাল-মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা আমার তখন ছিল না। তাঁহার হাতের বাঙ্গালা লেখা অতি পরিষ্কার ছিল। তিনি এক ইঞ্চি সওয়া ইঞ্চি পরিমিত অক্ষরে আমাকে বাঙ্গালা 'কাপি' লিখিয়া দিতেন, আমি বড় বড় অক্ষরে গোটা গোটা করিয়া ছাপার ছাঁদে লিখিতাম। কি লিখিতাম, তাহা মনে আছে। লিখিতাম—'ঘোর মহানন্ধকার-হর ঐহিক-পারত্রিক-মঙ্গলাকর শ্রীগুরুদেব দেবাদি-দেব শ্রীচরণ-সরসীরুহ-রাজেষু।' এই গোটা গোটা লেখাতেও খেলা করিতাম। চাল চোঁয়াইয়া জলে ফেলিয়া, চোয়ানি জল তৈয়ার করিতাম। শাদা কাগজে, সেই ঈষৎ রক্তিম জলে, ঐ ঘোর মহানন্ধকার লিখিতাম। কাগজটি বেশ শুকাইলে, সমগ্র কাগজটির উপর কালির ভুষা দিয়া, হাতে করিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া, সমগ্র কাগজটা ঘোর চকচকে কালো করিয়া ফেলিতাম। তাহার পর একটা বড় পীঁড়ের উপর সেই কাগজটা রাখিয়া, জলের ছাট মারা হইত। যে স্থানটা চোয়ানী জলের লেখন, সেই স্থানটা শাদা বাহির হইয়া পড়িত; বাকি জমিটা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ থাকিত। সেই কালোর ভিতরে শাদা লেখা, আমার একটা খেলা।

আমার খেলার পরিচয় ঐরূপ, ব্যায়ামের পরিচয় ব্যাটম্বল। আর খেলা, ব্যায়াম ও আমোদের জন্য পিতা আমাদের বাড়ীর উঠানে একটি ছোটখাট ফুলের বাগান করিয়া দিয়াছিলেন। আমি সেখানে অল্প-স্বল্প খোঁড়াখুড়ি করিতাম, ঘাস নিড়াইতাম; চাকরেরা কূপ হইতে জল তুলিয়া দিলে, সেই জল লইয়া ফুলের গাছে দিতাম। বাগানে প্রজাপতির সঙ্গে খেলা করিতাম, কখন কখন চুপ করিয়া দশবাহু চণ্ডীর সবুজ লীলা প্রাণ ভরিয়া দেখিতাম, কখন বা মল্লিকার মালা করিয়া আমাদের বৈঠকখানায় রাখিয়া আসিতাম।

উলায় থাকিবার সময়ে, আমি ইংরাজি অতি অল্পই পড়িয়াছিলাম। কিন্তু যেটুকু পড়িয়াছিলাম, বুঝিয়া-সুঝিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি পড়িয়াছিলাম, ফার্স্ট নম্বর ও সেকেণ্ড নম্বর স্পেলিং, ফার্স্ট নম্বর রিডারের বার আনা, সেকেণ্ড নম্বর রিডারের অর্ধেক। ইংরাজি ঐ পর্যন্ত, অঙ্ক বিষয়ে বাঙ্গালায় শিখিয়াছিলাম সমস্ত শুভঙ্করী ও ইংরাজি মতে সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ। বাঙ্গালায় পিয়ারসনের ভূগোল আর ইয়েটস্ পদার্থবিদ্যা; বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি।

আমার শিক্ষা-বিষয়ে পিতৃদেব কি রকম উপকরণ উপস্থাপিত করেন ও কি রকম প্রকরণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহার কতক পরিচয় দেওয়া হইল। পদ্ধতির মধ্যে আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, আমি খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ যথেষ্ট করিতাম, কিন্তু সকলই পিতার সমক্ষে, তাঁহার নজরের উপর। উপকরণ-সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে, ভাল ছাপার ভাল কাগজে যে সকল গদ্য, পদ্য পুস্তক সে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সমস্তই দেখিতে পড়িতে ঘাঁটিতে আমি পাইতাম; বটতলার ছাপার একখানিও পুস্তক আমার সম্মুখে কখন আসে নাই। আমি দেখিতে বা পড়িতে পাই নাই। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, এক দিকে যেমন কুৎসিত পুস্তক একখানিও আমি পড়ি নাই, সেইরূপ কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ হইতে আমি বঞ্চিত ছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপায় অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের 'সু' 'কু' আমার সকলই উদরস্থ ছিল।

আমার লেখাপড়া শিক্ষার প্রকরণ ও উপকরণের কথা বলিলাম। আমার আচার-ব্যবহার শিক্ষার প্রধান উপকরণ—পিতা স্বয়ং। এই সকল শিক্ষা—চরিত্র গঠন—যেমন দৃষ্টান্তে হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। পিতৃদেবে

বিলাস, বাবুয়ানা, দম্ভ, দর্প—এ সকল কিছুই ছিল না। শাদা-সিধা ডাল ভাত তরকারী, চলন-সই কাপড়, চাদর, জামা, জুতা—এই সকলই তাঁহার নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী ছিল। ভাল খাওয়া হইত, অতিথি-অভ্যাগত আসিলে। ভাল পরা পরিতাম, পূজা-পার্বণে। নিত্য ব্যবহারে সকলই শাদা-সিধা। এই যে শাদা-সিধা কাপড়-চাদর ইহার মধ্যে বিলাতীর সংস্রব ছিল না। তা যে একটা ধর্ম বা কর্তব্য, বা দেশ-হিতৈষিতা, তা বলিয়া নয়, আপনা-আপনিই, তাহাই আমাদের অভ্যাস ছিল। বিলাতী কাপড়ের জামা ছিল,—কিন্তু সেটা যে একটা দূষণীয় পদার্থ, তাহা কখন ভাবি নাই, ভাবিতে কেহ বলেন নাই। আমাদের এখানে চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গায়, দেশী কাপড়-চাদরের অভাব ছিল না। থাকিতাম উলায়, শান্তিপুর অতি নিকটে, সেখানেও দেশী কাপড়-চাদর বিস্তর, কাজেই আমরা দেশী বস্ত্রই ব্যবহার করিতাম। যে বৎসর* পিতা সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া শান্তিপুরে প্রথম বেড়াইতে যান, সেই বৎসর শান্তিপুর হইতে তিন লক্ষ টাকার থান রপ্তানি হইয়াছিল। এখন পালা উল্টাইয়া গিয়াছে। তাঁতিতে থান বুনিতে ভুলিয়াছে, দেশ-হিতৈষিতার দোহাই দিয়া এখন ছেলেপিলেকে দেশী কাপড় ব্যবহার করাইতে হয়। আমাদের এরূপ বিচিত্র শিক্ষা হয় নাই।

পিতাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতাম; পিতাহি পরমং তপঃ—এ সকল জানিতাম না। শাস্ত্র জানিলে, তবে পিতৃভক্তি হয়—এ বিড়ম্বনাতেও কখন পড়ি নাই। পিতা—সরল, সংযমী, সদালাপী, মিতাচারী ছিলেন, আমি বালক হইলেও তাঁহারই মত স্বভাব পাইয়াছিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি. এই সময়ে পিতৃজীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল আমার সৎশিক্ষা। তাঁহার গুরুতর রাজকার্য তিনি নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার জীবনের এই ভাগের বর্ণনায় আমার শিক্ষার কথাই বেশি বলিতে হইল। তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবায় তাঁহার অনুরাগও বুঝিতে পারা গেল।

* ১৮৪৬ সালে।

২০

এই স্থলে আর একটি কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে, আদালতে বাঙ্গালা, এক বিকুৎসিত ব্যাপার ছিল। এক পৃষ্ঠা দরখাস্তে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকিত। 'এতাবতা' 'বিধায়' ইত্যাদি শব্দ দিয়া প্যাঁচের উপর প্যাঁচ লাগাইয়া বাঙ্গালা ভাষার এবারত বা স্টাইল একটি বিষম গোলকধাঁধাঁ করিয়া তোলা হইত। বাঙ্গালা লেখার জন্য ষত্ব ণত্ব জ্ঞান থাকা আবশ্যক ছিল না। ঞয় আকার (া) দিয়া হঞা (হইয়া) ওয়ে আকার দিয়া হওা (হওয়া) সর্বদাই থাকিত। লেখকেরা কেহ বিশুদ্ধ বানানের ধার ধারিত না। ব্যাকরণ কাহাকে বলে জানিত না। গেরর উপর গের দিয়া, প্যাঁচের উপর প্যাঁচ দিয়া, জটিল-কুটিল দুর্বোধ একটা কারখানা করিতে পারিলেই, লেখক বড় মুন্সি হইতেন। লেখকদিগের বুদ্ধি ছিল না এমন নহে; কিন্তু ঘোর-ফের করিয়া যে যত ভাষা অস্পষ্ট করিতে পারিত, তাহার মুন্সিয়ানা বুদ্ধির ততই প্রশংসা হইত। তাহার পর নির্বুদ্ধিতাও যথেষ্ট ছিল। একজন উচ্চ কর্মচারী তাঁহার উপরিস্থ আর একজন উচ্চতর কর্মচারীকে লিখিলেন—'পুলিশ সাহেবের আশায় দস্যুরা পলায়ন করিল।' বড়সাহেব বাহাদুর অভিধান দেখিয়া জানিলেন সে 'আশা' অর্থে ইচ্ছা; অতএব বুঝিলেন, পুলিশ সাহেবের ইচ্ছাক্রমে ডাকাতরা পলাইয়াছে। সুতরাং পুলিশ সাহেব সস্পেণ্ড হইলেন, মহাতুমুল হইয়া উঠিল। লেখা উচিত ছিল 'পুলিশ সাহেব আসাতে,' তাহা না লিখিয়া 'পুলিশ সাহেবের আশায়' লেখাতেই এত গণ্ডগোল হইল।

এরূপ সর্বদাই হইত। এই সকল বিডম্বনা দূরীকরণার্থ পিতা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি আছেলে মামলা, মুহরি আমলা, উকীল মোক্তার সকলেরই কার্যে তাঁহাদের ক্রটি দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাদের ভাষা সংশোধন করিয়া দিতেন; আর ভবিষ্যতে সেরূপ না হয়, তাহার জন্য সৎ-উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। যাহাদের লেখার প্রয়োজন, যাহাতে

তাহারা সহজে সরল ভাবে লিখিতে পারে, তাহার জন্য তাহাদিগকে সর্বদা শিক্ষাদান, তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল। পূর্বে বলিয়াছি, তিনি চারটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। কাছারী তাঁহার স্থাপিত নহে বটে, কিন্তু সেটি পঞ্চম স্কুল। সেখানে ষত্ব, ণত্ব, ব্যাকরণ কিছু শিখাইতেন না বটে, কিন্তু লেখার রীতি, কায়দা ও লেখার মধ্যেও যে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, সেই ভাবটা—সর্বদাই বুঝাইয়া দিতেন। আর কোন বিষয়েই সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হওয়া পিতৃদেব গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না, তবে সাধারণত, যাহাতে শিক্ষা-বিস্তার হয়, এবং চলিত লেখা-পড়ায় যাহাতে অধিকতর বিশুদ্ধি, সারল্য, প্রাঞ্জলতা এবং বুদ্ধিবিচার থাকে, তজ্জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। এই স্থলেই তিনি সংস্কারক। যখন যে-জেলায় গিয়াছেন, সেই-খানেই যাহাতে ভাষার সংস্কার হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। যে ভাষায় তিনি সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা অবিকল সাক্ষীর কথা হইলেও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইত। সাধারণ লোক কখন বাঙ্গালা বলিতে ভুলে না। আমাদের সহর-অঞ্চলে কখন কখন বলে বটে ঠাকুর মহাশয় চলে গেল, তার জুতজোড়াটা পড়ে রইলেন, কিন্তু তখন তাহারা আমাদের অনুকরণ করিতে যায়, অর্থাৎ সাধুভাষা বলিতে যায়; গিয়া ভুল করে।

তাঁহার সাক্ষীর জবানবন্দি অতি পরিষ্কার বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালা। সমস্ত হুকুম নিজে লিখিয়া দিতেন, সাধারণত মোকদ্দমার রায় বাঙ্গালাতেই লিখিতেন, তাহা অতি প্রাঞ্জল বাঙ্গালা হইলেও বিশেষ প্রগাঢ় হইত। তাঁহার সেই আদর্শ বাঙ্গালা লেখার সংক্রামকতা ছিল; কাজেই উকীল মোক্তার সকলেই ভাল বাঙ্গালা লিখিতে চেষ্টা করিতেন। এই সকল কথা—তাঁহার মুনসেফি অবস্থার কথা বলিতেছি। তিনি যখন সদরআলা হইলেন, তখন বাঙ্গালায় বিশ বৎসর বিশুদ্ধ বাঙ্গালার চর্চা হইয়াছে; ঢাকায় একজন এম. এ.-কে পিতৃদেব কিছুদিনের জন্য সব জজের সেরেস্তাদারী পদে নিযুক্ত করেন। তখন আর বাঙ্গালার ভাবনা তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। তখন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা দেশে শিকড় গাড়িয়াছে। ছাত্রবৃত্তি-পাস শত শত যুবক রাজকীয় কর্মাগারে নানা কর্ম করিতেছেন। উলা, পানিঘাটা, জাহানাবাদ, সাতক্ষীরা, এই সকল স্থানে পিতৃদেবকে বাঙ্গালা ভাষার সংস্কারের কার্য করিতে হইয়াছিল। এই সংস্কার কার্যের প্রধান অধিষ্ঠান-ক্ষেত্রে উলা, পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর আবাসভূমি। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ সকলেই লেখাপড়া শিখিতেন। হাতের লেখা গোটা গোটা পরিষ্কার উজ্জ্বল ছিল। বালকেরা আগ্রহ-সহকারে স্কুলে ষত্ব ণত্ব ব্যাকরণ শিখিতে লাগিল। যুবক উমেদার গোষ্ঠী কাছারীতে আসিল, বাঙ্গালা লেখার এবারত দোরস্ত করিতে লাগিল। পূর্বেই বলিয়াছি, উকীল রামচন্দ্র দত্ত বাঙ্গালা এবারতে খুব মজবুত ছিলেন, তিনিও খুব আগ্রহ-সহকারে এ বিষয়ে পিতৃদেবের সহায়তা করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম হাকিমের মনোরঞ্জনকারী বলিয়া কেহ কেহ ইঙ্গিতে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। কিছু দিন পরে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিল; এবং এই কার্যের জন্য সকলেই পিতৃদেবকে ও রামচন্দ্র দত্তকে মনে মনে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

২১

আমার শিক্ষার জন্য পিতৃদেব কিরূপ প্রকরণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন ও কিরূপ উপকরণ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এখন আমার কীর্তির একটু পরিচয় দিতে ক্ষতি কি? যে সকল পুস্তক পড়িতাম, সে সকল পুস্তকের মধ্যে যে সকল দুরূহ শব্দ থাকিত, সেইগুলি একখানি খাতায় একদিকে লিখিতাম ও শব্দার্থ পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া তাহার পার্শ্বে লিখিতাম। কখন কখন পিতৃদেব স্বহস্তেও পার্শ্বে অর্থ লিখিয়া দিতেন। এমনি করিয়া অনেকগুলি খাতা হইয়াছিল। বালককালের মন,—বৃদ্ধাবস্থার স্মৃতি ও মন দিয়া বিশ্লেষণ করা বড় কঠিন। সেই খাতাগুলি অভিধানরূপে প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। এই ইচ্ছার মধ্যে কতটা ছেলেমি ছিল, আর কতটা

দুরাকাঙ্ক্ষার বীজ ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা একরূপ অসাধ্য। আমাদের বাড়ীতে 'শব্দাম্বুধি' অভিধান ছিল। আমি কাজেকাজেই, 'শব্দসাগর'* সঙ্কলন করিতে সঙ্কল্প করিলাম, সঙ্কল্প মত কার্য হইল। অভিধানের পরিচয়-পৃষ্ঠা এইরূপ—

'শব্দসাগর
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকারকর্তৃক
প্রণীত
সংবৎ ১৯১৩
শকাব্দা ১৭৭৮
সাল ১২৬৩
খ্রীষ্টীয় শাক ১৮৫৬

এই গ্রন্থ নানাবিধ পুস্তক হইতে দুরূহ শব্দ সঙ্কলন-পূর্বক তদর্থ তৎপৃষ্ঠে লিখিত হইয়াছে।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'কর্তৃক প্রণীত' লিখিতেন, আমিও লিখিয়াছি। কেহ সংবৎ, কেহ শকাব্দা, কেহ সাল, কেহ খৃস্টাব্দ দিতেন, আমি সব-কটাই দিয়াছি। আর গ্রন্থের পরিচয় সর্বশেষে দিয়াছি। তবে 'এই গ্রন্থ' শব্দের কারক কিরূপে মিটিল, তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এই গোল আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, সেই ভূমিকা-পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিরূপ গ্রন্থারম্ভে সন্নিবেশিত করিলাম।

এখানে দেখিবেন, কর্তৃবাচ্যে আরম্ভ হইয়া ভাববাচ্যে বাক্য শেষ হইয়াছে। আমার নামের পূর্বে অধীন শব্দটিও লক্ষ্যের বিষয়। অক্ষয় শব্দের মোড়া 'অ'টি লক্ষ্যের বিষয়। মোড়া 'অ' দেবনাগর 'অ' তখন একটু আধটু চলিত। 'ক্ষ' পরে আছে, 'অ'টি দেবনাগর করিয়া দিলে, লেখাটি খুব ঘোরালো-ফেরালো হয়, এই জন্য রামচন্দ্র দত্ত আমাকে ঐরূপ লিখিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শব্দসাগরের শকুন্তলা ভাগের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

নান্দী	···	নাটকের প্রথমে আশীর্বাদসূচক বাক্য
সূত্রধার	···	প্রধান নট
নেপথ্য	···	সাজঘর
আর্যা	···	শ্রেষ্ঠা স্ত্রী
আর্যপুত্র	···	স্বামী
অভিনয়	···	ভাব প্রকাশ করা
প্রস্তাবনা	···	আরম্ভ, ভূমিকা
অপবার্য্য	···	ফিরিয়া
বিষ্কম্ভক	···	প্রথমে পূর্ব কথার স্মরণ করিয়া দিয়া যে বিষয়ের অভিনয় হইবে তাহার ভাবি কথার অংশকে যাহা সূচনা করিয়া দেয়।
		ইত্যাদি।

অধিক নমুনা দিবার প্রয়োজন নাই।

শুনিয়াছি নাকি, হাতের লেখায় মানবচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। মানবচরিত্রে বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই, হাতের লেখায় বৈচিত্র্য আছে। যে ছোট ছোট গুজিবুজি লেখে, তাহার চিত্তও নাকি সঙ্কুচিত এবং জটিলতাময়। যে বড় বড় করিয়া দীর্ঘচ্ছন্দে গোটা গোটা লেখে, জোরালো টানে কলম টানে, তাহার নাকি উদার হৃদয় এবং বিশাল সাহস। নেপোলিয়ন খুব তেজকলমে গোটা গোটা অক্ষরে নাম সহি করিতেন। ওয়াটারলুতে বিষম বিপর্যস্ত হইয়া, তাঁহার দস্তখতের টান নাকি নিস্তেজ হইয়াছিল। শেষের 'এন'-এর শেষ টান নাকি ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। জানি না, এ সকল কথা কতদূর সত্য।

* 'শব্দসাগর'-এর একটি বিশেষ পরিচয় দিতে সাহিত্যাচার্য ভুল করিয়াছেন। শব্দসাগরের শেষে স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দিয়া ১ হইতে ৮ পৃষ্ঠায় অমর-কোষের ন্যায় একই অর্থের শব্দ-পর্যায় আছে—যেমন, পৃথিবী, পৃথ্বী, অবনী, ধরণী, ধরা, ধরিত্রী, ভূমণ্ডল, বসুন্ধরা, বসুধা, বসুমতী, ক্ষিতি, মর্ত্যলোক, মহী প্রভৃতি। এই ভাবে শতাধিক শব্দের 'পর্যায়ক্রম' লিখিত আছে—বর্ণানুক্রমে সাজানো নয়, শব্দটি তিনি যেমন প্রথমে পাইয়াছিলেন, তেমনই খাতায় টুকিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে সেই একই অর্থের শব্দ পাইলে প্রথমের পাশে লিখিত হইয়াছিল। আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য আছে। রূপক ও রহস্যের অন্তর্গত 'চণকচূর্ণ (সংবাদপত্র)' প্রবন্ধে আছে—এস্মে প্রা-আ-আড্‌বিবাক হ্যায়, মলিম্লুচ হ্যায় ইত্যাদি; এই দুইটি শব্দ 'চোর' ও 'বিচারপতি'র পর্যায়ে পর পর দুই লাইনে শব্দসাগরে ৭ম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

আমার দশম বৎসরের জীবনের হিজিবিজির অবিকল প্রতিরূপ দিলাম। চরিত্রের পরিচয় এখন আপনারা বুঝিয়া লউন।

২২

এই যে ভূমিকার তারিখ, শকাব্দা ১৭৭৮, ২৮এ* আশ্বিন, আমার উলা জীবনের এই শেষ সময়। ইহার পর বেশি দিন আমরা আর উলায় ছিলাম না। আমি ত আর যাই নাই। যে রামচন্দ্র দত্ত আমাকে হস্তাক্ষর শিক্ষা দিয়াছিলেন, একদিন হঠাৎ শুনিলাম তিনি অকস্মাৎ মহাপীড়িত। শুনিয়া চাপরাসির সঙ্গে বৈকালে দেখিতে গেলাম। উলার প্রায় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় বাজারের সংলগ্ন একটি ছোট একতালা কুঠরিতে—তিনি বাস করিতেন। তখন পূজার পূর্বে উলার চারিদিকে জলে জলময়। চারিদিকের মাঠ ছাপাইয়া গ্রামে কানায় কানায় জল উঠিয়াছে। দত্তজার সেই কুঠরিটি দেখিলাম অত্যন্ত স্যাঁতা। সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে, একদিকে চৌকীর উপর সদাশয় দত্ত মহাশয় অসাড় পড়িয়া আছেন; চিত হইয়া পড়িয়া আছেন; হস্তপাদাদি নাড়িতেছেন না। আমাকে চিনিতে পারিলেন—দুই চারিটি কথায় আশীর্বাদ করিলেন, চাপরাসি আমাকে লইয়া চলিয়া আসিল। মৃত্যুর পূর্বগামিনী ছায়ার সঙ্গে, সেই আমার প্রথম পরিচয়। উদাস প্রাণে নয়, ভরা প্রাণে আমি বাসায় আসিলাম। সে রাত্রি পড়িতে-শুনিতে পারিলাম না। পরদিন প্রত্যুষে শুনিলাম, দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিন দিনের জ্বরে দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তখন কাছারীর ছুটি হয় নাই। পিতা ছুটির অপেক্ষায় দুই চারি দিন রহিলেন। আমি, মাতা ও পরিবারের আর আর সকলে চলিয়া আসিলাম। উলায় তখন বিষম মহামারী আরম্ভ হইয়াছে। আট-লক্ষ-লোক-পূর্ণ কলিকাতায় কোন দিন দুই শত লোকের মৃত্যু হইলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়; আর দশ হাজার অধিবাসীর বাসস্থান উলায়, প্রত্যহ দুই শত লোক নীরবে মরিতে লাগিল। পূজার পর পিতা রানাঘাটে কাছারী উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এখনও সেই রানাঘাটে আছে।

এই যে আমরা উলায় ছিলাম, ইহা লুপ্তভাবে বা এক-নাগাড়ে নহে। ৺শারদীয়া পূজার ছুটি হইলে, পিতার সহিত বাড়ী আসিতাম, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় পিতৃদেব চলিয়া যাইতেন, আমরা অর্থাৎ মাতা আমি প্রভৃতি কার্তিক পূজা করিয়া, অগ্রহায়ণে নবান্ন সারিয়া, পৌষে পিঠাপার্বণ খাইয়া, মাঘ মাসে উলায় যাইতাম। হেমন্ত ও শীত আমাদের চুঁচুড়ায় কাটিত। চুঁচুড়ায় বাস, আমার সহরে বাস হইত। উলায় বাস আমার পল্লীবাস ছিল। চুঁচুড়ায় গঙ্গা দেখিতাম, কলেজ দেখিতাম, লাল গোরা পিল পিল করিতেছে—এমন বারিক দেখিতাম; পালেদের বাড়ীর পার্শ্বে হোটেলের পূতিগন্ধের ঘ্রাণ লইয়া নাকে কাপড় চাপা দিতাম। দুর্গাপ্রসন্ন কাকা প্রভৃতি পাড়ার বর্ষীয়ান্ বালকেরা আমার সঙ্গী হইয়া আমার শহুরে জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করাইয়া দিতেন। দুই বার অগ্রহায়ণ, পৌষ, তাহা হইলেই হইল চারি মাস—আমি পাড়ার প্রেমচাঁদ মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়াছিলাম। পৌষপার্বণ পালার ভিতর পড়িত, দুই বারই গুরুমহাশয়কে চাল, ডাল, নারিকেল, গুড়, তিল, তিলের ছাঁই, রাঙ্গা আলু, গোল আলু প্রভৃতি পৌষের সিধা দিতে হইয়াছিল, আমার বেশ মনে আছে। সিধার সঙ্গে এক এক বোঝা সুঁদরী কাঠও দিতাম। শাস্ত্রমত তামাক চুরি করিয়া গুরুমহাশয়কে দেওয়া আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। বাড়ীর মধ্যে তামাক-খেকো পুরুষ—সাধু চাকর। সে প্রত্যহ ১০ কড়ার তামাক পাইত, তাহা হইতে চুরি করিয়া গুরুমহাশয়কে দেওয়া বড়ই কঠিন ও নিষ্ঠুর কার্য হইত। এই সকল বুঝিয়া-সুঝিয়াই বোধ করি ঐরূপ কার্যে গুরুমহাশয় আমাকে কখন ব্রতী করেন নাই।

এবার যখন উলা হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন ত আমি দিগ্‌গজ পণ্ডিত। পাঠশালার সমবয়সী ছেলেদের বানানে ঠকাইয়া দিই, মানেতে ঠকাইয়া দিই। তবে দুই একজন তিলি-জাতীয় ছাত্রের হাতের লেখা

* লক্ষ্য করিতে হইবে '২৮এ' -'২৮শে' নহে।

আমাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। পূজার পর পিতৃদেব রানাঘাটে চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা-প্রাপ্তির একরূপ সমাধান হইল। কুসংসর্গে নষ্ট না হইয়া যাই, এরূপ শিক্ষা তিনি আমাকে দিয়াছিলেন। সদা সত্য কথা কহিবে, মিথ্যা কথা কহিবে না—এরূপ করিয়া তিনি আমাকে কখন শিক্ষা দেন নাই; শিক্ষা হয় দৃষ্টান্তে, কেবল উপদেশে নহে। তিনি আমাকে যে বিচিত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শিক্ষার গুণে আমি কুসংসর্গ-প্রুফ হইয়াছিলাম। কুসংসর্গে আমাকে নষ্ট করিতে পারিত না। এই শিক্ষার কথা বহুদিন পরে, পিতার মুখে শুনিয়া এবং বুঝিয়া, আমি সাধারণীতে প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলাম এবং পরে, 'আলোচনা' পুস্তকে সেই প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।* দুই পঙ্‌ক্তি তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 'মনুষ্য-জীবনের প্রথম শিক্ষা—অহঙ্কার, আত্মগৌরব, আপনার উপর শ্রদ্ধা, আপনার উপর বিশ্বাস। কুসংসর্গে লোক মন্দ হইয়া যায়, অর্থাৎ যাহার মনে নিয়মিত অহঙ্কার নাই, সেই উচ্ছিন্ন যায়।' পিতা হৃদয়ের মধ্যে এই আত্ম-গৌরবের অঙ্কুর প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতেই চারি দিকে অনাচার-অত্যাচারের বিষম দৃষ্টান্ত থাকিতেও, আমি দশ বৎসরের বালক, সেই সময় হইতে সমস্ত কিশোর কাল, অনড় অচল ছিলাম।

পূজার কিছুকাল পরেই কলেজের পরীক্ষার সময়। আমি একেবারে গ্রীষ্মের ছুটির পর, যে দিন সিপাহীরা ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে বিষম বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ১৮৫৭ সালের ২রা জুন, সেই দিন আমি হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে সেকেণ্ড নম্বর রীডারের ক্লাসে ভর্তি হইলাম।†

* 'অহঙ্কার'-প্রবন্ধ 'অনুশীলনী'তে মুদ্রিত হইয়াছে।

† কিন্তু হুগলী মহ্‌সিন কলেজের Admission Register-এ লেখা আছে, 'তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী'—Third Year Class. ১৮৫৭ সালে ৩য় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইলে, ১৮৬৩ সালে ৯ম বার্ষিক শ্রেণী হইতেই এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া যায়।

পর দশ বৎসরে, কিরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট্ কলে, ঘৃষ্ট ও পিষ্ট হইয়া একটি অদ্ভুত ম্যালেরিয়া-পূর্ণ রুক্ষের জীবভাবে ১৮৬৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম, পূর্বেই বলিয়াছি, সে সকল কথা কিছু বলিব না। তবে এই দশ বৎসর কালের মধ্যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের কি শিক্ষা পাইলাম, তাহা বলা কর্তব্য মনে করি।

২৩

তখন বাঙ্গালায় সঙ্গীত বলিয়া একটা জীবন্ত জিনিস ছিল। কবির গান নিস্তব্ধ ও ম্রিয়মাণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাত্রা, পাঁচালী খুব আসর জমকাইয়া বসিয়াছিল। আমাদের পাড়াতেই পাঁচালীর দল ছিল। আর চুঁচুড়া, ফরেশডাঙ্গায় যাত্রা, পাঁচালীর আড়ৎ ছিল। তাহা ছাড়া পথে ঘাটে সর্বদাই লোকে গান গাহিতে গাহিতে যাইত; রাত্রিতে ত বটেই। পড়িবার সময় ছাড়া, অন্য সময়ে, চারিদিক্ চাহিয়া দেখা ও সকল কথা কাণ খাড়া করিয়া শুনা, আমার অভ্যাস হইয়াছিল। বহুতর বাঙ্গালা গান আমার মুখস্থ হইয়াছিল। রাত্রি-জাগরণ করিয়া যাত্রা শুনা,—বৎসরে দুই দিনও শুনিতাম না। এমনি দিবা ও সান্ধ্য গানে, আমার মগজ ভরপূর ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি হুগলী কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সেই ব্যবস্থা হইতে উপকার লাভ করিবার আমার ক্ষমতা হইয়াছিল। আমি উপকৃতও হইয়াছিলাম। আমরা পড়িতাম 'সুখবোধ ব্যাকরণ'। এই ব্যাকরণের কথা, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একটি প্রত্ন-তত্ত্ব-প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শত শত বালক ঐ ব্যাকরণ যে কণ্ঠস্থ করিত, তাহা বোধ হয় ত্রিবেদী কখন শুনেন নাই। ত্রিবেদী গ্রন্থকারের নাম লিখিয়াছেন—শ্রীভগবান্‌চন্দ্র সেন। ঠিক কথা, কিন্তু ১৮৫৭ সাল হইতে মুদ্রিত পুস্তকে 'শ্রীভগবৎচন্দ্র বিশারদ-প্রণীত' বলিয়া ছাপা হইয়াছে। এই ভগবান্‌চন্দ্র সেন বা ভগবৎচন্দ্র বিশারদের কাছে, আমরা এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার জন্য ১৮৬২ সালে পড়িয়াছিলাম। আর তাঁহার ব্যাকরণ সমস্ত কিশোর জীবনে অভ্যাস

করিয়াছিলাম। মুখবোধ হইতে যে কৃৎ, তদ্ধিত ও স্ত্রীত্ব পড়িয়াছে, তাহাকে বাঙ্গালা লেখায় হঠাৎ ব্যাকরণে ঠকিতে হয় না।

হুগলী কলেজের নীচের ক্লাসে কয়েক জন ভাল ভাল পণ্ডিত ছিলেন। এখনকার প্রসিদ্ধ বিপিনবিহারী গুপ্তের পিতা ৺গোবিন্দ গুপ্ত তন্মধ্যে এক জন। স্কুলে ভর্তি হইয়াই, তাঁহার হস্তে পড়িলাম। তিনি বড় সৎশিক্ষক ছিলেন। তাঁহার কাছে আমি বিশেষরূপে ঋণী। সেইরূপ হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছেও ঋণী। ভগবৎচন্দ্রের নাম পূর্বেই করিয়াছি। তাঁহার উপর ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি। ইঁহার নিকট আমি মুগ্ধবোধ শিক্ষা করিতাম। তিনি অগ্রে হেড পণ্ডিত ছিলেন, পরে প্রফেসর হন। পিতৃদেবও তাঁহার নিকট কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা দুই পুরুষে, তাঁহার নিকট ও প্রসিদ্ধ প্রফেসর ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী। সংস্কৃত বাঙ্গালার জন্য আর আমি ছাত্রজীবনে শেষ ঋণী—৺গোপালচন্দ্র গুপ্তের নিকট ও শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের নিকট। সকলেই জানেন, তিনি এখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান। কৃষ্ণবন্দ্যের 'ষড়-দর্শন সংবাদ' আমাদের বি. এ.-র অন্যতম পাঠ্য ছিল। তাঁহার পদমূলে বসিয়াই সংস্কৃত দর্শনে যৎকিঞ্চিৎ প্রবেশ লাভ করি।

স্কুলে ভর্তি হইয়া দেখিলাম, সুবোধিনী নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কলেজের অতি নিকটে চৌমাথা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিত—বাঙ্গালার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ওভারসিয়র পরীক্ষা পাস-করা। সংস্কৃত, বাঙ্গালা বেশ জানিতেন। সরল, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ সাধুভাষায়, সুবোধিনী ছাপা হইত। ফুলস্ক্যাপ আকারের কাগজ; দুই স্তম্ভে। যাঁহারা 'সাধারণী' দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন, সে-সুবোধিনী আকারে প্রকারে সাধারণীর আদর্শ।

সুবোধিনীতে ঈশ্বর গুপ্তের ছাত্রশ্রেণী অনেকেই পদ্য লিখিতেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়কে এবং মাদ্রালের গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বোধ হয় কেহ কেহ এখনও স্মরণ রাখিতে পারেন। অভয়চন্দ্র পাঁড়েকে, বোধ হয়, সকলেই ভুলিয়াছেন। তিনি সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিতের, মামাত কি পিসতুত ভাই ছিলেন, আর আমাদের তিন ক্লাস উপরে হুগলী কলেজের ছাত্র ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, সেটি সিপাহী সমরের সময়। পাঁড়েজী পদ্য লিখিতেছেন,—

> জয় ব্রিটিশের জয়, জয় ব্রিটিশের জয়,
> যতেক বিদ্রোহিদল, যাকৃ সব রসাতল,
> প্রবল ব্রিটিশ বল হউক অক্ষয়,
> বল হউক অক্ষয়।
> জয় ব্রিটিশের জয়, জয় ব্রিটিশের জয়।

স্কুলের প্রথমাবস্থায়, সংবাদপত্রের মধ্যে, এই সুবোধিনী আমার প্রধান সম্বল ছিল। এডুকেশন গেজেট বা প্রভাকর আর দেখিতে বা পড়িতে পাইতাম না। এ অঞ্চলে কৃত্তিবাস-কাশীদাসের ভূয় প্রচলন ছিল। ঐ সকল পুস্তক এবং বটতলার প্রকাশিত রজনীকান্ত, জীবনতারা প্রভৃতি আরও অনেক পুস্তক আমি পাঠ করিয়াছিলাম। কাশীদাস-কৃত্তিবাসের অনেক স্থলই মুখস্থ করিয়াছিলাম। এটি পড়িবে, উটি পড়িবে না, আমার মাথার উপর এমন কেহ বলিবার ছিলেন না, আমিও ভাল-মন্দ সমস্তই গলাধঃকরণ করিতাম। তখন একরূপ মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্য জীবন্ত ছিল। কাজি সফিউদ্দীন নামে কোন মুসলমান সেই সকল বটতলা হইতে প্রকাশ করিতেন। চাহার-দরবেশ গোলে-বকোয়ালি, ইসপ্, জেলেখাঁ, হাতেম-তাই প্রভৃতি সেই সকল মুসলমানী বাঙ্গালা গ্রন্থও গলাধঃকরণ করিতে আমি ছাড়ি নাই।

স্কুলে পড়িবার সময়েই, বৈষ্ণব-সাহিত্য এবং সংকীর্তনের দিকে আমার মন আকৃষ্ট হয়। তবে তৎপূর্বে যে উলায় থাকিবার সময়েও ঐ টানের কিছু অঙ্কুর জন্মে নাই, এমন কথা নহে। উলায় দেওয়ান মুখুয্যে মহাশয়দের নগর-সংকীর্তন খুব ভক্তিপূর্বক শুনিতাম। পিতৃদেব দুই একটি নগর-সংকীর্তনের গান

বাঁধিয়াছিলেন ; তাহাও মনে আছে। আর উলায় থাকিলেও, ৺দুর্গাপূজার সময় প্রতি বৎসরই বাড়ীতে থাকিতাম ; বিজয়া-দশমীর পরদিন হইতে এক মাসকাল আমাদের বাড়ীতে 'নিয়ম-সংকীর্তন' হইত। সেই অবধি এখনও হইয়া থাকে। আমাদের জন্মের পূর্বে, আমাদের পল্লীতে, বাঞ্ছারাম কীর্তনিয়া ছিলেন। তাঁহার সংকীর্তন-গানে মোহিত হওয়াতে, বাগনাপাড়ার বলরাম বিগ্রহের নাকি হস্তস্থিত শিঙ্গা খসিয়া পড়িয়াছিল। সেই বাঞ্ছারামের দৌহিত্র গুরুদাস বাওয়াজি আমাদের বাড়ীতে নিয়ম-সংকীর্তন করিতেন। আমাদের বৈঠকখানায় তাঁহাকে বেশ করিয়া বসাইয়া, পিতা তাঁহার গান শ্রবণ করিতেন। আমি একমনে হাঁ করিয়া শুনিতাম। আর যে দিন গোষ্ঠগান হইত, সে দিন বড়ই আনন্দিত হইতাম। এখন গুরুদাস-বংশ নির্বংশ হইয়াছে।

চুঁচুড়ায় থাকিবার কালে, বৈষ্ণব-সাহিত্য-সম্বন্ধে আর একরূপ শিক্ষা হইতে লাগিল। আমাদের পাড়ায় সদ্‌গোপবংশীয় নিয়োগীরা সদ্‌গৃহস্থ। সে সময়ে বর্ষীয়ান্ কর্তা জগমোহন নিয়োগী মহাশয় প্রত্যহই অপরাহ্ণে দুই পাঁচ জন প্রতিবেশী লইয়া চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ নিজে করিতেন, কখন-বা শুনিতেন। তিনি আমায় বড় ভালবাসিতেন। আমরা নিয়োগীদের বাড়ীতে সর্বদা ইংরাজি পড়া-শুনা করিতাম। চরিতামৃত-পাঠের সময় খেলা-ধূলা, ইংরাজি পড়া বা অঙ্ককষা ছাড়িয়া জগমোহন ঠাকুরদাদার পার্শ্বে বসিয়া চৈতন্যচরিতামৃত পান করিতাম। মাঝে মাঝে জগমোহন দাদা বলিতেন, 'মদন কাকার প্রপৌত্র না হবে কেন ? আকরে টান যে।'

পাড়ার চন্দ্রশেখর বৈদিক, পাটনা হইতে কি কার্য করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পাঁচ হাত জোয়ান, কবাটের মত বক্ষ, লাল চেহারা ; যদি পান, প্রত্যহই একটা গোটা পাঁঠা খাইতে পারেন ; কিন্তু প্রত্যহই অপরাহ্ণে পাঠ করেন—কাশীরামদাসের মহাভারত। লাল লক্ষ্ণৌ ছিটের তুলা-ভরা জামা বন্ধক আঁটিয়া গায়ে দিয়া, রাম রক্ষিতের দালানে বসিয়া, চন্দ্রশেখর বৈদিক মহাভারত পাঠ করিতেন। নিজে মহা পাঁঠাখোর ; কিন্তু নাকে তিলক, গলায় তিনকণ্ঠী মালা, পাড়ার বৈষ্ণব প্রতিবেশীরা সকলেই আগ্রহ-সহকারে সেই মহাভারত শ্রবণ করিতেন। আর তর্ক-বিতর্ক হইত—বৈষ্ণবতত্ত্বের নিগূঢ় কথা লইয়া। যিনি যে দিক্ দিয়াই বলুন, ভগবানের নির্লিপ্তবাদ সকলেই স্বীকার করিয়া লইতেন। ও-কথায় তর্ক চলে না—সকলেই এইরূপ ভাবে কথা কহিতেন। আমিও সেই বালককাল হইতে ঐ কথা মানিয়া লইয়াছি এবং নির্লিপ্ত-বাদে বিশ্বাস ক্রমে দ্রঢ়ীভূত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের কথা নানারূপ জল্পনা হইত। আমি কিন্তু তৎকালে বা তাহার বহুপর পর্যন্ত ভাল করিয়া কিছুই বুঝি নাই। এখনও যে বেশ করিয়া বুঝিয়াছি, সে স্পর্ধা করিতেছি না।

২৪

আমার শিক্ষার কথা বলিতে হইলে, সেই সময়ের সমাজের কথা বলা একান্ত আবশ্যক। যখন যাঁহার কাছে, যেটুকু শিখিয়া থাকি, পিতা যেরূপেই আমার চরিত্র গঠন করিয়া থাকুন, সে সময়ের সমাজের কথা না জানিলে, না বুঝিলে সেই সময়ের কাহারও শিক্ষার ভিত্তি বুঝা যায় না। মনুষ্য অদৃষ্ট হইতে কি পায়, না-পায় ঠিক বলিতে পারা যায় না। অভিজ্ঞাত হইতে কতকগুলি জিনিস পায় ; নিকটস্থ আত্মীয় পিতা মাতা ভাই ভগিনী হইতে লালন-পালনে কতকগুলি সঞ্চয় করে। গুরুমহাশয় প্রভৃতির তাড়নায় অনেকে শিক্ষা করে। দীক্ষাগুরুর কৃপায়, কেহ কিছু পায়, কেহ পায় না। এ সকল বিশেষ প্রাপ্তির কথা—কিন্তু সমাজ হইতেই সাধারণত সকলেই শিক্ষা করে। সমাজ—মনুষ্যের উপর নিঃশব্দে, বিনা আড়ম্বরে, গুরুগিরি করিয়া থাকে।

সেইজন্য বলিতেছিলাম, আমার কি কাহারও শিক্ষার কথা বুঝিতে হইলে, আমাদের বাল্যকালে, এই বঙ্গ-সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা বুঝা একান্ত আবশ্যক।

আবশ্যক বটে, কিন্তু বুঝা বড় কঠিন। এমন মনে হয় যে, সমাজের মূলভিত্তি বুঝি বদলাইয়া গিয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসরে জাপানের বাহ্য পরিবর্তনে জগৎ যেরূপ

চমৎকৃত হইয়াছে, আমাদের বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিলে, সেইরূপই বিস্ময় বোধ হইবে। কিন্তু আভ্যন্তরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা বড় কঠিন; সেইজন্য কাহারও বড় বিস্ময় হয় নাই। আমাদিগকে নাকি, সেই সমাজে শিক্ষা পাইয়া, এই সমাজে পরীক্ষা দিতে হইতেছে, কাজেই এই আভ্যন্তরিক পরিবর্তন, আমাদিগের, বিশেষ আমার, বিলক্ষণ লক্ষ্য হইয়াছে।

তখন বঙ্গসমাজের মূলে ছিল—সন্তোষ; এখন এই সমাজের মূলে দাঁড়াইয়াছে—অসন্তোষ, একেবারে চিতেন-মোহাড়া উল্টাইয়া গিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে—সমাজও বুঝিয়াছিল, সন্তোষ সকল সুখের মূল, অর্থাৎ সুখ হয় সন্তোষ হইতে। ইউরোপ বলে, কাজেই অনেকে তাহা কার্যে মানিয়া লইয়াছে—সন্তোষ হইতে আলস্য হয়, আলস্য সকল দুঃখের মূল। ইহার ফলে এই হইয়াছে, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় শুধু-গড়ে ঢেঁকীতে পাদ দিবেন, তবু চাষে মন দিবেন না।

পণ্ডিত অপণ্ডিত, জ্ঞানী মূর্খ, ব্রাহ্মণ কায়স্থ, কামার কুমার, চাষাভুষা সকল শ্রেণীর পনের আনা লোক থাকিত—আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট; তবে কি, অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিত না? করিত বৈকি—যাহার উন্নতি করিবার উপায় থাকিত, সেই করিত আকাশে ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরিতে যাইত না, শুধু হাঁড়িতে পাত বাঁধিয়া ব্যবসায়ের ধুমধাম করিত না। দরিদ্র?—ভদ্র সন্তানের মধ্যে এখন অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল; কিন্তু লক্ষ্মীছাড়ার সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে ছিল না বলিলেই হয়। 'লক্ষ্মীছাড়া', 'ছোটলোক' প্রায় একই পর্যায়ের গালি ছিল।

আমাদের পাড়ার পঞ্চু চাটুয্যে মহাশয় অতি দুঃখী ছিলেন। তাঁহাকে দীন-দুঃখী না বলিয়া দিন-দুঃখী বলিলে বোধ করি ঠিক হয়, কেন-না তিনি প্রতিদিনই দুঃখী। চাটুয্যে মহাশয়ের ঘরে কিছু নাই, সকাল সকাল সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া আটহাতী কাপড়খানির কোঁচাটি বাম হাতে ধরিয়া, ডান হাতে তুড়ী দিতে দিতে, নিজের পদস্থ চটির তালে গুন্‌গুন করিয়া গান করিতেছেন, ও একটু প্রকাশ্য পথে পাদ-চারণা করিতেছেন। সেই চটি কত দিনের কেহ বলিতে পারিত না; গুরুর সময় চাটুয্যে মহাশয়ের পদানত, বর্ষাকালে চালের বাতায়,—শীর্ষস্থানীয়, তবে একপার্শ্বে বটে। তখন লোকে ভিজা জুতা পায়ে দিবার সানিটেশন-পর্ব পাঠ করে নাই। চাটুয্যে মহাশয়ের সেই চট্‌চট্ পাদ-চারণাতেই বুঝা যাইতেছে, তাঁহার গৃহ অদ্য তণ্ডুল-কণা-শূন্য। তখন সমঝদার লোক ছিল, দরদের দরদী ছিল: উহারই মধ্যে একজন চাটুয্যে মহাশয়কে গোপনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি দুয়ানি বা দুই সের তণ্ডুল দিল। চাটুয্যে মহাশয় হাসিবেন, কি আশীর্বাদ করিবেন, স্থির করিতে পারিতেন না। শেষে বাম হাতে চাল বা পয়সা সামলাইয়া, সেই তুড়ী দিবার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া মৌন আশীর্বাদ করিয়া হাস্যমুখে হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। আহারের পর অশীতিপর বৃদ্ধ তাসের সঙ্গে গান গাহিতেছেন, হাস্য করিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন—কাল যে আবার কি খাইবেন, খাওয়াইবেন, সে ভাবনা কখন নাই।

আমরা সেই সন্তোষের সমাজে, সেই সুখের সমাজে, সেই আনন্দের সমাজে, সন্তোষেই গড়া-পিটা হইয়াছিলাম। তখন সেই সন্তোষ থাকাতে, সমাজে কতই-না স্ফূর্তি, কতই উৎসাহ, গান বাজনা, খেলা ধূলা, কুস্তি করতপ,—কতই-না ছিল! কাজেই আমরা বুঝিয়াছিলাম—সুখই জগতের নিয়ম, দুঃখ ব্যভিচার মাত্র। সুখের চোখে সকলই সুন্দর দেখায়। অতি বাল্যকালে, ঘোর ঝঞ্ঝার সহিত বজ্রস্ফোট হইলে, বুক ধড়ফড় করিত, কিন্তু সেই বুকের ভিতর তবু একরূপ আনন্দ উপভোগ করিতাম। পিতার নিকট শুনিতাম,—গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র তারকা সকলই মহাসুশৃঙ্খলায় আবদ্ধ ও নিয়োজিত—আকাশের সৌন্দর্য বুঝিতাম, শৃঙ্খলা মানিয়া লইতাম। পিতা দেখাইতেন, দুঃখের অপেক্ষা সুখ অনেক গুণে বেশি। কথাটা বেশ করিয়া, আপনার ভুয়োদর্শনে মিলাইয়া বুঝিয়া লইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম জগৎ সুন্দর, সুশৃঙ্খল; পরে বুঝিলাম—ভগবান্ মঙ্গলময়। ইহাই

বৈষ্ণব ধর্মের বীজ। আমার বাল্য-কৈশোরের শিক্ষা ঐ বীজ পর্যন্ত।

২৫

স্কুল-কলেজে পড়িবার সময় আমি আগ্রহ-সহকারে সকল বাঙ্গালা পুস্তকই পাঠ করিতাম, চর্চা করিতাম। সে সকলের আনুপূর্বিক পরিচয় দেওয়া অসাধ্য। তবে সাত আট জন গ্রন্থকারের নাম এবং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে কিরূপ ফল পাইয়াছিলাম, তাহা বলা আবশ্যক।

প্রথমেই বলিব,—রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কর্তৃক সম্পাদিত বিবিধার্থসংগ্রহের বিষয়। আমি প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা হইতে, তিন চারি বৎসরের বিবিধার্থসংগ্রহ পাইয়াছিলাম। অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক সেই সকল পাঠ করিতাম। বিচিত্র জুড়িদার পাইয়াছিলাম—বৃদ্ধ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে; তিনি পিতা অপেক্ষা বয়সে বিস্তর বড় ছিলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক পূজা-পার্বণ প্রভৃতি নিত্যকর্মে রত থাকিতেন, আর অবকাশ পাইলেই পাঠ করিতেন—বিবিধার্থসংগ্রহ। পূজার সময় পিতা আসিলে, আমরা দুই অপূর্ব জুড়িদারে সেই পাঠের পরিচয় প্রদান করিতাম। পিতা আমাদিগকে লইয়া নানা কৌতুক করিতেন। বিবিধার্থসংগ্রহ হইতে জ্ঞান পাইয়াছিলাম বহুতর। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের রচনায়, সাহিত্যশিক্ষার কোন সুবিধা পাই নাই; বলিতে কি, ভাষা শিক্ষারও নহে।

এই সময়ে মহা ধুমধামে চুঁচুড়ায় কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয় হইল। তখনও কলিকাতায় নাটক-অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। প্রসিদ্ধ গায়ক এবং গাথক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন; একদিন নিজে গাহিয়াও দিলেন। নাটকের নটীর গান হাটে বাজারে গীত হইতে লাগিল।—'অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে?' গ্রন্থকার রামনারায়ণের রচনার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল, তাঁহার নান্দী, নাপ্‌তে বউয়ের পরিচয় ও তিনরূপ ফলারের লক্ষণ প্রভৃতি মুখস্থই করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ফলার এখনও ভুলি নাই।

তখন পুস্তকের ফেরিওয়ালারা আমাদের এতৎ অঞ্চলের নগর-পল্লীর অলিতে গলিতে সমস্ত দিন পুস্তক বিক্রয় করিত। কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, চরিতামৃত, প্রেমবিলাস, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ প্রভৃতি বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থ, হিন্দু মুসলমান পুরুষেরা কিনিত। মেয়েরাও জীবনতারা, কামিনীকুমার প্রভৃতি গ্রন্থ ক্রয় করিত। বট'তলা ছাড়া অন্যত্র ছাপা দুই-একখানি গ্রন্থও হকারদের কাছে মিলিত। ফেরিওলাদের সঙ্গে আমার বড় পোট ছিল। আমি প্রতি রবিবারে, তাহাদের পুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করিতাম। তাহারা আমায় কিছু বলিত না, আমি যে একজন বাঁধা খরিদ্দার। এমন খরিদ্দার চটাইবে কেন? এক দিন নাড়িতে নাড়িতে একখানি এড়াটে চটি বই পাইলাম। গ্রন্থকারের নাম নাই, কোথায় কবে ছাপা হইল, তাহার কিছুই নাই। দুইখানি শাদা কাগজের মলাট দুই দিকে, মধ্যে ৬২ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ; নাম 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ।' বহু পরে জানিয়াছি এখানি রামকমল ভট্টাচার্যের লেখা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা-রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী নয়, বেতাল-পঁচিশও নয়, প্যারীচাঁদও নয়,—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই,—অথচ যেন সকলই আছে এবং উহাদের ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

'আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশ-বর্ষ-বয়স্কা এক ফরাশি যুবতী ছিলেন। তাঁহার নাম জুলিয়া। তাঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন। স্বামীর বয়ঃক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যূন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর

প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপা। তাহার অলকগুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোলদেশে পতিত হইত যে, দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়নযুগল উজ্জ্বল বিশাল ও ভ্রমরের ন্যায় নীল। কপোল-তল এরূপ স্বচ্ছ যে মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি যুবজন-সুলভ ভাবের অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার স্বামী আমার নবীন বয়স্‌ ও নির্ভয় ব্যবহার দেখিয়া অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। তিনি আমার প্রতি অতি অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন স্পষ্টরূপে নিষেধ করিতে পারেন নাই। ইউরোপের প্রথা এ দেশের মত যুবতী স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না, অতএব আমি জুলিয়ার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগের পথ অতীত হইতে লাগিল। কোন দিন একটি হাঙ্গর, কোন দিন জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া, কোন দিন মছলী বন্দরে মাস্তলের বন, কোন দিন সাফা উর্মিমালায় আহত উপকূলে অধিষ্ঠিত মান্দ্রাজ নগরের প্রাসাদাগ্র—এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা বঙ্গোপসাগরের নীল জল ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলাম।'

অনেকখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম বটে, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের ভাষার বিশেষত্ব বোধ করি দেখাইতে পারিলাম না। বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়াপদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা। কাদম্বরীতে কঠোর সংস্কৃত দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু 'এলা-লতা-লিঙ্গিত চুত ও তাম্বূল-বল্লী-পরিণদ্ধ সুপারি' এরূপ ঢং দেখি নাই।

বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনি না, বা লিখিতে দেখি না। অথচ আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী। হউক বা না হউক, এই ভাষার বিশেষত্বের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ক্ষতি কি?

আমি বালককালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম। গ্রন্থের সার কথা এই যে কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা লইয়া থাকিলে,—আমি হেন করিব, আমি তেন করিব, ইংরাজ তাড়াইব, ভারতের উদ্ধার করিব, এইরূপ সব দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পুষিলে, মানুষের স্বস্তি থাকে না, সুখ থাকে না, শান্তি থাকে না। তাহাকে কিসে যেন হুটপাট করিয়া তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায়। তাহার পর ঘা খাইয়া, ঠেকিয়া, শিখিয়া যখন মানুষ শান্তির অন্বেষণ করে, তখন দৈবক্রমেই হউক, আর যে রূপেই হউক, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিলে, তাহার শান্তি হয়। আসল কথা সুখ—দৌড়-ঝাঁপে নহে, রাজনীতিতে নহে, ভারত-উদ্ধারে নহে, সুখ—পারিবারিক শান্তিতে। এ কথা বাঙ্গালার অতি প্রাচীন কথা। বাঙ্গালার মজ্জাগত কথা। বাঙ্গালি কিছুকাল পূর্বে এই কথা বুঝিত বলিয়া, বাঙ্গালি পারিবারিক অধিষ্ঠানের যেরূপ সুশ্রীকতা, সম্পূর্ণতা-সম্পাদন করিয়াছিল, এমন কেহ কখন পারে নাই। অতি সামান্য আয়ে বাঙ্গালি দেবতা-অতিথির সেবা করিয়া, গৃহপ্রাঙ্গণ সুপরিষ্কৃত রাখিয়া, দেহে স্বাস্থ্য, মনে স্ফূর্তি পরিপোষণ করিয়া, কিছুকাল পূর্বে অতিস্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছে। এইটিই বাঙ্গালির গৌরব ছিল। এখন উন্নতি উন্নতি উন্নতি করিয়া দারুণ দুর্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষায় সেই গৌরব চূর্ণ করিতে বসিয়াছে। বালককালে অবশ্য এ সকল কথা বুঝি নাই, ভাবি নাই; কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের উপদেশ হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছিল। আমি বিচিত্রা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম।

আর উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, আমি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত সুবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। তাহাতে 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' নাম দিয়া একটি গল্প খণ্ডশ বাহির হইত। সেই গল্পে ছিল, জগন্নাথ যাইবার পথে—পথের একটু তফাতে, জটা-ঘটাসজ্ঘটিত এক মহাবটবৃক্ষ। তাহার

তলদেশ নিতান্ত নিভৃত নিরালয়। সেখানে সূর্যরশ্মি প্রবেশলাভ করিতে পায় না। ভীষণ বায়ু উপরে হু হু করিলেও তলদেশে মন্দ মন্দ বিচরণ করে। প্রচুর পত্রসন্নিবেশে সেখানে বৃষ্টিও পড়িতে পারে না। সেইখানে একটি ছোটখাট সামান্য কুটীর; বাস করেন এক পড়িয়া বা চণ্ডাল খৃস্টান, তাহার সহধর্মিণী ও একটি ছোট কন্যা। এ পুস্তকে পড়িলাম দুরাকাঙ্ক্ষ যখন মান্দ্রাজ, মহীশূর, মালব উলট-পালট করিয়া সেই বটতলে উপস্থিত হইলেন, তখন পড়িয়ার সহধর্মিণী মরিয়াছে, কন্যা যুবতী হইয়াছে। দুইটি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত গল্পের এইরূপ অপূর্ব মিল দেখিয়া, আমার বালক-মনে বড়ই আনন্দ হইল। সমসাময়িক ঘটনার যতই বিবরণ পাঠ করিব, ততই এইরূপ আরও মিল দেখিতে পাইব, এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা মনে উদয় হইল। এখন বুঝিয়াছি, গল্পের মিল ত দূরে থাকুক, দুইজন বাঙ্গালি গ্রন্থকার যদি একই ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ লিখিতে বসেন, দুইজনে নিশ্চয়ই বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। ভারতবর্ষীয় কুটীরে ও দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে, কেন-যে মিল হইল, এখন তাহা জানি। দুইখানিই ইংরাজি রোমান্স অব হিসটরি হইতে সঙ্কলিত। কিন্তু না-জানাই ভাল ছিল, কেন-না না-জানাতেই মহা আনন্দভোগ করিয়াছিলাম।

পঠদ্দশায় আর একখানি পুস্তকে আমাকে আলোড়িত করিয়াছিল। আনন্দও পাইয়াছিলাম। সেখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সা। আলালের ঘরের দুলালেও অনেক স্থানে নক্সা বা ফটো তুলিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লী-সমাজের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, কলিকাতার অলি-গলির নক্সা তেমন ফুটন্ত হয় নাই। তেপায়া উচ্চ টুলের উপর কাচের বাক্স বসাইয়া, দু পয়সা দাও, দু চক্ষু দিয়া দেখ, বলিয়া যেমন মেলার মধ্যে নানাবিধ ফটো দেখায়, অপূর্ব ভাষার গাঁথুনিতে সেইরূপে কলিকাতার নানাবিধ নক্সা তুলিয়া প্যাঁচা দেখাইতে লাগিল ও ফুলো গাল টিপিয়া বলিতে লাগিল, 'ইয়ে রাজবাড়ি কি নক্সা,—বড় মজাদার হ্যায়; ইয়ে শোভাবাজার কি গাজন,—বড় তামাসা হ্যায়; ইয়ে হাইকোর্টকা বিচার,—আজব তাজ্জব হ্যায়।' আমরা তখন নিতান্ত বালক, তাহার ভাষার ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গেতে, একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। মনে করিলাম, আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজি খেলানো যায়, তুবড়ি ফুটানো যায়, ফুল কাটানো যায়, ফুয়ারা ছোটানো যায়। মনে করিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সর্বাঙ্গে রঙ্গময়ী। ভালকথা,—তোমরা কৃতিসন্তান, তোমরা ত নানারূপে মাতৃভাষার সেবা করিতেছ, ভাষায় নক্সা লিখিতে, ছবি আঁকিতে, ফটো তুলিতে চেষ্টা কর না কেন? পার না? না, অবজ্ঞা কর? না, পার না বলিয়া, অবজ্ঞা দেখাও?

২৬

আমরা যখন চারি দিকের সন্ধান রাখিতে সমর্থ, তখন চুঁচুড়ায় নর্মাল স্কুল বসিয়াছে। ভুদেববাবু নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছেন। সপরিবারে চুঁচুড়ায় ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিতেছেন, শিক্ষা দান করিতেছেন, পুস্তক প্রচার করিতেছেন। তাঁহার হাবড়ার হেড মাস্টারির কথা আমরা জানি না। তাঁহার পুরাবৃত্তসার তখন পড়ি নাই, তাঁহার প্রথম পুস্তক পাঠ করিলাম ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয়—সফল স্বপ্ন এবং অঙ্গুরীয় বিনিময়। এই দুই গ্রন্থও রোমান্স অব হিসটরি হইতে লিখিত। কয়েক পঙক্তিতে স্ফুটরূপে স্বভাব বর্ণন করিয়া, নানারূপ স্বভাবজ শব্দের পরিচয় দিয়া, ভুদেববাবু উপসংহার করিতেছেন, 'যেন জগদ্‌যন্ত্র বাদ্যের মধুর লয়সঙ্গতি হইতেছে!'* লেখাটুকু কঠোরে

* 'রাত্রি উপস্থিত হইল। সুধাংশুমণ্ডলনিঃসৃত জ্যোৎস্না-রাশি মন্দমন্দ সমীরণে সঞ্চালিত মহীরুহগণ কর্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বনদেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গ-প্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং শুষ্কপত্র পতনের মরমর শব্দ, নির্ঝরের ঝরঝর ধ্বনি ও রাত্রিচর পশুগণের গভীর নিনাদ সমুদায় মিলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন জগদ্‌যন্ত্র বাদ্যের মধুর লয়সঙ্গতি হইতেছে এবং উহারই মোহিনীশক্তিপ্রভাবে যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্তশক্তি হইয়াছে।'—সফল স্বপ্ন।

মধুর ; এই নূতন রসের আস্বাদ পাইয়া একরূপ অপূর্ব আনন্দ উপলব্ধি করিলাম। বাল্যের সাহিত্য-চর্চায় ভূদেববাবু হইতে বিশেষ কোন শিক্ষা লাভ হইয়াছিল, এমন কথা নাই বলিলাম। সমাজ-তত্ত্বে তিনি সকল লেখকের শীর্ষস্থানীয়। যৌবনে আমরা অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি।

বোধ করি বিবিধার্থসংগ্রহে, আমি মাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু বালককালে আমি মাইকেল কিছুই পড়ি নাই। একটু বড় হইলে মাইকেলের মিতাক্ষরে উপহাস করিতাম। তাঁহার লেখার ভাবে অবহেলা করিতাম। তাঁহার প্রতি এক প্রকার মুখস্থ বিদ্বেষ দেখাইতাম। আসল কথা, মধুসূদনকে লইয়া তখন দুইটা পক্ষ হইয়াছিল। এক পক্ষ বলিত, মাইকেলের মত অমন হয় নাই, হবে না। আর এক পক্ষ বলিত, উহা কেবল ছাই ভস্ম। উহাতে না আছে ছন্দ, না আছে মিল, ব্যাকরণে দুষ্ট, অলঙ্কারে দুষ্ট। বালককালে এই বিতর্ক শুনিতাম। মনে মনে বিদ্বেষী পক্ষের দিকে একটু টান ছিল। তাহার পর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, যখন আমি শায়েনশা বিদ্যাদিগ্‌গজ বলিয়া পরিচিত হইলাম, তখন সেই বিদ্বেষী পক্ষের অধিনায়কতা, জানি না কেমন করিয়া, আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। ইহার বাহাদুরী এই, দুইদশ ছত্র ব্যতীত তখন আমি মাইকেল ভাল করিয়া পড়ি নাই। তবে তুখোড় ছেলে কি না, মাইকেলের পক্ষে কেহ কিছু বলিলে, আমি বিপক্ষে একটা-না-একটা জবাব দিতে পারিতাম। মাইকেলকে ভেঙ্গচাইয়া অমিতাক্ষর পদ্য লিখিতাম। কিন্তু তখন বাস্তবিক জানিতাম না,—অমিতাক্ষর কাহাকে বলে। স্তবের শেষের দিকে মিল না থাকিলেই অমিতাক্ষর বুঝিতাম। বাস্তবিক মিলে-গরমিলে অমিতাক্ষর নহে। সাধারণত পয়ারে ২৮ অক্ষরে ভাব শেষ হয়। অমিতাক্ষরে সে নিয়ম নাই। মাইকেল অধিকাংশ সময় শ্লোকটা ২৮ অক্ষরে শেষ না করিয়া ৪০, ৪৪, ৫০, ৫২ অক্ষরে ভাব শেষ করিয়াছেন।

বিধাতার নির্বন্ধে, বি. এ. পরীক্ষার জন্য বাঙ্গালার পদ্যাংশে মাইকেলের মেঘনাদের শেষভাগ স্থিরীকৃত হইল। সংস্কৃতাধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্তের সহিত আমার নিত্য দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। কিশোর-স্বভাব-সুলভ অতিশয় উক্তিতে আমি বলিলাম যে, মাইকেলের সমস্তই চুরি, তাঁহার নিজের একটুও নয়। আর এ কথা মাইকেল নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, কেন-না তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, 'গাঁথিব নূতন মালা' অর্থাৎ আমি টীকা করিতেছি,—ফুলগুলি তোমাদের পাঁচজনের,—গাঁথনি খালি আমার। তখন যে স্থানটা পড়া হইতেছিল, সে স্থানে ছিল 'অন্ধকার ঘরে দীপ আছিল মৈথিলী।' অধ্যাপক বলিলেন,—'দেখ দেখি, কেমন সুন্দর নূতন উপমা!' আমি বলিলাম, ও ত চাহার-দরবেশে আছে, 'আঁধারিয়া ঘরমে এক দিয়া ন দিয়া।'

এল. এ. পরীক্ষা দিয়া আমি পিতার কাছে আরায় এক মাসকাল ছিলাম। পিতার কাছারীর সেরেস্তাদারকে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা পড়াইতাম, তিনি আমাকে উর্দু অক্ষরে চাহার-দরবেশ পড়াইতেন। সেই টাট্‌কা বিদ্যা লইয়া, এখন এই সাহিত্য-সংগ্রামে মাইকেলের বিরুদ্ধে চাহার-দরবেশ-রূপ শর-সংযোগ করিলাম। অধ্যাপক ও সতীর্থেরা হাসিতে লাগিলেন। এমন নিত্যই হইত। কোন দিন-বা আমি তারাশঙ্করের বা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য লইয়া স্তম্ভ সাজাইয়া, অমিতাক্ষরের মতন করিয়া দেখাইতাম। তাহাতেও হাস্যকৌতুক হইত। দুই বৎসরের মধ্যে পরীক্ষার জন্য আমি মেঘনাদবধ পুস্তক কিনিলাম না। এইরূপে বহু-বিদ্বেষের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এখন আমি সেরূপ বিদ্বেষী নহি। মাইকেলের ছন্দ, কবিবর হেমচন্দ্রের অপেক্ষা সরল, সতেজ, মোলায়েম, সহজ এবং সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট, তাহা বুঝিতে পারি।*

পঠদ্দশায় মাইকেলের মেঘনাদ-বিদ্বেষ দেখাইবার জন্য পুস্তক কিনি নাই বটে, কিন্তু মাইকেলের নাটক-

---

* 'কবি হেমচন্দ্র' দ্রষ্টব্য।

প্রহসন সমস্তই পড়িয়াছিলাম। নাটকের ভাষায় বিশেষ কিছু শিখিবার না থাকিলেও, সেই ভাষা সহজ, সুমধুর বাঙ্গালা বটে; আর প্রহসনের ভাষা Just, appropriate,—যাহার মুখে যেমন দেওয়া উচিত, তাহার মুখে ঠিক তেমনই দেওয়া আছে, এ কথা তখনই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই বিষয়ের জন্য মাইকেলকে শ্রদ্ধা করিতাম। মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হইবার কিছু কাল পরেই দীনবন্ধুবাবু প্রকাশিত করিলেন,—'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়।' শেষোক্ত দুই গ্রন্থ উপরিউক্ত দুই গ্রন্থের অনুকরণে বা টক্কর দিয়া লেখা বটে। অনুকরণ অনেক সময় হীনবল হইলেও, সধবার একাদশী নামডাকে 'একেই কি বলে সভ্যতাকে' ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। সেও নিমেদত্তের গুণে। নিমেদত্ত আবার মধুদত্ত। সুতরাং মাইকেল মধুসূদন দত্তকে যদি দীনবন্ধু কোন স্থানে ছাপাইয়া থাকেন, সেও মধুসূদন দত্তের কৃপায়। অন্যত্র মধুসূদন একজন গ্রন্থকার; সধবার একাদশীতে মধুদত্ত বা নিমেদত্ত একজন পাত্র বা Dramatis Personae. কলিকাতার নর্দমায় পড়িয়া পাহারওয়ালার লণ্ঠন দেখিয়া নিমচাঁদ Milton আওড়াইয়া বলিতেছে—

'Hail holy light! the offspring of
Heaven first-born,
Of the eternal co-eternal beam.'

ইত্যাদি — শুনিয়াছি এ সকল মাইকেল-চরিত্রের ঐতিহাসিক ঘটনা। 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়। That's moral courage. (বুকে হাত দিয়া) আমি সেই moral courage-এর ছেলে বাবা!' ইত্যাদি অনেক কথাই মাইকেলের।

প্রহসনের কথায় প্রহসনের তীব্র সমালোচনার পরে সমালোচকের দুর্দশার গল্প মনে পড়িল। হুগলী কলেজ হইতে বি. এ. দিয়া যখন কলিকাতায় পড়িতাম, তখন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ফ্রাই ডে রিভিউ নাম দিয়া একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদিত করিতেন। বিলাতের স্যাটার ডে রিভিউতে সাময়িক সাহিত্যের যেমন তীব্র সমালোচনা থাকে, অথবা সেই সময়ে থাকিত, ফ্রাই ডে রিভিউতেও দে মহাশয় সেইরূপ তীব্র সমালোচনার চেষ্টা করিতেন। তিনি সধবার একাদশীর সমালোচনা করিলেন—'If this trash ever be put on the stage, we cannot recommend a better place for its performance than Sonagachi, and a fitter audience than its inmates and their patrons.' দীনবন্ধুবাবুর অবশ্য তেলে-বেগুনে হইল, জ্বলিয়া উঠিল; শিখা দেখা দিল—'জামাই বারিকের' তোতারাম ভাটে। তোতারাম ভাট অর্থ তোতা বা টিয়া পাখীর মত মুখস্থ করিয়া যে ভাটের মত বলিতে পারে। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ইংরাজিতে সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে তোতারাম ভাট নাম দিয়া দীনবন্ধুবাবু গায়ের জ্বালা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এত দিন পরে এ সকল কথা বলিবার প্রয়োজন কি? একটু প্রয়োজন আছে। দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থাবলী প্রকাশের অবসরে, ভূমিকায় বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, 'তোতারাম ভাট—দীনবন্ধুর কলঙ্ক।' কেন কলঙ্ক? কিরূপে হইল? সেই কথারই টীকা-টিপ্পনী করিলাম। সধবার একাদশীর সমালোচনাটা মুখস্থ ছিল বলিয়াই গোড়াগুলি বলিতে সাহসী হইলাম।

দীনবন্ধুবাবুর প্রহসনের পরিচয় বি. এ. পাস করিয়া পাইলাম বটে, কিন্তু আমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্বে অর্থাৎ ১৮৬১ সালে প্রসিদ্ধ লং সাহেবের মকদ্দমা হয়। সেই সময়ে নীলদর্পণ নাটক ও নাটককার দীনবন্ধুবাবুর নাম বাঙ্গালার সর্বত্র ঢি ঢি হইয়াছিল। আমরা তখন নাটক পড়িতে পাই নাই; কিন্তু নাটক যে একটা বড় গুরুতর জিনিস, নাটকের লেখাতে লোকের মান. অপমান হয়, সাহেবরা পর্যন্ত রাগিয়া উঠেন,—এরূপ কতকগুলি কথা, আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়াছিলাম।

ইদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক* বঙ্কিম-

* বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যাচার্যের অপেক্ষা ৮ বৎসরের বড় ছিলেন।

চন্দ্রের সহিত আমাদের পঠদ্দশার শেষভাগে পরিচয় হয়। তখন আমরা বাঙ্গালার ভঙ্গি বুঝিতে পারি, ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারি, কোনটা পথ, কোনটা অপথ, কোনটা কুপথ, একটু একটু চিনিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা পাইয়া আমার মনে পড়ে, আমি প্রথম দিনে আহ্লাদে আটখানা হইলাম। প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী-প্রকাশের অবসরে ভূমিকায় যে কথা বঙ্কিম-চন্দ্র জগৎকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,—স্পর্দ্ধা করিতেছি মনে করিবেন না—সত্য কথা বলিতেছি, সেই কথা তখনই আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর হইলেও বয়স্কা কুলীনকন্যার মত যেন কেমন-কেমন বোধ হইত। শীঘ্র ভিন্নগোত্রা হউক, আপনার ঘর আপনি করিতে শিখুক, আপনার পথ আপনি দেখুক,—এই প্রকার ইচ্ছা হইত। যখন টেকচাঁদ ঘটক সাজিয়া সোজা বাঙ্গালাকে বর সাজাইয়া সভায় উপস্থিত করিলেন, তখনও পাত্র আপনাদের আত্মীয় হইলেও কেমন-যেন ছোট ঘরের অপাত্র বলিয়া বোধ হইল। বঙ্কিমবাবু যখন স্বয়ং বরবেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকেই উপযুক্ত সৎপাত্র বলিয়া বোধ হইল। পাত্র মিলিল দেখিয়া সেই আহ্লাদেই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। পরে দেখা গিয়াছে, আমাদের সেই আহ্লাদ বালকের আহ্লাদ হয় নাই। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতারিত হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার নানারূপ সেবা করিয়াছেন, ভাষাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন এবং এক ভাষার গুণে বাঙ্গালিকে জগতের নিকট পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ ইংরাজি ফরাসীতে অনূদিত হইয়াছে।

আমাদের কলিকাতার কলেজ জীবনের শেষাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হইল। এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতাশূন্য অথচ রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রোত কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। কেবলমাত্র কপালকুণ্ডলা লিখিলেই, তিনি কপালকুণ্ডলাকার কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন, অন্য গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। আমরা যৌবনের সেই ভাবোদ্বেল অবস্থায়, সংসার-প্রবেশের সেই প্রথম উদ্যমে, এই অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালির লেখায় পাইয়া, একেবারে চরিতার্থ হইলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম।* কিন্তু এই গৌরবে একটা কিন্তু পড়িল। এখন যেখানে সিটি কালেজ, তাহার পশ্চিম ধারের তেতলা বাড়ী হইতে অর্থাৎ আপনার বাসাবাড়ী হইতে আরদালিকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কালেজের আইন শ্রেণীর† গ্যালারিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সুন্দর, সুশ্রী-গঠন, পাতলা পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, ঠোঁটের আশেপাশে একটু একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমা-জ্ঞান। আসেন, এক পার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না। তাৎকালিক সংস্কৃতাধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে, তাঁহার অনুরোধে তিনি আমাদের রেজেস্টরী লইতেন। কৃষ্ণকমলবাবু প্রথম নামটি ধরিয়াছেন কি, বঙ্কিমবাবু অমনি উঠিলেন,—তাঁহার কাণের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'আমাকে উপস্থিত লিখিয়া লইবেন, মহাশয়।' কৃষ্ণকমল বলিলেন, 'আচ্ছা'। অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদিঘির ধার দিয়া, ছাতা ধরাইয়া, সটানে সমানে চলিয়া গেলেন। আমাদের কাহার সহিত তখন বঙ্কিমবাবুর আলাপ হয় নাই। সেইটুকুই যা-কিছু কিন্তু। থাকুক 'কিন্তু', তখন বুঝিয়াছিলাম, এখনও বুঝিতেছি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

আমার বাঙ্গালা লেখা-পড়া সাঙ্গ হইল, অর্থাৎ

* 'প্রবন্ধ ও নিবন্ধ'-এ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† হিন্দু স্কুলের গ্যালারিতে, এখন যেখানে সুউচ্চ সুরম্য অট্টালিকা হইয়াছে।

কলেজের শিক্ষাও শেষ, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাও শেষ—একত্রই হইল। আমার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার কথা বলিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। আমিও নিজের কথা নিজে বলিবার অধর্ম হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

২৭

এখন পিতৃদেবের জীবনীর কথা বলা যাইতেছে। কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে রাজনীতি-সংঘটিত কোন কথা বলা ত চলে না; সুতরাং ছাড়িয়া ছুড়িয়া, কথা এড়াইয়া, লিখিতে হইতেছে।

উলা হইতে চৌকি উঠাইয়া লইয়া, রানাঘাটে গিয়া পিতৃদেব সেখানে অতি অল্পকালই ছিলেন। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ 'অপদস্থ' হইয়া পানিঘাটায় যাইতে হয়। পানিঘাটা নদীয়া জেলার দেবগ্রামের নিকট। তখন সেখানে চৌকি ছিল, এখন নাই। হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনের কারণ—প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতি। তখন নীলকর বিষধরে বাঙ্গালা জর্জ্জরিত। ইডেন, হর্শেল, গ্রাণ্ট তখনও নীলকরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন নাই। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশপরগনা, যশোহর জেলার অনেক স্থলেই তখন নীলকর সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহাদের দৌলত-দৎপৎ দেখে কে! এই নীলকরের এক জনের সঙ্গে পিতৃদেবের দুই একটি কি কথা হয়। নীলকর আপনাকে অপমানিত মনে করেন। অতি অল্পকাল পরেই পিতৃদেব বদলি হইলেন। রানাঘাট হইতে পানিঘাটা; পানিঘাটা হইতে পূর্ণিয়ার সদর। সেখানে উর্দ্দু চলিত্ ছিল। তাঁহার ফার্সী পড়ার ফল দেখিল। পূর্ণিয়া হইতে জাহানাবাদ। জহানাবাদে তিনি ইংরাজি স্কুল স্থাপনা করেন। সে স্কুল এখনও আছে। আর ১৮৬১ সালে প্রসিদ্ধ হিন্দু-হিতৈষী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, একটি শোকসভা আহ্বান করিয়া, তদীয় স্মরণার্থ চাঁদা সংগ্রহের জন্য একটি সুন্দর সুললিত বক্তৃতা বাঙ্গালায় করেন। বহুদিন পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহার আবার এই সংস্পর্শ।

ইংরাজি '৫৭ হইতে '৬১ এই চারি বৎসরে আমাদের পিতাপুত্রে কেবল দুর্গোৎসব ও মহরমের সময় মিলন হইত। '৬১ সাল হইতে, হয় শীতের ছুটিতে, না হয় গ্রীষ্মের ছুটিতে, আমি পিতার কাছে যাইতাম ও থাকিতাম। এইরূপে এক বৎসর আমি শীতের ছুটিতে জাহানাবাদে, আর এক বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে আবার পর বৎসর শীতের ছুটিতে কলিকাতায়, তাহার পর বৎসর '৬৩ সালে শীতের ছুটিতে জঙ্গিপুরে, '৬৫ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে আরায়, '৬৮ সালে মুর্শিদাবাদে পিতার নিকট গিয়াছিলাম। ১৮৬৮ সালে আমার শিক্ষা সাঙ্গ হইল। আমি পিতার নিকট বহরমপুরে ওকালতি করিতে গেলাম। ১৮৭০ সালের ২৯এ মার্চ পর্য্যন্ত পিতা বহরমপুরের সদর মুন্সেফ থাকেন, অথচ প্রায়ই একটিনী প্রধান সদর আমিনীতে অথবা একটিনী ছোট আদালতের জজিয়তিতে, ঢাকা, কটক, ভাগলপুর, চব্বিশপরগনা (আলিপুর) এবং যশোহর—এই সকল স্থানে দুইমাস ছয়মাস করিয়া কাটাইয়া আসেন। দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় এক বৎসর কাল, পিতাপুত্র আমরা একত্র ছিলাম।

তখন বহরমপুরে বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চার বড় সুবিধা ছিল। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী সেইখানে। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল। আর ভারতবর্ষের সংসৃষ্ট ইংরাজি পুস্তকও বিস্তর ছিল। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া বহরমপুরেই আসিয়া থাকিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—এই সময়ে বহরমপুরেই ওকালতি করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই সময়ে এই বিভাগের পোস্টাল ইনস্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর আমি যাইবার কিছুকাল পরেই,—পিণ্ডান্ত পিণ্ড শেষ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া গেলেন। সুতরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গালা চর্চার মহেন্দ্র-যোগ

বলিতে হইবে। আমি মহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ অবহেলা করি নাই।

আমি বহরমপুরে এরূপে যাইবার কিছু পূর্বেই, অর্থাৎ ওকালতি করিতে যাইবার কিছু পূর্বেই, পঠদ্দশায় একবার এক মাস মাত্র বহরমপুরে গিয়াছিলাম। সে কথা ধরিতেছি না। আমি বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পূর্বেই জজ কাছারীর সেরেস্তাদার মহাশয়ের ঘরে একটি নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সভ্যেরা একটু সকাল সকাল গিয়া সভা বসাইতেন, জজ সাহেব আসিলেই, সভা-ভঙ্গ হইত। সাধারণত দিনে অর্ধঘণ্টা জীবন। কোন দিন কাজের ভিড় থাকিলে, সে জীবনটুকুও হইত না। এই সভায় বিক্রমাদিত্য ছিলেন—জজ সাহেবের সেরেস্তাদার বৈকুণ্ঠনাথ নাগ। সে ঘরটি তাঁহারই ঘর। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্যামাচরণ ভট্ট—বেতাল ভট্ট। বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন (জাতিতে বৈদ্য সুতরাং)—ধন্বন্তরি। বহরমপুরের সরকারী উকীল দীননাথ গাঙ্গুলী—ক্ষপণক। বোধ করি তিনি একটু রাগী ছিলেন মনে করিয়া, তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হইবে। স্বনাম-প্রসিদ্ধ * গুরুদাসবাবু তখন বহরমপুরের আইনাধ্যাপক ছিলেন; অবশ্য ওকালতিও করিতেন। তিনি ছিলেন—বররুচি। আর পিতৃদেব—কালিদাস। ভরপূর আসরে যখন নবরত্ন সভা জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন, তখন আমি ওকালতি করিতে গেলাম। কোন ভেকান্‌সি ছিল না যে আমি প্রবেশ করিতে পারি, অথচ নবরত্ন সভা আমার সহিত সম্পর্ক রাখিতে উৎসুক হইলেন। আমাকে উৎকট বিকট সম্মানের পদ প্রদত্ত হইল। আমি হইলাম—রাক্ষস। আমি সমস্যা দিতাম, নবরত্ন পূরণ করিতেন। নবরত্ন-অধিষ্ঠিত নব বিক্রমাদিত্যের সভায়, আমি একখানি অপোজিসন চেয়ার পাইলাম। প্রাচীন পুরনো প্রথামত অনেক সময়েই রাক্ষসের আক্রমণ হইতে কালিদাসই সভার সম্মান রক্ষা করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমি কলেজে পঠদ্দশার সময় হইতেই, কতক মনের সহিত, কতক মজা দেখিবার জন্য, মাইকেলের বিদ্বেষী ছিলাম। এক এক দিন মেঘনাদের দুই দশ পঙ্‌ক্তি লইয়া নবরত্নকে ব্যাখ্যা করিতে দিতাম। মনের ভাবটা এই যে, অনেক স্থলে মেঘনাদবধ কাব্যের ব্যাখ্যা করা যায় না! কেবল 'ললিত-লবঙ্গ-লতা', কথাতেই পরিপূর্ণ।—

> 'উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে,
> পদ্মপর্ণে সুপ্তদেব পদ্মযোনি যেন,
> উন্মীলি নয়ন-পদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
> চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
> কুসুম-কুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পদ্মপর্ণ শব্দের অর্থ কি? হেমবাবু টীকা করিয়াছেন, পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র। সেটা কি জিনিস—পদ্মের গাছের পাতা, না পদ্মের ফুলের পাপড়ি? যদি গাছের পাতা হয়, তাহা হইলে উপমা বুঝা যায় না। কেন-না পদ্মপত্র হরিৎবর্ণ, উদয় অচল হরিৎ বর্ণ নহে। আর যদি পদ্মপর্ণ মানে পদ্মের পাপড়ি হয়—সেই-বা কি হইল? পদ্মের পাপড়িতে পদ্মযোনি সুপ্ত কেন? যদি-বা কখন থাকেন, তবে উদয়াচলের সহিত সাদৃশ্য কি? যাক। ব্রহ্মার নয়নপদ্মের উন্মীলনের মত আদিত্যের উদয়। তবে ব্রহ্মা কি একচক্ষু? আর সুপ্ত পদ্মযোনিই-বা নয়ন-পদ্ম উন্মীলন করেন কিরূপে? সুপ্তির পর, হইতে পারে বটে। আর ঘুম ভাঙ্গিয়াই-বা সুপ্রসন্ন ভাবে মহীর পানে চান কেন? কোন পৌরাণিকী কাহিনী আছে কি? যদি না থাকে, তবে কি বুঝিব? আর মহীর-বা এত উল্লাসে হাসি কেন? যদি বল, প্রভাত হইয়াছে বলিয়া, তাহা হইলে ত সব গোলমাল হইল, সাধ্যসম হইল—উপমান-উপমেয় পাল্টাপাল্টি হইয়া গেল।—এইরূপ নবরত্নের সহিত ঘোরতর রাক্ষস-সুলভা রাক্ষসী বিতণ্ডা করিতাম।

মাইকেলকে লইয়া ঘোরতর বিতণ্ডাই হইত। কোন পক্ষে জয়পরাজয় স্থির হইত না। আমি প্রকাশ্যত মাইকেল-বিদ্বেষী বটে, কিন্তু মাইকেলের কবিতা আবৃত্তি-কালে কাব্যের রস ভঙ্গ করিবার জন্য, আমি কোন

* পরে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকার বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতাম না। এ কথা সকলেই বলিতেন, এবং আবৃত্তিতে ছন্দ ও রস সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হয়, এ কথা বলিয়া সকলেই আমার প্রশংসা করিতেন। বররুচি প্রধান আলঙ্কারিক। তিনি একদিন বলিলেন যে মাইকেলের অনুপ্রাস বড়ই মিষ্ট। আমি বলিলাম, কি বলিতেছেন বুঝাইয়া দিউন; তিনি বলিলেন যেমন—'কিম্বা বিম্বা-ধরা রমা অম্বুরাশি তলে।' আমি বলিলাম, 'এইরূপ মিষ্ট অনুপ্রাস স্বচ্ছন্দে মুখে মুখে করা যাইতে পারে।' তিনি বলিলেন, 'একটা করুন।' আমি বলিলাম, 'কানুচেন রাঘববাঞ্ছা গামছা আনছে কেটা?' কেবল বিতণ্ডা নহে, এরূপ বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ সর্বদাই হইত।

এক দিন বররুচি কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'এমন কি পদার্থ আছে, যাহা থাকা ভাল, কিন্তু পাওয়া মন্দ?' কালিদাস শুনিয়াই উত্তর করিলেন,—'কৃষ্ণ'। কৃষ্ণ থাকা ভাল, কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তি মন্দ। উত্তর ঝটিতি বলাতে এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি কথা থাকাতে সকলেই হাস্য করিলেন, কিন্তু সদুত্তর হয় নাই বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিলেন। বররুচি অবশ্য বলিলেন, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর হয় নাই। পরদিন অশ্বযানে কাছারী আসিতে কালিদাস, বররুচির বাসভবনের নিকট অশ্বযান থামাইয়া, এই কবিতাটি তাঁহাকে শকট হইতে বলিয়া আসিলেন—

'প্রহেলিকা-অর্থ তব শুন হে রসিক,
নর হতে নারী তাহা ধরয়ে অধিক;
বিশেষ কি কব আর বুঝে দেখ ভাই,
কল্য না বলিতে পারি পাইয়াছি তাই।'

তাহার পর সভায় আসিয়া কালিদাস বলিলেন, 'বররুচির প্রহেলিকার সদর্থ আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি।' বলিয়া আবার কবিতাটি আওড়াইলেন। বিক্রমাদিত্য বলিলেন, 'এ যে বড দায় হইল—প্রহেলিকার অর্থ প্রহেলিকায়, এরূপ কতবার চলিবে?'*

একদিন রাক্ষস মহাদম্ভে নবরত্ন সভা আক্রমণ করিলেন। প্রহেলিকায় কবিতা আবৃত্তি করিলেন।

বার, দিন, মাস, তিন থাকে থাকে থাকে,
আপনার পরিচয় দেয় যাকে তাকে,
আপনি নির্বাক থাকি দেয় পরিচয়,
দিন দিন নব মূর্তি ধারণ করয়;
সকলের হিত করে নিজ পরিচয়ে,
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় অনেক বিষয়ে;
নবরত্ন সভা-মধ্যে বারো মাস রয়,
না বুঝিয়া নবরত্ন পান পরাজয়!

কত রকম কদর্থ, বদর্থ, টানাবোনা অর্থ, গোলমেলে অর্থ, এক এক রত্ন, এক এক সময়ে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস শিরঃসঞ্চালন করিয়া হুঙ্কার দেন মাত্র। একদিন গেল, দুইদিন যায়, ক্রমে সভা হেট-তুণ্ড হইতে লাগিলেন। সে স্ফূর্তি নাই, সে আনন্দ নাই, যেন সত্য সত্যই বিক্রমাদিত্যের সভা কোন রাক্ষস আক্রমণ করিয়াছে। না পারিলে রাজ্যে প্রজা নষ্ট করিবে, হয়ত রাজাকেই কত কষ্ট দিবে। এমন যে রাক্ষসের মন, তাহাও টলিল। হৃদয় গলিল। নবরত্ন সভা-গৃহের প্রাচীর-সংলগ্ন ধাতুময় ক্ষুদ্র *যন্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করিয়া এবং সকলের লক্ষ্য সেই দিকে আকর্ষণ করিয়া, রাক্ষস নবরত্ন সভার সম্মান রক্ষা করিলেন। সভাস্থ সকলে আরকিমিডিসের মত, Ureka, Ureka 'প্রাপ্তোঽস্মি, প্রাপ্তোঽস্মি' বলিয়া উঠিলেন, আবার আনন্দের স্রোত বহিয়া উঠিল।

পূর্বে রামগতি ন্যায়রত্ন ও লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়-দ্বয়ের নাম করিয়াছি। তাঁহারা ছাড়া আর একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তৎকালে বহরমপুরে ছিলেন। তিনি ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পৌত্রের পৌত্র—উমাচরণ ভট্টাচার্য। তিনি নৈয়ায়িক অথচ বিশেষ কাব্য-রসজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কাছে আমি কালিদাসের 'শকুন্তলা' পড়িয়াছিলাম। সে গুরুদত্ত পুঁথিখানি এখনও

* প্রহেলিকার অর্থ লজ্জা।

* যে দেওয়াল ক্যালেণ্ডারে মাস, বার, তারিখ প্রভৃতি বদল করিতে হয়।

আছে।* যৌবনের প্রারম্ভে তিনি উত্তরপাড়ায় আবদার করিয়াছিলেন,—'বিচারের ফলে বিদায়ের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে।' সে কথা কেহ শুনিল না; সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন। সরকারী চাকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব এখন উমাচরণ ভট্টাচার্য বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখরের মত—ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন।

তিনি তৎকালে বহরমপুরে সদর আলার সেরেস্তাদার ছিলেন। সেরেস্তা ছাড়িয়া উঠিবার তাঁহার অবকাশ হইত না। রাক্ষসাধমকে নবরত্নের নিত্য-লীলার নিত্যবিবরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে পেশ করিতে হইত। তিনিও এক এক দিন সভায় সমস্যা প্রেরণ করিতেন। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও কচিৎ সভায় সমস্যা দিতেন। তাঁহার একটি সমস্যা মনে পড়িতেছে।

'একাকী দাঁড়ায়ে সতী, ভারতীরূপিণী
যত থাকে, তত যায়, যামিনী-শোভিনী।'

নবরত্ন সভা বসিতে বিলম্ব দেখিয়া, আমি ভট্টাচার্য মহাশয়ের সমীপে ইহা পেশ করিলাম। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, হয়ত কত ন্যায়শাস্ত্র আলোড়িয়া, কত কাব্য-কলাপ মনে মনে আওড়াইয়া, শেষে সমাধা করিলেন,—'রজনীগন্ধা ফুলের ডাঁটা।' মিলাইয়া দিতেছেন, বলিতেছেন—'রজনীগন্ধা ত যামিনী-শোভিনী বটেই, শ্বেতবর্ণা বলিয়া ভারতীরূপিণী, আর যত অধিক দিন থাকে, তত ফুল খসিয়া খসিয়া যায়।' আমরা প্রহেলিকার অর্থ শুনিয়া তাঁহার লক্ষ্য-শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলাম। পরে নবরত্ন প্রকৃত অর্থ ভাঙ্গিয়া দিলেন—'জলন্ত বাতি'।

তাৎকালিক আমোদ-প্রমোদের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া এই সকল ফষ্টি-নাষ্টি সংগ্রহ করিয়া, বহুদিন পরে প্রকাশ করিতেছি।

* এখন আর নাই।

২৮

আমার বহরমপুরে যাওয়ার কিছুদিন পরে, বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যান। তিনি এরূপ সভায় কখন মিশিতেন না। কেন, তাহার আভাস প্রেসিডেন্সি কলেজে, তাঁহার যাওয়া আসার পরিচয়ে একটু দিয়াছি। এখন আর একটু বলিতে হইতেছে। তাৎকালিক বঙ্কিম-চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া, তাঁহার অহঙ্কারের কথা না বলা, ঘোরতর বিড়ম্বনা। বঙ্কিমবাবু আমাদের সমাজে, সাহিত্যে গোলাপ ফুল। গোলাপের কেবল পাপড়ির রং দেখিবে, মিঠা মিঠা সৌরভ দেখিবে, ঢল ঢল রূপ দেখিবে; গোলাপের বৃন্তে যে কাঁটা আছে, তাহা কি দেখিতে নাই? গোলাপে কাঁটা আছে বলিয়া, কি গোলাপের মর্যাদা কম?

'দেবের দুর্লভ নিধি, বিরলে বসিয়া বিধি
সমাদরে সৃজন করেছে,
নরের নিষ্ঠুর করে পাছে লণ্ডভণ্ড করে,
এই ভয়ে কণ্টকে ঘিরেছে।'*

এইরূপ বর্ণনা করিয়া পিতৃদেব ঋতুবর্ণনে গোলাপের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্কিম-সম্বন্ধেও যদি তাহাই হয়? যদি সামাজিকদের হাতে 'লণ্ডভণ্ড' হইবার ভয়ে, বঙ্কিমকে কেহ অহঙ্কারের আলোক-আবরণ দিয়া, ঘিরিয়া রাখিয়া থাকেন?

অত কথা বুঝি আর না বুঝি, এই বুঝি যে, বঙ্কিমকে অহঙ্কারী বলিলে তাঁহার মর্যাদার হানি করা হয় না। কোন সত্য কথাতে, কাহারও হানি করা হয় না; বিশেষ বঙ্কিম অহঙ্কারী ছিলেন বলিয়া তিনি দাম্ভিক ছিলেন, এমন কথা বলিতেছি না। পিতৃদেব ও আমার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়-কাহিনী গোড়া হইতেই বলা ভাল।

১২৬০।৬১ সালে পিতা যখন জাহানাবাদে মুনসেফ, বঙ্কিমবাবুর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র তখন জাহানাবাদে সাব-রেজিস্ট্রার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুইজনে

* গঙ্গাচরণ সরকার-প্রণীত 'ঋতুবর্ণন' নামে কাব্যগ্রন্থে বসন্ত-বর্ণন হইতে উদ্ধৃত।

বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যাইতেছেন বলিয়া সঞ্জীববাবু পিতাকে পত্র লেখেন, আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবং কাছারীর নিকট বঙ্কিমবাবুর জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য পাঁচটা বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া, একটি বাড়ী ঠিক করিয়া ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া রাখিলাম ; জল তুলাইয়া রাখিলাম ; একটি ঠিকা চাকরও রাখিয়া দিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যের গুণপণায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে, আনন্দ-সহকারে এই সকল কার্য করিয়াছিলাম।

যথাকালে বঙ্কিমবাবু আসিলেন, আহারাদি করিলেন, শুনিলেন যে, আমি গৃহবাসী গঙ্গাচরণবাবুর পুত্র, বি. এল. পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহারের পর বিশ্রাম করিলেন ; বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতাপুত্রে গাড়ি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ী দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ী দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিনখানা কেদারা বাহির করিয়া দিল, আমরা তিন জনে ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম, বাসায় সকলে ফিরিয়া আসিলাম, বঙ্কিমবাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবার্তা চলিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার জিনিসপত্র, চাকর, ব্রাহ্মণ লইয়া গাড়ি করিয়া তিনি নিজ বাসায় গেলেন, আমি গাড়ি করিয়া দিলাম, গাড়িতে তুলিয়া দিলাম ; হায় রে হায়! তখনকার কথা মনে পড়িলে, এখনও বুক ফাটে। এ পর্যন্ত বঙ্কিমবাবু আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না ; অধীনের প্রতি কপালকুণ্ডলাকারের করুণা-কটাক্ষ হইল না। বাবা সব বুঝেন, সব জানেন, সব দেখিতেছিলেন ; আমি ফিরিয়া উপরে গেলে, বলিলেন, 'বঙ্কিম গেল হে?' আমি বলিলাম, 'হাঁ।' 'তোমার সহিত দুদিনে একটিও কথা হয় নাই?' আমি বলিলাম, 'কথা কি, আমি যে একটা জীব, এই বাসায় থাকি, সে খবর হয়ত তাঁহাতে এখনও পৌঁছে নাই।' পিতা বলিলেন, 'তাই বটে।' বলিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির ফোয়ারায় আমার মনের ময়লা ধুইয়া গেল ; পিতৃগৌরবে আমি গৌরবান্বিত, আমিও হাসিতে লাগিলাম।

কাছারীর ফেরতা পিতাপুত্র দুইজনে বঙ্কিমবাবুর সুবিধা অসুবিধা কতদূর হইতেছে দেখিবার জন্য, বঙ্কিমবাবুর বাসায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু 'আসুন' বলিয়া পিতাকে সংবর্ধনা করিলেন। এবার মনে হইল, পিতাকে আসুনের সম্বোধনে ব্রাকেটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর সেইরূপ তিনখানি কেদারা বাহির করিয়া দিল ; বঙ্কিমবাবুর আদেশমত পিতাকে তামাক দিল, আমরা তিনজনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিমবাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুই-এক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না। তবে আমি এবার বুক বাঁধিয়া গিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর এই ভাব গায়ে কিন্তু মাখিলাম না ; তবে মনে মনে এমন ভাবটা হইয়া থাকিবে যে,—

কাদা মাখা সার হ'ল মোর, মাছ ধরা হ'ল না।

এই রূপে দিন যায়। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। আমারও দিন আটকাইয়া রহিল না। যতদিন পিতা বহরমপুরে ছিলেন, ততদিন বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝে এক একবার আসিতেন, পিতার সহিত গল্পগুজব করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাহার পর পিতৃদেব চলিয়া গেলেন, আমি একা বাসায় রহিলাম। বঙ্কিমবাবু আর আসেন না। আমিও অবশ্য যাই না।

কিসের একটা ৪।৫ দিনের ছুটি হইল। বঙ্কিমবাবুও বাড়ী আসিবেন, আমিও বাড়ী আসিব। নলহাটিতে আসিয়া দুইজনে দেখা সাক্ষাৎ। সাত সাত ঘণ্টা কাল, নলহাটিতে বিশ্রাম বা কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহার পর হয়ত ইস্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ি আসিবে, নয়ত দুই ঘণ্টা বিলম্বেও আসিতে পারে। সেকেণ্ড ক্লাসের বিশ্রাম-ঘরে বসিয়া বঙ্কিমবাবু ও আমি। দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। বহুদিন গিয়াছে, কিন্তু এবার বঙ্কিমবাবু ক্ষণ কাটাইতে

পারিলেন না। শুভক্ষণে, অতি শুভক্ষণে, বঙ্কিমবাবু কথা কহিতে লাগিলেন। এ কথা, সে কথা, ও কথা, কোথা হইতে কিরূপ করিয়া পড়িল—রহস্যকার রেনল্ডের কথা। তখন দুইজনে অসি-ধারে রেনল্ডের মুণ্ডপাত করিয়া, বসিয়া বসিয়া তৃপ্তিপূর্বক, দুইজনে সেই মুড়ি চিবাইতে লাগিলাম। চর্বণের সেই রসগ্রহে, দুইজনের ভিতরে সহৃদয়তা জন্মিল, দিন দিন সেই সহৃদয়তা ক্রমে ক্রমে অবিচ্ছেদে বিশেষ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি বড়, আমি ছোট; তিনি বয়সে বড়, জাতিতে বড়, বিদ্যায় বড়, কৃতিত্বে বড়, কিন্তু ছোট-বড় বলিয়া বন্ধুত্বে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর 'বন্ধুবৎসলতার' পরিচয় চন্দ্রনাথ দাদা যথেষ্ট দিয়াছেন। আমি আর চন্দনে সুগন্ধি প্রক্ষেপ করিব কেন? আমাদের এই নব বন্ধুতার অচিরাৎ একরূপ পরিণতি হইয়াছিল। দুই দিকে তাহার দুইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল। সেই কথার একটু সবিস্তার পরিচয় এক্ষণে দিব। পাঠক, আবার বলি, আমার আত্মম্ভরিতা আবার মার্জ্জনা করিবেন।

২৯

বহু পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'লুপ্ত-রত্নোদ্ধার'-এর ভূমিকায় বলিতেছেন,—'উহাতেই (আলালের ঘরের দুলাল হইতেই) প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে-বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে, বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ-দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা-দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।'—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা লিখিবার সময় বঙ্কিমবাবু যে সম্যক্ প্রকারে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এমন আমার বোধ হয় না। তাঁহার ভাষার 'লম্ফত্যাগ', 'নিদ্রা-গমন' প্রভৃতি সমস্ত পদ লইয়া কায়স্থ-কুলভূষণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিদ্রূপাত্মিকা সমালোচনা করিয়াছিলেন। আর কায়স্থ-কুলাধম আমি, ভাষার একান্ত সংস্কৃতানুসারিণী ভঙ্গি লইয়া বঙ্কিমবাবুর সহিত বিচার-বিতর্ক করিয়াছি। মৃচ্ছকটিক নাটকে দেখিবেন, প্রাড়্‌বিবাকের পার্শ্বোপবিষ্ট কায়স্থ প্রাকৃতে কথা কহিতেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ হউন, দীনবন্ধু হউন, প্যারীচাঁদ হউন, আর রাজেন্দ্রলালই হউন—আমাদের প্রাকৃতের দিকে একটু টান আছে। আমরা বুঝি ধর্মকার্যে, প্রত্নতত্ত্বে, ছটা-ছন্দো-বিভূষিত কবিতায়, সেই কবিতার লালিত্যে ও মাধুর্যে সংস্কৃতের প্রয়োজন। সংস্কৃত আমাদের গুরুজন; কিন্তু গুরুজন লইয়া ত সংসার হয় না। প্রধানত পুত্র-কলত্র, দাস-দাসী, বন্ধু-বান্ধব—এই সকল লইয়াই সংসার। এ সকল ত সংস্কৃত নয়,—প্রাকৃত। তাহা বলিয়া কেবল বিষয় কার্যের জন্য প্রাকৃত বা বাঙ্গালার প্রয়োজন এমন নহে। জীবন্ত কাব্যের বাঙ্গালাই জান্ অর্থাৎ প্রাণ।

যে কবিতা বুকের ভিতর দিয়া হৃদয়ে বসিয়া যায়, তাহা বাঙ্গালির পক্ষে বাঙ্গালাতেই হওয়া সম্ভব। সাধারণ বর্ণনায়, সাধারণ কথায় যেমন ভাব পরিস্ফুট হয়, ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলে তেমন হয় না। এইরূপ কথার বিচার-বিতর্ক অনেক দিন চলিল। বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে 'গোরু ঠেঙ্গাইতে' লাগিলেন।* বিষবৃক্ষে উভয়রূপ ভাষার সমাবেশ হইল। তখন বিষবৃক্ষ হাতের লেখায়,—ছাপানো হয় নাই।

মধ্যবর্তিনী ভাষা-প্রচারের সূচনা হইতেই 'বঙ্গদর্শন'-প্রচারের সূচনা আরম্ভ হইল। কত দিন, কত জল্পনা চলিতে লাগিল। শেষে কয়জন লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের খৃস্টান ব্রজমাধব বসু প্রকাশকরূপে, বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন।

লেখকগণের নাম বাহির হইল—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামদাস সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার। আর সকলে নামজাদা,

* 'জলের ধারে, তীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে ···। কৃষক লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে।'

আমিই কেবল নাম-হীন, অথচ আমার নাম ছাপা হইল। ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা—নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া আমি 'উদ্দীপনা' প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বড় খুসি। ব্রজমাধব প্রথম সংখ্যায়, আমার সেই প্রবন্ধের টিকি কাটিয়া বাহির করিলেন। প্রবন্ধের মুখটুকুও দেখা গেল না। বঙ্কিমবাবু এপলজি করিলেন বটে, আমি কিন্তু মনে মনে চটিয়া লাল। ওদিকে পিতাকে বঙ্গদর্শন পাঠানো হয় নাই। তিনি চটিয়া আমাকে লিখিলেন—'Why does not my friend Bankim Chandra send his Bangadarsan to me? I am able to understand it and can afford to pay for it?'

ঐ ক্ষুদ্র কথা কয়টিতে পিতার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং বন্ধুর সামান্য অবহেলায় 'রাগ' বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য বঙ্গদর্শন তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল এবং তিনি পাঠ করিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৩০

১৮৭০ সালের ২৯-এ মার্চ্চ, পিতা পাকা সব্‌জজ হন। পাকা পদ পাইয়া প্রথমে চট্টগ্রামে গমন করেন। সেই সময়ে একটি অপূর্ব্ব ঘটনা হয়। বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, সেটির উল্লেখ করা আমি কর্তব্য মনে করি। সাহিত্য কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া অর্থাৎ রস লইয়া, নাড়া চাড়া করে। সাহিত্যের এলেকা ছাড়া আরও অনেক গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয় আছে। সেইরূপ একটি আধ্যাত্মিক ঘটনার কথা বলিতেছি; ১২৯৩ সালের শ্রাবণের 'নবজীবনে' যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

ভবিষ্যতের ছোটপাট ঘটনা আমি কতবার স্বপ্নে দেখিয়াছি, তাহা বলিতেই পারি না। সাঙ্গোপাঙ্গ একটি গুরুতর ঘটনা আমি একবার স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। আমি একরাত্রি বহরমপুরে থাকিতে হঠাৎ* স্বপ্নে দেখি যে, পূজ্যপাদ পিতৃদেব যেন চট্টগ্রামে কর্ম করিতে যাইতেছেন, আর আমি তাঁহাকে কলিকাতায় রাত্রিকালে স্টীমারে উঠাইয়া দিতে গিয়াছি। আলোয় জাহাজ ঝকঝক করিতেছে, খালাসীরা কলকল করিতেছে, নীচে গঙ্গা কুলকুল করিতেছে, আর উপরে বায়ু ঝরঝর করিয়া বহিতেছে। স্বপ্নের কথা দুই-এক জনকে বলিয়াছিলাম। ইহার কয়মাস পরে, ঠিক সেইরূপ ঘটনা হইল। তেমনই আলো, তেমনই গঙ্গা; আমার বোধ হইল, সেই 'রেঙ্গুন'-নামা জাহাজই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। স্বপ্ন মিথ্যা আমি কখনই বলিতে পারি না।*

* হঠাৎ বলিবার ভাব এই যে, যে-বিষয় স্বপ্ন দেখি, সে-বিষয়ে জাগ্রৎ অবস্থায় মনে কোন তোলাপাড়া করি নাই।

১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইল। সেই বৎসর দুর্গোৎসবের পর মাতাঠাকুরানীর বায়ুরোগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, আমি ওকালতি ছাড়িয়া দিলাম, বহরমপুরে আর গেলাম না, বাড়ীতেই রহিলাম। '৮০ সালের বৈশাখ হইতে বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্কিমবাবুদিগের বাড়ী কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সঞ্জীববাবু কাঁটালপাড়াতেই প্রেস স্থাপিত করিলেন। ১২৮০ সালের ১১ই কার্তিক অর্থাৎ আমি বাড়ী বসিয়া থাকিতে আরম্ভ করার এক বৎসর পরে, 'সাধারণী' প্রকাশিত হইল, আর সেই মাস হইতে আমি 'বঙ্গদর্শনে' প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে লাগিলাম।† 'সাধারণী'ও 'বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে' কাঁটালপাড়ায় ছাপা হইতে লাগিল। '৮১ সালের শ্রাবণ মাসে আমি চুঁচুড়ার কদমতলায় আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন আমাদের আর একটি বাড়ীতে 'সাধারণী যন্ত্রালয়' স্থাপন করিয়া সাধারণী প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ঐ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পিতার 'ঋতুবর্ণন'‡ প্রকাশিত

* 'উদ্ভটকথা' হইতে উদ্ধৃত।

† মাঘ ১২৮১, বঙ্গদর্শনের 'সম্পাদকীয় উক্তি'র শেষ প্যারায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,

'আমাদের স্থূল বক্তব্য এই যে আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে বা যাহা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে না। কোন কোন গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা পূর্ব প্রথানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব।'

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বঙ্গদর্শনে আর প্রকাশিত হয় নাই।

‡ 'ঋতুবর্ণন, কবিতাবলী ও গীতাবলী' নামে গ্রন্থ ১৩২০ সালে পুনরায় মুদ্রিত হয়।

হইল। ঋতুবর্ণনের উৎসর্গ-পত্র অতি বিচিত্র বলিয়া এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রাণোপম প্রিয় পুত্র অক্ষয়চন্দ্র,

তুমি জান, আমাকে রাজকার্য-নিবন্ধন সময়ে সময়ে বিরল-বান্ধব স্থানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল; সেই সেই স্থানে অবকাশ-কাল কথঞ্চিৎ সুখে যাপন করণার্থ, পদ্য রচনা করিতে চেষ্টা করিতাম, সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ এই 'ঋতুবর্ণন' অভিহিত গ্রন্থখানি হইয়াছে। গ্রন্থখানি সামান্য, এ জন্য কোন বড় লোককে উৎসর্গ না করিয়া, ইহা তোমাকেই অর্পণ করিলাম। তুমি সন্তান, পিতৃদত্ত সম্পত্তি ভাল হউক বা না-হউক, তোমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতেই হইবে।

অগ্রহায়ণ ১২৮১ — শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার

'৮২ সালের বৈশাখে বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনে 'ঋতুবর্ণনে'র সমালোচনা করিলেন। বলিলেন ঋতুবর্ণন রিয়ালিস্‌টিক, বৃত্রসংহার আইডিয়ালিস্‌টিক। তাঁহার কথা তিনিই বলুন না কেন?

'সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত বর্ণনা-কাব্যের উদ্দেশ্য স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে —এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লয়েন। যাহা অসুন্দর, তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই,—যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই"—সেই আত্ম-চিত্ত-প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্যের অতি-প্রাকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি-প্রাকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে।...আমরা দুইজন বাঙালি কবির কাব্যকে উদাহরণ-স্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটি সুস্পষ্ট করিতে চাহি। যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেমবাবু প্রণীত "বৃত্রসংহার" তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া, মনোহর নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, লোকের মনোমোহন করিতেছেন। মানব-স্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া দৈব এবং আসুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে; কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধা হইয়া স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়াছে। যে জ্যোতি দেবগণের শিরোমণ্ডলের, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। সংসারকে শোধন করিয়া, কবি আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার-প্রণীত "ঋতুবর্ণন।" ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে—প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোকচিত্র, ইহার উদ্দেশ্য। উভয়েই কৃতকার্য্য, উভয়েই সুকবি। কিন্তু প্রভেদও অতি স্পষ্ট। একটি উদাহরণে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উভয়েরই কাব্যে বিদ্যুৎ আছে—গঙ্গাচরণবাবুর কাব্যে বিদ্যুৎ, উৎকৃষ্টরূপে আত্মকার্য সম্পন্ন করে, যথা—

ঘনতম ঘোরঘটা ক্রমে ঘোরতর।
চতুর্দিক্‌ অন্ধকার, অতি ভয়ঙ্কর।
চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির,
ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোষে গভীর।

চারিছত্রে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ, ইহাতে অসম্পূর্ণতা কিছুই নাই। দোষ ধরিবার কথা কিছুই নাই। যাহা প্রকৃত, তাহার কিছুরই অভাব নাই; তাহার অতিরিক্ত একটি কপর্দকও নাই। পরে হেমবাবুর বিদ্যুৎ দেখুন,—

কিংবা গিরিশৃঙ্গরাজি- মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণ-প্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা।
খেলে রঙ্গে ভীম ভঙ্গি, শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা॥
নিমেষে নিমেষে ভঙ্গ, দগ্ধ গিরিচূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ি ঘোর রবে।
বেগে দীপ্ত গিরি-কায়, বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লসিত ভবে॥

স্থানান্তরে বিদ্যুৎ আরও শোধিত, উৎকর্ষতা-প্রাপ্ত—

কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্মুক ধরি করে।
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস কত রঙ্গে,
ঘটা করি, লহরে লহরে ॥

বাঙ্গালির সাহিত্যে শোধন এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকাব্য-প্রণেতৃগণ শোধনপটু। বর্ণন-কাব্য-প্রণেতৃগণ মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত একজন।

ইহাও বক্তব্য যে গঙ্গাচরণবাবু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন যে, তিনি শোধন কাব্যেও অপটু নহেন। উদাহরণ-স্বরূপ প্রভাত-বর্ণন হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

মরি কি তরল অমল কিরণে,
ঢল ঢল আভা ঢালিয়া ভুবনে,
পুলক-জনক আলোক ভূষণে,
প্রাচী নভোদ্বারে উষা উপনীত,—
আরক্ত অধরে কিবা হাসি হাসে,
সে হাসি হিল্লোলে চরাচর ভাসে,
নিশার তামস মিশায় আকাশে,
হেরিয়া হইল অখিল মোহিত।

মোহিনী-মাধুরী করি দরশন,
প্রণয়-প্রয়াসে আপনি তপন,
আদরেতে কর করে প্রসারণ,
রূপসীরে যেন হৃদয়ে ধরিতে;
অপরূপ রুচি মানস-রঞ্জন,
শান্তির সহিত শোভার মিলন,
সে রুচি দেখাতে বিহঙ্গমগণ
জাগায় জগৎ মধুর ধ্বনিতে।

*

সুধীর গমনে সমীর শীতল
চলেছে জুড়াতে তাপিত ভূতল;
প্রফুল্ল-আননে প্রসূন সকল
পরশনে তার নাচে ধীরে ধীরে;
নলিনী-নিকর তাহার হিল্লোলে,
কাচ সম স্বচ্ছ সরসীর কোলে,
হাসি হাসি মুখে আধ আধ দোলে,
নিরখি গগনে নবীন মিহিরে।

রিয়ালিস্‌টিক আইডিয়ালিস্‌টিক বলিয়া বিভেদ করা মন্দ নয়। বুঝাইবার পক্ষে ভালই বটে। কিন্তু ঋতুবর্ণনে গৃহদাহ-বর্ণনায় এই যে—

ধেনুপাল, আলথাল, উৰ্দ্ধমুখে চাহিছে,
দগ্ধকায় সারিকায় মৃত্যুগীত গাহিছে।

এই যে কবিতা, ইহা রিয়ালিস্‌টিক, না আইডিয়ালিস্‌টিক? আমি মনে করি, দুয়ে মিশাল এবং তাহাই ভাল। ঋতুবর্ণনে সেরূপ পদ্যের অভাব নাই। যেমন নিদাঘ-নিশীথের বর্ণন—

হাসি হাসি স্রোতস্বতী, করি ধীরি ধীরি গতি,
নিজ নাথ সিন্ধু পানে যায়।
প্রতিবিম্ব তারকার, যেন কত হীরা হার,
তটিনীর অঙ্গে শোভা পায় ॥
লতিকারে কোলে লয়ে, নিতান্ত নীরব হয়ে,
স্থিরভাবে আছে তরুচয়।
প্রিয়তমা নিদ্রা যায়, পাছে বিঘ্ন হয় তায়,
নাহি নড়ে কথা নাহি কয় ॥

মধুর তান, বেণুর গান, কিরূপ শুনুন,—

তখন বিপিনে হরি, বিম্বাধরে বেণু ধরি,
ধরিলেন গোপী-গুণ-গীত।
চতুর্দিকে সুধাবর্ষে, প্রাণিকুল পিয়ে হর্ষে,
চরাচর হয় চমকিত ॥
প্রভাতীয় কলরব, না করে বিহঙ্গ সব,
আছে তারা শাখায় সুস্থির।
দিন-পতি-দুহিতার, না হয় কল্লোল আর,
শান্তভাব, গতি অতি ধীর ॥
মলয়ার সমীরণ, করি রব আকর্ণন,
বৃন্দাবন না পারে ত্যজিতে।
হইয়া প্রফুল্ল আস্য, ফুলরাজি করে হাস্য,
ধরা কোলে বেণুর ধ্বনিতে ॥

ঋষিগণ যেতে স্নানে, মোহিত হইল গানে,
পথে আর পদ নাহি চলে।
শুনি তান তরু-দল, কত প্রেম আঁখিজল,
ফেলিতেছে শিশিরের ছলে॥
ব্রজ-গোপ-বালা যত, নিকেতনে নিদ্রাগত,
বাঁশীরব শ্রবণে পশিল।
শুনি মাত্র চমকিত, হয় সবে জাগরিত,
নীলোৎপল নয়ন খুলিল॥'

আমি সমালোচনা করিতেছি না; পিতাকে পুত্রের প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পিতা ত নিজেই বলিয়াছেন, পিতৃদত্ত সম্পত্তি ভাল হউক, বা না হউক, আমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতেই হইবে। আমি কেবল বঙ্কিমবাবুর কথায় একটা কথা তুলিতেছিলাম। স্বভাব-বর্ণনায় যে, অতি-প্রাকৃত থাকে না এমন নহে; বরং প্রাকৃতের সহিত অতি-অতি-প্রাকৃত মিশিয়া-ঘুসিয়া লুকাইয়া-চুরাইয়া থাকিলে, কাব্য অতি সুন্দর হয়।

৩১

পিতা যখন যশোহরে তখনই বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়, সাধারণী প্রকাশিত হয়; আর ঋতুবর্ণন প্রথমার্ধ অমৃতবাজার যন্ত্রে, শেষার্ধ সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া, চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। পিতার যশোহরে থাকা সময়ের মধ্যে আরও দুইচারিটি ঘটনা হয়। তাহার মধ্যে একটির সাহিত্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখযোগ্য—দীনবন্ধুবাবু-প্রণীত 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয়। বঙ্কিমবাবুতে আমাতে লীলাবতীর একরূপ পরিবর্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া যে একটি উপকথা লাগানো আছে, সেই ভাগটি পরিত্যাগ করা হয়। বঙ্কিমবাবু লীলাবতীর প্রণয়োন্মাদের অবস্থায় (Raving Scene) প্রলাপ-দৃশ্য বসাইয়া দেন। আর টুক্‌রা-টাকরা পরিবর্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীনবন্ধুবাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না-হইয়াছে না-জানিয়া, বলিয়াছিলেন, 'এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিম—ভাই, আর অক্ষয়—ছেলে, ইহাদের ভালবাসি বলিয়া, আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই।' এই অভিনয়-রঙ্গে ৭।৮টি গান ছিল; দুই-একটি আমার কৃত; আর অনেকগুলি সঞ্জীববাবুর রচিত। তাহার একটি উল্লেখ করা আবশ্যক। এক সময়ে এই গানটির আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুর, নাটোর, কলিকাতা এবং আমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।

পিলু, যৎ

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার।
যত পেলে আঁখি জল, তত সে হ'ল প্রবল,
এখন লতা-ভরে তরু মরে, কে করে বিহিত তার?

বোধ করি ১৮৭২ সালের গুডফ্রাইডের সময় চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ মল্লিক* বাড়ীতে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল। কলিকাতা হইতে দীনবন্ধুবাবু প্রভৃতি, যশোহর হইতে পিতা প্রভৃতি, ভাটপাড়া হইতে ভট্টাচার্যগণ, কাঁটালপাড়া হইতে সঞ্জীববাবু প্রভৃতি, আমাদের স্বগ্রামের মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি শূরবীর-রথিগণ শ্রোতা। বঙ্কিমবাবু গুডফ্রাইডের ছুটি পাইয়াও আসিতে পারেন নাই। বাগবাজারের নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহারাও নিমন্ত্রিত শ্রোতা।

খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন থিয়েটারে 'কীর্তন' প্রবেশ করে নাই, আমরা লীলাবতীর মুখে খাঁটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়া ছিলাম।—

কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই?
আমি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পাই।
আমার হিয়ার মাঝে, ও-তার নূপুর বাজে,
ঐ রুনুঝুনু বাজে, তোরা শোন গো সবাই।

এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স-গণনায় যাপিত-জীবন মহারাজকে সকলে কঠোরপ্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল। দীনবন্ধুবাবু আমাদের সাত খুন্ মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য মহাশয়রা ত দুই হাতে দুই পায়ের ধূলা লইয়া, মহা আনন্দে

* চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটে প্রসিদ্ধ 'ধর'-এদের বাড়ী।

মহা আশীর্বাদ করিলেন; বলিলেন, ‘যেমনটা শ্রোত ছেলাম, তেমনটাই ছ্যাখলাম।’ সে রাত্রিতে আমাদের কিন্তু অসম্পূর্ণতা ছিল। ললিত-লীলাবতীর মিলনের পরিচায়ক তেমন একটি ভাল গান বাঁধা হয় নাই। আমরা করিলাম কি, প্রাচীন খেম্‌টা গান ভাঙ্গিয়া—

আয় আয় মকর গঙ্গাজল!
লীলাবতীর বিয়ে হবে, সইতে যাব জল।
কোথা গো লবঙ্গলতা, কোথা গো উর্বশী কোথা,
... ...
ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা না’চব ঝম্‌ঝমাইয়ে মল।

এইরূপ একটা গান করিয়া, সে দিনের আসর-রক্ষা, রস-রক্ষা, মান-রক্ষা করিলাম। পরদিন পিতাকে অনুরোধ করিলাম যে, সেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট নাটকের শেষ মিলনের গানটি যেমন প্রস্‌প্যারর উক্তিতে আছে, সেইরূপ লীলাবতীর শ্রীনাথ মামার উক্তিতে একটি গান আমাদের করিয়া দিতে হইবে। তিনি স্বীকৃত হইলেন। বিশেষ করিয়া শ্রীনাথ মামা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমাদের স্বগ্রামবাসী দীননাথ ধর-দাদা শ্রীনাথের রঙ্গ করিতেন; তিনি আমাদের অভিনয়-সমিতির একজন অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার গান-শক্তিও বেশ ছিল—এখনও আছে।

পিতা পরদিন যশোহর চলিয়া গেলেন। তাহার পরদিন পৌছান-পত্রের সঙ্গে গান আসিল। পিতা গাড়িতেই গানটি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের গাওয়া সেই সুর, সেই তাল,—

আজি কি সুখের উদয়!
লীলার সঙ্গে ললিতের (আজ) দিলাম পরিণয়॥
দুখ-তম তিরহিল, সুখ-ভানু প্রকাশিল,
রোদনের পুরী হ’ল আনন্দ-আলয়।
যদি সব সভাজন, এই সুখে সুখী হন,
বুঝিব সফল শ্রম, সফল আশয়॥

তাহার পরের কয়বারকার অভিনয়ে আমরা এই গান গাহিয়া মাত্ করিয়াছিলাম।

পিতা যশোহরে থাকার সময় যশোহর স্কুলের হেড-মাস্টার ছিলেন—প্রসিদ্ধনামা জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়। তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য-সেবায় নিতান্ত অনুরক্ত এবং বৈষ্ণব-সাহিত্য-সংগ্রহে একজন প্রথম পথপ্রদর্শক। বৈষ্ণব সাহিত্যে আমার অনুরাগ-সৃষ্টির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বিবিধার্থ-সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কর্তৃক উদ্ধৃত একটি মাত্র পদ-পাঠে সেই অনুরাগ বর্ধিত হয়। তাহার পর বহরমপুরে সদর মুনসেফির অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ রায় পরিষ্কার হাতের লেখায়, গোটা গোটা কালো কালো অক্ষরে একখানি ‘পদকল্পতরু’ আমাকে পাঠ করিতে দেন। সেইখানি নিয়ত নাড়িয়া-চাড়িয়া, দুরূহ পদের ক্রমাগত অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়া, আমি সেই অনুরাগ পোষণ করিতে ছিলাম। জগবন্ধুবাবু-কর্তৃক পিতার নাম-সংবলিত ‘বিদ্যাপতির পদাবলী’ পাইয়া আমি মহা আনন্দিত হই[illegible]। নিদাঘ-[illegible]ানন্দের ফল-স্বরূপ শ্রীযুক্ত (জজ) সারদাচরণ মিত্র [illegible]র সঙ্গে আমা-কর্তৃক ‘প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ’-প্রকাশ। অমৃতবাজারের হেমন্তকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সহিত পিতার যশোহরেই আলাপ হয়, এবং পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহারাই ঋতুবর্ণনের প্রথমার্ধ তাঁহাদের স্বীয় যন্ত্রে ছাপাইয়া দেন।

৩২

বঙ্গসাহিত্যের কথাই আমি প্রধানত লিখিতেছি, পিতার সহিত সেই সাহিত্যের সম্পর্কের কথাই প্রধানত বলিতেছি। কিন্তু আর একটা কথা পরিস্ফুট করিয়া না বলিলে, পিতার জীবনী নিতান্ত অসম্পূর্ণ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার জীবনের সহিত রাজনৈতিক ঘটনার কথা বলিতে পারিব না, আর তাঁহার বিচার-নীতির ও বিচার-দক্ষতার সম্যক্ পরিচয় দিতে পারিব না বলিয়া আপাতত লিখিব না, কিন্তু এ সকল ছাড়া আরও দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক; কেবল সাহিত্যের কথাই বলা প্রচুর নহে।

উলা, বহরমপুর, যশোহর, ঢাকা—সর্বত্রই বহুতর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সহিত পিতার পরিচয় হয়; এমন কি ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি তাঁহাদিগের সহিত নানা বিষয়ে ঘোরতর তর্ক করিতেন, কোন বিষয়ে ইংরাজি মতটা কি, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু সর্বদাই চেষ্টা থাকিত যে,

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ যাহাতে লোভী, লালায়িত না থাকিয়া, বৈরাগ্যবলে পূর্বমত সমাজের উন্নত পদবীতে অধিরোহণ করেন। শাস্ত্রচর্চা, ধর্মচর্চা দেশে যাহাতে বহুতর বিস্তৃতি লাভ করে, সে পক্ষেও তাঁহার সমধিক যত্ন ছিল। অনুস্বার, বিসর্গ দিয়া একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেই যে শাস্ত্র বলিয়া নত-মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে, এমনটা না হয়। বিচার হউক, বিতণ্ডা হউক, কিন্তু যে যতটুকু শাস্ত্র মানিতে পার, শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে পার, সে ততটুকু মানো, বিশ্বাস করো—ইহাই তাঁহার মত ছিল। 'করকায় কাঠিন্য ভ্রম' এই কথা লইয়া তিনি নৈয়ায়িকগণকে বিষম উপহাস করিতেন। বলিতেন পদার্থ-বিদ্যা ও-রূপে পরিচালনা করিতে নাই। কতকগুলি সূত্র আগে ধরিয়া লইয়া, তাহার পর পদার্থের বিচার করা চলে না। সে বিপরীতা বুদ্ধি। আগে পদার্থ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ভূরি ভূরি পরীক্ষার-দ্বারা পদার্থ-জ্ঞানলাভ করিতে হইবে; কোন্‌টা ব্যাপক, কোন্‌টা ব্যাপ্ত, তাহা বুঝিতে হইবে, তাহার পর সূত্র স্থির হইবে। ইহাই অন্বীক্ষণ এবং তাহাই প্রকৃত ন্যায়শাস্ত্র।

নৈয়ায়িকগণ প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেন না বলিয়া, তিনি মহাদুঃখ প্রকাশ করিতেন। এই জন্য অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল যে একজন সৎ-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লইয়া চুঁচুড়াতে একটি চতুষ্পাঠী করেন। যশোহরে জগবন্ধু ভট্টাচার্যের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ভট্টাচার্য মহাশয় মহাপণ্ডিত না হইলেও সদাচারী ও সৎ-বুদ্ধিশালী। কথা স্থির হইল যে, তিনি চুঁচুড়ায় আসিয়া চতুষ্পাঠী করিবেন। তিনি এ দেশে আসিলেনও বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে তিনি আমাদের ও-পারে গরীফা-গ্রামে চতুষ্পাঠী করিলেন; সে চতুষ্পাঠী এখনও সেইখানে আছে। পিতার প্রবলা ইচ্ছা ছিল জানিয়া এবং নিতান্ত কর্তব্য-বোধে আমি একটি চতুষ্পাঠী করিয়াছি।

এখন ব্রাহ্মণ-রক্ষার্থ, ব্রাহ্মণের গৌরব-রক্ষার্থ, চারিদিকে চেষ্টা হইতেছে, চতুষ্পাঠী বসিতেছে। মহাত্মা ভূদেববাবু-কর্তৃক বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার চতুষ্পাঠীতে 'বিশ্বনাথ বৃত্তি'-দান, গোপালচন্দ্র বসু মল্লিক-কর্তৃক বেদান্ত-প্রচার উদ্দেশ্যে দান, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলীকে প্রচলিত ব্যবহারশাস্ত্র-শিক্ষা-দান-জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের দান—এ সকলই ব্রাহ্মণের গৌরব-রক্ষার্থ কীর্তি। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই বুঝিবেন না, কিসে তাঁহার গৌরব। ব্রাহ্মণ চেত্তী শ্রেষ্ঠী কাঞ্রা মাড়োয়ারীর মত ধন, ধন করিয়া ব্যগ্র। ব্রাহ্মণের গৌরব লোভ-হীনতায়, অল্পে সন্তুষ্টিতে। অসন্তুষ্ট দ্বিজ নষ্ট হন, তোমরাই ত বলিয়াছিলে; আর তোমরাই-বা সে কথা ভুলিলে কেন। জীবনযাবৎ ঐ কথা বলিয়া পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আমারও আর কোথাও যাইবার দিন আগতপ্রায়,—যদি একজনও ঋষি-বৃত্তি নির্লোভ ব্রাহ্মণ দেখিয়া যাইতে পারিতাম তবে জীবন সার্থক বোধ করিতাম। ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব হইতে 'সাধারণী'তে এই কথা লিখিয়াছি। ২০ বৎসর পূর্ব হইতে 'নবজীবনে' পুনরুক্তি করিয়াছি; দশ বৎসর চতুষ্পাঠী করিয়াছি; এখনও ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতেছি। ব্রাহ্মণের কি চক্ষু ফুটিবে না!

সাহিত্য-সেবা-উপলক্ষে বিংশতি বৎসর পূর্বে নবজীবনে যে কথার পরিচালনা করিয়াছিলাম, এখনও সাহিত্য-সেবার ইতিহাস-গ্রন্থন-প্রসঙ্গে, সেই কথার পরিচালনা, করিতে দিন —সেই সমাচার নবজীবন হইতে উদ্ধৃত করিতে দিন। আমার দোষ মার্জন করিবেন; আমি আমার মজ্জার কথা বলিতেছি—

ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্বাগ্রে আবশ্যক; ব্রাহ্মণ উঠিলে, সকলের উদ্ধার সহজ হইবে। এই বিষয়ে, অগস্ত কোমতের মত অতি বিচিত্র। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে ভারতের পুনরুদ্ধার হইবে; তবে তজ্জন্য বিষয়-বাসনা এবং ঐহিক প্রভুত্ব-লালসা পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাঁহার সবিস্তার মত, সানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

* * Positivism must first regenerate the polytheists of India, then of China, lastly those of Japan.

Although it will act simultaneously on the three, whether through the direct agency of the West or indirectly through the Mussulman, it is

impossible to doubt that *the theocracy which has suffered the least from time will be the most open to the regenerative process.* Besides my lectures on this subject, I must refer to the preceding volume for explanations inconsistent with the limits of my present sketch, to show the latent predisposition of the Brahmins in favour of the faith which will restore their moral nature and their mental organisation. ...Positivism will deliver it (the theocratic caste *i.e.*, the Brahmins) from the oppression of the temporal power to which it has been subjected for twenty centuries, an oppression which it bows to more and more without ever losing its consciousness of its spiritual superiority and the hope of seeing it definitively re-established. Such a restoration, it is true, demands its complete renunciation of command and even of property, but the systematic guardians of human order will not be slow to accept conditions in the name of their social mission and of their individual dignity.

Positivism offers, then, the regenerate Brahmins the re-organisation of Brahmanical body, but it offers them besides, as nothing else does, gratification of the noble wish they have cherished to free their country from all foreign dominion. Appealing in fitting terms to the English nation, it will peaceably remove a yoke which under whatever veil of illusion, justly inspires more antipathy than that of the Mussalmans....the great object of instituting that doctrine (the positive faith) being to enable the Brahmins who have become positivists, to modify their theocratic milieu.

Extract from Positive Polity, Vol. iv., Page 447.

—বৈজ্ঞানিক ধর্ম প্রথমে ভারতের, পরে চীনের, সর্বশেষে জাপানের দেবোপাসকগণকে পুনর্জীবিত করিবে।

বৈজ্ঞানিক ধর্ম ঐ তিন জাতির উপরেই একই সময়ে শক্তি চালনা করিবে বটে, তা সাক্ষাৎভাবে ইউরোপীয়দিগের দ্বারাই করুক, অথবা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের দিয়াই করুক, কিন্তু যে-জাতি কালবলে সকল অপেক্ষা অল্প পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহারাই (ব্রাহ্মণেরাই) বৈজ্ঞানিক ধর্মের নবজীবনী শক্তিতে শীঘ্র সঞ্চালিত হইবে। এই বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য আমার অন্যান্য বক্তৃতা এবং এই গ্রন্থের পূর্বখণ্ড দেখিতে বলি; এই ক্ষুদ্র বিবরণে সকল কথা বিবৃত করা আয়ত্তি-সাধ্য নহে; ঐ সকল দেখিলে, বুঝা যাইবে যে,যে-ধর্মে ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদের পূর্বসামাজিক গৌরব দেয়, অথচ তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতি সর্ব-গুণ-সম্পন্ন করে, সে-ধর্মে বিশ্বাস করিতে ব্রাহ্মণদের গূঢ় প্রবৃত্তি আছে।

বিগত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণেরা রাজ-শক্তির অধীন হইয়া আছেন; এই রাজশক্তির অত্যাচারের হস্ত হইতে বিজ্ঞানধর্ম ব্রাহ্মণদিগকে উদ্ধার করিবে। ব্রাহ্মণেরা রাজশক্তির অত্যাচারের নিকট দিন দিন অধিকতর নত হইয়া আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে আধ্যাত্মিকতায় অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত বলিয়া জানেন,—সে জ্ঞান তাঁহারা এক দিনের তরেও হারান নাই, আর সর্বতোভাবে সেই শ্রেষ্ঠতা পুনঃসংস্থাপনের আশাও এক দিনের তরে ত্যাগ করেন নাই। আপনাদের গৌরব পুনঃস্থাপনের জন্য ঐহিক বিষয়ে প্রভুত্ব ও বিত্তাদির বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা,—ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যক; নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণেরা তাহা করিবেন। যাঁহারা এতকাল ধরিয়া ধারাবাহিকক্রমে মানবসমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব রক্ষার জন্য, এবং তাঁহাদের সামাজিক কর্তব্যসাধন-জন্য, ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।

ধর্মযাজক-সম্প্রদায়-পুনর্গঠনের সুবিধা নব-জীবন-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে বিজ্ঞানধর্ম প্রদান করে; আর সর্বপ্রকার বৈদেশিক আধিপত্য হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার যে আশা তাঁহারা এত দিন ধরিয়া পোষণ করিয়াছেন, সেই আশা ফলবতী করিবার সুযোগও বিজ্ঞানধর্মই তাঁহাদিগকে প্রদান করে,—সে সুযোগ আর কিছুতেই দেয় না। ইংরাজ জাতির নিকট কথোপকথন ভাবে আত্ম-বেদন জানাইয়া ইহারা বিনা

রক্তপাতে ইংরাজের প্রভুত্ব হইতে আপনাদিগকে উন্মোচন করিবেন। ইংরাজের প্রভুত্ব যতই কেন কুহু-কুহকে ঢাকা ঘেরা থাকুক না, মুসলমানের রাজত্ব অপেক্ষা বাস্তবিক অধিকতর অসন্তোষের নিদানীভূত। ··· বিজ্ঞানধর্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যই এই যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ মতাবলম্বী হইবেন, তাঁহারা এতদ্দ্বারা সহজে যাজক-সম্প্রদায়ের প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।—

বিজ্ঞানধর্মের বলে, ব্রাহ্মণ জাতির পুনরুত্থানের কথা—সহজেই মনে করা যাইতে পারে, কোম্‌তের নিজ প্রতিষ্ঠিত ধর্মে গাঢ় অনুরাগের পরিচয় মাত্র। অথচ বিষয়-বৈভব-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, ব্রাহ্মণ জাতি আবার পূর্ব গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, এ কথাটিতে বড় আশা হয়, বড় আনন্দ হয়। কিন্তু ইউরোপের সুদূর প্রান্ত হইতে, কঠোর বৈজ্ঞানিক কোমৎ ভারতের বিকৃত ইতিহাস পাঠ করিয়া যে কথাটি বুঝিতে পারিলেন, যাঁহাদের কথা তাঁহারা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ সহস্র স্থানে স্পষ্ট দেখিয়াও সেই কথা বুঝিতে পারেন না,—ইহাই আশ্চর্যের বিষয়, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। যখন তোমার বিষয়-বাসনা ছিল না, সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিতে, তখন তুমি ঊর্দ্ধ হস্তে, কেবল আশীর্বাদ করিয়া, সমগ্র সমাজের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছ, আর আজি তুমি বৈষয়িক বৈভবের জন্য ব্যস্ত, কাজেই আজি তোমাকে দক্ষিণার জন্য দ্বারে দ্বারে যোড়হস্তে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে। জানি না, কত দিনে তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে।

ব্রাহ্মণগণ এখন যদি জাতি-স্থিতির ভাবনা না ভাবিয়া, স্বজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, নিঃস্বার্থ ধর্ম-জীবনের উচ্চ ব্রত অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব গৌরব লাভ করেন, এবং ভারতে সত্য সত্যই নবজীবন হয়। জানি না, ব্রাহ্মণের চক্ষু কবে উন্মীলিত হইবে! এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে?

৩৩

যশোহরের পর পিতা ঢাকায় যান। ইংরাজি '৭৬ সাল হইতে '৮২ সাল পর্যন্ত কয় বৎসর ঢাকাতেই থাকেন। ঢাকায় কথঞ্চিৎরূপে তাঁহার উচ্চ পদের গৌরবে, কিন্তু প্রধানত তাঁহার গুণ-গৌরবে, তিনি সর্ব সম্প্রদায়ের শীর্ষ-স্থানীয় হয়েন। তিনি নিরভিমান থাকিয়া সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতে পারিতেন, নিরপেক্ষ হইয়া যথার্থ কথা বলিতে পারিতেন, চরিত্রে নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, সকলের সম্মান ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিতেন; তাহার উপর পদগৌরব ত ছিলই; সুতরাং তিনি সকল সম্প্রদায়ের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়াছিলেন; ঢাকায় হিন্দু-ব্রাহ্মে একটু ফুটন্ত অফুটন্ত ঘর্ষণ ছিল। এক দিকে 'হিন্দু ধর্মরক্ষিণী' সভা ছিল। অন্য দিকে স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মধর্ম রক্ষা করিতেছিলেন। পিতা অবশ্য হিন্দু, 'হিন্দু ধর্মরক্ষিণী' সভার সভ্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কোন ব্রাহ্ম কখন তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন নাই, অবজ্ঞা করা ত দূরে থাকুক। ঢাকায় মুসলমানের অর্থ আছে, কাজেই সামর্থ্য আছে, কীর্তিও আছে; কিন্তু পিতৃদেবের নায়কতায় এই শক্তিসম্পন্ন মুসলমান-সম্প্রদায় হিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া একটি সম্মিলন সভা করিয়া, যাহাতে উভয় জাতি-মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি সম্বর্ধিত হয়, তাহার জন্য যত্ন করিতেন। সেই সভারও পিতা অধিনায়ক ছিলেন। উকীল-সম্প্রদায়-মধ্যে মনোমালিন্য এবং দলাদলি ছিল। পিতা ঢাকা ছাড়িলে, মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া এই মনোমালিন্য অতি কুৎসিত আকারে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যতদিন পিতা ঢাকায় ছিলেন, এই মনোমালিন্য থাকিলেও কাজে বা কথায় তাহা ফুটিতে পারিত না। হয়ত কোন এক রবিবারে, পিতা পদ-ব্রজে ভ্রমণে বাহির হইয়া একজন নেতা উকীলের বাসায় গিয়া তামাক খাইলেন। তাহার পর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্য পক্ষের নেতা উকীলের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিয়ত-দ্বন্দ্ব-পরায়ণা লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যবর্তী নারায়ণের মত, সেই দুই জন কলহকারী উকীলকে লইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত নানা গল্প-গুজবের পর, বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। এমনি করিয়া একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, সপ্তাহে সপ্তাহে খাটিলে মনোমালিন্য ফুটে কিরূপে বল?

তৎকালে ঢাকায় দুই-এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর একটু আধটু অনাচার অত্যাচারের দিকে ভিতরে ভিতরে টান ছিল। পিতা সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই, আপন বাসায় তাঁহাদিগকে আনাইয়া রাখিয়া, নানাবিধ গল্প-গুজবে অর্ধ-

রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা উঠিয়া যাইবার ফুরসুৎ পাইতেন না। এদিক-ওদিক টান থাকিলেও পিতার চরিত্রের টানে, প্রাণের টানে, আর তাঁহার মনঃপ্রাণ-মজানো মিষ্ট কথার টানে, বাহিরের টান আর বল করিতে পারিত না। এই একরূপ সংশোধনী সভা।

পিতা যখন প্রথম ঢাকায় গেলেন, তখন সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সরকারী চাকরী করিতেছিলেন। তিনি সর্বদাই পিতার কাছে আসিতেন। সাহিত্য, অসাহিত্য, অনেক বিষয়েই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বান্ধবের প্রসারে কালীপ্রসন্নবাবুর কীর্তি প্রসারিত হইল। তিনি বঙ্গের সর্বত্র কীর্তিমান্ বলিয়া প্রথিত হইলেন। ঢাকায় বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ চর্চা হইতে লাগিল। সঙ্গে [illegible] হিন্দুধর্মের চর্চাও জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিল। ১২৮৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ঢাকায় হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভায়, পিতা হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বড় বড় অক্ষরে ৩২ পৃষ্ঠায় সেই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে সাধারণী যন্ত্রে আমরা ছাপিয়াছিলাম। বক্তৃতার প্রধান কথা এই যে, হিন্দুধর্মই হিন্দু জাতির জাতিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য জাতি যে-কালমধ্যে মহাকালের কবলে বিলীন হইয়াছে, হিন্দুধর্ম তাহার পূর্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্যন্ত আপনার পক্ষ বিস্তার করিয়া হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিতেছে। এই ধর্ম কেবল জনসাধারণের ধর্ম নহে, পরম পণ্ডিতগণ, পরম জ্ঞানিগণ এবং সাধুগণ এই ধর্মের পূজা করিয়া আসিয়াছেন। খৃস্টানদিগের বাইবেল, অথবা মুসলমানদিগের কোরানের ন্যায় হিন্দুধর্ম কেবল একখানি পুস্তকের বিষয়ীভূত বস্তু নহে। বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা প্রভৃতি—সমস্ত গ্রন্থসমষ্টি এই ধর্মের ধর্মপুস্তক। ইহা এক প্রকার অধিকারীর ধর্ম নহে। কিন্তু সবল-দুর্বল সর্বপ্রকার অধিকারীর ধর্ম। ইহা যেমন প্রশস্ত, তেমনই উন্নত। ইহা যেমন ভক্তির আসন পরিগ্রহ করিয়াছে, তেমনই যুক্তির উপর অধিকার লাভ করিয়াছে। হিন্দুধর্মের কর্মকাণ্ডে বহুরূপা প্রকৃতির পূজা। হিন্দুসমাজ একটি বিরাট্ ধর্মমন্দির। ইহাতে অহরহ ধর্মের যাগ প্রভূতভাবে হইতেছে। প্রতিদিন উষাকাল হইতে যামিনীর যামার্ধ পর্যন্ত, প্রতিক্ষণেই হইয়া থাকে। এই ধর্মগুণে হিন্দুদিগের ভক্তি-তরঙ্গ কেবল ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয় নাই, ইহা সমাজে, সংসারেও প্লাবিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম নিরীহ অথচ উদার ধর্ম, অন্য কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ করে না। আপনাকে বিস্তার করিবার জন্য, কখন নর-শোণিতে হস্ত ধৌত করে না। কর্মই হিন্দুধর্মের বল এবং মহিমা।

৩৪

ঐ ১২৮৬ সালের আষাঢ় মাসে অর্থাৎ পর মাসেই ঢাকার কলেজ ভবনে পিতা বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানিও বড় বড় অক্ষরে ৭৪ পৃষ্ঠায় সাধারণী যন্ত্র ছাপিয়াছিল। বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পর্যন্ত অধিকাংশ লেখকের লেখার ভঙ্গির সমালোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অতি বিশদরূপে আছে। ইহার শেষ ভাগের দুই দশ পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া নমুনা দিতেছি।

'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবন-চরিতের পর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাদম্বরী সাহিত্য-সংসারে দর্শন দিল। কাদম্বরী তো কাদম্বরী! ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্য মাতাইয়া তুলিল। যেমন শব্দের ঘটা, তেমনি সমাসের ছটা, তেমনি উপমার আড়ম্বর। বাঙ্গালার জন্‌সোনিয়ান্ ভাষা। বাঙ্গালায় গদ্য-ছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস। কিন্তু মদিরার মত্ততা অধিকক্ষণ থাকে না। এই জন্য কাদম্বরীর ভাষা যদিও বঙ্গসাহিত্যের কিছু শোভা সম্পাদন করিয়াছে, কিন্তু অনুকৃত হইতে পারে নাই। ইহার কিছুদিন পরে সাহিত্য-সংসারে আর একজন আচার্য লেখক প্রবেশ করিলেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র আসরে নামিলেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা অতি চমৎকার। এই লেখা কেবল শ্রুতি-মোহকর নহে, কেবল মধু-পরিপূর্ণ নহে, ইহাতে তাড়িত্তেজ প্রভূত ভাবে বহিতেছে, ইহা ভাব-বৈভবেও অতি ঐশ্বর্যশালী। বঙ্কিমবাবু কেবল বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত নহেন, কিন্তু ইংরাজি বিদ্যাতেও অতি সুপণ্ডিত এবং তাঁহার নিজের কল্পনাশক্তিও অতি বলবতী।

অতএব তিনি যেমন এক দিক্ হইতে সংস্কৃত-সাহিত্যের মাধুর্য ও সৌন্দর্য লইতে যত্ন করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিক্ হইতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা যেমন মাধুরীময়ী, তেমনি শক্তি-সম্পন্না ও ভাব-পরিপূর্ণা। তিনি বঙ্গভাষায় একরূপ নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। যে দিন বঙ্কিমবাবু কতিপয় বন্ধু লইয়া বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিলেন, সেই দিন বঙ্গভাষা-নদীতে উন্নতির কোটালে মহাবিক্রমের সহিত বান ডাকিয়া উঠিল; উন্নতির স্রোত তর্-তর্ বেগে ছুটিতে লাগিল; নদীর জল ক্রমশই স্ফীত হইতে লাগিল; দেখিয়া শুনিয়া ভাবুকের মন আনন্দরসে গলিয়া গেল; বঙ্কিমবাবু হইতেই বঙ্গবাসিগণ 'সক' করিয়া বাঙ্গালা বই পড়িতে শিখিয়াছে।'

এই সময়ে ঢাকায় পিতার চারিপোয়া প্রতিষ্ঠা হইল। তিনি আদালতে পদস্থ প্রভু, আর সর্বত্রই মধ্যস্থ বন্ধু। তিনি ঢাকায় থাকিবার সময়-মধ্যে, আমি তিন বার তথায় গিয়াছিলাম। শেষ বার তাঁহার কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর। তিনি সকাল হইতে সাড়ে দশটা পর্যন্ত, সমানে বাসায় বসিয়া রায় লিখিতেন। নির্জনে, একাকী; কোন আমলাও নিকটে থাকিত না। নিজেই পাতা উলটাইতেছেন, একমনে কাগজ দেখিতেছেন, এখানকার কথার সহিত সেখানকার কথার তুলনা করিতেছেন, একটা খসড়া কাগজে নোট লইতেছেন, আর রায় লিখিতেছেন। একজন আরদালি নীচেকার দেউড়িতে বসিয়া থাকিত মাত্র। বসিয়া থাকিতই-বা বলি কেন? সে প্রায়ই নিদ্রা-সুখ ভোগ করিত। সে সময়ে পিতার নিকটে কেহই আসিতে চাহিত না; সুতরাং নিবারণ করিবার জন্য তাহাকেও জাগিয়া থাকিতে হইত না। ভিখারী ফকীর আসিত, তাহাদিগকে বাসার চাকরে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া বিদায় দিত; আরদালির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কচিৎ কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত আগন্তুক গাড়ি-জুড়ি করিয়া আসিলে, চাপরাসি চমকিয়া উঠিয়া, বাম হাতে পাগড়ি পরিতে-পরিতে, ডান হাতে চোখ্ মুছিতে মুছিতে, তার কাছে এত্তালা বা কার্ড দিত। পিতা আগন্তুককে সসম্ভ্রমে আনাইয়া লইয়া সসম্ভ্রমেই ১০।১৫ মিনিটে বিদায় দিতেন। হয়ত সেই সময়ে একবার তামাক দিতে বলিতেন। এটা হইল নৈমিত্তিক তামাক। নিত্য তামাক ছিল, সকাল বেলায় রায় লিখিবার পরে একবার, অর্থাৎ ৬॥টা ৭টার মধ্যে একবার, আর ১০॥টার পর একবার। তাহার পর স্নান আহার, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও তামাক সেবন। তাহার পর কাছারী গমন। কাছারীর ছয় ঘণ্টা-কালমধ্যে কখন জলপান, টিফিন বা তামাক খাইতেন না। শৌচ-প্রস্রাব করিবার জন্য উঠিতেন না। এ কেবল ঢাকায় বলিয়া নয়, ৩৬ বৎসর চাকরীর মধ্যে পারতপক্ষে কোথাও করিতেন না। পারতপক্ষে বলিবার তাৎপর্য আছে। মুনসেফি করিবার কালে জাহানাবাদে একবার, আর সদর আমিনি করিবার কালে আরায়* বা সাহাবাদে আর একবার, গ্রীষ্মকালে হাঁপানি-কাশিতে তাঁহাকে বড়ই ভুগিতে হইয়াছিল। জাহানাবাদ তখন অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। মাটি খট্‌খটে, জল অতি পরিষ্কার, বায়ু শুষ্ক এবং দুর্গন্ধহীন। আরা ত চিরকালই স্বাস্থ্যভূমি। এখনও সেইরূপ আছে। অথচ এই সকল স্থানে গ্রীষ্মকালে হাঁপানি রোগের বড়ই প্রাবল্য হয়। পিতার তাহাই হইয়াছিল। তিনি উঠিয়া, নামিয়া, কোনরূপ যানারোহণেও কাছারী যাইতে পারিতেন না। জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া, নিজের বাসাতেই, তাকিয়া বুকে দিয়া, কাছারীর কার্য করিতেন। চট্টগ্রাম অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান। ম্যালেরিয়া জ্বর লাগিয়াই আছে। চট্টগ্রাম গিয়া পিতার হাঁপানি চৌদ্দআনা কমিয়া যায়। ছিল না বলিলেই হইল। কচিৎ কখন একটু আধটু দেখা দিত। তাহাতে কার্যের ব্যাঘাত হইত না। যশোহরে, ঢাকাতে সে বালাই প্রায় দেখা দেয় নাই।

*১৯০৭ সালে ৫।৭ দিনের জন্য অজরচন্দ্র আরায় গিয়াছিলেন। সেই সময় ৪.৯.১৯০৭ তারিখে চুঁচুড়া হইতে সাহিত্যাচার্য অজরচন্দ্রকে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, 'একটা কথা বলিতে তোমায় ভুলিয়াছিলাম—নিজ আরায় ভাল বৌদ্ধমঠ (জৈনমঠ নহে) আছে; তাহা দেখিও, আর কুমার সিংহের বাগান দেখিবেই।' আরা শহর হইতে ৩।৪ মাইল দূরে কুমার সিংহের বাড়ীতে গিয়াও অজরচন্দ্র তাঁহার পৌত্রের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কুমার সিংহ ছিলেন সিপাহী-সমরের একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি।

পিতা ঢাকাতে শীতকালে ৫টার পর, গ্রীষ্মকালে ৬টার পর বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। নিত্য ক্রিয়াদি সমাপন করিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত। তাহার পর মজলিস্—ঘোরতর মজলিস্। তবে আরম্ভে উলার মজলিস্ হইতে ঢাকা প্রভৃতি স্থানের মজলিসের প্রভেদ এই যে, মুনসেফি অবস্থায় উলা প্রভৃতি পল্লীগ্রামে, প্রধানত পল্লীস্থ ভদ্রলোক লইয়াই মজলিস্। আর সবজজ-পদে সদরে থাকিতে হয়, সুতরাং ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি স্থলে পদস্থ, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া মজলিস্। ঢাকার মজলিসে প্রায় থাকিতেন সবজজ নফরচন্দ্র ভট্ট, এন্‌জিনিয়ার রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উকীল ত্রৈলোক্য-নাথ বসু। তিনি আজিও ঢাকায় আছেন। আর একজন সবজজ বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই সান্ধ্য সমিতিতে অবশ্য নানা সৎকথারই আলোচনা হইত; কিন্তু কোন একটি বিষয়ে গম্ভীররূপে আলোচনা হইবার পূর্বে, সেই দিবসের ঢাকার ঘটনাবলীর বিজ্ঞাপনও আলোচনা হইত। তাহার পর ক্ষণ-মাহাত্ম্য-অনুসারে কোন দিন সমাজতত্ত্ব, কোন দিন সাহিত্য, কোন দিন ধর্মতত্ত্ব সরস গল্পের সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল বিষয়ের আলোচনা আলোড়ন হইত। পরনিন্দা যে একেবারে হইত না, এমন কথা বলি না; অথবা পরনিন্দা পিতা ত্যাজ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মজলিসে পরনিন্দা উঠিতেই পারিত না, এমন কথাও বলি না। পরনিন্দা আরম্ভ হইলে, বাবা অল্পের মধ্যে কথাটা কি শুনিয়া লইয়া, একবার বেশ করিয়া শুনিয়া লইয়া, একটু গম্ভীর স্বরে, একটু প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক স্বরে 'যাক ও-কথা' বলিয়া সহাস্য বদনে, আর একটি কথার অবতারণা করিতেন। ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব কি ভাবে কেমন করিয়া হইবে, তাহার পরামর্শ আঁটিবার মন্ত্রণা-গৃহ এই মজলিস্। আবার ঢাকায় কলের জল বসাইতে হইলে, কিরূপে দরখাস্ত করিতে হইবে, মিউনিসিপ্যালিটিকে অন্তত কতটাকা দিতে হইবে, নবাব সাহেবকে কিরূপে হাত করিতে হইবে—এ সকল পরামর্শেরও সেই কেন্দ্রস্থল। অর্ধবঙ্গ তোলপাড় করিয়া রমাবাই * ঢাকায় গিয়া উপস্থিত, কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে, ঢাকায় কোন্ পণ্ডিত বেশ সংস্কৃত কথা কহিতে পারেন—এ সকল যেমন সেই সান্ধ্য সমিতির ভাবনা, আর বসাক মহাশয় স্কুল পাঠ্য পাটীগণিত প্রণয়ন করিয়াছেন; তিনি ঢাকার ইন্সপেক্টর অফিসে প্রধান কর্মচারী, ঢাকা সার্কলে তাঁহার বই ত চলিবেই—এ সকল কথারই পরামর্শ সেই সান্ধ্য সমিতিতে হইতেছে; আর পরামর্শ-দাতাদের সেই শীর্ষস্থলে সবজজ গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ই আছেন।

বিচার-কার্যে পিতার বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং বিপুল সুনামও ছিল। তাঁহার ৫৫ বৎসর বয়ক্রম হওয়ার পর, '৮০ সালের ২৬-এ আগস্ট গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে অতিরিক্ত এক বৎসরকাল কর্ম করিবার অনুমতি দিলেন। বাবাকে প্রার্থনা করিতে হয় নাই। সেই এক বৎসরের যখন ১০ মাস পূর্ণ হইল, তখন গুজব উঠিল যে, গঙ্গাচরণবাবুকে গভর্নমেণ্ট আর অতিরিক্ত সময় দান করিবেন না। ঢাকার অধিবাসীদের তখন যেন চমক ভাঙ্গিল, তবে ত আমরা গঙ্গাচরণবাবুকে হারাইব! সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিয়া, মহামান্য হাইকোর্টের বিচারকদিগের সমীপে সময় প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিলেন। আমি যে কথাটা উপরে বলিতেছিলাম, সেই কথাটা অতি সংক্ষেপে দরখাস্তে লেখা ছিল।

'That as an instance of his power of endurance and patience, your Memorialists do not deem it out of place to inform your Lordships, that even at this age, Babu Ganga Charan Sircar is never seen to adjourn the court, to take a short respite, but is observed to be always at his work and engaged in the discharge of his duties till dusk.'

এই প্রার্থনার ফল হইয়াছিল। গভর্নমেণ্ট আর দেড় বৎসর কাল সময় দেন। পিতা ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পান। তাহার পর ঢাকার সকল সম্প্রদায় সাড়ম্বরে পিতাকে বিদায় দেন। সেই বিদায়গ্রহণের জন্য পিতাকে ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসেও ঢাকায় থাকিতে হইয়াছিল। দেশীয় বিদেশীয় সকল কর্মচারী নিজ কর্ম হইতে অবসর পাওয়ার পর, সেরূপ আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, এমন কথা আমি জানি না। এক কলিকাতার রিপন-বিদায় উৎসব ছাড়া,

* 'রূপক ও রহস্য'-এ 'ভাই হাততালি' দ্রষ্টব্য।

আর বোধ করি, কটকের র‍্যাবেন্স'-বিদায়ের কথা ছাড়া, আর কোথাও যে এরূপ হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। একমাস কাল ধরিয়া সমগ্র ঢাকা-নগরী সমুদ্র-সাগরের মত কল্লোলের রোল তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

এই সময়ের একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলিবার পূর্বে পিতার মনে বিশ্বাস কিরূপ ছিল, এবং সাধারণত নিষ্ঠা, আস্থা, বিশ্বাস কি পদার্থ—সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

৩৫

কর্মে নিষ্ঠা, আপ্তবাক্যে আস্থা থাকিলে মনে বিশ্বাস হয়, অথবা বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। আমাদিগের আস্থা ও নিষ্ঠা কমিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাসও কমিতেছে। কর্ম তখনও লোকে করিত, এখনও লোকে করে; কিন্তু তখন যেমন প্রাণের সহিত, জিদের সহিত, নিষ্ঠার সহিত, লোকে কর্মে লাগিয়া থাকিত, এখন আর সেরূপ প্রায় দেখা যায় না—যেন আল্‌গা আল্‌গা, শিথিল ভাবে, অনেককে কর্মে অনুসরণ করিতে দেখা যায়। কর্ম না করিলে নয়, তাই করিতেছি, এই রূপ কথা সকলেরই মুখে। কাজেই বোধ হয়, এইরূপ ভাবও সকলেরই মনে। কর্মে জিদ না থাকায়, তেজ করিয়া কর্ম না করায়—না কর্মীর স্ফূর্তি থাকে, না কর্মে শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমি ভাল কর্ম বা মন্দ কর্মের কথা বলিতেছি না। ভাল-মন্দ দুইরূপ কর্মেই আমাদিগের মধ্যে এখন প্রবৃত্তির তেজ না থাকারই কথা বলিতেছি।

তাহার পর আপ্তবাক্যে আস্থা। তখনও লোকে করিত, এখনও লোকে করে। তবে তখন হইতে এখানকার প্রভেদ এই যে, তখন লোকে আপ্তবাক্যকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইত না; এখন আমার মতের সহিত কোন এক বাক্যের মিল আছে, সেইজন্য সেই বাক্যটিকে আমার মতের সমর্থনার্থ প্রয়োগ করা হয়। একটা স্থূল উদাহরণ দিতেছি। ধরুন যেন, ঋষিবাক্য আছে যে, একাদশীতে অন্নাহার নিষেধ; সোজাসুজি সেটি আপ্তবাক্য মনে করিয়া নিষেধ মানিলেই চলে; তাহা না করিয়া, অনেকে বলেন যে, একাদশীর সময় হইতেই রসের সঞ্চার হয়, সেই জন্য একাদশীতে লঘু আহার করা বা উপবাস দেওয়া ভাল, অর্থাৎ এই মত যেন বিজ্ঞান বলে স্থির করিয়াছি, ঋষিবাক্যে সমর্থন পাইয়াছি মাত্র। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, একাদশীতে লঘু আহার, আর ত্রয়োদশী-চতুর্দশীতেই-বা নয় কেন? তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা কোন হেতুবাদ দিতে পারেন না। বাস্তবিক একাদশীতে লঙ্ঘন প্রভৃতি বাক্যে শাস্ত্রের শাসন বা শাব্দ প্রমাণ ব্যতীত অন্য হেতু কিছু নাই। শাব্দ প্রমাণে বা আপ্তবাক্যে আস্থা না থাকায়, আমরা অনর্থক বৈজ্ঞানিক হেতুবাদের অনুসন্ধান করি মাত্র।

আপ্তবাক্যে আস্থা না থাকিলে কি সংসারের, কি ধর্মের কোন কার্যই হয় না। তবে সংস্কৃত করিয়া একটা শ্লোক বলিলেই তাহা ঋষিবাক্য বলিয়া তাহাতে আস্থা করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। এক বেদ ভিন্ন সর্বত্রই বিচার চলে। বেদ অপ্রচলিত পদার্থ। ম্যাক্সমূলার বা রমেশ দত্ত ছাপিলে বেদ হয় না। পরম্পরা মন্ত্র-শুদ্ধি থাকিলে বেদ বলিয়া একরূপ উজ্জ্বল জ্ঞান থাকিত। সেই জ্ঞান থাকিলে, বুদ্ধিবৃত্তি স্বতঃবিকশিতা হইত। এ সব কথা এখন পুরনো কাহিনী হইয়াছে। এ সকল কথায় আস্থা কর বা না-কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। বেদই অপ্রচলিত, তা বেদনিন্দুক শব্দের অর্থ কি হইবে? কিন্তু তাহা বলিয়া আপ্তবাক্য নাই, এমন কথা বলা যায় না। বেদের পরেই মনুর প্রমাণ। সেই মনুর কতকগুলি কথা, আমরা ভৃগুসংহিতায় ও নারদ-সংহিতায় দেখিতে পাই। কোন্‌টি আপ্ত, কোন্‌টি আপ্ত নহে, ইহার বিচার হউক। কিন্তু আপ্ত বলিয়া স্থির হইলে, তাহাতে আস্থা না করিয়া কিরূপে থাকা যায়; মনের অবস্থা অনুসারে আস্থার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। চিত্ত পরিষ্কার থাকিলে, তাহাতে যেন একরূপ আঠার মত পদার্থ থাকে, যাহাতে লাগাও, তাহাতেই লাগিয়া যায়। ভাসা-ভাসি থাকে না, আঁটা-আঁটি হয়। শুদ্ধসত্ত্ব বুদ্ধি হইতেই আস্থা হইয়া থাকে। এই বুদ্ধি আমাদের দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, কাজেই আস্থাও কমিতেছে।

দেখিতে পাওয়া যায়, এখনকার দিনে, 'অন্ধ'-বিশ্বাসে অনেকেরই মহাভয় হয়। কিন্তু কতটুকু অন্ধ-বিশ্বাস, আর কতটুকু চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাস—তাহা আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে? আমাদের দেশের মহা মহা দার্শনিক, এমন কি,

এই সকল বিষয়ে 'মিল, কোমৎ' হইতেও অধিকতর দার্শনিক ঋষিগণ, তপস্বিগণ, ব্যাখ্যাকারগণ নাস্তিকের নানা তর্ক খণ্ডন করিয়া, পরকালের বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়াছেন। সেই সকল দেখিব না, পড়িব না, বুঝিবার চেষ্টা করিব না, আর না পড়িয়া, না শুনিয়া বলেন যে, পরকালের বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস মাত্র। এ সকল অতি অসার কথা; কিন্তু আমরা দিন দিন এই অসারতার কূপে মগ্ন হইতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, পিতার মাতৃদেবী, শিশু পিতাকে রাখিয়া পতির পাদ বক্ষে ধারণ করিয়া অনুমৃতা হন।* আগুনখাকির বিশ্বাস আগুনের মত জ্বলন্তই ছিল, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রবিধিতে বাধ্য হইয়া, মৃত ঠাকুরদাদাকে লইয়া, ঠাকুরমাকে জাহ্নবী-তটে বটতলায় সাতদিন বাস করিতে হয়। সুতরাং লোকে বুঝাইবার পড়াইবার, অথবা উত্যক্ত করিবার, সময়-সুযোগ প্রচুর পাইয়াছিল। সকলে বলিল, 'তুমি এই কাঁচা বয়সে পুড়িয়া মরিতে পারিবে না!' নিকটে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, ঠাকুরমা জ্বলন্ত শিখায় অঙ্গুলি ধরিয়া রহিলেন। লোকে স্তব্ধ হইল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিল; তাঁহার সহিত বিতর্ক ছাড়িয়া দিল, বলিল, 'এমন দুধের ছেলেটিকে ফেলিয়া যাইতে তোমার মমতা হইতেছে না?' ঠাকুরমার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল; দূরে জ্বলন্ত কটাক্ষক্ষেপ করিলেন, যেন গঙ্গাপারে কিছু দেখিতে পাইতেছেন। বলিলেন,—'তোমরা দেখিতে পাইতেছ না', আমি দেখিতে পাইতেছি, আমার এই ছেলে রাজা হইবে, মহাযশস্বী হইবে, মহাসুখী হইবে।' বাবা এই সকল কথা বলিতেন, আর বিশ্বাসে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইত। তাঁহার মাতৃস্বসাকে সম্বোধন করিয়া, একদিন আমাদের সমক্ষে বলিলেন, 'তা মাসী, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ত হইয়াছে, আমি ত রাজাই হইয়াছি। আর তিনি দেখিলেন না বলিয়াই-বা আমি দুঃখ করিব কেন? তিনি অবশ্য দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন ত।' ঠাকুরমার আগুন খাওয়ার মত জ্বলন্ত বিশ্বাস না থাকুক, পিতা বিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, পরকালে বিশ্বাস করিতেন, পূজা-পার্বণে বিশ্বাসের সহিত কত যে আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা গৃহ-স্বামীর বর্ণনায় নিজেই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। সে কথা পরে বলিব এবং সে চিত্র আপনাদের সমক্ষে ধরিব।

মহাবিপন্ন হইয়া, একমনে কাতর-প্রাণে ঈশ্বরকে ডাকিলে, ভগবান্ অভয়দান করিয়া থাকেন। পিতা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনে তিনি দুইবার এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একবারকার কথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আর একবারকার তাঁহার বলিবার সুযোগ হয় নাই, অথবা আমার শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

একবারকার কথা কি তাহা বলিতেছি। কার্য হইতে অবসর গ্রহণের কিছুকাল পূর্বে, ঢাকায় তুমুল মোকদ্দমা বাধিল। ঢাকার তাৎকালিক নবাব গনিমিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার কতিপয় জ্ঞাতিবর্গ বহুতর টাকার দাবিতে একটি দেওয়ানি মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। মোকদ্দমার বিবরণ আমি দিব না; দিবার প্রয়োজনও নাই। আসল কথা এই যে, বাদীর পক্ষ হীনবল, দরিদ্র, পরমুখাপেক্ষী। বাদি-প্রতিবাদীর আর্জি-জবাবের ভঙ্গি দেখিয়া, পিতা মনে মনে বুঝিলেন যে, বাদীরা অর্থহীন সুতরাং বিপন্নও বটে। কিন্তু ন্যায় বিচারে, সুবিচারে, সম্ভবত তাহাদিগকে হারিতে হইবে। এই ধারণা মনে উদয় হওয়ায়, তিনি আপনাকে মহা বিপন্ন মনে করিলেন। বিপদ্ এই যে, লোকে ত সুবিচার, অবিচার দেখিবে না, লোকে লক্ষমুখে ব্যক্ত করিবে যে, গঙ্গাচরণবাবু যাইবার সময় বেশ খাইবার মাছ করিয়া গেলেন। এক লক্ষ হউক দুই লক্ষ হউক, নিশ্চয় তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বাদীদের মনোরথ ব্যর্থ হইবার যতই সম্ভাবনা হইতে লাগিল, ততই তিনি আপনাকে বিপন্ন মনে করিতে লাগিলেন। শেষে এক দিন নিশীথে, নিভৃতে, শুদ্ধমনে, যুক্ত-করে বিপদ্-ভঞ্জন ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। হঠাৎ অবসাদের অন্ধকারের মধ্যে যেন সুস্নিগ্ধ আলো উদ্ভাসিত হইল। সুমধুর অভয়বাণী যেন তাঁহার কর্ণে ঘোষিত হইল। আনন্দে হৃদয় পরিপূরিত হইল। এতক্ষণ নিদ্রা হয় নাই, নিদ্রাভিভূত হইলেন। পর দিন প্রাতে শরীর-মন যেন সরল, সহজ। ভার যেন চলিয়া

* সাহিত্যাচার্যের পৌত্র সুলেখক শ্রীমান্ অজিতচন্দ্র-লিখিত 'সতীর দেশ' পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ঢাকায় টেলিগ্রাম পৌঁছিল, ছোটলাট হঠাৎ ঢাকা পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন। পিতা তখনই মনে করিলেন, ইঁহাকে দিয়াই আমার বিপদ্ কাটাইতে হইবে।

যথাসময়ে ছোটলাট আসিলেন। কমিশনর, জজের পর, পিতা তাঁহার সহিত 'রোটাসে'* একাকী দেখা করিলেন। তিনি আদরে পিতাকে তাঁহার কামরায় বসাইলেন। এ কথা সে কথার পর বলিলেন, 'আপনি যেন আমাকে কিছু বলিবেন বলিবেন মনে হইতেছে।' পিতা উত্তরে বলিলেন, 'বলাকহা আর কি, নবাব বাড়ীর মোকদ্দমা আপনাকে মিটাইয়া দিয়া যাইতে হইবে।' ছোটলাট বলিলেন, 'আমি বলিলেই মিটিবে?' পিতা বলিলেন, 'নিশ্চয়', হইলও তাহাই। বিপদ্‌বারণ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিলেন। ছোটলাট তিন দিন থাকিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

৩৬

যত কাল পদস্থ ছিলেন, পিতা সকল স্থানেই সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতেন, সকলের সহিত বসা-দাঁড়া করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি কোন সৎজাতির ভবনেও কখন ভোজন বা ফলাহার করেন নাই। এরূপ করিয়া লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে, গভর্নমেন্টের প্রাচীন বিধি-বিধানে নিষেধ ছিল। সাহেবেরা অবশ্য মাকড় মারিলে ধোকড় হয়; তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সপত্নীক সকল বাড়ীতে গিয়া চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় সেবা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু সে কথা বলেই বা-কে,—আর ধরেই বা কে? কিন্তু সাহেবেরা মানুন আর নাই মানুন, ও-গুলা নিষিদ্ধ। বাঙ্গালিরা সকলেই যে এই নিষেধ মানিয়া থাকেন তাহাও নহে, তবে পিতা অতিরিক্ত মাত্রায় এই নিষেধ-বিধি প্রতিপালন করিতেন। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা ডাব খাওয়াও যেন গ্লানি-কর মনে করিতেন। দুই-এক স্থলে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ব্যভিচার ছিল। শুনিয়াছি, তিনি কটকে থাকার কালে পুরীর রাজা তাঁহাকে, চোপদার প্রভৃতি সঙ্গে দিয়া, বৃহৎ রূপার থালে, গুটি আটেক পটোল পাঠাইয়া দেন। পটোল তখন কটকে বারমাসই দুর্লভ ছিল। বাবা প্রত্যাখ্যান না করিয়া রাজদূতকে দুই মুদ্রা পারিতোষিক দেন, এবং পটোল কয়টি গ্রহণ করেন, পরে সেবনও করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদে নবাবের বৎসরে দুইবার ভেট, জ্যৈষ্ঠে আমের, আর শীতে মেওয়ার, সকল কর্মচারীই গ্রহণ করিতেন,—পিতাও গ্রহণ করিতেন, প্রত্যাখ্যান করা অন্যায় মনে করিতেন। আর মহারানী স্বর্ণময়ীর ভোজ, তাঁহার বাড়ীতে নয়, তাঁহার পুরোহিতের বাড়ীতে, উকীল-আমলা-দলবলের সঙ্গে পিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মফস্বল তদারক করিতে গিয়া, রাত্রি যাপনার্থ ক্বচিৎ কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। আর একস্থানে মুসলমানের সিধা লইয়া, নিজ ব্রাহ্মণের পাকে আহার করিয়া, দুই দিনের পর দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

ঢাকাবাসী এইবার তাঁহাদের সাধের সবজজকে অবসর প্রাপ্ত পাইয়া, বিশুদ্ধ গঙ্গাচরণবাবুরূপে পাইয়া, শৃঙ্খল-বিমুক্ত বন্ধুভাবে পাইয়া, ভোজে, নাচে, উৎসবে মাতিয়া উঠিল। আমি ও আমার বন্ধু, হুগলী নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগ্রামের পূর্বে রণ-রঙ্গ-স্থলে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আমার কায়স্থের উদর, দিন দিন পর্যায়-স্তুত সে ভোজের ভার সহিতে পারিল না। আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। আমার বন্ধু ব্রাহ্মণ; তাহাতে চিরদিনই ফলাহার-পটু; তবু পলান্ন-দায়ে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তবে রণে ভঙ্গ দিলেন না। পিতা কিন্তু অক্ষুন্ন অটুট। সকল জায়গায় সমানে যাইতেছেন, আহার করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, থিয়েটার দেখিতেছেন। একবারও অবসাদ বোধ করিতেছেন না। কে বলিবে বৃদ্ধ কার্য হইতে অবসর লইতেছেন, যেন যুবা পুরুষের কার্যক্ষেত্রে এই প্রথম উদ্যম। থিয়েটারে মেঘনাদ বধ হইয়াছে, প্রমীলা সহগামিনী হইবেন। রাবণ স্পীচ দিয়া চলিয়া গেলেন। জনপ্রাণীটি নাই; প্রমীলা বেচারা আপনার চিতা আপনি ফুৎকার দিয়া জ্বালাইতেছে। আমি পিতার পশ্চাতে ছিলাম, এই বিষদৃশ বিড়ম্বনা দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ইহাদের কি আর কেহ নাই নাকি? ভৃত্য-পরিচারক সব কোথায় গেল?' পিতা শুনিতে পাইয়া আমাকে বুঝাইয়া

* ছোটলাটের স্টীমারের নাম।

দিলেন,—'রাম কি আর কিছু রেখেছে গা, রাক্ষস-পুরী শূন্য করিয়াছে।' এরূপ কথা সর্বদাই শুনিতাম।

ঢাকার জনসাধারণ-সভা ১২৮৮ সালের ৪ঠা মাঘ স্বর্ণ-চিত্র-বেষ্টিত পার্চমেণ্ট পত্রে পিতাকে অভিনন্দন দিয়া, মহতী সমিতি-মধ্যে তাঁহাকে বিদায় দান করিল। ঢাকা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন,—'You have no business to be here Babu. We bid farewell to your father, you have no *locus standi*.' আমি বলিলাম, 'সাহেব, তোমার ঐটি ভুল—You say, farewell, farewell ; I say, Welcome father. I oppose you! Haven't I a *locus standi* ?' সাহেব নীরব হইয়া হাসিতে লাগিলেন। বাসায় গিয়া এই গল্প শুনিয়া, পিতা আনন্দে অশ্রুপাত করিলেন।

৩৭

বাস্তবিক আমি পিতাকে welcome করিয়া আনিতে, অর্থাৎ আদরে আগুবাড়াইয়া আনিতে গিয়াছিলাম বটে। সেই মাঘ মাসের মাঝামাঝি আমরা বাটীতে ফিরিলাম। বন্ধনমুক্ত পিতাকে পাইয়া আমাদের গ্রাম-শুদ্ধ লোকের আনন্দই না কত! পিতা বাড়ীতে আসিয়াই গয়া-গমনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। এই যে ৩৬।৩৭ বৎসর চাকরী, ইহার মধ্যে পিতা নিজের পীড়ার জন্য একমাস কাল, আর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশনের উৎসবের জন্য ১৮ দিন-মাত্র, ছুটী লইয়াছিলেন। ৺ দুর্গাপূজার ছুটীতে প্রতি বৎসরই বাড়ীতে থাকিতেন এবং সেইটাই প্রিভিলেজ ছুটীর মত গণ্য হইত। নিকটে থাকিলে বড়দিন, মহরম ও গুডফ্রাইডের সময়েও বাড়ীতে থাকিতেন। অন্যথা মহালয়া হইতে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া পর্যন্ত, বাড়ীতে অবস্থানকাল মাত্র। যখন আরায় ছিলেন, তখন ৺ কাশীধামে গিয়াছিলেন ; যখন কটকে ছিলেন, তখন ৺ পুরীধামে গিয়াছিলেন ; আর আলিপুরে থাকার কালে অবশ্য ৺ কালীঘাটে গিয়াছিলেন ; ইহা ছাড়া, অন্য কোন তীর্থ করেন নাই। তাহার জন্য বিশেষ ব্যগ্র বা ক্ষুণ্ণ ছিলেন না। এবার বাটীতে আসিয়াই, যেন গয়া-গমনের জন্য একটু ব্যগ্র ব্যগ্র বোধ হইল। বাড়ীর চাকর ত সঙ্গে গেলই, তবে একজন বিশ্বাসী ভাল ব্রাহ্মণ পাইতে একটু বিলম্ব হইল। তাহাতেই তাঁহার ব্যগ্রতা আমরা বুঝিতে পারিলাম। কেন ব্যগ্র, তাহাও জানিতে পারিলাম। তাঁহার পিতামহ, মাতামহ, তাহাই-বা বলি কেন—সে কালে সকল হিন্দুই আশা করিতেন, মনে মনে দাবি করিতেন, যে পুত্রপৌত্রগণ কৃতী হইলে যেন গয়ায় পিণ্ডদান করে। পিতার পিতামহ, মাতামহ, ঐরূপ আশার কথা হয়ত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। তখন রেল ছিল না, পথ ছিল না, পথে ভীষণ দস্যুভয়, হিংস্র জন্তুর ভয় অতিশয় ছিল, তবু তাঁহারা এরূপ আশা করিয়াছিলেন। এখন রেল হইয়াছে, পথ-ঘাট সুগম হইয়াছে, পিতা ত কৃতী বটেনই, সুতরাং রাজকার্য হইতে অবসরান্তে তাঁহাদের দাবির কথা স্মরণ করিয়া পিতা গয়া-গমনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

চাকর, ব্রাহ্মণ, আর পিতার পিসতুত ভাই—আমার প্রসন্ন* কাকাকে সঙ্গে লইয়া বাবা গয়া গমন করিলেন। ভাবটা এই যে, নিজের পিতৃপুরুষ ও মাতামহ বংশের যেরূপ পিণ্ডদান হইবে, পিসীর পিতৃপুরুষদিগেরও সেইরূপ পিণ্ডদান হইবে। তাঁহারা কয়দিন গিয়া ৺বৈদ্যনাথে থাকেন। তাহার পর গয়া করিয়া আসিয়া আবার বৈদ্যনাথে ছিলেন। জ্বরের তাড়নায়, ৺বৈদ্যনাথের কৃপায় বৈদ্যনাথধাম তৎপূর্ব হইতেই আমার একরূপ (Second domicile) দ্বিতীয় নিবাস হইয়াছে। পিতার কিন্তু সেই একবার বা দুই বার যাওয়া। তাঁহাকে হাতে পাইয়া পাণ্ডা মহাশয়েরা খুব আদর আবদার করিলেন। আমাদের বাড়ীতে আড়ম্বরে তাঁহাদের সপাক পকান্ন ভোজ হইল। আর আমাদের খাস পাণ্ডা জয়কুমার ঠাকুর পট্টবস্ত্র, শাল, উত্তরীয় প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরে পিতা ফিরিয়া আসিলেন। আমি জীবনী লিখিতেছি না, মাস মাস বা বৎসর বৎসর পর পর ঘটনারও উল্লেখ করিব না, তবে এই সকল বিষয়ে উঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা কিরূপ ছিল, সেই কথা বুঝাইবার জন্যই গয়া গমনের কথা বলিলাম।

---

* বংশলতা দ্রষ্টব্য।

আসল কথা, অন্য তীর্থাদির জন্য তিনি ব্যগ্র না থাকিলেও গয়া-গমনের জন্য ব্যগ্র হন। অন্যান্য তীর্থ প্রধানত আপনার জন্য, গয়া তীর্থ প্রধানত পিতৃপুরুষদিগের জন্য। দেবতায় তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তাহা তাঁহার হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতার শেষভাগ দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। সেই বক্তৃতার শেষদিকে যে দুর্গোৎসবের বর্ণনা আছে, তাহা কেবল প্রথম পুরুষে, তাঁহারই স্বরূপ বর্ণনা মাত্র।

'এই সময়ে গললগ্নীকৃতবাস কৃতী (যিনি প্রকৃত হিন্দু) প্রতিমার সম্মুখে, অথচ কিঞ্চিৎ পার্শ্বে, দণ্ডায়মান হইযা করযোড়ে দেখিতেছেন এবং ভাবিতেছেন। ... এই ভাবিতেছেন যে, পরমা প্রকৃতি, আদ্যা শক্তি তাঁহার আলয়ে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। গৃহস্বামী এই ভাবিতেছেন এবং তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ও আনন্দ-তরঙ্গ যুগপৎ উদ্বেলিত হইয়া নয়ন-যুগল দিয়া দর-দরিত ধারায় পড়িতেছে। গৃহস্বামী পশ্চাৎ-দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন, তাঁহার ভবনে আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, প্রতিবাসী, গ্রামবাসী এবং দীনদুঃখী প্রভৃতি বহুল ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে। সকলেই আনন্দ-উৎফুল্ল; গৃহস্বামী ভাবিলেন যে অদ্য আমার ভবনে আনন্দময়ী আগমন করিয়াছেন, ইহাতেই এত আনন্দ। তাঁহার নয়ন দিয়া আবার আনন্দধারা বহিতে লাগিল। এই আনন্দ অতি বিমল আনন্দ, ইহা ভক্তির আনন্দ, ইহা স্বর্গীয় আনন্দ। এই শোক-তাপ-সন্তপ্ত সংসারে এরূপ আনন্দ যে লাভ করিতে পারে, সে ধন্য এবং তাহার জীবন সার্থক।'—আবার বলি, এই চিত্র পিতার নিজকৃত স্বরূপ-চিত্র; তিনি ভক্তির আনন্দ উপভোগ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

৩৮

পিতা আমাদিগের মত পোলিটিক্যাল কখন হন নাই। রাজনীতির খিচুড়ি করিয়া, দুইহাতে ছড়াইয়া, কাককে বককে খাওয়াইতে তিনি কখন অভ্যাস করেন নাই। চাকরী করিতে করিতে তিনি যে রাজনীতির চক্রব্যূহ-মধ্যে পড়িয়াছিলেন, সে কথার পরিচয় পূর্বেও দিই নাই, এখনও দিব না। তিনি পোলিটিক্যাল ছিলেন না, সুতরাং সাধারণীতে লিখিতে ভালবাসিতেন না। গভর্নমেণ্ট এ সকল কাজে নিতান্ত নারাজ, রাজকর্মচারীদিগের পক্ষে সংবাদপত্রে লেখা একপ্রকার নিষিদ্ধই ছিল। কাজেই সাধারণীতে লিখিতে আমি তাঁহাকে কখন অনুরোধও করি নাই। কাঁকশিয়ালির বটবৃক্ষের বর্ণনার কথা প্রথমেই বলিয়াছি, সেইরূপ পদ্য কচিৎ কখন লিখিতেন এবং সাধারণীতে প্রকাশিত হইত। আর ঋতুবর্ণনের নিদাঘ ভাগের অনেক অংশ সাধারণীতে ক্রমশ প্রকাশিত হইয়াছিল; আর বর্ষার কয়েকটি বর্ণনা প্রকাশিত হয়, তাহা অদ্যাপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।* গদ্য প্রবন্ধ সাধারণীতে অতি অল্পই লেখেন। ১২৮১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ সাধারণীতে প্রকাশিত 'সাক্ষী' নামক প্রবন্ধটি এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, অবশ্য সমালোচনা করিব না।

সাক্ষী

বিচারকার্য-সাধনার্থ সাক্ষীর সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কোন ব্যবহার মীমাংসা করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে উভয় পক্ষের বিবৃত ভূতপূর্ব ব্যাপার সমূহের বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু সেই সমস্ত ব্যাপার-সম্বন্ধে বিচারপতি সম্যক্ অনভিজ্ঞ থাকায়, কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা কিছুই নির্বাচন করিতে পারেন না। তখন সাক্ষীর বাক্যই তাঁহার প্রধান উপায়। তিনি তদ্দ্বারা অন্ধকারে আলোক লাভ করেন; আপনার পথ দেখিতে পান, এবং জটিল জাল ছেদন করিয়া সত্যের উদ্ধার করিতে পারেন। যাঁহার বাক্যের দ্বারা ঈদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাকে আদর করা সর্বতোভাবে কর্তব্য এবং ভগবান্ মনুও তদীয় সংহিতায় সাক্ষীকে সম্মান করিতে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা ইংরাজ রাজ-প্রতিষ্ঠাপিত ধর্মাধিকরণ-সমূহে সাক্ষীদিগকে আদর বা সম্মান করা দূরে থাকুক, তাহাদের বিশেষ অবমাননা ও সময়ে সময়ে নিষ্পীড়ন করা হয়। এই সকল ধর্মাধিকরণে সাক্ষীদিগের দুর্দশা দর্শন করিলে বোধহয় যেন তাহারা কোন গুরুতর

* 'ঋতুবর্ণন, কবিতাবলী ও গীতাবলী' নামে গঙ্গাচরণ সরকারের সমগ্র কবিতা, পাঁচালী ও গান ১৩২০ সালে সাহিত্যাচার্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

অপরাধ করিয়াছে এবং তজ্জন্যই তাহাদের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইতেছে। দণ্ডার্ধই হউক, কিংবা প্রহরদ্বয়ই হউক, যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে কাঠগড়া-বেষ্টিত একটি সংকীর্ণ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। এরূপ অবস্থা কেবল ক্লেশকর নহে, অধিকন্তু ভদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতীব অপমান-জনক। যদি বলেন যে, বিচারালয়ের সম্ভ্রম-রক্ষার্থ দণ্ডায়মান অবস্থায় সাক্ষ্য প্রদান করা কর্তব্য, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কেবল এরূপ কাল্পনিক সম্ভ্রমের জন্য কাহাকেও কষ্ট প্রদান করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। বিশেষত যে স্থানে কার্তিক বাগ্দী ও খোয়াজ নিকারী দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিয়াছে, সেই স্থানে সেই অবস্থাতে ফুলের মুখটি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান হরলাল মুখোপাধ্যায়কে কিংবা বিশাল ভূসম্পত্তিশালী যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে সাক্ষ্য দিতে হইলে, তিনি যে আপনাকে হতমান বোধ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই; এবং এই অপমান হইবার ভয়ে সম্ভ্রান্ত সাক্ষীরা বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়েন।

সত্য বটে, বিচারপতির সম্মুখে সকলেই সমান, কিন্তু তজ্জন্য যে সর্ব্বপ্রকার সাক্ষীকেই একই আসনে দণ্ডায়মান না করিলে, বিচারে দোষ-স্পর্শ হইবে এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষত কার্যত রাজাজ্ঞার দ্বারা এ বিষয়ে ইতর-বিশেষ দেখা যাইতেছে। অনেকানেক ধনাঢ্য ভূস্বামিগণ সাক্ষ্য প্রদানার্থ বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, এবং সচরাচর দেখা যায় যে, যদি কোন ইউরোপীয়কে সাক্ষ্য দিতে হয়, তবে তিনি প্রায়ই বিচারপতির পার্শ্বে সমাসীন হইয়া থাকেন। অতএব বিচারালয়ের সম্ভ্রমরক্ষার্থ ভদ্র-অভদ্র সকল সাক্ষীকেই এক কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে—এ তর্ক নিতান্ত দুর্বল; এরূপ প্রথা অবলম্বনে কোন উপকার নাই, বরং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে মানসিক ও দৈহিক কষ্ট দেওয়া হয় ও সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের সাক্ষ্যলাভের পথ অবরোধ করাও হয়।

কিন্তু কেবল ইহাই নহে, সাক্ষীদিগের আরও দুর্গতি আছে। যে ব্যক্তি-কর্তৃক সাক্ষী আহূত হন, তাঁহার পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা-বাদ হইলে পর, পক্ষান্তরের উকীল তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন। আদালতের ভাষায় এই প্রশ্নের নাম 'জেরার সওয়াল' এবং তাহা কখন কখন এতদ্রূপ জটিল ও সুদীর্ঘ হইয়া উঠে যে, সে জেরার জের মিটানো অতি সুকঠিন। প্রমাণ-বিষয়িণী-ব্যবস্থাবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, এ প্রশ্নের দ্বারা অনেক প্রকৃত বিষয়ের আবিষ্কার হইতে পারে, অতএব ইহা প্রয়োজনীয়। আমরাও বলি যে, যদি জেরার সওয়াল বিশুদ্ধ প্রণালীতে করা হয়, তবে অনেক গুপ্ত বিষয় প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু উকীল মহাশয়েরা তদুদ্দেশ্যে প্রতিপ্রশ্ন করেন না। সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী করাই তাঁহাদের প্রতিপ্রশ্নের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তদ্বিষয়ে প্রায়ই কৃতকার্য হইয়া থাকেন। জেরার সওয়াল কালে উকীলদিগের সকোপ নয়নে দৃষ্টিপাত ও পরুষবাক্য প্রয়োগ এবং সময়ে সময়ে বিচারপতির ভয়ঙ্কর তাড়না, সাক্ষীকে এরূপ সভয় ও ব্যতিব্যস্ত করে যে, সে একেবারে হতচেতন হইয়া পড়ে, তখন তাহার মুখে যাহা আইসে সে তাহাই বলিতে থাকে। ইহাতে সত্যের আবিষ্কার না হইয়া বরং সত্য তিমির-জালে অধিকতর আচ্ছন্ন হয়। বিশেষত বিচারপতি-কর্তৃকই হউক, কিংবা উকীল-কর্তৃকই হউক, সাক্ষীকে তাড়না করা কোন প্রকারেই বৈধ ও সাধু-সম্মত নহে। স্বীকার করি যে, এরূপ দূষণীয় কার্যে কোন কোন উকীলের প্রবৃত্তি জন্মে না, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আমরা যে কুপ্রথার বর্ণনা করিলাম, তাহা অধিকাংশ উকীলেরাই করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহা সাধারণ প্রথা হইয়া উঠিয়াছে এবং তদ্দ্বারা কুফলও ফলিতেছে। এই প্রথা যাহাতে দূরীকৃত হয় এবং সাক্ষীদিগের অবস্থানুসারে মর্যাদা রক্ষা পায়, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ।

———

ঠিক এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮২ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ 'সীতা-বিলাপ' (দণ্ডকারণ্যে) সাধারণীতে প্রকাশিত হয়। সেটি পদ্য। তাহার তিনটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

যে দিন বলিলে দিতে পরীক্ষা অনলে,
করিলে ঘোষণা এই, শুনিল সকলে,—

'যদি এই পরীক্ষায়, সীতা মম মুক্তি পায়,
জানিব কলঙ্ক-হীনা জনক-নন্দিনী ;
আজীবন সিংহাসনে করিব সঙ্গিনী ॥'

বিশ্বাস করিয়া সেই ঘোষিত বচনে,
বিশ্বাস করিয়া আর মম আচরণে,
পশিলাম হুতাশনে, প্রফুল্ল পবিত্র মনে,
বাহির হইনু পুনঃ দেখিল ত্রিলোকে
বিমল সুবর্ণ যথা বিমল আলোকে ॥

কিন্তু অয়ি নাথ, একি সর্বনাশ,
কোথা সিংহাসন, কোথা বনবাস !
উঠি অকস্মাৎ, ঘন ঘূর্ণ বাত,
জীবন-কানন ছিন্নভিন্ন করি,
নাশিল সমূলে আশার বল্লরী ॥

ঢাকা ছাড়িবার কিছু পূর্বে ১২৮৯ সালের ১৮ই বৈশাখ সাধারণীতে পিতৃকৃত 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ' প্রকাশিত হয়। ইহার বহুপরে তৎকালের দেওঘর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু 'মহাপ্রস্থান' নাম দিয়া স্কুলপাঠ্য 'কবিতা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের প্রথমেই একটি কবিতা প্রকাশিত করেন ; সেটি অতি সুন্দর ; অনেক স্থলে পিতার 'স্বর্গারোহণ' হইতে সুন্দর। তবে যোগীনবাবু বলিতেছেন, যুধিষ্ঠির—

শোকচ্ছায়ে বিমলিন, নরপতি আভাহীন,
মেঘাবৃত যেন দিবাকর,
অন্তরে চিন্তার ভার, কষ্টের নাহিক পার
ধীরে ধীরে হন অগ্রসর।

আর পিতা বলিতেছেন—

প্রফুল্ল মুখারবিন্দ, হৃদয়-দর্পণ—
বিমল আভায় করে সবে প্রদর্শন ;
কুচিন্তা, কুটিল দ্বেষ, শোক-তাপ-পাপ-লেশ
পারে নাই করিবারে কভু অধিকার ;
সত্য-রত পুণ্য-পূত অন্তর তাঁহার।

এই দুই চিত্রের বিভিন্নতা যেন কেমন কেমন লাগে। আর পিতার যুধিষ্ঠির কুক্কুর-সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

নারিব কদাচ এই আশ্রিতে ত্যজিতে।

যোগীনবাবুর যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—
প্রতি জীবে ভগবান্ করিছেন অধিষ্ঠান
শ্বন্ বলি ত্যজিব কেমনে ?

সমালোচনা আমার সেকালে রোগ বলিয়া এই কথাগুলা বাহির হইয়া পড়িল। নতুবা যোগীনবাবুর মহাপ্রস্থান কবিতা সুন্দর, অতি সুন্দর। সে সৌন্দর্যে হস্তার্পণ করিতে অতি নৃশংসও পারে না। তবে স্বর্গারোহণের বহু পরে মহাপ্রস্থান লেখা, সুতরাং এইরূপ বিভেদ যদি ইচ্ছাপূর্বক যোগীনবাবু করিয়া থাকেন, তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় বৈকি। সমগ্র স্বর্গারোহণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

দুঃসহ-দীধিতি-দীপ্ত দিবা গত-প্রায়,
বৈকালিক মাধুরীতে মহী শোভা পায়,
ফুটিছে কুসুম-চয়, সুমৃদু সমীর বয়,
ধীরে ধীরে অস্তাচলে চলে দিনমণি,—
শান্তির কোমল কোলে অর্পিয়া অবনী।

সান্ধ্য সৌর হৈম দ্যুতি হিমাদ্রি উপরে,
তরল লাবণ্যে খেলে শিখরে শিখরে ;
তুষার-মুকুটে সাজি, স্তরে স্তরে শৃঙ্গরাজি,
কনক-কিরণে মরি কিবা সুশোভিত,
স্বর্গের সোপানাবলী সুবর্ণ-নির্মিত।

তার মাঝে হের এক তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি,
চূড়া যার পরশিছে অমর নগরী,—
অপূর্ব পুরুষ-বর, দেব যক্ষ কিংবা নর,
একাকী দণ্ডায়মান কেহ নাহি আর,
এক সারমেয় মাত্র সঙ্গেতে তাঁহার।

দীর্ঘাকৃতি, সৌম্য-মূর্তি বয়সে প্রবীণ,
অঙ্গের উজ্জ্বল আভা ঈষৎ মলিন।
শুক্লবাস পরিহিত, শুক্লকেশ বিলম্বিত,
শুক্লশ্মশ্রু সুধাংশুর শিখা-সম ভাসে,
অমল অনিলে দুলি সুনীল আকাশে।

প্রফুল্ল মুখারবিন্দ, হৃদয়-দর্পণ—
বিমল আভায় করে সবে প্রদর্শন ;
কুচিন্তা, কুটিল দ্বেষ, শোক-তাপ-পাপ-লেশ
পারে নাই করিবারে কভু অধিকার ;
সত্য-ব্রত পুণ্য-পূত অন্তর তাঁহার।

ললাট প্রশস্ত অতি, অতি সুলক্ষণ,
তদুপরি ছিল বুঝি মুকুট ভূষণ ;
ওষ্ঠাধর বিম্ব হেন, ঈষৎ কাঁপিছে যেন,
প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে অনন্ত গগনে,
হেরিছেন উর্ধ্বদৃষ্টি আয়ত নয়নে।

হেন কালে ধ্বনি এক হইল আকাশে,
সুগভীর তারস্বরে এই কথা ভাষে—
'পাণ্ডবেন্দ্র যুধিষ্ঠির, সত্যব্রত ধর্মবীর,
স্বর্গলাভে যদি থাকে কামনা তোমার,
অবিলম্বে সারমেয় কর পরিহার।

ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞানী তুমি, ধর্ম-অবতার,
কুক্কুরে লয়েছ সঙ্গে কেমন বিচার !
যার স্পর্শে পুণ্য-ক্ষয়, অশুচি হইতে হয়,
কেমনে আসিবে বল হেন পশু লয়ে,
পরম পবিত্র ধাম অমর-আলয়ে।'

হইল আকাশে এই ধ্বনি নিনাদিত,
টলাতে নারিল কিন্তু ভূপতির চিত ;
অচলে অচল সম, স্থির ভাব নিরুপম,
অকম্পিত স্বরে কন অপূর্ব বচন,
অন্তরীক্ষ হ'তে শুনে যত দেবগণ।

'শিরোধার্য দৈববাণী, কিন্তু কদাচন,
নারিব করিতে আমি কুক্কুরে বর্জন।
বনিতা পাঞ্চালী সতী, ভ্রাতা চারি মহামতি,
লয়ে সঙ্গে মহাপন্থে করি আগমন,
সবে স্বর্গে আরোহিব করিয়া মনন।

নিয়তি-নিয়ম কিন্তু কে লঙ্ঘিতে পারে ?
একে একে সবে তারা ত্যজিছে আমারে ;
কোথায় দ্রুপদ-সুতা ধর্মপত্নী গুণ-যুতা,
কোথায় নকুল আর সহদেব বীর !
কোথা ভীম মহাবল, কোথা পার্থবীর !

মৃত্যু-বশে অন্য পথে গিয়াছে সকলে,
ফেলিয়া আমায় এই দুর্গম অচলে ;
কেহ নাহি ছিল আর চতুর্দিক শূন্যাকার !
উঠিলাম তবু শৈলে ধৈর্য ধরি মনে
কিছু দূরে দেখা হয় সারমেয় সনে।

নাহিক রক্ষক, আর নাহিক দোসর,
মম সম একা ভ্রমে শিখর উপর।
আমারে দেখিতে পেয়ে, সত্বরে আইল ধেয়ে,
পরস্পর মধ্যে ক্রমে সানুভূতি হয়,
সে হইল সঙ্গী, আমি দিলাম আশ্রয়।

পবিত্র কি অপবিত্র হউক যেমন,
আমি তারে নাহি পারি ছাড়িতে কখন ;
যেখানে করিব গতি, তাহারে লইব তথি,
এই সত্যে আপনারে করেছি বন্ধন,
নারিব নারিব তাহা করিতে লঙ্ঘন।

হ'তে হয় হ'ব স্বর্গ-সম্ভোগে বঞ্চিত,
কিংবা এই গিরি-পৃষ্ঠে তুষার গলিত।

দেবগণ-সন্নিধানে দুর্লভ অমৃত পানে,
বিড়ম্বিত হতে হয়, তাও আমি হব,
ত্রিদশের কোপানল শির পাতি লব।

সখা মম নারায়ণ—দয়ার আধার,
ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্ধ করো গোলকের দ্বার,—
অন্তিমে নরক-গামী হ'তে হয় হ'ব আমি,—
তথাপি নারিব নিজ বচন খণ্ডিতে,
নারিব কদাচ এই আশ্রিতে ত্যজিতে।'

এত যদি বলিলেন নৃপচূড়ামণি,
আকাশে ঘোষিত হয় ধন্য ধন্য ধ্বনি।
খুলিল স্বর্গের দ্বার জ্যোতি অতি চমৎকার,
ধরায় ধারায় পড়ি কিবা মনোহর!
ঢল ঢল গলা হেমে ভাসে চরাচর।

সে দ্বার শোভিছে কিবা দিব্যাঙ্গনা দলে,
কক্ষে স্বর্ণ-কুম্ভ-পূর্ণ মন্দাকিনী-জলে।
লুটিয়া নন্দনবন পারিজাত অগণন,
শত শত সুরবালা আনি সমাদরে,
হর্ষে বর্ষে নৃপতির মস্তক উপরে।

কত দেব দেবী, কত কিন্নর কিন্নরী
সুমধুর বীণা-যন্ত্র যত্নে করে ধরি
আরম্ভিল সুললিত অপূর্ব মোহন গীত,
পবন হিল্লোলে গীত অনন্ত আকাশে
ব্যাপিল, শুনিল বিশ্ব অসীম উল্লাসে।

রাগিণী—জয়-জয়ন্তী, তাল—একতালা

'জয় যুধিষ্ঠির পুণ্য-পরায়ণ,
জয় ধর্মরাজ ধর্মের নন্দন,
জয় বিপদার্ত বিপদভঞ্জন,
জয় সুর-নর-মানস-রঞ্জন;
জয় সত্যনিষ্ঠ জয় মহাভাগ,
অনুপম তব সত্য অনুরাগ,
করেছ ধরায় কত পরিত্যাগ,
বিনা ক্ষোভে ভূপ, সত্যের কারণ।
ধন্য ধন্য তুমি ধন্য পুণ্যবান্,
তব পুণ্যে বাধ্য বিভু ভগবান্,
সুরগণ যাচে পেতে তব স্থান,
সুরলোকোপরি তোমার আসন।
নিত্যধামে তব পুণ্য-পুরস্কার,
অক্ষয় আনন্দ ভুঞ্জ অনিবার,
বিমুক্ত হয়েছে ত্রিদিবের দ্বার,—
এস এস ত্বরা এস হে রাজন॥'

গগনে দুন্দুভি-ধ্বনি হইল তখন,
নামিল ভূধরোপরি বিচিত্র স্যন্দন;
আরোহিয়া তদুপ'র নরশ্রেষ্ঠ নৃপবর,
সশরীরে পশিলেন ত্রিদশ আলয়,
চতুর্দিকে নিনাদিল শব্দ জয় জয়॥

৩৯

পূর্বেই বলিয়াছি, অতি বাল্যকাল হইতে পিতা আমাকে নিয়ত সাথের সাথী করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আমার যৌবনে, সেরূপ সাহচর্যের সুবিধা ছিল না বটে, কিন্তু পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ যদি কোথাও হইয়া থাকে, তবে আমাদের পিতা-পুত্রের মধ্যে হইয়াছিল। কেবল মিত্র বলিয়া নয়, বন্ধু বলিয়া নয়, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমাকে সময়ে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সমকক্ষতা প্রদান করিতেন। হঠাৎ এক দিনে নহে, আমাকে তাঁহার সমকক্ষ করিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী করিতে— তিনি আমার অতি বাল্যকাল হইতেই আয়োজন করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি যখন যৌবনের প্রারম্ভে মিল, কোম্‌ৎ, স্পেন্‌সর প্রভৃতি পাশ্চাত্যগণের মতবাদে মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ করিলাম, তখন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে, তিনি আমাকে সমরে আহ্বান করিলেন। মিলের মায়াবাদ (Permanent possibility of Sensation) লইয়া,

কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ লইয়া, হারবার্ট স্পেন্‌সরের সমাজতত্ব লইয়া, আমরা পিতাপুত্রে ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক করিতাম। মিল, কোম্‌তের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন; হরবার্ট স্পেন্‌সরের সমাজতত্ত্বের সময়ে, জিজ্ঞাসুর মত পূর্বপক্ষ করিয়া ঠিক যেন শিক্ষা করিতে বসিতেন।

মধুসূদনকে লইয়া নবরত্নের সহিত আমার কলহের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইংরাজি বাঙ্গালার আর কোন কবির কবিত্ব লইয়া পিতাপুত্রে আমাদের বিবাদ ছিল না। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির রস আমরা পিতাপুত্রে লোফালুফি করিয়া উপভোগ করিতাম। সেক্সপিয়ারের নাটকের রস তাঁহার পাদমূলে বসিয়াই উপভোগ করিয়াছি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মেকলে, কাপ্তেন রিচার্ডসন্‌কে বলিয়াছিলেন যে, আমি ভারতবর্ষের সমস্ত ভুলিতে পারিব, কিন্তু তুমি যে এই সেক্সপিয়ারের আবৃত্তি করিলে, এ আবৃত্তি কখন ভুলিতে পারিব না। রিচার্ডসন্ যখন বিলাত চলিয়া যান, তখন তদীয় ছাত্রেরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনি চলিয়া গেলেন এখন কাহার কাছে আমরা সেক্সপিয়ারের পাঠ শিক্ষা করিব? রিচার্ডসন্ বলিয়াছিলেন, 'অধ্যাপক উইলিয়ম মাস্টারস্ রহিলেন। তাঁহার কাছে সেক্সপিয়ার শুনিও।' আমি সেই উইলিয়ম মাস্টারসের ছাত্র। পিতা রিচার্ডসনের ছাত্র। আমার মনে হয়, রিচার্ডসন্ সাহেব, উইলিয়ম মাস্টারস্ সাহেবের নাম না করিয়া, যদি পিতার নাম করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইত। গুরু-নিন্দার বাহাদুরীর জন্য বা পিতৃভক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন-জন্য, এমন কথা বলিতেছি, কেহ মনে করিবেন না। যে স্থলে রস গভীর, ভাষা প্রগাঢ়, আবেগ-পরিপূর্ণ,—সেই সকল স্থলের সেক্স-পিয়ারের পাঠ পিতা যেমন করিতে পারিতেন, এমন আর কাহাকেও শুনি নাই—লিউইসের লাইসিউস্ থিয়েটারের রঙ্গস্থলেও নহে। তবে সেখানে হ্যামলেটের স্বগত উক্তির, 'Tobe or not to be' প্রভৃতি, যেরূপ বিকাশ দেখিয়াছিলাম, সেরূপ আর কোথাও দেখি নাই। ভিনিসের রাজসভায় ওথেলোর উক্তি—Her father lov'd me; oft invited me; প্রভৃতি পিতা অতি আশ্চর্যরূপ আবৃত্তি করিতেন। Father, loved, oft প্রভৃতি গালভরা কথা, কেন সেক্স-পিয়ার সংযোজনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আবৃত্তিতেই প্রথমে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

কথোপকথনে রস-বিস্তারে পিতার মত দ্বিতীয় লোক আমি দেখি নাই। অনেকেই বলেন, তাঁহারাও দেখেন নাই। অজ্ঞ, বিজ্ঞ, হিন্দু, ব্রাহ্ম, যুবা, বৃদ্ধ লইয়া একটা ভরপুর মজলিসে তিনি একাই এক-শ হইয়া গল্পের ছটায় হাসির ঘটা তুলিয়া দিগ্‌বিজয়িরূপে বিরাজ করিতেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও বিচারক দ্বারকানাথ মিত্র বেশ কথোপকথন-পটু ছিলেন বটে, কিন্তু অনেক সময় তাঁহার আপন কথাই পাঁচকাহন বলিয়া অনেকের মনে হইত এবং সেই জন্য অনেকে বিরক্তি প্রকাশও করিতেন। আর একজন মজলিসি মানুষ ছিলেন মুখার্জীস্ মেকাজিন্ ও রেইস এণ্ড রায়তের সম্পাদক প্রসিদ্ধ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিন্তু অনেক সময়েই তিনি অহিফেনে মস্‌গুল-মগজ হইয়া থাকিতেন। কথা চিবাইয়া চিবাইয়া বাহির হইত। মুখুয্যে মহাশয়ের নায়কতায় মজলিস্ যেন একটু একটু ফরাসডাঙ্গার আড্ডার মত মনে হইত। মদের মজলিসের বক্তাদের সঙ্গে তুলনাই করিব না। কেবল এই স্থলে পিতার ব্যঙ্গরচনার, হাস্যরসোদ্দীপক রচনার একটু পরিচয় দিব। সেই লেখার ইতিহাস বুঝাইবার জন্য তাঁহার গুণ এবং পুত্রের গুণের পরিচয়ও একটু দিতে হইল।

সাধারণীতে 'চেণাচুর' নাম দিয়া, পাঠককে বালক সাজাইয়া মুঠা মুঠা বিদ্রূপ বর্ষণ করিতাম। 'সাধারণীর চেণাচুর' একটা উপমার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যে, সংবাদপত্রে,—সাধারণীর চেণাচুরের উল্লেখ থাকিত, * 'কিষণ দাস্ কি চেনা,—তের রূপেয়া, চার আনা —বড় লোক লেতেহে, বড় লোক খাতেহে' ইত্যাদি কথা তখন লোকের মুখে মুখে শুনা যাইত। চেণাচুর ছেলেরাই খায়; সাধারণীর চেণাচুর বুড়ারাও ফোক্‌লা দাঁতে চিবাইতে লাগিলেন; এ দিকে কেশববাবুর সম্প্রদায়ের দুই চারিজন লেখক, বুদ্ধদেব যীশুখৃস্ট শ্রীগৌরাঙ্গকে লইয়া বড়ই নাচাইতে

* 'রূপক ও রহস্য'-এ 'চেণাচুর (সংবাদপত্র)' দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ করিলেন। পিতা ধর্মের বিকৃত ভাব লক্ষ্য করিয়া সাধারণীতে এক 'ধরমচাঁদকি চেণাচুর' লিখিলেন। ইহাতে শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম,—এই সকল ধর্মের বিকৃত ভাবের উপর তীব্র কটাক্ষ আছে। এরূপ বিদ্রূপে কোন প্রকৃত বিশ্বাসীর হৃদয়ে কিছু মাত্র আঘাত লাগিবে না, এই বিশ্বাসে তখন পিতৃদেব উহা ছাপাইয়া ছিলেন, এখনও আমি সেই বিশ্বাসেই সেই পদ্য পুন প্রকাশিত করিলাম।

ধরমচাঁদকি চেনাচুর
মজেমে ভরপুর।

হর্ তরেহ্‌কে চেনা মেরা হর্ তরেহ্‌সে তৈয়ারি।
দেখলে খালে চুনি চুনি গুণ-বিচারি॥
য়্যায়সা লেজ্জৎ, ত্যায়সা গুণ, কিয়া কহোঁ তারিফ।
খানেসে দফা হোয়ে দুনিয়াকি তক্‌লিফ॥
গুঙ্গী হোগা গাইয়া, আওর বয়রা পাগা কাণ।
লেংড়া যাগা কুদ কর্কে হোকে আগুয়ান॥
দেল খুব খোস্ রহেগা, বুড্‌ঢা হোগা জোয়ান।
অন্ধেকা আঁখো হোগা, বন্ধেকা সন্তান॥
দৌড় দৌড়কে আও সব্ আও রে বাঙ্গালি।
পসন্দ কর্‌লে মেরা চীজ. মেইনে উতারা ডালী॥

পহেলা নম্বরমে দেখ তন্ত্রশাহী চেনা।
আগরচে হুয়াহায় থোড়াসা পুরাণা॥
তৌভি হ্যায় খুব তাজা, আওর তেজী।
ভক্তিসে যো খাওয়ে এস্‌কো, শক্তি ওস্‌পর রাজী॥
পুরবসে লেআয়া হোঁ দেকে মন্ত্র ছিটা।
যন্ত্রমে বানায়া হুয়া, হুয়া বহুৎ মিঠা॥
শূদ্র ভদ্র বিপ্র বৈশ্ হোকে এক সাত।
খুব খুসি কর্‌লে ভাই! খাকে সারে রাত॥
লেও মজা আনন্দমে হোকে মাতোয়ারা।
দুনিয়াকা দুখ-ভোগ মৌকুফ হোগে তেরা॥

দোসরা নম্বরমে হ্যায় গোরাচাঁদকি চেনা।
রূপেয়া রূপেয়া সের আওর চার চার আনা॥
প্রভুনে তৈয়ার কিয়া, কিয়া মোলায়েম দানা।
সবকে ওয়াস্তে মজুদ হ্যায় নেহি কিসিকো মানা॥
নেহি এস্‌মে ময়লা যোগ নেহি কুছ জঞ্জাল।
প্রেম রস্‌মে বনি হুই, বড়াহি রসাল॥
যেত্না খাগা, হোগা আওর লালচ্ তুহার।
আখের লেকর্ কফ্‌নি টুক্ৰী ছোড়েগা সংসার॥
নাচেগা দোবাহু মেলি, বাজায়গে মৃদং।
পঙ্গৎ কি সঙ্গৎ মাঝ হোগা সাধু ঢং॥

তেস্‌রা রকম্‌কা হ্যায় আউল চাঁদকি চেনা।
ঘোষপাড়াকা বাজারমে ইস্কা লেনা-দেনা॥
আচ্ছা মস্‌লা সাত হুয়া, সাফা তস্‌লামে ভাজা।
বড়ি মজাদার চীজ,—চেনা কর্তাভজা॥
খানেসে খুসিমে হোগা মেজাজ্ ভরপুর।
কিস্‌মৎকি খুবিসে দুখ যাগা দুর॥
বাড়েগা কর্দানি, হোগা জাহের কেরামৎ।
দর্দী-দেল হোগা তেরা কেত্নী আওরৎ॥
ভজন্ ভোজন্ বট্‌না গানা হোগা একসাত।
বড়ী আরাম্‌সে দিন যাগা সাচ্চি মেরী বাত॥

চৌঠা নম্বরমে হ্যায় রায়জীকা চেনা।
আগর্ সব্ না লেসকো লেও থোড়া নমুনা॥
সহর কল্‌কতামে হুয়া এস্কা পয়দা।
বহুৎ খোস্‌বদার চীজ বহুৎ এস্কা কয়দা॥
একদম আঁখো মুদকে লেও এস্কা রস।
ভুক্, পিয়াস্ সব যাগা হপ্তা রোজ বস্॥
সুরৎভি আচ্ছি হোগী চেক্লেগা চেহারা।
নজরকা রৌস্‌নীসে ভাগে-গা আন্ধিয়ারা॥
খরচকা কম্‌তী হোগী রহোগে ফিট্‌ফাট্।
সংসারকা সুখ পাগা, না পাগা ঝঞ্ঝাট॥
আপ্‌নাকো পালো, আওর কর জরুকো পিয়ার।
দরকার নেহি আওর কিসিসে রাখ্‌না সরোকার॥

আখের মে দেখ ভাই সেন্‌জীকা চেনা।
তাকত নেহি হ্যায় মেরা, তারিফ এস্কা কহ্‌না॥

নয়া তৌরসে ভজা হুয়া, হ্যায় খুব টাট্‌কা।
সব্ চেনাসে মজাদার হ্যায়, নেহি এস্‌মে খট্‌কা॥
পয়সা পয়সা এক এক মোড়কী কিম্মৎ।
খা দেখ, মেলেগা হর্ রকমকি লেজ্জৎ॥
জবানকা জোর হোগা, হোগা মিঠি বুলি।
কেত্না আদ্‌মী লেগা তেরা দো পাঁওকি ধূলি॥
আজব তরেকা কাম করেগা নাম হোগা জাহের।
নেহি রহেগা ডর, নেহি সরম্‌কা খাতের॥
মেজাজ ফলাও হোগা ফেরেগা আহোয়াল।
হর্ ওয়াক্ত দেখেগা হর্ তরেহ্‌কা খেয়াল॥

তু দেখেগা কেত্না সাধু, কেত্না অবতার।
নাচ রংমে তেরা সামনে করেগা বিহার॥
মুসা নাচে, য়িসা নাচে, শ্যাক্যসিংকা সাত।
নাচে লুথর, পাকড় লেকে নানকজীকা হাত॥
জনক নাচে, জস্‌হুয়া নাচে, নাচে গজাধর।
মক্কা ছোড়কে মোহিত হোকে নাচে পগম্বর॥

জন নাচে, লুক নাচে, নাচে সেইণ্ট পাল।
পিটর নাচে, কুঞ্জী বাজে, মেথ দেওয়ে তাল॥
গৌর নাচে ধিয়া ধিয়া, গিরে আঁসু ধার।
চস্‌মা চোক্‌মে দেকে নাচে, সেন অবতার॥

দেখোগে এইসি তরেহ্‌ খেয়াল তাজা তাজা।
কাহাঁ তেরা ভাং, আওর কাহাঁ তেরা গাঁজা॥

আমাদের পিতাপুত্র-মধ্যে সমবয়স্ক সহচরের মত বিশুদ্ধ রসাভাবেরও অভাব ছিল না। এক দিনের একটা গল্প বলি। তখন আমি বহরমপুরে ওকালতি করি। বঙ্কিমবাবুও বহরমপুরে থাকেন। পিতা বহরমপুর একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কেবল পূজার সময় বাড়ীতে দেখা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমবাবুতে আমাতে দীনবন্ধুবাবুর লীলাবতী নাটক কাটাকুটি করিয়াছিলাম। কিন্তু এই গল্পের একটু পূর্বপীঠিকা আছে। সেটুকু আগে বলিতে হইতেছে। সেই সময়ে বহরমপুরে আমাদের সবজজ ছিলেন রাইট সাহেব নামক একজন শ্বেতকায় ফিরিঙ্গি। তিনি একরূপ কিম্ভূতকিম্ভবিস্মৃতি-রূপ পদার্থ ছিলেন। একটি মোকদ্দমার দাবি ডিক্রি দিলেন। উকীল আমলারা এজলাস হইতে চলিয়া গেল, বিশ মিনিট পরে তাঁহাদিগকে আবার ডাকাইলেন; পেসকারকে বলিলেন, 'পার্বতী পূরা হুকুম লিখা যায়।' উকীলদিগকে বলিলেন, 'আপনারা শুনুন, পার্বতী লিখো।' টেবিলে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, 'দাবি-ভোর ডিক্রি।' এই গল্প পিতার সমক্ষে আমি টাট্‌কা টাট্‌কি করিয়াছি। সে দিন তখন আমাদের বাহিরের বৈঠকখানার মজলিসে লীলাবতী-সংশোধনের সমালোচনা চলিতেছিল। দৃশ্য বরাহনগর, সেই স্থসের একজন স্ত্রীলোকের উক্তিতে দীনবন্ধুবাবু লিখিয়াছিলেন 'গ্যাদারী'। আমি কাটিয়া করিয়াছিলাম 'ঠ্যাকারী'। পিতা বলিলেন, 'গ্যাদারী, ঠ্যাকারী দুই হয়; তুমি গ্যাদারী কাটিয়া ঠ্যাকারী করিলে কেন?' আমি বলিলাম, 'আমাদের এতদঞ্চলে গ্যাদারী স্ত্রীলোক বলে না, ঠ্যাকারী বলিয়া থাকে।' পিতা বলিলেন, 'তুমি আমার চেয়ে বেশি জানিলে কি করিয়া?' আমি বলিলাম, 'আপনি বহুকাল বিদেশে থাকেন, নদে জেলায় বহুকাল ছিলেন, সেখানে গ্যাদারীই বলে, সেই জন্যই আপনার এরূপ ভ্রম হইতেছে।' (পাঠক লক্ষ্য করিবেন, আমি পিতার সহিত কিরূপ সমকক্ষভাবে তর্ক-বিতর্ক করিতাম।) পিতা বলিলেন, 'তবে ইহার মীমাংসা হয় কিরূপে? তোমার মা ত আমার সঙ্গে বিদেশে প্রায়ই জান না। তিনি যদি বলেন গ্যাদারী ঠ্যাকারী দুই হয়, তবে তুমি ত হারিবে?' আমি বলিলাম, 'অবশ্য হারিব।' (সহৃদয় পাঠক, আবার লক্ষ্য করিবেন, আমাদের পিতা-পুত্রের সাহিত্য বিবাদে, সালিসির ব্যবস্থা কিরূপ।) বৈঠকখানায় একঘর ভদ্রলোক হাস্যবদনে উৎফুল্ল নয়নে উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। আমরা পিতাপুত্রে অন্দরে মহাবিচারক মাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্ত্রীলোক অহঙ্কারী হইলে তাহাকে কি বলে?' আমার মাথা খাইতে মা একেবারে বলিয়া

ফেলিলেন, 'ঠ্যাকারীও বলে, গ্যাদারীও বলে।' আমরা হাসিতে হাসিতে বহির্বাটীতে আসিলাম। সকলে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইল ? কি হইল ?' পিতা সটানে মজলিসের মাঝখানে গিয়া রাইট সাহেবের অনুকরণে মেজেতে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, 'দাবি-ভোর ডিক্রি।—গৃহিণী বলিলেন ঠ্যাকারী গ্যাদারী দুই হয়।' হাস্যের তরঙ্গ উঠিল, হাসির ফোয়ারা ছুটিল। এখনও আমার হাসি আসে, হাসির সঙ্গে একটু কান্নাও পায়; পিতা নাই বলিয়া নয়. পিতা কাহারও চিরদিন থাকেন না। কিন্তু এরূপ রসামোদ বাঙ্গালা হইতে যে লোপ পাইতে চলিল, সত্য সত্যই তাহাতে কান্না আসে।

সার বার্নস্ পীকক তখন হাইকোর্টের চীফ্ জাস্টিস। তিনি বিজ্ঞ, বিদ্বান্, প্রবীণ, কিন্তু অনেকগুলি ফুলবেঞ্চের বিচারে তিনি একলা একদিকে মত দিলেন, আর অন্যদিকে অন্য সকল জজে জুটিয়া বিপরীত মত দিলেন। আমাদের সংসার ধর্ম্মের, গৃহস্থালির কথায়, তখন আমরা পাঁচ জন জজ ছিলাম। আমি, আমার সহধর্ম্মিণী, আমার বিধবা পিস্তুত দিদি, * মাতাঠাকুরানী ও পিতৃদেব। এমন সময়ে সময়ে হইত যে তত্ত্বতাবাস প্রভৃতি আহার ব্যবহারাদি, কোন গৃহস্থালীর কথায় মাতা, ভগিনী, আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী, আমরা চারিজনে একমত হইলাম, কিন্তু পিতা আমাদের মতে মত দিলেন না। আমাদের বুদ্ধি-সাধ্য-মত তাঁহাকে বুঝাইলেও তাঁহার মতের পরিবর্তন হইল না। তিনি তাহাতে রাগ করিতেন না, ক্ষুব্ধ হইতেন না, ক্ষুণ্ণ হইতেন না; হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'আমরা বাঙ্গালার বিচারক স্যর বার্নস্ পীককের জাতি; তাঁহার অনুকরণ করাই আমাদের কর্তব্য। আমি এ বাড়ীর চীফ্ জাস্টিস, তোমাদের সকলের হইতে আমার মতবিভেদ হওয়াই ঠিক, আর তোমাদের মতানুসারে কার্য হওয়াও ঠিক! তোমরা এককাট্টা এবং অধিকাংশও বটে।' কাজেই পিতা কর্তা হইয়া, অকর্তা হইয়া থাকিতেন, আমরা কোন কোন স্থলে কর্তৃত্ব করিতাম।

৪০

পিতা যখন রাজকীয় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চুঁচুড়ায় আসিয়া বসিলেন, তখন সাধারণী চৌ-চাপটে চলিতেছিল। তখন গ্রাহকের সংখ্যা লইয়া কাগজের সম্মান হইত না। কোন খবরের কাগজের খবর যদি গভর্নমেণ্ট রাখিতেন, অভাব অভিযোগ্ প্রকাশিত হইলে, যদি সেই অভাব পূরণ করিতেন, অভিযোগে কর্ণপাত করিতেন, বা কখন কোন পদস্থ রাজকর্মচারী কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যগ্রতা দেখাইতেন,—তাহা হইলে, সেই সংবাদ-পত্রের সম্মান হইত, অর্থাৎ রাজার আদরে সর্ব সাধারণের কাছে সম্মান পাওয়া যাইত। আর তখন সাহিত্যের একরূপ সমাদর ছিল; এখন তাহা দেখিতে পাই না। সেদিন বঙ্গদর্শনে যে * 'বঙ্গমঙ্গল' প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ শ্লেষ-ব্যঙ্গ-পূর্ণ কবিতা বা পঞ্চানন্দি কবিতা, সেই সময়ে যদি সাধারণীতে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গে একটা ঢিঢি পড়িয়া যাইত। এখন ত সেরূপ কিছু হইল না। বঙ্গমঙ্গলের কেহ খবরই লইল না। বিদ্রূপাত্মক পদ্যের দশা এইরূপ; গভীর, গম্ভীর ভাবপূর্ণ গদ্যের কেহ সংবাদই রাখেন না। ১০।১৫ বৎসর, ক্রমে ক্রমে, এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। কেন হইয়াছে, সে বিষয়ের আলোচনা এখানে করিব না। ২০।৩০ বৎসরে পূর্বে এরূপ ছিল না। স্ফুটোন্মুখ বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব সম্মান ছিল। সরস রচনার সমাদর ছিল। সাধারণী সাহিত্য এবং রাজনীতি সমভাবে সমানে সেবা করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, করিতও তাহাই। সাধারণী বলিত, ক্রন্দন ভিন্ন পলিটিক্স নাই, সুতরাং সরল বালিকার মতন কাঁদিত, ছোট ছোট আব্দার করিত। রাজপুরুষেরা অতি ছোট ছোট আব্দারে কর্ণপাত করিতেন; বড় আব্দার করিলে এখন মুখ বাঁকান ভর্ৎসনা করেন, তখন বালিকার কথা বুঝিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। সাধারণীর ক্ষুদ্র কথায় রাজা কর্ণপাত

---

* অতি দূর সম্পর্কের,—তাঁহার পিতার মাসতুত ভগিনীর কন্যা গঙ্গালক্ষ্মী, সুতরাং তাঁহার দিদি। নতুবা গঙ্গাচরণ ও অক্ষয়চন্দ্র উভয়েই পিতামাতার একমাত্র সন্তান।

* পরিশিষ্টে বিজয়চন্দ্র মজুমদার-রচিত বঙ্গমঙ্গল মুদ্রিত হইয়াছে

করিতেন বলিয়া, সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল। আর সাহিত্য-সেবা-পরায়ণ ছিল বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল—বাঙ্গালার কৃতবিদ্যের কাছে। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালি বাবু সক্ করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করেন। আর রাজনীতি-জড়িত সাহিত্যের সক্ মিটাইবার জন্য, সাধারণীর জন্ম।

পূর্বেই বলিয়াছি, ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ বঙ্গদর্শন, আর দেড় বৎসর পরে ১২৮০ সালের ১১ই কার্তিক সাধারণী প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্বে রাজনীতির সহিত সাহিত্যের সেবা, কি আর কোন সংবাদপত্রে হইত না? হইত বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিতেন লাট সাহেবকে সম্বোধন করিয়া পদ্য। কিন্তু সাধারণী প্রকাশের সময় সেরূপ কিছু ছিল-না। ছিল মহামহিমান্বিত সোমপ্রকাশ। তাহাতে থাকিত— (বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রেতাত্মা ক্ষমা করিবেন।) তাহাতে থাকিত—'যদি রাজস্বসচিবের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে দেশীয় জনগণের উপচীয়মান গুণাবলী অপচিত হইতে থাকে'—এই সাহিত্য রচনা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের আদরের সামগ্রী হইলেও, ইংরাজি কৃতবিদ্যগণ ইহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন, সাধারণ জনগণ উহার ত্রিসীমাতেই অগ্রসর হইতে পারিত না। পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরগুপ্তের পদ্য, 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম-প্যাচার নক্সা' প্রভৃতি অতি শিশুকালে পাঠ করিয়া শিখিয়াছিলাম যে, সহজ বাঙ্গালা উপেক্ষার পদার্থ নহে। আর সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালায় যে, অধিকতর গাম্ভীর্য হয় তাহাও ভুলি নাই। অতি শিশুকাল হইতেই তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতাম, স্কুলে ভর্তি হইয়াই সুবোধিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সুবোধিনীতে গদ্যে-পদ্যে রীতিমত সাহিত্যের সেবা থাকিত। সেই সুবোধিনীর আকার প্রকার লইয়াই সাধারণী প্রকাশিত হয়। পিতা চুঁচুড়ায় যখন আসেন, তখন সাধারণী চৌ-চাপটে চলিতেছিল। আমাদের বাড়ীতে ঢুকিতে দরজার বামদিকের ঘরে সাধারণীর আফিস ঘর, আর দক্ষিণদিকের ঘরে সঙ্গীতের আড্ডা। হারমোনিয়ম বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রোত্থিত সুরসহ সঙ্গীত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষোল ঘণ্টা চলিতেছে। পিতা আমাদের আফিস ঘরেই প্রায় বসিতেন; কচিৎ কখন সঙ্গীত সমাজেও যাইতেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত আমাদের বাহির বাড়ী সঙ্গীতে, সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, গানেগল্পে, সমস্ত দিনই ভোরপূর। পিতা অবসর গ্রহণ করিয়া আসিলে কৃষ্ণযাত্রার মাঝখানে মধ্য রাত্রিতে গোবিন্দ অধিকারী আসিলে যেরূপ হইত, —সেইরূপ হইলে পালা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, গান জমাট হইল।

এ সৌভাগ্য কিন্তু অধিক দিন আমার সহিল না। জ্বরে জ্বরে বিষম জ্বালাতন হইয়া উঠিলাম। কিশোর-কাল হইতেই, এন্ট্রান্স পরীক্ষার পূর্ব হইতেই, '৬৯ সালের কার্তিক মাস হইতেই, এই বিষম ম্যালেরিয়া আমাকে আশ্রয় লইয়াছে। যৌবনের মধ্যে একবার মাত্র ৫ বৎসর কাল ইহার দেখা পাই নাই। সেই কালটি সাধারণীর প্রথম ৫ বৎসর। তাহার পর আবার ভোগানি আরম্ভ হইয়াছে; এখন সাধারণীর বয়স দশ বৎসর হইয়াছে। জ্বরের জ্বালায় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। কম্পোজিটর, প্রেসম্যান, পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি সকলেই জ্বরে পড়িয়া—কাগজ ত আর সময়ে বাহির হয় না। এক সপ্তাহ নহে, দুই সপ্তাহ নহে; আশ্বিন, কার্তিক ক্রমাগতই এইরূপ হয়, পরের পয়সা ঘরে লইয়া এরূপ করিলে চলিবে কেন? কাজেই আমাকে তোড়-জোড় সমস্ত লইয়া কলিকাতায় যাইতে হইল। দেখ বিড়ম্বনা। এত কাল চুঁচুড়ায় রহিলাম, আর পিতা যেই দেশে আসিলেন, কোথায় তাঁহার চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া চাতক-প্রাণ শীতল করিব, সাক্ষাতে তাঁহার সেবা করিয়া, তদীয় সমক্ষে তদীয় আরাধ্য বঙ্গভাষার সেবাপূজা করিয়া, —আপনাকে চরিতার্থ করিব, না-কিসের কর্তব্যজ্ঞানে আমাকে এমন দিনে কলিকাতায় যাইতে হইল। হায় রে! কর্তব্যজ্ঞান। তোমার ছায়া লইয়াই রহিলাম, কিন্তু কর্তব্য সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কর্তব্য কি তাহাই বুঝি না, তবে কর্তব্য সম্পাদন কিরূপে হইবে।

৪১

১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠে সাধারণী কলিকাতায় উঠাইয়া লইয়া গেলাম। তৎপূর্বেই কলিকাতায় একটা বাসা লইয়া

আমাকে বসিতে হইয়াছিল। তখন যুবার্টের প্রদর্শনীর বড় জাঁক। কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া অগ্নিমূল্য হইয়াছে। আমাকে খিতাইয়া জিরাইয়া, খুঁজিয়া পাতিয়া বাড়ী দেখিতে হইতেছিল। বামুনের গোরুর মতন ভাল পল্লীতে ভাল বাড়ী হইবে, অথচ ভাড়াটা অগ্নিমূল্য না হয়।

সেই সময়ে কলিকাতায় কলুটোলায় বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট্‌রূপে বঙ্কিমবাবু বিরাজমান। শশধর তর্কচূড়ামণি মুঙ্গের হইতে আসিয়া, পথিমধ্যে বর্ধমান বিজয় করিয়া, কলিকাতায় শিবির স্থাপন করিতেছেন। বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্য-সঙ্গত হয়। থাকেন চন্দ্রনাথ বসু দাদা-মহাশয়, এখন পরলোকগত তখন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সরকারী অনুবাদক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, খিদিরপুরের দুই মহাত্মা,—কবিবর হেমচন্দ্র এবং কোমৎ-শিষ্য যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বঙ্কিমবাবুর প্রতিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, কেশববাবুর সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন, পরে কটক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রভৃতি। মধ্যে মধ্যে আসেন বারাসতের ডেপুটি তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমানের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতি। বঙ্কিমবাবু ত অবশ্যই থাকিতেন। কলিকাতায় বাসা করার পর প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ত বটেই, অন্য অন্য সময়েও সেইখানে যাইতাম। চূড়ামণি মহাশয়ও এক এক দিন থাকিতেন। সাহিত্য সেবার সভায় ধর্মের কাহিনী উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় আলবর্ট হলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম ব্যাখ্যার সঙ্গে, তিনি বিজ্ঞানের দোহাই জাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন। ধর্ম বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইবে, কথাটা নিতান্ত উল্টা কথা বলিয়াই আমার বোধ হয়। সাধারণীতে এই মতের প্রতিবাদ করিলাম। ধর্মই সকলের আশ্রয়, ধর্মই সকলের অবলম্বন, ধর্ম আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবে কেন? এই সকল কথার আলোচনার ফলে নবজীবন প্রকাশিত হইল। নবজীবনের সূচনাতেই লিখিলাম,

যে বিশাল মহান্ স্তর সমাজ-তত্ত্বাদির আশ্রয়-স্বরূপ অবলম্বন-স্বরূপ হইয়া ঐ সকলকে গর্ভে ধারণ করত, অনবরত উহাদের পুষ্টিসাধন, অবস্থাপরিবর্তন এবং ক্ষয়সাধন করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া,—সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পরিমাণে উপাদান এবং হেতু—তাহা না বুঝিয়া, সেইটিই সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে না হউক, কিন্তু অংশত সকল তত্ত্বের সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহা সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া—কোন তথ্যের কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালি দেখিতে দেখিতে অন্তর স্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু বুঝিতেছেন যে, সেই মূলীভূত সারস্তরের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সেই বিশাল মহান্ আশ্রয়-স্তরের নাম —ধর্ম।

নবজীবন প্রকাশিত হইল। বঙ্গের মহামহারথিগণ প্রায় সকলই লিখিতে লাগিলেন। আমি সম্পাদক, কাজেই আমার জাঁক-পসার খুবই হইল। পিতা অবশ্য চুঁচুড়াতেই রহিলেন। পিতাপুত্রের এই বিচ্ছেদে আমি কিন্তু মর্মে পীড়িত। কি আনন্দেই পিতাকে ঢাকা হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম, আর কি নিরানন্দে তাঁহাকে চুঁচুড়ায় রাখিয়া, কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, চুঁচুড়ায় জ্বরের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছিলাম; নিয়মিত-রূপে সাধারণী প্রকাশ করিতে কোন মতেই পারিতাম না; ভূয় কর্তব্যের দায়ে সাধারণী উঠাইয়া কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতায় বসিয়া বঙ্কিম-সঙ্গতে হাওয়ার সুর বুঝিয়া নবজীবন প্রকাশিত করিলাম। সাধু-সন্দর্শন, সুহৃৎ-সঙ্গম যথেষ্ট হইত; কিন্তু পিতার সহিত বিচ্ছেদে আমি মর্মাহত থাকিতাম; মধ্যে মধ্যে পত্নীকে ও পুত্রকন্যাকে কলিকাতায় আনিতে হইত; দুই একটি সন্তান তাঁহারই কাছে চুঁচুড়ায় রাখিতাম; আপনি কাজকর্ম ফেলিয়া মাঝে মাঝে গিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতাম; তিনি মাসের মধ্যে দুই একদিন আসিয়া আমাদিগকে দেখা দিয়া যাইতেন, কিন্তু তাহাতে আমার মনের সাধ মিটিত না। জগৎ এক দিকে, আর বাবা আর এক দিকে থাকিলে, আমার মনের তুল-দাঁড়ীতে বাবার দিকেই ঝোঁক ছিল।

পিতা কিন্তু মহা আনন্দিত, আমার গৌরবে মহাসুখী। থাকি না কেন আমি পৃথক্—থাকি না কেন দূরে—আমার

গৌরব বাড়িয়াছে তাহাতেই তিনি মহা আনন্দিত। নবজীবনের প্রথম মাসে ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। তাঁহার রচিত চারি ছত্রের * গানটি (ভোর হইল, জগত জাগিল ইত্যাদি) আমি মহা ধৃষ্টতা করিয়া বিশ ছত্র করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছিলাম—তাহাতেও ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে, তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়া, আমিও মনে ধিক্‌কার দিতেছিলাম। কাজেই ভালমন্দ কোন কথাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলাম না। তাঁহার সঙ্গে সমান ভাবে কত তর্ক করিতাম, কিন্তু কেমন তিনি রাশভারি লোক ছিলেন,—যতই তাঁহাকে ভালবাসি ও ভক্তি করি, সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় তাঁহাকে যাবজ্জীবন সমানে করিয়াছি। তিনি এখন অন্যধামে, তবু এখনও তাঁহাকে পূর্বমতই ভয় করি।

নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। তাহাতে ছিল আমার লিখিত 'বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম'। পাঠ করিয়া পিতার মনে আনন্দ আর ধরে না। যাহাকে পান, তাহাকেই ধরিয়া নবজীবন পড়িতে বলেন। কলিকাতায় আসিলেন, কলিকাতায়ও আনন্দ ছড়াইয়া গেলেন। ৺পূজার সময় উলার কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। তিনি পেন্সন-প্রাপ্ত মুন্সেফ, সরল বৈষ্ণব, পিতার পরমবন্ধু। সমস্ত প্রবন্ধটি পিতা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি আমাকে কত আশীর্বাদ করিলেন। ইঁহাদের আনন্দে পিতৃ-বিচ্ছেদের ভারটা আমার মন হইতে খানিক কমিয়া গেল।

ক্রমে সহিয়াও গেল। পিতাও আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন। মাসে একবার কলিকাতায় আসিতেন। আমিও মাসে দুই বার বাড়ী যাইতাম। আরও সহিয়া গেল,—কলিকাতায় পিতার লীলাখেলা দেখিয়া। সাবিত্রী লাইব্রেরিতে আমি বক্তা—তিনি পাঁচজনের মধ্যে আমার একজন রক্ষা-কর্তা। চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম ব্যখ্যা হইবে, মির্জাপুরে কালিদাস সিংহের গলিতে। অঘোরনাথ কুমারকে সঙ্গে লইয়া পিতাপুত্রে পিছনদিকে আড়ালে চুপি চুপি রহিয়াছি। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির বাটীতে চন্দ্রনাথ দাদা-মহাশয় হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করিলেন, বাল্য বিবাহের কথা উঠিল; পিতা তাঁহার বাল্য বিবাহের ফল বলিয়া অধমকে দেখাইয়া দিলেন; আমার একটি পুত্র এক কীলে একটি বাক্স ভাঙ্গিয়াছিল, সে কথাও বলিলেন,—মহা হাস্যকৌতুক হইল। শোভাবাজারে অক্ষয়কুমারের স্মরণ সভায় পিতৃ-দেব সভাপতিত্ব করিলেন। পঞ্চাশী পরব—জুবিলির সময়, দলে বলে চুঁচুড়া হইতে আসিলেন, সকলে মিলিয়া আলিপুরে গভর্নমেণ্ট টেলিগ্রাফ স্টোর আফিসে বসিয়া বাজী পোড়ানো দেখিলাম। নবজীবনের প্রথম বৎসরেই আমরা রীপনকে লইয়া কত বাড়াবাড়ি করিয়াছিলাম। পিতা প্রথম দিন অপরাহ্নে যেরূপ শিয়ালদহ স্টেশনে রীপন-অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, শেষের দিন সেই-রূপ সাতপুকুরিয়ার বাগানে গভীর নিশীথ পর্যন্ত উৎসবে উৎফুল্ল। কলিকাতায় কংগ্রেসের কন্‌ফারেনস বসিয়াছে। আমি ও-সকল ভালবাসি না, যাই না। প্রথম দিন আমাদের আহারের পর পিতা বলিলেন, 'অক্ষয়, যাবে না হে?' আমি বলিলাম, 'বলেন ত যাই।' উত্তর—'তবে এসো'। আমি অমনই তাঁহার সঙ্গে সেইখানে গেলাম। সেখানে, পুলিশ কিরূপ অনর্থক হুমকি দেখাইয়া আমার একটি পুত্র ও তাহার সমবয়সীদের ক্লব ভাঙ্গাইয়া দেয়, সে গল্প বলিলেন। সকলেই বিস্মিত হইল। পিতার পরিপক্ক বয়সের এই সকল অপূর্ব লীলাখেলায় আমি মহা আনন্দিত থাকিতাম। তাঁহার স্ফূর্তিতে, আমার স্ফূর্তি হইত। পিতার যৌবনের বন্ধু ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়; তাঁহার মত সরল লোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। পিতা তাঁহাকে শ্যামাচরণ (বিশ্বাস) দে মহাশয়দের বাড়ীতে লইয়া গিয়া কত কৌতুক রহস্যই-না করিতেন। আমি সঙ্গে থাকিতে পারিতাম না, রিপোর্ট পাইতাম; শুনিয়াই আমার-না কত আনন্দ হইত।

বাড়ীতে, চুঁচুড়ায় যখন থাকিতেন, অধিকাংশ কাল বাড়ীতেই থাকিতেন; তখন আমার ছেলে মেয়েদের ও আরও দুই একটি ছেলে মেয়ে লইয়া, এক রসের পাঠশালা বসাইয়া সকাল, সন্ধ্যা বেলা সেই পাঠশালার গুরু-গিরি

* 'কবিতা ও গান'-এ সমগ্র গানটি ছাপা হইয়াছে।—ভোর হইল, জগত জাগিল, চেতনে চাহিল নারীনর।

করিতেন। তাহারা সমস্ত দিনই হাসিতেছে, আর প্রতি দশ মিনিটে কিছু না কিছু শিখিতেছে। বৈঠকখানার বড় দেওয়ালে একখানা ভারতের মানচিত্র খোলা টাঙ্গানো আছে।* আমার তিন বৎসরের শিশু পুত্রটি 'লঙ্কা' দেখাইয়া, নাম ভুলিয়া গিয়া বলিতেছে, 'ঝাল'। তাহা অপেক্ষা যাহারা বড়, তাহারা আরেবিয়ান নাইটের বা সেক্সপিয়ারের গল্প ঠাকুরদাদার মুখে শুনিতেছে; কখন বিস্ময়ে স্তব্ধ, কভু করুণায় বর্ষণোন্মুখ, কখন-বা আহ্লাদে হাসিয়া উঠিতেছে। আমি শিখিয়াছিলাম—অনুকরণে। ইহারা শিখিতেছিল—হাসিতে খুসিতে। একজন বৃদ্ধ দুইটি নাতিকে কাঁধে লইয়া, একটিকে পিঠে লইয়া যাইতেছিল দেখিয়া, একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—'এ কি?' বৃদ্ধ উত্তর করিল,—'ভাই, বুঝ না—আসলের চেয়ে সুদের মায়া বেশি।' পিতা আমার সমক্ষে এই গল্পটি শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'ঠিক বলিয়াছে।'

পিতা, নবজীবনে 'দুর্গোৎসব', দুইটি 'আগমনী', একটি পদ্য,—সাধারণীতেও শরৎ-বর্ণনার দুই-একটি পদ্য লিখিয়াছিলেন। 'ব্রিটেনিয়া সমীপে ইণ্ডিয়া' নামে একটি পদ্য খণ্ডশ নবজীবনে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা শেষ হয় নাই। —সেই দারুণ কথা এইবার অবশ্যই আমাকে বলিতে হইবে।

৪২

সেই কথা একদিন দেওঘরে শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু† মহাশয়ের অতি নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছিলাম। বলিতেছিলাম, 'কেবল দুইটি বিষয় ছাড়া, পিতার আর কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ভয় ছিল না। অন্ধকার, ভূত, সাপ, বাঘ, ইংরাজ, চোর, ডাকাত'—এইটুকু মাত্র আমার যাই বলা হইয়াছে, রাজনারায়ণবাবু শুইয়াছিলেন, অমনই ধড়ফড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া, বলিতেছেন—'বাহবা! beautiful! beautiful!—সাপ, বাঘ, ইংরাজ, চোর, ডাকাত,—beautiful!' আমি প্রথমে তাঁহার এত প্রশংসাবাদের মর্ম-স্পর্শ করিতে পারি নাই—পরে বুঝিলাম, রাজনারায়ণবাবু মহা রাজনৈতিক, ঐযে ইংরাজকে সাপ, বাঘ, চোর, ডাকাতের মাঝে ফেলিয়া এক তালিকার (category) মধ্যে পুরিয়াছি,—তাহাতেই তাঁহার মহা আনন্দ হইয়াছে।

বাস্তবিক দুইটি বিষয় ছাড়া আর কিছুতেই পিতার মনে ভয়ের কিছু মাত্র উদ্রেক হইত না। আমরা উলায় ভূতের বাড়ী, অথচ বেশ দোতালা দক্ষিণ-খোলা সস্তায় পাইয়া, ভাড়া করিয়াছিলাম। গৃহস্বামীর অতি বৃদ্ধা মাতাকে সেই বাড়ীতে ভূতে মারিয়াছিল; কিন্তু রাত্রিকালে একটু-আধটু শব্দ করা ছাড়া, ভূত আমাদের কখন কিছু বলে নাই। সে বাড়ী সাপের সঙ্গে আমাদের ভাগবাটরায় ছিল। নিচের তিনটা ঘর আমরা কদ্রুপুত্রদের ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; তাহারা কিন্তু নিদাঘ পূর্ণিমার রাত্রিতে আমার ছোট ফুল-বাগানটিতে (trespass) অনধিকার প্রবেশ পূর্বক আমার কেলো-ভুলো কুকুর দুটার সঙ্গে রঙ্গরস করিত।

বাঘ,—বাঘ একটা ভয়ের কারণ বটে। পিতা কিন্তু বাঘকেও ভয় করিতেন না। পিতা দেওয়ানি কর্মচারী ছিলেন। মুনসেফীতে প্রথমে বেতন ছিল মাসে ১০০৲ টাকা। যে রাজনৈতিক ভ্রমে পড়িয়া গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে একটু অপদস্থ করিয়া পানিঘাটায় পাঠান, সেই ভ্রম দূর হইলে ১০০৲ টাকার কর্মচারীকে ২০০৲ টাকা দিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষ সেই সময়ে সুন্দরবনের বন্দোবস্তের কার্যে বড় বিশৃঙ্খলা হইতেছিল; গভর্নমেণ্ট পিতাকে দেওয়ানি শ্রেণীতে রাখিয়া, ডেপুটি কালেক্টরি দেন। ২৪-এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬২ হইতে ৩রা জুন, ১৮৬৩ পর্যন্ত এক বৎসর তিন মাস আট দিন, পিতা সুন্দরবনের বন্দোবস্তের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। কাজ অত্যন্ত জরুরি, কাজেই পিতাকে অনেক রাত্রি নিবিড় বনমধ্যেই পাল্‌কীতে বাস করিতে হইত। এইখানেই বঙ্কিমবাবুর বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্যগণ* নিতান্ত রাজভক্ত প্রজার মত, দস্তুর মোতাবেক সরকারি ডেপুটি কালেক্টরের সঙ্গে গভীর নিশীথে মুলাকাত করিতে

* 'মহাপূজা'র 'স্বপ্নে আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক, শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ। শেষ জীবন দেওঘরে বাস করিয়াছিলেন।

* বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত ১ম ভাগ বঙ্গদর্শন-এ 'সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' শীর্ষক প্রবন্ধ উপলক্ষে।

আসিতেন। শিবিকার দ্বার বন্ধ দেখিয়া হাকিম সরকারের ফুরসুৎ নেহি বুঝিয়া পঞ্চার চিহ্ন ভিজা ভূমিতে রাখিয়া চলিয়া যাইতেন। বাবা এই গল্প করিতে করিতে বলিতেন, —'যদি পাল্‌কীর বাড় টানিয়া একবার উঁকি মারিয়া বলিত, "হাকিম হালুম!" তাহা হইলেই মুস্কিল হইত আর কি?' অর্থাৎ তিনি মুস্কিল মানিতেন না! জানিতেন 'যঁহা মুস্কিল, তঁহা আসান।'

দুইটা পদার্থে বাবার ভয় ছিল। বজ্রপাতে ও ওলাউঠায়। বজ্রপাতে ভয় বৈজ্ঞানিক, Scientific, বজ্রে ভয় নয়, ভয় Electricityতে। একটু মেঘ ডাকিল ত অমনই চাকরদিগকে বলিলেন,—'ওরে, ঘটী গাড়ু সব ঘরে রাখ।' জানালায় একটিও লোহার গরাদে দেন নাই। আমি উকীল হইয়া আমার নূতন শয়ন কক্ষে লোহার গরাদে দিয়াছিলাম। ৺পূজার সময় বাড়ী আসিয়া, ঐ সকল দেখিয়াই পিতা আমাকে মহা ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন, বলিলেন—'তোমাদের মত নাস্তিক আর কখন জগতে হয় নাই; যাহারা বিজ্ঞান মানে না, তাহাদের মত নাস্তিক আর কোথাও আছে না কি?' আমি বলিলাম, 'হুগলী কলেজের সামনের তেতলা বাটীতে বড় লোহার শিক আছে, তাহার বিপরীত দিকের খিলানে বজ্র পড়াতে বাড়ীটা নষ্ট হইয়াছে। আরও লোহার রেল-গরাদে চারিদিকে ছিল, কোথাও পড়ে নাই বা বাধা পায় নাই'—ইত্যাদি, ইত্যাদি। পিতার রাগ তখনই পড়িল, ভয় কিন্তু তেমনই রহিল।

ওলাউঠায়ও তাঁহার অত্যন্ত ভয় ছিল। এবার Scientific নয়, Nervous, প্রাণের ভিতরের ভয়। পিতার মৃত্যুর দুই-চারি বৎসর পূর্বে ওলাউঠার দেবতার গল্প হইতেছিল। একজন বহু সাধনায় বর পাইল যে, দেবতারা ছদ্মবেশে মর্ত্যে আসিলে, সে চিনিতে পারিবে। একদিন রাত্রিকালে, সে দেখিল যে ওলাউঠার দেবতা তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন। সে মহা অনুনয়-বিনয়ে তাঁহাকে বলিল, 'আমাদের গ্রামে আসিবেন না।' তিনি বলিলেন—'তিন জনের নিয়তি আছে; আমাকে অবশ্য গ্রামে যাইতে হইবে। সেই তিন জনকে লইয়া আমি সাত দিন পরে এই সময়ে চলিয়া যাইব।' সে ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া দিল। সাত দিনে কিন্তু গ্রাম উজাড় হইল; চারিদিকে হাহাকার; শবের সৎকার হয় না। সাত দিন পরে যখন দেবতা গ্রাম হইতে যাইতেছেন, তখন সেই ব্যক্তি তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, দেবতারাও মিথ্যা কথা কহেন। দেবতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের ভিতরে গেলেন। একজনকে দেখাইয়া বলিলেন, 'দেখ দেখি ঐ ব্যক্তি কে।' সে বলিল, 'উনি দেখিতেছি ভয়ের দেবতা।' 'উনিই তোমাদের গ্রাম নষ্ট করিয়াছেন।' পিতা গল্প শুনিয়া বলিলেন, 'বাল্যকালে এই গল্পটি শুনিলে ভাল হইত।'

৪৩

১২৯৫ সালের দুর্গোৎসব আসিল। ঐ সালের আশ্বিনের নবজীবনের প্রথম প্রবন্ধ পিতার রচিত 'দুর্গোৎসব' পদ্য। দুর্গোৎসবের সময়ে পিতার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিত। চিরদিন বিদেশে থাকিতেন, এই সময়ে মাত্র বাড়ী আসিতেন। স্বয়ং পৌরাণিক ধর্মের মধুর স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেন, কাজেই আনন্দে প্রাণ নৃত্য করিত। আমাদের বাড়ীতে ৺পূজায় সম্ভবাতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য হইত। ঠাকুর-গঠনে, চিত্রে, সাজ-সজ্জায় দেশীয় শিল্প উৎসাহ পাইত। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-নবশাখ, ভদ্র, দরিদ্র-ভোজনে আমরা যশ পাইতাম, আশীর্বাদ পাইতাম। ভাল যাত্রা গান কীর্তনে উৎসব উছলিয়া উঠিত। কাজেই পূজার সময় আমাদের আনন্দের দিন। পিতা 'দুর্গোৎসব' পদ্যে এই আনন্দ বর্ণন করিতেছেন,—

* * *

তমোঘন ঘোর নিশা যেন পোহাইল।
সৌভাগ্য-আকাশে রবি গৌরবে উদিল ॥
অতি অপরূপ শোভা,
জগজন-মনোলোভা;
সাজিল অখিল কিবা কনক-কিরণে।
ভারত জাগিল যেন নবীন জীবনে ॥

দাসত্ব দুর্গতি কারো মনে নাহি আর।
হাস্য-লাস্যে শোভিতেছে বদন সবার॥
কিবা ধনী কিবা দীন,
কিবা গৃহী উদাসীন,
বালবৃদ্ধ নরনারী সবে পুলকিত।
বিশ্ব-ব্যাপী মহোৎসবে সকলে মিলিত॥
অর্থ-দান বস্ত্র-দান করে কত জন।
কত জন করে কত ভক্ষ্য-বিতরণ॥
যেমন বিবিধ দান,
সেইরূপ নৃত্যগান,
তুষিতেছে মোহিতেছে মানস সবার।
মহাদিন মহোৎসব আনন্দ অপার॥

*   *   *

এস এস বঙ্গবাসী মিলিয়া সকলে,
জগৎ-জননী পূজ, পূজ কুতূহলে।
দাঁড়ায়ে মায়ের পাশে,
গললগ্নীকৃতবাসে,
পুষ্পাঞ্জলি পাদপদ্মে, দেহ অবিলম্বে।
উচ্চস্বরে বল 'জয় জয় জগদম্বে'॥

আমাদের বৈষ্ণবী পূজা, বলিদান হয় না—আখ-কুমড়াও নয়। কিন্তু প্রতিদিন পূজার পর—আমরা ঢাকের বাদ্য থামাইয়া—'জয় জগদম্বে, জয় জগদম্বে, জগদম্বে—মা-আ' বলিয়া সকলে শতকণ্ঠে মহাধ্বনি করিয়া উঠিতাম। আমরা থামিলেই, ঢাকে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিত; ছেলেরা সকলে নৃত্য করিত; আমার একটি ছেলেকে কোলে করিয়া পিতাও কখন কখন নৃত্য করিতেন; পায়ের নৃত্য নহে,—ছেলে নাচাইতে নাচাইতে, বুকের নৃত্য, বাহুর নৃত্য,—পা ছাড়া আর সর্বশরীরের নৃত্য।

পঁচানব্বই সালের পূজার মহোৎসব—নাচা-কুঁদা আমাদের হইয়া গেল। আমি কলিকাতায় গেলাম। প্রায় দুই সপ্তাহ আছি। ইংরাজিতে কয় পঙ্‌ক্তি লেখা পিতার একখানি কার্ড পাইলাম।* ৺শ্যামাপূজার সময় তুমি বাড়ী আসিবে, এখানে বড় ওলাউঠা হইতেছে। তাঁহার হৃদয়ে ওলাউঠার ভাব-গতি জানিতাম। আমি বাড়ী আসিলাম, আসিয়া দেখি পিতার মুখ আধখানা হইয়াছে। আমাদের কদমতলা পল্লী ও কাঁকশিয়ালি ওলাউঠায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশিনী একটি দুঃখিনী মুমূর্ষ অবস্থায়। সেবা পায় নাই, চিকিৎসা হয় নাই। নিজে তাহার ঘরদ্বার পরিষ্কার করিয়া দিয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সেই দিনই বুঝা গেল, সে রক্ষা পাইল। পিতা এই সংবাদে মহা উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহার আনন্দে, আমারও আনন্দ হইল।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন চিরকালই পায়স হয়। সেবারও হইল। মধ্যাহ্নে আহার একটু গুরুতর হইল। অপরাহ্নে পিতার মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর। বড় রায় লিখিবার সময় পূর্বে যেরূপ গম্ভীর হইত, সেইরূপ গম্ভীর। সন্ধ্যার পর বলিলেন, 'আজি রাত্রিতে আমি কিছু খাইব না।' কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—'পেট কেমন ঘুট্ ঘুট্ করিতেছে।' রাত্রিতে শয়ন করিলেন। তাঁহার ঘরের দ্বারে আসিয়া কাণ পাতিয়া শুনিলাম, পিতার যেমন নাক ডাকিত, সেইরূপ ডাকিতেছে—তিনি স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতেছেন। রাত্রিতে দুই তিনবার এইরূপ শুনিলাম—বুঝিলাম স্বচ্ছন্দে সুপ্তি। ভোরে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; উঠিয়া শুনিলাম, পিতা পীড়িত—মল অপাক,—তবে বেশি হয় নাই; প্রস্রাব হইয়াছে। ডাক্তার-কবিরাজ আসিলেন। ৯।১০টার সময় একবার বমি হইল; বলিলেন, 'রোগের নামকরণ খুব সঙ্গত—ওলাউঠা; এতক্ষণ ওলা ছিল, এইবার উঠা হইল।' নানা ঔষধ চলিল; সন্ধ্যার সময় আমরা অনেকে বুঝিলাম, ঔষধ বৃথা হইতেছে। ইতিপূর্বে কোম্পানির কাগজগুলি পিতা আমার নামে সই করিয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করেন। ডাক্তারবাবু বলেন, 'সে কি মহাশয়! ও সকল কথা ভাবেন কেন?'—বলিয়া নিষেধ করেন। সেটা মঙ্গলবার। সেই রাত্রিতে আমাদের কদমতলার ত্রিপথে সকলে মিলিয়া ৺রক্ষাকালীপূজা করিয়া ছিলেন। তাহার পুরোহিত আনিয়া অর্ধরাত্রিতে পিতাকে দেবীর চরণামৃত সেবন করাইয়া গেলেন। কালরাত্রি কিন্তু কাটিল না। ১২৯৫ সালে ২২-এ কার্তিক মঙ্গলবার রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর—

* পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

তখন চতুর্থী পড়িয়াছে—পিতা নিজ যোগ্যধামে গমন করিলেন!

পিতার কথা লিখিবার জন্য এই প্রবন্ধ; পিতার জীবন শেষ হইল তবু কিন্তু আমি গোটা-দুই-চার কথা আরও বলিব; পাঠক মার্জনা করিবেন।

৪৪

পূর্বে গঙ্গাতীরে সকল ঘাটের পার্শ্বেই শবদাহ হইত। মিউনিসিপ্যালিটি সে প্রথা বন্ধ করিয়াছে।—নির্দিষ্ট শবদাহের ঘাট স্থির করিয়া দিয়াছে। কাঁকশিয়ালির বটতলার ঘাটের পার্শ্বে পিতার পিতা-মাতা সহমরণ লাভ করেন। পিতার ঠাকুর দাদারও সেই ঘাটে দাহন হয়। পিতার ইচ্ছা ছিল, সেই ঘাটেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টি হয়। আমাকে একথা বলেন নাই। আমি কাণাঘুষায় কথাটা জানিতাম। মিউনিসিপ্যাল কমিশনর মহোদয়েরা উপস্থিত থাকিয়া সেই ঘাটেই শবদাহের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রচণ্ড পুলিশও দেখিল—কিন্তু ভ্রূকুটি করিল না।

সময়ে সময়ে পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য পিতাকে করিতে হয়। এই কথা লইয়া ভাবিতাম, আমাদের শাস্ত্র কি কঠিন, কি কঠোর, কি নৃশংস! আজি পিতাকে স্নান করাইয়া, নব যুগ্ম বস্ত্র পরাইয়া, কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্র দিয়া, চিতায় উঠানো হইয়াছে, আমি দক্ষিণ হস্তে বটজটা ধরিয়া, দূরে দাঁড়াইয়া সেই নৃশংস শাস্ত্রের কথা ভাবিতেছি; মনে করিতেছি, আজি আমার যদি এই সকল অবশ্য কর্তব্য না থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ভূশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকিতাম। উঠিতেও পারিতাম না, কেহ উঠাইতেও পারিত না। আজি শাস্ত্রই ত আমাকে উঠাইয়াছে, দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে, কর্তব্যে ব্যস্ত করিতেছে; তবে শাস্ত্র নৃশংস কেন? শাস্ত্র মানিলে,—শাস্ত্র মহোপকারী।

সমস্ত ঔর্দ্ধদেহিক কার্য হইয়া গেল। বাড়ী আসিলাম। মাতা * সালঙ্কারা গুম লইয়া বসিয়া আছেন। কেহ তাঁহার কাছে যাইতে পারে নাই। তাঁহার অলঙ্কারগুলি স্বহস্তে খুলিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে?' উত্তর—'বাবাকে দাহ করিয়া আসিলাম, আমার গলায় এই কাচা।' তাহার পর, তাঁহাকে স্নান করাইলাম, যথা যোগ্য বস্ত্র পরাইলাম; কিন্তু ক্রমেই আমার চক্ষে সমস্ত কুজ্ঝটিকাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কুয়াসা অথচ ফাঁকা কুয়াসা—সমস্তই যেন ফাঁকা, আছে অথচ নাই। আমার কোন চিন্তাও নাই, ভাবনাও নাই—যেন আমি বলিয়াই একটা বোধ নাই। পত্নী ছেলেপিলেদের লইয়া ঘরের মধ্যে থাকেন, আমি একাকী বারান্দায় কম্বল-শয্যায় শয়ন করি। দ্বিতীয় রাত্রি এক ঘুমের পর চিন্তা আসিল। ভাবিতে লাগিলাম, দেখা যা'ক আমার বয়সী বা আমার অপেক্ষা বয়সে বড়, আমাদের এখানে এমন কয় জনের পিতা বর্তমান আছেন। দুইঘণ্টা মনে মনে খতিয়ান করার পর দেখিলাম, একজনের মাত্র আছেন—অন্নদা মুখোপাধ্যায়ের। ক্ষণেক চিন্তা-হীন অবস্থায় আবার রহিলাম—আপনা আপনি কখন শ্বাস বন্ধ হইয়াছিল, চিন্তার সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। ভাবিলাম তবে আমি 'ভাগ্যহীন' কিসে? সেই একরূপ মুখ-পোড়ার সান্ত্বনা পাইলাম। চতুর্থ রাত্রিতে পত্র পড়িবার প্রয়োজন হইল। দেখি যে চোখে ভাল দেখিতে পাই না। এচোখ ওচোখ বুজিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, বাম-চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমে বুঝিলাম বাম হস্তের ও বাম পদেরও কম-জোর। সেই হইতে 'পক্ষাঘাত' আমাকে পাড়িবার চেষ্টা করিয়াছে। এই ষোল বৎসরে আমি ব্যবস্থা লইয়া ৩৷৪ বার চতুর্মুখ খাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে তালপাতার আগুনের সেকের সঙ্গে, কুব্জপ্রসারিণী তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সর্বত্রই হা-হুতাশের ধ্বনি, 'এমন লোকও হঠাৎ মারা যায় গা!' যেন তিনি দুই-চারি মাস ভুগিয়া লীলা-সংবরণ করিলে, তাঁহার বা সমাজের কিছু-না-কিছু লাভ ছিল। পিতা 'চুঁচুড়া হিতৈষিণী' সভার সভাপতি ছিলেন। অন্যতম সভ্য রাধাজীবন রায় (হায়! রাধাজীবনই-বা কোথায়?) নববিভাকর-সাধারণীতে শোক-পদ্য প্রকাশিত করিলেন; দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

* বায়ু-রোগ-গ্রস্তা ছিলেন।

এক দিন পর বলি, ভাবি নাই মনে,
জনকের মত তাঁরে, করিতাম জ্ঞান—
পুত্রসম ভাবিতেন, তিনি সর্বজনে,
হৃদে তাঁর ছিল চিন্তা—মোদের কল্যাণ!

'আমারে বাসেন ভাল সবার উপর,'
পরস্পর সবাকার আছিল ধারণা;
হেন লোক আছে কোথা ভবের ভিতর,
এ গুণ স্মরণে আরো, হতেছে যাতনা।

সর্বত্রই হা-হুতাশ! আমি কোথাও গিয়া একটু স্বস্তি পাই না। সকলকার হা-হুতাশে আমিও সান্ত্বনা পাই না, আমার হৃদয়ের হুতাশ আরও জ্বলিয়া উঠে। স্থির করিলাম কলিকাতায় যাওয়া ভাল; সেখানে কত ভাল লোক আছেন। আর লৌকতা রাখিতে ত হইবেই।

একটি ভৃত্যের সঙ্গে ভাগীরথীর পুলের উপর দিয়া নৈহাটী হইয়া যাইতেছি। কয়খানা মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে, আমি আর আমার সেই ভৃত্য। আর জনপ্রাণী নাই। গাড়ীতে উঠিয়া একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। গাড়ী যখন মধ্য-গঙ্গার উপরে,—কূল-প্লাবনী কুল কুল করিয়া সরিয়া পড়িতেছেন, গঙ্গার শীতল বায়ু বেশ আমার গাত্রে সরসর করিয়া লাগিতেছে, তখন ঠাহর হইল, আমি গুনগুন করিয়া নিধুবাবুর বিরহ-গীতি গান করিতেছি।—

আয় রে! বিচ্ছেদ রাখি তোরে,
যতনে, হৃদি-মাঝারে।

ঠাওর হওয়ার পর, পোড়া-মুখে একটু হাসি আসিল—পিতৃ-শোকে বিরহ-গান! মন্দ নয়! তখন কেহ ছিল না, এখন তোমরা আমার সম্মুখে রহিয়াছ,—এই হাসিতে হাসিবে, না কাঁদিবে?

কলিকাতার বাসায় গিয়া রহিলাম। প্রত্যহ একখানা গাড়ি করিয়া গঙ্গা-স্নান তর্পণ করিয়া আসি, আর দুইচারি বাড়ী লৌকতা সারিয়া আসি। কিন্তু সর্বত্রই সেই চুঁচুড়ার মত হা-হুতাশ!

খিদিরপুর গেলাম। হেমবাবুর কাছে সারিয়া, যোগেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে গেলাম। সঙ্গে সেই চাকর, আর ঢাকার শেষ যাত্রার সেই সঙ্গী—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভায়াও আছেন। আমি আগে আগে, উঁহারা দুইজন আমার পিছনে। বৈঠকখানার দ্বার দিয়া আমি যেমন প্রবেশ করিয়াছি—যোগেন্দ্রদাদা বসিয়াছিলেন, উঠিয়া সহাস্য মুখে, দুই হাত একটু তুলিয়া, যেন আমাকে আলিঙ্গন করিবেন এইভাবে অগ্রসর হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন—'অক্ষয় ভায়া এলে, এসো! এসো! হিন্দু পেট্রিয়টে গঙ্গাচরণবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পড়িয়া আহ্লাদ আর রাখিতে পারি না—(আমি হতভম্ব!) আরে ভাই! আমরা ত কেহ মৌরসি পাট্টা লইয়া আসি নাই—তুমি তাঁহার একমাত্র সন্তান—তোমাকে রাখিয়া যে তিনি চলিয়া গেলেন, ইহার অপেক্ষা আহ্লাদ আর আছে নাকি!'—এই অপূর্ব কথাগুলি কাণে, মনে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র জীব হইতে লাগিলাম। আমার দেহ বিশুদ্ধ হইয়াছে, মনে হইল; শরীরের ভার কমিয়া গেল; সমস্ত কুজ্ঝটিকা সরিয়া গেল; আমি আবার যেন মানুষ হইলাম। যোগেন্দ্রদাদা আমাকে আলিঙ্গন করিলেন; আমি চোখের জল পুঁছিতে পুঁছিতে তাঁহাকে প্রত্যালিঙ্গন করিলাম। তাহার পর কত গল্প হইল। চলিয়া আসিবার সময়, পূর্ণচন্দ্রে আমাতে বলাবলি করিতে লাগিলাম—যোগেন্দ্র ঘোষ একটা সত্যিকার মানুষ বটেন।

সেই যে ডাক্তারবাবু কোম্পানির কাগজে পিতাকে সই করিতে নিষেধ করেন, কেমন করিয়া জানি না, সেই কথা কলিকাতায় রাষ্ট্র হইয়াছে; সকলেই ডাক্তারবাবুর নিন্দা করেন, বলেন, 'তাঁহার নির্বুদ্ধিতে তোমার কতকগুলা টাকা* ন দেবায় ন ধর্মায় যাইবে।' একজন মাত্র ইহার উল্টা কথা বলিলেন,—ডাক্তার দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলিলেন, 'সেইরূপ করার পর, পিতার মৃত্যু হইলে, আপনি চিরকালই মনে করিতেন, ডাক্তারবাবু সই করাতে সম্মতি দেওয়াতেই পিতা জীবনে হতাশ হন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সই করিলে, এই শেল আপনাকে বহুকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকিতে হইত। ডাক্তারবাবু যে সই

* কোম্পানির কাগজগুলির জন্য Succession certificate লইতে ১,০৬০৲ টাকার কোর্ট ফি লাগিয়াছিল।

করিতে দেন নাই, তাহাতেই তিনি আপনার মহোপকারী বন্ধু।'—কথাটায় আমার চক্ষু ফুটিল। এমন দুর্দৈবে অনেককেই পড়িতে হয়, ডাক্তার দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা কয়টি তাঁহাদের শুনিয়া রাখা ভাল বলিয়া, এই স্থানেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমরা সামান্য গৃহস্থ। পিতা চাকরী করিতেন মাত্র, অথচ নামডাক খুবই ছিল; আমাকে সেই নামডাকের মতন করিয়াই শ্রাদ্ধ করিতে হইল। পিতা গভীর প্রকৃতির রাশভারি লোক হইয়াও হাস্যরসে রসিক ছিলেন। দু'দণ্ড তাঁহার কাছে বসিলে, মহাদুঃখীও হাসিতে থাকিত। তাঁহার জীবনের শেষ কথা বলিতে মহা বিষাদ-কাহিনী গাঁথিয়াছি। অতএব একটা হাসির কথা বলিয়া, এখন সেই সদানন্দের জীবনী শেষ করি। পিতার শ্রাদ্ধে আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের জন্য আতপ তণ্ডুল, গব্যঘৃত, দুগ্ধ, মটরের দাল, কাঁচাকলা প্রভৃতি হবিষ্যান্নে যাহা চাই সেইরূপ নিরামিষ আহারের জোগাড় রাখিয়াছিলাম। নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় ভুবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন জোগাড় দেখিয়া বলিলেন, 'কৃতীর পিতৃবিয়োগ, আমরা করিব হবিষ্য!—এ ব্যবস্থা কে দিলে হে?' আমি মনে করিলাম, আমার পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হয় নাই; কেন-না এই কথা শুনিয়া পিতা যোগ্যধামে থাকিয়া নিশ্চয়ই উচ্চহাস্য করিয়াছেন। কাজেই শ্রাদ্ধ সার্থক হইয়াছে।

২৬-এ আষাঢ় ১৩১১

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার
কদমতলা, চুঁচুড়া

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

উদ্দীপনা

[সাহিত্যাচার্যের লিখিত প্রথম প্রবন্ধ—১. ১. ১২৭৯]

ক

ভারতবর্ষে অনেক ভাল বস্তু ছিল, তাহার অনেক একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, অনেক লুপ্তপ্রায়, অনেক নির্জীব ও মরণাপন্ন ও অনেক বিকৃত-ভাবাপন্ন। আবার অনেক ভাল বস্তু ছিল না, কিংবা মধ্যে মধ্যে হইয়াছিল মাত্র। যাহা ছিল তাহা আবার হইবে, কিন্তু যাহা ছিল না, না-থাকাতে এত সর্বনাশ, অথবা যাহা ছিল, থাকাতেই এত সর্বনাশ, তাহারই অনুসন্ধান করা আমাদিগের কর্তব্য। অনুসন্ধান করিয়া যে ভাল বস্তুটি ছিল না, তাহা কিসে সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা, যদি প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে অতি যত্নপূর্বক তাহার পোষণ করা অতি কর্তব্য। যে মন্দ বস্তুটি ছিল, তাহা যদি এখন আর না থাকে, তবে যাহাতে সেটি আর পুনঃপ্রবেশ করিতে না পারে, এমন সাবধান হওয়া উচিত, এবং যে মন্দ বস্তুগুলি এখনও জীবিত রহিয়াছে, সেগুলি যাহাতে সমাজ হইতে একেবারে উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা যুক্তিযুক্ত।

এই একটি ভাল বস্তু ছিল না। এটি সমাজের স্বাস্থ্য-জন্য থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। 'ছিল না' এই শব্দটি ন্যায় মতের 'অভাব পদার্থ'-জ্ঞাপক বোধ করিতে হইবে না। 'আমার রোগে রোগে আর শরীরে কিছুমাত্র বল নাই' বলিলে, বলের নিরবচ্ছিন্ন অভাব বুঝায় না। যতটুকু বল শরীরের সহজ অবস্থায় থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সেটুকু নাই বুঝিতে হইবে। সেইরূপ সমাজ-সম্বন্ধেও বুঝিতে হয়।

আমাদের এই একটি ভাল বস্তু ছিল না—উদ্দীপনা-শক্তি ছিল না। ডিমস্থিনিস, কাইকিরো—আমাদের একজনও ছিল না। [যে বাক্‌শক্তি ইউরোপে এলোকোয়েন্স বলিয়া প্রতিষ্ঠিত তাহা আমাদের ছিল না।] অলঙ্কারকারেরা উদ্দীপন-বিভাবের বর্ণন ও লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। উদ্দীপন-বিভাবকে তাঁহারা রসের একটি অঙ্গ বলেন। রসকে কাব্যের সারভূত পদার্থ বলেন। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।' কিন্তু কবিতা-শক্তি ও উদ্দীপনা-শক্তি—দুইটি যে বিভিন্ন একথা সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন না। যেমন কাব্যের সার—রস, তেমনি উদ্দীপনার সারও—রস। কাব্যসার রস যেমন করুণ, বীর প্রভৃতি নানা ভাগে তাঁহারা বিভক্ত করিয়াছেন, উদ্দীপনার সার রসও ঠিক সেইরূপ নানা ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কাব্যরস-বর্ণনে যেমন আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি বিভাবের আবশ্যকতা এবং যেমন নানাপ্রকার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব উদিত হয়, সেইরূপ উদ্দীপনারসেও আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি নানা ভাবের আবশ্যকতা এবং তাহাতেও সেইরূপ নানাপ্রকার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব উদ্ভূত হয়। আপাতদৃষ্টিতে কবিতা ও উদ্দীপনা এক বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহারা সহোদরা মাত্র। এক গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া দুইজনে কালে দুই বিভিন্ন গোত্রে পরিণীতা হইয়াছেন। এক্ষণে দুইজনের বিভিন্ন গোত্র বলিতে হইবে। উদাহরণে শীঘ্র বুঝা যাইবে। একই বিষয় উদ্দীপনা কিরূপভাবে বলেন, শুনুন; আর কবিতাই-বা কিরূপে বলেন, পরে শুনিবেন। উদ্দীপনা বলিতেছেন—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরে গলায় হে,
কে পরে গলায়॥

যবনের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,

ক্ষত্রিয়-তনয়।

এ কথা যখন হয় মনেতে উদয় হে,

মনেতে উদয়॥

* * *

অই শুন অই শুন ভেরীর আওয়াজ হে,

ভেরীর আওয়াজ।

সাজ' সাজ' সাজ' বলে সাজ' সাজ' সাজ' হে,

সাজ' সাজ' সাজ'॥

(পদ্মিনী-উপাখ্যান)

সেই স্বাধীনতা-বিষয়েই আবার কবিতা কি বলেন, শুনুন—

—সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। বঙ্গজয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয়-অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম। আকাশের সামান্য নক্ষত্রটিও অস্ত গেলে পুনরুদিত হয়।

(মৃণালিনী)

দুইটিই রসাত্মক বাক্য; কিন্তু প্রথমটি কখনই আপনা আপনি বলা যাইতে পারে না। কোন এক বিশেষ ব্যক্তি যে ইহার উদ্দেশ্য, তাহার আর সংশয় নাই। রসাত্মক বাক্য বটে, কিন্তু বক্তার সম্মুখে একজন শ্রোতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়টি স্বতঃস্খলিত রসাত্মক বাক্য-মাত্র। হইতে পারে, কবি যখন ঐ কথাগুলি কণ্ঠ হইতে বহির্গত করিতেছিলেন, তখন অনেক লোক তাঁহার নিকটে ছিল ও সেই কথা শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনই তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া সে কথাগুলি উচ্চারণ করেন নাই। তিনি আপনি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ শুনিল কিনা, তাহাতে তাঁহার মনোযোগ নাই।

কিন্তু উদ্দীপনা সর্বদাই লোককে ডাকিয়া কথা কন। পরের মনোবৃত্তি-সঞ্চালন, ধর্ম-প্রবৃত্তি-উত্তেজন, অন্যের মনের রস-উদ্ভাবন, অন্যকে কোন কার্যে লওয়ানো, এইরূপ একটি-না-একটি তাঁহার চির উদ্দেশ্য। তিনি সর্বদাই ডাকিতেছেন। নিজ মন হইতে একটু রস তোমার মনে ঢালিয়া দিলেন, তুমি হয়ত সাহসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে, কখন-বা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলে, কখন-বা তুমি ক্রন্দন করিয়া উঠিলে। উদ্দীপনা চরিতার্থ হইলেন। তিনি যে-রস তোমার মনে উদ্দীপন করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা করিলেন; সুতরাং চরিতার্থ হইলেন। কবিতা সেই প্রকৃতির নহেন। তিনি কাহাকে ডাকেন না, নিজে হাততুলিয়া কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না। তিনি কখন বসন্ত-সন্ধ্যা-বাতান্দোলিতা, প্রস্ফুটিতা—ভূরি প্রস্ফুটিতা, সদ্যোজলসিক্তা, ক্বচিৎ ভ্রমরভর-স্পন্দিতা যূথিকা লতারূপে বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন—কাহাকে ডাকেনও না, কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না। চতুর্দিক্ গন্ধে আমোদিত হইতেছে; তিনি সেই গন্ধ বিস্তার করিয়াই সুখানুভব করিতেছেন—তাহাতেই চরিতার্থ হইতেছেন। সে গন্ধ কেহ ঘ্রাণ লইল কিনা, সে শোভা কেহ দেখিল কিনা, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তুমি নিকটে যাইবামাত্র গন্ধে ভোর হইলে, সেই অতুল শোভা দেখিয়া তোমার নয়ন তৃপ্ত হইল, তোমার মানস মোহিত হইল, তুমি চরিতার্থ হইলে; লতার তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই—লতা ফুটিয়াই চরিতার্থ হইয়াছে। কবিতা কখন-বা জ্বলন্ত অনলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ধূউ ধূউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, শোঁও শোঁও করিয়া শব্দ হইতেছে, মধ্যে মধ্যে চট্‌চট শব্দে কর্ণকুহর বধির হইয়া যাইতেছে, সহস্র শিখা গগন স্পর্শ করিয়াছে, চারিদিকে স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে, তেজে দিঙ্মণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, উত্তাপ ক্রমেই চারিপার্শ্বে বিস্তার করিতেছে। কবিতা রূপ ধারণ করিয়াই চরিতার্থ হইতেছেন।

তুমি দূর হইতে ব্রহ্মমূর্তি দেখিতে পাইলে, ভয়বিস্ময়ে তোমার চিত্ত পরিপূরিত হইল, তুমি নিকটে গেলে, উদ্গীরিত উত্তাপে তোমার গাত্র অভিষিক্ত হইল। যদি তুমি শীতার্ত হও তোমার সুখস্পর্শ হইল। পতঙ্গবৎ অতি নিকটে যাও, তুমিই অবিলম্বে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে—কিন্তু প্রচণ্ড অগ্নির তাহাতে কিছুই হইবে না। কখন-বা কবিতা

প্রেতভূমিরূপ ধারণ করিয়া নদীকূলে শয়ন করিয়া থাকেন। রাশি রাশি অঙ্গার বিকীর্ণ রহিয়াছে, অঙ্গারে অর্ধপূরিত চুল্লী, অর্ধদগ্ধ বংশখণ্ড; অর্ধভগ্ন, অল্পভগ্ন, সচ্ছিদ্র, অচ্ছিদ্র মৃৎকলস কত গড়াগড়ি যাইতেছে; কোনটার ভিতর সন্ধ্যা-বায়ু প্রবেশ করাতে হো-হো করিয়া শব্দিত হইতেছে; সমস্ত স্থান অস্থি-কপাল-কঙ্কাল-কেশ-পরিপূরিত। দক্ষিণে জলসমীপে একটি চিতা জ্বলিতেছে। এক ব্যক্তি একটা বাঁশ লইয়া একটি চিতাস্থিত শবের উদরে বেগে আঘাত করিল; শব দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিল—তোমার বোধ হইল যেন হাত নাড়িয়া বারণই করিল। তুমি পলায়ন-পর হইয়া বাম দিকে দেখিলে; দেখিলে ভগ্ন খাটের উপরে প্রৌঢ়া মাতা অপোগণ্ড নবকুমার শিশুকে বটতলায় শোয়াইয়া ছন্দেবন্ধে ক্রন্দন করিতেছেন। দূরে বোধ হইল একজন লোক বসিয়া আছে। নিকটে গেলে। একি! সদ্যোমৃত শব হেলান দিয়া বসানো রহিয়াছে। তুমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিহরিয়া উঠিলে। একটা কৃষ্ণকায় কুকুর তোমার সেই চাহনি দেখিল; ঐ শবের দিকে দেখিল; উভয়ে কি প্রভেদ যেন কিছুই না বুঝিতে পারিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা-সমীরণ-সঞ্চালনে তোমার কর্ণমূলে কে-যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, কলসের হো-হো শব্দে কে-যেন হো-হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তুমি আড়ষ্ট, আস্তব্ধ, নিষ্পন্দ, তুষ্ণীভূত, চকিত-ও-স্থগিত-নেত্র। দূরে একটি শিবারব তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল। তুমি চারিদিকে দেখিয়া ভয়, বিস্ময়, বিরাগ, জুগুপ্সা-পরিপূরিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে। তোমার এত ভাবান্তর হইল, শ্মশানের কি হইল? কিছুই নহে।

কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা রসাত্মিকা অন্যোদ্দিষ্টা কথা। সুতরাং নির্জনে বিরলে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি এবং অনেক লোকের সহিত আলাপ ও কথোপ-কথনেই উদ্দীপনার জন্ম হইয়া থাকে। কেন পূর্বতন কালে আমাদের কবি—পুঞ্জ পুঞ্জ কবি ছিলেন ও একজনও উদ্দীপক ছিলেন না, তাহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয়দের মত বোধ হয় এমন নির্জনস্পৃহ জাতি, এমন নির্জন-চিন্তাস্পৃহ জাতি পৃথিবীতে আর ছিল না, এখনও বোধ হয় আর নাই। বোধ হয় এই জন্যই এত কবি—প্রকৃত কবিপদবাচ্য কবি—এক দেশে এত আর কখনই জন্মে নাই। আজিও কোথাও জন্মিতেছে না।

সংসার ভালমন্দ-মিশ্রিত, সুখদুঃখ-জড়িত। যেখানে গুণ আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দোষ আছে; নিরবচ্ছিন্নতা, পূর্ণতা, অত্যন্তাভাব—এগুলি আধ্যাত্মিক পদার্থবাচক, সাংসারিক অবস্থাজ্ঞাপক নহে। এক দিকে কিছু বেশি লাভ হইয়াছে কি, অন্য দিকে সেই পরিমাণে ঠিক না হউক, কতক ক্ষতি অবশ্যই হইয়াছে। জগতের জমাখরচ সকল সময় ঠিক মিল থাকে কিনা তাহা বলা যায় না, কিন্তু কারবার চল্‌তি। কোনও কুঠিতে আজি মাল আমদানি হইল, জমার অঙ্ক খরচের অঙ্ক হইতে দেখিতে অনেক বেশি বোধ হইতেছে, অন্য কুঠিতে সেই সময় এত বিলাত-বাকি যে সে কুঠি চালানো ভার। কিন্তু সমস্ত জগতের কারবার চিরকালই চল্‌তি। সামান্য খণ্ডসমাজেও সেইরূপ। যাঁহার উপর লক্ষ্মীর কৃপা হইয়াছে, সপত্নী সরস্বতী তাঁহার দিকে প্রায় চাহিয়া দেখেন না; লক্ষ্মী আবার তেমনি সপত্নী-বরপুত্রদের পল্লীতেও পদার্পণ করেন না। যশোধন, মানধন্য পণ্ডিতপ্রবর অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা লইয়া বিব্রত; দাসদাসী-পরিবেষ্টিতা রূপযৌবন-সম্পন্না সুশীলা সতী মাদক-সেবন-শীল উদ্ধত স্বামি-নিগ্রহে দিন দিন ম্রিয়মাণা হইতেছে। কেহ-বা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, আয়াসসাধ্য যাগ করিয়া একটি পুত্রের কামনা করিতেছে, অন্য এক ব্যক্তি সোণার চাঁদ ছেলেদিগকে, ননীর পুতলি মেয়েগুলিকে দু'বেলা দুটো মাছেভাতে, পূজার সময়ে এক একখানি নীলেছোবানো কোরা কাপড় দিতে পারিতেছে না। এই জন্যই কেহ শীঘ্র অবস্থা পরিবর্তন করিতে চায় না। কিন্তু তবু যদি উচ্চরবে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনার অবস্থায় কে অসন্তুষ্ট?'—প্রতিধ্বনি অমনি তখনি মুখের উপর উত্তরচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিবে, 'হায়! কে সন্তুষ্ট?'—সকলেই অসন্তুষ্ট, সকলেই সন্তুষ্ট। জগতের একটি বিচিত্র কৌশলই এই, যদি এক দিকে কিছু কম থাকে, নিশ্চয় আর এক দিকে কিছু বেশি আছে।

আমাদের অনেক কবি ছিলেন, অনেক কাব্য ছিল, সেই জন্যই আমাদের দেশে একজনও উদ্দীপক ছিলেন না—

উদ্দীপনা ছিল না। যে নিভৃত-চিন্তা কবিতা থাকার কারণ, সেই নির্জনস্পৃহাই উদ্দীপনা না-থাকার কারণ। সেই নিভৃত-চিন্তাই এখনও আমাদের বাঙ্গালি জাতিকে গুমরে গুমরে পোড়াইতেছে। এই যে, সমস্ত বঙ্গজাতি টপ্পাগান-প্রিয়, তাহাতে কি বুঝায়? বুঝায়—এদেশে এখনও উদ্দীপনার বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই; আপনার কথা আপনি বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত, তাহাই যথেষ্ট এবং তাহাতেই আমাদের চরিতার্থতা।

ভারতবর্ষীয়েরা যেমন নির্জনস্পৃহ ছিলেন, তেমনি স্বতঃসন্তুষ্ট ছিলেন। ভাল-মন্দ উভয়েই প্রয়োজনের অনুচর। সংসারে, সমাজে, গৃহে, আচরণে সকল বিষয়েই প্রয়োজন একা শাসনকর্তা। প্রয়োজনই সর্বেসর্বা। বস্তুবিক প্রয়োজনের নিকট ধর্মশাস্ত্রকেও পরাজিত হইতে হয়, প্রয়োজন-শাসন সর্বাপেক্ষা গরীয়ান্। এই জন্যই আমাদের সামান্য কথায় বলে যে 'গরজের উপর আইন নাই।' এই জন্যই সামান্য কথায় বলে যে 'অরে তুই প্রহর বেলা সিঁধ কাটিতেছিস যে?' না, 'আমার গরজ।' কিন্তু প্রয়োজনে যেমন মন্দ বস্তু হয়, তেমনি ভাল বস্তুও হয়। ভারতবর্ষীয়েরা স্বতঃসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের কিছুই আর নূতন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং অনেক মন্দ বস্তুও জন্মে নাই, অনেক ভাল বস্তুও জন্মে নাই। উদ্দীপনাও জন্মে নাই।

খ

ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বতঃসন্তুষ্ট জাতি ছিলেন, তাহা ভারতের যাহাকিছু পর্যালোচনা করিবেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। ভারতের সমাজ-ভাগ দেখুন। ব্রাহ্মণে নিভৃতে চিন্তা করিলেন, বিবেচনা করিলেন, ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষত্রিয় বিদেশীয় শত্রুর বাহ্য আক্রমণ নিবারণ করিলেন, দস্যু হইতে আভ্যন্তরিক রক্ষা করিলেন। বৈশ্য বাণিজ্যে কৃষিকার্যে জীবন যাপন করিলেন। শূদ্র দাস। সমাজের ভাগ যেন ভূগোলের ভাগ। চারিটি খণ্ডদেশ লইয়া যেমন একটি দেশ, তেমনি চারিটি জাতি লইয়া একটি হিন্দু জাতি হইল। ঠিক যন্ত্রের মত সমুদয়। প্রয়োজন নাই, অভাবও নাই, কষ্টও নাই। কে কাহার মনে কি উদ্দীপন করিতে যাইবে? প্রয়োজন কি? জীবনে দেখুন, —ব্রাহ্মণ-শিশু আট বৎসর বা দশ বৎসর পর্যন্ত পিতামাতার ক্রোড়ে বর্ধিত হইলেন। উপনয়ন হইল। সেইটি তাঁহার বিদ্যারম্ভ। তিনি তখন ব্রহ্মচারী। [বোর্ডিং ইউনিভার্সিটির বোর্ডার।] কেহ বার বৎসর, কেহ ষোল, কেহ বিংশতি বৎসর পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, বিবাহ করিলেন। ক্রমে স্থবির বয়সে বনে গেলেন। নদীস্রোতের ন্যায় জীবনস্রোত। পিতামাতার অনুকরণ করিলেই শাস্ত্রানুযায়ী কার্য করা হইল। যুক্তি এবং স্বার্থও তাহার বিপরীত কিছুই বলিতে পারিত না। সুতরাং যুক্তি- এবং স্বার্থ-সঙ্গতও হইল; সমাজ সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে লাগিল।

এদিকে দেখুন, বসুন্ধরা ভূরি শস্যপ্রসূতি; খনী রত্নগর্ভা; ভারত ফলফুলের উদ্যান বলিলেই হয়। কথায় বলে, পৃথিবীর সকল জিনিসের নমুনা ভারতে আছে। পূর্বকালে যে সেইরূপ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিছুরই অভাব নাই। প্রয়োজন নাই। সুতরাং যাহার কাহাকে কিছুই বলিতে হইল না, তাহার উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে? তিনি কবি হইলে হইতে পারেন। হায়! রোগ-শোক-দুঃখ-জরা-মরণ-সঙ্কুল পৃথিবীতে কবি নয় কে? সকলেই এক-সময়ে-না-এক-সময়ে কবি। যাঁহার লেখাপড়া বোধ আছে, যিনি আপনার মনের ভাব ভাষায় সুন্দররূপে গাঁথনি করিতে পারেন তিনিই প্রকাশ্য কবি। কিন্তু অন্তরে সকলেই কবি। যিনিই মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে 'হায়! বুঝি হরাইলাম!' বলিয়াছেন, তিনিই অন্তরে কবি। এক্ষণে অন্তরে কবি নয় কে? তাহাতেই বলি, হায়! রোগ-শোক-দুঃখ-জরা-মরণ-সঙ্কুল পৃথিবীতে কবি নয় কে? আবার এ দিকেও বলি, ও-হো-হো! সুখ-শান্তি-সৌন্দর্য-শোভা-প্রীতি-পূরিত মজার সংসারে কবি নয় কে? আমরা সকলেই অন্তরে কবি। কোন নারীর স্নেহ, আদর বা প্রীতিতে গলিয়া গিয়া, যিনি 'মা', 'দিদি' বা 'প্রেয়সী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনিই অন্তরে কবি। যে হাসে নাই, কাঁদে নাই—সে মনুষ্য নয়—জীবন্ত পুতুল। মনুষ্যমাত্রেই অন্তরে অন্তরে কবি। সংসারে নানা রস ছড়ানো রহিয়াছে, অবস্থানুসারে তিক্ত, মিষ্ট, লবণ

আস্বাদন করিতে হইতেছে। মানব যদি কুশিক্ষায় অরসিক, অভাবুক না হইয়া থাকেন, তাঁহাকে কবি হইতেই হইবে। কবিত্ব মনুষ্যের স্বভাবধর্ম। উদ্দীপনা সেরূপ নহে, ইহা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রূপে পরিণত, বর্ধিত ও পুষ্ট হয়।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতে উদ্দীপনার বীজ মৃত্তিকা আশ্রয় করিতে পারে নাই। স্রোতের বলে কয়বার চরে লাগিয়াছিল ও সেই কয়বারই বীজ অঙ্কুরিত, লতা পল্লবিতা ও পুষ্পিতা এবং বোধহয় ফলভরেও অবনতা হইয়াছিল। পুরাবৃত্তের কোন্ কোন্ স্থানে এইরূপ ঘটনা হয়, তাহাও আমাদের দেখা বিশেষ কর্তব্য। কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ জলবায়ুতে বীজ অঙ্কুরিত ও লতা বর্ধিতা হয়, তাহা না জানিলে কখনই আমরা কৃষিকার্যে সফলতা লাভ করিতে পারি না; সেই কৃষিকার্যও এখন বিশেষ আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতের একগতিস্রোতোবাহিনীতে আমরা বড় অধিক দিন বা অধিক বার সঞ্চরণ করি নাই। ভারত নদী-বিপুল; চর দেখিয়াই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র তরী সেই প্রবাহে বিসর্জন করিতে ভরসা পাই। নাবিক পাই নাই, পাইলট পাই নাই, সুতরাং কয়টি বৃহৎ বৃহৎ চরে লাগাইয়া, সেই কয়টি দেখিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রায় কখনই লক্ষ্যে পড়ে নাই। যদি কখন দূরে একটি কালো মেঘের মত মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাকি—ভরসা করিয়া যাইতে পারি নাই; আর পাঁচজন সঙ্গী পাইলেও-বা ভরসা হয়। তা কে কোথায়, কাহাকেও দেখি না। তখন ভয়ে বিষাদে বাগশ্রীতে বলিতে হয়,—

'তরি নাহি দেখি আর,
চারিদিকে অন্ধকার,
বুঝি প্রাণ যায় এবার
ঘূর্ণিত জলে।'

এইরূপ অবস্থায় একবার একজন বিলাতি পাইলটের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহাকে দেখিয়া মনে কিছু ভরসা হয়। সাহেবেরা নৌ-বিদ্যায় কিছু পটু, তাহাতে জাতিতে ইংরাজ, সাহসও বিলক্ষণ আছে। পাইলট অগ্রে অগ্রে চলিলেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। সাহেব আমাদিগকে বলিলেন, ঐ যে দূরে চর দেখিতে পাইতেছ, ঐটি মহাভারত, আর তাহার এদিকে এই যে দেখিতেছ, এইটি রামায়ণ। আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। দ্বাপরের পর ত্রেতা যুগ হইল, এ যে ঘোর কলি! সাহেবের প্রতি একেবারে অশ্রদ্ধা জন্মিল। তখন সেই পূর্বের গানের মোহাড়াটি গাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

'কোথায় আনিলে হে
পথ ভুলালে হে।'…

সেই অবধি আর কাহারও সঙ্গে ভারত-নদীতে যাই না।

গ

পরশুরামের ক্ষত্রিয়-প্রাদুর্ভাব-দমন-সম্বন্ধে আমরা পৌরাণিক আখ্যায়িকা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। কিন্তু তাহার পর রাম অবতার। দক্ষিণ-বিজয়ই রামায়ণ-যুদ্ধ। যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-মধ্যে আর রাজ্য লইয়া বিবাদ ছিল না, যখন সমুদয় আর্যাবর্তে আর্যসন্তানেরাই বাস করিতেছিল তখনই রামায়ণের ঘটনা সমস্ত ঘটে।

তখন দাক্ষিণাত্য অনার্য-ভূমি; রামচন্দ্র, যে উদ্দেশ্যেই হউক, এই অনার্য-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ইহার সীমান্তবর্তী লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত বিজয় করেন। আর্যাবর্তের সীমা ছাড়াইয়াই, নির্জনস্পৃহ আর্য মুনিগণের তপোবন ছাড়াইয়াই, রাম এক জাতি দেখেন। এ জাতি অতি প্রাচীন; আর্যেরা ইহাদিগকে জানিতেন। আর্যগণের পীড়নে ইহারা বহিষ্কৃত হইয়া—উত্ত্যক্ত হইয়া দক্ষিণে বাস করিতেছিল। আর্যেরা ইহাদিগকে মাংস-প্রলোভী জানিয়া ঘৃণা করিত ও চণ্ডাল বলিয়া হেয় অভিধান দিয়াছিল। শ্রীরামকে স্বকার্য-উদ্ধার-জন্য এই জাতির সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইয়াছিল। রামায়ণের এই ঘটনাই গুহক চণ্ডালের সহিত মৈত্র-নিবন্ধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরে এক অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যাইয়া, কোন দলের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই দলকে পরাজয় এবং কোন দলের সহিত-বা সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন। ইহাই রামায়ণে বালিবানর-বধ ও

সুগ্রীবসহ বন্ধুত্ব বলিয়া বর্ণিত। চণ্ডালেরা হিন্দু-সমাজ-বহিষ্কৃত বটে, কিন্তু বানরগণের ন্যায় অসভ্য নহে। তবে বানরগণ চণ্ডালগণ অপেক্ষা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ; কেন-না তাহারা দাক্ষিণাত্যের আদিমবাসী ; চণ্ডালগণের ন্যায় আর্য-নির্বাসিত জাতি নহে। পরে রামচন্দ্র নরমাংসলোভী, নরমাংসভোজী বিকৃতাকার এক জাতিকে প্রায় একেবারে লোপ করেন। ইহাই রাবণের সবংশে বধ। ইহারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। যেমন আমেরিকার নরকপাল-সংগ্রহকারী, নরবলি-প্রতিষ্ঠাকারী কোন কোন জাতির মধ্যে অনার্য সমৃদ্ধির বিশেষ পুষ্টি হইয়াছিল, রাক্ষসদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। আর্যগণের ন্যায় তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বিভাগ ছিল না। সকলেই যোদ্ধা ও ধনুর্ধারী, বেদাচার-বহির্ভূত অথচ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। রামায়ণ-ঘটনার স্থূল মর্ম এই, কিন্তু এগুলি গুরুতর ঘটনা—বৈদিক একজাতির রোধকারী। ইহাতেও বৃহৎ চর উৎপন্ন হয়। রামকে (তিনি একজনই হউন, আর অনেকজনই হউন) একটি অসাধারণ বিপ্লব করিতে হইয়াছিল। যে চণ্ডালকে দর্শন করিতে নাই, তাহার সহিত বন্ধুত্ব। সামান্য বর্ণনে বলে, গুহক চণ্ডালের সহিত কোলাকুলি। কন্দমূল-ফলাশী বানর-সদৃশ জীবের হৃদয়ে বীররসের উদ্ভাবনা, পৃথক্ পৃথক্ নানা অসভ্য দলকে একত্র করা। সেই সামান্য অসভ্য জাতির সাহায্যে আমমাংসলোভী, অতিবিক্রম-শালী জাতিকে একেবারে উচ্ছিন্ন করা—শ্রীরামচন্দ্রের কার্য। পরের চিত্তবৃত্তির উপর, পরের সাহায্যের উপর, লোকের শ্রদ্ধার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। নিভৃত-চিন্তা, নির্জনে তারস্বরে বেদপাঠ, আচার্য-নিকটে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বর্ষে বর্ষে একবার নিজ পরিজন-সমভিব্যাহারে অযোধ্যা-সংলগ্ন শালতালবনে মৃগয়া প্রভৃতি নিয়মিত কার্য করিয়াই তাঁহার জীবন পর্যবসিত হয় নাই। তিনি স্বীয় অসীম ক্ষমতা-প্রভাবে আর্যবৈরী, প্রভূতবিক্রমশালী (যে বিক্রম-বর্ণন-জন্য আর্যমুনি আর্যদেবগণকে সেই জাতির দাসত্বে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন) সেই জাতিকে একেবারে ভারতবর্ষ-নিকটস্থ দ্বীপ হইতেও নির্মূল করিয়াছেন। আর্যসন্তানেরা সেই কীর্তি মনে করিয়া অদ্যাপি তাঁহাকে সপ্তমাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা করে। অদ্যাপি তাঁহার নাম মহান্ ঈশ্বর শব্দের প্রতিশব্দ। অদ্যাপি রামজি হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কিন্তু এই ত্রেতাবতার রামচন্দ্র মানবীয় উপায় অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হয়েন। তাঁহার চরিত্র অসাধারণ, অলৌকিক নহে। মনুষ্য যে উপায় অবলম্বন করিয়া পরের সাহায্য প্রাপ্ত হয়, রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। পরের সাহায্য না পাইলে কখনই মহৎ কার্য সুসাধিত হয় না এবং অন্যে কর্তার মনোভাবে সমভাবী না হইলে প্রাণপণে সাহায্য করে না। আন্তরিক সাহায্য নহিলে সাহায্যই নহে। এক ব্যক্তির মনোভাবে আর এক ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে সমভাবী কে করে? রস ঢালিয়া দিয়া পান করিতে কে বলে? কেবল রস অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া রস উদ্দীপন করিতে চায় কে?—উদ্দীপনা। প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই এই রামায়ণ-চরে, দক্ষিণ-বিজয়-চরে, রাবণ-বধ-চরে, রাক্ষস-ধ্বংস-চরে, যাহাই নাম দিউন, এই স্থানে প্রয়োজন, বিপদুদ্ধার, মহৎ কার্যসাধন এই সকল জলবায়ুর গুণে উদ্দীপনার বীজ অঙ্কুরিত হয়। সে লতা বহু-পল্লবিতা, ভূরি-মনোহর-কুসুম-শোভিতা হইয়াছিল। সে ফুলের মালা এখনও রামায়ণের পাতে পাতে সাজানো রহিয়াছে। রামায়ণ-গ্রন্থ রামের সমকালিক। রামায়ণ-কাব্য স্থানে স্থানে উদ্দীপনাপূর্ণ। রামোপ্তা উদ্দীপনা-লতা তাবৎ ভারত ব্যাপিয়া ছিল, কবিগুরু বাল্মীকি তাহারই গুটিকতক অক্ষয় কুসুম তুলিয়া গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই লতা কতদিন জীবিত ছিল? তাহা কে বলিতে পারে। যে দেশে মৌনব্রতাবলম্বী মুনিগণকে দেবসদৃশ ভক্তি করে, সে দেশে উদ্দীপনা কতদিন জীবিতা থাকিবে? কিন্তু আমরা এ সময়ের কিছুই জানি না। রাবণ-নিপাতকারী রাঘব-বংশের—সেই সূর্য-বংশের প্রাদুর্ভাব কিসে হ্রস্ব হইয়া চন্দ্রবংশের শ্রীবৃদ্ধি হইল তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ভারত-নদীতে আর সহস্রেক বৎসর এ দিকে বাহিয়া আসিয়া আমরা আর একটি বৃহৎ চর দেখিতে পাই। চর দেখিলেই আশা হয়। অবশ্য নানা তরুলতা আছে। হয়ত উদ্দীপনার লতা আছে। এ চরটি ভারতযুদ্ধ চর।

ঘ

এই সময়ে বিস্তীর্ণ আর্যাবর্তে নানা জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। আর্যক্ষেত্রে সুত, মাগধ, বল্লব, গোপ, সুপকার প্রভৃতি নানা আগাছা পরগাছা জন্মিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী, নাগকন্যা, আভীরী প্রভৃতি কত জঙ্গলী লতা উদ্ভূতা হইয়াছে, আর্যক্ষেত্রের চতুষ্পার্শে শক, খশ, দরদ, বাহ্লীক, চীন, যবন প্রভৃতি নানা অনার্য জাতি দিন দিন বিক্রম বিস্তার করিয়া আপনাদের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। ভারতরাজ্য—খণ্ডরাজ্য, উপরাজ্য, মণ্ডল, ছত্র, নগর, গ্রাম-বিভেদে একেবারে চূর্ণীকৃত হইয়াছে। চোল, কোল, চোর, মণ্ডল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মথুরা, ত্রিগর্ত, মৎস্য, সৌরাষ্ট্র, মরুকচ্ছ, সিন্ধু, সৌবীর প্রভৃতি নানা দেশ, নানা রাজা। পরস্পরে একতা নাই, সৌহার্দ্য নাই।

এই সময়ে অষ্টম যমলাবতার কৃষ্ণার্জুন জন্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিরবৈরী বেদদ্বেষী কংসরাজকে বিনষ্ট করিয়া যে-জরাসন্ধ স্বীয় কারাগারে ভারতের বীরগণকে অন্ধকারে বিনষ্ট করিতেছিলেন, যে-শিশুপাল স্বীয় দম্ভে ধর্মের অবমাননা করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য যুধিষ্ঠির-আদি পঞ্চ ভ্রাতার সাহায্য লইলেন। সেই পঞ্চ ভ্রাতা আবার আপনাদের চিরজ্ঞাতিশত্রু দুর্যোধন-কর্তৃক তাড়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। স্বার্থে দুই বিভিন্ন রাজাকে একত্র করিল। শ্রীকৃষ্ণের অর্থ সুসাধিত হইল, কিন্তু তৎপরেই জ্ঞাতিবৈর-যুদ্ধে সমস্ত ভারত দুই দলে বিভক্ত হইল এবং কুরুক্ষেত্রে তুমুল সংগ্রাম হইল। চূর্ণীকৃত ভারত অন্তত কিছুদিনের জন্য এক না হউক, দুই দল হইয়াছিল। এ গৃহবিবাদে আর কি মহৎ ফল ফলিয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু অশ্বমেধ পর্বের বর্ণনে বোধ হয় যে, সমস্ত সাম্রাজ্য একীকরণের চেষ্টা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই মহৎ কার্যের উদ্যমের কর্তৃগণকে আমরা দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছি—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, অর্জুন নরনারায়ণ। তাঁহার ভ্রাতৃগণ সকলেই দেবরূপী। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ঘটনা সমস্ত মহাভারত-প্রণয়নের সমকালিক বৃত্তান্ত। বেদব্যাসের গ্রন্থ মহাভারত-রামায়ণের ন্যায় সেইকালের উদ্দীপনা শক্তির প্রাচুর্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মহোদ্দীপক বেদব্যাসের গ্রন্থোক্ত শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের লেখায় একবার তুলনা করুন। ভারতোক্তা নায়িকা শকুন্তলার চরিত্রের সহিত নাটকের শকুন্তলা চরিত্রের একবার তুলনা করুন। উভয়েই সতী সাধ্বী পতিব্রতা—মানবমোহিনী শক্তিতে ভূষিতা। উভয়েই আশৈশব মুনিগৃহে পালিতা, মাধবী লতার সহিত উভয়েই বর্ধিতা, উটজপর্যন্তচারিণী হরিণী উভয়েরই সঙ্গিনী। উভয়কেই দুষ্মন্ত গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিয়া, ইচ্ছাপূর্বকই হউক আর বিস্মৃতি-ক্রমেই হউক, বর্জন করিলেন, অর্ধাঙ্গের ভাগিনী করিলেন না, সহধর্মিণী আখ্যা দিয়া মান বৃদ্ধি করিলেন না। কিন্তু এই আচরণে দেখুন, কবির শকুন্তলা কিরূপ ব্যবহার করেন। কবির শকুন্তলা রাজার গোপন ব্যবহার দুইবার স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়া পরে লজ্জাতে ঘৃণাতে নিবারিত হইয়া আপনার দুঃখ আপনিই প্রকাশ করিলেন। যথা—

রাজা। আর্যে, বলুন।

গৌতমী। এও গুরুজনের অপেক্ষা করে নাই, তুমিও বন্ধুজনকে জিজ্ঞাসা কর নাই। একলা একলার কার্যে অপরে কে কি বলিতে পারে?

শকুন্তলা। (আত্মগতা) না জানি আর্যপুত্র কি বলেন।

রাজা। (শুনিয়া সভয়) কি গা? উপন্যাস আরম্ভ করিলে নাকি?

শকু। (আত্মগতা) আ ছি-ছি! এঁর বচনভঙ্গী যে কেমন কেমন।

* * *

রাজা। কি, আমি এঁকে বিবাহ করিয়াছিলাম নাকি?

শকু। (সবিষাদ আত্মগতা) হা হৃদয়! যা ভয় করেছিলে, এখন তাই হলো!!

* * *

রাজা। হে তপস্বিগণ! ভাবিয়া চিন্তিয়াও ত ইঁহাকে পরিগ্রহ করা আমি মনে করিতে পারিতেছি না। তবে কৃক্ষত্রিয়ের ন্যায় কেমন করিয়া এই স্পষ্ট-গর্ভ-লক্ষণাকে গ্রহণ করি ?

শকু। (আত্মগতা) ছি-ছি! বিবাহেতেই সন্দেহ! এতদিনে আমার দূরারোহিণী আশালতা ছিন্ন হইল।

* * *

শকু। (আত্মগতা) তেমন অনুরাগই যদি এমন অবস্থান্তর-গত হলো তবে আর মনে পড়াইবার চেষ্টা করলেই-বা কি হবে ? তথাপি আপনাকে দোষমুক্ত করবার জন্য কিছু বলি। (প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র (এই অর্ধোক্তি করিয়া) অথবা এখন এ সম্বোধন উপযুক্ত হচ্ছে না।

পৌরব! পূর্বে আশ্রমপদে প্রণয়প্রফুল্ল-হৃদয়া আমাকে প্রতিজ্ঞাপূর্বক আদর ক'রে এখন এইরূপে প্রত্যাখ্যান করা কি তোমার উপযুক্ত ?

* * *

শকু। ভাল, যদি যথার্থই পরস্ত্রী-গ্রহণ শঙ্কা ক'রে তুমি এরূপ করছ, তবে আমি কোন অভিজ্ঞান-দ্বারা তোমার আশঙ্কা দূর করি।

রাজা। উত্তম কথা।

শকু। (অঙ্গুলি দেখিয়া) হায় হায়! লতে অঙ্গুরীয় নাই যে! (সবিষাদ গৌতমীর মুখ-দর্শন।)

রাজা। (হাস্য করিয়া) একেই বলে স্ত্রীদিগের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

শকু। এ স্থলে এখন বিধাতাই প্রভুত্ব দেখালেন। ভাল, আমি তোমাকে আর কিছু বলছি।

রাজা। বল, শুনিতেছি।

শকু। একদিন বেতস-লতা-মণ্ডপে তোমার হস্তে পদ্ম-পত্রে জল ছিল ?

রাজা। তারপর বল শুনি।

শকু। সেই সময়ে সেই দীর্ঘাপাঙ্গ নামে আমার কৃতপুত্র মৃগশাবক এল। 'এই আগে পান করুক,' এই ব'লে তুমি আদর ক'রে তাকে জল পান করতে ডাকলে; কিন্তু সে অপরিচিত ব'লে তোমার হাত হতে জল খেতে এল না। তারপর আমি সেই জল নিলে সে ভালবেসে খেলো। তাতে তুমি হেসে বললে, 'সকলেই স্বজাতিকে বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই বন্য।'

রাজা। স্ত্রীলোকে আপন কার্য-সাধন-জন্য এইরূপ অমৃতমধুর মিথ্যা বচন-দ্বারাই বিষয়ী লোকদিগকে আকর্ষণ করে।

গৌত। মহারাজ! এরূপ মনে করিবেন না। তপোবনে পালিত এই সকল লোকেরা কৈতব জানে না।

রাজা। অয়ি তাপসবৃদ্ধে! পশুপক্ষীর মধ্যেও স্ত্রী-জাতির অশিক্ষিতপটুত্ব দেখা যায়, তবে পরিবোধবতীদিগের কথা আর কি বলিব ? দেখ, কোকিলগণ শাবকেরা আকাশে উড়িতে পারিবার পূর্বে আপনারা তাহাদিগকে অন্য পক্ষীর দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া লয়।

শকু। (সরোষে) অনার্য! এ কি আপনার হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখছ নাকি ? তুমি ধর্মচ্ছদ্মবেশী তৃণাচ্ছাদিত কূপের মত! অন্যে কে তোমার অনুকরণ করবে ?

রাজা। ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র প্রসিদ্ধ; আমার প্রজাদের মধ্যেও এমত দেখা যায় না।

শকু। তোমাদের কথাই প্রমাণ, লোকের ধর্মস্থিতিও তোমরা জান, লজ্জাজিতা মহিলারা কিছুই জানে না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তবে কি আমি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকা হয়ে এসেছি ?

গৌত। বাছা পুরুবংশে বিশ্বাস ক'রে মধুমুখ-গরলহৃদয় জনের হাতে পড়েছ।

শকু। (মুখে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন।)

শার্ঙ্গরব। গৌতমি! অগ্রসর হউন। (সকলে যাইতে লাগিলেন।)

শকু। এখন এই শঠ আমায় ত্যাগ করল, তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করবে ? (এই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন।)

শার্ঙ্গ। (ক্রোধে ফিরিয়া) দুষ্টশীলে! স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিতেছিস্।

শকু। (ভয়ে কম্পান্বিতা।)

শার্ঙ্গ। শকুন্তলে! তুমি শুন, রাজা যাহা বলিতেছেন, তাই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি কুলটা—তোমায় লইয়া কি হইবে? আর যদি আপনাকে তুমি শুচিব্রতা বলিয়া জানো, তাহা হইলে পতিগৃহে দাস্যবৃত্তিও তোমার ভাল।

পুরোধা। (চিন্তা করিয়া) যদি এইরূপ করেন …

রাজা। মহাশয়, আমাকে উপদেশ দিন।

পুরোধা। ইনি প্রসবকাল পর্যন্ত আমার গৃহে থাকুন।

রাজা। কেন?

পুরোধা। সাধুনৈমিত্তিকেরা বলিয়াছেন যে, আপনার প্রথম পুত্র চক্রবর্তী হইবে। যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ লক্ষণযুক্ত হয় তাহা হইলে ইঁহাকে সমাদরে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, তা যদি না হয়, তবে ইঁহার বাপের বাড়ী যাওয়াই স্থির।

রাজা। গুরুর যাহা অভিরুচি।

পুরোধা। (উঠিয়া) বাছা, আমার সঙ্গে এই দিকে আইস।

শকু। ভগবতি বসুন্ধরে! আমাকে অন্তরে স্থান দাও। (পুরোধা ও গৌতমীর সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে নিষ্ক্রান্তা।)

৬

ব্যাসের শকুন্তলা সে-প্রকৃতির নহেন, তিনি দুষ্মন্ত-কর্তৃক পরিবর্জিতা হইয়া ম্লানবদনে ছলছল নয়নে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে আশ্বাসকে বিসর্জন দিয়া প্রত্যাগমন করিবার মহিলা নহেন। তিনি লাঙ্গুলস্পৃষ্টা কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় মুখ ফিরাইয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন। গর্জন করিয়াই প্রত্যাবৃত্তা হইবেন?—তাহা হইলে ত কবির সৃষ্টা বীর-রস-প্রবলা নায়িকা হইলেন মাত্র। তাহা নহে, তিনি উদ্দীপনাকে স্মরণ করিয়া রাজাকে সম্বোধনপূর্বক নিজ মনোভাব তাঁহার কর্ণকুহর দিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেগে ঢালিয়া দিলেন। তিনি সফলাও হইলেন।

—মহারাজ সর্ষপপ্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিল্বপরিমিত আত্মদোষ দেখিতে পাও না? মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয়া ও আদরণীয়া, অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম যে উৎকৃষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গতায়াত করিতে পারি। অতএব আমার ও তোমার প্রভেদ সুমেরু ও সর্ষপের প্রভেদের ন্যায়। আমার এরূপ প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। হে মহারাজ! আমি এ স্থলে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখিতেছি, শ্রবণ কর, রুষ্ট হইও না। দেখ, কুরূপ ব্যক্তি যে পর্যন্ত আদর্শ-মণ্ডলে আপন মুখমণ্ডল না দেখে, ততক্ষণ আপনাকে সর্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে। কিন্তু যখন আপনার মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে তখন আপনার ও অন্যের রূপের প্রভেদ জানিতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক বাক্যব্যয় করে লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল বলে। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ মূর্খ লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভ কথা পরিত্যাগপূর্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগপূর্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভই গ্রহণ করেন। সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ন হন, কিন্তু দুর্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগকে সংবর্ধন করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া তদধিক সন্তোষ লাভ করে। অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে, কারণ অসাধু সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধু-কর্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহার নিন্দা করে না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জন সে সজ্জনকে দুর্জন বলে, ইহা হইতে হাস্যকর আর কি আছে? ক্রুদ্ধ কালসর্পরূপী সত্যধর্মচ্যুত পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন মাদৃশ আস্তিকেরা কোথায় আছে। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট

করেন এবং সে অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বধর্মোত্তম বলিয়া নির্দেশ করেন, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয়। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের ইহকালের ধর্ম, কীর্তি ও মনঃপ্রীতি বর্ধন করে এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব হে নরনাথ! তুমি পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। হে ধরাপতে! আত্মকৃত সত্যধর্ম প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র! কপটতা পরিত্যাগ কর। দেখ, শত শত কূপ খনন অপেক্ষা একটি পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ; শত শত পুষ্করিণী করা অপেক্ষা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ; শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা এক পুত্র উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ এবং শত শত পুত্র উৎপাদন করা অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্য দিকে এক সত্য রাখিয়া তুলা করিলে, সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। হে মহারাজ! সমুদয় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব তীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কিনা সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম, সত্যপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যানুরাগী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর তবে আমি আপনিই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সহিত আর কদাচ আলাপ করিব না; কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তোমার অবিদ্যমানে এই পুত্র এই গিরিরাজ-বিরাজিতা সসাগরা বসুন্ধরা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে, সন্দেহ নাই।—

(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত)

এইরূপ জ্বলন্ত উদ্দীপনা মহাভারতের নানা স্থানে আছে। এখানেও দেখুন, প্রয়োজন হইয়াছিল, জরাসন্ধের কারাগার হইতে ভারতের বীরগণকে উদ্ধার করা, ভারতের সীমান্ত প্রদেশে নূতন দ্বারকা নগর স্থাপন করা, একবার রাজসূয় যজ্ঞকালে সমস্ত ভারতের মিলন, আবার কুরুক্ষেত্রে সেই সমস্ত ভারতের সসৈন্য আগমন ও বল-পরীক্ষা, শেষে অশ্বমেধ উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারত বিজয় করা প্রভৃতি নানা মহৎ কার্য-সাধন, প্রয়োজন। যেখানে বহু লোকের প্রবৃত্তি-চালন প্রয়োজন, সেইখানেই উদ্দীপনার আবশ্যক, এবং প্রয়োজনই প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রসূতি। তাৎকালিক উদ্দীপনা তাৎকালিক মহাকাব্য গ্রন্থে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। ভারত-পল্লীর উদ্দীপনালতার পুষ্প ভারত-গ্রন্থে রাশি রাশি রহিয়াছে—শকুন্তলোপাখ্যানে, নলোপাখ্যানে, ভীষ্মের বচনে, ভীমের ভর্ৎসনে, খাণ্ডব-দাহনে, দ্রৌপদীর রোদনে, ভূরি ভূরি বচনে সেই পুষ্প, এবার মালার মত নয়, স্তূপে স্তূপে রাশীকৃত রহিয়াছে। মহাভারতের পর্বে পর্বে রস। কবিতার রস, উদ্দীপনার রস—দুই রস সমভাবে থাকাতে মহাভারত এক অপূর্ব গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই ইহাকে মহাপুরাণ বলে, পঞ্চম বেদ বলে।

চ

অতি প্রবল ঝড়ের পর স্বভাব অত্যন্ত শান্তভাব ধারণ করে। দুষ্ট ছেলেগুলি খানিকক্ষণ মাতামাতি করিয়া প্রায়ই মায়ের কোলে গিয়া অকাতরে অগাধ নিদ্রা যায়। অতি আয়াসসাধ্য কার্য করিলে পরই একটু বিশ্রাম করিতে হয়। পর্বাহে, পূজায়, উৎসবে, ব্রতনিয়মে, নামসংকীর্তনে, চান্দ্র আশ্বিন, চান্দ্র কার্তিক যাপিত করিয়া বঙ্গসমাজ একবার চান্দ্র অগ্রহায়ণ, চান্দ্র পৌষ বিশ্রাম করেন। মহরমে দুই প্রহরে মাতনের পরদিন জিরেন। ইহুদি-বিবরণে এমন কি সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকেও ছয় দিন জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া রবিবারে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। ভারত-ঘটনার পর হিন্দু সমাজ যে দিনকত বিশ্রাম করিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? একে প্রাচীনকালের হিন্দু সমাজ, তাহাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। হিন্দু জাতি অদ্যাপি সেই ভয়ানক ব্যাপার স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। আজ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর হইল এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও পাঁচজনকে একত্র হইয়া গোলমাল করিতে দেখিলে বলিয়া থাকি, ওখানে ভারি 'কুরুক্ষেত্র' হইতেছে। এই কুরুক্ষেত্র ব্যাপারে বহু সংখ্যক সৈন্য নাশ হইয়া গেল, এখন যে হিন্দু সমাজ কতকাল নিদ্রা যাইবে তাহা কে বলিতে

পারে ? যে হিন্দু জাতি কাষ্ঠ আহরণকারী ছেদকের শিরেও নিপীড্যমান বৃক্ষছায়া দান করিতে বিরত হয় না, ইত্যাদি উদাহরণ দিয়া 'অহিংসা পরমোধর্মঃ' বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছে, যে হিন্দু জাতি সুখ অপেক্ষা স্বস্তি ভাল বলিয়া অদ্যাপি উপরতস্পৃহতার উদাহরণ কথায় কথায় দেয়, যে হিন্দু জাতি দৌড়ানো চেয়ে দাঁড়ানো ভাল, দাঁড়ানো অপেক্ষা বসা ভাল, বসা চেয়ে শোয়া ভাল, শোয়া চেয়ে ঘুমানো ভাল ইত্যাদি ধারাবাহিক বচন-নিচয় সৃষ্টি করিয়া আপনাদের আলস্য-পরতন্ত্রতার ভূয়োভূয় পরিচয় দান করিয়াছে, যে হিন্দু জাতি পৌরাণিক শাসন-প্রমাণবিবৃতি-জন্য, কেহ বাল্য-ক্রীড়া কালে কৌতুকপ্রিয়তা-বশত শলভপুচ্ছে শলাকা-প্রদান করিয়াছিল বলিয়া তাহার শত জন্ম পরে শত পুত্রের মৃত্যু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া নিষ্ঠুরতার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এবং অতিশয় গুরুতর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে, যে হিন্দু জাতি অতি সামান্য রক্তপাতকে মহাপাপ বলিয়া গণনা করিয়া গিয়াছে, সেই হিন্দু জাতি এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিল। ভারত বীর্যহীন, ভারত বীরশূন্য, কুরুবংশ লুপ্তপ্রায়, যদুবংশ লুপ্ত, গৃহ-বিচ্ছেদে গৃহদগ্ধ। নির্জীব ভারত ঘুমাইতে লাগিল। সহস্র বর্ষ এইরূপ নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। পরশুরাম একবিংশতি বার চেষ্টা করিয়া যে কর্ম করিতে পারেন নাই, ক্ষত্রিয়েরা গৃহ-বিবাদে সেই কর্ম সম্পন্ন করিল। পৃথিবী প্রায় নিঃক্ষত্রিয়া। নিঃক্ষত্রিয় ভারতে ব্রাহ্মণেরা একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। এখন আর ব্রাহ্মণগণ কেবল হোতাপোতা, দীক্ষা-শিক্ষা-দাতা, শাস্ত্র-প্রণেতা নহেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকল কার্যেই হস্তার্পণ করিলেন, তাঁহারাই এখন সমাজের কর্তা, তাঁহারাই এখন শাসন-বিধাতা। সে কঠোর শাসনভাবও আমরা এখন মনঃক্ষেত্রে চিত্রিত করিতে পারি না। নিঃক্ষত্রিয়, ক্লান্ত ভারত সেই কঠোর শাসনে অবসন্ন হইয়া রহিল।

হিন্দু সমাজ পূর্ব হইতেই যন্ত্রের ন্যায় চলিতেছিল, এখন সেই সমাজের একদল পৃথক্ হইয়া যন্ত্রচালক হইল। বিপ্রবর্ণ যন্ত্রচালকের কর্মে অভিষিক্ত হইয়া কেবল যন্ত্রচালনাতেই সময় যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পূর্বের সেই শান্তভাব, সেই বিশুদ্ধভাব, একটু অপূর্ব পারলৌকিকভাব, ঐহিক-চিন্তা-অবিচলিত ভাব হারাইলেন। কালচালনেই ব্যস্ত, কঠোর নিয়ম সমস্ত প্রচার করিলেন। ছায়াবাজীর পুতুলের যে স্বাধীনতা আছে, হিন্দু সমাজের সে স্বাধীনতা-টুকুও রহিল না। ছায়াবাজীর পুতুলের আকর্ষণ-রজ্জু ক্ষণমাত্রের জন্যও ছিন্ন হইলে পুতুল তখন আর চালকের আয়ত্ত নহে। কিন্তু এ শাসন, এ ব্যবস্থা এমনি সুকৌশলযুক্ত যে, যদি একটির আকর্ষণ-রজ্জু ছিঁড়িল, আর একটি আসিয়া তাহা বাঁধিয়া দিল।

প্রত্যেক দিনের রাত্রির ছয় দণ্ড হইতে পরদিন রাত্রি প্রহরৈক পর্যন্ত এক নিয়ম; প্রত্যেক চান্দ্র মাসের অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা, পূর্ণিমা হইতে চতুর্দশী—তিথি-নিয়ম; সপ্তাহের প্রত্যেক বারের এই এই ক্রিয়া; সূর্য-সংক্রমণে এই নিয়ম; উত্তরায়ণে এই; দক্ষিণায়নে এই; বিশেষ চতুর্মাসে এই; মলমাসে এই; বর্ষগতিতে এইরূপ; মাতৃগর্ভে অঙ্কুর সংস্থাপন অবধি শবদাহের পর বর্ষৈক কাল পর্যন্ত—শুদ্ধ যাবজ্জীবন নয়—যাবজ্জীবনের মাথায় একটি চূড়া, পায়ে পাদুকা—এই আগা-পিছা-বাড়ানো যাবজ্জীবনে এই এই সংস্কার, এই বর্ষক্রিয়া, ঋতুকলাপ, মাসবিধি, দৈনিক কর্ম, প্রতি প্রহরে পদ্ধতি, প্রতি ক্ষণে এই করিতে হইবে, এইগুলি দেশাচার, এইগুলি কুলাচার, এইটি এই বংশের রীতি, এইটি গোত্রের পদ্ধতি, এই শাখার এইটি ধর্মশাস্ত্র, এইরূপ জন্ম লইতে হইবে, এইভাবে জন্ম দিতে হইবে। এই প্রকার কাঁদিতে হইবে, এইরূপ মরিতে হইবে, এটি খাইবে, এটি খাইবে না, এখানে এইভাবে বসিবে, এতক্ষণ ধ্যান করিবে। হিন্দুশাস্ত্র পালনের জন্য হিন্দু সমাজ—হিন্দু সমাজের রক্ষা বা উন্নতির জন্য হিন্দু-শাস্ত্র নহে। তোমার প্রত্যহ পঞ্চ অতিথি, ব্রাহ্মণ সেবা করা কর্তব্য,—তুমি চারিজনের অধিকের সেবা করিতে পারিলে না, তোমার প্রায়শ্চিত্ত মাঘী পূর্ণিমাতে পাঁচটি তুষারধবল বৎস পঞ্চ ব্রাহ্মণে দান করা। পাঁচটি বৎসই তুষারধবল হয় নাই, উত্তম—ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত শতৈকবার গায়ত্রী জপ করিয়া অষ্টোত্তর শত নিষ্ক ব্রাহ্মণে দান। গায়ত্রীজপ-কালে ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে, বেশ—ইহার প্রায়শ্চিত্ত ত্র্যহ উপবাসপূর্বক গোদাবরী নদীতে স্নাত হইয়া অষ্টাবিংশ স্নাতক বিপ্রে শুভ্র বস্ত্রদান; গোদাবরী স্নানকালে জীবিত

শম্বুক-পৃষ্ঠে তোমার পদ স্পর্শ করিয়াছে, ভাল—ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণারণ্যে অষ্টাশীতি ব্রাহ্মণ-ভোজন। ২৩ নম্বরের পুতুলের দক্ষিণ হস্তের তার ছিঁড়িয়া গেলে ৫৭ নম্বরের পুতুল আসিয়া বাঁধিয়া দিতেছে। যে বাঁধিতেছে, তাহার ঘর্ম হইতেছে,—২৬৪ সংখ্যার পুতুল বাতাস করিতেছে; ৩ নম্বরের পুত্তলিকা সেই বাতাস করা ভাল করিয়া হইতেছে কিনা তাহাই দেখিতেছিল—ঐ ২৩ নম্বরের হাতের তার বাঁধা হইবামাত্র তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেল। এইরূপ ঋষিদিগের, শাখাকর্তাদিগের কাল্পনিক গাঁথনির উপর গাঁথনিতে এক বৃহৎ মায়াময় অট্টালিকা হইল। উপবাসে, জপে, জাগরণে, নিত্যকর্ম পালনে, কঠোর শাসনে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। যাজনক্রিয়ার একায়ত্তকারী ব্রাহ্মণ জাতির উপর সাধারণের দিন দিন অশ্রদ্ধা হইতে লাগিল। বিপ্রজাতির মধ্যবর্তিতা অবহেলা করিয়া লোকে যে, ভক্তিতে ভগবান্‌কে ভজিয়া চরিতার্থতা লাভ করিবে তাহারও উপায় ছিল না। শাস্ত্রবিচ্যুত জাতিদিগকে স্পর্শন বা শুদ্ধ দর্শন করিলেও মহাপাপ,—এই সংস্কার অনেকের মনে হওয়াতে তাহারা ঘৃণিত হইয়া কদর্য বিষাক্ত সরীসৃপের ন্যায় ধরণী-বিবরে, পর্বত-গহ্বরে বাস করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণগণ শাসন-রজ্জু ক্রমেই প্যাঁচাও করিয়া অসংখ্য ফাঁশ—লোকের গলে, বক্ষে, হস্তপদে, করাঙ্গুলিতে, পদাঙ্গুলিতে দিয়া দু'জনে দু'জনে ফাঁশ জড়াইয়া, দশজনে দশজনে ফাঁশ জড়াইয়া, জাতিতে জাতিতে ফাঁশ জড়াইয়া, সমস্ত হিন্দু সমাজ এক বড় ফাঁশে জড়াইয়া, রজ্জুর দুইমুখ একত্র করিয়া, আপনারা ধরিয়া বসিয়া কেবল দড়ি পাকাইতে লাগিলেন—একটু টান পড়ে আর তৈয়ারি দড়ি গেরো দিয়া বাড়াইয়া দেন। কুরুক্ষেত্রের পর ভারতের এক বিশ্রাম-প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাতে দৃঢ় নিয়ম-বিষ সমাজের শাখায়, পাতায়, শিরেশিরে প্রবেশ করিয়া লোকের মস্তকে, মস্তিষ্কে, কেশে, অস্থি-মধ্যগত মজ্জাতে প্রবেশ করিয়া সব একেবারে জরজর করিয়া রাখিল।

ছ

এই সময়ে নবমাবতার বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে ঐ সমস্ত বিপদ্-জঞ্জাল দূরীকরণ করিতে হইবে। এক একগাছি করিয়া তার ছিঁড়িলে এ কার্য হইবে না। আর এক জন আসিয়া বাঁধিয়া দিবে, অর্ধেকের চেয়ে বেশি দড়ি একবারে ছেঁড়া চাই। ফাঁশের দড়িতে একটু একটু করিয়া টান দিলে ত হইবে না। মাঝখানে এমন একটি আঘাত করা চাই যে, সেই আঘাতে লোক এমন বেগে ছড়াইয়া পড়িবে যে, ব্রাহ্মণের হাত হইতে বাঁধনের দুই মুখ খুলিয়া যাইবে—সে মুখ তাঁহারা আর ধরিতেও পারিবেন না এবং নূতন দড়ি পাকাইয়া জোড়া দিয়াও আর বাঁধন রাখিতে পারিবেন না।

বুদ্ধদেব তাহাই করিয়াছিলেন—তিনি এক বিরাট্ আঘাতে সমস্ত তার খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। তিনি এই অবসন্ন দিন-দিন-জড়ীভূত সমাজ-কেন্দ্রে এমনি একটি গুরুতর কেন্দ্রবিযোজক বল প্রয়োগ করিলেন যে, ব্রাহ্মণদের কঠোর শাসন একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সেই বেগ প্রাচীন হিন্দু সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়াই পর্যবসিত হইল না,—ভারত-সাগরের ঊর্মিসঙ্কুল নীলজলরাশি তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না—হিমালয়ের তুষারাবৃত শুভ্র শিখরশ্রেণী সেই বেগের প্রতিবন্ধক হইতে পারিল না। বাহ্লীক, লাডক, তিব্বত, তাতার, চীন, মহাচীনে—ব্রহ্ম, সুহ্ম, মলয়ক, কোচীনে—যব, বলি, সুমাত্রা, সিংহল দ্বীপে সেই বেগ চালিত হইল। সমস্ত পূর্ব এশিয়া জীবিত হইল। নব-বর্ষের মধ্যে পঞ্চবর্ষ নবভাব ধারণ করিল। শাক্যমুনি ব্রাহ্মণদিগের সেই মায়াময় অট্টালিকা চূর্ণীকৃত ও ভূমিসাৎ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সেই চূর্ণীকৃত অট্টালিকার উপকরণ লইয়া একটি অপূর্ব সুদৃশ্য হর্ম্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি * রবস্‌পিয়ারের ন্যায় হিন্দু সমাজকে একেবারে অধঃপাতে দিয়া অতলে ডুবাইয়া গভীর রসাতলে সমাজের সমস্ত কলঙ্ক কচ্‌লাইয়া ধুইয়া, সেইখানে তাহার দোষক্ষালন

* Robespierre—ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেতা; জ্যাকোবিন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেন; বিচারে ইঁহার মৃত্যুদণ্ড হয়।

করিয়া আবার নেপোলিয়নের ন্যায় হিন্দু সমাজকে উন্নত পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সামান্য কথায় বলে, ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু গড়া কঠিন। বাস্তবিক ভাঙ্গা তত সহজ নহে —ভাল পাকা মজবুদ গাঁথনি ভাঙ্গা অত্যন্ত কষ্টকর, অতীব আয়াসসাধ্য এবং সময়ে সময়ে হয়ত একেবারেই দুঃসাধ্য। অতি কাঁচা গাঁথনি ভাঙ্গা আবার যেমন সহজ তেমনি বিপদ্-পরিপূর্ণ—অনেকে ভাঙ্গিতে গিয়া চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। আবার এমন গাঁথনি আছে যে, খানিক অত্যন্ত শিথিল, খানিক অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ। সেগুলি ভাঙ্গা সর্বাপেক্ষা কঠিন কার্য। শাক্যসিংহ হিন্দু সমাজের গাঁথনি যেমন ভাঙ্গিয়াছিলেন, অচিরাৎ তেমনি একটি পাকা গাঁথনির সুবৃহৎ সমাজ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই কার্যটি যেমন সুমহৎ তেমনি সুকঠিন। সিদ্ধার্থ উদ্দীপনার সাহায্যেই সমাজ-সংস্করণে সফলার্থ হন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তে আমরা তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। তিনি ভারতবর্ষের আর্যাবর্তের নানা স্থান পর্যটন করেন, সকল স্থানই তাঁহার উদ্দীপনাতে মাতিয়া উঠে। শাক্যসিংহ মগধরাজ অজাত-শত্রু, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও কাশীরাজ এই তিনজন অতি প্রতাপশালী নরপতিকে স্বীয় মতাবলম্বী করেন। তিনি কালান্তক ধর্মশালায় কয়েক বৎসর ক্রমাগত স্বীয় মত বিস্তার করেন। তিনি এক জীবনে লক্ষ লক্ষ লোককে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া লোকযাত্রা সংবরণ করেন। আর্যধর্ম-ধ্বংসকারী নিজ অসীম ক্ষমতাবলে পৌরাণিক অবতার হইলেন। পৃথিবীর * অর্ধেক লোক তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করে।

অদ্যাপি পৃথিবীর তিন ভাগের একভাগ লোক তাঁহাকে ফো, বোধ, গড়ামা, মহৎ লামা, বুদ্ধ প্রভৃতি নানা অভিধানে ঈশ্বরত্বে অভিষিক্ত রাখিয়াছে। অদ্যাপি হিন্দুরা তাঁহাকে নবমাবতার জানিয়া ভক্তি করিতেছে। অদ্যাপি শ্রীক্ষেত্রে তিনিই জগন্নাথ মূর্তিতে বিরাজিত থাকিয়া ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুয়ানির সারস্বরূপ জাতিভেদ-সংঘটিত অন্নবিচার লোপ করিয়া হিন্দুয়ানির সার হরণ করিতেছেন। অদ্যাপি তৎপ্রচারিত ধম্মপদ কঠোর নাস্তিকের পর্যন্ত হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে দুইজন অমানুষ মানুষের নাম করিতে হইলে যীশুখৃস্টের সঙ্গে তাঁহারি নাম করিতে হয়।

* পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১০০ বলিলে প্রায় ১৬জন হিন্দু ও ৩২জন বৌদ্ধ হয়, সুতরাং ১০০র মধ্যে ৪৮জন বুদ্ধের দেবত্ব স্বীকার করে।

জ

আর্যচরিত এতদূর পর্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভারতবর্ষে উদ্দীপনা মহাসাগরে চরের ন্যায় মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। তিন সহস্র বৎসর মধ্যে আমরা উদ্দীপনা বিস্তারিত হইতে তিনবার দেখিয়াছি মাত্র। কিন্তু বুদ্ধদেব যে লতা বর্ধিতা করেন তাহা অনেকদিন পর্যন্ত জীবিতা ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৌদ্গলায়ন, সারিপুত্ত প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ ভারতের নানা স্থানে পর্যটন করিয়া হিমালয়-প্রদেশ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম-সংস্থাপন করিতেছিলেন। নানা বৌদ্ধগ্রন্থে তাঁহাদের উপদেশ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর সহস্র বৎসর ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। ভারত-সৌভাগ্য চতুষ্পাদ-পরিমিত হইয়াছিল। সে সৌভাগ্য-সূর্য কিরূপে অস্তগত হয়, শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে আমাদের কত ক্ষতি হইয়াছে—কতই' বা লাভ হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে। প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না, ইহাই দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য ছিল; আমরা তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মহাসাগর যেমন জলময়, ভারত তেমনি কবিতাময়। মহাসাগরে দ্বীপ আছে, ভারতেও সেইরূপ উদ্দীপনা ছিল। এক্ষণে প্রবন্ধের সার কথাগুলি সংহতভাবে প্রদর্শন করিয়া এবং কোন মহাত্মা যদি এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তবে আমরা তাঁহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া উপসংহার করিতেছি।

আমাদের কি ছিল না তাহা দেখা উচিত। প্রাচীন ভারতে উদ্দীপনা ছিল না। যদ্দ্বারা পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্মপ্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন করা বা অন্যকে কার্যে লওয়ানো যায় তাহাকে উদ্দীপনা-শক্তি বলে। উদ্দীপনা কবিতা হইতে পৃথক্। কবিতা রসাত্মিকা

আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা অন্যোদ্দিষ্টা রসাত্মিকা কথা। নির্জনে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি; অন্য লোকের সহিত আলাপেই উদ্দীপনার জন্ম হয়। ভাল থাকিলেই মন্দ আছে; নির্জনে চিন্তায় অধিক কবিতা হইল, উদ্দীপনা অতি অল্পমাত্র হইল; তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা স্বতঃসন্তুষ্ট জানি, ভারতের সমাজভাগ ভুগোলভাগের মত। ভারতবর্ষীয়ের জীবন স্রোতের ন্যায়, আবার তাহাতে স্বভাবজ কোন পদার্থেরই অভাব নাই; কাহারও বিশেষ সাহায্যের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে? অভাব না থাকিলেও মানুষ কবি হইতে পারে—সাধারণ সুখদুঃখ-বোধ থাকিলেই কবি। কিন্তু উদ্দীপনা বিশেষ ঘটনায় বিশেষরূপে পরিবর্ধিতা হয়। প্রাচীন ভারতে তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে আমরা (দ্বীপের ন্যায়) উদ্দীপনা-প্রবল কাল তিনবার মাত্র দেখিতে পাই। এত বিস্তৃতভাবে পুরাবৃত্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ জলবায়ুতে উদ্দীপনা-লতা বর্ধিতা হইয়াছিল, তাহা না জানিলে আমরা কখনই উদ্দীপনারোপণী কৃষিবৃত্তিতে সফলতা লাভ করিতে পারিব না। সেই উদ্দীপনা রোপণ করাও এ সময়ে বিশেষ আবশ্যক

বঙ্গদর্শন ১ম খণ্ড বৈশাখ ১২৭৯

দশমহাবিদ্যা

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

আমি যে ঘরে বসি পূর্বে সেই ঘরের চারিদিকে এই দশমহাবিদ্যা বিরাজ করিতেন। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যখনই সেই গৃহে পদার্পণ করিতেন সেই সকল মূর্তির অধিষ্ঠানে সর্বদাই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন; ছিন্নমস্তাকে দেখিয়া তাঁহারা খড়্গহস্ত হইতেন; কত বক্রোক্তি আমাকে এই দশমহাবিদ্যার জন্য শিরে বহন করিতে হইয়াছে; অশ্লীল, কদর্য প্রভৃতি কত বিশেষণ পদ আমার রুচির পরিচয়-প্রদান করিয়াছে।

দশমহাবিদ্যার প্রতি আমার ভক্তি বড় অচলা নহে; ক্রমে তাঁহারা স্থানান্তরিত হইলেন ও দেশী-বিলাতি আলেখ্য-শোভন-কারিণী আধুনিকী মহাবিদ্যাগণ সেই পৌরাণিকী মহাবিদ্যাদিগের স্থলে বিরাজ করিতেছেন। একটি দেশী মহাবিদ্যার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, ইনি অতি সূক্ষ্ম কৃষ্ণকূল-শ্বেতাম্বর-পরিহিতা, আলুলায়িত-কেশা; ইঁহার বক্ষঃস্থলের অর্ধভাগ আচ্ছাদিত, অর্ধভাগ অনাবৃত; হস্তে ডায়মনকাটা বালা, তাহে উজ্জ্বল রসান; পদে ডায়মনকাটা মল, তাহে নকাশিপুটে; দক্ষিণ হস্তে সেই আলুলায়িত ঈষৎ-সিক্ত কুন্তলরাশি কুলাইতেছেন ও বিকৃত বিকট কটাক্ষক্ষেপ করিতেছেন। চিত্রকর প্রতিমূর্তির সুনাসায়, সুনথে গজমোতি পরাইয়াছে; সুচিকণ বস্ত্র ভেদ করিয়া গৌরাঙ্গীর গৌর কান্তি ফুটাইয়াছে; গুচ্ছ গুচ্ছ কেশের সহিত দেবীর আঙ্গুলগুলি কৌশলে চিত্রিত করিয়াছে।

আমা-কর্তৃক এই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয় নাই, ইহা জানিয়াই হউক অথবা আমি 'বঙ্গদর্শনে' লিখিতে অভ্যাস করিতেছি বলিয়াই হউক, আমার উন্নতরুচি বন্ধুবর্গ আর এখন-বড় রুচি-বিষয়ে বাদানুবাদ করেন না। একজন আগন্তুক কেবল একদিন বলিয়াছিলেন যে, 'এসকল বড় ভাল নহে।' তিনি প্রস্থান করিলে পর শুনিলাম তিনি একজন স্কুলমাস্টার; তাঁহার কথায় আর বড় আস্থা হইল না। আস্থা করি আর না-করি আমি কিন্তু সেই পূর্বস্থাপিতা পৌরাণিকী ছিন্নমস্তা আর এই আধুনিকী ছিন্নশীলার মধ্যে বড় প্রভেদ দেখিতে পাই না।

একটি বিলাতি মহাবিদ্যার কথাও বলি। ইনি অপরাজিতাপুষ্পাভাক্ষী; ইঁহার বক্ষ অর্ধাবৃত; ইনি বেণীবদ্ধ-কেশা; ইঁহার রক্তাভ কপোল; যুগ্ম ভ্রূ; উৎসঙ্গে একটি বহুরোমশ মার্জার; বিলাতি আসনে আসীনা; আসনের এক পার্শ্বে একটি কুক্কুর অর্ধোত্থিত ভাবে দেবীর বস্ত্রাঞ্চল কর্ষণ করিতেছে; ক্রোড়স্থিত বিড়ালের প্রতি আক্রমণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছে; দেবী বিড়ালকে বামহস্তে অভয় প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী-প্রদর্শন করিয়া সারমেয়কে ভ্রূকুটিভাবে যেন বলিতেছেন, 'তিষ্ঠ';

আলেখ্যের নিম্নদেশে ইংরাজিতে লেখা আছে 'বিবাদ'। এই সকল বিলাতি চিত্রের আমি সম্পূর্ণ রসজ্ঞ নহি; বরং পৌরাণিকী কমলাত্মিকা বা রাজরাজেশ্বরীর প্রতি আমার অধিকতর শ্রদ্ধা হয়; তবে দেশীয় চিত্রের সহিত বিলাতির তুলনায় বিলাতিয়েরই প্রশংসা ও গৌরব করিতে হয়।

যাহা হউক এই সকল আধুনিকী মূর্তি এক্ষণে বসিবার গৃহে অধিষ্ঠান করেন। পৌরাণিকী দশমহাবিদ্যা আমার শয়নাগারে অন্তঃপুরে স্থান পাইয়াছেন।

দশমহাবিদ্যা আমার শয়নাগারে আছেন; আমি রাত্রির অল্পালোকে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই; বালসূর্যের কিরণ-পাতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়; ধূমাবতী আমার সম্মুখে থাকেন; ছিন্নমস্তাকে পশ্চাতে রাখিয়াছি। এই সকল দেখিয়া দেখিয়া এক্ষণে খেয়াল দেখিতেছি; যদি আমার মতিভ্রম হয় আমার রুচিসংশোধনকারিগণ দায়ী হইবেন।

আমার বোধ হয় যে, এই ভারতবর্ষের দশ দশাই দশ মহাবিদ্যা। এক্ষণে সপ্তমী দশা চলিতেছে, সেই দশার প্রতিমূর্তিই **ধূমাবতী** মূর্তি।

প্রথম দুই দশায় **কালী** ও **তারা** মূর্তি। আর্য-দস্যু-বিবাদ লইয়া যখন ভারতবর্ষ প্রত্যহ রক্তে স্নান করিত—এ সেই তখনকার মূর্তি। তখনই ভারতবর্ষ অনার্য জাতি-দিগের জন্য 'সদ্যশ্ছিন্ন-শিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্ধ্ব-করাম্বুজাম্' আবার তখনই আর্যদিগের প্রতি 'অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্ধ্ব-পাণিকাম্'। তখন ভারত দস্যুশোণিতপ্লাবিত; 'শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষুসমন্বিতাম্'। ভারতের ভীম নৃশংসতাই কালী ও তারা মূর্তি,—তখনই ভারতমাতা করালবদনা, ঘোরমহামেঘপ্রভা, মুক্তকেশী, 'কণ্ঠাবসক্ত-মুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চিতাম্, ঘোররাবাং মহারৌদ্রীম্।' তখনই ভারতক্ষেত্র অনার্যগণের জন্য অনন্ত চিতা-স্বরূপ, তাহাতেই তারার ধ্যানে বলা হইয়াছে যে,

'জ্বলচ্চিতা-মধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
সাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্।'

এই গেল ভারতের প্রথমাবস্থা, তাহার পর **ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী** দুই মূর্তি। তখন আর পূর্বের ভাব নাই। সে নৃশংসতা বিদূরিত হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধস্পৃহা এখনও যায় নাই।

এখন দেবী আর মুণ্ডমালা-করকাঞ্চী-বিভূষিতা হইয়া, খড়্গ-কাতি ধারণ করিয়া ঘোর অট্টহাসে ভূমিকম্প—হৃৎকম্প সম্পাদন করেন না বটে, কিন্তু তথাপি রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে

'রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর॥'

এখন ভারত-সিংহাসনের দেবতারাই মূল। হস্তে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর। পাশাঙ্কুশ শাসনাস্ত্র; ধনুর্বাণ যুদ্ধাস্ত্র, ভারত এক্ষণে রাজ্ঞী কিন্তু যুদ্ধার্থিনী। কিন্তু পরেই ভুবনেশ্বরী মূর্তিতে দেখুন—

'রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারিভুজ॥'

সেই পাশাঙ্কুশ আছে কিন্তু সে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন রাজ্ঞী অভয়দানে সকলকে তুষ্ট করিতেছেন। এক্ষণে ভারত রাজ্ঞী, এক্ষণে ভারত শান্তি। এটি বড় সুন্দর মূর্তি। ভারতমাতা তখন যথার্থই ভুবনেশ্বরী।

তাহার পর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব। তান্ত্রিক যোগের সৃষ্টি। ভারত অধঃপাতে যাইবেন তাহারই সূচনা হইতেছে। ভারত আর রাজ্ঞীরূপে পাশাঙ্কুশ ধরিতে ইচ্ছা করেন না; তাহাতেই এক্ষণে

'অক্ষমালা পুঁথি বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাট উপর॥'

পূর্বের বরাভয় আছে কিন্তু পাশাঙ্কুশের পরিবর্তে পুঁথি, অক্ষমালা লইয়াছেন। ভারতে সংস্কৃত গ্রন্থের এই সময়ে অত্যন্ত আড়ম্বর, যোগের জপের বড়ই আড়ম্বর, তাহাতেই ভারতমাতা অক্ষমালা করে গ্রহণ করিয়াছেন; শুদ্ধ অক্ষমালা লইয়াই ক্ষান্ত নহেন; এখন

'রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল-আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানাভূষণভূষণা॥'

'মুণ্ডমালা গলে'—তান্ত্রিক শবসাধনা আরম্ভ হইয়াছে। ভারত উচ্ছিন্ন যায় আর বিলম্ব নাই। তান্ত্রিক কালের

ভারতের এই মূর্তি; এখন আর ভারত রাজ্ঞী নহেন—ভারত যোগিনী, ভারত ভৈরবী। এই ভৈরবী দশায় যত কেন অমঙ্গল হউক না বহুল সংস্কৃত চর্চা হইয়াছিল; নানা তন্ত্রের সৃষ্টি হয়; সেই সকল তন্ত্রে মগধ, মিথিলা, বঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ অদ্যাপি আকুল করিয়া রাখিয়াছে।

ষষ্ঠী দশায় তন্ত্র-প্লাবন। ছিন্নমস্তা মূর্তি। স্বার্থপরতা ও স্বার্থশূন্যতা উভয় যোগ-নিষ্পন্ন কঠোর বাতুলতা, নৃশংসতা, শোণিতস্পৃহা, কুৎসিত কাম-প্রবৃত্তি, নির্লজ্জতা; এইগুলি এ মূর্তির সমবায়ী কারণ। ইহার সংস্কৃত ধ্যান সংস্কৃতই থাকুক।

জবাকুসুম-সঙ্কাশং রক্ত-বন্ধুক-সন্নিভং।
* * * ॥

মধ্যেতু তাং মহাদেবীং সূর্যকোটি-সমপ্রভাম্।
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্॥
প্রসারিতমুখীং দেবীং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাম্।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্॥
বিকীর্ণ-কেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাম্।
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্॥
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদেস্থিতাম্।
অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥

দেবীর সহচরী ডাকিনী-বর্ণিনীর মূর্তিও ঐরূপ ভয়ানক

দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাং পানং প্রকুর্বতীম্।
বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্॥
কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ-যোগতঃ।
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব॥
প্রত্যালীঢ়-পদাং দিব্যাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্।
সদা-দ্বাদশবর্ষীয়াং অস্থিমালা-বিভূষিতাম্॥
ডাকিনীং বামপার্শ্বেতু কল্পসূর্যানলোপমাম্।
বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্ত-পঙ্‌ক্তি-বলাকিনীম্॥
দংষ্ট্রা-করাল-বদনাং * * *।
মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্॥
লেলিহান-মহাজিহ্বাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্।
কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ-যোগতঃ॥
দেবী-গলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্বতীম্।
করস্থিত-কপালেন ভীষণেনাতি ভীষণাম্॥

ভারতমাতা আপনার মুণ্ড আপনি কাটিয়াছেন, ভারত-সঙ্গিনীরা সেই রক্ত পান করিতেছে; উন্মত্তা জ্ঞানহীনা ভারতমাতা আপনিও সেই রুধিরধারা গলাধঃকরণ করিতেছেন; ভৈরবী দশায় ভারত জপে বসিয়াছিলেন,—এখন ভারত উচ্ছিন্ন হইয়াছেন। কুৎসিত কামপ্রবৃত্তির উপর ভারতমাতা নৃত্য করিতেছেন; আপনার শোণিতে আপনি মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন; লজ্জাহীনা নৃত্য করিতেছেন; মস্তকছিন্না নৃত্য করিতেছেন; কি ভয়ানক নৃত্য; উন্মত্ততা নৃশংসতা একত্র হইলে কি ভয়ানক ভাব হয়! ভারতমাতার এই ভাব! আর দেখিতে পারি না।

ভারতের কি এইবার সব ফুরাইল? ভারত নাম কি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইল? যবন-শাসনে কি ভারতবর্ষীয়েরা যবনত্ব প্রাপ্ত হইবে? ছিন্নমস্তা কি দশমহাবিদ্যার শেষ বিদ্যা? না—দেবতারা মরেন না। ভারতমাতাও মরেন না। যবনের পর ইংরাজ আসিয়াছে, ভারতের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে; ভারতকে জীবিত করিয়াছে; কিন্তু জীবিত করিয়াছে মাত্র; তেজোদান করিতে পারে নাই—ভারত জীর্ণ, ভারত শীর্ণ, ভারত মলিন, ভারত ক্ষুধায় আকুল, ভারত চিন্তায় ব্যাকুল। ভারতের এক হাতে কুলা আর হাতে মালা। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতমাতার এক্ষণে ধূমাবতীর দশা। ভারতমাতা এক্ষণে—

বিমুক্ত-কুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরল-দ্বিজা।
কাকধ্বজ-রথারূঢ়া বিলম্বিত * * ॥
সূর্পহস্তাতি-রুক্ষাক্ষা ধৃতহস্তা বরান্বিতা।
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা॥

বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, রুক্ষ-কেশা, রুক্ষাক্ষা; দন্ত বিরল হইয়াছে; শোকেতাপে দৃষ্টি

কুটিল হইয়াছে,—যেন সকল আশ্রয় পরিচ্যুতা হইয়া পুরাতন ভগ্নযান রথে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। হায়! সেই রথের উপরি কাক বসিতেছে। বড় কুলক্ষণ,—ভয়ে ভারত কাঁপিতেছেন, কাঁপিতে কাঁপিতে সেই কম্পিত হস্তে ভঙ্গি করিয়া বলিতেছেন, 'আমায় রক্ষা কর, আমি দেবী, এক্ষণে অনাথা—রক্ষা কর, তোমার মঙ্গল হইবে।'

উদ্ধত ইংরাজ শাসনকর্তা! একবার স্থির চিত্তে এই মূর্তির ধ্যান কর। একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখ। দেখ দেখি, সোণার পুরী কি হইয়াছে! ভুবনেশ্বরী এখন পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছেন। কাঙ্গালিনীকে দেখিয়া তোমার দুঃখ হয় না? তুমি মনুষ্য, অবশ্যই দুঃখ হয়। তবে এই সময় দুঃখে দুঃখে দুঃখীদের জন্য, ঐ দুঃখিনীর সন্তানগণের জন্য কিছু ব্যথারব্যথী ব্যবস্থা কর দেখি।

এখনও আমার জাগ্রৎ স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নাই, আমার এখনও আশা হইতেছে যে ভারতমাতা আবার **বগলা** মূর্তিতে দেখা দিবেন। ইংরাজ-অনুকম্পায় ভারতের বৈরিপক্ষ ভারতের কর-কবল-গত হইবে; ভারতমাতা আবার রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন, ভারতমাতা আবার স্বভূষণে ভূষিতা হইবেন। এমন দিন হইবে। ভারতবাসিগণ এস সকলে আমার সঙ্গে একস্বরে একবার সেই মূর্তির ধ্যান করি।

মধ্যে সুধাব্ধি-মণিমণ্ডপ-রত্নবেদী
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীত-বর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণমাল্য-বিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং স্মরামি ধৃত-মুদ্গর-বৈরিজিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং
বামেন শত্রুন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন
পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥

বগলা সিদ্ধবিদ্যার মন্ত্রে সকলে সিদ্ধ হইবার উপায় অবলম্বন কর; বগলা দেবীই তোমাদের ইষ্ট দেবতা হউন; হৃদয়পটে তোমরা এই দেবীর মূর্তিই চিত্রিত করিয়া রাখ।

ইহার পরেই ভারতের **মাতঙ্গী** মূর্তি। ভারতমাতা আপনার চিরপরিচিত দয়ার বশবর্তিনী হইয়া সেই কর-কবলিত শত্রুকে বিমুক্ত করিয়াছেন; আত্মরক্ষার্থে খড়্গচর্ম ধারণ করিয়াছেন; শাসনাস্ত্র পাশাঙ্কুশ পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন; রত্নপদ্মাসনে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ভারতমাতা বহুকাল এ ভাব গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি ইহার পরেই **মহালক্ষ্মী**রূপে ভবে দেখা দিবেন,—

'সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
চতুর্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত-বরিষে॥'

ভারতমাতার যুগ-যুগান্তরের মলরাশি শ্বেত হস্তিগণ অমৃতবারি সেচনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারতমাতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয়দান করিতেছেন। আহা কি শুভদিন! শরীরে রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার আনন্দ জয়ধ্বনি কর।

ভারতমাতার অভিষেক হইতেছে। মাতা যোগিনী মূর্তি, রাজ্ঞী মূর্তি, এমন-যে ভুবনে অতুলা ভুবনেশ্বরী মূর্তি —মাতা তাহা গ্রহণ করেন নাই; মা এখন মহালক্ষ্মীভাবে শোভা পাইতেছেন; সকলে জয়ধ্বনি কর।

* * *

তাহাতেই বলিতেছিলাম আমার বুঝি ভ্রম হইয়াছে। ভারতমাতা মহালক্ষ্মী মূর্তি কত শত বৎসর পরে ধারণ করিবেন, আমি এখনই জয়ধ্বনি করিতে বসিলাম! সম্মুখে কি দেখ দেখি—ঐ দেখ মাতার সেই ভগ্নযান রথোপরি কাক বসিয়া আছে, ডাকিতেছে ক-অ-অ-অ, ক-অ-অ-অ-অ; দেবীর ক্ষুৎপিপাসার্দিত ভ্রূকুটিপাতে অন্তর্দাহ হয়, আর সহিতে পারি না!

মাতর্বগলে আবিরাবিঃ।

ভালবাসা

ভালবাসা একটি মহাযজ্ঞ। এ যজ্ঞের আহুতি—স্বার্থ, দক্ষিণা—আত্মদান। স্বার্থত্যাগে ভালবাসার আরম্ভ, আত্মদানে তাহার পূর্ণ বিকাশ। যিনি ভালবাসিতে পারেন তিনি যথার্থ ভাবুক, তিনি যথার্থ প্রেমিক, তাঁহার গুণের সীমা নাই, তিনি জগতে অতুল্য। তুমি যদি ভালবাসিতে চাও তবে অগ্রে আপনার স্বার্থ বলিদান দাও। আপনার পৃথগস্তিত্ব ভুলিয়া যাও, অন্যের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব মিশাইয়া দাও, আপনার বলিতে যাহা-কিছু আছে সর্বস্ব অন্যের হাতে আনিয়া দাও—পরকে তোমার আপনার করিয়া লও।

সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কাজ করিতে হইলে লোকে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহাতে হাত দেয়। আগের দিকে একটি পা বাড়াইতে হইলে শরীরের সমস্ত ভারটুকু অপর পায়ের উপর রাখিয়া ক্রমে ক্রমে নিক্ষিপ্ত পদের উপর ভার-সঞ্চালন করিয়া থাকে। পিচ্ছিল ভূমিতে চলিতে হইলে অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে থাকে। প্রত্যেক পায়ের পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি তিল-পরিমিত স্থানের পরীক্ষায় নিয়োজিত হয়। কিন্তু ভালবাসিতে হইলে ওরূপ করিলে চলে না—ভালবাসা সন্দিগ্ধ মনের কর্ম নয়। সন্দিগ্ধচেতা লোকে কখন ভালবাসিতে পারে না, কারণ তাহার মন বিশ্বাস করিতে শিখে নাই। একটি সামান্য বস্তুও সে কাহাকেও দিতে চায় না। কোন কারণে কাহাকেও কিছু দিতে হইলে বা কাহারও উপর কোনও বিষয়ের ভারার্পণ করিতে হইলে সে সর্বদাই ইতস্তত করিতে থাকে, সে ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ দোলায় দুলিতে দুলিতে মনে কতই অশান্তি, কতই গ্লানি-না অনুভব করে। অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তুর সম্বন্ধে যাহার মনের গতি এরূপ, সে কেমন করিয়া আপনার প্রাণমন অন্যের হস্তে সমর্পণ করিবে? কেমন করিয়া সে আপনার অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বে লীন করিয়া হরিহররূপে একাত্ম হইতে পারিবে? আর কেমন করিয়াই-বা সে ভালবাসার চরম সীমায় উঠিয়া আকণ্ঠ-পূর্ণস্বরে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—এই মহান্ সত্য উচ্চারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে পারিবে? তাই মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন,—'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।'

যাঁহাদের মন সর্বদা সন্দেহপূর্ণ তাঁহাদের ভাগ্যে যেমন ভালবাসা ঘটে না, সেইরূপ আবার যাঁহারা বিচারক—যাঁহারা বিচার-বিতণ্ডা করিয়া আবর্জনা হইতে বাছিয়া-গুছিয়া খাঁটি মাল পাইবার জন্য মার্জিত এবং শাণিত বুদ্ধির চালনা করিয়া থাকেন—তাঁহারাও ভালবাসার মধুর স্বর্গীয় ভাব অনুভব করিতে পারেন না। অনুভব ত দূরের কথা, কখন কল্পনাতেও আঁকিতে পারেন না। সন্দেহ, বিচার বা তর্কের অবশ্যম্ভাবী ফল—জ্ঞান, অর্থাৎ অনুসন্ধান-পরায়ণ ব্যক্তি সহজেই জ্ঞানার্জন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে ভালবাসা তত সহজ-প্রাপ্য নহে। জ্ঞানের গতির স্থানে স্থানে বিরাম আছে, কিন্তু ভালবাসার বিরাম নাই—উহা অবিশ্রাম স্রোতোবহা নদীর ন্যায় একটানে চলিয়াছে। যেখানে উহার গতির বিরাম সেইখানেই এক অসীম অনন্ত মহাসমুদ্র। সেইখানেই এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড একাকার—লঘুগুরু-ভেদ নাই, আত্মপর-ভেদ নাই,—পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, তুমি-আমি, ব্রাহ্মণ-শূদ্র কিছুরই ভেদ নাই,—সবই একভাবে ভাবময়, সেখানে প্রেম লইয়া কাড়াকাড়ি, সেখানে ভালবাসার ছড়াছড়ি। তুমি জ্ঞানী হইয়া ভালবাসিতে চাও, বহু বিলম্বে তোমার সিদ্ধি হইবে। কিন্তু প্রকৃতিগত ভালবাসা-বৃত্তির গতির বাধা না জন্মাইয়া যদি উহার পশ্চাদ্বর্তী হও, তবে দেখিবে, অবিলম্বে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হইবে, কারণ কাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহা শিক্ষা করিবার জন্য জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় না বা বিচার-বিতণ্ডা করিতে হয় না। মন আপনিই তাহার মীমাংসা করিয়া লয়—মন ভালবাসার পাত্রকে ভাল করিয়া চিনে। তাই কবিগুরু কালিদাস বলিয়াছেন—'মনোহি জন্মান্তর-সঙ্গতিজ্ঞম্।'

ভালবাসার কাছে জাতিভেদ নাই, সুন্দর-কুৎসিত-ভেদ নাই, শত্রু-মিত্র একই কথা। তাই শত্রুপক্ষীয় হইয়াও রোমিও জুলিয়েটকে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন। যদি ভালবাসার ভেদাভেদ-জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে উহাকে

স্বর্গীয় না বলিয়া পার্থিব বলিয়া ডাকিতাম, অমরাবতীর সিংহাসন হইতে নামাইয়া মরতের সিংহাসনে বসাইতাম। ভালবাসা অপার্থিব ধন। তাই বলিয়া উহার ব্যাপ্তি ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া—ক্ষুদ্রাধারে উহার থাকা চলে না। যেখানে উহার পূর্ণ বিকাশ সেইখানেই উহা উথলিয়া উঠে, সেইখানেই উহার তরঙ্গ, উচ্ছ্বাস—সে উচ্ছ্বাস কেহ দেখিতে পায় না, কারণ তাহার আস্ফালন নাই; সে উচ্ছ্বাস কেহ বুঝিতে পারে না, কারণ তাহা অতি গভীর। ভালবাসা সেখানে স্পন্দহীন, নিস্তব্ধ, নিরুত্তর। সময়ে সময়ে উহা যে এক-আধটু প্রকটিত হইয়া থাকে সে কেবল বায়ুর আন্দোলনে তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের ন্যায়। সত্য বটে, দেখিলাম সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল, ঘন ঘন গভীর গর্জনে, তরঙ্গের পুনঃ পুনঃ ঘাতপ্রতিঘাতে সমুদ্র আলোড়িত হইল, ঘূর্ণা বায়ুর আবর্তন-বিবর্তনে আকাশ বিক্ষোভিত হইল, মুহূর্তের মধ্যে বিস্তীর্ণ জলরাশি ফেনময় হইয়া উঠিল। কিন্তু যে মহাশক্তি জলনিধির অন্তর হইতে অনন্তরতম প্রদেশ ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার আমি কি বুঝিলাম?—বুঝিলাম কেবলমাত্র সেই মহাশক্তির বেগবলের আধিক্য-বশতই সমুদ্রের এই ভাবান্তর। সে শক্তির স্বরূপ কি, কাহার সাধ্য বলিতে পারে, কাহার সাধ্য সে শক্তির পরিমাণ করে—সে শক্তি মনুষ্যের অজ্ঞেয়, সে শক্তি অপ্রমেয়।

তাই বলিতেছি, প্রকৃত ভালবাসার পরিমাণ কেহ কখন করিতে পারে নাই, কেহ কখন পারিবে না। উহার স্বরূপ কি, আজ পর্যন্ত কেহ জানে না, কখন জানিতেও পারিবে না; কারণ উহার মূর্তি অনেক। সন্তানের প্রতি মাতার ভালবাসা স্নেহরূপে এবং মাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা ভক্তিরূপে প্রকাশিত। এইরূপে দেখিবে ভালবাসা কখন ঊর্ধ্বগামী, কখন নিম্নগামী, কখন সমতল ক্ষেত্রে বিরাজিত। উহা এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও স্বরূপত এক। সেই পূর্ণানন্দ পূর্ণপ্রেম পরব্রহ্মের প্রকৃতি বলিয়াই ভালবাসা স্বর্গীয়। তাই জগতে উহার এত আদর, এত সম্মান। যোগী ধ্যানে যে বস্তুর দেখা পায় না, তত্ত্বদর্শী যাহার তত্ত্ব খুঁজিয়া পায় না, যে পদ পাইবার জন্য ভগবান্ পিনাকপাণি দিগম্বর বেশে ভস্ম মাখিয়া শ্মশানবাসী, সেই যোগীন্দ্র-বাঞ্ছিত পরম পদে যাহার উদ্ভব, সে ভালবাসার তত্ত্ব তুমি-আমি কি বুঝিব? সে তত্ত্ব অতি গুহ্য, তাহার স্বরূপ যে দিন বুঝিবে, মানব! সে দিন তুমি আর মানব থাকিবে না, সে দিন তোমার মোক্ষ, সেই দিন তুমি নির্বাণ-মুক্তি পাইবে, সেই দিন তুমি পরব্রহ্মে লীন হইয়া এক হইবে।

কতকগুলি জিনিস আছে তাহাদের সম্বন্ধে দরদাম করা চলে, কিন্তু আর কতকগুলির সম্বন্ধে ওরূপ দর করা চলে না। শাক-মাছের এক বারের স্থানে দশ বার দর করা চলে এবং উচিত মূল্যের কম হইলেও বিক্রেতা তাহাতেই জিনিস ছাড়িতে পারে। কিন্তু হীরা-জহরৎ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্তুর জন্য সওদাগরের সঙ্গে ওভাবে দর করা চলে না। যদি কেহ করে, তবে নিশ্চয় বুঝিবে, তাহার হীরা কেনা কর্ম নয়। সেইরূপ যাঁহারা ভালবাসার দর করেন, টাকা-কড়ির মত উহাকে বিনিময়ের বস্তু মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি নিশ্চয়ই কুগ্রহের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাঁহাদের ভাগ্যে ভালবাসা জুটিবে না। ভালবাসার দর নাই—যদি থাকে ত চিরকালই বাঁধাই আছে, তাহার কখন কমবেশি হয় না—ভালবাসা অমূল্য। যদি ভালবাসার মধুময় ভাব অনুভব করিতে চাও ত উহার বিনিময়ে কিছুই পাইবার প্রত্যাশা করিও না।

যদি হৃদয় থাকে তবে বুঝিতে পারিবে এই সামান্য গানটিতে ভালবাসার মহিমময় দেবভাব কেমন প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। গানটি এই—

'ভালবাসিবে ব'লে ভাল্‌বাসিনে,
আমার স্বভাব এই—তোমা বই আর জানিনে।'

তুমি যাঁহাকে ভালবাস, তাঁহার জন্য তোমার ঘরের দুয়ার যেন সর্বদা খোলা থাকে। তোমার সৌভাগ্যবশত যদি কখন তিনি তোমার বাড়ী আসেন, তবে তাঁহাকে তোমার অন্দর মহলে লইয়া যাও। তোমার বাড়ীর প্রত্যেক কক্ষ এক একটি করিয়া তাঁহাকে দেখাও। অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে তুমি যে-যে ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছ—যেখানে ভাল ভাল অলঙ্কার, বহুমূল্য প্রস্তর অহর্নিশ ধক্ ধক্ করিয়া

জ্বলিতেছে, সেই-সেই ঘরে তাঁহাকে লইয়া যাও। আর তোমার যে ঘরগুলি একেবারে অন্ধকার, যেখানে কখনও সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে নাই, বহুকাল রুদ্ধ থাকায় যাহার মধ্যে প্রভাতের নির্মল বায়ু প্রবেশ-পথ পায় নাই, সুতরাং যাহার গন্ধ নক্কারজনক, সে ঘরগুলিও যেন তাঁহাকে দেখাইতে ভুলিও না, বা তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইতে সঙ্কুচিত হইও না। অম্লান বদনে তাঁহাকে তোমার আঁস্তাকুড়ের পচা নর্দমাটি দেখাইবে। তোমার যে-যে বাগানে যুঁই, চামেলী, বেলী, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প সর্বদাই প্রস্ফুটিত থাকে, গন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত হয়, যেখানে শুক, সারী, ময়না, দোয়েল, কোকিল প্রভৃতি সুকণ্ঠ পক্ষী নানারাগে গান গাহিতেছে সেখানে তাঁহাকে লইয়া যাও। আর তোমার খিড়কীর নিকটে যে বাগান আছে, যেখানে শুধুই শেয়াকুলের কাঁটা পথ আগ্‌লাইয়া ঝোঁপ বাঁধিয়া রহিয়াছে, যেখানে শিমুল বৈ আর ফুল নাই, যে স্থান কেবল কাক, শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতি বিকটরবকারী পক্ষীর কর্কশ শব্দে শব্দায়মান, যেখানে প্রভাতের মলয় বায়ু কখন পথহারা হইয়াও বহে না, সেখানে তাঁহাকে লইয়া যাও—লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। যদি তুমি এরূপ করিতে রাজি না হও, তবে তোমার ও-পোশাকী ভালবাসায় আর কাজ নাই। এ কথাটা যেন স্মরণ থাকে যে, আওতায় কখন গাছ বাড়ে না, শীঘ্রই কুড়াইয়া যায়। ফল ত ধরেই না, যদি ধরে ত মিষ্ট হয় না, পাকিতে-না-পাকিতে পোকা লাগে—পোকা লাগিলেই অধঃপাতে যায়।*

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, স্বার্থত্যাগ বা ত্যাগস্বীকারে ভালবাসার আরম্ভ। যিনি ত্যাগে ভীত, ভালবাসা পাইবার জন্য তিনি যেন ভুলেও কখন ইচ্ছা না করেন, প্রয়াস না পান, কারণ তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হইবে, পরিশ্রম পণ্ড হইবে, তিনি স্বভাবত অসিদ্ধ। ভালবাসার যাহা মূলমন্ত্র, সেই ত্যাগস্বীকার বলিলে আমরা কি বুঝি, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

* চুঁচুড়ার ৫ম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণের অংশ-বিশেষের সহিত তুলনীয়।

কোন সাধ্য-সাধনার জন্য আমার যাহা প্রীতিদায়ক, যাহাকে আমি স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি, যাহা আমার সুখের সঞ্চার করিয়া দেয়, অকাতরে এরূপ বস্তুর পরিবর্জনের নাম আত্মত্যাগ বা ত্যাগস্বীকার। উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া লোকে যেমন সহজেই ইহা শিক্ষা করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। আমাদের বিবেচনায় বিবাহ-প্রথার মূলে একটি অতি গভীর অর্থ নিহিত আছে। সে অর্থ সকলে বুঝিতে পারে না, না পারিলেও কিন্তু সংসারের কোন ক্ষতি হয় না, কারণ জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক, সকলেই সেই তত্ত্বানুযায়ী কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া লোকে জগৎকে ভালবাসিতে শিখে এবং আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া অন্যের সুখের জন্য লালায়িত হয়। যদি বিবাহ-বন্ধন না থাকিত তাহা হইলে সংসার চলিত কিনা সন্দেহের কথা। অন্য প্রকারে সৃষ্টি রক্ষিত হইতে পারিত বটে, কিন্তু জগতে সমাজ থাকিত না। আত্মবিসর্জন-ব্রতে কেহই দীক্ষিত হইতে পারিত না। সকলই ভাঙ্গাভাঙ্গা, ছাড়াছাড়া বোধ হইত। প্রথমত ধর, তুমি বিবাহ করিলে—অন্য এক অপরিচিতা রমণীর সহিত সঙ্গত হইলে। ইহাতে বুঝায় কি ?—না তুমি সংসারের একটিকে আপনার করিলে। পরে তোমার সন্তান হইল—তুমি এবার আর দশটিকে আপনার করিয়া লইলে। অভ্যাসের বর্ধমান গুণে সমস্ত জগৎ তোমার আপনার হইল, অন্যের সহিত তোমার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তুমি যে একটি ক্ষুদ্র পরিবার সৃষ্টি করিয়াছ, তোমার সেই পরিবার এক্ষণে মানব-সমাজরূপ বিরাট্ পরিবারের অঙ্গীভূত হইল। তুমি এক্ষণে অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, ঘরে-বাহিরে কতকগুলি শক্তিদ্বারা চালিত হইতে লাগিলে, অর্থাৎ তুমি অন্যের অধীন হইলে, সমাজের অনুগত ভৃত্য হইলে। এখন কেবল তোমার নিজের সুখ দেখিলে চলিবে না। আর দশজনের সুখের প্রতি তোমার এখন দৃষ্টি রাখা চাই। তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জন করিলে এবং দশজনকে আগে খাওয়াইয়া তবে খাইতে পাইবে—এক কথায় বলিতে গেলে, তোমাকে এখন ত্যাগস্বীকার অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপে যখন দেখিবে অভ্যাসে সিদ্ধ

হইয়াছে, তখনই বুঝিবে তোমার সংসারে ভালবাসা অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়াছে—তোমার সংসার সোণার সংসার হইয়াছে। অতএব ভালবাসাই সংসারের বন্ধন, সমাজের মূলমন্ত্র এবং মনুষ্যত্বের বীজ।

নবজীবন ১ম ভাগ মাঘ ১২৯১

সুখের হাট ও সৌন্দর্যের মেলা

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবকাল হইতে মানুষ সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ চিরকাল বলিয়া আসিতেছে যে সুখ পৃথিবীতে নাই, যদিও থাকে, বড়ই দুষ্প্রাপ্য। পৃথিবী মানুষের কান্নায় ভরা। মানুষ বলে, ভগবান্ মানুষের অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই, দুঃখই লিখিয়াছেন। তাই মানুষ চিরকাল দুঃখের কান্না কাঁদিতেছে।

ধর্মযাজকেরা সর্বদেশে সর্বসময়ে বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে সুখ নাই, সুখ স্বর্গে—এ জন্মে সুখ নাই, সুখ মৃত্যুর পরলোকে। খৃস্টীয় ধর্মযাজকেরা বলিয়া থাকেন যে, এ জন্মটায় মানুষের কেবল পরীক্ষা, সেই পরীক্ষার ফলস্বরূপ মানুষের সুখদুঃখ মানুষের মৃত্যুর পর পরলোকে। এ পৃথিবীতে সুখ নাই।

যাঁহারা ধর্মযাজক নহেন, এমনি তোমার আমার মতন মানুষ, তাঁহারা সুখ খুঁজিয়া বেড়ান, মনে করেন বুঝি সুখ কোন স্থানে বা কোন জিনিসে লুকানো আছে। আবার কোন্ স্থানে বা কোন্ জিনিসে সুখ লুকানো আছে ঠিক করিতে না পারিয়া তাঁহারা সুখের জন্য সর্বদাই অস্থির, সর্বদাই লালায়িত, সর্বদাই সন্তপ্ত। তাঁহারা কখনও এ-জিনিসটা দেখিতেছেন, ইহাতে সুখ আছে কিনা; কখনও ও-জিনিসটা দেখিতেছেন, উহাতে সুখ আছে কিনা; কখনও এ-কাজটা করিয়া দেখিতেছেন, ইহাতে সুখ পাওয়া যায় কিনা; কখনও ও-কাজটা করিয়া দেখিতেছেন, উহাতে সুখ পাওয়া যায় কিনা। এত দেখিয়াও হয়ত সুখ পান না, আর যদিও পান, হয়ত সে সুখ দুঃখের সহিত মিশ্রিত, নয়—দুই দিনের বেশি থাকে না। তাই তাঁহারা বলেন যে পৃথিবীতে সুখ নাই, থাকিলেও না-থাকারই মধ্যে।

কিন্তু প্রকৃত কথাটা কি? সুখ কি সত্যসত্যই পৃথিবীতে নাই? থাকিলেও, তাহা কি এতই দুষ্প্রাপ্য, পরিমাণে এতই কম? সুখকে কি এতই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়? না তাহা নহে। পৃথিবীতে সুখের পরিমাণ নাই—সুখ যথার্থই অপরিসীম। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে, এই অনন্ত জগতে সুখের ছড়াছড়ি, সুখের ঢলাঢলি, সুখের গড়াগড়ি। এই অসীম অনন্ত জগৎ—অসীম অনন্ত সুখের অসীম অনন্ত হাট। এ অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ সুখের হাটে কত জিনিস আছে, বল দেখি? কত রকমের জিনিস আছে, বল দেখি? কাহার সাধ্য বলে কত জিনিস, কাহার সাধ্য বলে কত রকমের জিনিস! আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর, একটা ক্ষুদ্র দেশের, একটা ক্ষুদ্র বিভাগের, একটা ক্ষুদ্র গ্রামের, একটা ক্ষুদ্র পল্লীতে কত জিনিস এবং কত রকমের জিনিস আছে, বল দেখি? কত গাছ এবং কত রকমের গাছ আছে, বল দেখি? কত লতা এবং কত রকমের লতা আছে, বল দেখি? কত পাতা এবং কত রকমের পাতা আছে, বল দেখি? কত পাখী এবং কত রকমের পাখী আছে, বল দেখি? আর জিজ্ঞাসাই-বা করিব কত? জগতে জিনিসের সংখ্যারও সংখ্যা নাই, জিনিসের রকমেরও সংখ্যা নাই। তাই বলি যে, এই অসীম অনন্ত জগৎ একটি অসীম অনন্ত হাট, এবং এই অসীম অনন্ত হাট অসংখ্য দ্রব্যে ভরা। এই অসংখ্য-দ্রব্য-পূর্ণ হাটের বিশালতা ভাবিয়া দেখিতে গেলে মন স্তম্ভিত হইয়া যায়, অন্তঃকরণ আনন্দমাখা-গাম্ভীর্যে ভরিয়া উঠে। এই অসীম অনন্ত হাটের অসংখ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্য অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে। অভ্রভেদী অসীমকায় হিমাচলও যেমন অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে, ক্ষুদ্রতম বালুকাকণাও তেমনি অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে। কথাটা কি কিছু অসঙ্গত বোধ হইল? তবে বুঝাই, শুন। অসীমকায় হিমাচলে জগদীশ্বরের অসীম শক্তি দেখিতে পাও বলিয়া হিমাচল দেখিলে অন্তঃকরণে এত সুখ উছলিয়া উঠে। কিন্তু বিন্দুবৎ বালির কণাতেও কি জগদীশ্বরের অসীমশক্তি দেখিতে পাও না? তবে কেন হিমাচল দেখিলে অন্তঃকরণেও যেমন সুখ উছলিয়া উঠে, বালির কণাটি

দেখিলেও অন্তঃকরণে তেমনি সুখ উছলিয়া উঠে না? তবেই ত বলিতে হয় যে অসীমকায় হিমাচলকে যে চক্ষে দেখ, বিন্দুবৎ বালির কণাটিকে সে চক্ষে দেখ না। অতএব এ কথা ঠিক যে, যে চক্ষে হিমাচল দেখ, সেই চক্ষে বালির কণা দেখিলে হিমাচল হইতে যত সুখ পাও বালির কণা হইতেও তত সুখ পাইবে। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, জগতে যাহা-কিছু আছে সকলই অসীম, সসীম কিছুই নাই। অনন্ত বিশ্বমণ্ডলও যেমন অসীম, বিন্দুবৎ বালির কণাটিও তেমনি অসীম। বালির কণাটিকে যে ক্ষুদ্র বা সসীম বলো, সে কেবল চর্মচক্ষের ভাষায় বলো, মনশ্চক্ষের ভাষায় সেও অসীম।

রবীন্দ্রবাবু তাঁহার আলোচনা নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্তমান। কথাটা বড়ই ঠিক—কিন্তু আরও একটু বাড়াইয়া লওয়া যায়। বিশ্বের প্রত্যেক বিঘাতে বা প্রত্যেক বালির কণাতে শুধু বিশ্ব বর্তমান নয়, স্বয়ং বিশ্বনাথ বর্তমান। অতএব চর্মচক্ষের মোহ এবং দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া মনশ্চক্ষে দেখিলে জগতের কোন পদার্থকে সসীম বলিয়া দেখিবে না, জগতের সকল পদার্থকেই অসীম বলিয়া দেখিবে, জগতে সীমা বলিয়া একটা জিনিসই দেখিতে পাইবে না। তখন ক্ষুদ্রতম বিন্দুবৎ বালির কণাতেও অসীমত্ব দেখিবে এবং অসীমত্বে মজিলে যে অসীম সুখ ও অসীম আনন্দ হয়, ক্ষুদ্রতম বালির কণা দেখিলেও সেই অসীম সুখ ও অসীম আনন্দে মজিবে। তাই বলিতেছি যে এই অসীম অনন্ত হাটের অসংখ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্য অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে। এ হাটে সুখের সামগ্রী খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না, চক্ষু মেলিলেই অসংখ্য সুখের সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। যেটিকে ইচ্ছা লও, সেইটিকে লইয়াই অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখ পাইবে। আর সকলগুলিকে লইতে ইচ্ছা হয়, সকলগুলিকেই লও, অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখ পাইবে। আবার এই অসীম অনন্ত সুখের হাটে যে-অসংখ্য দ্রব্য সুখ বিক্রয় করিতে বসিয়াছে, তাহারা সুখের বিনিময়ে তোমার কাছে আর কোন মূল্য চায় না, কেবল ঈশ্বরে তন্ময়ত্ব চায়। সেই তন্ময়ত্ব লাভ কর, ঈশ্বরের এই অসীম অনন্ত সুখের হাটে যে-অসংখ্য দ্রব্য সুখ বিক্রয় করিতে বসিয়াছে, তাহারা সকলেই তোমাকে অকাতরে অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখ বিনামূল্যে অসীম মাত্রায় বিক্রয় করিবে। জগৎ কাহাকে বলে, জগদীশ্বর কাহাকে বলে, সুখ কাহাকে বলে মানুষ বুঝে না বলিয়া এই অসীম অনন্ত সুখের হাটের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া 'জগতে সুখ নাই', 'জগতে সুখ নাই' বলিয়া সে চিরকাল কাঁদিতেছে এবং অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে!

জগতে যত দ্রব্য আছে সকলেই অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখ দান করে, এ কথাটা ঠিক কিনা একটু ভাল করিয়া দেখা যাক। যাঁহারা ইংরাজি সাহিত্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে একটা গোলাপ ফুল দেখিলে যে আনন্দ—যে সুখ হয়, একটা আকন্দ ফুল দেখিলেও কি সেই আনন্দ, সেই সুখ হইতে পারে? একটা পর্বত দেখিলে যে আনন্দ, যে সুখ হয় একটা মাটির ঢিবি দেখিলে কি সেই আনন্দ সেই সুখ হইতে পারে? গোলাপ ফুল সুন্দর, পাহাড় সুন্দর, অতএব পাহাড় ও গোলাপ ফুল দেখিলে সুখ হয়; আকন্দ ফুলও সুন্দর নয়, মাটির ঢিবিও সুন্দর নয়, তবে কেমন করিয়া আকন্দ ফুল বা মাটির ঢিবি দেখিলে সুখ হইবে?—Beauty বা সৌন্দর্য বলিয়া একটা জিনিস আছে। সেটা কিন্তু পৃথিবীর সকল পদার্থে নাই। যে পদার্থে তাহা আছে মানুষ সেই পদার্থ হইতে সুখ ও আনন্দ লাভ করে; যে পদার্থে তাহা নাই, মানুষ সে পদার্থ হইতে সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে না। ইউরোপীয় সাহিত্যের যে ভাগকে æsthetic বা fineart বলে সেই ভাগে এই সকল কথা পাওয়া যায়। অতএব আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইউরোপীয় সাহিত্যের সেই ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য বলিতে পারেন যে, সকল পদার্থ যখন সুন্দর নয়, তখন সকল পদার্থই যে অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখ দান করিতে পারে, এ রকম কথা বলা অন্যায় ও অসঙ্গত।

কিন্তু এ কথার একটি উত্তর আছে। জগতে যে-সকল পদার্থ আছে, সেই-সকল পদার্থকে যদি কেবল চর্মচক্ষু দিয়া দেখ তবে তাহাদের অনেককে সুন্দর এবং অনেককে অ-সুন্দর বা কুৎসিত বলিয়া বোধ হইবে। চর্মচক্ষে একটা গোলাপ

ফুল বা একটা পর্বত যেমন সুন্দর, একটা মাটির ঢিবি বা একটা আকন্দ ফুল তেমন সুন্দর নয়। অতএব পর্বত বা গোলাপ ফুল দেখিলে যেমন সুখ হইবে, মাটির ঢিবি বা আকন্দ ফুল দেখিলে তেমন সুখ হইবে না। কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখিলে গোলাপ ফুলও যেমন সুন্দর, আকন্দ ফুলও তেমনি সুন্দর দেখিবে। চর্মচক্ষে আকার অবয়ব বর্ণ প্রভৃতি দেখা যায়। আকার অবয়ব বর্ণ প্রভৃতির কমবেশি ভালমন্দ ইতর-বিশেষ আছে। অতএব যে-সকল জিনিস চর্মচক্ষে দেখ, তাহা সমান সুন্দর এবং সমান প্রীতিকর না হইতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে হয়ও না। কিন্তু সকল পদার্থের মধ্যে যে-ব্রহ্ম-শক্তি বা ব্রহ্ম-পদার্থ মানসচক্ষে দেখ, তাহার আর কমবেশি ভালমন্দ ইতরবিশেষ নাই, তাহার পরিমাণও অসীম, সৌন্দর্যও অসীম। অভ্রভেদী অনন্তকায় হিমাচলস্থিত ব্রহ্ম-পদার্থও যেমন অসীম ও সুন্দর, বিন্দুবৎ বালুকা-কণাস্থিত ব্রহ্ম-পদার্থও তেমনি অসীম ও সুন্দর। কোকিলের কলকণ্ঠস্থিত ব্রহ্ম-পদার্থও যেমন অসীম ও সুন্দর, কাকের কর্কশ কণ্ঠস্থিত ব্রহ্ম-পদার্থও তেমনি অসীম ও সুন্দর। নির্ঝরিণীর নির্মল জলস্থিত ব্রহ্ম-পদার্থও যেমন অসীম ও সুন্দর, পঙ্কিল পল্বলের জলস্থিত ব্রহ্ম-পদার্থও তেমনি অসীম ও সুন্দর। অতএব মনশ্চক্ষে দেখিলে জগতে যত পদার্থ আছে সবই সমান সুন্দর; এবং মনশ্চক্ষে দেখিলেই এই অসংখ্য পদার্থপূর্ণ অসীম অনন্ত জগৎ একটি অসীম অনন্ত সৌন্দর্যের মেলা। উপরে যে অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখের হাটের কথা বলিয়াছি, সে এই অসীম অনন্ত অপূর্ব সৌন্দর্যের মেলারই নাম। এই অসীম অনন্ত অপূর্ব জগৎ, অসীম অনন্ত অপূর্ব সৌন্দর্যের মেলা বলিয়াই অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখের হাট হইয়াছে। এমন হাটে আসিয়া আবার সুখ খুঁজিতে হয়, না, সুখের জন্য কাঁদিতে হয়!

তবে চর্মচক্ষে যে সৌন্দর্য দেখা যায় তাহা কি কিছুই নয়? কিছু নয় এমন কথা বলি না। তাহাও খুব ভাল জিনিস এবং তাহা দেখিলেও খুব সুখ হয়। কেনই-বা না হইবে? তাহাতেও ত সেই অসীম অনন্ত সুন্দর ব্রহ্ম-পদার্থ রহিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা আছে। চর্মচক্ষে যে সৌন্দর্য দেখা যায়, সে সৌন্দর্য যদি তোমাকে আর কোন রকম সৌন্দর্য না দেখিতে দেয়, তবে সে সৌন্দর্যকে সৌন্দর্য বলিয়া গণনা না করাই ভাল, সে সৌন্দর্য না দেখাই উচিত। চর্মচক্ষে যে সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া যে পদার্থে সে সৌন্দর্য নাই সে পদার্থে যে ব্যক্তি কোন রকম সৌন্দর্য দেখিতে পায় না, তাহাকে যত বড় কবি বা সুরুচি-সম্পন্ন মানুষ বল না কেন, সে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ নয়। তাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় নাই বলিলেই হয়। যে সৌন্দর্য চর্মচক্ষে দেখা যায়, আমার বোধ হয় যে ইউরোপীয় সাহিত্যের æsthetic ভাগ মানুষকে সেই সৌন্দর্যের কিছু বেশি পক্ষপাতী করিয়া তুলে; এবং সেই জন্য ইউরোপীয়েরা পদার্থকে সুন্দর এবং অসুন্দর বলিয়া যত পৃথক্ করিয়া থাকে, এ দেশের লোক তত করে না, এবং ইউরোপীয় সাহিত্যেও সুন্দর-অসুন্দর বলিয়া পদার্থের যত প্রভেদ এবং সুরুচি-কুরুচি লইয়া যত গণ্ডগোল দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু সাহিত্যে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। চর্মচক্ষে যে সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সংস্কৃত কাব্যে সে সৌন্দর্যের অপরিমিত সমাবেশ আছে। কিন্তু যে পদার্থে তাহা নাই, সে পদার্থের প্রতি ইউরোপীয় সাহিত্যে যেরূপ ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং সংস্কৃত ও ইউরোপীয় সাহিত্য কিছু বেশি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাহ্য জগৎ এবং বাহ্য সৌন্দর্য সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু বেশি মনের দিক্ দিয়া বর্ণিত এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে কিছু বেশি চর্মচক্ষের দিক্ দিয়া বা বাহ্যেন্দ্রিয়ের দিক্ দিয়া বর্ণিত হয়। ইউরোপীয় কবি সূর্যাস্তের শোভা কেবল চোখ দিয়া দেখিতে বলেন; হিন্দু কবি ম্রিয়মাণ কমলিনীর জন্য এবং বিচ্ছেদগ্রস্ত চক্রবাক চক্রবাকীর জন্য না কাঁদিয়া শুধু চর্মচক্ষে সূর্যাস্ত দেখিতে বলেন না। রং শুধু রং বলিয়া, আকার শুধু আকার বলিয়া, অবয়ব শুধু অবয়ব বলিয়া, রূপ শুধু রূপ বলিয়া, লাবণ্য শুধু লাবণ্য বলিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যে যত প্রশংসিত, সংস্কৃত সাহিত্যে তত প্রশংসিত হয় না। হিন্দু সকল পদার্থে ব্রহ্ম-পদার্থ দেখেন বলিয়া তাঁহার সাহিত্যে সুন্দর অসুন্দর বলিয়া পদার্থের প্রভেদ নাই এবং চর্মচক্ষে যে সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়,

সে সৌন্দর্যের একাধিপত্যও নাই। ইউরোপবাসী জগৎ হইতে জগদীশ্বরকে পৃথক্ দেখেন বলিয়া তাঁহার সাহিত্যে সুন্দর অসুন্দর বলিয়া পদার্থের এত প্রভেদ এবং চর্মচক্ষে যে সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার এত আধিপত্য। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সংস্কারের প্রভেদবশত নানা বিষয়ে কত গভীরতর গুরুতর প্রভেদ ঘটিয়া পড়ে, এখন বুঝিতে পারিবে।

তাই বলি, যে-শাস্ত্র মানুষকে বাহ্য সৌন্দর্যের বিশেষ পক্ষপাতী করে, সে-শাস্ত্র বড়ই অনিষ্টকর, সে-শাস্ত্র অতি সাবধানে অধ্যয়ন করা কর্তব্য। বাহ্য সৌন্দর্যের পক্ষপাতী হইলে তোমাকে সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে, কেন-না সকল পদার্থের বাহ্য সৌন্দর্য নাই। অতএব যে-শাস্ত্র তোমাকে বাহ্য সৌন্দর্যের পক্ষপাতী করে, সে-শাস্ত্র তোমার সুখের ভাণ্ডার কম করিয়া দেয়, এবং সুখের ভাণ্ডার কম করিয়া তোমাকে অস্থির এবং অসুখী করে। সে-শাস্ত্রের ভক্ত হইলে এই যে অসীম অনন্ত অপূর্ব সৌন্দর্যের মেলা ইহাও ভাঙ্গিয়া যাইবে, এই যে অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখের হাট—ইহাও ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আর তুমি জীব-প্রধান মানুষ, তুমি কি কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের গুণে জীব-প্রধান? তোমার মন, তোমার জ্ঞান, তোমার হৃদয় লইয়াই কি তুমি জীব-মধ্যে প্রধান নও? তবে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়-দ্বারা জগৎ দেখিলে জীব-মধ্যে তোমার প্রাধান্যই-বা কেমন করিয়া হয়, আর তোমার জগৎ-দেখা কার্যটা মানুষের জগৎ-দেখা কার্যই-বা কেমন করিয়া হয়? চর্মচক্ষে যে সৌন্দর্য দেখা যায় সে সৌন্দর্যেও ব্রহ্ম-পদার্থ আছে, অতএব সে সৌন্দর্যও দেখ, সে সৌন্দর্যও ভালবাস। কিন্তু সে সৌন্দর্যের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া মনশ্চক্ষু এবং হৃদয় দিয়া যে বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য দেখা যায়, সে সৌন্দর্য দেখিতে যদি না পাও, তবে জানিও যে মানবোচিত উৎকৃষ্ট প্রকৃতিও তুমি পাও নাই এবং উৎকৃষ্ট প্রকৃতির মনুষ্যের জন্য যে অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখের হাট এবং সৌন্দর্যের মেলা খোলা রহিয়াছে সে হাটে এবং মেলায় প্রবেশ করিবার অধিকারও তোমার হয় নাই। হিন্দু ঋষিরা উৎকৃষ্ট প্রকৃতি-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া জগৎকে প্রধানত মানসচক্ষে দেখিতেন, এবং মানসচক্ষে দেখিয়া জগৎকে সুখময় দেখিতেন, জগতে সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেন না। ইউরোপের মহাপুরুষেরা খুব মহান্ হইয়াও মানব প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ লাভ করেন নাই বলিয়া জগৎকে প্রধানত মানসচক্ষে না দেখিয়া চর্মচক্ষে দেখেন, এবং সেইজন্য জগৎকে সুন্দর-অসুন্দর, সুখময়-দুঃখময়, দুইভাগে বিভক্ত করিয়া জগতে সুখ ও সৌন্দর্য খুঁজিয়া বেড়ান, এবং সুখের অনুসন্ধানে সদাই অস্থির ও অসুখী হইয়া থাকেন। ইউরোপে মানবের আধ্যাত্মিকতা কিছু নিকৃষ্ট বলিয়া তথায় æsthetic বিদ্যার এত প্রাধান্য; ভারতে মানবের আধ্যাত্মিকতা বড়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া তথায় æsthetic বিদ্যা নাই বলিলেই হয়, এবং æsthetic বিদ্যা পরমার্থ বিদ্যায় এক রকম লয় হইয়া গিয়াছে। আজিকার দিনে আমরা æsthetic বিদ্যাকে পরমার্থ বিদ্যায় লয় করিয়া দিতে পারিব কিনা, ঠিক বলিতে পারি না, এবং ততটা লয় করিয়া দেওয়াও আবশ্যক কিনা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু æsthetic বিদ্যাকে পরমার্থ বিদ্যা হইতে পৃথক্ করি আর নাই-করি, উহাকে পরমার্থ বিদ্যার সম্পূর্ণ অধীন না করিলে আমরা মানব-প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারিব না, এবং এমন যে অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখের হাট এবং সৌন্দর্যের মেলা খোলা রহিয়াছে, ইহাতেও প্রবেশ করিতে পারিব না,—সুখ খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরিব, অসুখেই কাল কাটিবে!

নবজীবন ২য় ভাগ পৌষ ১২৯২

গগন-পটো

গগন-পটোকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ; পথে-ঘাটে দাঁড়াইয়া কত বারই দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু তোমরা সকলে তাহার গুণাগুণ জান না, তাই আমাদিগকে আজ তোমাদের কাছে সেই পরিচিতের পরিচয় দিতে হইতেছে।

কারিগর লোক প্রায়ই একটু খাম্‌খেয়ালি হয়; কেহ বদ্ মেজাজের উপর খাম্‌খেয়ালি, আর কেহ-বা রস্‌ক্ষেপার উপর খাম্‌খেয়ালি। কিন্তু গগন-পটোর মত খাম্‌খেয়ালি রস্‌ক্ষেপা লোক আর দুনিয়ায় নাই। সে যদি কখনও কাহারও ফর্‌মাস মত চিত্র করিল! আপনার মনে আপনার

ঝোঁকে নিয়তই আঁকিতেছে, আর পুঁছিতেছে, কিন্তু যখন যেটা দাঁড় করাইবে, সেটা একেবারে চূড়ান্ত। যেমন রং আর তেমনি 'শেড্'; যেমন ভাব-ভঙ্গি, তেমনি অঙ্গ-সৌষ্ঠব! তাহাতেই বলিতেছিলাম, গগন-পটো খাম্‌খেয়ালি বটে, কিন্তু মস্ত কারিগর।

তবে গগনের অনেক সময় সময়-অসময়-বোধ নাই। প্রথম আলাপে সেইজন্য গগনের উপর বড়ই বিরক্ত হইতে হয়; কিন্তু তাহার পর ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝা যায়, লোকটা অসাময়িক হইলেও বদ্‌রসিক নহে; রস্‌ক্ষেপা বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে লুকানো ছাপানো সহৃদয়তা বিলক্ষণ আছে। তবে সহিষ্ণুতা না থাকিলে, ঘনিষ্ঠতা না হইলে তাহার সেই ভাবটুকু কিন্তু বুঝিয়া উঠা ভার।

তুমি স্বজনের সদ্যোনাশে শোকে জরজর, সংসার আঁধার দেখিতেছ, থাকিয়া থাকিয়া তলদেশে মেদিনী ঘুরিতেছে, বাতাসে হুহু করিয়া সেই স্বজনের নাম ধ্বনিত হইতেছে, বুকের ভিতর বামদিকে কে যেন কীলক পুঁতিয়া দিয়াছে,—ঘোরতর বিষাদে তুমি অবসন্ন হইয়াছ। আকুলস্বরা কুলকুলনাদিনী কল্লোলিনীর তীরে তুমি অবসাদে উপবিষ্ট হইয়া আছ। দূরে গগন-পটোর চিত্রপটে তোমার দৃষ্টি পড়িল। সে যেন তোমাকেই ভুলাইবে বলিয়া রং ফলাইয়া বসিয়াছিল; তুমি চাহিবা মাত্রই অমনই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার পটে আঁকিতে বসিয়া গেল। শোকগম্ভীর হৃদয় সহজেই এক-মনস্ক হয়,—তুমি একমনে সেই অপূর্ব চিত্রণ দেখিতে লাগিলে। তোমার সেই স্বজনের সৌম্যমূর্তিই-বা আঁকিবে। তা'ত নয়!—ভীষণ-দংষ্ট্র একটা বিষম ব্যাঘ্র কাহাকে যেন কামড়াইয়া রহিয়াছে। তোমার বোধ হইল, সেই ব্যাঘ্র-দষ্ট ব্যক্তিই যেন তোমার স্বজন। তোমার বুকের শেল কে যেন নাড়িয়া দিল, তোমার মর্ম-জ্বালা হইল,—গগন-চিত্রকরকে মহা নিষ্ঠুর স্থির করিয়া মহা বিরক্ত হইলে।

তুমি মুখ ফিরাইবে, এমন সময় চকিতের মধ্যে দেখিলে যে, চিত্রপটে আর সে ভয়ানক ব্যাঘ্র নাই, তোমার সেই ভূপাতিত বন্ধু সৌম্যমূর্তিতে গগনের পট শোভা করিতেছেন, আর, একখানি সুন্দর হস্ত যেন তাঁহাকে আস্তে আস্তে কোথায় মন্দ মন্দ লইয়া যাইতেছে। তোমার প্রাণ যেন একটু শীতল হইল, তুমি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলে; ভাবিলে, গগন-পটো ক্ষেপা হউক, আর যাহাই হউক—মনের কথা বুঝিতে পারে,—পোড়া মন একটু শীতল করিতে পারে। মনে যদি একবার ধারণা হয় যে, লোকটা সহৃদয় এবং তোমার ব্যথার ব্যথী, তাহা হইলেই তাহাকে ভালবাসিতে হয়। আর হৃদয় যখন শোকে-তাপে গম্ভীর, তখন সেই ভালবাসাও এক দিনে—এক মুহূর্তে প্রগাঢ় হইয়া পড়ে। তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিলে যে, গগন তোমার ব্যথার ব্যথী, অমনই যেন তাহার উপর তোমার একটু ভালবাসা জন্মিল। তুমি নদীতীরস্থ শষ্পশয্যায় শায়িত হইয়া একমনে, স্থিরনয়নে গগনের খাম্‌খেয়ালির কারিগরি পর্যালোচনা করিতে লাগিলে।

গগন আঁকিল—একটা বৃহৎ কুম্ভীর, সূচালো মুখ, কর্কশ গাত্র, কণ্টকিত লাঙ্গুল, কপিল বর্ণ, ভয়ঙ্কর ভঙ্গি—সব ঠিকঠাক হুবহু,—যেন অগাধ নীল জলে সাঁতার দিতেছে। হঠাৎ কুম্ভীর দ্বিখণ্ডীকৃত হইল, গায়ের কাঁটাগুলি তুলার মত ফুলো ফুলো হইল, মুখ-কোণ সংযত হইল, রংটা কেমন একটু ঘোলা ঘোলা হইল। পরক্ষণেই দেখ, দুইটি নিরীহ মেষ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সেই নীল প্রান্তরে শনৈঃশনৈ বিচরণ করিতেছে। তুমি ভাবিতেছ, ভয়ঙ্কর কুম্ভীর যমজ মেষ-শিশু হইল; ভাবিতে না ভাবিতেই সে চিত্র নাই। সেই মেষদ্বয়ের স্থলে বিচিত্র বর্ণের বৃহৎ এক সদণ্ড পতাকা, খর খর বাতাসে যেন ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে। স্বজন-বিয়োগ-চিন্তা তোমার মন হইতে ক্ষণেকের তরে অন্তর্হিত হইল। বিষম রস্‌ক্ষেপা গগন তোমাকে আপনার পাগলামীর কীর্তি দেখাইয়া তোমাকে হাসাইল। তোমার সেই মলিন ম্লান মুখের অধর-প্রান্তে সেই অন্তরের হাসি ঈষৎ দেখা দিল। তুমি অন্তরে বলিলে, পাগলা পটোর ভিতরের কথাটা ঠিক—সংসারের সকলই ত এইরূপ পরিবর্তনশীল, তা ঐ কেবল স্থাবর চিত্র আঁকিবে কেন?

এই চিন্তায় তুমি অন্যমনস্ক হইয়াছিলে,—দেখিলে সে বিচিত্র নিশান আর নাই,—মৃদু আভায় একটি স্থির চিতা যেন ধীরিধীরি জ্বলিতেছে। সেই চিতার মধ্যে অস্পষ্ট অবয়বে তোমার সেই স্বজনের শবমূর্তি। শবদেহ কিন্তু

নিষ্প্রভ নহে,—সূর্যাস্ত-কালের পূর্বদিকের পাত্‌লা মেঘের উপর ক্ষীণ রামধনুর ন্যায় একটু হাসি যেন সেই মুখ-প্রান্তে দেখা দিতেছে, চক্ষুর্দ্বয়ের প্রশান্ত শীতল জ্যোতি গগনের চিত্রান্তরে যেন স্থাপিত রহিয়াছে। সে চিত্র গগনের আর এক অপূর্ব কীর্তি। স্বর্ণময়ী একটি দিব্যাঙ্গনা সতী-স্বভাব-সুলভ লজ্জায়, অথচ প্রৌঢ়-প্রোষিত-ভর্তৃকার স্বামি-সমাগমের আগ্রহে এবং বনশোভিনী সদ্যঃকুসুমিতা বসন্ত-লতার প্রফুল্লতা-ভরে সেই চিতার সজীব, সহাস্য শব-দেহটিকে সুকোমল হস্ত-প্রসারণে আহ্বান করিতেছেন। সেই কাঞ্চনময়ী দিব্য মূর্তিতে তুমি তোমার বন্ধুর মৃতা পত্নীর মুখশ্রী লক্ষ্য করিলে ;—সেইরূপ পুরু পুরু জোড়া ভ্রূ—যেন তেমনই করিয়াই নীচের দিকে নামানো আছে, সেই স্থির নয়নে যেন তেমনই করিয়াই জ্যোৎস্না মাখানো আছে!

উপর স্তরে দিব্যাঙ্গনা ভাসিয়া ভাসিয়া নিম্নস্তরের চিতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নিম্নস্তরের চিতাও শবদেহ লইয়া দিব্যাঙ্গনার দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল,—কাছাকাছি হইল, তোমার চক্ষুতে জল আসিল ; চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলে সে সব আর কিছু নাই,—গগন-পটো নীল পটের এখানে সেখানে কেবল কাঁচা সোণার স্তবক আঁটিতেছে, আর তাহাতে জরদ, ধূমল, পাংশু কত বিচিত্র রঙের শেড্‌ দিতেছে। তুমি উঠিয়া বসিলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলে, এবার মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিলে,—'গগন সকলকেই জানে,—সকলকেই চেনে ; আমরা কিন্তু উহাকে কেহই চিনিতে পারিলাম না। দেখ, আমাদের সকল সংবাদই রাখে, আমরা কিন্তু উহার কিছুই জানি না।'

গগনের কার্য-সাধন হইয়াছে। তাহার সহিত একবার ঘনিষ্ঠতা করিলেই সে তাহার অস্থাবর পট দেখাইয়া তোমার কিছু-না-কিছু ভাল করিবেই। হয় তোমার মনের কবাট খুলিয়া দিবে, নয় তোমার শোকের সান্ত্বনা করিবে। কখন হয়ত তোমার আনন্দের সংবর্ধনা করিবে, আবার কখন হয়ত তোমাকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিবে। আজ সে তোমার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিয়াছে, তোমার মাথা হাল্‌কা হইয়াছে বটে,—এখন আর ঘুরিতেছে না ; বাতাস এখনও হুহু করিতেছে—এখনও পিলুরাগিণীতে ভরিয়া আছে, কিন্তু এখন ত আর তোমার বন্ধুর নাম করিয়া কাঁদিতেছে না ; বুকে এখনও শেল বিঁধিয়া আছে বটে, কিন্তু তেমন করিয়া আর ত কেহ তাহাকে মোচড় দিতেছে না। গগনের কার্য সমাধা হইয়াছে। গগন তোমার শোক-বহ্নির প্রখরতা নষ্ট করিয়াছে। তুমি এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া দেখিলে পশ্চিমের দিক্‌-চক্রবাল ব্যাপিয়া ঘন-সন্নিবেশিত শাল-বিটপি-আচ্ছাদিত পর্বত-বেদীর উপরি জ্বলন্ত কাঞ্চনরাগে এক অপূর্ব প্রতিমা দীপ্তি পাইতেছে। গগন-পটোর সেই এক প্রিয় প্রতিমা। মাস মাস ধরিয়া প্রত্যহই আঁকে, আর প্রত্যহই পুঁছিয়া ফেলে,—তাহার বিরক্তিও নাই, তৃপ্তিও নাই।

ঐ প্রতিমা একখানি আশ্চর্য ছবি। গগন-পটো প্রায়ই প্রত্যহ আঁকে, আর আমরাও ত প্রায়ই প্রত্যহ দেখি, তবু নিত্যই নূতন। পুরাণের পুরাণ মহাপুরাণকে নূতন করিয়া দেখাইতে গগন-পটো যেমন পটু, এমন আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু কেবল তাই বলিয়া যে পশ্চিমের প্রতিমা আশ্চর্য ছবি, তাহা নহে। ও-এক আজগুবি কাণ্ড।—মুখ নাই অথচ দেখ কেমন হাসিতেছে ; চোখ নাই , ভ্রূ নাই—তবু দেখ কেমন চোখ রাঙ্গাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া রহিয়াছে। আর আশ্চর্যের আশ্চর্য—ঐ মধুর হাসিতে আর ঐ ভীষণ ভ্রূকুটিতে দেখ দেখি কেমন মাখামাখি, কেমন মেশামেশি! পৌরাণিকী অন্ধকারময়ী কালীমূর্তিতে একবার প্রসন্নাং স্মিতাননাং করালবদনাম্‌ দেখিয়াছ, আর একবার গগন-পটোর ঐ জ্বলন্ত চিত্রে ললিতে-ভৈরবে, কোমলে-ভীষণে অপূর্ব মিলন দেখ। ঐ দেখ কেমন অপূর্ব হাসি! ঢল ঢল তপ্ত কাঞ্চনসাগরে যেন অমৃতের লহরী উঠিল। ঐ দেখ কেমন রাগ! ব্রহ্ম-কোপানলে যেন খাণ্ডব-দাহ হইবে। ঐ দেখ নিঃশব্দ, তবু যেন তোমাকে স্বর্গের বার্তা ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিতেছে ; চক্ষু নাই, তবু যেন তোমার মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। আর দেখ, নিশ্চল, সুস্থির—তথাপি যেন হাত তুলিয়া তোমাকে অভয়-দান করিতেছে, আশীর্বাদ করিতেছে। এস, আমরা প্রণত হই। সঙ্গে সঙ্গে মহাশিল্পী গগন-চিত্রকরকে নমস্কার করি এবং তাহার ওস্তাদকে একবার দেখাইবার জন্য তাহার কাছে প্রার্থনা করি।

গগন-দাদা! তোমার ক্ষেপামীতে ক্ষান্ত দিয়া একবার আমাদের গুটিকত কথা শুন। গঙ্গার উপর তোমার প্রভাতচ্ছবি, পর্বত-পৃষ্ঠে তোমার এই সন্ধ্যার প্রতিমা, প্রাবৃটের সেই ঘনকৃষ্ণ সিংহাসন, নিদাঘের সেই রৌদ্রমূর্তি—ও-সকল কারিগরি তোমার অনেকবার দেখিয়াছি। তোমার বিচিত্র পট দেখিয়া অনেকবার জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি; কিন্তু ঐ সকল বিচিত্র চিত্রে আত্মহারা হই বটে, অথচ পরমার্থ পাই না, তুষ্টি হইলেও তৃপ্তি হয় না। না দাদা, আর ক্ষেপামী করিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। তোমার এই সকল ছায়াময়ী প্রতিমার অন্তরস্থ প্রতিমা আমাকে সেই সে দিনের মত আর একবার দেখাও। তোমার সেই বিষম ভেল্কি আর একবার ভাঙ্গিয়া দাও। এই ছায়াবাজির ছায়া-পট একবার ক্ষণ-মুহূর্ত-জন্য সরাইয়া দাও—আমি আর একবার তোমার সেই নীল, নীল, অতি নীল বাজি-ঘরের অভ্যন্তরস্থ তোমার ওস্তাদকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব। সে দিন তুমি দেখাইলে বটে, কিন্তু আমি যে কি দেখিলাম, তাহার কিছুই বুঝিলাম না। কোমলের কোমল অতি কোমল বংশীরবে আমার মোহ হইল; নীল-মধ্যে অতি নীল দেখিতেছিলাম, সমস্ত জগৎ নীল আভায় প্রতিভাত হইল—আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর তুমি তোমার ছায়াপটে তুলারাশি ছড়াইয়া হাসিতে লাগিলে। না দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, এবার আর ও-সময়ে ক্ষেপামী করিও না; ভাল করিয়া তোমার ওস্তাদকে একবার দেখাও।

নবজীবন ২য় ভাগ পৌষ ১২৯২

শ্যেনকপোত এবং শাইলকের কথা

১

ইংরাজের কাছে হিন্দু নানা দোষে দোষী। ইউরোপের কাছে এশিয়া ঘোর অপরাধে অপরাধী। এশিয়ার সহিত তুলনা করিয়া ইউরোপ আপনাকে কষ্ট-সহিষ্ণু এবং উন্নতিশীল বলিয়া প্রশংসা করে এবং এশিয়াকে বিলাস-প্রিয় এবং অবনতি-প্রবণ বলিয়া নিন্দা করে। ভারতের ইংরাজ যে ভারতের হিন্দুকে অশেষ দোষে দোষী বলিবে, সে কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু বিদ্বান্, বিচক্ষণ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইউরোপও যে হিন্দুর সেইরূপ কলঙ্ক ঘোষণা করে, ইহা একটু বিস্ময়কর। The ease-loving Oriental—এই নিন্দাবাদ শুধু ইংরাজের মুখে নয়, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি সকল ইউরোপবাসীর মুখে শুনা যায়। তবে ইংরাজের মুখে যতটা, অপর ইউরোপবাসীর মুখে ততটা শুনা যায় না। এই নিন্দাবাদ যে একেবারে অমূলক এমন কথা বলি না। ইউরোপ যাহাকে কর্মশীলতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা বলে এশিয়ায় তাহা অধিক পরিমাণে নাই। অবিশ্রান্ত-ভাবে পৃথিবীর দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ানো, শীত-গ্রীষ্ম তুচ্ছ করিয়া অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ বা অগ্নিময় মরুভূমি-ভ্রমণ—এক কথায় গৃহত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন এবং এক কথায় দূরদেশ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন, পাহাড় কাটিয়া রেলপথ সম্প্রসারণ, বালি কাটিয়া বরুণের রাজ্য বিস্তীর্ণকরণ—এ রকম চঞ্চলতা-সংযুক্ত শ্রমশীলতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা এশিয়ায় বড়-একটা দেখা যায় না। তাই ইংরাজ এবং অপরাপর ইউরোপবাসী এশিয়াবাসীকে ease-loving Oriental বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু এশিয়াবাসী কি যথার্থই ease-loving, আরাম-প্রিয় বা বিলাস-প্রিয়? সমস্ত এশিয়াবাসীর সম্বন্ধে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম। হিন্দুজাতি প্রকৃতপক্ষে আরাম-লোলুপ বা বিলাস-প্রিয় কিনা, হিন্দুজাতি প্রকৃতপক্ষে শ্রমশীল এবং কষ্টসহিষ্ণু কিনা, আমি শুধু এই কথার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব, এবং এই প্রশ্নের মীমাংসাস্থলে আমি প্রধানত প্রাচীন হিন্দুদিগের কথা বলিব। তাহাতে কোন দোষ ঘটিবে না, কারণ ইউরোপবাসী প্রাচীন হিন্দুকেও বিলাস-প্রিয় জাতি বলিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া থাকে। সাহেবের বিবেচনায় যোগোপবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, মুদিতাক্ষ মহাযোগী ও স্বস্তি-প্রিয় ভারতবাসী উভয়ই এক। আর এক কথা। এই প্রশ্নের মীমাংসা-স্থলে আমি প্রধানত সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করিব। তাহার প্রথম কারণ এই যে, প্রাচীন হিন্দুর কার্যকলাপ ফুরাইয়া গিয়াছে, এমন

কি সে কার্যকলাপের মধ্যে অধিকাংশের চিহ্নমাত্র নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলেও সাহিত্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ, কেন-না সাহিত্যে শুধু কার্যকলাপ বর্ণিত হয় না, প্রবৃত্তি, মেধা, আসক্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ—ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকলই অঙ্কিত থাকে। জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় ধাত্ বাঁধা থাকে, কেন-না জাতীয় ধাত্ না বাঁধিলে জাতীয় সাহিত্য জন্মে না।

এ দেশের পুরাতন শিক্ষা-প্রণালীর গুণে এ দেশের বালক-বৃদ্ধ, বিদ্বান্-মূর্খ, ধনি-নির্ধন, ছোট-বড় সকলেই কিছুকিছু ধর্মশাস্ত্রের কথা অবগত আছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির স্থূল স্থূল কথা সকলেই জানে। অতএব কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, এ দেশের ধর্মশাস্ত্র দুঃখের কাহিনীতে, কষ্টের কথায়, ত্যাগস্বীকারের বিবরণে পরিপূর্ণ। রামের বনবাস, পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস, অর্জুনের নির্বাসন, নলদময়ন্তীর কথা, শ্রীবৎসচিন্তার কথা, হরিশ্চন্দ্রের কথা, সাবিত্রীসত্যবানের কথা, জিমূতবাহনের কথা, দাতাকর্ণের কথা—এইরূপ অসংখ্য অগণ্য শোক, দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণার কথায় হিন্দুশাস্ত্র পরিপূর্ণ। বোধহয় এত শোক, এত দুঃখ, এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণার কথা পৃথিবীর আর কোন শাস্ত্রে নাই। আবার যিনি সেই সকল কথা মন দিয়া পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন, কি অসাধারণ ভক্তি-ভরে, কেমন প্রাণ ভরিয়া, বনবাসি-বনবাসিনী সেই বনবাস-যন্ত্রণা, পতিহারা পতিব্রতা সেই পতি-বিচ্ছেদ-দুঃখ, সেই পতি-বিয়োগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন—তিনিই জানেন, যে-মহাপুরুষগণ সেই সকল শোকের দুঃখের যন্ত্রণার কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সেই কথায় কত উন্মত্ত, কত বিহ্বল, কত মুগ্ধ; যেন শোক দুঃখ যন্ত্রণাই সর্বোৎকৃষ্ট সুখ—মানুষের পরম ভোগবিলাসের সামগ্রী। গ্রীক সাহিত্যে অনেক দুঃখের কাহিনী আছে, ইংরাজি সাহিত্যেও অনেক দুঃখের কাহিনী আছে। সফক্লিস, ইস্কিলস এবং সেক্সপিয়ারের মতন দুঃখ-যন্ত্রণার কথা ইউরোপে অল্প কবিই লিখিয়াছেন। কিন্তু সে দুঃখ-যন্ত্রণা হয় ক্ষণস্থায়ী—যেমন গ্রীক নাটকে; নয়, ক্রোধ হিংসা এবং অধৈর্য-মিশ্রিত—যেমন সেক্সপিয়ারের নাটকে। নাটক অভিনয় করিতে যে চারিপাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে, গ্রীক নাটক বর্ণিত ঘটনাবলিও সেই স্বল্প কালব্যাপী। অতএব গ্রীক নাটকের নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণা—ঈদিপস্, আন্তাইগনি বা ফিলক্তিতিসের যন্ত্রণা—তীক্ষ্ণতম হইলেও দণ্ড-মাত্র-স্থায়ী। ইংরাজি নাটকের ঘটনাবলি দীর্ঘকালব্যাপী বটে, কিন্তু ইংরাজি নাটকের নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণা—হ্যাম্লেটের বা লীয়রের যন্ত্রণা—অধীর অস্থির অসহিষ্ণু লোকের যন্ত্রণা। সেক্সপিয়ার, সফক্লিস, ইস্কিলস সকলেই দুঃখ-যন্ত্রণার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু কেহই দুঃখ-যন্ত্রণার জীবন চিত্রিত করেন নাই। পল পল করিয়া দণ্ড, দণ্ড দণ্ড করিয়া দিন, দিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর করিয়া জীবন—এমন একটা দুঃখ-যন্ত্রণাময় জীবন—কেহ চিত্রিত করেন নাই। ইউরোপীয় নাটকে যন্ত্রণায় কেহ আপনার চক্ষু আপনি উপাড়িয়া ফেলিতেছে, কেহ আপনার সন্তানসন্ততিকে আপনি উৎকট অভিসম্পাত করিতেছে, কেহ অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পড়িয়া মরিতেছে। ভয়ানক দৃশ্য—যেন বিদ্যুতগ্নিতে সহসা দশ দিক্ জ্বলিয়া উঠিতেছে—কিন্তু তখনি আবার সব ঘোরঅন্ধকার। কেবল চকিত হইতেছি মাত্র—দেখিতেছি অতি অল্প, বুঝিতেছি অতি অল্প। অবাক্ হইয়া আছি।* যে যন্ত্রণা কাটিয়া কাটিয়া লুণ দেওয়ার মতন পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া বাড়িয়া একটা জীবনকাল বা জীবনকালের একটা সুদীর্ঘ অংশ ব্যাপিয়া উঠে, অথচ যন্ত্রণাভোগী স্থির ধীর অবিচলিত, সে যন্ত্রণার চিত্র কোন প্রধান ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায় না—কেবল প্রাচীন হিন্দুর সাহিত্যে দেখা যায়।—বালিকা রাজবধূ ইচ্ছা করিয়া বনে গমন করিতেছেন। রাজভোগ, রাজসম্পদ্, রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বন্ধুর, কণ্টকাকীর্ণ, বন্যজন্তু-সমাকীর্ণ বনপথে উপবাসে অল্পাহারে বৃক্ষমূল-সার করিয়া চলিতেছেন—দিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস

* ইউরোপীয় নাটক-পাঠে মোহিত হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষালাভ বড় বেশি হয় না।

করিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর করিয়া কত কালই চলিতেছেন। এত কষ্টেও নিস্তার নাই। সেই যন্ত্রণার উপর আবার পতিপ্রাণার পতি-বিচ্ছেদ—যে পতির জন্য এত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, সেই পতিকে ছাড়িয়া শত্রুপুরীতে বাস। শত্রু প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতিপ্রহর, প্রতিদিন শাসাইতেছে, তাড়না করিতেছে, অপমান করিতেছে, জ্বালার উপর জ্বালা দিতেছে। এমনি করিয়া কত দিন কাটিয়া গেল। তারপর যদি শত্রুর হাত ছাড়াইলেন, আবার পতির হাতে পড়িয়া অগ্নি-পরীক্ষা। অগ্নি-পরীক্ষা দিয়াও নিস্কৃতি নাই। রাজ্যে গিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া আবার সেই বনবাস। বনবাসের পর আবার সেই নিদারুণ পরীক্ষা, আবার সেই দেবতুল্য পতিকে হারাইয়া অনন্তকালের জন্য অন্তর্ধান। যেন কষ্ট দিতে, কষ্ট সহিতে হিন্দুর কত সুখ, কত চেষ্টা। আবার দেখ,—রাজা হরিশ্চন্দ্রকে দুঃখ দিতে হইবে—দুঃখ দিতে হইলে দুঃখে জর্জরিত না করিলে দুঃখ দেওয়াই হয় না। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছেন যে এক মাসের মধ্যে তিনি বিশ্বামিত্রকে প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দান করিবেন। এক মাসের দুঃখে মানুষ জর্জরিত হয় না। তাই ভয়ানক হিন্দুকবি একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখাইয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রকে যুগব্যাপী যন্ত্রণাভোগ করাইলেন। তাই বলি, যন্ত্রণাভোগ কাহাকে বলে, প্রকৃত কষ্ট-সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে, যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুকে বুঝিতে হইবে, ইউরোপবাসীকে বুঝিলে চলিবে না। শোকের, দুঃখের, কষ্টের, যন্ত্রণার তুষানল কাহাকে বলে, হিন্দু ভিন্ন জগতে আর কেহ জানে না।

২

রাজা ঔশীনর যজ্ঞ করিতেছেন। কপোতরূপী অগ্নি শ্যেনরূপী ইন্দ্র-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া প্রাণ-ভয়ে রাজার ক্রোড়ে লুকাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। শ্যেন আসিয়া রাজার নিকট কপোত প্রার্থনা করিল। বিধাতা কপোতকে শ্যেনের ভক্ষ্য-বস্তু করিয়াছেন—ক্ষুধার্থ শ্যেন রাজার নিকট কপোত প্রার্থনা করিল। প্রাণভয়ে ভীত শরণাপন্ন কপোতকে দিতে রাজা অস্বীকৃত হইলেন; তিনি বলিলেন —'গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি, অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে তাহাও এইক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু এই শরণাগত ভীত কপোতকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিব না। যেরূপ কর্ম করিলে তুমি এই পক্ষীরে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এক্ষণেই উহা সম্পন্ন করিব, তথাপি এই কপোতকে প্রদান করিব না।' শ্যেন কহিল, 'যদি এই কপোত-পরিমাণ মাংস নিজদেহ হইতে কাটিয়া দিতে পার, তবেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া কপোতের কামনা পরিত্যাগ করিব।' 'তাহাই করিব' বলিয়া রাজা ঔশীনর তুলাযন্ত্রের এক দিকে কপোতকে বসাইয়া অন্য দিকে আপন হস্তে আপন দেহ হইতে মাংস কাটিয়া রাখিলেন। কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন আপন হস্তে আপন দেহ হইতে আর এক খণ্ড মাংস কাটিয়া মাংসের উপর রাখিলেন। তথাপি কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন আপন হস্তে আপন দেহ হইতে এক এক খণ্ড করিয়া অসংখ্য মাংসখণ্ড কাটিলেন, তথাপি কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন সেই কঙ্কাল-মাত্র দেহ লইয়া রাজা ঔশীনর স্বয়ং তুলাযন্ত্রে আরোহণ করিলেন দেখিয়া শ্যেনরূপী ইন্দ্র ইন্দ্ররূপ ধারণ করিলেন—কপোতরূপী অগ্নি অগ্নিরূপ ধারণ করিলেন এবং রাজার অক্ষয় যশ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। রাজাও ধর্মপ্রভাবে স্বর্গমর্ত্ত্য উজ্জ্বল করত দেদীপ্যমান কলেবর হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

কালে এই কথা ইউরোপে গমন করিল—এই রকমের অনেক কথাই ইউরোপে গমন করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপে গিয়া এ কথার এ আকারও রহিল না, এ প্রকারও রহিল না। ইউরোপ আপন দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দিতে পারিল না—তত কষ্ট, তত যন্ত্রণা কি সওয়া যায়? ইউরোপ ঔশীনরের আপনার দেহের মাংস কাটিয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। আর ভাবিল—এমন কি পরোপকার যে, তজ্জন্য এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সহিতে হইবে, আর আপনার মাংস কাটিয়া দিয়া প্রাণটাকে নষ্ট করিতে হইবে? ইউরোপ ঔশীনরের কথা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফেলিল। মাংস কাটিয়া প্রাণ নষ্ট করিবার ভয়ে আইনের একটা কূটতর্ক তুলিয়া মাংস কাটিবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, আর পাছে সেই ভীরুতা এবং আত্মপ্রিয়তার জন্য লোকে নিন্দা করে, সেইজন্য আপনার কলঙ্কের ডালিটা একটা নির্বিরোধ ইহুদীর মাথায় চাপাইয়া দিল! আর সেই গল্প লিখিয়া * স্বয়ং সেক্সপিয়ার সেই কলঙ্কের ডালি আপনার পবিত্র মাথায় চাপাইলেন! আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন যে, কুসীদজীবী শাইলক যে নৃশংস নির্মম প্রণালীতে টাকা ধার দিয়াছিল তদনুসারে কার্য হওয়া উচিত নয়, সে প্রণালী ব্যর্থ হওয়াই ভাল। এও কি কথা? যেখানে মানুষকে নীতির এবং ধর্মের আদর্শ দিতে হইবে, সেখানে কি আদর্শশ্রেষ্ঠ বিশ্বাদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে না? সেই বিশ্বাদর্শ কি? বিশ্বনাথের নিয়মে জীব কি দলিত, নিপীড়িত, ক্ষতবিক্ষত, বিচূর্ণিত, বিঘূর্ণিত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ভস্মীভূত হইতেছে না? তা বলিয়া কি বিশ্বনাথের নিয়মকে ব্যর্থ বলিতে হইবে? ইউরোপ তাই করে, হিন্দু তা করে না। হিন্দুর দুঃখ-যন্ত্রণার কাহিনীর মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের এক কাহিনী আছে। সে কাহিনী অপূর্ব কৌশলে কথিত। রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দান করিতে প্রতিশ্রুত। প্রতিশ্রুত কার্য হিন্দু সর্বদাই ধৈর্য-সহকারে সম্পন্ন করে। কিন্তু প্রতিশ্রুত কার্য করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র শোকে আকুল, যন্ত্রণায় বিহ্বল। সে শোক, সে যন্ত্রণা দেখিলে দর্শকের হৃদয়ও শোকে তেমনি আকুল, যন্ত্রণায় তেমনি বিহ্বল হইয়া উঠে। এ রকম চিত্র কেন? কেন তাহা এই কথায় বুঝ। এ চিত্র দেখিলে বিশ্বামিত্রের উপর রাগ হয়, মনে হয় বিশ্বামিত্রের মতন পাষণ্ড আর নাই। কবিও তাহাই বলিতে চাহেন। শৈব্যা আত্মবিক্রয়-দ্বারা দক্ষিণাদানের প্রস্তাব করিলেন। পতিব্রতা পত্নীকে বিক্রয় করিতে হইবে মনে করিয়া রাজা শোকে বিহ্বল-প্রায়। এমন সময় বিশ্বামিত্র আসিয়া বলিয়া গেলেন—আজ যদি দক্ষিণা না দিস, তাহা হইলে সূর্যাস্ত হইলেই তোকে অভিশপ্ত করিব। তখন

… … রাজা চাসীদ্ ভয়াতুরঃ।
কান্দিগ্‌ভূতোঽধমো নিঃস্বো নৃশংসধনিনার্দিতঃ॥

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮।৪৬

রাজা নৃশংস ধনি-কর্তৃক পীড়িত, ভয়াতুর, দিশাহারা, অধম এবং নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন।

কবি বিশ্বামিত্রকে নৃশংস বলিয়া গালি দিলেন। আবার যখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীপুত্র-বিক্রয়লব্ধ ধন লইয়া বিশ্বামিত্র দক্ষিণার অবশিষ্টাংশের নিমিত্ত রাজাকে শাসাইয়া চলিয়া গেলেন তখন কবি বলিতেছেন—

ত্বমেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রং নিষ্ঠুরং নির্ঘৃণং বচঃ।
তদাদায় ধনং তূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ॥

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮।৭৮

কৌশিক রাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রকে এই নিষ্ঠুর ও নির্ঘৃণ বাক্য বলিয়া সেই ধন গ্রহণপূর্বক কোপভরে সত্বর প্রস্থান করিলেন।

কবি বিশ্বামিত্রের ব্যবহারকে নিষ্ঠুর ও নির্ঘৃণ বলিয়া নিন্দা করিলেন—বিশ্বামিত্রের উপর কবির কত রাগ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ রাগ ন্যায়সঙ্গত, কেন-না বিশ্বামিত্রের পণ যথার্থই নিষ্ঠুর, নির্মম। বিশ্বামিত্রকে নিষ্ঠুর এবং নির্মমভাবে দেখাইবেন বলিয়াই হিন্দুকবি তাঁহার চিরন্তন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে কাঁদাইলেন। হরিশ্চন্দ্রকে না কাঁদাইলে বিশ্বামিত্রের উপর রাগ হয় কৈ? কিন্তু এত রাগ করিয়াও কবি বিশ্বামিত্রের কার্যে ত বাধা দিলেন না—পাষণ্ডের পণ ত পণ্ড করিলেন না। করিবেন কেন? তিনি যে বিশ্বাদর্শের অনুগামী। জীব যন্ত্রণা পায় বলিয়া কি বিশ্বের নিয়ম ব্যর্থ হয়? বিশ্বামিত্র মানুষ—পণ ছাড়িবেন কেন? হরিশ্চন্দ্র যতই কেন কাঁদুন না—তিনিও মানুষ, সত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে সত্য পালন করিতেই হইবে। হিন্দু ভিন্ন কেহ বিশ্বের শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানে না। ইউরোপ যদি শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানিত, তাহা হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যে শাইলকের কাহিনী কথিত হইত না, সেক্সপিয়ার কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিতেন না। হিন্দু শোক, দুঃখ এবং যন্ত্রণার প্রকৃত আস্বাদ জানে বলিয়া শোক, দুঃখ এবং যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের জন্য চিরকাল লালায়িত। যে শ্রমের মর্ম বুঝে, সেই বিশ্রামের প্রার্থনা করে—সেই যথার্থ বিশ্রামপ্রয়াসী হয়। হিন্দুর মুক্তি-কামনার তাৎপর্য

* Merchant of Venice.

বড় গভীর। স্বস্তি-প্রয়াসী প্রাচীন জাতি বলিয়া হিন্দু মুক্তি-কামনা করে না।—যাঁহারা সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, হিন্দু শোক-দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যত লালায়িত জগতে আর কেহ তত লালায়িত নয়। কিন্তু সেই মুক্তি-লাভের জন্য হিন্দু যত কঠোর তপস্যা, কঠিন ব্রহ্মচর্য, নিদারুণ আত্মত্যাগ, অলৌকিক গৃহসন্ন্যাস করিয়া থাকে, জগতে আর কেহ তত পারে না। যে এত শোক-দুঃখ ভোগ করে, লোকে তাহাকে কেমন করিয়া আলস্য-লোলুপ লোক বলে, বুঝিতে পারি না। অথবা বুঝি নাই-বা কেন, বুঝি। ইউরোপ যাহাকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা বলে, হিন্দু তাহা করে না। ইউরোপ নিজে যাহা করে না, ইউরোপ তাহা বুঝিতেও পারে না। ইউরোপের এই একটি মহান্ রোগ।

৩

ইউরোপবাসী এবং হিন্দু উভয়েই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে পারে। কিন্তু উভয়ের সমান উদ্দেশ্য নয়। ইউরোপ বাহ্য-সম্পদের নিমিত্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে পারে, হিন্দু ধর্মের নিমিত্ত, কর্তব্যপালনের নিমিত্ত, পরোপকারের নিমিত্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে পারে। ইউরোপের কষ্ট দেহের জন্য, হিন্দুর কষ্ট আত্মার জন্য। ইউরোপের কষ্ট নিজের জন্য, হিন্দুর কষ্ট পরের জন্য। দুই প্রকার কষ্টের দ্বারাই উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু সে উন্নতি দুই রকমের। একটি বাহ্য উন্নতি, আর একটি আধ্যাত্মিক উন্নতি। হিন্দুর বাহ্য উন্নতি বড় বেশি হয় নাই, ইউরোপের অধ্যাত্মিক উন্নতিও বড় বেশি হয় নাই। ইউরোপের সামান্য লোককে এখানকার পল্লীগ্রামের বড় বড় জমিদারের অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বোধ হয়, এখানকার সামান্য লোকও ধর্মজ্ঞানে এবং ধর্মচর্যায় ইউরোপের প্রধান প্রধান লোকের সমকক্ষ। কোন্ উন্নতিটি উৎকৃষ্ট, পাঠক বিচার করিবেন। তবে একটা কথা আছে। কেহ কেহ বলিবেন যে হিন্দুর উন্নতি উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার ফল মৃত্যু—উদাহরণ, ইউরোপ কর্তৃক এশিয়ার বাণিজ্য-হরণ এবং ইংরাজ রাজ্যে হিন্দুর দারিদ্র্য। এ কথা সত্য হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, ইউরোপের উন্নতির ফলও কি মৃত্যু নয়? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, হিন্দুর উন্নতির ফল যেমন দেহের মৃত্যু, ইউরোপের উন্নতির ফল তেমনি আত্মার মৃত্যু। আবার পাঠককে বলি, কোন্ মৃত্যুটা ভাল বিচার করিবেন। আমরা একটা সার কথা বুঝি এই যে, কি এদেশীয় শাস্ত্র, কি বিদেশীয় শাস্ত্র—সকল শাস্ত্রেই বলে ধর্মযুদ্ধে মরিলে অক্ষয় স্বর্গ হয়। কিন্তু আসল কথা এই যে, লোক ধর্মপ্রধান হইলে যে তাহাদিগকে মরিতেই হইবে, এমন কি লেখাপড়া আছে? হিন্দুজাতি ধর্মপ্রধান বলিয়া পরাধীন হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানে যখন হিন্দুস্থান লইয়া যুদ্ধ হয় তখন হিন্দুর সামরিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে বর্তমান ছিল। এমন হইতে পারে যে তাহার স্বদেশানুরাগ বা patriotism ছিল না, কিন্তু রাজস্থানে যে-রাজভক্তিকে স্বদেশানুরাগের কার্য করিতে দেখা গিয়াছে, সে-রাজভক্তি ত প্রভূত পরিমাণে বর্তমান ছিল। তবে কেন হিন্দু পরাধীন হইল? অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ধর্মপ্রধান না হইয়াও এবং স্বদেশানুরাগী হইয়াও গ্রীক যে কারণে পরাধীন হইয়াছিল, হিন্দুও সেই কারণে পরাধীন হয়—দেশ অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া। আর এক কথা। ধর্মপ্রধান হইলে মরিতে হয় এ কথার অর্থ এই যে ধর্ম অতি মন্দ জিনিস। কিন্তু সে অর্থ কি কেহ গ্রহণ করিবেন? বোধ হয় না। তবে এমন কি লেখাপড়া আছে যে, ধর্মপ্রধান হইলে আমাদিগকে মরিতে হইবে? তুমি ইউরোপকে দেখাইয়া বলিবে যে আত্মসুখান্বেষী না হইলে ইউরোপের ন্যায় চঞ্চল (active), শ্রমশীল, অসমসাহসিক (adventurous) ইত্যাদি হওয়া যায় না। আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে এ কথা কে বলিল? মানুষের ইতিহাস পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, আদিম অবস্থায় মানুষ যখন কেবল আপনাকে লইয়া এবং আপনার প্রয়োজন লইয়া থাকিত, তখন মানুষ পশুর ন্যায় অতি অলস এবং অসহিষ্ণু ছিল, এবং যখন মানুষের পাঁচজন হইল—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী হইল—তখনই সে চেষ্টাশীল, শ্রমশীল, কর্মশীল হইতে লাগিল। অতএব ধর্মই কর্মের প্রকৃত মূল। তবে মানুষের এমন একটা সময় হয়, যখন সে ধর্মের জন্য নয়, শুধু সম্পদের

জন্য সম্পদ্ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। মানুষ যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ্ পায়, তখন তাহার ধনলোভ বা সম্পদ্‌লালসা জন্মে এবং তখনই মানুষের সেই সময় উপস্থিত হয়। আজ ইউরোপ পৃথিবীকে তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব তুমি বোধ হয় তর্ক করিবে যে, আপনার সুখসাধন করিতে মানুষের স্বভাবত যত প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হয়, অন্যের সুখসাধন করিতে তত হয় না। এ কথার উত্তর এই যে, আপনার সুখ অপেক্ষা অন্যের সুখ বেশি প্রার্থনীয় বলিয়া, যে বুঝিতে শিখিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, আপনার সুখাপেক্ষা সে অন্যের সুখের নিমিত্ত স্বভাবতঃই বেশি উদ্যমশীল হইবে। হিন্দু সাহিত্যের ধাতু বুঝিয়া দেখিলে অনুমিত হয়, প্রাচীন কালে হিন্দু ধনের নিমিত্ত নয় ধর্মের নিমিত্ত, আজিকার ইউরোপের ন্যায়, আজিকার ইউরোপের প্রণালীতে, কর্ম করিতে পারিত। গুরুকে মনোমত দক্ষিণা দিবার জন্য শিষ্য তখন স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল ভেদ করিয়া বেড়াইত, যজ্ঞের অশ্বের অন্বেষণে সগর-সন্তানেরা পৃথিবীকে খনন করিয়া সাগরের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিল, (লেসেপস্ খানিকটা বালি কাটিয়া একটা সরু খাল কাটিয়াছেন বৈ ত নয়), এবং সেই ষাটি সহস্র সগর-সন্তানের উদ্ধারার্থ ভগীরথ কত দুর্গম স্থানে গিয়াছিলেন এবং কত দুরূহ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতএব বোধ হয় বলা যাইতে পারে, প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুর যেরূপ শিক্ষা হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে তিনি স্বার্থকে অধীন করিয়া পরার্থকে প্রধান করিয়া আজিকার ইউরোপের প্রণালীতে বাহ্যোন্নতির নিমিত্ত চেষ্টাশীল এবং উদ্যমশীল হইতে পারিবেন এবং তাহা হইলে একমাত্র হিন্দুর দেশে উন্নতি বাহ্যাভিমুখী হইয়াও সর্বতোভাবে ধর্ম-মূলক এবং ধর্মাত্মক হইবে। কিন্তু হিন্দুর যে প্রাচীন প্রকৃতি এবং প্রাচীন শিক্ষার কথা বলিতেছি, আজিও কি তাহার কিছু আছে? বোধ হয় কিছু আছে, কেন-না আজিও গৃহস্থ হিন্দু যত লোকের সুখের নিমিত্ত খাটিয়া থাকেন, গৃহস্থ ইংরাজ তত লোকের সুখের নিমিত্ত খাটেন না। অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে ধর্মচর্যায় প্রাচীন হিন্দুর যে অসীম উদ্যম, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগ করিবার ক্ষমতা ছিল, আজিকার হিন্দুরও যেন তাহা থাকে। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, হিন্দুর মধ্যে সে ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইয়াছে এবং যাঁহারা ইংরাজি শিখিতেছেন তাঁহাদের সে ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু দেখিয়াছি, যে-কষ্টসহিষ্ণুতাতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর হিন্দু-মহত্ব, হিন্দুর ইউরোপের উপর প্রাধান্য, সে-কষ্টসহিষ্ণুতা হারাইলে আমরা সব হারাইব—আমাদের বর্তমান তমসাচ্ছন্ন; আমাদের ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হইবে।

৪

আর একটি কথা। কষ্টেই মানুষের উন্নতি। দেখিলাম, হিন্দুর যত কষ্টভোগ ক্ষমতা আছে, আর কাহারও তত নাই। অতএব আমাদের ইতিহাসের এই কথাটিই আমাদের সমস্ত আশা-ভরসার মূল। যদি আবার তেমনি কষ্টভোগ করিতে পারি, তবে আবার তেমনি উন্নত, তেমনি মহান্ হইব। হিন্দু আজ বুক ভরিয়া এই আশা, এই আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে। সেই আশায় সেই আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহিত হইয়া, আমরা এখন মানুষ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, যত্ন করিতেছি, পরিশ্রম করিতেছি। কোন্ পথে চলিলে সে চেষ্টা, সে যত্ন, সে পরিশ্রম সফল হইবে, প্রথম হইতেই তাহা ঠিক করিয়া রাখা চাই। প্রথম হইতেই পথ ঠিক করা সকল কার্যেরই প্রকৃত পদ্ধতি এবং এরূপ গুরুতর কার্যে তাহা নিতান্ত আবশ্যক। সকল কার্যই কষ্টসাধ্য। কিন্তু কষ্ট দুই রকমের। বসিয়া বসিয়া পরিশ্রম করা এক রকম কষ্ট; ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইয়া পরিশ্রম করা আর এক রকম কষ্ট। আমরা দেখিয়াছি যে, স্থির হইয়া ঘরে বসিয়া হিন্দু অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারে। বহু প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু এই প্রণালীতে কষ্ট ভোগ করিয়াছে। অতএব এমন অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই প্রণালীতে কষ্টভোগ করা তাহার প্রকৃতিসঙ্গত এবং এই প্রণালীতে কষ্টভোগ করিলেই যে-উদ্দেশ্যে কষ্টভোগ, তাহাতে সে বেশি সফলতা লাভ করিবে। আমি এমন কথা বলি না, চিরকাল ঘরে বসিয়া কষ্ট ভোগ করিয়াছে বলিয়া হিন্দু আজ ঘরের বাহির হইয়া জ্ঞানসঞ্চয়ার্থ পৃথিবীর সকল স্থান এবং সকল পদার্থ দেখিয়া বেড়াইবে না। জ্ঞানোপার্জনার্থ আজি হইতে তাহাকে সেই প্রণালীতে

কষ্টভোগ শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া পুরাতন প্রকৃতিসঙ্গত প্রণালীটি যেন একেবারে উপেক্ষিত না হয়। দুইটি প্রণালীর মধ্যে সেই পুরাতন প্রণালীটিই উৎকৃষ্ট। যে হাটবাজার হইতে মাছ মাংস তরকারি প্রভৃতি আনিয়া দেয়, সে অনেকটা কাজ করে সন্দেহ নাই। যে রন্ধনশালায় বসিয়া বসিয়া চুল্লীর উত্তাপে দগ্ধ হইয়া গাঢ় ধূমে রুদ্ধশ্বাস হইয়া আহৃত দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া মানবের পুষ্টিসাধনার্থ অন্ন, ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাহার শ্রমের মূল্য নাই, তাহার পদ বড়ই শ্রেষ্ঠ। সামান্য লোকের দ্বারা হাটবাজার হয়; প্রকৃত ওস্তাদ নহিলে রন্ধনকার্য হয় না। হিন্দু! যে ক্ষমতা থাকিলে মানুষ রন্ধনকার্যে কৃতকার্য হয়, অতি প্রাচীনকাল হইতে সে ক্ষমতা বোধ হয় তোমারই আছে। আজিকার নূতন প্রণালীতে দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে শিক্ষা কর। তাহা না করিলে আজিকার দিনে চলিবে না। কিন্তু তোমার অনন্ত ইতিহাসে তোমার যে অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, মনে থাকে যেন সে রকম চিত্র আর কাহারও ইতিহাস-পটে অঙ্কিত নাই। মনে রাখিয়া, এই চেষ্টা করিও যেন বিজ্ঞানের বিশাল রন্ধনশালায় প্রধান রাঁধুনীর পদ তোমারই হয়—যেন অপর সমস্ত জাতি জগতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে তোমার রন্ধনার্থ দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিয়া দেয়। তোমার ইতিহাস বলিতেছে, ইহাই তোমার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত—লক্ষ্যান্তর অনুসরণ করিলে বোধ হয় তুমি দিশাহারার ন্যায় সকল দিক্ হারাইবে! সেই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিলে অতীত যুগে তুমি যেমন পৃথিবীর আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলে, ভবিষ্য যুগেও তেমনি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কথায় প্রত্যয় না হয়, একটা প্রমাণ গ্রহণ কর। এত অধম, এত অবনত, এত অবসন্ন হইয়াও যে আজিকার নরবীর ইংরাজকে বিদ্যার পরীক্ষায় পরাজয় করিয়া পৃথিবীতে ডঙ্কা বাজাইতে পারিতেছে, সে কেবল তোমার পবিত্র পিতৃপুরুষের সেই অলৌকিক এবং অসাধারণ কষ্টভোগ শক্তির কণামাত্র এখনও তোমাতে আছে বলিয়া। লোকে আজ তোমার যে-শক্তি দেখিয়া তোমাকে উপহাস করিতেছে, সে-শক্তি না থাকিলে উন্নতি হয় না এবং সে-শক্তি বাড়াইতে পারিলে লোকে একদিন অবশ্যই তোমাকে পৃথিবীর আর্য বলিয়া আবার পূজা করিবে।

নবজীবন ১ম ভাগ ভাদ্র ১২৯১

সূচনা

['নবজীবন'-এর]

যাহা সকলেই বুঝেন, তাহা বুঝাইতে যাওয়া ঘোরতর বিড়ম্বনা; জানিয়া-শুনিয়া সে বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না; সুতরাং বঙ্গভাষায় আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়া যে এই সময়ে আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আর নাই বুঝাইলাম তবে আর বলিব কি? বলিবার কথা অনেক আছে।

আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িক পত্রের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু এত দিন ধরিয়া যে ভাবে সাময়িক পত্র সকল চলিতেছিল, সেইরূপ পত্রেই কি বর্তমান বাঙ্গালির অভাব পূরণ এবং মানসিক তৃপ্তিসাধন হইবে? আমাদের তাহা বোধ হয় না। বাঙ্গালির হৃৎক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত। যখন তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়, সেই এক যুগ; বিবিধার্থ-সংগ্রহ, আর এক যুগ; বঙ্গদর্শন প্রভৃতির আবির্ভাবে তৃতীয় যুগ; এখন আবার যুগান্তর উপস্থিত। নূতন দিকে বাঙ্গালির দৃষ্টি পড়িয়াছে; বঙ্গবাসী নূতন অভাব অনুভব করিয়া, অভিনব পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত; বাঙ্গালি আজিকালি নব উৎসাহে উৎসাহিত; আমরা এই উৎসাহের উৎসবে যোগ দিতে সংকল্প করিয়াছি। আমরা বিবেচনা করিতেছি, এই কথাটি একটু বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আরও দশবিধ কারণে আমরা এই কার্যে ব্রতী হইয়াছি, কিন্তু সে সকল কথার বোধ হয় কৈফিয়ৎ না দিলেও চলিবে।

ভারতবাসী চিরদিনই ধর্মব্রত। পাশ্চাত্য সভ্যতা-আলোকের প্রতিবিম্ব পাইয়া প্রথমে ভারতবাসী ধর্মের নাম লইয়া গাত্রোত্থান করিল। ধর্মের কথাই কহিতে লাগিল। খৃস্টানের একেশ্বরবাদের কথা শুনিয়া আপনাদের প্রাচীন বৈদান্তিক এবং তান্ত্রিক একেশ্বরবাদ গৌরবে প্রচার করিল।

মহাত্মা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইলেন। দেশীয় ও বিলাতীয় একেশ্বরবাদে ঘোরতর বিতর্ক চলিতে লাগিল; ইংরাজি ও বাঙ্গালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মপুস্তিকা প্রচারিত হইল। আন্দোলনে বাঙ্গালা মাতাইয়া মহাত্মা স্বর্গারোহণ করিলেন; ঝঞ্ঝাবাত্যা থামিল; তরঙ্গ কমিয়া আসিল; কিন্তু স্রোত চলিতেছে। সেই স্রোতের বাহিনী—তত্ত্ববোধিনী। সুতরাং প্রথম প্রথম তত্ত্ববোধিনী, কেবল ধর্ম কথাতেই পরিপূরিতা। আমাদের দেশে কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব একটু না বুঝিলে ধর্মতত্ত্ব বুঝা কঠিন; কাজেই তাহাতে প্রত্নতত্ত্ব আসিল; ক্রমে দেহতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব আসিয়া পড়িল; চারুপাঠের ভ্রূণ তত্ত্ববোধিনী-গর্ভে বর্ধিত হইতে লাগিল; যুগ হইতে যুগান্তর এই রূপেই হয়। ইউরোপীয় ধর্মহীন বিজ্ঞান ক্রমেই দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল; ধর্মের স্রোত মন্দা হইল, তত্ত্ববোধিনীর তত্ত্বকথা আর কেহ পাঠ করিল না। তত্ত্ববোধিনীতে যে সকল প্রাণিতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই সাধারণে পাঠ করেন।

পদার্থতত্ত্বে প্রবেশ করিতে করিতে বঙ্গবাসীর ভূগোল, ইতিহাসের বুভুক্ষা হইল; এই বুভুক্ষা নিবারণের জন্যই বিবিধার্থ-সংগ্রহের অবতারণা। বাঙ্গালিকে নূটকা জাতির অবস্থা পর্যন্ত, নোবাজেম্‌ব্লা দ্বীপের বিবরণ পর্যন্ত—শুনানো হইল; বাঙ্গালি মগধ, কাশ্মীরের ইতিহাস শুনিল, রাজপুত-গণের কীর্তিকলাপ শ্রবণ করিল; বহুকালের পতিত ক্ষেত্র স্থানে স্থানে কর্ষিত হইল; জাতি-ভক্তি-বীজের এখানে সেখানে অঙ্কুর দেখা দিল। বাঙ্গালি তখন অল্প স্বল্প জ্ঞান লাভ করিয়া উপদেশ লাভের জন্য ব্যস্ত হইল।

বঙ্গদর্শন এই উপদেষ্টৃ- বন্ধুভাবে জন্ম গ্রহণ করিল। বঙ্গ-দর্শন, বান্ধব, আর্যদর্শন, ভারতী—উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক; ইহাদিগকে কাণে-কলম-দেওয়া পাখীর কথা বলিতে হয় নাই; জল জমিলে বরফ হয়, বুঝাইতে হয় নাই; ভারত-চন্দ্রের জীবনী বা রত্নাবলীর কেবল গল্পভাগ বাঙ্গালিকে শিখাইতে হয় নাই। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র পাইয়া উচ্চতর উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল। বঙ্গদর্শন প্রভৃতিতে বালকের প্রলোভন চিত্র ছিল না, বালকের শিক্ষণীয়, ইতিহাস-ভূগোল ছিল না। বঙ্গদর্শনের উদয়ে, বাঙ্গালি-জীবনে ও বঙ্গসাহিত্যে আবার যুগ-প্রলয় হইল।

বাঙ্গালি কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ, ডারুউইনের পরিণামবাদ, রুষোর সাম্যবাদ, মিলের হিতবাদ ও স্বৈরবাদ, সাংখ্যের দ্বৈতবাদ, বেদান্তের মায়াবাদ, হিন্দুর অদৃষ্টবাদ—এ সকলই বঙ্গদর্শন প্রভৃতি হইতে শিখিতে লাগিল। পাশ্চাত্য সংঘর্ষণে যে জ্ঞান আত্ম-দর্শনে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে তত্ত্ববোধিনীতে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশ পুষ্টিতে জগৎ সংসার ব্যাপিয়া লইল; মহতী বিস্তৃতি লাভ করিল। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি বাঙ্গালিকে স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতলের কথা গভীর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার মত ধীরে ধীরে শিখাইয়াছে। জাপানের বাক্সর মত, পলাণ্ডুর কোষের মত যে আধ্যাত্মিক জগতের স্তরের নীচে স্তর আছে, তাহা বঙ্গবাসীকে বঙ্গদর্শনই দেখাইয়াছে। পুরাণে, ইতিহাসে,—দেবতত্ত্বে, সমাজতত্ত্বে,—কবিত্বে, সাহিত্যে,—সর্বত্রই যে স্তরের নীচে স্তর আছে, বঙ্গদর্শন আজি বার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত তাহাই দেখাইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিন পৌরাণিক মহাদেবতার অন্তর-স্তরে যে, বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত তিনটি জড়শক্তির ভাব রহিয়াছে, কৃষ্ণ-চরিত্রের বাহ্যকোষ ভেদ করিলে যে একটি মহান্ পুরুষ তন্মধ্য হইতে আবির্ভূত হন, দ্রৌপদীকে অন্তর্বীক্ষণে দেখিলে যে একজন মহতী তেজস্বিনী আর্যরমণী দেখিতে পাওয়া যায়, দশমহাবিদ্যার পৌরাণিক স্তর ভেদ করিলে যে ভারতের অবস্থান্তর-পরিণাম বুঝিতে পারা যায়—এ সকল কথার উপদেষ্টা বঙ্গদর্শন। বঙ্গদর্শনই বুঝাইয়া দিয়াছে যে, পূর্বতন সময়ের জনশ্রুতির স্তর ভেদ করিলে, মাতৃগুপ্তই কালিদাস; মধ্যকালে যাহা ভারত-কলঙ্ক বলিয়া মনে ধারণা করিয়াছ, ইতিহাসের সূক্ষ্ম অস্ত্র লইয়া সেই কলঙ্ক ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিবে তাহাই ভারত-গৌরব। এমন কি, সে দিন যাহা শুনিয়াছিলে জালপ্রতাপের অত্যাচার, সেটি কেবল আসলে ইংরাজের অবিচার। বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছে, কোম্‌তের মহামনু—পুরাণের নারায়ণ; কারলাইলের অশ্রান্ত পরিশ্রমই—হিন্দুর প্রকৃত বৈরাগ্য। কবিত্ব-সাহিত্যের স্তরোদ্ঘাটন করিয়া বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছে যে, কুমারসম্ভবের শিব-পার্বতী অনন্ত

জগতের অনন্ত কালের পুরুষ-প্রকৃতি; দেখাইয়াছে যে, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল একখানি গূঢ় সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ; দুষ্মন্ত—কঠোর রাজধর্মের সহিত, দৃঢ় নিবিষ্ট সমাজ-ধর্মের সহিত—মনুষ্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতির ঘোরতর সংঘর্ষণ। স্তরোদ্ঘাটন ব্যাপারে বঙ্গদর্শনের সামান্য বিষয়েও উপেক্ষা ছিল না। বঙ্গদর্শন বুঝাইয়াছে যে, বাঙ্গালির আহার ভুষি, আমোদ বিভীষিকা। রামচন্দ্র বনে গেলে দশরথ বেহালা বাজান, কৌশল্যা নৃত্য করেন। অথচ সেই বাঙ্গালিরই সামান্য তাসের খেলায় নব-মনুসংহিতার বর্ণাশ্রম ও গৃহাশ্রমতত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে।

বঙ্গদর্শনের এই যুগব্যাপী উপদেশের ফল ফলিয়াছে। এখন আমরা সকল বিষয়েরই অন্তঃস্তর দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছি। এই ব্যগ্রতায় যুগান্তর উপস্থিত। তবে ধর্মের বিশোদর ভাব যে আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা স্পর্ধা আমাদের নাই। নিয়মিতরূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চা করিয়া আমরা আপনারাও বুঝিব এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে। আজিকালি বঙ্গদেশে যে অস্ফুটশক্তি বিকাশোন্মুখী হইয়া নবমুঞ্জরিত বঙ্গসমাজ-পাদপে একটু একটু দেখা দিতেছে, যদি আমাদের দুর্বল চেষ্টায় দশ দিনের জন্যও শীত-বাতাতপ হইতে, কীট-পতঙ্গ হইতে তাহা সুরক্ষিত হয়, তাহা হইলেও আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। সিদ্ধি মানবের সহজসাধ্য নহে, তবে সাধনা করিতে আমরা পারি বটে। সকলে বলুন, এই সাধনায় যেন আমাদের জ্ঞানকৃত ত্রুটি না হয়।

নবজীবন ১ম ভাগ শ্রাবণ ১২৯১

বঙ্গদর্শনের বিদায়

'বঙ্গদর্শন' অকালে বিদায় গ্রহণ করাতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। আপনার গুরুভার আর্যদর্শন ও বান্ধব প্রভৃতি অনুজগণের উপর অর্পণ করিয়া বঙ্গদর্শন অবসৃত হইয়াছে। বৃদ্ধ দশরথের চারিপুত্র, তিনি চারিজনকেই সমান স্নেহ করিতেন, অথচ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের শোকে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন। বৃদ্ধা বঙ্গমাতা যে জ্যেষ্ঠ-পুত্র বঙ্গদর্শনকে হারাইয়া বান্ধব বা আর্যদর্শনের মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ বিস্মরণ করিবেন—এ প্রত্যাশা আমরা শীঘ্র করিতে পারি না। তবে ইতিমধ্যে বান্ধবের কলেবর বৃদ্ধির বিজ্ঞাপন দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভরসা হইতেছে। বঙ্গদর্শন বিদায়কালে ক্ষুদ্রপ্রাণা সাধারণীকেও বিস্মৃত হন নাই, কনিষ্ঠা ভগিনী যেরূপ অজ্ঞাত-বাস-প্রয়াসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুনরাগমন প্রত্যাশা করে, আমরাও আজি সেইরূপ অশ্রুপূর্ণলোচনে বঙ্গদর্শনের পুনর্দর্শনের আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

২৩ শ্রাবণ ১২৮৩] [সাধারণী—৬ ভাগ, ১৭ সংখ্যা

[চৈত্র, ১২৮২, বঙ্গদর্শন, ৪র্থ খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের বিদায়' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

'... তৎপরে যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন...প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।... নিরপেক্ষ, সদ্বিদ্বান্ এবং যথার্থবাদী ভারতসংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট ও তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য আমি শত শত ধন্যবাদ করি।']

বঙ্গদর্শনের পুনরাবির্ভাব

যখন অকালে বঙ্গদর্শন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলাম, 'কনিষ্ঠা ভগিনী যেরূপ অজ্ঞাতবাস-প্রয়াসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুনরাগমন-প্রত্যাশা করে, আমরাও আজি সেইরূপ অশ্রুপূর্ণলোচনে

বঙ্গদর্শনের পুনর্দর্শনের আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।' সে আশায় নিরাশ হই নাই ; কিন্তু এখনও চক্ষের জল মুছিতে পারিতেছি না। বর্ষৈক অজ্ঞাতবাসের পর বঙ্গদর্শন দেহের অলঙ্কারাদি পরিবর্জনপূর্বক অর্ধ-তপস্বিবেশে সাহিত্য-সংসারে দর্শনদান করিয়াছেন। এ অর্ধ-বৈরাগ্য-মূর্তি-দর্শনে আমরা ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছি। মহতের অজ্ঞাতবাসের পর বৈরাগ্য বেশ কেন? আমাদের ইচ্ছা হয়—অজ্ঞাতবাসের পর যুধিষ্ঠিরাদি বিরাট-ভবনে যে মূর্তিতে দেখা দিয়াছিলেন আমরাও বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ও লেখকগণকে আবার সেইরূপেই দেখিতে পাই। ইচ্ছা হয়, আবার তেমনি করিয়া যুধিষ্ঠির স্বর্ণ-সিংহাসনে বিরাজিত থাকেন, তেমনি করিয়া ভীমার্জুন সশস্ত্র তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হন, আর তেমনি করিয়া আবার নকুল-সহদেব চামর-হস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া জ্যেষ্ঠের সেবা করেন ; কিন্তু এখন বোধ হইতেছে আমরা বুঝি বঙ্গদর্শনের কখন সে রাজ-বীর-মূর্তি আর দেখিতে পাইব না। সম্পাদকের স্বাক্ষরিত ভূমিকায় আমাদের মন একটু একটু উদাস হইয়াছিল, তাঁহার লুপ্তনাম 'বুড়া বয়সের কথায়' আমরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। যে বঙ্গদর্শন আত্মগৌরবে ভর করিয়া, যুবার উৎসাহপূর্ণবেশে, অশ্বারোহণে, কশাহস্তে, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে এই রণভূমিতে বিচরণ করিতে-ছিলেন, সে বঙ্গদর্শনের, সর্বালঙ্কার-পরিভ্রষ্ট তপস্বিবেশ সেই রণভূমিতে আমরা অক্ষুব্ধ হৃদয়ে দেখিতে পারি না। আমরা এখনও চোখের জল মুছিতে পারিলাম না।

তবে বলিবে, এক সম্পাদকের শৈথিল্য-দর্শনে এত দুঃখ কর কেন? উত্তর দিতে লজ্জাও হয়, দুঃখও হয়।—আমরা বঙ্গদর্শনে ও বঙ্কিমবাবুর মধ্যে এখনও পার্থক্য কল্পনা করিতে পারিতেছি না। সুশিক্ষিতমণ্ডলীর সাধারণ-উক্তি-পত্ররূপে বঙ্গদর্শনের যে পরিণাম হইবে, এ ভরসা কেবল আশামাত্র। সাহিত্যেই কি, সমাজেই কি আর সংসারেই কি,—আমরা এখনও সাধারণতন্ত্র প্রথার উপযোগী হই নাই, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাহাতেই একের অবসাদে আজি সাধারণীর এত বিষাদ।

মহতের মহত্ত্ব এই যে, তিনি ইচ্ছামত আত্মসংবরণ করিতে পারেন। তাহাতেই আমাদের সুপরিচিত 'বুড়া দাদা' অরণ্যে যাইতে যাইতে আবার সংসারে ফিরিয়া আসিলেন। তবে এবার পরের জন্য। এখন আমরা অশ্রুসংবরণ করিতে পারি। হাসিতে হাসিতে অনুরোধ করি,—এবার যেন কেবল পরের জন্যই আবার তেমনি করিয়া সূর্যমুখীর শয়নগৃহ সাজাইয়া রাখেন,—আবার যেন তেমনি করিয়া কুন্দকমলে ঘটকালি করেন,—আমরাও আবার তেমনি করিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইব, আর সাধারণে আবার তেমনি করিয়া বঙ্গদর্শনকে ভয় করিবে, ভক্তি করিবে এবং ভালবাসিবে।

[বঙ্গদর্শন-পুনঃপ্রকাশের-প্রস্তাব-সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র সেনের উক্তি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।]

১১ বৈশাখ ১২৮৪]   [সাধারণী—৮ ভাগ, ২ সংখ্যা

বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্ম

পূর্ব সংখ্যায় (নবজীবনের) ধর্ম-জিজ্ঞাসা প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, 'অন্যের কথা দূরে থাকুক, যীশুখৃস্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য—তাঁহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এমত স্বীকার করিতে পারি না।' স্বয়ং বৌদ্ধদেব বা চৈতন্যপ্রভু ধর্মের ধারণা করিতে যখন অসমর্থ, তখন আমরা ধর্মের ভাব কতদূর বুঝিয়াছি, তাহা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমরাও 'সূচনা'য় সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি।—ধর্মের বিশ্বোদর ভাব যে আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা স্পর্ধা আমাদের নেই। নিয়মিতরূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চা করিয়া আমরা আপনারাও বুঝিব এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে।—বুঝিবার ও বুঝাইবার আশা আছে বলিয়াই আজি বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্মের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমেই বলিয়া দেওয়া ভাল, পাঠক যেন এটায় দিগ্‌গজ গবেষণার, উদ্ভট উদ্ভাবনার প্রত্যাশা করিয়া আপনা আপনি প্রতারিত না হন।

বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম বড়ই বিড়ম্বনার বিষয়। বিশেষ

এই চসমা-চক্ষু, চপল-চিত্ত, চটুলবৃত্ত যুবকদলের রাজত্বকালে। এই কোপ্তা, কোর্মা, করি, কট্‌লেট প্রভৃতি ককারাদি ব্যঞ্জনের দিনে যে ধর্মে মাংসাহার নিষেধ করে, বিলাতি ব্যাণ্ডের বেণু-বীণা-বাদনের বদলে, যে ধর্মের উপাসকেরা খোলকরতালে বিষম খচ্‌মচ করিয়া তুলে, কণ্ঠে ত্রিভাঁজ কলরের স্থানে যে ধর্মযাজকেরা তুলসীর ত্রিকণ্ঠী ধারণ করে,—সে ধর্ম যে এখনকার দিনে বিষম বিড়ম্বনা, তাহাও কি আর বুঝাইতে হইবে? যাত্রাতে যাহার আশ্রয়, ভিক্ষাতে যাহার প্রশ্রয়,—মধুর রসেই যাহার রঙ্গ, প্রেম যাহার প্রধান অঙ্গ, 'কুরুচি' যাহার চিরসঙ্গ—গুপ্তপ্রণয়িনী গোপিনী যে ধর্মের আলম্বন এবং শঠ লম্পট কপট শ্রীকৃষ্ণ যাহার অবলম্বন,—সে ধর্ম যে বঙ্গের বিড়ম্বনা, তাহাও কি আবার বলিতে হয়? না,—সাহেব যাহা সাহেবিয়ানায় বুঝাইয়াছেন, তাহা আর বাঙ্গালিকে বুঝাইতে নাই; তবে এই অধম জাতির ঐ অপকৃষ্ট ধর্ম যদি এই অধমদিগের বুদ্ধিবলেই কিছু বুঝা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি?

*ধর্মের নানা ভাব, ধর্মের নানা মূর্তি। পূর্বেই বলা গিয়াছে, সমগ্র ধর্মের বিশাল বিশ্বোদর ভাব শ্রেষ্ঠ মানবেও ধারণা করিতে পারেন না। এই জন্য ধর্ম-বিষয়ে, নানা দেশে নানা মত আছে; এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন, ধর্মের প্রাণ—ভয়; ঈশ্বর ভয়, পরকাল ভয় বা কর্মফল ভয় যাহার হৃদয়ে জীবন্ত নহে, তাহার ধর্মজ্ঞান নাই। কেহ বলেন, ধর্মের প্রাণ—ভক্তি। ভগবান্ ভক্তের; ভক্তিতেই ভগবান্ মিলেন। কেহ বলেন, ধর্মের প্রাণ—কর্ম। যে যেমন কর্ম করে, সে তেমনই ফল পায়—কঠোর কর্তব্য-সাধনই ধর্ম-যাজন। কেহ কেহ এই মতের বিপরীতবাদী। তাঁহারা বলেন, কর্মে বিরতিই—প্রকৃত ধর্মচর্চা। তবেই ধর্মের প্রধান সাধন কিরূপ, এবং ধর্মের প্রধান লক্ষ্যই বা কি,—ইত্যাদি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে।

ধর্মের উপজীব্য ভগবানের সেই জন্য নানা মূর্তি হইয়াছে। উপনিষৎ একবার বলিতেছে—তিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্', আর একবার বলিতেছে, 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।' তন্ত্র এক মুখে একই নিশ্বাসে একেবারে বলিতেছে, 'করালবদনাম্' অথচ 'স্মিতাননাম্'। কোথাও শুনিবে,—তাঁহার দ্বিভুজ-মুরলীধর সুবঙ্কিম নটবর বেশ,—কোথাও শুনিবে তিনি শর-কার্মুক-ধারী বীরশ্রেষ্ঠ বীরাসনে উপবিষ্ট। বাইবেলে বলে, তিনি কঠোর ন্যায়পর, অথচ দয়ার অগাধ সাগর। যীশুখৃস্ট বলেন, তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর; তন্ত্র বলেন, তিনি করুণাময়ী জগদম্বা। যাঁহারা বালক-গোপালের সেবক, তাঁহারা ভগবানকে অপত্যভাবে ধুয়াইয়া পুঁছাইয়া দুগ্ধদানে সেবা করিতেছে, আবার বামাচারী শক্তিভক্ত নরকপালে মহামাংস-মদ্য দিয়া ভগবতীর মহা-ভোগের আয়োজন করিতেছে। সম্প্রদায়-বিশেষের পূজার পদ্ধতির কথা শুনিলে সন্ত্রাসে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়, হৃৎপদ্ম কাঁপিতে থাকে, মন স্তব্ধ হয়;—আবার আর এক সম্প্রদায়ের পূজা-পীঠের নিকটে গেলে, স্বচ্ছন্দ আয়োজন দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হয়, পবিত্র বাদিত্রে শ্রবণ জুড়ায় এবং সুগন্ধে অন্ধীভূত হইতে হয়।

সনাতন ধর্মের সার কথা এই যে, প্রকরণ, পদ্ধতি—ধ্যান, ধারণা—আলম্বন, বিভাবন—পৃথক্ হইলেও সকল শ্রেণীর ঐশ্বরিক সাধনাই ধর্ম। দেশ, কাল, পাত্র—জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা—প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, রুচিভেদে—ধর্মের তারতম্য হয় মাত্র। কোন ধর্মের হিংসা করিতে নাই, কোন ধর্মযাজককে ঘৃণা করিতে নাই। যে যে-পথে পার, ধর্মের উজ্জ্বল, বিমল, বিমানব্যাপী পতাকা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। এইসকল সনাতন ধর্মের সার কথা।*

নগণ্য বাঙ্গালির সামান্য বৈষ্ণব ধর্মে যাঁহারা ঘৃণা করিতে এখনও অভ্যস্ত হন নাই, বৈষ্ণব ধর্মকে জঘন্য ভিক্ষুকবৃত্তি (nasty Beggarism) বা পাশব বিলাসের প্রস্থান (system of Carnality) বলিয়া নাসিকার আকুঞ্চন-প্রসারণ করিতে যাঁহারা এখনও শিক্ষিত হন নাই, তাঁহাদেরই সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্মের ভাবভঙ্গি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণবের প্রধান সাধন প্রেম-ভক্তি। বৈষ্ণবের মতে

* তারকা-চিহ্নদ্বয়ের মধ্যস্থিত অংশ 'সনাতনী'র 'ধর্মের যাজনা সাধ্যমত কর্তব্য'-শীর্ষক অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভগবানে প্রেম-ভক্তিই সদ্গতির প্রধান উপায়। কেহ বলেন, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত মহিমার বিষয় নিরন্তর স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া, সাধকে ক্রমেই আপনার ক্ষুদ্রত্ব, অণুত্ব উপলব্ধি করিবেন ; এই উপলব্ধি হইলেই তাঁহার প্রকৃত বিনয় হইবে, আপনার অকিঞ্চন ভাব বুঝিতে পারিবেন। সেই বিনয়ই ধর্মের প্রকৃত ভাব। কেহ বলেন, ঈশ্বরের দণ্ডপ্রণেতৃত্ব ভাব হৃদয়ে সম্যগ্‌রূপে ধারণা করিতে পারিলেই, প্রকৃত ধর্মভাবের উপলব্ধি হয় ; ঈশ্বরের ভীতিই ধর্মের মূল। অপরেরা বলেন যে ভয় ত বালকের পক্ষেই কর্মের নিবর্তক বা প্রবর্তক ; পরম জ্ঞানী সাধক—তিনি ভীতি-তাড়িত থাকিবেন কেন ? ঈশ্বরে শ্রদ্ধাই ধর্মের মূল। ঈশ্বরকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিতে হইবে। আর এক পক্ষ বলেন যে, পিতাকে যে শ্রদ্ধা করা যায়, তাহারও অন্তরে অন্তরে ভয় আছে ; ঈশ্বরে ভয়ের লেশ মাত্র থাকা উচিত নহে। ঈশ্বরকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করিতে হইবে। 'কু-পুত্র যদ্যপি হয়, কু-মাতা কখন নয়।' আমরা অকৃতী, অকৃতজ্ঞ সন্তান, তিনি করুণাময়ী। তাঁহার স্নেহময় উৎসঙ্গে লইয়া তিনি সকলকেই তাঁহার অজস্র ক্ষীর-ধারায় পালন করিতেছেন। বৈষ্ণব বলেন—যে যেমন বুঝেন, তাঁহার সেই ভাবেই সাধনা করা উচিত ; কিন্তু আমি বুঝি, ঈশ্বর আনন্দময় প্রেমময় নায়ক। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী ; তাঁহার কাছে সাধকের কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নাই। বিশ্রব্ধা নায়িকার প্রেম-ভক্তিই আমার অবলম্বনীয় সাধন। নায়কে নায়িকার যেরূপ প্রেম-ভক্তি, ঈশ্বরে সেইরূপ ঐকান্তিকী প্রেম-ভক্তিই সদ্গতির প্রধান সাধন।

এটি বড় বিষম কথা। নায়ক-নায়িকা—এই দুইটি কথা মনে আসিলেই রঙ্গরসের কথা মনে আসে, কিশোর বয়সের লীলা-খেলার কথা মনে পড়ে—সেই শিরায় শিরায় তড়িৎ-সঞ্চার, সেই আবেশের বিহ্বলতা, সেই বিলাসের মত্ততা, সেই আত্মতৃপ্তির স্বার্থপরতা—সকলই মনে পড়ে। যে প্রেম-ভক্তির এই সকল উপাদান, সেই প্রেম-ভক্তিই কি অনন্তজ্ঞান, অপরিমেয়-শক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বরের উপাসনার প্রধান সাধন ?—ক্রমে বড় বিষম কথা হইল ! বাস্তবিক কিন্তু কথাটা তত কঠিন নয় ; অথচ এখনকার দিনে উহা যে বিষম হইতে বিষমতর হইয়াছে তাহার আর ভুল নাই ; নহিলে এই সনাতন বৈষ্ণব ধর্মে লোকের দিন দিন অশ্রদ্ধা হইবে কেন ?

স্বতঃপরত এখন আমরা দুই প্রকার নায়িকা সচরাচর দেখিয়া থাকি। এক ঘরাও নায়িকা, আর এক কেতাবী নায়িকা। শিক্ষার জোরেই হউক, আর অদৃষ্টের ফেরেই হউক, আমরা আজিকালি ঘরের নায়িকাকে হয় দাসীর দাসী, না হয় পুতুলের পুতুল বানাইয়াছি। কাজেই অনেক সময় তাঁহারাও হয় আমাদিগকে মনিবের মনিব বলিয়া মনে করেন, না-হয় পুতুলের সাজওয়ালা ভাবিয়া চির দিন অলঙ্কারের দাবি-দাওয়া করেন। বৈদেশিক কাব্য-নাটকে কেবল সাম্যের কঠোর প্রকৃতির ছায়া সর্বত্রই উজ্জ্বল, আশ্রয়-আশ্রয়ী ভাবের কোমল মূর্তি প্রায় কোথাও স্ফূর্তি পায় না, —কাজেই প্রেমময়ী নায়িকার যে প্রখরা অথচ কোমলা, উজ্জ্বলা অথচ স্নিগ্ধকারিণী প্রেম-ভক্তি বৈষ্ণব মতে ঈশ্বরোপাসনার প্রধান সাধন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনরূপ অস্পষ্ট ছবিও দেখি না, অপকৃষ্ট আদর্শও পাই না, সুতরাং ও-সকল কিছু বুঝিতেও পারি না—আমি যাহা বুঝি না তাহাই ত humbug, তাহাই ত বিড়ম্বনা। অতএব বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম—এক বৃহৎ বিড়ম্বনা, a huge humbug.

বৈষ্ণব বলেন—কৈশোরের রঙ্গরস, বয়সের লীলাখেলা, —শিরায় তড়িৎ-সঞ্চার, আবেশের বিহ্বলতা, বিলাসের ভোগসুখ, আনন্দের উচ্ছ্বাস, উৎসাহের উল্লাস, তৃপ্তির স্বার্থপরতা,—ভাই ! এ সকল তোমার পক্ষে হেয় বা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া তুমি মনে করিও না। সাধক যদি সৎ-সাধনায় ঐ সকল প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে তাহাতেই তাঁহার সদ্গতি।

এই শোভাময়ী প্রকৃতির অঙ্কে লালিত হইয়া, এই সৌন্দর্যময় জগতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তোমাকে যে কেবল কঠোরতার অভ্যাসে ধর্মশিক্ষা করিতে হইবে—এ কথা ভাই ! তোমাকে কে বলিল ? যৌবনে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্মের জন্য অকালে বৃদ্ধত্ব অবলম্বন করিতে হইবে—এ কথা তুমি কোথায় শুনিয়াছ ? চিত্তবৃত্তি সকল যখন স্ফূর্তি লাভ করে, ইন্দ্রিয়াদি যখন পূর্ণ পরিস্ফুট হয়, শরীরে সামর্থ্য,

মনে একাগ্রতা, হৃদয়ে আগ্রহ যখন প্রবল থাকে, সেই যৌবনকাল, যদি কেহ বলিয়া থাকেন কেবল অনর্থের সময়, তবে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট যৌবনকালের কথা বলিয়াছেন, আর যৌবনের উচ্ছ্বাসে অধর্ম হয়, এ শিক্ষা যদি কেহ তোমায় দিয়া থাকেন,—নিশ্চয়ই তিনি কক্ষভ্রষ্ট কুগ্রহের কথা বলিয়াছেন। প্রতি মনুষ্যের পূর্ণ বিকাশ কখনই অনর্থ-পাতের হেতুভূত হইতে পারে না—স্বভাবে বিড়ম্বনা আছে বটে, কিন্তু এরূপ বিশ্বব্যাপী বিড়ম্বনা কোথাও নাই ; যৌবন-সুলভ প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও স্ফূর্তি মানবের বিড়ম্বনা নহে। ঈশ্বর-প্রেমে সেইরূপ শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চারিত কর, সেই প্রেমময়ের ভাবে সেইরূপ বিভোর হও, অনন্ত আনন্দের বিলাসে সেইরূপ বিহ্বল হও, যৌবনের সেই উচ্ছ্বাস, সেই উল্লাস, তৃপ্তির সেই স্বার্থপরতা, ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা কর, দেখিবে নায়িকার মত ঐকান্তিকী প্রেম-ভক্তিই ঈশ্বরোপাসনার উৎকৃষ্ট সাধন, সোৎসাহ মাধুর্য রসই সাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এবং বৈষ্ণবের ধর্ম—সাধকের চরিত্র-দোষে এখন যতই বিড়ম্বিত হউক না কেন,—প্রেম-ভক্তির ধর্ম উপেক্ষা বা ঘৃণার বিষয় নহে, বুঝিবার ও শিখিবার সামগ্রী ; নায়িকার প্রখরা অথচ কোমলা, উজ্জ্বলা অথচ স্নিগ্ধকারিণী প্রেম-ভক্তির অস্পষ্ট ছবিও আজিকালি আমরা দেখি না বটে, অসম্পূর্ণ আদর্শও পাই না বটে, কিন্তু বৈষ্ণবের পদাবলীতে, বৈষ্ণবের গ্রন্থাবলীতে সেই আদর্শের পৌনঃ-পুনিক উল্লেখ আছে। সনক, সনাতন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ,—নন্দ, যশোদা,—শ্রীদাম, সুবল,—সকলেই সাধকের আদর্শ—কিন্তু প্রেম-ভক্তির পূর্ণ আদর্শ—শ্রীমতী প্রেমময়ী রাধিকা।

বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা ক্রমেই বিষম হইতে বিষমতর হইতেছে ; বৃন্দাবনবিলাসিনী কুলকলঙ্কিনী, বৃষভানু-নন্দিনী 'সাধকশ্রেষ্ঠ'—বড়ই বিষম কথা হইল !

আবার একটু পিছু হটিয়া যাইতে হইতেছে ; বেশ করিয়া বুঝা চাই যে, নায়িকার প্রেম-ভক্তিই সাধনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলি কেন। ভাল, ঈশ্বর-ভয় যেন বালকের ভাব হইল ; ঈশ্বরে পিতার মত শ্রদ্ধা যেন একটু ভয়-জড়িত ভাব বলিলাম, সাধকের দাস্যভাবও যেন সেইরূপ ধরিলাম, কিন্তু ঈশ্বরকে মাতার মত ভক্তি করিতে পারিলে ক্ষতি কি ? তাহা শিক্ষা না করিয়া, নায়কে নায়িকার প্রেম-ভক্তিই আমাদের অনুকরণীয় হইল কিরূপে ? বৈষ্ণব বলেন, মাতৃভক্তিতে যে ঈশ্বর-সাধনা হয় না, তাহা বলি না, কিন্তু আমরা যেরূপ বুঝিয়া এই পন্থা অবলম্বন করি, তাহা বলিতেছি।

শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম তিনেতেই একটি পাল্‌টি-প্রকৃতি ভাব আছে, অথচ বিনিময়ের ভাব নাই। বিনিময় যাহার লক্ষ্য—তাহার নাম ব্যবসাদারি। শ্রদ্ধা-ভক্তিতে স্নেহ মিলে, প্রেমে প্রেম পাওয়া যায়, ইহারই নাম পাল্‌টি-প্রকৃতি-ভাব। পাল্‌টি-প্রকৃতিভাব থাকিলেই, সাম্যভাব আসিয়া পড়ে ; সাম্যের স্ফূর্তিতে ঐ ভাবের প্রকৃত স্ফূর্তি হয় ; এই সাম্যভাব পিতাপুত্রে যতটুকু আছে মাতাপুত্রে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি আছে ; নায়ক-নায়িকা-মধ্যে পূর্ণমাত্রায় আছে। পিতার কাছে সঙ্কোচ আছে, মাতার কাছেও কতকটা আছে, নায়ক-নায়িকা-মধ্যে সংকার্যের কোন কথারই আর সঙ্কোচ নাই। ইহাই প্রকৃত বৈকুণ্ঠভাব, সুতরাং নায়ক-নায়িকার উপজীব্য অসঙ্কোচ প্রেম-ভাবই বৈষ্ণবের অবলম্বনীয়।

এখন বুঝিতে হইবে যে, নায়ক-ভাব ও নায়িকা-ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবটি সাধক আপনাতে আনয়ন করিয়া ভগবানের সাধনা করিবেন। বাঙ্গালির নায়ক-নায়িকা-ভাব বুঝিলে ঐ প্রশ্নের একই উত্তর সম্ভব। নায়িকার মত প্রেম-ভক্তিই ঈশ্বরে প্রযুজ্য। আমাদের দেশে নায়ক-নায়িকা-মধ্যে ঠিক সাম্যের পাল্‌টি-প্রকৃতি-ভাব নাই। অগাধ প্রেমের সহিত সম্পূর্ণ অসঙ্কোচ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, একটি অপূর্ব আশ্রয়-আশ্রিত-ভাব আছে। যতই উদারতায় স্ত্রীপুরুষের সাম্যভাব প্রচার কর, যতই উচ্চ কণ্ঠে স্ত্রী-স্বাধীনতার 'সংবাদ' বিঘোষিত কর, যতই অবারিত-বন্ধ-মুক্ত-দ্বারে নারীকে রাখ এবং অসঙ্কোচে তাঁহাকে বিচরণ করিতে দাও—তবু বাঙ্গালির কুলরমণী—সেই তমালে তরুলতা, সহকারে মাধবী ; এবং পুরুষ—প্রণয়িনীর আশ্রয় ও অবলম্বন। বৈদেশিক নাটক-নভেলের সেই তুলাদণ্ডের সাম্যভাব আমাদের দেশের কোন শ্রেণীর নায়ক-নায়িকায় নাই।

প্রেমে ভক্তি, সাম্যে বৈষম্য, প্রতিগ্রহে বিনিময়, দাসীত্বে বন্ধুতা—এইরূপ দুই দুই বিপরীত ভাব—কেবল হিন্দু নায়িকাতেই আছে। হিন্দু নায়িকা প্রেমের সখী, অথচ ভক্তির সেবিকা; সাম্যে সহধর্মিণী, বৈষম্যে দাসী; রসে ইয়ার অথচ শিক্ষায় ছাত্রী। প্রেম-ভক্তির এইরূপ রাসায়নিক সংযোগ বৈষ্ণবী সাধনার প্রধান উপকরণ। যে সাধক, সে অবশ্যই ঈশ্বরকে আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বরূপ ভাবিবে। বৈষ্ণবও তাহাই ভাবেন, তবে তাঁহার অবলম্বনের সমীপে, তাঁহার আশ্রয়ের নিকটে তাঁহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই। তিনি ঈশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, মনের মানুষ অকপটে স্বচ্ছন্দে মনের কথা তাঁহাকে বলেন; ভক্তির চক্ষুতে দেখেন—তিনি বিশ্ববিধাতা বিশ্বনিয়ন্তা, সাধকশরণ এবং অনাথের অবলম্বন। প্রেম-ভক্তির এরূপ রাসায়নিক সংযোগ আর কোন ধর্মে নাই। এই প্রেম-ভক্তি হয়ত কখন উপদেশে, হয়ত কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মায়। উভয়ত্রই সেইরূপ প্রেম-ভক্তি—কর্তব্যতার অনুসঙ্গ বা ফল। হিন্দু নারীকে শাস্ত্রে শিক্ষা দিলেন, সমাজ শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইল, পিতামাতা শৈশব হইতে বলিয়া দিলেন, সখী কাণে কাণে জপমন্ত্র দিল যে, স্বামীকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে হয়, দেবতার মত ভক্তি করিতে হয়। সাধ্বী তাহাই শুনিল, তাহাই করিল, আজীবন সেই উপদেশ ক্ষণকালের জন্য ভুলিল না; কর্তব্য-পন্থা হইতে কেশমাত্র বিচলিত হইল না; প্রেম-ভক্তি-ভরে চিরদিন স্বামি-সেবা-ব্রত পালন করিতে লাগিল। অথবা শাস্ত্র শুনে নাই, সমাজের সুদৃষ্টান্ত দেখে নাই, পিতামাতা তাহাকে ওরূপ কোন কথা বলেন নাই; কিন্তু জ্ঞান হইলে বুদ্ধিমতী সতী দেখিল যে, স্বামী হইতেই ভরণপোষণ, স্বামী হইতেই মানসম্ভ্রম, স্বামী হইতেই সুখসম্ভোগ; সুতরাং কৃতজ্ঞতা-ভরে স্থির করিল যে, স্বামিসেবাই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি; স্বামীই নারীর পরম দেবতা।—এই সিদ্ধান্ত মত তিনি চিরদিনই প্রেমভক্তি-সহকারে স্বামিসেবা করিতে লাগিলেন,—তাঁহার কর্তব্য-পন্থা হইতে কেশমাত্র বিচলিত হইলেন না। অতএব প্রেম-ভক্তি কখন উপদেশে হয়, কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মায়। সকলরূপ প্রেম-ভক্তিই স্বর্গীয় সামগ্রী। কিন্তু বৈকুণ্ঠের নহে। স্বর্গ পবিত্র-পুরী, বৈকুণ্ঠ আনন্দ-ধাম। যে প্রেম-ভক্তি কর্তব্যতার সহচরী, তাহা বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি নহে। যাহা উপদেশে উঠে বা কৃতজ্ঞতায় জন্মায় তাহাও বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি নহে। বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি সৌন্দর্য-বোধের সহচরী, উপদেশে উহা উদ্ভূত হয় না, কঠোর কর্তব্যজ্ঞানের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কর্তব্যজ্ঞানের দায়িত্ব ইহাতে নাই, সৌন্দর্যের আকর্ষণ আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে। অনন্ত সুন্দরের শোভায় তাঁহার প্রতি চিত্তের যে একাগ্র গতি,—তাহাই প্রকৃত প্রেম-ভক্তি। আর যে-রসে হৃদয় উথ্‌লে উঠে, তাহাই প্রকৃত মাধুর্য রস। ঐ মাধুর্য রসে, ঐ প্রেম-ভক্তি-ভরে বৈষ্ণব জগদীশ্বরকে দেখিল—রাসরসিক রসেশ্বর।

অতএব আদর্শ-সাধিকার, প্রেমময়ী রাধিকার, প্রেম-ভক্তি—গুরূপদেশের ফলও নহে, কর্তব্যানুষ্ঠানের সহচরীও নহে। তিনি ব্রজ-সুন্দরের সৌন্দর্যে, আনন্দময়ের আনন্দে, রসিক-শেখরের রস-লোভে কুলত্যাগিনী। যে-কুলকামিনী শাস্ত্রের বিধানানুসারে বা সমাজের সুদৃষ্টান্ত দেখিয়া, গুরুজনের উপদেশমত পতিপরায়ণা, পতিরতা, পতিব্রতা; স্বামীকে ইহকালের ও পরকালের পরম দেবতা বলিয়া জানেন,—তিনি নারীচরিত্রের আদর্শ, ভারতের গৌরব, পৃথিবীর অলঙ্কার, স্বর্গের বাঞ্ছনীয় সামগ্রী। তিনি সীতা, তিনি সাবিত্রী, তিনি ধরিত্রীর পাবিত্র্যকারিণী। কিন্তু তাঁহার পতিভক্তি বৈষ্ণবের অনুকরণীয়া নহে। যে ভাবে যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন, যদি পিতা-মাতা-পরিবার পরিত্যাগ করিতে পার, তবে আমায় পাইবে, সেইভাবে রাধিকা সর্বত্যাগিনী হইয়া তবে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব বলেন, যিনি শাস্ত্রের শাসনে পতিপরায়ণা, তিনি পূজনীয়া হইয়াও বালিকা; যিনি সমাজের দৃষ্টান্তে পতিরতা, তিনি মাননীয়া হইলেও গড্ডলিকা; যিনি উপকারের প্রত্যুপকারচ্ছলে পতিসেবায় নিযুক্তা, তিনি বেণেনী; যিনি কঠোর কর্তব্য-সাধনে পতিপ্রাণা, তিনি ব্রতধারিণী দেবী; কিন্তু যে প্রেমের বলে কুল মানিল না, মান দেখিল না, লজ্জা-ভয় পাইল না, শাস্ত্র ভাবিল না, কিছুই গণনা করিল না,

সর্বস্ব-ত্যাগিনী হইয়া কলঙ্কিনী হইল—তিনিই যথার্থ প্রেমময়ী। তুমি ধর্মধ্বজী, ইহাতে শিহরিয়া উঠিলে; তুমি হিতবাদী শনৈঃশনৈ মস্তক সঞ্চালন করিতেছ; তুমি নীতিবিৎ, তোমার মস্তক আজি বজ্রাহত হইল; তুমি সতীত্বের গৌরবাকাঙ্ক্ষী—হতাশ হইতেছ। না, তোমরা কেহই হতাশ হইও না—প্রকৃত প্রেম-ভক্তির সহিত শাস্ত্রের দ্বন্দ্ব নাই, সমাজের বিরোধ নাই, নীতির বিবাদ নাই, কর্তব্য-পালনের শত্রুতা নাই। রাধিকার প্রেম-ভক্তি কিছুরই বিরোধিনী নহে।

রাধিকা ক্লীবে বিবাহিতা, সুতরাং শাস্ত্রমতে অনূঢ়া। পরকীয়া হইয়া পরস্ত্রী নহেন; কুলটা হইয়াও স্বৈরিণী বা ব্যভিচারিণী নহেন। এইখানেই বাঙ্গালি বৈষ্ণবগণের আদর্শ-সৃষ্টির আশ্চর্য কৌশল! যিনি মহৎ হইতে মহৎ, তিনি ক্ষুদ্রকে বিস্মৃত হন না। বৈকুণ্ঠের প্রেম-ভক্তি পৃথিবীর রীতি, মানব ধর্মশাস্ত্রের নীতি—বিস্মৃত হন নাই। প্রেমময়ী শাস্ত্রে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নীতির দিকে নয়ন না হেলাইয়া প্রেমময়ের দিকে একাকিনী অভিসারিণী হইয়াছেন, শাস্ত্র ধীর পদে দূরে থাকিয়া তাঁহার দেহ-রক্ষার্থ তদীয় অনুসরণ করিতেছেন, নীতি পরিচারিকা-ভাবে চামর লইয়া পশ্চাতে যাইতেছেন। বৈষ্ণব-চিত্রিত এই অপূর্ব ছবি বড়ই সুন্দর, সরস এবং সারময়।

প্রেম-ভক্তির উৎপত্তি ঐরূপ; ঐ ভক্তির বিকাশ এবং স্থিতি আরও বিস্ময়কর। কঠোর কর্তব্যের সহিত প্রেম-ভক্তির কোন সম্পর্ক নাই। সৌন্দর্যের মাধুর্যেই উহার উৎপত্তি; এবং সেইজন্য শ্রীমতী কুলত্যাগিনী। আর প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সর্বভোগী অথবা লম্পট!

শ্রীমতীর মত শ্রীকৃষ্ণের যদি একগতি, একমতি তুমি দেখিতে চাও, তবে তুমি আবার সেই পাল্‌টি-প্রকৃতি খুঁজিতেছ, বিনিময় চাহিতেছ, প্রেমের বাণিজ্য করিবে মনে করিতেছ। ঈশ্বর-সাধনায় সেরূপ বাণিজ্যের বাসনা—অসম্ভবের আব্‌দার। এই অসংখ্য সূর্য-চন্দ্র-পরিব্যাপ্ত বিশ্বমণ্ডল যাঁহার আনন্দের উপাদান, তুমি—ধ্রুব হও, প্রহ্লাদ হও,—সনক হও, সনাতন হও,—যীশু হও, মহম্মদ হও,—শ্রীদাম হও, শ্রীমতী হও,—তিনি যে তোমাতেই তাঁহার প্রেম সীমাবদ্ধ করিবেন, এ তোমার কেমন আব্‌দার? তবে হৃদয়ে যদি বাস্তবিকই ভক্তি থাকে, এতটুকু আব্‌দার করিতে পারি বটে যে, তুমি অনন্ত হইয়াও সর্বদৃক্‌, আমি ক্ষুদ্র হইয়াও যেন তোমার চরণে শরণ পাই।

এই জন্যই শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন—

ভুল না, ভুল না, নাথ!
মিনতি করি আমি হে!
অন্যেরও অনেকও আছে,
আমার কেবল তুমি হে!
তোমারও অনেকও আছে,
আমার কেবল তুমি হে!

ঐ সামান্য কয়টি কথায়, প্রেম-ভক্তির কেমন মনোহর উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের কেমন সুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়!

'অন্যেরও অনেকও আছে—কত লোক, কত বিষয়ের উপাসনা করিতেছে, কত বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া মনের তৃপ্তিসাধন করিতেছে। কেহ ধন-জন-মান লইয়া ব্যস্ত, কেহ রূপ-গুণ-কুল লইয়া মত্ত, কেহ রাজসভার ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট, কেহ-বা সমর-সজ্জায় মোহিত। সাধকের কিন্তু—তিনি এই মায়া-মোহময়, লীলা-খেলা-পূর্ণ, অথচ বিপজ্জাল-জড়িত সংসারেই থাকুন, আর ঘন-বিরল-বিটপি-বিন্যস্ত, স্বভাবের শষ্পশোভা-শোভিত হিমালয়ের নিরালয় সানুদেশেই থাকুন, —সাধকের জগদীশ্বরই একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র গতি, জগদীশ্বরই তাঁহার অবলম্বন এবং জীবনের জীবন। 'অন্যেরও অনেকও আছে, আমার কেবল তুমি হে!' আমায় ভুলিও না। আমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, অণু হইতে অণু, এই অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত সহস্র কোটি সৌরমণ্ডলের মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চন, তুমি সর্বময় সর্বাধার, 'তোমারও অনেকও আছে'—ভুল তোমাতে সম্ভব হইলে, তুমি ভুলিলে ভুলিতে পার, কিন্তু নাথ! তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে? আমার যে কেবল তুমি হে! অতএব মিনতি করি, নাথ! তুমি আমায় ভুলিও না। ভক্তির কি মনোরম উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের কি সুন্দর বিকাশ। তোমার অনেক আছে, থাকিবারই কথা। তুমি রাজ-রাজেশ্বর, অসংখ্য প্রাণী তোমার প্রজা, তুমি রসিক-

শেখর, ষোড়শ সহস্র গোপিনী তোমার সেবিকা, কিন্তু আমার এই আব্দার, তুমি তা বলিয়া আমাকে (যেন) ভুলিও না; ভুলিলে আমার গতি কি হইবে? 'আমার (যে) কেবল তুমি হে!' অতএব মিনতি করি, তুমি আমায় ভুলিও না। প্রেম-ভক্তিময়ী সাধিকা, ভক্তপ্রধানা রাধিকার সরল প্রাণের ঐ একমাত্র কামনা। বৈষ্ণব শক্তি-সেবকের মত ধনং দেহি, মানং দেহি বলেন না, বলিতে জানেন না; বৈষ্ণব কৃপাময়ের কৃপাকণা কখন যাজ্ঞা করেন না,—কোন দেশে এমন মূর্খ নায়িকা নাই যে 'নাথ! আমাকে কৃপা কর' বলিয়াছেন। প্রবাস-গমন-প্রয়াসী নায়কের নিকটে বাষ্প-ভর-স্পন্দিত নয়নে নায়িকা আসিয়া যেমন ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন, 'দেখ, মনে রেখ, যেন ভুল না,' বৈষ্ণব চিরদিনই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে সেইরূপ বলিয়া থাকেন, 'ভুলনা, ভুলনা, নাথ! মিনতি করি আমি হে।' বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির ঐ একমাত্র প্রার্থনা।

বৃন্দাবন-পরিক্রমে প্রায়ই পথ ভুল হইয়া থাকে; আমরা প্রেম-ভক্তির পরিণাম-কুঞ্জে আসিয়াছি, পথে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আবার সেই কুঞ্জ পরিভ্রমণ করিতে হইবে। প্রেম-ভক্তির মহাযাত্রায় চন্দ্রাবলীর পালা ছাড়িতে পারা যায় না। প্রেম বৈকুণ্ঠ হইতে অবতারিত। প্রেমে কুণ্ঠা নাই, সঙ্কোচ নাই; কিন্তু পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে; অভিমান—নায়িকার পরিমিত প্রেমের চিরসঙ্গী।

সীতা যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সস্ত্রীক হইয়া সেই যজ্ঞ করিতে হয়, তখন অভিমানের উৎকণ্ঠায় বলিলেন, 'কি বলিলে? কি বলিলে?' বর্ণনকারিণী বলিতে লাগিলেন, 'তিনি স্বর্ণসীতা নির্মাণ করিয়া বামে রাখিয়াছেন;' তখন অভিমান সেই পূর্ণ প্রীতিকে পথ ছাড়িয়া দিল; প্রীতির উচ্ছ্বাস নয়নে আসিল; সীতা নয়নাঞ্চলে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বলিলেন, 'সেই ধর্মব্রত মহারাজের জয় হউক।' যখন পতি-ভক্তির পূর্ণ-প্রতিমা সীতাতেই এইরূপ প্রেমাভিমান, তখন অন্য পরে কা কথা। কিন্তু নায়িকার পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে বলিয়া সাধকের ঈশ্বর প্রেমেও কি অভিমান আছে? আছে। আব্দারের সঙ্গে সঙ্গে অভিমান না থাকিলে, প্রেম কখন বিকশিত হয় না। এই অভিমান ছিল বলিয়াই সাধক-প্রধান রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন,—'মায়ের এমনি বিচার বটে।' ভক্তিতে অভিমান ছিল বলিয়াই মহাত্মা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন—

কোথায় আনিলে?
পথ ভুলালে।

শ্রীমতীর সেই অভিমানের পূর্ণ স্ফূর্তি চন্দ্রাবলীর পালায়। পূর্বেই বলিয়াছি, সাধক-সাধিকার একমাত্র কামনা, 'নাথ! আমায় ভুলিও না।' যদি একবার মনে হয় যে আমার কেবল তিনিই, ইহা জানিয়াও তিনি আমায় ভুলিয়াছেন, তবে সাধকের আর অভিমানের ইয়ত্তা থাকে না। কিন্তু সেই অভিমানে ভক্তি শিথিল হয় না,—দৃঢ় হয়। সরল ভক্তিতে অভিমানের গ্রন্থি-ভক্তি আরও সুদৃঢ় করে। এই অভিমান-গ্রন্থি সকল ভক্তেই দেখিতে পাওয়া যায়। জোবে আছে, দায়ুদে আছে, মহম্মদে আছে, ধ্রুবে আছে, প্রহ্লাদে আছে। প্রেম-ভক্তির আদর্শ-প্রতিমা শ্রীরাধার প্রেম-বিকাশের এই অভিমানই প্রধান উপকরণ। এই অভিমান প্রেমসাগরের মানরজ্জু। যেখানে প্রেম যত গভীর সেখানে মানরজ্জু ততই বিস্তৃত। কিন্তু সাগর যেখানে অগাধ, সেখানে মানরজ্জু হারাইয়া যায়। প্রেম অগাধ হইলে অভিমান প্রেমে লীন হয়। তখন নায়িকা বলেন—

প্রণয় মোর সাগরতুল, সে কি অনাদরে শুখাবার,
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি, না তাতয়ে সাগর মাঝার।
সখি, কতদূরে ভানু রয়, নাগর তাহে কাতর নয়,
পসারি তার অগাধ হৃদয় তবু তার পানে ধায়।

প্রভাস খণ্ডে শ্রীমতীর প্রেম-ভক্তির পূর্ণ বিকাশ, তখন অভিমান অতলের অতলে গিয়াছে। তখন বৃন্দাবনের সেই বিলাসিনী কেবল কৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের জন্য উন্মাদিনী। তখন আর রুক্মিণী বা সত্যভামার অস্তিত্ব পর্যন্ত বোধ নাই।

বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির পরমোৎকৃষ্ট আদর্শের আমরা এতক্ষণে ঐহিক চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইলাম। এখন ভাদ্রের সেই কূল-ভঙ্গকর স্রোতে আর তরঙ্গ নাই—এখন আশ্বিনের একটানা পড়িয়াছে; আপনার বেগে

মন্দাকিনী আপনি সাগরে চলিয়াছেন; বর্ষার সেই ঘোর-ঘটার বজ্রবিদ্যুৎ চলিয়া গিয়াছে, এখন শারদের মাধুর্যে জগৎ পরিপূরিত হইয়াছে। প্রভাসের রাধিকা শারদের সেই মন্দাকিনী; বিমল উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের সুন্দর ছবি প্রশস্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তখন কুল-কুলস্বরে অনন্ত প্রেমের অনন্ত সাগরে মিলিতেছেন। বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির এই চরম আদর্শ!

বোধ হয়, এতক্ষণে আমরা কতক কতক বুঝিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব-স্বামী, সকল উপাস্য বলিয়াই তিনি গোপাঙ্গনা-গণের নায়ক বলিয়া বর্ণিত; এবং প্রেম-ভক্তি কর্তব্যের অনুষ্ঠান বা শাস্ত্রের অনুসরণ নয় বলিয়াই রাধিকা কুলত্যাগিনী।

বৈষ্ণব ধর্মের আধ্যাত্মিক আলোচনায় বুঝিলাম যে বৈষ্ণবের মতে যৌবনের উৎসাহময় মাধুর্য রসই সাধকের চিত্ত-বৃত্তির উৎকৃষ্ট অবস্থা; ঈশ্বরে ঐকান্তিকী প্রেম-ভক্তিই তাঁহার সহজ সাধনা; বৃন্দাবনের বিলাসিনী, প্রভাসের তপস্বিনী প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধিকাই প্রধানা সাধিকা ও ভক্তের আদর্শ এবং অনন্তসুন্দর, রসশেখর শ্রীকৃষ্ণই অনন্ত অসংখ্য সাধকের একমাত্র আনন্দ-কেন্দ্র।

ভক্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ রাধিকা। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষ্ণবের একজন ঐতিহাসিক আদর্শ আছেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে পুণ্যভূমি ভারতের মধ্যে বাঙ্গালা প্রসিদ্ধ ভক্তি-ক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ। তিনি ভক্তির ঐতিহাসিক অবতার—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। স্বয়ং ভগবানের ভক্তরূপে অবতারের কথা অতি বিচিত্র। যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র পবিত্র কথা বারান্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

নবজীবন ১ম ভাগ ভাদ্র ১২৯১

পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব

নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত, 'বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম' নামক প্রবন্ধের শেষ কথা কয়টি এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনা-রূপে পুনরুক্তি করা আবশ্যক—

'ভক্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ রাধিকা। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষ্ণবের একজন ঐতিহাসিক আদর্শ আছেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে পুণ্যভূমি ভারতের মধ্যে বাঙ্গালা প্রসিদ্ধ ভক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ। তিনি ভক্তির ঐতিহাসিক অবতার—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। স্বয়ং ভগবানের ভক্তরূপে অবতারের কথা অতি বিচিত্র। যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র পবিত্র কথা বারান্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব।'

বারান্তরে বটে কিন্তু এবারে নয়। অগ্রে পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে ঐতিহাসিক অবতারের কথা হৃদ্গত করিয়া বুঝা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়; সেই জন্য এবার অগ্রে পৌরাণিক অবতার-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ঈশ্বর-অবতারের নানারূপ সিদ্ধান্ত আছে। কেহ বলেন, এই সমস্ত জড়-জীব-জগৎ সমষ্টিতে এবং ব্যষ্টিতে ঈশ্বরের অবতার। সমষ্টিতে এক এবং অদ্বৈত অবতার; ব্যষ্টিতে অনন্ত এবং অসংখ্য অবতার। মানবের ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ীভূত হইয়া ঐশী শক্তির যেখানেই বিকাশ দেখিবে, সেইখানেই বুঝিবে জগদীশ্বরের অবতার। বনে-উপবনে, গহনে-কাননে, পর্বতে-সাগরে, মানবে-দানবে, কীট-পতঙ্গে, ফুলে-ফলে—সর্বত্রই তাঁহার শক্তি ঝল্‌মল করিতেছে। সর্বত্রই তিনি সশরীরে বিরাজমান, সর্বত্রই তাঁহার অবতার—এই পৃথিবী অবতারময়ী।

কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ঐশী শক্তিতে অবতার উপলব্ধি করা ভক্তির চরম দশা বটে, কিন্তু অবতার বলিলে আমরা ওরূপ বিশ্বগ্রাসী কোন ভাব বুঝি না। যে স্থলে আমরা ঐশ্বরিক শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখি,—আমরা সেই স্থলেই অবতার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। মানবে ঐশ্বরিক শক্তির বিশেষ বিকাশকে প্রতিভা বলা যায়। 'প্রজ্ঞা নব-নবোন্মেষ-শালিনী-প্রতিভা মতা।' জগৎস্রষ্টার সৃষ্টিকারিণী শক্তি মানব-হৃদয়ে প্রতিভারূপে প্রতিভাত হয়; সেই শক্তি তখন মানব-হৃদয়েই সৃষ্টিকারিণী, নব নবোন্মেষশালিনী হয়, এবং সেই মানব জগদীশ্বরের অবতাররূপে পরিণত হন। কপিল, কোমৎ, ধন্বন্তরি, নিউটন, ব্যাস, বাল্মীকি—ইঁহারা সকলেই অবতার।

কেহ কেহ বলেন, কেবল মাত্র ধার্মিক পুরুষগণই প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের অবতার। জগদীশ্বর ধর্ম-ময়, ধর্ম-ধৃক্, ধর্ম-শক্তি; সেই ধর্মই যাঁহাদের জলন্তজীবন, ধর্মই যাঁহাদের প্রতিভা-বিকাশের প্রসারক্ষেত্র, তাঁহারাই মুখ্যকল্পে অবতার। তবে গৌণকল্পে, রূপকের ভাষায় অন্যান্য প্রতিভা-সম্পন্ন জনগণকেও কখন কখন অবতার বলা গিয়া থাকে। এই মতে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, মূশা, ঈশা, নানক প্রভৃতি সকলেই অবতার।

খৃস্টানের মতে, কেবল মাত্র ঈশাই দেব-নর বা নর-দেব অর্থাৎ অবতার। মূশা প্রভৃতি ঈশ্বরের করুণা-কটাক্ষে অতিমানুষ-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা অবতার নহেন। খৃস্টানের মতে নরের প্রধান গুণ আত্মদান। নরের সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রধানা শক্তি—ক্ষমা। এই ঐশ্বরিক অপূর্ব পিতৃশক্তি ক্ষমা এবং মানবীয় ঐ প্রধান গুণ সন্তানের আত্মোৎসর্গ—বাক্য এবং অর্থের মত মিশ্রিত হইয়া যীশু-জীবন; সুতরাং যীশুখৃস্ট দেব হইয়া নর; নর হইয়া দেব। তিনিই নর-দেব ও দেব-নর; তিনিই এক মাত্র অবতার।

পুরাণের অবতারতত্ত্ব বিচিত্র। কোন কোন পুরাণে পূর্ণাবতার এবং অংশাবতার, এই দুই ভাগে অবতার ভেদ করা হইয়াছে।* শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

এতেচাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

পূর্বে যে সকল অবতারের কথা কহিলাম, তন্মধ্যে পরমেশ্বরের কেহ কেহ অংশ এবং কেহ কেহ কলা; কিন্তু কৃষ্ণাবতার আবিষ্কৃত সর্বশক্তি-প্রযুক্ত স্বয়ং ভগবন্ নারায়ণ। এই জগৎ দৈত্যকুল-কর্তৃক উপদ্রুত হইলে ভগবান্ ঐ সকল মূর্তিতে সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের বিনাশ করত লোক সকলকে সুখী করেন।

[শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যানুবাদ।]

পরন্তু অনেকগুলি পুরাণের মত এই যে, কেবল পালন কার্যের জন্যই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সৃজন এবং সংহরণে অবতারের কোন প্রয়োজন নাই। এই জন্য কেবল বিষ্ণু বা নারায়ণেরই অবতার হইয়া থাকে, অন্য কোন দেবতার অবতার নাই। তবে যে হনুমান্‌কে রুদ্রাবতার বলিয়া বা বলরামকে অনন্ত বা সঙ্কর্ষণাবতার বলিয়া উল্লেখ আছে, তাঁহারা কেবল নারায়ণাবতারের সহায়রূপে পরিগণিত মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোক-ভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্যঙ্ নরাদিষু॥

অপিচ এই লোক-ভাবন ভগবান্ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া লীলাবশতঃ দেবতির্যক্ নরাদিতে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনুরক্ত হইয়া লোক সকলকে প্রতিপালন করেন। [বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যানুবাদ।]

মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনির্ধের্দ্বিজ।
যথাবিদাসিনাঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥
ঋষয়ো মনবো দেবাঃ মনুপুত্রাঃ মহৌজসাঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়স্তথা॥

হে দ্বিজ, জলাশয় হইতে নদী, খাল প্রভৃতি যেমন সহস্র প্রকার হয়, সেইরূপ সত্ত্বগুণ-প্রধান হরির অসংখ্য অবতার। ঋষি, মনু, দেব, মহাবিক্রম মানব, প্রজাপতি প্রভৃতি সকলেই সেই হরির কলা মাত্র।

বিষ্ণুপুরাণের একস্থানে কথিত হইয়াছে যে—

মনবো ভূভুজঃ সেন্দ্রা দেবাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা।
সাত্ত্বিকোঽংশ স্থিতিকরো জগতো দ্বিজসত্তম॥

ব্রাহ্মণ! মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ বিষ্ণুর সাত্ত্বিক অংশ এবং ইহারাই জগৎ পালন করিয়া থাকেন।

চর্তুর্যুগেঽপ্যসৌ বিষ্ণুঃ স্থিতিব্যাপারলক্ষণঃ।
যুগব্যবস্থাং কুরুতে যথা মৈত্রেয় তচ্ছৃণু॥

---

* বঙ্কিমবাবু পূর্ণাবতারেরই অবতারত্ব স্বীকার করেন সেই জন্যই তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বরাবতার বলেন —'প্রকৃত বিচারে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না এবং রামচন্দ্রের সে পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা-সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।'—প্রচার।

মৈত্রেয়, জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারি যুগে যে প্রকার যুগানুসারী ব্যবস্থা করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদি স্বরূপধৃক্।
দদাতি সর্বভূতানাং সর্বভূতহিতে রতঃ॥

তিনি প্রথমতঃ সত্য যুগে সর্বভূত-হিতার্থে কপিলাদিরূপ ধারণপূর্বক সকল প্রাণীকে পরম সত্যজ্ঞান দান করেন।

চক্রবর্তিস্বরূপেণ ত্রেতায়ামপি স প্রভুঃ।
দুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্বন্ পরিপাতি জগত্রয়ম্॥

ত্রেতা যুগে সেই প্রভু চক্রবর্তি-স্বরূপ ধারণপূর্বক দুষ্টগণের দণ্ডবিধানপূর্বক ত্রিলোক রক্ষা করেন।

বেদমেকং চতুর্ভেদং কৃত্বা শাখা শতৈর্বিভুঃ।
করোতি বহুলং ভূয়ো বেদব্যাস-স্বরূপধৃক্॥

তিনি দ্বাপর যুগে বেদব্যাস-রূপ ধারণপূর্বক এক বেদ চতুর্ভাগ করিয়া পশ্চাৎ শত শাখায় বিভক্ত করেন, এবং পুনর্বার উহা বহুল অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

বেদাংস্তু দ্বাপরে ব্যস্য কলেরন্তে পুনর্হরিঃ।
কল্কিস্বরূপী দুর্বৃত্তান্ মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ॥

তিনি বেদব্যাস-রূপে এইপ্রকার বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ কলির অবসানে কল্কিরূপ ধারণপূর্বক দুর্বৃত্তদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবেন।

[বরদাপ্রসাদ বসাক-কর্তৃক প্রকাশিত সানুবাদ বিষ্ণুপুরাণ।]

উপরের ঐ কয়টি শ্লোক হইতে মোটামুটি এই বুঝা যায় যে ভগবানের সত্ত্ব-গুণাংশে অর্থাৎ নারায়ণাংশে লোক-পালনের জন্য যুগে যুগে ভগবান্ মানব-আকারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণের অন্যত্র কথিত আছে যে—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরম্॥

দুঃখপ্রাপ্তিহেতু বা সুখপ্রাপ্তিহেতু, ধর্মহেতু বা অধর্মহেতু, তুমি শরীর পরিগ্রহ কর না, পরন্তু তুমি একমাত্র ধর্মরক্ষার নিমিত্তই শরীর ধারণ করিয়া থাক। [ঐ ঐ সানুবাদ বিষ্ণুপুরাণ।]

মহাভারতান্তর্গত ভগবদ্গীতায়ও এই মত সমর্থিত হইয়াছে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম সংরক্ষণার্থায় * সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতগণের বিনাশসাধনের জন্য এবং ধর্মসংরক্ষণের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতগণের দুর্গতি-সাধন এই দুইটি ধর্মসংরক্ষণের অনুষঙ্গ বলিলেও বলা যায়; সুতরাং ধর্মসংরক্ষণই ঈশ্বরাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকগুলি পুরাণই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ বিবেচনা করিলে নারায়ণের কেবল মাত্র মানবতার হওয়াই সম্ভব। সেই মানবও প্রদীপ্ত প্রতিভাপূর্ণ এবং অতুল ধর্মশক্তিসম্পন্ন হওয়া সম্ভব।

কিন্তু পুরাণে মীনকূর্মাদিও ত নারায়ণের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল কথার অর্থ কি? ধর্ম-স্থিতি-সংরক্ষণাদির জন্য ভগবান্ মীনকূর্মাদিরূপ পরিগ্রহ করিলেন কেন? এই সকল পৌরাণিকী কথার কি কোনরূপ পৌরাণিক অর্থ নাই?

অনেকের মনে অবতারতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সংকল্পবাদ আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ অনেকে এইরূপ মনে করেন যে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন বা ধর্মসংরক্ষণ-জন্য ভগবান্ সময়-বিশেষে, হয়ত দেব-মানব-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হন। তাহাতে ভগবানের বিশেষ সংকল্প থাকে এবং তাঁহাকে সেই জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। বাস্তবিক পৌরাণিক বৃত্তান্তের ভাষা দেখিলে, ঐরূপ বোধ হয় বটে। কিন্তু পৌরাণিক তত্ত্বানুসন্ধায়িগণের এটুকু বুঝা চাই যে অনেক সময়েই পুরাণের ভাষা সম্পূর্ণরূপে রূপকের ভাষা। যদি যাত্রা শুনিতে গিয়া কেহ বাস্তবিক মনে করেন যে সত্য সত্যই মা যশোদা বালক কৃষ্ণের দেখা পাইয়া ভৈরবী রাগিণীতে—

'হারানো ধন আয়রে রতনমণি কোলে করি তোরে।
তোরে বুকে রেখে বদনখানি হেরি রে।'

বলিয়া গান গাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে যেমন ভ্রান্ত

* 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়'—বহুপ্রচলিত পাঠ

বলিয়া মনে করিয়া থাকি, পুরাণাদির ভাষা মাত্র বুঝিয়া যিনি সত্য সত্যই মনে করেন যে, নারায়ণ বিশেষ সংকল্প করিয়া কার্য-বিশেষের জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকেও আমরা সেইরূপ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারি।

বাস্তবিক জগদীশ্বরে সংকল্প-বিকল্প, কৌশল-অকৌশল আরোপ করা বড়ই বিড়ম্বনার বিষয়। মনুষ্য অবশ্য মনুষ্যভাবেই ঈশ্বরভাব বুঝিবে, আপনার প্রজ্ঞার প্রকৃতি মনুষ্য কোন কালেই পরীক্ষা করিতে পারে না। আমরা ঈশ্বরকে অগত্যা মানব-মনের বিষয়ীভূত করিয়া তাঁহার প্রকৃতির একরূপ ক্ষীণধারণা করিতে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু ঈশ্বর-আলোচনার সময় এতটুকু আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ঈশ্বরে অগত্যা আমরা মানবীয় গুণ আরোপ করি বলিয়া, আমরা আবার সেই নকলকে প্রকৃত প্রস্তাবে ঐশ্বরিক গুণ মনে করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে যেন না যাই।

ইউরোপীয় ধর্মবিজ্ঞানে এইরূপ সিদ্ধান্ত ও বিতণ্ডার বড়ই বাড়াবাড়ি। মানবীয় দয়া প্রথমে ঈশ্বরে আরোপিত হইল; তাহার পর ঈশ্বর পূর্ণ বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির করা হইল যে তিনি পূর্ণ দয়ালু, অর্থাৎ পরম দয়ালু। আবার আর একদিক্ দেখিয়া স্থির হইল, ঈশ্বর ন্যায়পর, পরম ন্যায়পর। তাহার পর বিতণ্ডা বাধিল যে যদি পরম ন্যায়পর তবে আবার তিনি পরম দয়ালু কিরূপে? যদি পরম দয়ালু তবে আবার পরম ন্যায়পর কেমন করিয়া?

এইরূপে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার সহিত তাঁহার কৌশলময় ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধ। জগতের অপূর্ব কৌশল দেখাইয়া কৌশলীর অনুমান অবশ্যম্ভাবী—এই যুক্তি-আস্ফালন দিনকতক ইউরোপে বড়ই হইয়াছিল; মিল বলিলেন, যাঁহাকে সর্বশক্তিমান্ বল, তাঁহাকে আবার কৌশলী বলিতেছ কেন? ঘড়িওয়ালা সহজে দুইটা কাঁটা ঘুরিবার উপায় করিতে পারে না বলিয়াই ত স্প্রিং, লীবর, চাকা, ফ্লাইহুইল, কত কি যোজনা করে; তাহার শক্তি নিতান্ত অল্প বলিয়া সে কৌশল করিতে যায়। তবে আবার যিনি সর্বশক্তিমান্ তাঁহাকে কৌশলী বলিবে কেন?

আমরা বলি, ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনায় ঈশ্বরে মানবগুণ আরোপ করিতে আমরা বাধ্য হই বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া এতটুকু জ্ঞান কেন থাকিবে না যে সেই সকল আরোপিত গুণ লইয়া আবার বিচার-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইব।

অতএব অবতারতত্ত্বের সহিত সংকল্পবাদ বা সংকল্পময় কৌশলবাদ আমরা একেবারেই মিশ্রিত করিব না।

কোন পুরাণে ২৪টি অবতার, কোনখানিতে ২২টি*, কোথাও ১৮টি, কোথাও-বা ১০টি। বর্তমান কালের সাধারণ হিন্দুদিগের বিশ্বাসে দশটি অবতারই প্রাধান্য পাইয়াছেন। সেই দশটির নাম এবং ক্রম সকলেই জানেন—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রাম, (৮) বলরাম, (৯) বুদ্ধ, (১০) কল্কি। বরাহ পুরাণ প্রভৃতিতে ঐরূপ নাম ও ক্রম আছে; বাঙ্গালায় জয়দেব ঠাকুরের প্রসাদে এই মতই গৃহে গৃহে গীত হইয়া প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। পৌরাণিক অবতারতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া গণিত নহেন; তিনি পূর্ণাবতার। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে দশমাবতার বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

এই দশাবতার-সম্বন্ধে বঙ্গের একজন বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞ বলেন—

> যদ্‌যদ্ভাবগতো জীবস্তত্তদ্ভাবগতো হরিঃ।
> অবতীর্ণঃ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ॥

* শ্রীমদ্ভাগবতে ২২টি অবতারের উল্লেখ আছে।

(১) বিরাট, (২) বরাহ, (৩) নারদ, (৪) নরনারায়ণ, (৫) কপিল, (৬) দত্তাত্রেয়, (৭) যজ্ঞ বা ইন্দ্র, (৮) ঋষভ, (৯) পৃথু, (১০) মৎস্য, (১১) কূর্ম, (১২) (১৩) ধন্বন্তরী, মোহিনী, (১৪) নরসিংহ, (১৫) বামন, (১৬) পরশুরাম, (১৭) ব্যাস, (১৮) নরদেব বা রাম, (১৯) (২০) রাম, কৃষ্ণ, (২১) বুদ্ধ, (২২) কল্কি। দশমাবতার মৎস্যের বিবরণ এইরূপ,—

> রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।
> নাব্যারোপ্য মহীময্যা মপাদ্বৈবস্বতং মনুম্॥

এই বর্ণনায় ইহুদীয় পুরাণোক্ত নোয়া-র নৌকা-দ্বারা সৃষ্টি-রক্ষার কথা স্পষ্টই লক্ষিত হয়।

মৎস্যেষু মৎসভাবো হি কচ্ছপে কূর্মরূপকঃ।
মেরুদণ্ডযুতে জীবে বরাহভাববান্ হরিঃ॥
নৃসিংহো মধ্যভাবো হি বামনঃ ক্ষুদ্রমানবে।
ভার্গবোঽসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশরথিস্তথা॥
সর্ববিজ্ঞানসম্পন্নে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধো নাস্তিকে কল্কিরেব চ॥
অবতারা হরের্ভাবাঃ ক্রমোর্ধ্বগতিমজ্জদি।
ন তেষাং জন্মকর্মাদৌ প্রপঞ্চো বর্ততে কচিৎ॥
জীবানাং ক্রমভাবানাং লক্ষণানাং বিচারতঃ।
কালো বিভজ্যতে শাস্ত্রে দশধা ঋষিভিঃ পৃথক্॥
তত্তৎকালগতো ভাবঃ কৃষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি যঃ।
স এব কথ্যতে বিজ্ঞৈরবতারো হরেঃ কিল॥

মায়াবদ্ধ জীব যে-যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে-যে স্বরূপ পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রাপ্তভাব স্বীকার করত নিজ অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবান্ তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য নির্দণ্ড, নির্দণ্ডতা ক্রমশ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ অবতার হন। নরপশু-ভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্র মানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র। মানবের সর্ববিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। জীবের ক্রমোন্নত হৃদয়ে যে সকল ভগবদ্ভাবের উদয় কালে-কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকলই অবতার, সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য সকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে-যে সময়ে একটি একটি অবস্থান্তর লক্ষণ রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই-সেই কালের উন্নত ভাবকে অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

[শ্রীকেদারনাথ দত্ত-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা।]

ইহার তাৎপর্য এই যে, জীবের ক্রমবিকাশ-অনুসারে বিষ্ণু অবতারেরও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। জীবের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিক হইলেও তাহার মধ্যে মধ্যে সন্ধি বা গ্রন্থিস্বরূপ একটি একটি পরিচ্ছেদ আছে; সেই এক এক পরিচ্ছেদে এক একটি বিষয়ের চরমোৎকর্ষ হয়। তাহার পর হইতে অন্যরূপ বিকাশ আরম্ভ হয়। সেই সেই সন্ধিস্থলে জীবের চরমোৎকর্ষ ভাবই ঈশ্বরের অবতার। এইরূপে অবতারতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে দেখা যায় যে ইহাতে মানবাবতারগুলিতে প্রতিভা থাকিতেই হইবে এবং কাজেই সেগুলি আদর্শ হইয়া উঠিবে।

এখন জীব-বিকাশের সন্ধিস্থলে মৎস্য কূর্ম প্রভৃতি কিরূপে আসিল, তাহাই বুঝিতে হইতেছে। জীব-বিকাশ বা জড়বিকাশতত্ত্ব হিন্দু পুরাণ-দর্শনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানে বিবর্তবাদ কিছু স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সুতরাং আমরা এইস্থলে ইউরোপীয় বিবর্তবাদের সাহায্য লইয়া এই বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিব। সুপ্রসিদ্ধ ডারুইন বৈদেশিক বিবর্তবাদের অধিনেতা; সৌভাগ্যক্রমে জীবের ক্রমবিকাশ-কথায় আমরা তাঁহারই সাহায্য পাইয়াছি। ডারুইন বলেন—

We thus learn that man is descended from a hairy quadruped furnished with a tail and pointed ears, probably arboreal in its habits, and an inhabitant of the old world. ...This quadrumana with all the higher mammals are probably derived from an ancient *marsupial animal*, and this through a long line of diversified forms either from some reptile-like or some *amphibian-like* creature and this again from some *fish-like* animal.

—*Descent of Man, Darwin*, Chap.XXI, Part 2, Vol. II.

এইরূপে আমরা বুঝিলাম যে, কোন একরূপ লোমশ, সকোণ-কর্ণ-বিশিষ্ট, এবং সম্ভবত বৃক্ষচর জম্বুদ্বীপবাসী চতুষ্পদ পশু হইতেই মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। ... এই চতুষ্পদ জীবের এবং সকল প্রকার উচ্চতর শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবের উৎপত্তি সম্ভবত কোনরূপ পুরাকালিক বৃহৎ গর্ভকোষ-বিশিষ্ট জীব হইতে হইয়া থাকিবে। কোনরূপ সরিসৃপবৎ অথবা কোনরূপ উভচর জীব হইতে আবার সেই জীবের

উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, এবং সেই উভচর জীব কোনরূপ মৎস্যবৎ জীব হইতে উৎপন্ন।

অতএব বৈজ্ঞানিক বিবর্তবাদ পর্যালোচনায় ডারূউইন এইরূপ অনুমান করেন যে উচ্চতর জীব-সৃষ্টিতে প্রথমে মৎস্য, পরে উভচর (কচ্ছপ), তাহার পর বরাহের মত কোনরূপ বৃহজ্জঠর জীব, তাহার পর লোমশ কোন পশু, এবং পরে মানব-শরীর বিকশিত হইয়াছে। সেই আদি মানবগণ প্রথমে খর্ব বা বামন ছিল, এমন সিদ্ধান্তও ইউরোপীয় বিজ্ঞানে দেখা যায়। সুতরাং পৌরাণিক অবতারতত্ত্বে জীবসৃষ্টির যেরূপ ক্রমবিকাশের আভাস দেখা যায়, তাহা যে নিতান্ত আধুনিক বিবর্তবাদের বিরোধী তাহা বোধ হয় না, বরং মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ*, বামন—এইরূপ ক্রমই বিজ্ঞান-সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

প্রথম পঞ্চ অবতারে আমরা নিকৃষ্ট জীবের শারীরিক বিকাশে উৎকৃষ্ট জীব মানবের অবতারণা বুঝিলাম। তাহার পর, মানবের সামাজিক বিকাশ; এই বিকাশের তিনটি গ্রন্থি; অবতারও তিনটি।—পরশুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম।

পরশুরামাবতারে বাহুবলে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব-স্থাপন। বসিষ্ঠ, অগস্ত্য, জামদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিরা সকলেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ব্রতী ছিলেন, কিন্তু পরশুরামে সেই ব্রতের পরা কাষ্ঠা; পরশুরাম ভারতের উত্তরের ক্ষত্রিয়গণকে নিবীর্য করিয়া, এবং দক্ষিণে উপনয়ন-দ্বারা নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়া সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ্যের প্রভুত্বের চরমোৎকর্ষে পরশুরাম অবতার।

মানবের সামাজিক উন্নতির দ্বিতীয় সোপানে শ্রীরামচন্দ্র। রামচন্দ্র রাবণজয় করিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যেরূপ সমগ্র ভারতে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য স্থাপন করেন, তেমনই প্রজা-রঞ্জনের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দিয়া রাজা নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। রামচন্দ্র রাজাবতার। রাম রাজার তুল্য রাজা হয় না, রামরাজ্যের মত রাজ্য হয় না।

তাহার পর বলরাম। বলরামে সামাজিক তৃতীয় সোপান; বলরাম বাল্যে গোপালন-নিরত; বয়সে হলধারী। বলরামে কৃষিযুগের উৎপত্তি; বলরামের সময়ে ভারতের গৃহবিবাদ শান্তিলাভ করিল; বলরামের হলই তাহার পর ভারতের প্রধান অস্ত্র হইল, মনুষ্য পরস্পর যুদ্ধবিবাদ হইতে বিষম রক্তারক্তির পর নিরস্ত হইয়া, সর্বংসহা ধরণীর উপর আপনার অস্ত্র চালনা করিতে ব্যস্ত হইল; পূর্বে ম্লেচ্ছ যবনের মত আর্যগণ মধুপর্কের জন্য গো-সেবা করিতেন; এই সময় হইতে প্রকৃত গোপালন হইতে লাগিল; হিন্দুর যথার্থ গো-সেবায় এবং কৃষিচর্চায় ভারতবর্ষ অচিরাৎ ধন-ধান্য-দধি-দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইল। ভারতের কৃষিযুগের মানববৃন্দের সামাজিক উন্নতির এই চরম সীমা।

তাহার পর আধ্যাত্মিক বিকাশ। ভারতের আধ্যাত্মিক বিকাশের দুই অবতার বুদ্ধ এবং চৈতন্য। প্রথমে যুক্তি, পরে ভক্তি।

সামাজিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ হইতে আধ্যাত্মিক সোপান আসিল। সামাজিক অবস্থার 'অন্ধবিশ্বাস' ঘোর-তর তর্কজালে স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। বুদ্ধের একটি নাম বিজ্ঞানমাতৃক। শব্দটি শুনিলে বোধ হয় যেন বিদ্যাসাগর মহাশয় বা বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ওটি সৃজন করিয়াছেন; বাস্তবিক তাহা নহে; ওটি হেমচন্দ্রের অভিধান-ধৃত বুদ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ। বুদ্ধের ঐ নামকরণেই বুঝা যায় যে বৌদ্ধ ধর্মের যুক্তিই মূল। সেই যুক্তিতে বিশ্বনিয়ামক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইল। ইহাই ভক্তিহীন ধর্মযুক্তির শেষ সীমা। বুদ্ধ সেই যুক্তির অবতার।

যুক্তির নিরাশ্রয়তায় চক্ষুষ্মতী ভক্তির উৎপত্তি। এই ভক্তি অন্ধবিশ্বাসের সহচরী নহে; ইহা যুক্তির জঠর বিদীর্ণ করিয়া যুক্তির কন্যা অথচ সংহারিণীরূপে অবনীতে অবতীর্ণা

---

* ঠিক নৃসিংহ-ভাব অবশ্য ডারূউইন হইতে পাওয়া যায় না, তবে পুরাণে যখন নৃ-সিংহকে নৃ-বরাহও বলা হইয়াছে, তখন নৃ-মর্কট বলিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না।

নৃ-বরাহস্য বসতির্মহল্লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
নৃসিংহস্য তথা প্রোক্তা জনলোকে মহাত্মনঃ॥

সর্বত্রই বন্য মানুষ মাংস-লোলুপ হিংস্র জীব; তাহাতে বামনাবতারের পূর্বাবতার নৃ-মর্কট না হইয়া নৃসিংহবৎ হওয়াই পৌরাণিক মতে সম্ভব।

হন। পূর্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তির আবির্ভাবে বঙ্গদেশ পুণ্যক্ষেত্র। সেই ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্য, তাঁহাতেই মানবের ধর্মজীবনের পূর্ণ বিকাশ। আধ্যাত্মিক জীবনে ভগবানের ভক্তরূপে জন্মগ্রহণের বিচিত্র কথার এইটি আমাদের প্রস্তাবনা।

নবজীবন ১ম ভাগ পৌষ ১২৯১

জয়দেব

বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্মের রাগমার্গের চরম বিকাশ

জয়দেব গোস্বামি-কৃত গীতগোবিন্দে বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্মের রাগমার্গের কাব্যময় পরম ও চরম স্ফূর্তি হইয়াছে। ভক্তিমার্গের পূর্ণাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব এই রাগ-মার্গ অবলম্বন করিয়া বঙ্গে পূর্ণভক্তির অবতারণা করেন।

'জয়দেব বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি' মহাপ্রভুর কৈশোর সাধনার প্রধান অবলম্বন ছিল। অতএব বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম গূঢ়ভাবে বুঝিতে হইলে গোস্বামি-কৃত গীত-গোবিন্দ বুঝিতে চেষ্টা করা কর্তব্য।

কথিত আছে, বাঙ্গালি বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীব; কাজেই বাঙ্গালি আপনার আরাধ্য দেবতায় সেই ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা আরোপ করিয়াছে। জয়দেবের গীতিকাব্য সেই ইন্দ্রিয়-বিলাস-লালসার পূর্ণ স্ফূর্তি। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের সমসাময়িক কতকগুলি গোস্বামীর চরিত্রদোষে ঐ সম্পূর্ণ অসার সমালোচনাও হঠাৎ সারগর্ভ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই অধঃপতিত সমাজে অনেক স্থলেই সাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভিতরের ভাব কিছুই বুঝা যায় না। এখনকার সন্ন্যাসী দেখিয়া সন্ন্যাস বুঝা যায় না, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ্য বা পাণ্ডিত্য কিছুই বুঝা যায় না, আর ঐ তুলসী-ত্রিকণ্ঠ-তিলকধারী, তুরী-ভেরী-খুন্তী-তন্ত্রী-সমভিব্যাহারী গুরুপ্রসাদী প্রসাদপ্রার্থী গোস্বামী ঠাকুরকে দেখিয়া বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম বুঝা যায় না। তাই বলিয়া যে প্রকৃত যোগী বা সন্ন্যাসী, অধ্যাপক বা পণ্ডিত, বৈষ্ণবগুরু বা গোস্বামী একজনও নাই এমন নহে। প্রকৃত যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত নিতান্ত বিরল হইলেও এখনও পাওয়া যায়—পাওয়া যায় বলিয়াই আমরা আমাদের এই পতিত জীবনেও আপনাদিগকে কথঞ্চিৎ পুণ্যবান্ বলিয়া আশ্বস্ত হই।

যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ সে যে আপনার আরাধ্য দেবতাকে 'সুতরাং', 'অতএব', 'কাজে কাজেই' ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিবে—ন্যায়শাস্ত্রে এমন কথা বলে না, ইতিহাস তাহা প্রমাণ করিতে পারে না। যে ভীরুস্বভাব সে আপনার দেবতাকে ভীরু বলিয়া মনে করিবে, না—ভয়ানক বলিয়া মনে করিবে? যে কুকর্মশীল সে আপনার ঈশ্বরকে কুকর্মরত বলিয়া মনে করে, না—দণ্ডপ্রণেতা বলিয়া জানে? বালককালে পঠদ্দশায় শিক্ষাগুরুকে ভয়ে ভক্তিতে আমরা দেবস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছিলাম,—ভাবিতাম কি, তিনি গঙ্গায় ঝাঁপাই ঝুড়েন, সকালে বিকালে কেবল মার্বেল বটিকা লইয়া 'খর্টিগেন' করেন, আর অবসর পাইলেই ঘোটকের পুচ্ছলোম লইয়া ঘুন্‌সি বুনেন? কৈ তাঁহাকে ত আমাদের মত ভাবিতাম না।

ঈশ্বরের স্বরূপ-নির্ণয়ে জাতীয় বৈশেষিকত্বের কোন ছায়াই পড়ে না, এমন কথা বলি না—তবে এ কথা বলি বটে যে, কোন একটি জাতি চৌরধর্মী হইলেই তাহাদের দেবতা চোর-তস্কর-ভাবাপন্ন হইবে, এমন কোন কথা নাই। যাহারা চোর তাহারা আপনাদের দেবতাকে মহার্ঘ স্পৃহনীয় মহারত্ন মনে করিতে পারে, অনপহরণীয় সামগ্রী মনে করিতে পারে, তিনি স্বয়ং নির্লোভ হইয়া চৌরবিদ্যায় প্রধান ওস্তাদ—এরূপ মনে করিতে পারে, আবার কঠোর দণ্ডনেতাও মনে করিতে পারে। ফল কথা, চোরের ঈশ্বরে বৈশেষিকত্ব থাকিলেও সেই ঈশ্বর যে চৌরধর্মী হইবেই, এমন কোন কথা নাই।

আর এক কথা, এমন কথা যদি ঠিক হয় যে, যাহাদের ঈশ্বর গোবিন্দ, তাহারা অবশ্যই গোপালন-ব্যবসায়ী হইবে; যে জাতির ঈশ্বর ননী চুরি, বস্ত্র চুরি করে, সেই জাতি অবশ্য তস্কর হইবে; যাহাদের ঈশ্বর পূতনা-কংস-ঘাতী, তাহারা অবশ্যই নিতান্ত আত্মীয়-আত্মীয়ার প্রাণ-হন্তারক হইবে; যে জাতির ঈশ্বর রাসবিহারী, তাহারা অবশ্যই নিয়ত ইন্দ্রিয়সেবায় রত হইবে; যাহাদের ঈশ্বর রাধা-বল্লভ,

তাহারা অবশ্য কুটুম্বিনীগামী হইবে; যাহাদের ঈশ্বর রথের সারথ্য করে, তাহারা সকলেই সহিস্‌-কোচম্যানের জাতি। এইরূপ যুক্তিতে যদি সঙ্গতি থাকে তাহা হইলে ভারতবাসী, বিশেষ বাঙ্গালি, যে এক অত্যদ্ভুত পাপিষ্ঠ, কৈশোরে গোপালক এবং যৌবনে কোচম্যানের জাতি, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া উঠে। আমরা যে এইরূপ অদ্ভুত পাপিষ্ঠ জাতি তাহা বোধ হয় আমাদের বৈদেশিক রাজার স্বীয়-কর্মচারি-প্রতিষ্ঠার কল্যাণে মহামতি বীম্‌স প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সাক্ষ্য-বাক্যে প্রমাণীকৃত হইতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর অধিকাংশ কোন কালে যে, আধা বয়স্‌ রাখালি আর আধা বয়স্‌ কোচম্যানিতে কাটাইয়াছে, তাহা বোধ করি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মহাপাণ্ডিত্যবলেও প্রমাণীকৃত হইবে না।

উপাসকের অনুরূপে উপাস্য দেবতা 'গঠিত' হয়, এ কথাটা নিতান্ত অসার। খৃস্টানমণ্ডলী-মধ্যে কালে কালে কত নৃশংস, দুর্বৃত্ত জাতি, আবার কত নিঃস্বার্থ ব্রতজীবন সম্প্রদায় হইয়াছে, কিন্তু সকলেরই উপাস্য দেবতা ধর্মার্থ-উৎকৃষ্ট-জীবন, ইহুদীয় নরদেবতা যীশুখৃস্ট। কৈ বণিগ্‌বৃত্তি ইউরোপীয়গণ তাঁহাকে কি পণ্যজীবী করিয়াছে? ক্ষাত্র-ধর্মাবলম্বী কসাকেরা কি তাঁহাকে সমর-ব্যবসায়ী করিয়াছে? উপাস্য দেবতার সহিত উপাসকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু ও-ভাবে থাকে না।

উপাসকের চরিত্রদোষের অনুকৃতিতে উপাস্য দেবতার প্রকৃতি গঠিত হয়, এই মূল কথা যেমন অসার—বাঙ্গালি চিরদিনই বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ জাতি, এই বিশেষ কথাও তেমনই অসত্য। মধ্যে মধ্যে ইতিহাসে দেখা যায়, কোন একটি জাতি বহুকাল পরাধীন থাকিলে সাধারণত তাহাদের ধর্মপ্রবৃত্তির সম্যক্‌ স্ফূর্তি হয় না; ধর্মের পরিপোষণ না হইলেই অধর্মের প্রশ্রয় হয়। দুই-একটি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলবতী হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় প্রাচীন জাতির বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বৃদ্ধি পাওয়া বিচিত্র বা অসঙ্গত নহে। সুতরাং এখন, ভারতবাসী বহুকাল দাসত্বের পর, বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছে বলিলে কথাটা সত্য হউক, অসত্য হউক, এখানকার সেখানকার ইতিহাসের দোহাই দিয়া কথাটা সম্ভবপর বলিয়া খাড়া করা যাইতে পারিত। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দকে বাঙ্গালির রাস-বিলাস-লালসার চরম স্ফূর্তি বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, কেবল এখনকার বাঙ্গালিদের উপর ঘোরতর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আরোপ করিলে তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থল হয় না। তাঁহারা কাজে কাজেই বলেন, বাঙ্গালি জয়দেবের বহুকাল পূর্ব হইতেই বিষম বিলাসী। এ কথা নিতান্ত অপ্রামাণিক এবং অশ্রদ্ধেয়।

জয়দেব গোস্বামী সেন রাজগণের সমসাময়িক। সেন রাজগণের সময়ে বঙ্গে হিন্দুরাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধগণ বিদূরিত হন। শুদ্ধাচারী জ্ঞানবান্‌ শ্রেষ্ঠ জাতিসকল বঙ্গে পুনঃস্থাপিত হয়। ব্যবসায়-সংকরতা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত করিয়া জাতিব্যবসায় প্রথা পুনঃপ্রচলিত করা হয়। ক্রমে বঙ্গের আদিমবাসী ও নবাগত শ্রেষ্ঠ জাতিসকল-মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনার্থ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ-মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ, আভিজাতিক শৃঙ্খলা ও কৌলিন্য-প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হয়। হলায়ুধ, পশুপতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণাদির আচার-পদ্ধতি সুব্যবস্থিত করেন। এই সকল সুমহদ্‌ ব্যাপারে কীর্তি অকীর্তি যতই-কিছু থাকুক, একটি প্রদেশ ব্যাপিয়া এইরূপ ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা এবং অনুষ্ঠান যখন চলিতেছিল, তখন সেই প্রদেশ যে বিলাসিতার রঙ্গক্ষেত্র ছিল, ব্যভিচারের অধিকারভূমি ছিল, এমন কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বল, বীর্য—ধনৈশ্বর্য সমস্ত নগণ্য করিয়া যে-জাতি যে-সময়ে আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সাত্ত্বিক সদ্‌গুণের অভূতপূর্ব আভিজাতিক সম্মাননা করিয়াছে, সেই-জাতি সেই-সময়েই বিলাসিতার পল্বলে, ব্যভিচারের পঙ্কে নিমজ্জিত ছিল, প্রতীচীন পাণ্ডিত্য-বলে এ কথা প্রচারিত হয় হউক, আমরা আমাদের প্রাচীন মূর্খতায় কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। ইংরাজি অক্ষরে ছাপা কথা দেখিয়া আমরা অনেক বিশ্বাস করিয়াছি, এখন একটু ইতস্তত করিতেছি, তোমরা কেহ রাগ করিও না।

বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্মের আধ্যাত্মিক আলোচনায় আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বৈষ্ণবের মতে যৌবনের উৎসাহময় মাধুর্যরসই সাধকের চিত্তবৃত্তির উৎকৃষ্ট অবস্থা; ঈশ্বরের ঐকান্তিকী প্রেমভক্তি—তাঁহার সহজ সাধনা;

বৃন্দাবনের বিলাসিনী, প্রভাসের তপস্বিনী প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধিকাই প্রধানা সাধিকা ও ভক্তের আদর্শ এবং অনন্ত-সুন্দর-রস-শেখর শ্রীকৃষ্ণই অনন্ত অসংখ্য সাধকের একমাত্র আনন্দ-কেন্দ্র। এই সকল কথার এ স্থানে পুনরালোচনা করিব না। এ সকলই রাগমার্গের কথা।

আর এক দিক্ দিয়া কথিত হইয়াছে যে, যেরূপেই এই রাগমার্গের উৎপত্তি হইয়া থাকুক জয়দেবাদি-কর্তৃক এই পন্থার প্রচারে ব্যভিচার প্রশ্রয় পাইয়াছে। অতএব বৈষ্ণব গোস্বামিগণ সাধকভাবে যতই কৃতী হউন না কেন প্রচারকভাবে মহা অকীর্তি করিয়াছেন।

এই স্থলে ঈশ্বরের সগুণ প্রকৃতির পৌরাণিকী ব্যাখ্যার একটি মূল কথার সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন। এডুকেশন গেজেটের সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় লেখক বলেন,* মহাভারতকার 'শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ ঐশী শক্তি মূর্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে ঐশী শক্তিটি কোন পার্থিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি-কর্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কবি বাল্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই—মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন এবং তাহা যতদূর সম্পন্ন হইতে পারে ততদূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ ঐশী শক্তির নাম "নির্লিপ্ততা"। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী নির্লেপ।'

নির্লেপ অর্থে নিষ্কাম বা নিরাসঙ্গ নহে। ঈশ্বর নিষ্কাম বলিলে বিশ্বের আবির্ভাব বা ঈশ্বরের অবতারণা কিছুই বুঝিতে পারি না; বরং তিনি সর্বকাম এবং সিদ্ধকাম বলিলে যেন একটু-আধটু বুঝি বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বর নিরাসঙ্গ বলিলে সেইরূপ কিছুই বুঝি না, বরং তিনি সর্বসঙ্গ এবং পূর্ণসঙ্গ বলিলে যেন কিছু আভাস পাওয়া যায়। নির্লেপ অর্থে অপাপপুণ্যবিদ্ধ—পাপ-পুণ্যের সংস্পর্শাতীত।

নির্গুণ পরব্রহ্ম নির্লেপ—এ কথা অনায়াসে বুঝা যায়। কিন্তু সগুণ ঈশ্বর নির্লেপ, এ কথা ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে, সাধনার শক্তিতে, হৃদয়ের ভক্তিতে ধীরে ধীরে ধারণা করিতে হয়। ইহুদীয় পুরাণের মতে সমগ্র মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই নরদেব যীশুখৃস্ট অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মর্ত্যজীবন উৎসর্গ করেন। সুতরাং তাঁহাকে অপাপবিদ্ধ বলিলে তাঁহার অবতার নিরর্থক হয়।

হিন্দুদিগের ধারণা সম্পূর্ণ অন্য রূপের। আমরা বুঝি, যিনি পাপ-পুণ্যের নিয়ন্তা, তিনি অবশ্যই পাপ-পুণ্যের অতীত। যে যুক্তিবলে ইংলণ্ডের অধিপতিকে চিরদিনই নিরপরাধ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, সেই যুক্তিবলেই আমরা জগদীশ্বরকে কেবল নিষ্পাপ বলিয়া ধরিয়া লই না—সম্পূর্ণ নির্লেপ বলিয়া বিশ্বাস করি।

কি কি যুক্তি অবলম্বন করিয়া হিন্দু ঈশ্বরের নির্লেপবাদে বিশ্বাসবান্ হইয়াছে, ইতিহাস কি ভাবে সেই সকল যুক্তি হিন্দুর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে—এ স্থলে সেই সকল আলোচনা সম্ভব নয়, একটি মাত্র কথা আমরা এ স্থলে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করিব।

জীবাত্মার কর্মফলবাদ বা অদৃষ্টবাদের সহিত ঈশ্বরের নির্লেপবাদ বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্পর্কিত। আমরা কর্মফল ভোগ করি, তিনি আমাদিগকে সেই কর্মফল ভোগ করান। তিনি নির্লেপ। কিন্তু আমরা নিষ্কাম হইলে আমাদের কর্মজনিত সংস্কার হয় না, কর্মফল থাকে না, কাজেই কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। আমরা যখন কর্মফল ভোগ করি, তখনও তিনি যেরূপ নির্লেপ, আমরা যখন সাধনা-বলে কর্মফল হইতে মুক্তিলাভ করি, তখনও তিনি সেইরূপ নির্লেপ।

জীবের এই অদৃষ্টবাদ এবং ঈশ্বরের নির্লেপবাদ আমাদের শাস্ত্রের সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে আছে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্ব জাতে।
তয়ো রন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যো
ভিচাকশীতি ॥

একজন ফলভোজন করেন, অন্যজন কোন ভোগ না করিয়া কেবল বিরাজ করেন। এইরূপ শ্লোক অনেক স্থলেই আছে। আর

শুদ্ধমপাপ-বিদ্ধম্

*১২৯৩ সালের ১৮ই বৈশাখের এডুকেশন গেজেট দেখ।

—এইরূপ বিশেষণ শাস্ত্রের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই হিন্দুর প্রাত্যহিক জীবনের সহিত অদৃষ্টবাদ ও নির্লেপবাদ রাসায়নিক মিশ্রণে মিশ্রিত হইয়া আছে।

অদৃষ্টবাদ আহ্লাদে স্থৈর্য, বিষাদে গাম্ভীর্য। অদৃষ্টবাদ আমাদের সুখে শান্তি, শোকে সান্ত্বনা। অদৃষ্টবাদ কর্মক্ষেত্রে নিরাশার আশ্রয়-বল; নির্লেপবাদ ধর্মজীবনে বিশ্বাসের দাঁড়াইবার স্থল।

ঐ যে ব্রাহ্মণ-কন্যা একটি শীর্ণদেহ ক্ষীণপ্রাণ শিশু লইয়া অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল এবং এতদিন পরের বাড়ী পাচিকা-বৃত্তি করিয়া আশায়, আশঙ্কায়, সাবধানে, সন্তর্পণে সেই সন্তান-পালন করিয়া, বিদ্যাসাগরের অনুগ্রহে তাহাকে বি. এ. পাস করাইয়াছিল, আজি তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল হইয়াছে। ঐ দেখ, আজি বিসূচিকা রোগে সদ্যোমৃত সেই সন্তানের পার্শ্বে অভাগিনী কাঙ্গালিনী শ্মশানে বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া অস্ফুট ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছে—

'বাছা কুড়ি বছর হলো, এমনি ক'রে এই ঘাটে বসেছিলাম রে! বাবা, সেবার তোর মুখ দেখে ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম রে বাপ! আজি কার মুখ দেখে ঘরে যাব রে, বাপ! অদৃষ্টে যে এমন ছিল, তা ত জানিনে রে বাপ! বিধাতা, তোমার মনে এই ছিল, তা ত জানতাম না গো।'

যে অদৃষ্টবলে আজি এই কাঙ্গালিনীর এই ঘোর নির্যাতন, সেই অদৃষ্টই তাহার আজি একমাত্র অবলম্বন। দুঃখিনী বয়োভারাবনতা বিধবা আজি শোক-বজ্রাঘাতে বিচূর্ণ হইয়াছে; কঠোর বিধাতাকে শতবার ডাকিতেছে, কিন্তু তাহাতে যে পাপ স্পর্শ করিয়াছে এমন কথা এমন দিনেও সে মনে করিতে পারে না।

সগুণ ঈশ্বরের নির্লেপবাদ শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, দর্শনেও সেইরূপ অনুমিত হইয়াছে। উহা মহাভারতাদির উপাখ্যানে যেরূপ উজ্জ্বলীকৃত—অজ্ঞ, মূর্খ, নিকৃষ্ট-বিশ্বাসী, সর্বসাধারণের মধ্যে সেইরূপ প্রচারিত ও বিশ্বাসিত। সকলেই জানে, সকলেই বুঝে, সকলেই দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, এই বিচিত্র বিশ্বসংসার—ইহার চন্দ্রার্ক-তারক-খচিত, সাগর-নগ-নগর-বনভাগ-রচিত ঐশ্বর্য দেখিয়াই বল, আর সহস্র-দীপজ্বালা-প্রতিফলিত মরকতময় ময়ূর-সিংহাসনস্থ পাতশাহের সহিত তাঁহার প্রতিবেশী ঐ অন্ধকারের মহাঘোরে, জীর্ণবাস, শীর্ণবপু বন্দীর তুলনা করিয়া, ইহার বৈষম্য দেখিয়াই বল—মলজীবীর সম্মার্জনী-প্রতাড়িত ঐ পথের ধূলিকণা আর সৌর আকর্ষণী-আকৃষ্টা এই বিশাল অনন্তা—জড় জগতের সর্বত্র গতি-ক্রিয়ায় একই নিয়ম দেখিয়া বিজ্ঞানের বিস্ময়েই চিন্তা কর, আর মহাবিপদে পতিত হইয়া একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে অননুভবনীয় কারণে উদ্ধার লাভ করিয়া ভক্তিভরেই আপ্লুত হও—যে ভাবেই যখন পর্যবেক্ষণ কর এই বিচিত্র বিশ্বসংসার জগদীশ্বরের লীলাভূমি। তিনি লীলাময়, অর্থাৎ সগুণ ও সকাম হইয়াও নির্লিপ্ত ও সংস্পর্শাতীত। নির্লেপশক্তির কার্যে অভিব্যক্তির নামই লীলা। শাস্ত্র তাঁহার রহস্যলীলা উদ্ভেদ করেন, দর্শন তাঁহার লীলা বৈচিত্র্য-মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে, বিজ্ঞান তাঁহার নিয়ম-লীলা বিবৃত করে, পুরাণ তাঁহার অবতার-লীলা উপন্যস্ত করে, ইতিহাস তাঁহার নিত্যলীলা ঘোষণা করে, বৈষ্ণব গ্রন্থাবলি সংসারাতীত বৈকুণ্ঠধামে চিন্ময় মূর্তিতে তাঁহার নিত্যলীলা এবং বিশ্ব-সংসারে রসেশ্বর মূর্তিতে পরা প্রকৃতির সহিত তাঁহার ব্রজলীলা বর্ণন করিয়া আপনাদের অস্তিত্ব সার্থক করে।

সগুণ ঈশ্বরে এই নির্লেপশক্তি বা লীলাময় কার্যে বিশ্বাসই হিন্দুধর্মের জীবন। কিছু দিনের জন্য বৌদ্ধ সংশয়বাদে এই বিশ্বাস হীনপ্রভ হইয়াছিল। বৈষ্ণবাচার্যগণ দাক্ষিণাত্যে এই বিশ্বাস আবার উজ্জ্বলীকৃত করিয়া বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত করেন। বঙ্গে সেনরাজগণের সময়ে যেমন এক দিকে বৌদ্ধ আধিপত্য বিদূরিত হইল, সেইরূপ গোস্বামী প্রভুরা লীলা-গ্রন্থ সকল প্রচার করিয়া হীনপ্রভ বিশ্বাস আবার প্রভাময় করিলেন। জয়দেব ঠাকুরের গ্রন্থ সেই উজ্জ্বল লীলারসে রসময়। পরা প্রকৃতিতে নির্লিপ্ত সগুণ পরমপুরুষের ব্রজ-বিলাস তাই চোখে-দেখা ভাবে, কাণে-শোনা ভাষায় সামান্য-স্বভাব-সঙ্গত প্রকরণে বর্ণিত।

জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি গোস্বামিগণ-কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মের রাগমার্গের গীতাবলি-প্রকাশে বাঙ্গালি মৈথিলি চরিত্রের কতদূর উন্নতি বা অধোগতি হইয়াছে, এক্ষণে তাহা গণনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত নহি; তবে এইমাত্র বলিতে

পারি যে, এই সকল গ্রন্থ যে সাধারণের জন্য প্রচারিত হয় নাই, তাহা গোস্বামিগণ নানাভাবে পুনঃপুন বলিয়া গিয়াছেন।

ভক্তির মূলে ঈশ্বরের কর্তৃত্বে বিশ্বাস একান্ত চাই। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ধ্যান বা ধারণাতে (বৈষ্ণবী) ভক্তি চরিতার্থ হয় না। ভক্তিমান্ লোকে সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ভক্তির যেরূপ প্রধান অবলম্বন ঈশ্বরের নির্লিপ্তবাদ ভক্তিমানের সেইরূপ প্রথম ধারণা।

পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়া বলা গিয়াছে, ঈশ্বরের এই নির্লেপশক্তি মহাভারতকার শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। পুরাণকারগণও তাহাই করিয়াছেন। তাহাতে এই ফল হইয়াছে, পুতনা-কংসাদি আত্মীয়-ঘাতন, অসংখ্য গোপাঙ্গনা-সনে অদ্ভুত রাসলীলা, জরাসন্ধ, শিশুপালাদি নরপতিকে ছলেবলে হত্যা, সুভদ্রা-দ্রৌপদীর ছলেবলে হরণ, ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারাবতীতে অভিনব রাজ্য-সংস্থাপন, স্বদেশীয় বিদেশীয় রাজন্য-শোভিত মহারাজসূয়-যজ্ঞ, অভিমন্যুর মহাশোককর অকালমৃত্যু, দুঃশাসনের বীভৎস মরণ, কুরুক্ষেত্রের ক্ষত্রিয়-ক্ষয়কর ভীষণ সমর, প্রভাসোপকূলে সুরা-সেবনে যদুবংশ ধ্বংস প্রভৃতি একটি যুগ মহাযুগের কাণ্ড-অকাণ্ড-মধ্যে মহাভারতের ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক মহাবিপ্লব আলোড়নের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বঘটে মহাঘটকরূপে অথচ নির্লিপ্তভাবে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর মেরুদণ্ড সুমেরু পর্বতের মত মহামূর্তিতে মূর্তিমান্। পুরাণ সকল তাঁহার লীলা বর্ণন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ করে, ইতিহাস তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার জন্য লালায়িত—ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারে না, গীতোপনিষৎ ধর্মশাস্ত্র তাঁহার দোহাই দিয়া ধন্য মনে করে, কাব্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নানা রসে উচ্ছ্বসিত হয়, সগুণবাদ উপযুক্ত অবলম্বন পাইয়া সাকারবাদে পরিণত হয়,—আর ভক্তি তাঁহার রাস-বিলাস-বিকাশ কল্পনা ও ধারণা করত আপনাকে মহাপ্রকৃতির হ্লাদিনী শক্তির সহচরী ও সেবিকা করিয়া কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে।

এই জীবন্ত ভক্তিবাদের জ্বলন্ত প্রতিভায় নিরীশ্বর বৌদ্ধবাদের যুক্তি-তামস ছিন্ন, ভিন্ন, বিদীর্ণ—বিদূরিত হইল। আর্য ঋষিগণের উজ্জ্বলীকৃত ভারতবর্ষ ভক্তিপ্রচারে সাধারণের পুণ্যক্ষেত্র হওয়াতে জগতের ধন্যধামরূপে পরিণত হইল। সেই অনন্ত-চরণোপান্ত-চারিণী অনন্ত স্রোতস্বতী ভক্তিবাহিনী-মধ্যে একটি বা দুইটি রাজনৈতিক শুষ্ক বালুদ্বীপ দেখিয়া এখানে সেখানে ওখানে সামাজিক কালীয় হ্রদ দেখিয়া যাঁহারা কালে শুষ্ক মরুর আশঙ্কা করিয়া নিরাশ হন তাঁহারা ভক্তির নির্মল ধারার গৌরব বুঝেন না। একবার ভগবদ্‌ভক্তির পূত সলিলে ধীর মন্দ অথচ একটানার স্রোতে গা ভাসাইয়া দেখ, তুমি অনন্তের আভাস পাইবে—তুচ্ছ বালুস্তূপ উপেক্ষা করিতে দুই দিনেই তোমার অভ্যাস হইবে।

বল্লভাচার্য, মাধ্বাচার্য, নিম্বাদিত্য, রামানুজস্বামী, শ্রীধর-স্বামী প্রভৃতি পথপ্রদর্শকগণ, ভারতের নানা প্রদেশে ভগবানের লীলা কীর্তন করিয়া ভক্তি-সাধনার নানা প্রস্থান সংস্থাপন করেন; জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বঙ্গে ভক্তিক্ষেত্র স্থাপনা করেন। সেই ভক্তিক্ষেত্রে মহাপ্রভু মহাবীজ রোপণ করেন। বৈষ্ণব তত্ত্বের পরিণাম-শৃঙ্খলায় জয়দেবের গীতগোবিন্দ মহাশৃঙ্খল। তবে শ্রীচৈতন্যরূপে ভক্তির সাকার অবতারণে ভক্তির মহাবীজ সর্বসাধারণ-মধ্যে অকাতরে বিতরিত হওয়াতে ধর্মের যে লোকব্যাপিনী স্ফূর্তি হইয়াছে, জয়দেব প্রভৃতি মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী গোস্বামিগণের তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কৃতিত্ব নাই। আর এখনকার গোস্বামিগণের চরিত্রগুণে বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বিশেষ-মধ্যে যে ব্যভিচারাদির প্রাবল্য হইয়াছে, সেই মহা অপকীর্তির ভাগীও জয়দেব নহেন। মহাপ্রভুর মহীয়সী কীর্তি এখনকার 'মহাপ্রভু'দের দ্বারা যে বিড়ম্বিত হইতেছে বিকৃত কামাচার পন্থাই তাহার মূল। বৈষ্ণবী সাত্ত্বিকী ভক্তি বঙ্গের সেই বিকৃত বামাচার ও বীরাচার যে অনেকাংশে উপশমিত করিয়াছে ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ বক্ষে বহন করিতেছে। বামাচার ব্যভিচার ক্রমশ দমনই বৈষ্ণবী ভক্তির অপূর্ব কীর্তি। এই কীর্তি যেমন মহতী, উহার সাধনাও তেমনি অনন্ত-স্থায়িনী। এই বৈষ্ণবী ভক্তিই আবার এখন পাশ্চাত্য পিশাচাচারের দমন করিতে সর্বাগ্রে বঙ্গে উন্মুখিনী হইয়াছে; এস সকলে মিলিয়া এই পুণ্যভূমির, ধন্যধামের সার্থকতা সম্পাদন করি।

ভক্তির লোকব্যাপিনী স্ফূর্তি জয়দেব আদির যে লক্ষ্য ছিল না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা গোস্বামী গ্রন্থকারগণ পরিষ্কাররূপে বলিয়া গিয়াছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দের বঙ্গব্যাখ্যা যদি সাধারণ্যে প্রচারিত হয়, এই আশঙ্কা নিরাকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যাকারক গোস্বামিপাদ গ্রন্থারম্ভে অধিকারীর বিশেষ করিয়া নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন; বটতলার গ্রন্থ হইতে আমরা ভাষা পয়ারগুলি উদ্ধৃত করিয়া গীত-গোবিন্দের গ্রন্থাভাস এবং অধিকারি-নির্দেশ দেখাইতেছি।

জয়দেব পাদপদ্মে করি যে ভকতি।
তাঁর অভিপ্রায় বুঝে কাহার শকতি?
বৃন্দাবনে সদানিত্য লীলার স্মরণ,
শ্রীজয়দেব তাহা করিল বর্ণন।
রাগমার্গ পথিক হইবে যেই জন,
নিত্য লীলা স্মরণের সেই সে ভাজন
(পরম কারণ?)
শ্রীগীতগোবিন্দ নাম গ্রন্থ মহাসার,
সকলের শ্রবণে নাহিক অধিকার।
কেবল রসিক ভক্ত ইথে অধিকারী,
অতিগূঢ় কুঞ্জলীলা জানিবে বিচারি।

তাহার পর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় অধিকারি-নির্দেশ বিশেষরূপে আছে।

প্রথম শ্লোকের শেষ-চরণ—

রাধামাধবয়োঃ জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ।

দ্বিতীয় শ্লোকের শেষার্ধ—

শ্রীবাসুদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেত
মেতৎ করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধঃ।

বাঙ্গালা ব্যাখ্যা—

বৃন্দাবনে যমুনার কূলে নিত্য লীলা,
জয়দেব গোস্বামী নিজ গ্রন্থে প্রকাশিলা।
রাধিকা মাধব কেলি যমুনার কূলে,
জয়যুক্ত বর্তমান কাল শাস্ত্র বলে।
রহঃ কেলি জয়যুক্ত বর্তমান কাল,
ভূত ভবিষ্যত ইথে জানিবে মিশাল।
রাধাকৃষ্ণ রহঃ কেলি বস্তুর নির্দেশ,
ইহার আস্বাদ নিল বৃন্দাবন দেশ।
এই পদ্য অর্থে সব গ্রন্থতত্ত্ব জানি,
ইহার বিচার উঠে অমৃতের বাণী।
যেই নিত্যলীলা কৃষ্ণ করেন বৃন্দাবনে,
পরম আনন্দ হয় যাহার বর্ণনে—

*　　*　　*

আপনার উপাসনা সাধ্য জানাইল,
রাধাকৃষ্ণ বিলাস বর্ণন গ্রন্থ কৈল।
এইরূপে জয়দেব আত্মার যোগ্যতা,
রাধাকৃষ্ণ লীলাগত করিল সর্বথা।
মন্দ জন গ্রন্থে না হইবে অধিকারী,
শ্রবণ অধিকারী ইথে, লিখিব বিচারি।
শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে একান্ত শরণ,
অন্য অভিলাষ জ্ঞান কর্ম বিবর্জন,
ব্রজলীলা উপাসনা অনুরাগধারী,
সেই জন গ্রন্থের হইবে অধিকারী॥

অন্যত্র—

শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য লীলা মাধুর্য সহিতে,
শ্রীজয়দেব কবি লাগিলা বর্ণিতে।
শ্রীগোবিন্দ ক্রীড়া সব করিছে বর্ণন,
বিঘ্ননাশ হয়, ভক্তি লাভের কারণ।
ভক্তি প্রতি শুদ্ধচিত্ত না আছে যাহার,
(প্রতি, না প্রীতি?)
তার কভু না হইবে, ইথে অধিকার।
অসুর যতেক ছিল ভক্তি প্রতি হেলা,
কৃষ্ণভক্তি নিন্দা করি মূল সহ গেলা;
অসুরের নাশ লাগি কৃষ্ণের বর্ণন
করিলেন জয়দেব কবি মহাজন।

উপসংহারে—

পরম সুধীর সব শুন ভক্তগণ!
কৃষ্ণভক্তি বাসিত তোমার বাক্য মন।

সদসদ্বাক্যের কর্তা সেই পরম পণ্ডিত,
শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ যাঁহার রচিত,
তাঁর সৎবাক্য শ্লোকে দুর্লভ বর্ণন,
আনন্দ সহিত তাহা করহ শোধন ;
আশঙ্কা পঙ্কজ সব সুখে ধৌত করি,
নিশ্চয় করিয়া ইথে সাধন আচরি ;
গন্ধর্ব কলাতে কৌশল অতিশয়,
সঙ্গীত শাস্ত্রের উক্তি তাহাতেই কয় ;
রস রাগ তাল গীত আদি যত করি,
তাহাতে নৈপুণ্য সব জানিবে বিচারি ;
সেই নির্বন্ধানুসারে করিলা বর্ণন,
আর যত আছে সব তাহার লক্ষণ ;
শ্রীকৃষ্ণ ভজনতত্ব সকলি লিখিলা,
বৈষ্ণবের ধ্যান বস্তুতত্ব বিচারিলা ;
অবতার অবতারী লিখিলা তাহাতে
সর্ব অবতারী কৃষ্ণ করিলা নিশ্চিতে।
মহাপ্রেম রসের বিচার ইথে জানি
ব্রজলীলা পরিপূর্ণ ইহাতে বাখানি।
স্বাভীষ্ট লীলার কথা করিয়া লিখন
উপাসনা উপদেশ করিলা বর্ণন।
নিত্যলীলা সহ গ্রন্থ বিচারি কহিলা,
সব সার গ্রন্থ যাতে সব কৃষ্ণলীলা।
ইহাতে একান্ত ভক্ত করিবা চিন্তন
মাধুর্য ভজনে লুব্ধ হয় যার মন।
কাব্যের মধ্যেতে গীত কৃষ্ণলীলা কথা,
রসলীলা কুঞ্জলীলা বিষয় এই গাঁথা।

বৈষ্ণবগণের এই সকল ব্যাখ্যায় আমরা গীতগোবিন্দ গ্রন্থের উদ্দেশ-নির্দেশ কি এবং অধিকরণ ও অধিকারীই-বা কে, তাহার অনেকটা আভাস পাই। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের রহস্য-কেলি নির্দিষ্ট বস্তু ; তাহাতে হ্লাদিনীময়ী মহাপ্রকৃতিতে 'রসো বৈ সঃ' মহাপুরুষের নিত্য অনন্ত অবিরাম লীলা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যমুনা যম-ভগিনী, কাল-সহচরী। এই বিশ্ব ব্রজভূমির পাদস্পর্শ করিয়া করাল স্রোত লইয়া কাল-সহচরী নিত্য প্রবাহিতা! তাহাতে পুরুষ-প্রকৃতির রহস্য-ময় বৃন্দাবনের মাধুর্যই উদ্ভাসিত হইতেছে। ভগবানের মাধুর্যময় ঐশ্বর্য-লীলা-বর্ণনই গীতগোবিন্দ। মঙ্গলাচরণে দশাবতারের জয়কীর্তনে, শ্রীকৃষ্ণের সর্বাবতারিত্ব সূচিত এবং 'দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ'—এই নমস্কার-সূত্রে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সেই সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের মহা-প্রেমরসের বিচারে গীতগোবিন্দ পূর্ণ। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—ধর্মের এই তিন প্রসিদ্ধ পন্থা। যিনি জ্ঞান ও কর্মের পন্থা মুখ্যরূপে অনুসরণ না করিয়া কেবল ভক্তি-পন্থারই অনুসরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে একান্ত কারণ প্রার্থী এবং রহস্যময় এই বিশ্ব ব্রজলীলার অনুধ্যানরূপ উপাসনা করিতে অনুরাগী তিনিই গীতগোবিন্দ গ্রন্থের অধিকারী। জয়দেব গোস্বামী আত্মার যোগ্যতা রাধাকৃষ্ণের লীলাগত করিয়াছেন ; ভক্ত যতই নিরাশঙ্কচিত্তে লীলারহস্যে প্রবেশলাভ করিবেন, ততই তিনি বৈষ্ণবানন্দে পরিশোভিতচিত্ত হইবেন।

সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দঃ।

একান্তমনে সাত্বিকভাবে ভগবানের মাধুর্যময়ী লীলার চিন্তা করাই অনুরাগ-পথচারী ভক্তের উপযুক্ত উপাসনা—জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দের এই উপদেশ।

অতএব

জয়দেব ভণিত শ্রীব্রজলীলা গীত,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন পদ সর্বজন হিত।
শ্রীচরণে সমর্পিত হয় মন যার,
সেই শ্রোতাগণে সুখ বাড়ুক অপার।

* * *

জয়দেব ভণিত হরি-চরিত সকল
কলুষ করিয়া নাশ করুক মঙ্গল।

নবজীবন ৩য় ভাগ — চৈত্র ১২৯৩

সুকুমার-শিল্প-সাধকের সাধনা

জগদীশ্বরের জগৎ সৌন্দর্যের মহাভাণ্ডার। তাঁহার অনন্ত-বিস্তৃত শষ্পশয্যা, বৈচিত্র্য-বিভূষিত পুষ্পশয্যা, কাঞ্চনজঙ্ঘামরী পাষাণ-মহিষী মেনকা বা ধবল শৃঙ্গধারী নগরাজ হিমালয়, গভীর, নীল, বিশাল সাগর বা বক্রদেহা,

ক্ষীণপ্রাণা কুল্যা, গ্রহ-উপগ্রহের ধীর-স্থির-জ্যোতিঃ-সমন্বিত তারকাপুঞ্জের চঞ্চল চমকে অনুপ্রাণিত বিভাবরীর ব্রহ্মকটাহ বা এই বৈশাখের নিদাঘ মধ্যাহ্ন-কালের বট-বিটপি-ছায়া-চ্ছাদিত বনভূমি—সেই বনকন্দরে অর্ধসুপ্ত ভীষণ সিংহের পৃষ্ঠস্থিত জটঘটা বা ঐ নিভৃত নিকুঞ্জে লুক্কায়িত ক্ষুদ্র চাতকের কোমল পক্ষ—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র, উচ্চ হইতে নীচ—তাঁহার সর্বত্রই সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি।

মনীষিগণ আবার এই বৃহৎ ভাণ্ডার হইতে সৌন্দর্য-সুবর্ণ একটু-আধটু সংগ্রহ করিয়া, গলাইয়া-পিটাইয়া, কখন সোহাগা দিয়া, কখন খাদ মিশাইয়া, নানাবিধ সাজসজ্জা, অলঙ্কার বানাইয়াছেন। এইরূপ সৌন্দর্য হইতে সৌন্দর্য-সৃষ্টিতেই মনুষ্যত্ব। জগদীশ্বরের জগদ্ভাণ্ডারে আর মানবের সংগ্রহে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে যে যত সৌন্দর্য দেখিতে পায়, সে তত ধন্য। দাসদাসী-পরিবেষ্টিত, মণি-মাণিক্য-মণ্ডিত, ধনজন-লালিত লক্ষপতি যদি সাহিত্য-সাধনার আস্বাদ না বুঝেন, যদি সুসঙ্গীতে দ্রাবিত-চিত্ত না হন, যদি সুকুমার শিল্পে সৌন্দর্য বুঝিতে না পারেন, তবে লোকে সেই সৌন্দর্য-মূঢ় ঐশ্বর্যবান্‌কে পশু বলিতেও সঙ্কোচ করে না; আর যে জাতি রামায়ণ-মহাভারত গ্রন্থন করিয়াছে,—কাশী, কাঞ্চী, জাজপুর, ভুবনেশ্বর, অজন্তা, অবন্তী গঠন করিয়াছে, ধ্রুবপদ খেয়াল গান করে, কীর্তনে-ভজনে জগদীশ্বরের গুণগীতি আলাপ করে—শত সহস্র শতঘ্নী-বলে তাহাদিগকে ছিন্ন, ভিন্ন—বিধ্বস্ত করিলেও সভ্যতাভিমানী, অতি বড় অহঙ্কারী জাতিও তাহাদিগকে অসভ্য বলিতে সঙ্কোচ করিবে —কুণ্ঠিত হইবে।

সৌন্দর্যবোধে মানুষের মনুষ্যত্ব। জগতের সৌন্দর্য প্রতিভাসিত করে বলিয়া ধর্ম মনুষ্যত্বের প্রধান সহায় এবং অবলম্বন। এক দিক্ দিয়া মনে হয়, যাহা আপনার তাহাই সুন্দর। আপনার ছেলেটি কেমন সুন্দর! আপনার রোপিত ললিত লতাটি কেমন ময়ূরকণ্ঠের মত বাঁকা হইয়া উঠিয়াছে। কেমন থোলো থোলো ফুল তাহার বাহু-বক্ষে শোভা পাইতেছে—মরি কি সুন্দর! এই রূপ সুন্দর! আর এক দিক্ দিয়া বোধ হয়, যাহা মঙ্গলময়, তাহাই সুন্দর। পুরুষের শৌর্য, নারীর লজ্জা, সমীরণের শৈত্য, মান্দ্য সুগন্ধ, অগ্নির জ্বালা, ভাদ্রের বর্ষা—এ সকলই এই রূপে সুন্দর। ধর্ম একদিকে পরকে আপন করে—জগৎকে আপন করে, অন্যদিকে ধর্ম-বিশ্বাসে জগৎ মঙ্গলময় বলিয়া প্রতীত হয়, কাজেই উভয়তঃই ধর্ম হইতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। সুতরাং ধর্ম মনুষ্যত্বের প্রধান সহায়।

ধর্মে যেমন জগতের সৌন্দর্য প্রতিভাসিত হয়, সৌন্দর্যের বোধ-বিস্তারে সেইরূপ ধর্মপ্রবৃত্তি পরিচালিত ও পরিপোষিত হয়। যে সুকুমার শিশুর আধফুটন্ত গোলাপের মত নধর অধরের হাসি দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে, মজিয়াছে, সে কি অর্থলোভে সেই শিশুহত্যা করিতে সহজে পারে? যে সতীর স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কণামাত্র আভাস পাইয়াছে, সে কি কখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য সেই সতীত্ব নষ্ট করিতে অগ্রসর হইতে পারে? তা পারে না। মনুষ্যের সৌন্দর্যবোধ থাকিলে তাহাতে মনুষ্যত্বের বীজ থাকে—সহজে সে বীজ নষ্ট হয় না।

আমাদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ-রূপ মনুষ্যত্বের এই প্রধান উপকরণ প্রচুর পরিমাণেই ছিল, এখনও আছে। একে এই ভারতভূমি স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অফুরন্ত আকর, তাহাতে মহা মহা কবি ও শিল্পিগণের কার্য ও কীর্তি-কলাপে ইহা সাহিত্য-শিল্পের চিত্রশালিকা,—আবার আর্যজাতি আশৈশব সৌন্দর্যের উপাসক, কাজেই আমাদের শোভানুভাবতা ক্রমেই প্রখরা ও প্রবলা হইয়াছে। তবে এখন আমরা না জানি কোন্ বিধির বিড়ম্বনায় সহসা মনুষ্যত্ব হারাইবার রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—অগ্রসর হইতেও প্রস্তুত। নহিলে হিন্দুসন্তান শিক্ষার নামে কখন ভিক্ষানিবারিণী সভা প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন! দেখিতে দেখিতে, দেখ! শিক্ষিত বঙ্গসন্তানের সঙ্গীতে শ্রদ্ধা কমিতেছে, কীর্তনাঙ্গ বঙ্গে অনাদৃত হইতেছে, কৃষ্ণনগরের দুর্লভ কারিগরি উৎসাহ বিনা লোপ পাইতেছে, হস্তিদন্তের সৌন্দর্যময় কারুকার্য ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। কিছুকাল পূর্বে মাদ্রাজে রামরাজ ছিলেন, কিন্তু এখন রামরাজের কথাও উপন্যাস হইয়াছে।

সুকুমার শিল্পে অনাস্থা এইভাবে বহুদিন চলিলে আমাদের যে কি দুর্দশা হইবে, তাহা ভাবিতেও আমরা পারি না।

ধনবান্ ধনের নানারূপ সদ্ব্যবহার করিতেছেন—

অন্নদানে দারিদ্র্য দূর করিতেছেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সরস্বতীর সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, ঔষধালয়, চিকিৎসালয়াদি স্থাপন করিয়া রোগকষ্টের কাতরতার লাঘব করিতেছেন, কিন্তু এই মৃতপ্রায় সুকুমার কলাসকলের উজ্জীবনে ও উদ্দীপনে—অর্থের সার্থকতা-সম্পাদনে তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই বলিলেই চলে।

আজি দুই বৎসর হইল যখন 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইহার মহোদ্দেশ্য বুঝিয়া ও প্রতিষ্ঠাতৃগণের একান্ত যত্ন দেখিয়া এবং পরে দুই তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইলে পত্রের উৎকৃষ্ট মুদ্রাঙ্কণ, চিত্রগুলির পারিপাট্য এবং শিল্পবিজ্ঞানাদি লেখকগণের রচনার বিশদ ভাষা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, বঙ্গের বিশিষ্ট ভদ্রলোকে সেই পত্রের উৎসাহদাতা হইয়া সুকুমার শিল্পের পুনরুদ্দীপনের সহায়তা করিবেন।

এ নিরাশার দেশে যে দিকেই আশা করিবে, সেই দিকেই প্রথমে নিরাশা আসিয়া বিভীষিকা দেখাইবে। যে নিরাশায় বুক বাঁধিয়া সংসার-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে, সেই প্রকৃত বীর। আমাদের ভীরু বলিয়া অপবাদ আছে, তাই আমরা ঐরূপ বিচিত্র বীরত্বে শিক্ষিত, পরীক্ষিত ও দীক্ষিত হইতেছি। বিংশতি বৎসর পূর্বে বঙ্গের সুকুমার সাহিত্যে নিরাশার লাঞ্ছনা ছিল, কিন্তু ঐ দেখ, ইংরাজি শিক্ষিতের এত অনাদর, অনাস্থা, অভক্তি ও বিরক্তির মধ্যেও আজিও বঙ্গসাহিত্যের বৈজয়ন্তী সুমন্দ বায়ুভরে বঙ্কিম ভঙ্গিতে উড়িতেছে। যে ধর্মের নামে দুই বৎসর পূর্বে যুবা-বঙ্গ প্রকাশ্যে উপহাস করিতেন, নাস্তিকতাই যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল, নিরাশার আশা দেখ, আজি তাঁহারাই ধর্মান্দোলনে যোগদিবার জন্য মিছামিছি ধর্মের দোহাই দেওয়া আপনাদের পুরুষার্থ এবং সিদ্ধিস্বার্থ মনে করিতেছেন। অভিনেতা নটমঞ্চে মিছা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে আসিয়া একদিন কাঁদিয়া ফেলে; আজি যাহারা ভান-ভণ্ডামিতে ধর্মের দোহাই পাড়িতেছে, কাল দেখিবে, তাহাদেরই সন্তানেরা ধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়াছে। এইরূপেই মনুষ্যত্বে কপটতার সার্থকতা হয়, এইরূপেই বঙ্গে নিরাশা হইতে আশার উৎপত্তি হইতেছে।

কেবল সুকুমার শিল্পই কি চির নিরাশায় নিমজ্জিত থাকিবে ? না, থাকিবে না। জগতে কখন কোন মহাব্রত নিষ্ফল হয় নাই। মহাশিল্পীর মহাপাদপদ্মে শিল্পপুষ্পাঞ্জলি নিয়মিতরূপে অর্পণ করিতে থাক, যাঁহার পূজা তিনি অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। সাধকের সাধনাই সিদ্ধি—অন্য সিদ্ধি নাই; অন্য সিদ্ধি কল্পনাও করিতে নাই। এই মাত্র কামনা করিও যে তাঁহার সাধনায় আমাদের যেন চিরদিনই সাধ্য থাকে।

সাধনার প্রধান উপকরণ নিরভিমান। জগতে মানবের অভিমানের স্থল নাই। অভিমান অর্থে নির্বুদ্ধিতা। তোমরা শিল্পানুশীলনকারী, তোমাদের পক্ষে অভিমান মহাপাপ। প্রথমেই বলিয়াছি, জগদীশ্বরের জগৎ সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। এই সৌন্দর্যের প্রতিলিপি রাখিবার জন্য জগদীশ্বরের কৃতির অনুকৃতি করিবার জন্য তোমাদের সাধনা। তাহাতেই বলিতেছিলাম, অন্যস্থলে অভিমান কেবলমাত্র নির্বুদ্ধিতা হইলেও তোমাদের স্থলে অভিমান মহাপাপ। শিল্পে যে মনে করে আমি কৃতী হইয়াছি—সে না বুঝিয়া মনে করে আমি মহাশিল্পীর সমকক্ষ। সে মহাপাপী, বাইবেল বলে, সেই সয়তান।

সৌন্দর্যের অনুকৃতি-সাধনায় অভিমান বা অহঙ্কাররূপ মহাপাপ দূর কর। যে পাপিষ্ঠ, নাম-স্মরণ ভিন্ন অন্য সাধনা তাহার নাই।

যুগযুগান্তর ধরিয়া পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সুকুমার শাস্ত্রের ও বিদ্যার সাধনা করিলেও প্রকৃতির অনুকৃতি বা পরাকৃতির প্রতিকৃতি হয় না। বিশেষ সুকুমার চিত্রবিদ্যার পাশ্চাত্ত্য মূর্তির বঙ্গে এখন সূতিকাগারে অবস্থিতি; তোমরা রক্তপিণ্ড মানুষ করিতেছ, তোমাদের লালনলাল, আদরের ধন,—তোমরা ভালবাসিবেই, সুন্দর বলিয়া বিশ্বাস করিবে। কিন্তু তোমরা তোমাদের পাশ্চাত্ত্য ধাত্রী-পদ্ধতির গুণে স্থল-বিশেষে দুই-একটি দেবশিশুকে যে বিকট মর্কট-শাবক করিয়া তুলিতেছ,—এ কথা বলিলাম রাগ করিবেনা ত ?

অতি অল্প কথায় আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। প্রতিমূর্তি-চিত্রণে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ—য়ুনানী ভাস্কর-শিল্পীর প্রস্তরমূর্তি, তাহাতে নরনারী-অবয়বের-সৌন্দর্য-পরা কাষ্ঠা

প্রদর্শিত হয় মাত্র। আমাদের দেশীয় দেবাঙ্গ-গঠন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আকর্ণবিশ্রান্ত-লোচন কেবল শব্দময় সাহিত্যে থাকে এমন নহে, পটে অঙ্কিত, প্রস্তরে প্রতিফলিত হইয়া তাহা নানাবিধ শিল্প-মূর্তিতে জীবন্ত হয়। দেবাঙ্গ-গঠনে এই দেবভাব রক্ষিত না হইলে, দেব গড়িতে বানর হইয়া উঠে। তোমাদের 'মধুমাসে রাসলীলায়' কোন্ বৈষ্ণব বলিবে যে শ্রীকৃষ্ণ রাসবিহারী হইয়াছেন!

দেবাঙ্গ-চিত্রণে প্রাচীন প্রসিদ্ধিমত পরিমাণাদি রক্ষণ করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি ও পরাকৃতি উভয়ই শিল্পের আদর্শ। য়ুনানী শিল্পী প্রকৃতিকেই চিনিয়াছিল; হিন্দু উভয়কেই সমভাবে চিনিয়াছিল,—বুঝিয়াছিল। ভারতের চিত্রবিদ্যা লুপ্তপ্রায়; প্রস্তর-প্রতিমা সকল হইতে পরিমাণ-ভঙ্গি-আদি পটে প্রতিফলিত করিতে হইবে। আর তোমাদের শত সাধনার মধ্যে এইটি মুখ্য সাধনা জ্ঞান করিবে।

যাঁহারা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম—আকাশ কাল কঠোরতা ও কোমলতা একত্র সন্নিবেশিত করিয়া প্রত্যহ বিশ্বরূপের ধ্যান করেন, যাঁহারা জগচ্ছক্তিকে একদিকে খড়্গ-মুণ্ড-হস্তা, অন্য দিকে বরাভয়করা, মহাকালে সমভাবে স্থজন্তী এবং সব রন্তীরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, ভুলিব কেন যে তোমরাই তাঁহারা; কেবল জড়-স্বভাবের অনুকরণে তোমাদের সাধনা সীমাবদ্ধ থাকিবে কেন? পরাকৃতির পরামূর্তির সর্ববিধ সেবা করিয়াই হিন্দুর হিন্দুয়ানি। আজি তোমরা তোমাদের মহাসাধনার ক্ষেত্রে সেই পরামূর্তির অবহেলা করিবে কেন? না, তাহা করিও না; আর মনে রাখিও যে সাধকের সাধনাই একমাত্র সিদ্ধি—অন্য সিদ্ধি নাই; অন্য সিদ্ধি কল্পনাও করিতে নাই। তবে এইমাত্র কামনা তোমরা করিবে, আমরাও করিতেছি যে, এই মহাসাধনায় আমাদের সকলেরই যেন সাধ্য থাকে এবং সাধ্যমত সাধনায় আমরা কখন যেন ত্রুটি না করি

শিল্পপুষ্পাঞ্জলি ১২৯৪

(অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত)

বঙ্কিমচন্দ্র

ক

তাঁহার প্রথম গদ্য-রচনা

আমরা এরূপ কল্পনা-প্রিয় জাতি, রচনায় সত্য-মিথ্যার প্রভেদ করা এত তুচ্ছ পদার্থ মনে করি যে, আমাদের দ্বারা কাহারও জীবনচরিত লেখা, বোধ করি, হইতেই পারে না বঙ্কিমবাবু ত অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, সত্য-মিথ্যা তাঁহাতে সকলই সাজে; তাহার পর, আজি ১৭।১৮ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে অলীক-বাদ যে উঠিবে, আশ্চর্য নহে। আমি সামান্য ব্যক্তি, এখনও 'জল জীয়ন্ত' জীবন্ত রহিয়াছি, আমার সম্বন্ধেও বিস্তর মিথ্যা কথা শুনিতে পাই। তাহাতে আবার আমার পিতৃদেবকে লইয়া টানাটানি করা হয়।

আমার বন্ধু, জ্যেষ্ঠসহোদরোপম শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর মহাশয় 'বঙ্গবাসী'-প্রকাশিত গোপাল উড়ের টপ্পার পরিশিষ্টে লিখিতেছেন,—'এক সময়ে উমেশ-ভুলোর মধ্যে মনোবাদ ঘটিয়াছিল; ফলে, গোপাল উড়ের যাত্রার দুইটি দল হইল। শুনা যায়, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চুঁচুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা খ্যাতনামা ৺গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় নিজ বাড়ীতে এই উভয় দলের বায়না করিয়া এ বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন।' সর্বৈব মিথ্যা। এ মিথ্যায় আবার একটু ক্ষতি আছে। আমাদের বাড়ীতে তৎকাল-প্রসিদ্ধ সমস্ত যাত্রার দলের গাহনা হইয়াছিল, অথচ পিতৃদেব কখন গোপাল উড়ের গান বাড়ীতে দেন নাই। কেন দেন নাই, অনেকে বুঝিতে পারিবেন। তবে আবার তিনি বিবাদ মিটাইবার জন্য সেই দলের বায়না করিবেন কেন?

একটা আমার নিজের কথা বলি। 'আর্যাবর্তে' 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তের কথাবার্তা প্রকাশিত হইতেছে। বিপিনবাবু বলিতেছেন,—

"পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বঙ্কিমবাবু কি কখনও আপনার Law Lectures শুনিতে আসিতেন?' তিনি বলিলেন, 'আমার Law Lectures? বঙ্কিমবাবু?'

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞা হাঁ; আপনার।' তিনি বলিলেন, 'না। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বল দেখি।' আমি বলিলাম, 'এক জন প্রবীণ সাহিত্যসেবী স্বীয় জীবনের পুরাতন ঘটনাবলির আলোচনা-প্রসঙ্গে ঐরূপ একটি কথা লিখিয়াছেন; ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পোষাক পরিয়া বঙ্কিমবাবু আপনার ক্লাসে আসিয়া ছাত্রদিগের সহিত বেঞ্চে বসিয়া আপনার লেকচার শুনিতেন।' তিনি বলিলেন, 'দেখ, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের পূর্বে আমি Law-lecturer হই নাই। কখনও যে তিনি আমার ক্লাসে আসিয়াছিলেন, এমন আমার মনে হয় না। তবে আন্দাজ ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমবাবু ও আমি একত্র Law-class-এ লেক্চার শুনিতে যাইতাম।' "

প্রবীণ সাহিত্য-সেবী—এই অধম। আমি 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম,—

"প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। * * * তাৎকালিক সংস্কৃতাধ্যাপক—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া, সাহেব-শিক্ষক উঠিয়া গেলে, তাঁহার অনুরোধে তিনি আমাদের রেজেস্টরী লইতেন। কৃষ্ণকমলবাবু প্রথম নামটি ধরিয়াছেন কি, বঙ্কিমবাবু অমনি উঠিলেন,—তাঁহার কাণের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—'আমাকে উপস্থিত লিখিয়া লইবেন, মহাশয়!' কৃষ্ণকমল বলিলেন, 'আচ্ছা'। অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদীঘির ধার দিয়া ছাতা ধরাইয়া, সটানে সমানে চলিয়া গেলেন।"*

এরূপ ভুল বা ভ্রম হওয়া নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়; বিশেষ আমার প্রবন্ধ যখন ছাপানো রহিয়াছে। তাহার উপর 'আর্যাবর্ত'-সম্পাদক এক জন কৃতবিদ্য প্রবীণ সম্পাদক; তিনি আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। এরূপ ভুল তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাওয়া আরও ক্ষোভের বিষয়। আসল কথা, আমরা সত্য-মিথ্যার ভেদ করা তুচ্ছ জ্ঞান করি।

বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া এখন একরূপ ঝক্‌মারি হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমবাবু বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন—মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে আরও বাড়াইতে যাওয়া একরূপ বাতুলতা। ১৩০২ সালের বৈশাখে শ্রীমান্* হারাণচন্দ্র লিখিলেন, 'সেই দুই মাস মাত্র পড়িয়া মেধাবী বঙ্কিম যথাকালে প্রশংসার সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।' এই শ্রাবণ মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীমান্ শচীশচন্দ্র লিখিতেছেন,—'পরীক্ষায় দুই জন মাত্র উত্তীর্ণ হইলেন, তাও আবার দ্বিতীয় বিভাগে। প্রথম স্থান অধিকার করিলেন বঙ্কিমবাবু, দ্বিতীয় হইলেন বাবু যদুনাথ বসু।'

এখন প্রকৃত কথা সরকারী বিবরণ হইতে শুনুন—

'The necessity for reducing the standard, as the Court of Directors had advised, was at once seen from the poor results of the first examination, in which only two students from the Presidency College obtained degrees, and these were conferred by favour."—*Report by the Bengal Provincial Committee. 1881. Page. 14 : Para. 45.*

এমন করিয়া, খুঁটিনাটি করিয়া চরিত লেখা চলে না। তাহাতে এমনও কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমি বঙ্কিমবাবুকে খাট করিবার জন্য এইরূপ কথা লিখিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে; বঙ্কিমবাবুর মত মনীষী পাস করিতে পারেন নাই বলিয়া, বি. এ. পরীক্ষার কঠোরতা কমিয়া গেল এবং আমার মত কত শত অভাজন বি. এ. পাস করিয়া কৃতার্থ হইল। আসল কথা, সত্য জানিতে পারিলে প্রকাশ করাই ভাল, তাহাতে ভাল ব্যতীত মন্দ হয় না।

কিন্তু সকল কথার প্রতিবাদ ত আর সরকারী বিবরণ দেখাইয়া করা যায় না। অথচ বঙ্কিমবাবুর চরিতে বা চরিত্রে অনেক মিথ্যা যোজিত হইতেছে; সেইগুলির প্রতিবাদ করিবার উপায় কি? ধরুন একটা কথা উঠিল—বঙ্কিমবাবু কেমন সাহসী ছিলেন। আমি চরিত-লেখক হইলে, হয়ত এ সকল কথা তুলিতাম না; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়গণ তুলিলে সেই কথার কোনরূপ উত্তর না দিলে চলে কই? বঙ্কিমবাবু

* পিতাপুত্র—৪৩ পৃষ্ঠা, ২য় কলম

* রক্ষিত।

এক জন বিশেষ সাহসী পুরুষ ছিলেন, এমন কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। এখন যাহাকে 'সাধুভাষা'য় nervous বলে, তিনি সেইরূপ nervous ছিলেন। ডেপুটী ম্যাজিস্‌ট্রেট ছিলেন বটে, কিন্তু ঘোড়া চড়িতে একেবারে পারিতেন না; পর্বতে কখনও উঠেন নাই। কিন্তু তিনি nervous বলিয়া যে ভূত-ভয়-গ্রস্ত ছিলেন—এমনটা বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে 'ললিতা' প্রকাশিত হয়। এক খণ্ড আমার আছে।* তাহাতে 'ভৌতিক গল্প' এমন কোন কথা নাই। ২২ বৎসর পরে, বঙ্কিমবাবু যখন প্রবীণ, তখন ঐটির পুনর্মুদ্রাঙ্কণ করেন। অনেক স্থলে খোল-নল্‌চে—দুই বদলাইয়া দেন। তাহাতেই ছাপা আছে, 'ললিতা। ভৌতিক গল্প!' এই ভৌতিক কথা লইয়া, কোন ভূতের ব্যাপারের সহিত গল্পের সম্পর্ক আছে, বুঝানো হইয়াছে।

ঐরূপ বুঝানো ভুল। প্রথম কথা, ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে যখন 'ললিতা' ছাপানো হয় তখন 'ভৌতিক গল্প' নাম ছিল না; 'পুরাকালিক গল্প' নাম ছিল। তাহার পর, বঙ্কিমবাবুর বাল্যাবস্থায় কাঁটালপাড়ার চাটুয্যেদের বাড়ীর দক্ষিণে খাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ ছিল। তাহাতে আশে পাশে দুই-একটা ঝোপ থাকিলেও, বড় গাছের জঙ্গল একেবারেই ছিল না। আমি অবশ্য সে সময়ের কথার সাক্ষী নহি। তবে বঙ্কিমবাবুরই মুখে শুনিয়াছি, সেই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শষ্পশয্যায় ঊর্ধ্বমুখে শয়ান থাকিতে, তিনি সকালে-বিকালে ভালবাসিতেন। আর সেই-যে প্রাণ ভরিয়া স্বভাবের শোভা-সন্দর্শন, তাহাতেই তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। সেই প্রভাতের বালারুণচ্ছটা, সেই সান্ধ্যগগনের রক্তিম আভা, সেই ঢল ঢল দুর্বাদলময় প্রান্তরের সবুজ লীলা, সেই চারিদিকের গাছপালার বিচিত্র হরিৎ-সমন্বয়, মাথার উপর মেঘের সেই বর্ষব্যাপিনী লীলা-খেলা—নয়ন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী। কিন্তু আমরা তাহা দেখি কি? দেখি না। বঙ্কিমবাবু বয়স্কালে কিঞ্চিৎ colour-blind বা রং-কাণা হইলেও, অতি বাল্যাবস্থা হইতেই এই সকল দেখিতেন, প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মহারা হইতেন। শীতল সমীরণের নিয়ত সর্ সর্ শব্দ, প্রভঞ্জনের স্বন্ স্বন্ স্বনন, সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থ কুল্যার কুল কুল রব, অজস্র বিহঙ্গকুলের বিচিত্র কাকলি, ক্বচিৎ উড্ডীয়মান পক্ষীর পক্ষপুট-ধ্বনি এবং বায়ুস্তর ভেদ করিয়া শন্ শন্ গতি-শব্দ—বালক-বঙ্কিম কাণ ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া শুনিতেন, উপভোগ করিতেন; করিয়া স্বভাবের সৌন্দর্যের সঙ্গে, তিনি যেরূপ সখ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আর কয়জন বাঙ্গালি সেরূপ করিয়াছেন, আমি জানি না। কাঁটালপাড়ার সেই প্রান্তর-টুকু, বাঙ্গালির পুণ্যক্ষেত্র—গাছপালায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে; তোমরা সকলে এইবেলা একবার দেখিয়া আসিও।

বুঝা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যাবস্থা হইতেই স্বভাব-সৌন্দর্যের সেবক। এই সেবার গুণে তিনি সকলরূপ সৌন্দর্যের উপভোগ করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সেই জন্য এক জন প্রকৃত সাহিত্য-সেবক। এখন বাঙ্গালার সাহিত্য বিশ্বব্যাপারে প্রসার পাইয়া নিতান্ত অগভীর হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা এইরূপ প্রসার-বৃদ্ধিতে প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহাদের সমীচীনতায় আমরা সন্দেহ করি। বঙ্কিমের বাল্যাবস্থায়, আবার ইহার বিপরীত ছিল; বঙ্গসাহিত্যের প্রসার তখন প্রায় কবিতা পর্যন্ত ছিল। যাত্রা, গান, কীর্তনের কথা এখন ধরিলাম না। তখন বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট্ ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তখন কবিতার চর্চার নামই ছিল সাহিত্য-চর্চা। পূর্ব হইতেই কাব্য-গ্রন্থ-পাঠ আমাদের সাহিত্য-চর্চার সীমা ছিল। কেবল পাঠশালা বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিত; বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদি মুদিখানার পাটে বসিয়া, পুরোহিত-ঠাকুর ৺শিবের মন্দিরের ধারীতে বসিয়া, মোসাহেব মুখুয্যে মহাশয় বড়মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে শ্রোতৃমণ্ডলী-মধ্যে কৃত্তিবাস কাশীদাস পাঠ করিতেন। গোস্বামী ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরের দাওয়ায়, বাবাজি-ঠাকুর আখড়ার আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, বৈষ্ণব গৃহস্বামী পূজার দালানের দরদালানে, সেইরূপ শ্রোতৃমণ্ডলী-মধ্যে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' পাঠ করিতেন। তদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী',

* এখন আর নাই।

রামেশ্বরের 'শিবায়ন', ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল', দুর্গাপ্রসাদের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' প্রভৃতি গীত ও পঠিত হইত। বহুকাল এইরূপ চলিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত আসিয়া কাব্যসাহিত্যে একরূপ নূতন ভাব আনিলেন।

তাঁহা-কর্তৃক বঙ্গসাহিত্যে ঢল নামিল; স্রোত চলিতে লাগিল; একটা জীবন্তভাব আসিল। কেবল পৌরাণিক প্রসঙ্গের নাড়াচাড়া করিয়া সাহিত্য এখন আর সন্তুষ্ট নহে। যখন সমাজে যে-বিষয়ের আন্দোলন হয়, গুপ্তকবি তখন সেই বিষয়েই কবিতা লেখেন; সমাজে-সাহিত্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহারই প্রমাণ দেন। তাহার পর, বর্ষার সময় বর্ষা-বর্ণন, গ্রীষ্মে গ্রীষ্মবর্ণন, বড় ঝড় হইলে ঝড়বর্ণন করেন। ১লা বৈশাখের 'প্রভাকরে' সমগ্র পূর্ব বৎসরের ঘটনাবলির কাব্য-চিত্র প্রদান করেন। কেহ খৃস্টান হইতে গেলে, তখনই তাহার উপর বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচিত হইল। বিধবা-বিবাহের গোল উঠিল, ঈশ্বর গুপ্ত ক্রমাগত সেই বিষয়ে পদ্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কবিতা এখন আর নরবানরের যুদ্ধ লইয়া বা কৌরব পাণ্ডবের বিবাদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না—বাঙ্গালার সকল কথাই এখন বাঙ্গালা কবিতাতে আলোচিত হইতে লাগিল। কবিতা একটি জীবন্ত পদার্থ হইল। বাঙ্গালির সুখদুঃখের সহিত বাঙ্গালা কবিতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সকলেই বুঝিতে পারিলেন।

এই ঈশ্বর গুপ্ত যখন সম্রাট্, তখন বঙ্কিমবাবু নিতান্ত বালক। বালক তখন স্বভাবের সৌন্দর্য-উপভোগে অভ্যস্ত হইয়া, সাহিত্যের রস-উপভোগে ব্রতী হইয়াছেন। প্রভাকরে পদ্য লিখিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ, গোপাল মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমের মত সকলেই ঈশ্বর গুপ্তের সাক্‌রেদ। বঙ্কিমবাবু নিজে বলিতেছেন,—

'দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন—বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন, বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর এক জন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকটে ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।'

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র আবার বলিতেছেন,—

'যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক—স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ সুন্দর-কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্তা কহিতেন—তাঁহার কতকগুলা নন্দী-ভৃঙ্গী থাকিত—রসাভাষের ভার তাহাদের উপরে পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকে শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তিশক্তি পরিমার্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনা-শক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কবিতারচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনাপ্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল স্বচ্ছ দেশী কথায় দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র সকলেই গিয়াছেন—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।'

অতি অল্প বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি কবিতার রস উপভোগ করিতে পারিতেন। এই সময় হইতেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করিতে থাকেন; কিন্তু সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজি সাহিত্যে তিনি অধিকতর প্রবেশলাভ করেন। বঙ্কিমের কোন কোন চরিত-লেখক বলিতেছেন, হুগলী কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষা করেন। আমি তাহা বলি না। কেন বলি না, তাহা বুঝাইতে গেলে কেবল খুঁটিনাটিতেই আমার প্রবন্ধ পূরিয়া যাইবে, সে ত ভাল হইবে না।

চরিত-লেখক নিজেই বলিতেছেন, বঙ্কিমবাবু, '৫৭ সালে বি. এ. পরীক্ষা দেন, আর ঈশানবাবু '১৮৬৪ সালে হুগলী কলেজের হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন।' তবে ঈশানবাবুর কাছে বঙ্কিমবাবু শিখিলেন কবে? যাক, ও-সকল অসাবধানতার কথা আর তুলিব না।

বঙ্কিমবাবুর প্রথম গ্রন্থ—

"ললিতা।

=

পুরাকালিক গল্প।

—

তথা

মানস।"

পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এইখানে 'তথা' কথাটি অনুধাবন করিবেন। 'তথা' অর্থ—এবং বা ও। ললিতা—পুরাকালিক গল্প, মানস তাহা নহে।

এই গ্রন্থ 'কলিকাতা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৮৫৬।'—সালে। সেই সময়ের লেখা গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন-অনুসারে এবং ২২ বৎসর পরের লেখা অনুসারে, এই গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে, 'লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়।' বঙ্কিমবাবুই বলিতেছেন,—'প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারিতেই পচে—বিক্রয় হয় নাই।'

গ্রন্থের বিষয় কিছু বলার প্রয়োজন দেখিলে, পরে বলিব; আপাতত সেই গ্রন্থে গ্রন্থকার-লিখিত গদ্য-বিজ্ঞাপনই আমাদের আলোচ্য। সেই বিজ্ঞাপনটি এই—

বিজ্ঞাপন

সু কাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কত দূর সুতীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা-কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয় মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্মার্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনাজনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।

গ্রন্থকার।'

বি. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে উপরের ঐ বিজ্ঞাপনটি থাকিলে, সকলেই হয়ত মনে করিতেন যে, ওটি পরীক্ষকদিগের মনগড়া সদোষ লেখা। তাহা নহে; ওটি পরে-গদ্য-লেখার সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরচিত বিজ্ঞাপন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তিনি কবিতা দু'টি লেখেন; তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ তাঁহার যখন আঠার বৎসর বয়স্, তখন বিজ্ঞাপন লিখিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহার পরই বর্ষকালমধ্যে তিনি বি. এ. পরীক্ষা দেন। এখন একবার এই সময়ের বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাস আলোচনা করা যাউক।

খুচরা গদ্য বা কড়্চার কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রথম যুগের গদ্য-লেখক রাজীবলোচন রায়, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৭২৫ খৃস্টাব্দ হইতে প্রায় সপাদ-শতবর্ষ এই যুগের পরিমাণকাল। ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রকাশে বাঙ্গালা গদ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। বঙ্কিমবাবুর ঐ লেখাটি ১৮৫৬ সালের; মধ্যে একটি ছোটখাট যুগ অর্থাৎ বার বৎসর গিয়াছে। সেই সময়ের মধ্যে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি গদ্য-গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্শম্যান সাহেব, য়েটস্ (Yates) সাহেব প্রভৃতির কথা ধরিব না। মুক্তারামের 'আরবীয়োপাখ্যান' ও 'অপূর্বোপাখ্যান', মদনমোহনের 'ঋজুপাঠ' বা তৃতীয় ভাগ 'শিশু-শিক্ষা' বাঙ্গালা গদ্যের আদর্শ। তখনও আদর্শ, এখনও আদর্শ। তারাশঙ্করের স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক প্রাপ্ত-পারিতোষিক প্রবন্ধ যেমন সরল রচনার দৃষ্টান্ত, তাঁহার 'কাদম্বরী' তেমনই কাদম্বরী—শব্দচ্ছটায় এবং ভাবঘটায় মোহকরী। ১৮৪৯ সালে

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়,—ইংরাজির এইরূপ প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রায় দেখা যায় না। তাহার পর 'বেতালপঁচিশ' ও 'বোধোদয়'। প্যারীচাঁদ মিত্র তখন 'মাসিকপত্র' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি প্রকাশিত করেন। বঙ্কিমবাবু বহুপরে বলিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ বাঙ্গালা গদ্যে যুগান্তর আনয়ন করে। অক্ষয়কুমারের তিনখানি 'চারুপাঠ' ও 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রকাশিত হইয়াছে; আর বোধ করি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাকৃত ভূগোল' ও 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। তা ছাড়া এই সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' ত ছিলই, 'এডুকেশন গেজেট'ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, ঠিকঠাক বলিতে পারি, আর নাই পারি,—বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপন লেখার সময় বাঙ্গালা গদ্য বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব রঙ্গ দেখাইতেছিল। বাঙ্গালার গদ্য, একটা শিক্ষার উপায় এবং উপভোগের সামগ্রী হইয়াছিল। সাহিত্যের প্রসার এখন আর কবিতায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই—গদ্যকেও আত্মসাৎ করিয়াছিল; ঈশ্বর গুপ্তের সহিত ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের নাম সমানে ঘোষিত হইতেছিল।

বঙ্কিমবাবুর ১৮৫৬ সালের বিজ্ঞাপন পাঠে মনে হয়, এই গদ্য-সম্পৎ বঙ্কিমবাবু একান্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল যে 'অত্র কবিতা', 'হইবায়' এইরূপ শব্দ দেখিয়া বলিতেছি, এমন নহে। 'হইবেক', 'জন্মিবেক' এরূপ কান্ত পদ আরও অনেক দিন পর্যন্ত ছিল। তাহার জন্যও বলি না। সমস্ত লেখাটি পড়িলেই মনে হয়, সাগরী যুগের রঙ্গ এই খেলায় একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। সেই অপূর্ব গদ্যের প্রসাদগুণের প্রভাব এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় নাই। মনে হয়, গ্রন্থকার সেই গদ্যের প্রভাব তখন অনুভব করেন নাই—প্রত্যুত সেই গদ্য একান্ত উপেক্ষাই করিয়াছেন।

'অত্র কবিতা', 'মনোনীত হইবায়' ইত্যাদি পরিষ্কার আদালতি বাঙ্গালা; তাহার পর আমরা যখন উপসংহার পাঠ করি,—'অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে (গ্রন্থকার) প্রস্তুত নহেন', তখন মনে হয়, কোন বালক-আসামী রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের সমক্ষে, উকীলের শিক্ষামত কাতরতা জানাইতেছে। লেখাটিতে আদালতি ঢং জাজ্বল্যমান।

তাহার উপর আছে—পণ্ডিতি ঢং। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে টোলের-পড়া বঙ্কিমবাবু অনেক পড়িয়াছিলেন। তাহাতেই আমরা দেখিতেছি—তাঁহার ভাষায় 'পণ্ডিতি' প্রবেশলাভ করিয়াছিল। 'সুকাব্যালোচক'—পণ্ডিতি বেশ, কিন্তু বাঙ্গালা নহে। 'গুণ হয়ে দোষ হৈল, বিদ্যার বিদ্যায়।'—'সু' দেখিতেছি, তাঁহার হাতে পড়িয়া প্রায় 'কু' হইয়াছে। 'সুকাব্যালোচক', 'সুত্তীর্ণ' আর 'সুরসজ্ঞ'—এরূপ 'সু' ত ভাল নহে। 'সু' ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। 'কাব্যালোচক' যে আলোচনা করে, সে অবশ্য শাস্ত্রমত আলোচক। কিন্তু এইরূপ শাস্ত্র লইয়া আমরা ত লেখা-বলা করি না; কাব্যালোচক কথা ত তাহার পরে আর খুঁজিয়া পাই না। 'পদ্ধতির পরীক্ষাপদবীরূঢ়'—বেশ পণ্ডিতি বটে, কিন্তু যে পাণ্ডিত্যবলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থে লেখেন,—'পদবীতে পদার্পণ', তাহা ত 'পদবীরূঢ়' পদে পাওয়া গেল না। নব্য লেখকগণকে বঙ্কিমবাবু উপদেশ দেন, 'যাহা কিছু লিখিবে, সুন্দর করিয়া লিখিবে';—'পদবীতে পদার্পণে' যে সৌন্দর্য আছে, তাহা 'পদবী-রূঢ়'তে নাই।

এ সমালোচনা এই পর্যন্ত। আমরা কেবল এইমাত্র দেখাইতে চাই,—যিনি এক সময়ে বাঙ্গলা গদ্যের শায়েনশা সম্রাট্ হন, তিনি আঠার বৎসর বয়স্ পর্যন্ত সেই ঐশ্বর্যময় গদ্যের আলোচনা করেন নাই, প্রত্যুত একান্ত অবহেলাই করিয়াছিলেন!

বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে তখন সাধারণে বাঙ্গালা কবিতাই বুঝিত। সে সাহিত্যে তাঁহার অবহেলা ত ছিলই না, গুপ্তের শিষ্যত্ব-স্বীকারেই সে কথার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যও তিনি কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। আর ইংরাজি কবিতা, সেক্সপিয়ার হইতে বায়রন তিনি বিশেষ করিয়া অনুশীলন করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, স্বভাবের সৌন্দর্য দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া তিনি কবিতার সৌন্দর্য উপভোগ করিবার শক্তি লাভ করেন। যাত্রা, গান, কীর্তনের কথা এখন বলিব না।

এ প্রবন্ধ এইখানেই থাক। দুইটা কথা আমি প্রথমে বলিলাম,—(১) বঙ্কিমবাবু বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই—কর্তৃপক্ষের favour বা অনুগ্রহে তিনি উত্তীর্ণ বলিয়া পরিচিত হন। এই কথাটির সরকারী দলিলী প্রমাণ দিয়াছি। (২) আর একটা কথা আমার অনুমান,—বঙ্কিমবাবু তাঁহার আঠার বৎসর বয়স্ পর্যন্ত বাঙ্গালা গদ্যের আলোচনা করেন নাই।

এই দুইটা কথায় বঙ্কিমবাবুর প্রতিভার কি কিছু অবমাননা করা হইল? আমি বলি, তা ত নয়ই—প্রত্যুত তাঁহার প্রতিভার গৌরববৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলাম। প্রতিভা দুই ভাবে বুঝা যায়,—(১) 'নবনবোন্মেষশালিনী-বুদ্ধিঃ প্রতিভা উচ্যতে।' Inventive genius. (২) আর এক কার্লাইলের মতে,—'Indefatigable exertion in pursuit of an object.' আমি যতদূর জানি, তাহাতে বুঝি,—এই দ্বিতীয় প্রকার প্রতিভাতেই বঙ্কিমবাবু আমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হইয়াছেন।

উপসংহারে একটি নিবেদন করিব,—বঙ্কিমবাবুর আত্মীয়, অনাত্মীয় নব্যলেখকেরা বঙ্কিমচরিত লিখিবার সময়, একটু দেখিয়া শুনিয়া সতর্কতার সহিত যেন লেখনী চালনা করেন; আমরা কল্পনা-প্রিয় জাতি, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ আমরা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি না—এইরূপ একটা জাতীয় বা বিজাতীয় কলঙ্ক যে আমাদিগের উপর আরোপিত হইয়া থাকে, বঙ্কিমবাবুর মত প্রতিভাবান্ ব্যক্তির চরিত্রাঙ্কনে সেই কলঙ্ক যেন স্পষ্টীকৃত করা না হয়। এই ভাদ্রের চতুর্থীর চন্দ্র আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি,—কলঙ্ক আমাদের নিয়তই লাগিয়া আছে,—আপনাদের কৃত কার্যে সেই কলঙ্ক আবার বাড়াইব কেন?

সাহিত্য ২২শ বর্ষ   কার্তিক ১৩১৮

খ

তাঁহার সংস্কার, শিক্ষা ও সাধনা

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধে (সাহিত্য, কার্তিক ১৩১৮) বলিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া এখন একরূপ ঝকমারি হইয়া উঠিয়াছে। সে ঝক্‌মারি ত আছেই, তাহার উপর আমি এইবার ঝক্‌মারির মাশুল দিতে বসিলাম।

পূর্ব প্রবন্ধে এইটুকু দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, 'যিনি এক সময়ে বাঙ্গালা গদ্যের শায়েনশা সম্রাট্ হন, তিনি আঠার বৎসর বয়স্ পর্যন্ত সেই ঐশ্বর্যময় পদ্যের আলোচনা করেন নাই, প্রত্যুত একান্ত অবহেলা করিয়াছিলেন।... বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে তখন সাধারণে বাঙ্গালা কবিতাই বুঝিত। সে সাহিত্যে তাঁহার অবহেলা ত ছিলই না, গুপ্তের শিষ্যত্ব স্বীকারেই সে কথার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যও তিনি তখন কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। আর ইংরাজি কবিতা, সেক্সপিয়ার হইতে বায়রন, তিনি বিশেষ করিয়া অনুশীলন করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, স্বভাবের সৌন্দর্য দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া তিনি কবিতার সৌন্দর্য উপভোগ করিবার শক্তি লাভ করেন। যাত্রা, গান, কীর্তনের কথা এখন বলিব না।'

সেবার বলি নাই, এবার বলিব। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন মহাপুরুষ ছিলেন। এমন রাশভারি লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। অনেক দিন তাঁহাকে একটি প্রণাম করা পর্যন্ত আমার তাঁহার সহিত আলাপের সীমা; তবে আলাপের দিন একাদশী হইলেই বড় গোলে পড়িতাম। সেই দিন অতি যত্নে, অতি আদরে, আমার উপর পুত্রাধিক স্নেহে, তিনি কাছে বসিয়া আমাকে 'জল' খাওয়াইতেন, 'এটি খাও', 'ওটি খাও' করিতেন, ফলসন্দেশের স্বাদুতা বর্ণন করিতেন। নিজে রসগ্রাহী লোক ছিলেন, অন্যকে রসগ্রহণের পদ্ধতি-প্রকরণ দেখাইয়া দিতে আনন্দ বোধ করিতেন।

একদিন ঐরূপ একাদশীতে আমি রসগোল্লা লইতে ইতস্তত করিতে ছিলাম; তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, 'এ কি তোমার ও-পারের ফিরিঙ্গি মুলুকের রসগোল্লা পেয়েছ যে, সুজির বাঁধন দিবে?—এ পারে সে সকল হবার যো নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।' এই যে রাশভারি লোকের রহস্যে রসাস্বাদ—সেটি বড় অপূর্ব পদার্থ। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রস-পরিগ্রহ নাকি সকল বিষয়েই সমান ছিল। কেবল খাইতে খাওয়াইতে নয়।—তিনি

সঙ্গীত-সাহিত্যের রস বিশেষ উপভোগ করিতে পারিতেন এবং স্বয়ং বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া নিজ ভবনে সঙ্গীতাদির আয়োজন করিয়া আপামর সাধারণকে রস উপভোগের সুচারু সুবিধা দান করিতেন। অতি বালক-কাল হইতেই বঙ্কিমবাবু উৎকৃষ্ট যাত্রাগান, কবি, কীর্তন, কথকতার রস উপভোগ করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। অনেকের অদৃষ্টে সেরূপ সুবিধা প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না।

আমাদের ও-পারের রায় বাহাদুরদের বাড়ী ছিল যাত্রাগান-মহোৎসবের মিলন-মন্দির। এতদঞ্চলের একরূপ টাউন-হল। পালপার্বণ ত ফাঁক যাবেই না, অন্য সময়েও উৎসব আছে। দুর্গোৎসবে কৃষ্ণনগর ঘুর্নির উৎকৃষ্ট কুম্ভকার শশী পাল ঠাকুর গড়িবে, উৎকৃষ্ট চিত্রকর চুঁচুড়ার মহেশ ও বীরচাঁদ সূত্রধর চিত্র করিবে। প্রতিমা সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে। জগমোহন স্বর্ণকারের চণ্ডীর গানে উচ্চ কণ্ঠে মা মা রবের মোহিনী শক্তি, অথবা নীলকমলের প্রসিদ্ধ রামায়ণ-গান। যাত্রা-অঙ্গে বদন অধিকারীর তুক্কো বা গোবিন্দ অধিকারীর 'কালীয়দমন' গান। দাশরথি রায়ের কথার ছটাঘটা* সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়ির সুরেতালে মাখামাখি গান; ফরাসডাঙ্গার জগৎমনোমোহিনীর ঢপ; বর্ধমানের সহচরী ও যাদুমণির কীর্তন; মধুকানের গান,—এইরূপ ছোট-বড়-মাঝারি কতরূপ গান প্রায়ই হইত। এই 'ধরণী'র কথকতা ক্রমাগত তিন মাস চলিয়াছে। এ সকলের আর কত পরিচয় দিব? বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থসমূহ-মধ্যে কীর্তনের ও সহজ গানের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার সংগ্রহ ছিল বিস্তর, তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন তাহার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষার আর একরূপ উপকরণ তাঁহাদের ভবনে প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভজী ও তাঁহার নিত্যসেবা। এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। 'বঙ্কিম-জীবনী'* হইতে সেই গল্পটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। '১৭৪৮ খৃস্টাব্দে একদা অপরাহ্লে জনৈক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী সশিষ্য কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অতিথিশালা নাই, সন্ন্যাসী বাধ্য হইয়া "অর্জুনা"র তটে বটচ্ছায়া তলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। তাঁহার কাঁধে একটি দীর্ঘ-বিলম্বিত ঝুলি। ঝুলির ভিতর "রাধাবল্লভজীউ" ছিলেন। সন্ন্যাসী ঝুলিটি নামাইয়া তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন।

বিশ্রামান্তে যখন সন্ন্যাসী ঝুলিটি তুলিতে গেলেন, তখন তাহা আর তুলিতে পারিলেন না। ক্ষুদ্র বিগ্রহ তুলিতে সন্ন্যাসীর সামর্থ্যে কুলাইল না। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, ঠাকুরের সে স্থানে থাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি তখন (সেই গ্রামের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি) রঘুদেব ঘোষালকে ঠাকুর-সেবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুদেব তন্মুহূর্তে স্বীকার পাইলেন। সন্ন্যাসী অর্জুনার সন্নিকটে একস্থানে একখানি ক্ষুদ্র চালা তুলিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

কয়েক মাস পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া এক দানপত্র রঘুদেবকে প্রদান করিলেন। দানপত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-কর্তৃক রাধাবল্লভজীউ বরাবর লিখিত। দানের সম্পত্তি সামান্য কয়েক বিঘা ভূমি মাত্র। বর্তমান চট্টোপাধ্যায়-বাটী, রাধাবল্লভ-মন্দির প্রভৃতি এই দানপ্রাপ্ত ভূমির উপর দণ্ডায়মান।......' তাহার কয়েক বৎসর পরে ১৬৭৫ শকে রঘুদেব-কর্তৃক মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। মন্দির-গাত্রে লিখিত ছিল—

বাণ-সপ্ত-কলা-নাকে রঘুদেবেন মন্দিরম্।

রঘুদেবের দৌহিত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় পাইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করেন। রামহরি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রপিতামহ।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যাবস্থায় এই বিগ্রহের এবং অতিথি-

* দাশরথি-সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু আমায় একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, 'The fellow was master of the colloquial Bengalee.'

*স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

অভ্যাগত-সেবার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল, এখনও অনেকটা আছে; সেই সুন্দর বিগ্রহ ও তাঁহার ঐকান্তিক সেবা-সন্দর্শনে অভ্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্র বয়সকালে কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

কেবল কৃষ্ণভক্তি নহে। শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস তিনি আপনার গ্রন্থমধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, সে ত সকলেই জানেন; আমি বলিতেছি, এই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অলৌকিকত্বে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। এই সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে ধীরে ধীরে একটু জেরার ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তিনি প্রথমে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সহাস্যবদনে বলিতে থাকেন, 'তোমাদের চুঁচুড়ার একটি সুবর্ণ-বণিক-মহিলা বিশত্রিশ জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে এপারে আমাদের এই ঠাকুর দেখিতে আসেন।' বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে জল আসিল, বলিতে লাগিলেন,—'কিন্তু সকলেই ঠাকুর দেখিল, তিনি দেখিতে পাইলেন না; আমরা বাড়ীতে ছিলাম, সকলেই তাঁহার কাছে গেলাম, সমস্ত লোকজন সরাইয়া দিয়া, তাঁহার ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা করাইয়া দিলাম,—অভাগিনী কিছুতেই ঠাকুরকে দেখিতে পাইল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।'—বঙ্কিমবাবুও কাঁদিতে লাগিলেন, আর বলা হইল না। তাঁহার বিগ্রহ-ভক্তি দেখিয়া আমিও অভিভূত হইলাম।

বালককাল হইতেই বঙ্কিমবাবু ভক্তিচর্চায় অভ্যস্ত হন। কৃষ্ণচরিত্রে সেই ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের হিন্দুমতে মানুষে মানুষে তারতম্য হয় ত্রিবিধ কারণে—সংস্কারে, শিক্ষায়, সাধনায়।

এই সংস্কার অর্থাৎ পূর্বজন্মার্জিত কর্মের প্রভাব ইউরোপ-আমেরিকা বুঝেন না, কাজেই মানেন না। এটি তাঁহাদের আংশিক বর্বরতার পূর্ণ পরিচয়। আমাদের দেশেও যে কোন কোন নব্য সম্প্রদায় এই সংস্কার স্বীকার করেন না, সেটা কেবল অনুকরণের বিষময় ফল মাত্র। এই যে দুই সহোদরের মধ্যে বুদ্ধিবিবেচনার বিষম বৈষম্য দেখা যায়, ইহার কি কোন কারণ নাই? যদি শিক্ষাবৈষম্যে ওরূপ বৈষম্য ঘটে, তাই বা কেমন করিয়া বলি? সর্ব শিক্ষার অগ্রে বালক বঙ্কিম, একদিনেই পঞ্চাশৎ বর্ণ লিখিতে বা পড়িতে পারেন, এটা কি কেবল genius কথা দ্বারাই বুঝা যাইবে? না, জিনিয়স শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধ করিয়া বুঝিতে হইবে? Genius সেই 'জন্' ধাতু, আর পূর্বজন্মজাত সংস্কারও সেই 'জন্' ধাতু। পূর্বজন্মের কথা ইউরোপের শিক্ষাদাত্রী গ্রীসভূমিতে স্বীকৃত ছিল, খৃস্টানিটির দোহাই দিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমাদের দেশের ঐটি সনাতন বিশ্বাস, আমরা বিলাতের অন্ধ অনুকরণ করিতে গিয়া সেই বিশ্বাস চাপিয়া রাখিব কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের genius বা প্রতিভা ত ছিলই, শিক্ষাও বিশেষভাবে হইয়াছিল। এক শিক্ষা প্রকৃতির নিকট, উহার কথা পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, 'তিনি স্বভাবের সৌন্দর্যের সঙ্গে সখ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।' আর একরূপ সমাজের বা মানবের নিকট হইতে; তাঁহার সংস্কৃত, ইংরাজি ও বাঙ্গালা কবিতা শিক্ষার কথা পূর্বে বলিয়াছি, এখন যাত্রা-গান-কীর্তনাদি শুনিবার তাঁহার যে অত্যধিক সুবিধা হইয়াছিল, সেই কথাই বলিলাম। বঙ্কিমবাবুর পিতার এই সকল বিষয়ে রসজ্ঞতা প্রচুর পরিমাণে ছিল, আর রস উপভোগের জন্য প্রভূত ব্যয় করিতেন, আপনার বাসভবনে প্রায়ই সঙ্গীতোৎসব হইত, তাঁহার পরিবারের সকলেই সেই অপূর্ব রস উপভোগ করিতে পারিতেন। এটি বড় অল্প ভাগ্যের কথা নহে।

'রসভোগ, সুসংযোগ হয় কি সকল কপালে?
দরিদ্রের কি স্বর্ণ মিলে রোদন করিলে সিন্ধুকূলে?'

আর কি বিপরীত ব্যবস্থা দেখুন, আমাদের রবীন্দ্রনাথের কপালে। তিনি নিজেই তাঁহার দুর্দশা বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার 'ভৃত্য রাজক তন্ত্র', আর অন্ধকূপের মাসতুত ভাই সেই শ্রীমন্দির 'বাহির বাড়ীতে চাকরদের মহলে, দোতলার দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘর।' এখনও পড়িতে গেলে—যতই বাঁচাইয়া লেখা হোক না কেন—পড়িতে গেলে চোখে জল আসে। রবিবাবু নিজেই নিজ বাল্য-শিক্ষার পরিচয় অতি সুন্দর কাহিনী করিয়া লিখিতেছেন এবং তিনি স্পষ্ট করিয়া না লিখিলেও, আমি তাঁহার মুখে শুনিয়া জানি, যাত্রা, কবি, কীর্তন, পাঁচালি, কোনরূপ দেশীয় সঙ্গীত শুনিবার সুবিধা বাল্যে কৈশোরে তিনি

কিছুই পান নাই। তিনি যেদিন আমাকে এই কথা বলেন, সেইদিন আমি তাঁহাকে অভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি; আর সেইজন্য বঙ্কিমবাবুকে মহাভাগ্যবান্ বলিতেছি। তাঁহার নিজ ভবনে ভক্তির উপকরণের কথা এইমাত্র বলিলাম।

তাহার পর সাধনার কথা—সেই কার্লাইলের Indefatigable exertion in pursuit of an object.—কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রম।

যে দেশের অতি নিরক্ষর বর্বর পর্যন্ত, পল্লীবাসের অতি দীনা রমণী পর্যন্ত ধ্রুব-ভগীরথের সাধনার কথা জানে ও বিশ্বাস করে, সে দেশে সাধনার কথা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা বটে; কিন্তু সে সাধনা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি; আমরা মনে করিতেছি, একটি সভা করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, গোটা কয়েক প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করাইয়া লইতে পারিলেই সাধনার পিণ্ডান্ত পিণ্ডশেষ হইল! হায় ভগবান্! ধ্রুব-ভগীরথের দেশে এ কি বিড়ম্বনা!

কিন্তু বঙ্কিমবাবুর সাধনা—প্রাণ-মনের সাধনা।—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার একটু বিরতি বা ক্লান্তি ছিল না; আহার-নিদ্রার সময়জ্ঞান নাই,—পারিপাট্য বোধ নাই, ছুটি লইয়াছেন আর দিবা-রাত্র সাহিত্য-সাধনায় নিমগ্ন আছেন। নিজের লেখা নিজে নষ্ট করিতে প্রাণ ধরিয়া মানুষ যে সেরূপ পারে, বঙ্কিমবাবুর সাধনা দেখিবার পূর্বে আমার জ্ঞান ছিল না। বিষবৃক্ষের এবং আনন্দমঠের সূতিকা-সমাচার আমি কিছু কিছু জানি। বিষবৃক্ষ বহরমপুরে হয়। প্রথম নাম হইয়াছিল, 'উভয়েরই দোষ', নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্রে বিপুল একটা মোকদ্দমা হাইকোর্টে পর্যন্ত হইয়াছিল। আমার সাক্ষাতে সেই খণ্ড খণ্ডীকৃত হইয়া অতলে গিয়াছে। সমগ্র উভয়ের দোষ পাল্টাইয়া লেখা হইয়াছে 'বিষবৃক্ষ'। সমীচীন পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উভয়েরই দোষ সাব্যস্ত হইলে সূর্যমুখীর নিতান্তই দুর্দশা হইত। এখন যে ভাল হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার সাধনার কথা ভাবিলে এখনও সন্ত্রস্ত হইতে হয়। সেই সাধনাই একরূপ প্রতিভা—'এই প্রতিভাতেই বঙ্কিমবাবু আমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হইয়াছেন।' আর 'আনন্দমঠ'-নির্মাণে সাধনাই বা কত! এই সময় আমার নিজের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া একটু গল্প বলি—যখন আনন্দমঠ সূতিকাগারে তখন ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার আর একজন ডেপুটি ছিলেন, বঙ্কিমবাবু ত একজন ছিলেন; উভয়ের পাশাপাশি বাসা। সন্ধ্যার পর তিনি আসেন, আমিও যাই। তিনি সুরজ্ঞ; বড় টেবিল-হারমোনিয়ম লইয়া তিনি 'বন্দে মাতরম্' গানে মল্লারের সুর বসান। বঙ্কিমবাবুকে সুরের খাতিরে যৎসামান্য অদল-বদল করিতে হয়। একদিন ক্ষেত্রবাবু আসেন নাই, বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠের শেষে যুদ্ধের ভাগ তাঁহার হাতের লেখা খাতায় আমাকে পড়িতে দিলেন। আমি দেখিলাম, অজয় নদের উভয় পার্শ্বে স্থান, আমি 'সন্তান' শব্দ বুঝিতে না পারিয়া 'সন্তাল' পড়িতেছিলাম—মনে মনে। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এবার কি Santal Insurrection theme হইল নাকি?' তিনি বলিলেন, 'না, Sannyasi Insurrection.' আমি বলিলাম, 'এই যে আপনি লিখিয়াছেন অজয়ের ধারে আর বার বার বলিতেছেন, সন্তাল, সন্তালগণ?' তিনি তখন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'একটা তোমার অনিচ্ছাকৃত ভুল—সন্তাল নয়, "সন্তান," আর একটা আমার নিজের ইচ্ছাকৃত ভুল—অজয় নদ ও বীরভূম।' তখন হো হো করিয়া দুইজনেই হাসিতে লাগিলাম। পাঠক, 'পুঁথি বেড়ে যায়', আজি হাসিতেই থাকুক না কেন?

বঙ্গদর্শন ১২শ বর্ষ (নবপর্যায়) ভাদ্র ১৩১৯

লর্ড রীপন

আজও পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, লর্ড রীপন ভারতের শাসনভার লইয়া আগমন করেন। তখন এ দেশীয়েরা তাঁহাকে চিনিত না। তিনি তৎপূর্বে একবার দুই কি তিন মাসের নিমিত্ত ভারতের স্টেট সেক্রেটারির কার্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কার্যে ভারতবাসী তাঁহার কোন পরিচয় পায় নাই—তিনি ভাল লোক, মন্দ লোক, জানিতে পারে নাই। আজ পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে তিনি ভারতের

শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ-যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু আজ আর তিনি এ দেশীয়ের কাছে অপরিচিত নহেন। তাঁহার স্বদেশ-যাত্রায় এ দেশীয় সকলেই কাতর হৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছে। ভারতবাসী আর কোন ইংরাজের জন্য এত কান্না কাঁদে নাই—আর কোন ইংরাজকে এত হৃদয় ভরিয়া ভালবাসে নাই, এমন পূর্ণমাত্রায় পূজা করে নাই। লর্ড রীপন আজ ভারতবাসীর দেবতা। কেমন করিয়া এত অল্প দিনের মধ্যে একটি অপরিচিত বিদেশীয় ব্যক্তি অসংখ্য বিদেশীয়ের হৃদয়-দেবতা হইয়া উঠিলেন,—একবার ভাবিয়া দেখা কর্তব্য। রহস্য বড় গুরুতর। রহস্য ভেদ করিতে পারিলে সকলেরই উপকার আছে। রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিব।

লর্ড রীপন ভারতের শাসনকর্তা হইয়া এদেশে আসেন। সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে সকল কার্য করিয়াছেন বা যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার দোষগুণ বিচারসম্পন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমার এইরূপ সংস্কার যে, তিনি যে সকল কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহার ফলাফল বিচার কিছু কাল-সাপেক্ষ। তাঁহার কৃত কার্য বা অনুষ্ঠানগুলি দেশের পক্ষে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, তাহা এখন বলা যাইতে পারে না। আত্মশাসন বা শিক্ষাবিস্তার যে প্রকারের অনুষ্ঠান, তাহার পরিণতি নিতান্তই কাল-সাপেক্ষ। শুধু তাহাও নয়। তদপেক্ষা একটু গুরুতর কথা আছে। এরূপ অনুষ্ঠানগুলির সিদ্ধি শুধু গভর্নমেণ্টের ইচ্ছা বা শক্তি-সাপেক্ষ নয়, অধিক পরিমাণে আমাদের নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তি-সাপেক্ষ। আত্ম-শাসন-সম্বন্ধে লর্ড রীপন স্বয়ং এ কথা গোড়া হইতে বলিয়া আসিয়াছেন। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধেও আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে আমাদের নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রভূত পরিমাণে প্রয়োজন হইবে। অতএব লর্ড রীপনের অনুষ্ঠানের ফলাফল শুধু কাল-সাপেক্ষ নয়, আমাদের নিজেদেরও শক্তি-সাপেক্ষ। অতএব সে সকল অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে এখন ভালমন্দ কোন কথা বলা যাইতে পারে না, এবং ভবিষ্যতে সে সকল অনুষ্ঠান যদি সুসিদ্ধ বা সুফলপ্রদ না হয়, তাহা হইলে তখন দেখিতে হইবে যে আমাদের নিজের দোষে ফল ভাল হইল কি না—শুধু লর্ড রীপনকে দোষ দিলে চলিবে না।

অতএব লর্ড রীপনের অনুষ্ঠিত প্রধান প্রধান কার্য-গুলির ফলাফল বিচার করিয়া তাঁহার দোষগুণ-বিচার আপাতত অসম্ভব এবং অসঙ্গত বলিয়া আমার বোধ হয়। কিন্তু সেই জন্যই তাঁহার অনুকূলে একটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। তাঁহার প্রধান অনুষ্ঠানগুলির সিদ্ধি বা সফলতা আমাদের নিজের শক্তি এবং প্রবৃত্তি-সাপেক্ষ,—এ কথার অর্থ এই যে তাঁহার শাসনপ্রণালী প্রজাশক্তিমূলক—শুধু রাজশক্তি-মূলক নয় এবং তাঁহার শাসনপ্রণালী প্রজাশক্তিমূলক—এ কথার অর্থ এই যে, তিনি শক্তিহীন প্রজাকে শক্তিশালী করিতে চাহেন, প্রজাকে শুধু শাসনের পাত্র না করিয়া শাসনকর্তা করিতে চাহেন, শুধু বিজয়ী রাজাকে রাজা না রাখিয়া বিজিত প্রজাকেও রাজা করিতে চাহেন। তিনি ঘৃণিত প্রজাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া রাজার পার্শ্বে বসাইয়া রাজা এবং প্রজা উভয়কে লইয়া একটি সরীকি-কারখানা বা জয়েণ্ট স্টক্ কোম্পানি করিতে চাহেন। তাঁহার শাসন-প্রণালী বড় উচ্চ দরের। প্রজার শক্তিই প্রকৃত রাজশক্তি। লর্ড রীপন সেই প্রজা-শক্তির উপর তাঁহার শাসন-প্রণালী স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মহত্ত্বের এবং রাজশক্তির অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। এখন প্রজা-শক্তির অভাবে যদি তাঁহার প্রণালী সুফলপ্রদ না হয়, দোষ তাঁহার হইবে না—প্রজারই হইবে।

কিন্তু লর্ড রীপনের অনুষ্ঠানের ফলাফল কাল-সাপেক্ষ হইলেও তাহার মধ্যে দুই-একটি-সম্বন্ধে আপাতত কিছু বলা যাইতে পারে। প্রেস আইন উঠাইবার বিষয় বা রমেশ-বাবুকে প্রধান বিচারপতি করার বিষয় আমি এ স্থলে কিছু বলিব না। ওরূপ কার্যের ফলাফল কিছু সংকীর্ণ—সমাজ-ব্যাপী নয় এবং প্রায়ই উচ্চশ্রেণীসংবদ্ধ হইয়া থাকে। আমি তাঁহার লবণশুল্ক কমাইবার বিষয়, খাসমহল-বন্দোবস্তের বিষয় এবং আত্মশাসন-প্রণালীর বিষয় কিছু বলিব।

যাঁহারা ধনী, দ্বিতল-ত্রিতল গৃহে বাস করেন, যাঁহাদের জমিদারির আয় প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা, জগতে দীন-দুঃখী আছে বলিয়া যাঁহাদের জ্ঞান নাই বলিলেও হয় এবং যাঁহারা জমিদার না হইয়াও আপনাদিগকে জমিদার-শ্রেণীভুক্ত জ্ঞান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন না,

তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, লবণের শুল্ক কমাইয়া এ দেশে লবণ সস্তা করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, এবং লর্ড রীপন লবণের শুল্ক কমাইয়া লবণ সস্তা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে (sentimental, visionary) ভাবপ্রবণ প্রভৃতি উপাধিতে উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিজের ঘরে প্রতিদিন ষোড়শোপচারে ভোজনের আয়োজন হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের অদৃষ্টগুণেই হউক আর অদৃষ্টদোষেই হউক তাঁহাদের জঠরানলও বড় প্রবল নয়; অতএব বিনা আয়াসেই তাঁহাদের ক্ষুধার শান্তি হয়। তাই তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে সকলেই তাঁহাদের ন্যায় বিনা আয়াসে ক্ষুধার শান্তি করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা নহে। বঙ্গের কোটি কোটি লোক যথার্থই লবণের কাঙ্গাল। একটি গল্প বলি।

কয় মাস হইল একদিন সন্ধ্যার সময় আমি কলিকাতার একটি গলি রাস্তায় ধীরে ধীরে বেড়াইতেছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে এক মুদির দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন নিম্ন শ্রেণীস্থ এক দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া মুদিকে একটি পয়সা দিয়া দুই-একটি কথার উপর একটু জোর দিয়া বলিল—'ভাল করিয়া একপয়সার নুণ দেও দেখি, নুণ সস্তা হইয়াছে।' গরীব যে রকম করিয়া এই কয়টি কথা বলিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে কিছু জোরে ঘা দিয়া জানাইয়া দিল যে, সে যথার্থই লুণের কাঙ্গাল, লুণ সস্তা হওয়ায় আহ্লাদে আটখানা হইয়াছে; জমিদারবাবুরা ত্রিশ হাজার টাকায় তিন লক্ষ টাকার একখানা জমিদারি পাইলে যেমন আহ্লাদে আটখানা হন, তেমনি আহ্লাদে আটখানা হইয়াছে। তখন ভাবিলাম যে, এ দেশে এই গরীবের ন্যায়, এবং ইহার অপেক্ষাও কত লক্ষ লক্ষ গরীব আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের জঠরানল বড়ই প্রবল, এক এক রাশি ভাত না খাইলে সে অনল নিবে না, কিন্তু তত ভাত খাইবার ব্যঞ্জন তাহারা পায় না, তাই তাহারা যথার্থই লুণের কাঙ্গাল, আর তাই বুঝি লুণ সস্তা দেখিয়া এই গরীবের মতন লক্ষ লক্ষ গরীব আজ আহ্লাদে আটখানা হইয়াছে।* তাহারা হয়ত জানে না কোন্ দীনবন্ধু তাহাদের লুণ সস্তা করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি'

* The total quantity of salt sold within the law limits in the saliferous districts of Midnapore, Howrah, the 24-Pergunnahs, Khulna, Backergunge, Chittagong, Noakholly, Cuttack and Balasore, rose from 9,67,083 to 9,99,653 maunds, showing a net increase of 32,570 maunds or 3·3 per cent. Consumption increased in all districts except Backergunge. In Midnapore and Khulna the advance was slight. In Howrah however it amounted to 4·3 per cent. on the previous year's consumption, in the 24-Pergunnahs to 3·1 per cent., in Chittagong to 6·9 per cent., in Noakholly to 4·6 per cent., in Cuttack to 4·6 per cent, and in Balasore to 5 per cent. The reduction of the salt duty is alleged everywhere to have contributed in part to the increase, while as special causes tending to stimulate consumption, an influx of labourers for employment on local works has been mentioned in the 24-Pergunnahs, Khulna and Balasore, increased vigilance on the part of the police in Howrah, Chittagong and Cuttack, the prosperous condition of the agricultural classes in Chittagong, and increase of population in Noakholly. The decrease in consumption in Backergunge is ascribed to large stocks having been in the hands of the dealers at the beginning of the year, to the prices having been kept high by the dealers for a considerable period, and to the diversion of the trade of some of the marts within salt limits to places outside them. There is no good reason to suspect the prevalence of illicit manufacture to any appreciable extent in the district.—*Bengal Administrations Report*, 1882-83, *pp.* 446-7.

জানিয়া আমাদের দীনদুঃখীর লুণ যিনি সস্তা করিয়াছেন সেই দীনবন্ধু রীপনকে কি আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করিব না? যিনি ধনী বা জমিদার, যিনি ত্রিতল বিলাস-ভবনে একটা বাতায়ন খুলিয়াও কখন কাঙ্গালের ভগ্ন কুটীরের দিকে একবার চাহিয়া দেখেন না, তিনি এ কৃতজ্ঞতার অর্থ বুঝিবেন না। আমরা দীনদুঃখী না হই, দরিদ্র বটে। আমরা দীনবন্ধু রীপনের কাছে যথার্থই কৃতজ্ঞ। তাঁহার ন্যায় দীনবন্ধু ইংরাজ রাজপুরুষ ভারতে কখনও আসেন নাই।

তাঁহার খাসমহল বন্দোবস্তের নিয়মেও তাঁহাকে সেই দীনবন্ধু মূর্তিতে দেখিতে পাই। ত্রিশ বৎসর অন্তর খাসমহলের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। প্রতি বন্দোবস্তের সময় মহলের সমস্ত প্রজার সমস্ত জমি জরিপ করা হয় এবং ইচ্ছামত সমস্ত জমির খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। এই জরিপ এবং খাজনা-বৃদ্ধি উভয় কার্যই প্রজার পক্ষে অতিশয় অশুভের কারণ। খাসমহলের প্রজা এই দুই কার্যের দ্বারা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইয়া থাকে। দীনবন্ধু রীপন অসংখ্য দীনদুঃখীকে সেই পীড়ন হইতে উদ্ধারার্থ বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া গেলেন। তিনি এই নিয়ম করিয়া গেলেন যে দুই-একটি নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বন্দোবস্তের সময় গভর্নমেণ্ট প্রজার জমি জরিপ বা খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই নিয়মে যদি গভর্নমেণ্ট কার্য করেন, তবে খাসমহলের লক্ষ লক্ষ দীনদুঃখী প্রজা যথার্থ ই অনেক দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এ জন্যও বলি যে রিপনের ন্যায় দীনবন্ধু রাজপুরুষ ভারতে আর কখনও আসেন নাই। এমন দীনবন্ধুকে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দিব না?

আত্মশাসন প্রণালীতে রীপনকে কেবল দীনবন্ধু মূর্তিতে দেখি না—ভারত-সমাজের জীবন-সঞ্চারক মূর্তিতেও দেখি। আত্মশাসন প্রণালীর ফলাফল কালসাপেক্ষ—সে প্রণালী সিদ্ধি লাভ করিবে কিনা, সুফল প্রসব করিবে, কি কুফল প্রসব করিবে, এখন বলা যাইতে পারে না। একথা পূর্বে বুঝাইয়াছি। কিন্তু ঐ প্রণালী-অনুসারে আপাতত যে নির্বাচন কার্য হইয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে মনে বড় আশা এবং উৎসাহ জন্মিয়াছে। গত ২৫শে এবং ২৯শে নভেম্বর বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যায় কমিশনর নির্বাচন লইয়া যে তোলপাড় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে তাহার অর্থ বড় গুরুতর। তাহাতে তীব্র রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, বিবাদ-বিসংবাদ, মারামারি, হুড়াহুড়ি প্রভৃত পরিমাণে দেখা গিয়াছে। তাহাতে ধনী এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তি হইতে মুটে মজুর দোকানি পশারিকে পর্যন্ত মহা শশব্যস্ত, মহা উৎসাহিত, মহা রিষারিষিভাবে উত্তেজিত হইতে দেখা গিয়াছে। নির্জীব নিশ্চেষ্ট নিস্পন্দ নিস্তব্ধ নির্বিকার দেশীয় সমাজে এই দৃশ্য যথার্থ ই নূতন, যথার্থ ই আশাপ্রদ, যথার্থ ই জীবন-লক্ষণ-যুক্ত। এই দৃশ্য দেখিয়া বোধ হইয়াছে যেন মহীপাল দীঘির যে ঘনদামাবৃত নিদ্রিত জলরাশির উপর দিয়া অসংখ্য গো-মহিষ-আদি চলিয়া গেলেও মুহূর্তকালের জন্যও জলরাশির চৈতন্য হয় না, সেই জলরাশিতে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে। রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, দলাদলি, মারামারি দেখিয়া ভয় পাইও না অথবা আত্মশাসন প্রণালীর দোষ দিও না। রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, দলাদলি, মারামারি মন্দ জিনিস নয়, ভাল জিনিস। যেখানে সমাজ জীবিত সেইখানেই সমাজে রিষারিষি, দলাদলি, মারামারি। যেখানে সমাজ মৃত বা নির্জীব, সেখানে ওসব কিছুই নাই। যখন হিন্দু সমাজ জীবিত ছিল তখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে কত বিবাদই হইয়া গিয়াছে। এখন হিন্দু সমাজ নির্জীব ; এখন কোন বিবাদই নাই। অতএব দলাদলি মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি ভাল জিনিস, কেন-না সজীবতার ফল। নির্জীব নিস্পন্দ নির্বিকার দেশীয় সমাজে এত দিনের পর তরঙ্গ দেখিলাম —জীবনসঞ্চার দেখিলাম—দলাদলি মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি দেখিলাম। লর্ড রীপনের আত্মশাসন প্রণালীর গুণে এই তরঙ্গ যদি বাড়িয়া উঠে, এই জীবনসঞ্চার যদি গাঢ় হইয়া যায়, এই দলাদলি মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি যদি তীব্রতর হইয়া উঠে, তবে নিশ্চয়ই এ দেশের সমাজ—কর্ম এবং উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইবে। রীপন মরা গাঙ্গে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। স্রোত-বিনা ডিঙ্গি চলে না। এখন আমাদের সমাজ-ডিঙ্গি চলিবে বলিয়া আশা হইতেছে। রীপন যথার্থই ভারত-সমাজের জীবন-সঞ্চারক মহাপুরুষ। রীপনের ন্যায় ভারতবন্ধু ইউরোপ হইতে আর কখনও এদেশে আসেন

নাই। রীপনকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে পূজা করিব না ত করিব কাহাকে?

মনে কর যাহা বলিলাম সবই ভুল—মনে কর রীপন আমাদের কোন উপকারই করেন নাই। তথাপি একটি কথা আছে। যে উপকার করে তাহাকেই কি পূজা করিতে হয়, তাহারই কি প্রশংসা করিতে হয়? রামচন্দ্রের কোন্ রাজকার্যের দ্বারা তোমার আমার কি উপকার হইয়াছে? কিন্তু আমরা ত রাম-চরিত পূজা করি। উপকারের পরিমাণে পূজা বা প্রশংসা—এ জঘন্য নীতি ভারতে ত কখন ছিল না। আর প্রকৃত কথাও এই যে, যে যথার্থ মানুষ সে ত উপকার বা কৃতকার্য দেখিয়া পূজা বা প্রশংসা করে না। প্রকৃত মানুষ যেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখে সেইখানেই পূজা করে, প্রশংসা করে—উপকারের হিসাব রাখে না। লর্ড রীপনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখিয়াছি। লর্ড রীপন বিদেশীয়—ইংরাজ—বিজয়ী জাতির একজন। বিজিত জাতির প্রতি বিজয়ী জাতির কিরূপ ভাব এবং আচরণ হইয়া থাকে, ইতিহাসে তাহা অনেক দিন হইতে দেখিতেছি। বিজিত জাতির উপর বিজয়ী জাতিকে অত্যাচার করিতে দেখিলে, অথবা বিজয়ী জাতিকে বিজিতদিগকে পশুবৎ ঘৃণা করিতে দেখিলে আমরা বিজয়ী জাতিকে নিন্দা করি বটে, কিন্তু আমরা যদি কোন ক্রমে বিজয়ী জাতি হইতে পারি তবে বিজিত জাতিকে যে বিজয়ী জাতির রীতি-অনুসারে ব্যবহার করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। অনেক ইংরাজ রাজপুরুষকে ত আমরা বিজয়ি-বিজিতের মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করার বিরুদ্ধে কহিতে বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু কাজের বেলা কেহই ত সে প্রভেদ নষ্ট করিতে প্রয়াস পান নাই। লর্ড রীপন সেই প্রভেদ নষ্ট করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্তনে, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্রকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগে, রুড়কি রিজোলিউসনে এবং ইলবর্ট বিলে তাঁহার সেই প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সব কথা ছাড়িয়া কেবল ইলবর্টবিল-সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিব। কিন্তু ইলবর্টবিলে লর্ড রীপনের যে অলৌকিক মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের দিক্ হইতে বুঝিলে চলিবে না, বিজয়ী ইংরাজের দিক্ হইতে বুঝিতে হইবে। ইংরাজের দিক্ হইতে এইরূপ বুঝা যায়। আজ এক শত পঁচিশ বৎসরের অধিক হইল ভারতে ইংরাজ-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজের রাজ্য-স্থাপনের তারিখ হইতেই ইংরাজ—ভারতের ইংরাজ এবং ভারতবাসী দুইজনকে তুল্য জ্ঞান করিবেন এবং তুল্য ব্যবহার করিবেন অর্থাৎ বিজয়ী এবং বিজিত দুইজনকেই সমান জ্ঞান এবং সমান ব্যবহার করিবেন, এই কথা বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু মুখে বলিলে কি হয়, আইনের গৌরচন্দ্রিকায় লিখিয়া দিলে কি হয়, কাজে তিনি তাহা বড়-একটা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই এই এক শত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার ভারতবর্ষীয় বিধি-বহিতে বিজয়ি-বিজিতের প্রভেদরূপ বিজয়ীর কলঙ্ক সমস্ত সভ্য জগৎ দেখিয়া আসিয়াছে; এবং সেইজন্য এই এক শত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সমস্ত সভ্য জগৎ তাঁহাকে অতি-অমানুষ বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে। ইংলণ্ডে এত রাজারানী হইল, এত পিট্, বার্ক, পীল, ব্রাইট্, গ্লাড্স্টোন হইল, ভারতে এত কর্নওয়ালিস্, বেণ্টিঙ্ক, ক্যানিং, মেয়ো রহিল—সকলেই বলিলেন, না, এ বিধি আমাদের জাতির কলঙ্কের কারণ, এ বিধি থাকা উচিত নয়, কিন্তু কেহই ত এ বিধি উঠাইলেন না। অবশেষে লর্ড রীপন এ বিধি উঠাইলেন—এ গাঢ় কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিলেন। বিজয়ী এতদিনের পর বিজয়ীর বিষম ভাব বিস্মৃত হইয়া বিজিতকে বিজয়ীর তুল্য বলিয়া সম্মান করিল—পশুকে মানুষের আসনে বসাইল—এবং শত সভ্যজাতির কাছে বিজয়ীর মুখ উজ্জ্বল করিল। বল দেখি, যদি ইংরাজ না হইয়া বাঙ্গালি আজ বিজয়ী জাতি হইত এবং রীপন বাঙ্গালি হইয়া যদি বিজয়ী এবং অপর কোন বিজিত জাতির মধ্যে প্রভেদ-বিধিরূপ কলঙ্ক মুছিয়া সভ্যজগতের সম্মুখে বাঙ্গালি জাতির মুখ উজ্জ্বল করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালির মধ্যে আজ রীপন কতবড় লোক, বাঙ্গালি জাতির আজ রীপন কত শ্লাঘা ও স্পর্দ্ধার জিনিস? বিজয়ী হইয়া—বিশেষ বিজয়ী ইংরাজ হইয়া—লর্ড রীপন যে কাজ করিলেন, বহুশতাব্দীতেও কেহ সে কাজ করিতে পারে না। বিজয়ীর দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে রীপনের মহত্ত্ব

এবং মনুষ্যত্ব যথার্থই অসাধারণ এবং অলৌকিক। সে মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্ব দেবত্বের কাছে-কাছে যায়। বিজয়ী ইংরাজ দোকানদার হয়ত তাই এ মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্বের অর্থ বুঝে না।

আবার এই ইলবর্টবিল পাস করিতে রীপন কি অপরূপ মাহাত্ম্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে এ দেশে ইংরাজের যেরূপ প্রাধান্য এবং স্থানীয় গভর্নমেণ্ট শুদ্ধ এ্যংলোইণ্ডিয়ানের যেরূপ সহায় তাহাতে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ আইন পাস করিলে এ্যংলোইণ্ডিয়ান ও ভারতবাসীর মধ্যে আকুণ্ডকুণ্ড বাধিয়া উঠিবে এবং মফস্বলে ভীরু ভারতবাসীর ধন প্রাণ এবং ধর্ম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এই বিশ্বাসে তিনি আপনার খ্যাতি-অখ্যাতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া শুধু ন্যায়-পালনার্থ এবং ভারতবাসীর মঙ্গলার্থ ইলবর্টবিল পরিবর্তিত আকারে প্রচার করিলেন। আর কেহ হইলে নিজের অপযশের ভয়ে বোধ হয় তখন পদত্যাগ করিয়া ফেলিতেন। রীপনের কাছে 'আত্ম' নাই—ভারতবাসীই সব। এ রীপন কি দেবতুল্য নহেন? আবার এই বিল লইয়া বৎসরাধিককাল ধরিয়া রীপন এ্যংলো-ইণ্ডিয়ানের কাছে কতই নিন্দিত, কতই অপমানিত না হইয়াছেন। কিন্তু রীপনের মুখে এ পর্যন্ত কখনও কি এ্যংলোইণ্ডিয়ানের উপর রাগের বা ঘৃণার কথা শুনিয়াছ? বিশাল কার্যক্ষেত্রে রীপন প্রথম আমাদিগকে প্রকৃত খৃস্টান চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। খৃস্টান কাহাকে বলে পুস্তকে পড়িয়াছি—বিশাল কর্মক্ষেত্রে আজ রীপনে প্রথম দেখিলাম। এ চরিত্র যাঁহার, তিনি জগতের একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ মনুষ্য। এ রকম আদর্শ-চরিত্র যে আমাদিগকে দেখাইল, সে আমাদিগকে না দিল কি? স্বাধীন প্রেস, প্রধান-বিচার-পতিত্ব, আত্ম-শাসন ইত্যাদি সবই দুই দিনের জন্য—আদর্শ-চরিত্র অনন্তকালের জন্য। সেই আদর্শ-চরিত্র রীপন দেখাইয়াছেন। তাই ফলাফল-তুচ্ছকারী মহত্ত্বপ্রিয় মহান্ হিন্দুর কাছে রীপন আজ দেবোপম পুরুষ—দেবপূজায় পূজিত। এ পূজা শুধু রীপনের পূজা নয়, হিন্দুরও পূজা। ফলাফল-বিচারক, উপকারাপকার-গণনকারী ম্লেচ্ছ বা ম্লেচ্ছবৎ পতিত হিন্দু এ পূজার অর্থ বুঝিবে না।

আর একটি বড় কথা, দুই কথায় বলি। ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী যে রকম প্রাচীন, গম্ভীর-স্বভাব, বিজ্ঞ, পবিত্রমনা, ধার্মিক এবং ধর্মপ্রিয়, তাহাতে প্রবীণ, গম্ভীর-স্বভাব, বিজ্ঞ, পবিত্রমনা, ধার্মিক এবং ধর্মপ্রিয় রীপন ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর উপযুক্ত শাসনকর্তা বটেন। রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত না হইলেও, কিন্তু যত ইংরাজ রাজপুরুষ এ দেশে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল তিনিই সেই সিংহাসনের পাদমূলে বসিয়া ভারত শাসন করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। এই জন্যই ভারতবাসী তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে; যোগ্যে যোগ্যে মিলন না হই কি প্রীতির উচ্ছ্বাস হয়!

নবজীবন ১ম ভাগ — পৌষ ১২৯১

হিমালয় বনভূমি

দার্জিলিং

গোড়াতেই বিড়ম্বনা দেখুন, ভট্টাচার্য মহাশয়ই ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার আমাদের দার্জিলিং যাত্রার দিন ভাল বলিয়া স্থির করিয়া দেন, কিন্তু ২৩শে আসিয়া তিনিই বলিলেন, 'আমার খুড়া মহাশয় আসিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন যে ২৭শে মঙ্গলবার গঙ্গাস্নানের মহা যোগ, তাহার পূর্বে তুমি বাবুকে তাড়াইয়া দিতেছ কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া তুমি গঙ্গার মাহাত্ম্য ভুলিয়া যাইতেছ।' আমি কথাটা শুনিয়া একটু হাসিলাম, মনে মনে ভাবিলাম, যখন হিমালয়-সন্দর্শনে যাইতেছি, তখন হিমালয়-কন্যা গঙ্গা, তাহাতে আমার উপর সন্তুষ্ট ব্যতীত কখনই রুষ্ট হইবেন না। এ পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক 'তোমার বাপের বাড়ী যাইতেছি' বলাতে আহ্লাদিত হন নাই, এমন কখন শুনি নাই, দেখি নাই—তা কি, অর্ধাঙ্গিনী পত্নী, দেব-সদৃশা মাতা, আর কি পাড়া-প্রতিবেশী মামী-মাসী। হউন না কেন গঙ্গা দেবতা—স্ত্রীলোক ত বটেন, আমি এ বয়সে এত কষ্ট করিয়া, অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার পিতৃ-সন্দর্শনে যাইব, আর তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন,—তা কখনও হইবে না, মঙ্গলবারের স্নানের পুণ্য অবশ্যই পাইব। আমার

মনের খুঁৎখুতুনি চলিয়া গেল; কিন্তু ভট্টাচার্য মহাশয়কে এ কথা ভাঙ্গিলাম না; তিনি অগাধ শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও, আমার শাস্ত্র তাঁহার ত পড়া নাই।

বুড়ো যাবে হিমালয়, সঙ্গে যাবে কে?
আরও দুটো বুড়ো আছে, কোমর বেঁধেছে।

পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত ডিস্‌ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত শ্যামচাঁধ ধর এবং কলের সাহেবদের কার্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত কালীকুমার সেন, আমার দুই বাল্যকালের বন্ধু আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত; শ্যামের দুই পুত্র আমাদের পূর্বেই যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং পৌঁছিয়া আমাদের খবরাখবর দিতেছিলেন, আমার কনিষ্ঠ পুত্র অচ্যুতচন্দ্র আমার সঙ্গেই চলিলেন; রবিবার পূর্বাহ্ণে আমরা পিতাপুত্রে আহারাদি করিয়া তল্‌পি-তোব্‌ড়া লইয়া শ্যাম-সদনে উপস্থিত, কালীকুমারও সেই স্থানে আছেন; তবে তাঁহারা তখনও দোমনা। আমি তাঁহাদের একমনা করিয়া দিলাম, তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন; তাঁহারা বলেন, আমার স্ফূর্তি দেখিয়াই তাঁহাদের মতি স্থির হইল। দুই প্রহরের পর আমরা কলিকাতা রওনা হইলাম। সেখানে ৩ ঘণ্টা সময় পাওয়া গেল, অচ্যুতচন্দ্র এটা-ওটা ক্রয় করিয়া লইলেন; আমি কিছু জল-খাবার তৈয়ার করাইয়া লইলাম। শ্যামবাবু, কালীবাবুর সঙ্গে জলখাবার ছিল; আম আমাদের সকলেরই সঙ্গে ছিল।

রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় দার্জিলিং মেলে একটি কামরায় আমরা ৪ জন আর একজন অপরিচিত লইয়া ৫জন আরোহী, গড়্ গড়্ চলিয়াছি। নদে জেলার ভিতর দিয়া যখন যাইতেছি, তখনও পার্শ্বের ক্ষেত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—ছোট ছোট পাটের চারা হইয়াছে; আউশ ধান কোথাও এক ছটাক আবাদ হয় নাই। পাটের ও ধানের তুলনা চলিল। ধান্য—লক্ষ্মী; পাট—মুদ্রা। আমরা মুদ্রা অপেক্ষা লক্ষ্মীর গৌরব গান করিতে লাগিলাম। রেলগাড়ি আমাদের উপহাস করিয়া গর্জন করিতে করিতে পদ্মা-অভিমুখে ছুটিল।

বিপদে পড়িয়া যে হাসিমুখে কষ্ট সহ্য করিতে পারে, অবসন্ন হয় না,—সে ত মহাশয় ব্যক্তি। যে বাল্যে-কৈশোরে, গুরূপদেশে কষ্ট, কঠোরতা, সংযম শিক্ষা করে, সে বয়স্‌কালে, হইবে মহাশয়; কিন্তু এই বুড়ো বয়সে, এই যে আমরা সক করিয়া কষ্টভোগ করিতেছি—আমরা কি? এই যে কয়েদীর মত কঠিন কাষ্ঠাসনে, পাঁচজনে বসিয়া আছি—এ কষ্ট নয়ত কি? কষ্ট বটে—তা ধরি আর নাই ধরি—গায়ে মাখি আর নাই মাখি। সক করিয়া এইরূপ কষ্ট সহ্য করা কেন? ইহাকে কি বলিব? পাগলামি নয় কি? পাগলামি বটে, তবে পাগলের সংখ্যা বেশি হইলে পাগলামির নাম বদল হয়। দেবতার পাগলামি—লীলা; বালকের পাগলামি—খেলা। মানুষ-মারায় হয়—বাহাদুরি। প্রজা-পীড়নে হয়—জমিন্দারি। ব্যবসাদারিতে হয়—রাজগিরি। বক্তৃতায় হয়—দেশোদ্ধার, বাজি ফুটায়ে—রাজ্যোদ্ধার। ধনীর পাগলামি—উদারতা, মধ্যবিত্তের পাগলামি—লৌকিকতা। বিজ্ঞের পাগলামি—জাতীয় সমিতি; অজ্ঞের পাগলামি—বিজাতীয় অনুকরণ। আমাদের মত পাগল বিস্তর—কাজেই আমাদের পাগলামির নাম—স্বাস্থ্য-সন্ধান। রেলগাড়ির হেঁচকা টানে হাড়চূর্ণ হইতে লাগিল—আমরা স্বাস্থ্য-সন্ধানে চলিয়াছি।—সে বেশ!

রাত্রি ৯টার সময় ঝক্‌ঝকে ইলেকট্রিক আলোতে, স্টীমারের উপর ডেকের ধূলার উপর চাপড়ুলি খাইয়া বসিয়া আমরা—বেশ ধীরে সুস্থে পদ্মা পার হইতেছি। তরঙ্গভঙ্গ নাই—স্টীমারের ঝাঁকানি নাই, পদ্মার গর্জন নাই, কোন বালাই নাই—টাইম্‌টেবিলে লেখা না থাকিলে, কিসে বুঝিতাম যে পদ্মা পার হইতেছি। কিন্তু বাস্তবিক আমরা পদ্মা পার হইলাম, অথচ পদ্মা দেখিতে পাই নাই।

পদ্মা-পারে ছোট গাড়ি। বড় ভয় বড় ভীড় হইবে। তাহা কিন্তু হইল না। আমরা ৪ জন একরূপ গুছাইয়া লইলাম। কিন্তু এইখানে একবার গাওনা বন্ধ হইয়া সঙের পালা আরম্ভ হইল। বাঙ্কে এক বর্ষীয়ান্ বাবুর কি একটা জামা ঝোলানো ছিল, কালীবাবু তাই সরাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন, 'এটা কি তোমার জামা?' আর যাবি কোথা? বাবু একেবারে উস্তং পুস্তং মহারাগ—রাগের উপর বক্তৃতা। কালীবাবু হয় চুপ করিয়া থাকিতে বা একটু বিনয় দেখাইতে পারিতেন, তা না করিয়া জবাব

দিলেন, 'তাতে হয়েছে কি ?' সঙের পালা চলিল, কয়জন হিন্দুস্থানী আরোহী ছিলেন, তাঁহারা কিন্তু একটা কথা বলিয়া পালা ভাঙ্গিয়া দিলেন। বলিলেন, 'বাবু সাহেব! স্বদেশীর দিনে এমন করিতে নাই।' স্বদেশীর জয় হইল ও পালা একরূপ বন্ধ হইল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

একঘণ্টা পরে নাটোরে পৌঁছিল। আমি জানিতাম নাটোরের সন্দেশ ভাল। এত বয়স্ হইল, কিন্তু কোথায় কোন্ জিনিস ভাল পাওয়া যায় সেটি আমার মুখস্থ আছে। মানকরে কদ্‌মা, মোকামায় মাখন—এ সকল এখনও ভুলি নাই। অচ্যুতকে বলিলাম নাটোরের সন্দেশ কিনিতে, তাহা জলযোগ হইল।

বড় গ্রীষ্ম, আমরা সকলেই জানালাগুলি খুলিয়া দিয়াছিলাম, আমি কেবল আমার মাথার কাছের দুইটি বন্ধ করিয়াছিলাম। ঘুমাইয়া পড়িয়াছি—ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি মহা ঝড়বৃষ্টি চলিতেছে, ঘরগুলি সমস্ত বিষম ঠাণ্ডা হইয়াছে; আমাকে একটু সর্দি লাগিয়াছে। সকলেই জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। আবার নিদ্রা—নিদ্রাভঙ্গে দেখা গেল ভোর হইয়াছে। একটু বেলা হইলে আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছিলাম। এ রেল শেষ হইল।

শিলিগুড়ি হইতে অতি ছোট রেল। বড় বড় মালপত্র আমরা প্রথম হইতেই ব্রেকে দিয়াছিলাম—সঙ্গে অল্পস্বল্প ছিল, তাহা নাকি কাড়িয়া লইবে; তাহা কিন্তু হইল না, আমরা একরূপ স্বচ্ছন্দেই বসিলাম। শিলিগুড়ি হইতে শুক্‌না; এইখান হইতে প্রকৃত হিমালয় আরম্ভ হইল; বিরাট্ ব্যাপার—বিরাট্ বন—কিরূপে বর্ণনা করিব বুঝিতে পারিতেছি না।

সে গোচারণের মাঠ আর নাই।

অমল শ্যামল তৃণে ঢাকা ধরাতল,
বহুদূর ভরপূর সবুজ কেবল;

তাহাও আর নাই। তিউর বা পরেশনাথও আর নাই

পাহাড়ীর ঢালু গায় চরে গাভীদল—
সে সকল কিছুই নাই। *

হিমালয় প্রদেশের বনভূমি—গাছ-পালা, লতা-পাতার সমুদ্র,—লিখিতে যাইতেছিলাম, সমুদ্র যে সমধরাতল,—গাছ-পালা, লতা-পাতার অনন্ত বিচিত্র জটিল সংঘটন। সমুদ্র দেখিলে অনন্তের আভাস পাওয়া যায়; সুনীল আকাশেও অনন্ত—অনন্ত কোমলতা; নক্ষত্রপুঞ্জ-খচিত পরিষ্কার আকাশেও অনন্ত—অনন্ত সুন্দর—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত গভীরা ত্রিযামার মসীময়ী ঘোর বিকট শব্দে শব্দায়মানা নভঃস্থলীতেও অনন্ত—সে অনন্ত কে যেন আর একরূপ বিরাট্‌তর অনন্তে সান্ত করিয়া রাখিয়াছে; হিমালয় প্রদেশের বনভূমি সেইরূপ—যেন মহান্ অনন্তদেবের বিরাট্ মায়াময় খেলাঘর। এমন খেলা বুঝি আর কোথাও নাই!—বিশাল ক্ষুদ্রকে আশ্রয় দিয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছে, মাথায় তুলিয়াছে। কত শত বিশাল শাল্মলী তরুর পাদদেশে সহস্র আয়ত চক্ষু মেলিয়া ধুস্তুরা চাহিয়া আছে, বন্যলতা পুঞ্জীকৃত পাতা লইয়া শাল্মলীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া আছে; আর বন্য বেগ্‌নোলিয়া রাশি রাশি লাল ফুল বিছাইয়া শাল্মলীর কাঁধে চড়িয়া মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে। উৎকটে কোমলে, বিশালে সুন্দরে—কি অপূর্ব মাখামাখি!

এমন বিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলাও আর কোথাও দেখি নাই। বিশৃঙ্খলা বলিব, কি শৃঙ্খলাপূর্ণ বলিব,—তাহা বুঝিতেই পারি না। সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে বৈচিত্র্য; আকাশে বায়ুভরে বৈচিত্র্য—এই একরূপ, আবার পরক্ষণেই অন্যরূপ। বনভূমির বৈচিত্র্য অন্যরূপ। ছোট-বড় বৃক্ষ—সূক্ষ্ম-স্থূল লতা পদে, উরুতে, কটিদেশে, বক্ষে, বাহুতে, স্কন্ধে জড়াইয়া লইয়া,—নিচল, নিথর, অনড়, অসাড় দাঁড়াইয়া আছে। নাই-বা থাকিল—পবন-বেগ, নাই-বা থাকিল চলৎ-মেঘ, আপনাদের গাম্ভীর্যে, স্থৈর্যে, সৌন্দর্যে, মাধুর্যে আপনারা ভোর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—এই এক বৈচিত্র্য। দাঁড়াইয়া আছে—কোথায়? পর্বতের শিরোদেশে, স্কন্ধে, সানুদেশে, অধিত্যকায়, উপত্যকায়, গুহায়, গহ্বরে, খালে, জোলে, পাতালে। সর্বত্রই উদ্ভিদ-সৌন্দর্য, সর্বত্রই বনস্পতির রাজ্য। যিনি বনপতি না বলিয়া, বনস্পতি বলিতে ব্যাকরণের ছলনায় উপদেশ দিয়াছেন,—তিনি ধন্য—তিনি সত্য সত্যই এই বনস্পতিগণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। হসন্ত দন্ত্যসয়ে কি অদ্ভুত মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে।

* এই তিন ছত্র 'গোচারণের মাঠ' হইতে উদ্ধৃত।

এই বনস্থলীতে কায়ব্যূহময়ী বিভীষিকা, কায়ব্যূহময় সৌন্দর্যকে গাঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়া রাখিয়াছে, যেন অর্ধ নারীশ্বর। সুন্দরে চিত্তবিনোদন হয়, বিভীষিকায় সন্ত্রাস জন্মে, কিন্তু সুন্দর-বিকটের বিচিত্র সম্মিলনে হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ হয়।

তুমি-আমি সকলেই সরলের প্রশংসা করি, সরলতা ভালভাসি। ভালবাসি সরলা কামিনীর রূপ, অদন্ত শিশুর মধুর হাসি, ফুলের সুগন্ধ, ফলের মিষ্ঠতা; ভালবাসি প্রেমের অশ্রু, দয়ার দ্রাবকতা; ভালবাসি সরলের সরলতা। এই বনভূমিতে বনস্পতিমণ্ডলীর বিলাস-লীলা কিন্তু বড়ই জটিলতাময়ী। শাখায় শাখায়, শাখায় লতায়, লতায় লতায়—ক্ষুপেতে গুল্মেতে, লতায় পাতায় এমন জটিলভাবে জড়াজড়ি, তলভূমিতে এতই জঙ্গল যে সেই জটিলতায়, সেই জঙ্গলে হাতীর উপর হাতী, তাহার উপর হাতী থাকিলেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জটিল জঙ্গলময়ী বনভূমি দিনেই অসূর্যম্পশ্যরূপা, অন্ধকার নিশীথে কি বিভীষিকাময়ী—মনে করিতেও অঙ্গ কণ্টকিত হয়।

কিন্তু এখন এই যে গাড়ি চলিতেছে—আমরা নিস্পন্দ-ভাবে বনভূমি দেখিতেছি, এখন ইহা কি অপূর্ব শোভাই না ছড়াইতেছে! শ্রীভগবানের লীলা রহস্যময়ী; তিনি স্তন্য পান করিতে করিতে রাক্ষসী পূতনার বধ-সাধন করেন; তিনি নারীহস্ত-সেবিত কুসুম-চন্দনে শোভিত হইয়া কংস-দৈত্যের বিনাশ-সাধন করেন; তাঁহার শঙ্খনাদে বিশ্ব-পরিপূরিত, তাঁহার চক্রে বিশ্ব ঘূর্ণায়মান, তাঁহার গদায় সন্ত্রস্ত এবং তাঁহার পদ্মের সৌরভ পীযূষপানে সকলেই পুলকিত। ধন-ধান্যপূর্ণ শোভাময় রাজ্যও যেমন তাঁহার—এই ঘন-বিজন কানন, শাল্মলী, শাল, শিশু, চম্পক, কদম্ব, কোবিদার,—চিলানী, পানী, লীস্পতিয়া-পূর্ণ নিবিড় অরণ্যও তাঁহারই লীলাখেলার বিচিত্র বোটানিকাল গার্ডেন। বলিহারি ইহার বৈচিত্র্য, বলিহারি ইহার জটিলতা—বলিহারি সুন্দরে বিকট,—বিকটে সুন্দর। এই নিবিড় অরণ্যানী ভেদ করিয়া, পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া, ফিরিয়া ঘুরিয়া দার্জিলিং-হিমালয় রেলগাড়ি ছুটিয়াছে। ৺তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'দার্জিলিং প্রবাসীর পত্রে' বলিতেছেন, 'রেলগাড়ী আরোহী লইয়া গর্ভবতী ললনার মত হেলিয়া দুলিয়া মন্থর গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল।' এটি ১৮৭৫ সালের কথা—এখন এই ১৯০৮ সালে, ভূমিকর্ষণকারী আতসবাজীর মত—শোঁ শোঁ শব্দ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল। আর যদি কোন ললনার উপমা দেওয়াই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, আজিকালি কলিকাতায় যেমন ট্রাম গাড়ীর নীচে কিছু শব্দ হইলে ফিরিঙ্গী রমণী ঘাগরা গুটাইয়া, ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রামের বিপরীত দিকে বেগে ছুটিতে থাকেন, সেইরূপ ভাবেই ট্রেন চলিতে লাগিল।

বিশ্বপতির এই বিপুল, বিরাট্ বিশ্ব-কাননের মধ্য দিয়া, ক্ষুদ্র মানবও তাহার বেশ বাহাদুরি দেখাইয়াছে। গাড়ি ত নয় যেন বাজিকরের বাজি—এই ঘুরিতেছে, এই ফিরিতেছে, এই ধনুকের মত হইয়া চলিতেছে, এই তীরের মত ছুটিয়াছে, এই চাকার মত হইয়া ঘুরিয়া আসিল, এই পিপড়ার সারির মত পর্বত-গাত্রে আস্তে আস্তে উঠিতেছে—বাজিকরের বাজি ব্যতীত আর কি বলিব? মানুষ যে বড় বাজিকরের বেটা ছোট বাজিকর,—মানুষ তাহার প্রমাণ এইখানে একরূপ করিয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে গাড়ি এত ধার দিয়া দৌড়িতে থাকে যে মনে হয়, এইবার বুঝি মানুষের বাহাদুরি শেষ হইল, আমরা মারা পড়িলাম।

সোমবার প্রায় বেলা ১১টার সময় আমরা কর্শিয়ং স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। সমুদ্র-সমতল হইতে আমরা প্রায় ৫,০০০ ফুট উর্ধ্বে উঠিয়াছি। সেই দিনই আমাদের দার্জিলিং যাইবার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের পিতাপুত্রের তাহা হইল না। শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র পাঠক স্টেশনের কর্মচারী, স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আমার সুপরিচিত হইলেও আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। তিনি পরিচয় দিয়া আমাদের যত্ন-পূর্বক নামাইয়া লইলেন। বহুপূর্বে তাঁহার পিতা গোয়ালন্দে কর্ম করিতেন। ঢাকা যাতায়াতের অবসরে তাঁহার বাসায় দৌরাত্ম্য করিতাম, সুতরাং শরচ্চন্দ্রের বাসায় যাইতে কিছু কুণ্ঠা বোধ করিলাম না—বুঝিলাম, আতিথ্য-রোগ পুরুষ-পরম্পরা চলে। শ্যামবাবু কালীবাবু আমাদের ছাড়িতে নেহাইত নারাজ, তবে একেবারে বারণ করিতেও পারি-লেন না। তাঁহাদের গাড়ি ছাড়িয়া দিল, আমরা জিনিসপত্র

লইয়া শরচ্চন্দ্রের বাসার পার্শ্বে একটি খালি বাড়ীতে আসিলাম। শরতের সুন্দর আতিথ্যে স্নানাহারের পর নিদ্রা। দিবা-নিদ্রার পর শরীর ভার ভার, গলায় সর্দি হইল; প্রায়শ্চিত্ত করিতে বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম; পথশ্রম, দূরদেশে ভ্রমণ—শারীরিক কষ্ট, অর্থনষ্ট—সকলই সার্থক হইল। আমি কর্শিয়ংএর গির্জার নিম্ন প্রদেশ হইতে এই সোমবারের শুভ বৈকালে—কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি হিমালয়ের পাঁচটি শৃঙ্গ দেখিতে পাইলাম—রজততাম্বুর মত ঝকমক করিতেছে। পরদিন প্রাতঃকালে আবার সেই স্থানে গিয়া সেই অপূর্ব বিচিত্র দৃশ্য দেখিলাম; মনে করিলাম আর দার্জিলিং না গেলেও চলে, গৌরীশঙ্কর দর্শন আমার ভাগ্যে নাই।

মঙ্গলবার। সেই দিন সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া আবার সেই মেল ট্রেন ধরিলাম। অপরাহ্ণের পর দার্জিলিং পৌছিলাম। স্বাস্থ্যাবাসের লোক আমাকে আদর করিয়া, মুটেনীকে দিয়া জিনিসপত্র লইয়া, সঙ্গে লইয়া চলিল। পরে বুঝিয়াছি, সে আদর ভ্রমক্রমে করিয়াছিল, কেন-না আমাদের জন্য স্থান-সঙ্কুলান করা ভার হইয়া উঠিল। শেষে একটা নিতান্ত অপকৃষ্ট একতলা ঘরে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর হিসাবে ভাড়া দিয়া রহিলাম। তিন দিন পরে প্রথম শ্রেণীতে আসিয়াছি। এ ঘর অবশ্য উপর তলায় এবং বড়শড়, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন; আলোক বাতাস বেশ আছে।

কুচবিহারের মহারাজ ৫০,০০০৲ টাকা মূল্যের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দান করাতে এই স্বাস্থ্যাবাসের পত্তন হইয়াছে। রঙ্গপুরের রাজা গোবিন্দলাল রায় ৯০,০০০৲ টাকা এবং রঙ্গপুর জেলার ডিমলের রাজা জানকীবল্লভ সেন ঐরূপ অর্থ দান করাতে এই সুবৃহৎ ভবন হইয়াছে, আরও বহুতর লোক এজন্য দান করিয়াছেন। স্থানটি কিন্তু ভাল নহে। স্টেশনের নিকটেই বটে, কিন্তু স্টেশন হইতে ৫।৬ তলা নিম্নে এবং প্রায় চারিদিকেই সুচ্চ পাহাড় ও বৃক্ষরাজিতে বেষ্টিত; খোলা হাওয়া প্রায়ই পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যাবাসের এই-রূপ অবস্থান, একটি মহা বিড়ম্বনা বলিতে হয়।

আর এক বিড়ম্বনা—ইহার নিষ্ঠাচার হিন্দু-বিভাগ, (Orthodox Hindu Department)। Orthodox শব্দে নিষ্ঠাচার লিখিয়া ঠিক করিলাম কি না, বলিতে পারি না, তবে এই বিভাগে নিষ্ঠাচার কিছু নাই, তাই বলিতেছি। সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুই ত নাই। পলাণ্ডু পর্যন্ত মাংসে প্রত্যহ চলিতেছে। আর আচমনীয়, অনাচমনীয়—সে সকল বিভাগের কোন গোলযোগই নাই। তবে লেপ্‌চ ম্লেচ্ছ পাহাড়ীর দেশে একটা হোটেলে আসিয়া কোনরূপ হিন্দুয়ানির দাবি করা, নিতান্ত অসঙ্গত; কিন্তু নামটা Orthodox আছে বলিয়াই এত কথা, নতুবা Heterodox Hindu Department বলিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইত, শুনিতেও বেশ অনুপ্রাস হইত।

আচারের কথা ছাড়িয়া দিলে স্বাস্থ্যাবাসে আহারের বন্দোবস্ত বেশ ভাল; চিকিৎসার জন্য বেশ সুযোগ্য ডাক্তার আছেন, ভাল ঔষধালয় আছে। ডাক্তারবাবুকে ফী দিতে হয় না, ঔষধের মূল্য লাগে না। ডেপুটী মাজিস্‌ট্রেট বাবু হরিমোহন চন্দ্রের উদ্যোগেই এই স্বাস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এখনও তিনি এই স্বাস্থ্যাবাসের তত্ত্বাবধায়ক শ্রেণীর সম্পাদক এবং প্রত্যহই ইহার পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে এই স্বাস্থ্যাবাসটি আর একটু বিস্তৃত করিয়া দিতে পারিলে, তিনি তাঁহার জীবন সার্থক মনে করিবেন; কথাটি পরম সত্য, স্বাস্থ্যাবাসই তাঁহার প্রাণের স্বরূপই বটে। খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজের ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক একজন অধ্যাপক। সেইরূপ তত্ত্বাবধানে হরিমোহনবাবু যদি এই স্বাস্থ্যাবাসের একটি বিভাগ খুলিতে পারেন, তাহা হইলে, ধন্য হইতে ধন্যতর হইবেন।

দার্জিলিংয়ের বোটানিকাল বাগান দেখিবার জিনিস। পর্বতীয় প্রদেশের বিস্তর মহীরুহ এইখানে জন্মিয়াছে; অপূর্বশৃঙ্খলায় এবং শোভায় বর্ধিত হইতেছে; এরূপ কলিকাতার নিকট শিবপুরেও নাই। ভারতবর্ষে বোধ করি আর কোথাও নাই। সমতল ভূমিতে অপূর্ব উপবন—একরূপ পদার্থ, আর এই উচ্চে, নীচে, শিখরে, গহ্বরে বনস্পতির বৃক্ষরাজির ক্ষুপগুল্মের খেলা, আর এক কাণ্ড। এখানে খোদার কার্যের উপর মানুষ খোদকারি করিয়াছে। মহেশের মহৈশ্বর্য অসীম; মানবের এই সসীম ঐশ্বর্যে

মানবেরও গৌরব করিবার আছে। মোটের উপর দার্জিলিং শহরটাই সর্বত্র খোদার উপর খোদকারি। পর্বতশিখরের উপর সৌধ-চূড়া। তবে অন্যান্য শহরে যেমন মানবের কৃত্রিমতাই বেশি বেশি এখানে সেরূপ নহে; স্বভাবের শোভাই জাজ্বল্যময়ী—মানব নোক্তাচুনী করিয়াছে মাত্র। ছোটলাটের বাড়ী, বর্ধমানের মহারাজের বাড়ী, (Mall) মল নামক ছোট চৌরঙ্গী, এ সকলই মানবের ঝাড়বুটি করিবার পরিচয়। কিন্তু দার্জিলিংয়ে স্বভাবকে পরাস্ত করিবার কোন উপায় নাই। যতই বাড়ী কর, চূড়া বানাও স্বভাবের মেঘমালা আসিয়া মুহূর্তে সে সকল ঢাকিয়া ফেলিবে,—বুঝাইবে মানব-গর্ব অসার।

দার্জিলিংয়ে মেঘের খেলা বড়ই মহিমময়ী। আমাদের দেশের মেঘ আমাদের হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ; হইতে পারে দেবতার মায়া, হইতে পারে স্বর্গের ছায়া, হইতে পারে তুলার বস্তা, হইতে পারে বাষ্পরাশি, যাহাই হউক, মেঘ আমাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—দূরে, দুর্লভ, অস্পৃশনীয়। সেখানে মেঘ কেবল দর্শনীয় মাত্র। এখানে মেঘ অসীম হইলেও, বিরাট্ হইলেও, লীলাময় হইলেও, ছায়াময় হইলেও আমাদের নিতান্ত ঘরের লোক। ঘরে আসিতেছে, কাপড় শুকাইতে দেয় না, এই অন্ধকার করে, এই রৌদ্রের তেজ বাড়াইয়া ঝক্‌ঝক করিতেছে। এই আমাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে, এই আমা হইতে চলিয়া গিয়াছে। এই নাচিতেছে, এই ধীর গম্ভীর হইয়া নীথর দাঁড়াইয়া আছে। যাহাই হউক,—মেঘ কিন্তু আমাদের ঘরের লোক। দেখিলে আনন্দ হয়, আবার ব্যবহারে রাগ হয়; ঘরের লোকের সঙ্গেও ত সেইরূপ হইয়া থাকে। এই মেঘের লীলাখেলার বর্ণনা করা অসাধ্য, বঙ্গসরস্বতী আমাকে মার্জনা করিবেন, বোধ করি বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর রস্কিনের লেখনীতে মেঘমালার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, বাঙ্গালায় সেরূপ লেখা অসম্ভব। আর রস্কিন স্বভাবের চিত্রকর, আমি সে বিচিত্র তুলিকা কোথায় পাইব? বাস্তবিক এখানে আসিয়া কবি হইতে ইচ্ছা হয়! এই সেই অস্ত্যত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়োনাম নগাধিরাজঃ—কিন্তু সে সরস্বতীর বরপুত্র সকল কোথায়?

হিমালয় প্রদেশে আসিয়া কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গলে হিমালয়-বর্ণন শতবার মনে পড়িতেছে, কিন্তু মিলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না,

> বিশ্ব যেন ফেলে পাছে,
> কি এক দাঁড়ায়ে আছে!

কথাগুলি বেশ! কিন্তু এরূপ ভাব ত কোথাও দেখিতে পাই না; বরং এরূপ দেখিতে পাইলাম—

> ওই কি হে ধব ধব
> তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
> ঊর্ধ্বমুখে ধেয়ে গেছে ফুঁড়িয়া অম্বর।
> দাঁড়াইয়া পাদদেশে
> ললিত হরিত বেশে
> নধর নিকুঞ্জরাজি সাজে থরে থর!

এটিও বেশ মিলানো যায়—

> কিবে ওই মনোহারী
> দেবদারু সারি সারি
> দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার।
> দূর দূর আলবালে,
> কোলাকুলি ডালে ডালে,
> পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার।

সকল স্থল মিলাইতে পারি, আর নাই পারি,—পাঠক একবার চক্রবর্তীর হিমালয়-বর্ণন পাঠ করিবেন; আমার লিখিতে না পারার ক্ষোভ রহিল, আপনাদের কেন ক্ষোভ থাকিবে। আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, আর অদ্য আমাকে বিদায় দিন। আজি জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি পূর্ণিমা, আগামী কল্য একবার আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে পর্বতে মেঘের খেলা দেখিয়া মেঘদূত-কারকে স্মরণ করিব—লিখিতে পারিব না।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাসংক্রান্তি 'পূর্ণিমা' ১৩১৫

দার্জিলিং

উলা বা বীরনগর

১

১৮৪৬ সালের ২৭এ অগ্রহায়ণ চুঁচুড়ার বাটীতে আমার জন্ম হয়। সেই সালের ২৬এ মে হইতে পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে

কর্ম করিতেছিলেন। ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন হইতে, তিনি উলার মুনসেফ হন। তখন উলায় মুনসেফি আদালত ছিল। এখন সেই মুনসেফিই রানাঘাটে আছে। ১৮৫০ সালের মাঘ মাসেই আমরা উলায় যাই, অর্থাৎ পিতৃদেব উলায় পরিবার লইয়া যান। তাহার পর প্রতি বৎসরই আমরা চারি মাস চুঁচুড়ায় এবং আট মাস উলায় থাকিতাম। ১৮৫৬ সালে উলায় মহামারী পড়িল ; ঠিক পূজার পূর্বেই। সেইবার হইতে আর আমরা উলা বা রানাঘাট যাই নাই। আমার বাল্যকালের ৭ বৎসর ঐ ভাবে উলায় কাটে, অর্থাৎ প্রতিবৎসর ৭।৮ মাস করিয়া থাকিতাম। বাল্য অনুরাগবশত উলার উপর আমার খানিকটা মমতা ছিল বা আছে।

পূরা দশ বৎসর বয়স্ হইবার পূর্বেই উলা ছাড়িয়া আসি, আর এই গত বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ৫৬ বৎসর পরে উলায় গিয়াছিলাম ; বুঝুন আমার মমতার টান!! রানাঘাটের শ্রীমান্ কুমুদনাথ মল্লিকের সহিত আজ কয় বৎসর যাবৎ আলাপ না হইলে, আর এ বৎসর তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলে, বোধ হয় তাহাও হইত না। এই ৫৬ বৎসরের মাঝামাঝি, অর্থাৎ ২৭।২৮ বৎসর পূর্বে পিতৃদেব বৈশাখী পূর্ণিমায় একবার উলায় গিয়াছিলেন, আমি তখন যাইতে পারি নাই—উলার অবস্থা শুনিয়াছিলাম—এখন তাহা হইতেও হীনাবস্থা।

এই ৫৬ বৎসর উলায় একবারও যাই নাই, তা বলিয়া উলা দেখিবার ইচ্ছা ছিল না, এমন কথা বলি না। তবে এতকাল 'অজরামরবৎ' মনে করিয়াই চলিয়াছিলাম, এখন বয়সের দোষে বা গুণে 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' ভাবিয়া 'ধর্মমাচরেৎ' মত করিতে হইল।

এই দীর্ঘকাল উলার অধিবাসিগণের সহিত আমরা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়াছিলাম। গুটিকতক ভদ্রলোকের সহিত বেশ আত্মীয়তাই ছিল। উলার দুর্দশার কথা প্রায়ই শুনিতাম। মহামারীতে উলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, এটা ইতিহাসের কথা হইয়াছে। ইতিহাসের সহিত কিশোর বয়সে আমি কাব্য মিশাইয়াছিলাম। কাব্য আবার ইংরাজি কাব্য! বিধির বিধানে ক্রমাগত তিন বৎসর ১৮৬০, ১৮৬১, ১৮৬২ সাল কবি গোল্ড্স্মিথের 'পরিত্যক্ত পল্লী' আমাদের পাঠ্য ছিল। কাজেই সমুদয় কাব্য আমার মুখস্থ হইয়াছিল। উলার কথা পড়িলেই—

> Seats of my youth, when every sport
> could please :
>
> *   *   *
>
> These were thy charms—but all these
> charms are fled.
>
> Near yonder copse, where once
> the garden smil'd,
> And still where many a garden-flower
> grows wild,

—এই সকল পদ্য আওড়াইতাম। আর কত কি মাথামুণ্ড ভাবিতাম, তাহা এখন মনেও আনিতে পারি না। একবার রানাঘাট হইতে শান্তিপুর যাইবার হাঁটা পথে কামগাছীর মাঠে, আর একবার রেলপথে উলা স্টেশন হইয়া দেবগ্রাম যাইতে মনে বিষাদ বা প্রসাদ প্রবল হইয়াছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না—বিধ্বস্ত গ্রামের কথা ভাবিতে গেলে বিষাদ ত আসিতেই পারে, কিন্তু 'ওই গো আমার সেই উলা ছুঁইয়া যাইতেছি',—এ কথাতে একটু প্রসাদও যে আসে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না।

মহামারীর পূর্বে অর্থাৎ ষাট বৎসর পূর্বে উলা অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন সভ্য জনপদ ছিল। তেমন সমৃদ্ধিসম্পন্ন পল্লীগ্রাম আমি আর কোথাও দেখি নাই। সমৃদ্ধি বলিতে যে খুব গাড়ি-ঘোড়ার আড়ম্বর, তাহা নহে ; ক্রিয়া-কর্ম, গান-বাজনা, আনন্দ-উৎসবে ভরপূর ছিল। আর লোকসংখ্যা বিপুল—বাঙ্গালার একটি পল্লীগ্রামে পঞ্চাশ হাজার লোক—সে কি কম কথা! আর সেই লোকই-বা কিরূপ! কুলি-মজুর নহে—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশি।

'উলার **বামনদাস (মুখোপাধ্যায়)** বাবুর তখন প্রবল প্রতাপ—প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। তিনি স্বয়ং অতিশয় ক্রিয়াবান্ পুরুষ ছিলেন। তেমন ক্রিয়াবান্ লোক এখন আর নাই। বার মাসে তের

পার্বণ এবং নিত্য নিয়মিত অতিথিশালাও ছিল। স্নানযাত্রা, রথ ও জগদ্ধাত্রী-পূজায় মহা ধূমধাম হইত। রথের আট দিন দিবারাত্র এক দিকে নাচ-গাওনা যাত্রা-কবি হইত, অন্য দিকে সেইরূপ মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দীয়তাং ভুজ্যতাম্ শব্দে ভূরি ভোজন চলিত। স্নানযাত্রার সময় সত্য সত্যই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সমাগম হইত। তখন রেল হয় নাই, স্টীমার-চলাচল ছিল না; সেই সময়ে দূরদেশাগত এক এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জন্য কত যে পাথেয় ব্যয় হইত, তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।'*

শান্তিপুরের মতিবাবু নাকি উত্তরসাধক হইয়া বামনদাস বাবুর বিরুদ্ধে একটি ঘরোয়া মোকদ্দমা বাধান; প্রিভি-কৌন্সিল পর্যন্ত গড়ায়। সেই মোকদ্দমা 'জিত' হইবার যে দিন সংবাদ আসিল, সেই দিন উলাবাসীর উল্লাস দেখে কে? সমস্ত গ্রাম হলহলায় পূর্ণ; সকল বাড়ীতেই সিধা আসিল, আর রাত্রিতে বোমফাটার শব্দে উলা কম্পিত এবং খধূপের আলোয় সমস্ত গ্রাম উজ্জ্বলীকৃত।

বহুপূর্ব হইতেই উলায় সংস্কৃতচর্চা, স্মৃতিদর্শনের চর্চা ছিল; আর অনেকগুলি পাঠশালা ছিল। বাঙ্গালায় আবার সমাস-কারক শিখাইতে হয়, তখন লোকের সে জ্ঞান সবেমাত্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পিতৃদেব গ্রামমধ্যে বিশেষ চেষ্টা করিয়া এবং কর্তৃপক্ষের সাহায্য লইয়া, তিনটি পাড়ায় তিনটি বাঙ্গালা স্কুল ও মাঝের পাড়ায় উপরন্তু একটি ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠাপিত করেন। প্রায় ৬ শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত। হরিসংকীর্তন, সাধারণ সঙ্গীত এবং কালোয়াতি গানের চর্চাও বিশেষ ছিল। আমি যখন ছিলাম, তখন প্রসিদ্ধ গানবিলাস মহাশয়ের পুত্র হরচন্দ্র বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। দুইজন ব্রজ মুখোপাধ্যায় পাখোয়াজি ছিলেন। ভাল ঢুলী ছিল, ভাল সানাইদার ছিল। বোধ হয়, তাহাদের নাম দীনে ও তিনকড়ি হইবে। ভাল চিত্রকর ছিল, তাহাদের হাতের চিত্র এখনও আমাদের বাড়ীতে আছে।† তাহারা উত্তম পুত্তলিকাও তৈয়ার করিত। উলার আচার্যদের ডাকের সাজ প্রসিদ্ধ। ঠাকুর-গড়া-কুমার খুব উত্তমই ছিল—বারইয়ারির ঠাকুরগুলি কলা-বিদ্যার চূড়ান্ত নিদর্শন। কাঁসারীরা বাসন তৈয়ার করিত, তাহারা দক্ষিণপাড়ায় থাকিত বলিয়া ভালরূপেই জানিতাম। উত্তম ময়রা ছিল; ভাল সন্দেশ হইত। সন্দেশের ঠোঙ্গায় ঘি গড়াইত। তরিতরকারী সমস্তই সুলভ; উত্তম ঘৃত সুলভে মিলিত।

পূর্বে গঙ্গার খাদ উলার নিচেই ছিল, বর্ষায় সেই খাদে জল আসিয়া উলার তিন দিক্ প্লাবিত করিত। বৈকালে রাস্তার ধারে তিন-চারি শত লোক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিত; সেই এক অপূর্ব দৃশ্য! যে মুহূর্তে যাইবে, তখনই দেখিবে, দশটা-পাঁচটা ছিপে মাছ গাঁথিয়াছে।

২

উলা অতি প্রাচীন জনপদ। পূর্বে ভাগীরথী গঙ্গা উলার নিচে দিয়া, খিস্মের পাশ দিয়া প্রবাহিত ছিলেন, তাহা কবিকঙ্কণের লেখা দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। সে হইল তিন শত ছত্রিশ বৎসরের কথা। ইহার শতবর্ষ পূর্বে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মেল-বন্ধন হয়। ফুলিয়া মেলের 'ফুলিয়া' প্রসিদ্ধ বলিয়া কীর্তিত হয়। সেই ফুলিয়া মেলের বিস্তর স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীনের উলায় বসবাস ছিল। কথিত আছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় উলায় ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের পঁচিশ শত ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আমি বালক, এ সকল এমন করিয়া তখন বুঝিতাম না, তবে আড়াই হাজার তিন হাজার ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিভোজনে আহার করেন, এমন কথা সর্বদাই শুনিতাম।

বামনদাসবাবুর কথা পূর্বেই বলিয়াছি; উঁহাদিগকে উলার 'বাবুরা' বলা হইত। আর এক ঘর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশ ছিলেন, তাঁহারাও মুখুটী বটেন—দেওয়ান মহাশয়েরা। ইহারা কন্যার বিবাহের পাত্রের ভাল পাঁচটা গুণের সঙ্গে দৈহিক শৌর্য-বীর্য বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইতেন। সুতরাং ইহাদের বংশে রুগ্‌ণ ভগ্ন দুর্বল লোক দেখিতে পাওয়া যাইত না। ইহারা পরম ভাগবত বৈষ্ণব ছিলেন। বারমাস বাড়ীতে হরিসংকীর্তন হইত, আর মাঘ

* পিতাপুত্র, ১৪, ১৫ পৃষ্ঠা।

† এখন আর নাই।

মাসে নগর-সংকীর্তন রাত্রিতে বাহির করিতেন। অশীতি-পর বৃদ্ধ হইতে বর্ষৈক-পূর্বে-উপনীত বালক পর্যন্ত, সেই গোষ্ঠীর সকলে একত্র সংকীর্তন করিতেন। মধ্যে শুভ্র-লোমাবৃত-বিশালবক্ষ 'রঙ্গিব মহাশয়' মোহড়া ধরিয়া দিতেছেন, আর তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া পঞ্চাশ-ষাট জন বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় হরিনামের তান তুলিতেছে। সেই এক অপূর্ব দৃশ্য, অপূর্ব গীতি—সেই যে বালক-কালে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সে কি ভুলিবার বিষয়!

একঘর কায়স্থ উলায় খুব নামজাদা ছিলেন—উলার **মুস্তৌফীরা**। তাঁহারা মিত্র—নবাব সরকারে কার্য করিয়া মুস্তৌফী উপাধি লাভ করেন। আমি যখন উলায় থাকি, তখন ইঁহাদের অবস্থা ক্ষুণ্ন হইয়াছে। নাম আছে, আর তখন ইঁহাদের প্রসিদ্ধ 'চণ্ডীমণ্ডপ' আছে। চণ্ডীমণ্ডপ 'বাঙ্গলা' চালের—'খড়ো', কিন্তু সেই এক বিচিত্র কাণ্ড। বাঙ্গলা দোচালা—তিন দিকে প্রাচীর; ভিতর দিকে প্রাচীর-গাত্রে সমস্ত দেবদেবীর লীলা-মূর্তি খোদাই করা। দক্ষিণ মুখ চণ্ডীমণ্ডপ, দক্ষিণ দিকে দুচালার জোড়ের কাছে এবং দক্ষিণ দিকের ছাঁচের কাছে কাষ্ঠের খুঁটী—ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রক দিয়া ঢাকা। খুঁটীও যেমন, আড়া তীর বাম্‌না সকলই তেমনই—কাষ্ঠের, ময়ূরপুচ্ছের চাঁদ দিয়া ঢাকা। চালের শলাগুলি বাঁশের, তারের মত সরু ও সুগোল এবং যন্ত্রের ছিদ্র-মধ্য দিয়া টানা। এই সব শলা ছিলেটের ভাল শীতলপাটীর বিতির মত পাতলা সরু বেত দিয়া বাঁধা। চালের ভিতরপিঠ নানা চিত্র-বিচিত্র রংকরা; লাল রংগুলি গালার, আর মধ্যে মধ্যে সেই ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রক দিয়া পদ্মের মত নক্সা। চালের উপরপিঠের কোনও বৈচিত্র্য থাকিত না, সাদা সিদা একটা বাঙ্গলা চাল। কিন্তু চণ্ডী-মণ্ডপের ভিতরে দাঁড়াইলে, দাঁড়াইয়া উপরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে আর নয়ন-মন ফিরাইয়া আনা ভার হইত। আমি বালক, সৌন্দর্য-প্রিয়—আমার আর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, শেষে আমার রক্ষকেরা আমাকে যৎকিঞ্চিৎ বলপূর্বক লইয়া চলিল—মুস্তৌফী মহাশয়দের সদর বাড়ী দেখিতে গেলাম। বাড়ীর তখন ভাঙ্গা অবস্থা। সুবৃহৎ কাষ্ঠের সারি সারি স্তম্ভ মৃত্তিকা হইতে দোতলার ছাদ পর্যন্ত নানা কারুকার্য ভগ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। তাহার উপরে সুপ্রশস্ত কাঠের কার্নিস্। রং নাই, বাহার নাই, জলুস নাই, খোদকারি সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কোথাও-বা কার্নিস্‌ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বালককালেই 'সোণেকি শুকৃতি—গিধড়কি জাড়া'র গল্প শুনিয়াছিলাম। এক পাতশাহ অত্যন্ত উদার ছিলেন, নিজ কর্মচারীদের চুরি জানিতে পারিয়াও ধরিতেন না। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে, তিনি কর্মচারীদের ডাকাইয়া বলিলেন—দেখ, আমার আমলে যা করিবার তাহা করিয়াছ, আমার উত্তরাধিকারীর আমলে আর সোণার শুক্তি বাদ দিও না, আর শৃগালের শীতনিবারণের জন্য কম্বলের ব্যবস্থা করিও না। মুস্তৌফীদের সদর বাড়ীর একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া আমার সঙ্গীরা বলিল, এই ঘরে বিস্তর ভাল ভাল ঝাড়-লণ্ঠন ছিল, সমস্তই উইয়ে কাটিয়া মাটী করিয়াছে; কেবল পিতলের সাঁপিগুলা পাওয়া গিয়াছিল। আর একজন বলিল, 'সোণেকি শুকৃতি—গিধড়কি জাড়া' এ কালেও হয়। আমি বুঝিলাম, ঝাড়-লণ্ঠন অপহৃত হইয়াছে।

নবশাখদের মধ্যে কয়েক ঘর গন্ধবণিক্ ও কাংসবণিক্ আমাদের দক্ষিণ পাড়াতেই ছিল; তাহারা গৃহস্থ লোক; আর উত্তরপাড়ায় ছিলেন **খাঁ বাবুরা**; তাঁহারা তিলি। কলিকাতায় বিপুল ব্যবসায় করেন; তাঁহারা এখনও বর্তমান; আমরা গত বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁহাদের আশ্রয়ে ৪।৫ ঘণ্টা সুখে কাটাইয়া আসিয়াছি।

পিতৃদেবও বৈশাখী পূর্ণিমায় উলায় গিয়াছিলেন, আমরাও গত বৈশাখী পূর্ণিমার দিন গিয়াছিলাম—কেন, ঐ পূর্ণিমায় কি কিছু বিশিষ্টতা আছে? আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় উলায় **উলুইচণ্ডার জাত্** হয় এবং তিন পাড়ায় বারইয়ারি পূজা হইত, এখন দুই পাড়ায় হয়। এই কথা বলিলেই দিনের বিশিষ্টতা বুঝানো গেল না। অতিবড় দীনদরিদ্র হইতে ধন-কুবেরগণ পর্যন্ত সকলেরই বাড়ীতে মহা উৎসব হয়। সকলেই চণ্ডী-মায়ের পূজা দেন বা করেন—সকলেরই বাড়ীতে ভূরি পরিমাণে অতিথি-কুটুম্বের সমাগম হয়।

উলায় থাকাতে **পল্লীগ্রামের আতিথ্য** জিনিসটা যে

কি, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কাছারীর কাছে আমাদের দোতলা বাসা-বাড়ী ছিল, সেই বাসা হইতেই একটি দরিদ্র প্রতিবাসীর ঘর, দুয়ার, উঠান বেশ দেখিতে পাওয়া যাইত। একটি বাঁশঝাড়ের পার্শ্বেই তাহাদের ঘর—একখানি মেটে ঘর, তাহারই দাওয়া, আর বাঁশতলাও যা, উঠানও তাই। ৩।৪ দিন পূর্বে গৃহস্থের পরিবার সেই ঘরদুয়ার বাঁশতলা ঝক্‌ঝকে করিয়া নিকাইয়া রাখিত। আর সেই পূর্ণিমার দিনই মেলা হইতে গোটা-দুই মাজুরি ও ৩।৪টা কলিকা ও খানিকটা তামাক কিনিয়া আনিত, আর সেই উঠানের এককোণে বাঁশের গোড়া-কাটার আগুন গর্ত করিয়া রাখিয়া দিত। সেই মাজুরিতে বসিয়া, সেই কলিকায় তামাক খাইয়া কুটুম্ব-অতিথিরা আনন্দে ভরপুর হইয়া কতই-না গল্প করিত। চণ্ডীমার প্রসাদ নামিলে, এক হাঁড়ী বা দুই হাঁড়ী ভাত চড়াইয়া দিত; ৫টা-৬টার সময় সেই প্রসাদান্ন খাইয়া, চাদর বা গামছাখানা কুণ্ডলী করিয়া মাথায় দিয়া লম্বা শুইয়া পড়িত। বলিহারি বাঙ্গালার দীন-দরিদ্র ও বলিহারি বাঙ্গালার আতিথ্য।

বৈশাখী পূর্ণিমা ৺গন্ধেশ্বরী পূজার দিন। ৺গন্ধেশ্বরী পূজা গন্ধবণিক্‌গণ প্রায়ই করিয়া থাকেন। প্রবাদ যে উলার চণ্ডী গন্ধেশ্বরীই বটেন। শ্রীমন্ত সিংহল যাত্রার সময় যখন উলার পার্শ্ব দিয়া যান, তখন গন্ধেশ্বরী পূজার দিন নদীতীরস্থ বটমূলে গন্ধেশ্বরী স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন; 'নদীয়া কাহিনী'তে ত্রিপদীর তিন চরণ উদ্ধৃতও হইয়াছে—

বটমূলে ভগবতী, যথায় করেন স্থিতি,
উপনীত সেই উলা-ধামে।

এই কথাগুলি কোথা হইতে আসিল, তাহা আমরা জানি না। বিশেষ উহা হইতে গন্ধেশ্বরী স্থাপনা বুঝা যায় না, বটমূলে ভগবতী স্থাপিত ছিলেন—ইহাই বুঝা যায়। বিশেষ ধনপতি যে ঐরূপে চণ্ডীপূজা করিবেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। তিনি তখনও তেমন শক্তি-ভক্ত হয়েন নাই। আর শ্রীমন্তেও সম্ভব নহে। কেন তাহা বলিতেছি। যখন শ্রীমন্তের নৌকা ভাগীরথীতে আসিয়া পড়িল তখন কবিকঙ্কণ বলিতেছেন,

'বাহিয়া অজয়নদী পাইল ইন্দ্রাণী।'

ইহার পর 'গঙ্গার উৎপত্তি-কথন' আছে, তাহার শেষে আছে—

'শুনি গঙ্গা অবতার, সুখী হৈলা কর্ণধার,
স্নান কৈল সতিল তর্পণে।
আচ্ছাদিয়া ধৌত পটে, লইল নূতন ঘটে,
শ্রীকবি কঙ্কণ রসভনে।'

ইহার বহু পূর্বে যখন বহর অজয়েই রহিয়াছে, তখন—

'বারেন্দা বাহিল সাধু বেণের নন্দন।
সোনায়ার ঘাটে ডিঙ্গি দিল দরশন॥
সুবর্ণের চণ্ডী করিল পূজ্যমান।
প্রণমিয়া সদাগর করিল পয়ান॥'

আবার উলায় আসিয়া চণ্ডী বা গন্ধেশ্বরী স্থাপনা করিলেন, তাহা বোধ হয় না। তাহার পর মহামহোপাধ্যায়* মহাশয়ের যুক্তি আছে। যখন হাড়ীরা এখনও রাত্রি থাকিতে প্রথম পূজা করে, তখন ঐ চণ্ডী বৌদ্ধের রূপান্তর মাত্র।

উলার **বারইয়ারি পূজা**—সেই এক বিষম কাণ্ড। পৌত্তলিক পীড়নকারীদিগের শত লাঞ্ছনাতেও এখনও বারইয়ারি জীবিত আছে। বাঙ্গালার যে সকল জনপদে হাট, গোলা, গঞ্জ বা বাজারের সমৃদ্ধি আছে, সেই সকল স্থানে সহজে মুনাফার উপর 'ঈশ্বর বৃত্তি' আদায় হয় এবং ঈশ্বরীর পূজা সমারোহে হইয়া থাকে। আজিকালি কলিকাতায় বাণিজ্য-ব্যবসায়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি, কাজেই কলিকাতার সুতাপটি, লোহাপটি, হাটখোলা, পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানে জাঁকজমকে, অথচ দান-ধ্যানে, বারইয়ারি পূজা হইয়া থাকে। জঙ্গীপুর, কাটোয়া, কালনা, শান্তিপুর, মগরা প্রভৃতি পল্লীগ্রামের বহুতর স্থানে ঐরূপ বারইয়ারি হইয়া থাকে।

গঞ্জ-গোলা না থাকিলেও, দেশে দেশে চাঁদা আদায় করিয়া স্থানে স্থানে বিশেষ ধূমধামে বারইয়ারি পূজা হইত। ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান গুপ্তিপাড়া, উলা প্রভৃতি গ্রামে এইরূপেই বারইয়ারি হইত। এই সকল বারইয়ারির বাঁধা পাণ্ডা ছিল। ভাল ভাল কুলীনের ছেলে, মোটা মোটা পৈতা কাঁধে, মাথায়

* হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, প্রায়ই মালকোচা-মারা, গ্রামের মধ্যে, বারইয়ারির দুই তিন মাস থাকিতে, চাঁদা আদায় করিত। দুই একজন বর্ষীয়ান্ আমুদে লোক সঙ্গে লইয়া, তাহাদিগকে মুরুব্বি বানাইয়া, যেখানে অর্থসম্পন্ন, বিশুদ্ধ বাঙ্গালি আছে, সেই সেইখানে প্রায় সংবৎসর ঘুরিত। চাঁদা অবশ্য 'রক্ষণ ভক্ষণ' দুইই হইত। এখনকার টেড়িকাটা বাবুরা কমিশন লন, তখন ভক্ষণই কমিশন। আমি উলার ভালটুকু বলিয়াছি, এখন মন্দটুকু বলি,—৪।৫ জন ঐরূপ গুণ্ডা পড়িয়া দুপুর বেলা গৃহস্থের ঘটিবাটি বারইয়ারির চাঁদার জন্য উঠাইয়া লইয়া গেল, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বারইয়ারির এইরূপ অত্যাচার আমার বাল-বুদ্ধিতেও ভাল লাগিত না। দুইজন দশজনকে এই জন্য কাঁদিতেও দেখিয়াছি।

বিদেশে পাণ্ডাদের চাঁদা আদায়ের নানারূপ বিচিত্র গল্প আছে। কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ কৃপণ বড় মানুষের বাড়ীতে বীরনগরের বীর পাণ্ডারা যাইতে উদ্যত; সকলে নিষেধ করিল, বলিল, 'উহার মুখ-দর্শন করিলেও পাপ আছে; একে একচক্ষু নাই—কাণা, তাহাতে বাপের শ্রাদ্ধ, মায়ের শ্রাদ্ধ করে না, অতিথি-ব্রাহ্মণকে কিছু দেয় না, উহার নিকট তোমরা যাইও না।' পাণ্ডারা কিন্তু নাছোড়বন্দা; তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কি মনে ক'রে আসিয়াছেন?' উত্তর হইল, 'আমরা উলার বারইয়ারির পাণ্ডা, মায়ের পূজার জন্য আপনার নিকট কিছু ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।' আবার উত্তর হইল, 'আপনারা কি শুনেন নাই, বাপের শ্রাদ্ধ, মায়ের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কোন বাজে খরচ আমার নাই, আমার কাছে আপনাদের কিছু হবে না।'—'না দেন, নাই দিবেন, তবে আপনার কিছু বাজে খরচ নাই—এমন মিথ্যে কথাটা বলবার কি প্রয়োজন?'—'আমার বাজে খরচ কিসে দেখিলেন?' —'আপনার একটি বৈ চোখ নাই, দুখানি পরকলা-দেওয়া চস্‌মা ব্যবহার করিতেছেন কেন?' কৃপণ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, 'আপনারা ধরিয়া ফেলিয়াছেন বটে, আমি আপনাদিগকে ১০টি টাকা দিতেছি, মায়ের পূজা দিবেন।' ব্রাহ্মণগণ টাকা লইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আর একদিন কলিকাতার এক উগ্রস্বভাব বড় মানুষের বাড়ী পাণ্ডারা প্রবেশ করিবার উদ্‌যোগেই তিনি 'এখানে কেন, এখানে কেন, এখানে কিছু হবে না, আবার কি দরওয়ান ডাকিতে হইবে না কি?' বলিয়া মহা রাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ ধীরেসুস্থে গিয়া ভিন্ন আসনে বসিলেন, বাবু আরও রাগত হইলেন। পাণ্ডারা বলিলেন, 'আমরা ব্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ; আমাদিগের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতেছেন কেন?' উত্তর—'ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!—আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব কি আছে?'—'কেন সকলই আছে, উপবীত হইয়াছে, নিষ্ঠা আছে, গায়ত্রী জপ করিয়া থাকি, নাই কি?' উত্তর, 'ব্রাহ্মণ হইলে সাগ্নিক হইতেন—আপনাদের মুখে আগুন থাকিত।' ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'এইজন্য আপনি এত রাগ করিতেছেন? ওটা আপনার ভুল। মুখে আগুন থাকিলে, হাঁ করিতে হইবে, ফুঁ দিতে হইবে, তবে আগুন বাহির হইবে,—এইত; আর দেখুন দেখি—আমরা পঞ্চাশ হাত দূরে থাকিতেই, আপনি আমাদের দেখা মাত্রই জ্বলিয়া উঠিয়াছেন; কোন্‌টা বেশি হইল মহাশয়?' কায়স্থ একেবারে নরম হইলেন, কুড়ি টাকা তাঁহাদিগকে দিতে হুকুম দিলেন; আর সাধ্য-সাধনা করিয়া তাঁহাদিগকে পাকাহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ আপনাদের স্বপাক মাছের ঝোল অন্ন এবং বিপাক ক্ষীর সন্দেশ উদর পূরিয়া আহার করিয়া, দক্ষিণা এবং কুড়ি টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন।

লাট হেস্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে উলার পাণ্ডারা দড়িদড়া লইয়া গিয়া বলে, 'মায়ের ইচ্ছা তোমার কাঁধে চাপিয়া আসেন, তাই তোমাকে লইতে আসিয়াছি।' গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বড় চতুর লোক ছিলেন, সেবারকার মায়ের পূজার সমস্ত ভার তিনি গ্রহণ করেন।

এইরূপ উলার বারইয়ারি পূজার গল্প বহু প্রচলিত ছিল, এখনও আছে।

৩

কাগজে ছাপাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—

প্রশ্ন—এতকাল পরে আবার উলার কথা কেন?

উত্তর—ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

সে কালের সমাজের রীতি-নীতি ও সে কালের ভদ্রলোকদিগের ধরণ-ধারণের কথা উল্লা-উপলক্ষ করিয়া বলিতেছি।

উলার পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর,
আর হালিশহরের তেঁদড়।

উলা **পাগল**-এর জন্য প্রসিদ্ধ।

পোল পাগল পুলো,
তিন নিয়ে উলো।

উলার **বামনদাসবাবু** অতি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ক্রিয়াবান্ ও নিষ্ঠাবান্ এবং বিলক্ষণ গম্ভীর প্রকৃতির। বাড়ীতে বৃত্তিভোগী একজন কবিরাজ মহাশয় থাকিতেন। মুখ-হাত ধুইয়া বামনদাস-বাবু বাহিরে বসিলে, এবং তিনি বলিলে, কবিরাজ মহাশয় হাত দেখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেন। এক দিন হাত দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'এমন কিছু নহে, তবে যৎকিঞ্চিৎ বায়ুর প্রকোপ বটে।' বামনদাসবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'ওটুকু ত গ্রামের, আমার কি বলুন।' সুতরাং গ্রামের দুর্নাম গ্রামের লোকই স্বীকার করিতেন।

একজন পাগলের কথা বলি—গ্রামের প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে কুলীনসন্তান, একটু দুষ্টবুদ্ধিও বটে, একটু ভালমানুষও বটে, পেসা পাগলা—এই উপাধি পাইয়াই পাগল বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার একটা অনুমান-খণ্ডের কথা বলি। প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে বলিয়াছিল, 'যখন রানাঘাটের শ্রীগোপাল পালচৌধুরী বাবুর পাগল হাতীটার মাথা গরম হইয়াছে, তখন আমাদের বামনদাসবাবু আর রক্ষা পান না।' একবার প্রসন্ন গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া শান্তিপুর যাইতে-ছিল। তখন প্রসিদ্ধ * ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল শান্তিপুরের ডেপুটী। তিনিও সেই পথে পাল্‌কী করিয়া আসিতে-ছিলেন; গোযানে শয়ান প্রসন্নকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি রে! পাগল, বামুন হয়ে গোরুর গাড়ীতে চড়েছিস যে?' প্রসন্ন উত্তর করিল, 'বলি—খাওয়ার চেয়ে চড়া ভাল নয় কি?'

এই প্রসন্নর একটু গান-শক্তি ছিল, সেই জন্য লোকে আরও চিনিত।

উলার সেই সময়ের আর একজন প্রসিদ্ধ লোক **শ্রীমোহন মুখুয্যে।** তাঁহাকে সকলেই **ছিরে খ্যাপা** বলিত। তিনি একজন হরবোলা ও ভাঁড়। এখন যেমন কলিকাতায় গোপাল সিং ও গোস্বামী, তখন মফস্বলে ঐ রকম অনেক লোক ছিল। তাহারা নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর বুলি বলিতে পারিত এবং কবি, কীর্তন, জজের বিচার প্রভৃতি হাস্যকর পদার্থ অবিকল নকল করিত। শ্রীমোহন হাতীর ডাক পর্যন্ত উত্তম ডাকিতে পারিতেন, সেইজন্য তাঁহার নাম ছিল 'হাতী পঞ্চানন'। (রানাঘাটে একজন ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল 'বলদ পঞ্চানন'।) নিজে বেশ স্থূলকায় ও লম্বাচৌড়া শরীর; তাহার উপর হাতী ডাকিতে পারিতেন বলিয়া, উলার দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারি পূজার মহিষ-বলিদানের সময়, হাড়িকাঠ-সংলগ্ন মহিষের উপর দাঁড়াইয়া ঘোর গম্ভীর চীৎকারে বৃংহিত ধ্বনি করিতেন। মহিষ বেচারা একে হাড়িকাঠে আড়ষ্টবদ্ধ, তাহার পর পৃষ্ঠে হস্তী চড়িয়াছে মনে করিয়া, একেবারে নিশ্চল হইত। তখন সহজেই তাহার মুণ্ডচ্ছেদ হইত।

শ্রীমোহন একবার দিনাজপুরের রাজবাটীতে ভাঁড়ামী করিতে যান। বাঙ্গালার সর্বত্রই রাজ-রাজড়ার বাটীতে তাঁহার গতিবিধি ও বাৎসরিক বৃত্তি ছিল। দিনাজপুরে অনেক ভাল ভাল হিন্দুস্থানী ভাঁড় উপস্থিত ছিল। তাহারা এ বিষয়ে খুব দক্ষ লোক—অনুকরণ-নাট্যে বিশেষ পটু। সেবারে মহারাজ পর্যন্ত শ্রীমোহনের কৌতুক অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিলেন, দেখিলেন। তাহাতে হিন্দুস্থানী ভাঁড়েরা মনে মনে একটু চটিল। শ্রীমোহনের সুদীর্ঘ পালা শেষ হইলে পর, শ্রীমোহন মজলিসের এক পার্শ্বে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানী ভাঁড়েদের একজন সহিস্‌বেশে মজলিসের রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল। হাতে এক গাছি মোটা দড়ি, যেন ঘোড়া পালাইয়াছে, খুঁজিতেছে—'মেরি ঘোড়ী কাঁহা গয়ী রে, মেরি ঘোড়ী কাঁহা গয়ী রে।' বলিয়া

* শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, এই ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের সহিত গোলদীঘির ধারে মুসলমানের দোকান হইতে তিনি শিককাবাব খাইতেন।

শ্রীমোহনের কাছে গিয়া, 'এহি মেরি ঘোড়ী' বলিয়া শ্রীমোহনের কাঁধে হাত দিল। শ্রীমোহন ঘোড়ার মত চতুষ্পদ হইয়া সেই নকল সহিসের বক্ষে এক উল্টা চাট্ মারিলেন। সে বিষম আঘাতে দশ হাত তফাতে ধরাশায়ী হইল। মহা গোল হইতে লাগিল, মহারাজ মিটাইয়া দিলেন।

শ্রীমোহন আপনিই কবির চোতা ধরিতেন, (অর্থাৎ Prompter হইতেন) গান গাহিতেন, ঢোলে কখন কেবল সাথ করিতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে ডুক্কা বাজাইতেন, আবার হঠাৎ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দৌড়িয়া এক কোণে গিয়া বাহবা দিতেন। শ্রীমোহন একলাই এক শ। রানাঘাটের প্রসিদ্ধ নীলকমল পালচৌধুরীর কৃষ্ণনগরের জজের কাছে বিচার শ্রীমোহন অভিনয় করিতেন—অবশ্য একাই জজ এবং আসামী ইত্যাদি। সকলে নীলকমলবাবুকে বলিয়া দিয়াছে, 'আপনি ত কোনও পাপে নাই, আপনি জজের সকল কথায় সায় দিবেন, আপনার ভয় কি?' জজ অতি বিকট স্বরে রুক্ষ ভাবে বলিলেন, 'নীলকমল পালচৌধুরী, তোম বড়া বদ্‌মায়েস্ হ্যায়।' নীলকমলবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে অতি-ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছেন, 'হাঁ হুজুর, হাঁ, হাম্ বড়া বদমায়েস্ হ্যায়।' আসামী খামকা স্বীকার করে, জজ সাহেবের ইচ্ছা নহে; তিনি কাজেই একটু নরম হইয়া বলিলেন—'টোম্ বড়া সাচা!' নীলকমল পূর্ববৎ কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্নকণ্ঠে হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'হাঁ হুজুর! হাম্ বড়া সাচা।' জজ নীলকমল বাবুকে নামাইয়া দিয়া মোকদ্দমার সাক্ষী ডাকিতে বলিলেন।

শ্রীমোহন পশুপক্ষীর স্বর উত্তম অনুকরণ করিতে পারিতেন; ভাল ছায়াবাজি দেখাইতেন। রাত্রিকালে কেবলমাত্র হস্তের সাহায্যে অল্প-ভিজা চাদরের উপর, কত পশু-পক্ষী নর-নারীর অবয়ব দেখাইতেন। এখন সায়েন্স-বলে আমরা বলীয়ান্ হইয়া বায়োস্কোপ দেখি—দেখ দেখি, কত উন্নতি ও কিরূপ উন্নতি!

সেই সময়কার উলার আর এক জন 'কেষ্টবিষ্ণু'—**রঘুনাথ ভট্টাচার্য** বা **মুনকে রঘুনাথ**। এমন প্রসিদ্ধি ছিল যে, তিনি 'জলে স্থলে' সর্ব-প্রকারে এক মন জিনিস আহার করিতে পারিতেন। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, দরিদ্র নহেন, কেবল আহার করিবার পারিতোষিক-রূপে তাঁহার নানা স্থানে বৃত্তি ছিল, তবু একবার দেনার দায়ে তাঁহার কয়েদ হয়। দুই-তিন দিন জেলে অনাহারে আছেন। ✓০ এক আনা খোরাকীতে তাঁহার কি হইবে! তৃতীয় দিনে জেলর বিচারপতিকে জানাইল—রঘুনাথকে তলব হইয়া জিজ্ঞাসায় রঘুনাথ বলিলেন, 'এক আনা পয়সায় আমার খোরাকী হইতে পারে না।' জজ বলিলেন, 'কত হইলে হয়?' রঘুনাথ বলিলেন, 'অন্তত এক টাকা চাই।' ডিক্রীদারের নিকট হইতে তাহাই দেওয়ানো হইল। রঘুনাথ রক্ষীদের সঙ্গে গিয়া নিজে বাজার করিয়া আনিলেন —✓৫ সের চাল, ✓২ সের দাল, একটা ✓৫ সের রুই মাছ—ইত্যাদি। স্বহস্তে রন্ধন করিলেন, রুয়ের মুড়াটা আস্তই রাখিয়াছেন, চিরিয়া দেন নাই। আহারের সময় জজ সাহেব দূরে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন। পঞ্চগণ্ডূষ করার পর দাল দিয়া ২।৪ থাবা ভাত খাইয়া ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া, ✓৫ সের রুইয়ের মুড়াতে কামড় দিয়া কড়মড় করিয়া মুড়া ভাঙ্গিতে লাগিলেন! জজ সাহেব সেই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন, 'হামকো মৎ খাও বেটা, ডোসরা মুদ্দই হাজির, উস্‌কো খাও।' বলিয়া বগী হাঁকাইয়া কাছারীতে চলিয়া গিয়া বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে প্রত্যহ ১৲ করিয়া খোরাকী দিতে পারিবে কি না। সে পারিবে না বলাতে আসামীকে খালাস দিলেন। মুক্ত হইয়া রঘুনাথ উলায় চলিয়া আসিলেন।

এরূপ কত গল্প প্রচলিত ছিল। বর্ধমানের মহারাজ রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন, 'ভট্টাচার্য! ঐ কাঁটালটি সেবা করুন।' ভট্টাচার্য রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, সমস্ত কাঁটাল খোসা-ভূতুড়ি-সমেত উদরস্থ করিলেন। অদ্ভুত আহারের জন্য বর্ধমান হইতে তিনি বিশেষ বৃত্তি পান

আমি যখন রঘুনাথ ভট্টাচার্যকে দেখিয়াছি, তখন তিনি প্রৌঢ়বয়স্ক। বয়স্ ষাটের কাছাকাছি। তখন ঐ সকল গল্প, গল্পের মতই শোনা যাইত। তখন তিনি সাধারণ জনগণ হইতে কিছু বেশি খাইতেন মাত্র। আমাদের চুঁচুড়ার বাড়ীতে একবার আহার করেন। পিতৃদেব আহার দেখিয়া বলিলেন, 'কৈ, আপনার আহারের যে এত গল্প

শুনিয়াছি, তাহার ত কিছুই দেখিলাম না।' উত্তরে ভট্টাচার্য বলেন, 'গঙ্গাচরণবাবু, আমি যে অন্ন লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা যদি রয়েবসে খেতাম, ত বোধ হয়, আরও ৫০ বৎসর জীবিত থাকিতাম—তখন তা ত বুঝি নাই, এখন একটু বুঝিয়াছি, তাই আর বাড়াবাড়ি করি না।'

রঘুনাথের সে সময়ে ভূষণ ভট্টাচার্য বলিয়া একটি পালোয়ান পুত্র ছিলেন, আরও পুত্র-কন্যা ছিল। ভূষণ বীরপুরুষ, তাই তাঁহার কথা বলিতেছি।

তখন দেশে **ব্যায়ামচর্চা** ছিল। এখনকার মত ব্যায়াম নহে। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে ঠিক দুপুর রৌদ্রে যুবকেরা ব্যায়াম করিত। ব্যায়াম ফুরাইল—অমনি ট্রামে উঠিয়া বৌবাজারে চলিয়া গেল ; ব্যায়াম করে, অথচ এক পোয়া পথ চলিতে পারে না, তখন এমন বিড়ম্বনা ছিল না। তখন যাহারা ব্যায়াম করিত, তাহারা দুই-দশ ক্রোশ চলিতে গাড়ী-পাল্কীর ভাড়া দিত না। উলাতেও বেশ ব্যায়ামচর্চা ছিল। **ভূষণ ভট্টাচার্য** একজন পালোয়ান ছিলেন। পালোয়ানীর পরীক্ষা হইত জন্মোৎসবের সকাল বেলা, আমাদের কাছারী বাড়ীর সম্মুখের মাঠে। মাঠের পূর্বে আমাদের ভাড়াটিয়া দোতলা বাড়ী, সেখান হইতে আমাদের বাড়ীর মেয়েরা দেখিতেন। উত্তরে মাঠে কাছারীর আটচালা, সেইখানে ভদ্রলোকেরা বসিতেন ; পশ্চিম দিকে সদর রাস্তা, এবং তাহার পশ্চিমে অনেকটা খোলা জমি, এই রাস্তায় ও জমিতে লোকে লোকারণ্য। দক্ষিণ দিকে শিবের ভাঙ্গা মন্দির ও মন্দিরের আচ্ছাদনস্বরূপ সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষ, সেই গাছের উপর পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা।

পালোয়ানেরা জাঙ্গিয়া আঁটিয়া, এবং সঙ্গের ছেলের দল, গায়ে কাদা মাখিয়া জয় নন্দলালকি! বলিয়া, মহা গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। কতকটা জল ঢালিয়া দেওয়া হইল, ছেলেরা নাচিতে ও লাফাইতে লাগিল। তাহার পর লাঠিখেলা হইল। শেষে কুস্তি।

তখনও ভূষণ প্রভৃতি লম্বা-কোঁচা কাপড় পরিয়া দণ্ডায়মান। পিতৃদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'এইবার ভূষণ এস হে।' ভূষণের প্রতিদ্বন্দ্বী বীর বকো মাল। ভূষণ জাঙ্গিয়া পরিয়া, বাহুতে মাটি লাগাইয়া মল্লবেশে উপস্থিত। বকোও সেইরূপ বেশে অন্য দিক্ দিয়া রণস্থলে প্রবেশ করিল। সেলাম, কুর্নিস, বাউকসাকসি, বাহ্বাস্ফোট, উর্বাস্ফোট, কত কি হইতে লাগিল ; তাহার পর মাটিতে পড়িয়া কস্তাকস্তি, কেহই অপরকে চীৎ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। একবার আমার মনে পড়ে, ভূষণ ভট্টাচার্য বকো মালের মাথায় এমন ঢুঁ মারিল যে, মাথা ঝাঁ করিয়া উঠিল, বকো বসিয়া পড়িল, মাথায় গামছা বাঁধিল ; একটু ম্রিয়মাণ হইল, আমিও হইলাম। খেলা সেবারে ভাঙ্গিয়া গেল—আমি ম্রিয়মাণই রহিলাম। কতক্ষণ পরে খবর আসিল, বকো বাজারে গিয়া মদ খাইতেছে। সকলে হাসিতে লাগিল, আমি কিন্তু ম্রিয়মাণই রহিলাম।

এই সকল মাল, ভাঁড়, খাইয়ে বা পাগলের কথা বলিলাম বলিয়া এমন কেহ মনে করিবেন না যে, উলায় সম্ভ্রান্ত বা পণ্ডিত লোকের অসদ্ভাব ছিল। উলার বামনদাস-বাবু বা শম্ভুনাথবাবু বড়মানুষ বলিয়া যে 'অবুতবু গিরিস্থতো' গোছ অকর্মণ্য ছিলেন, তাহা নহে। বিশেষ কর্মঠ এবং চৌকোশ লোক ছিলেন। বৃহৎ পরিবার, ছোট ছোট ছেলে মেয়েই ছিল বিশ-ত্রিশটি। বামনদাস স্নানের পূর্বে ইহাদের প্রত্যেকটিকেই একবার কোলে লইতেন, নাম ধরিয়া সোহাগ করিতেন, সম্পর্ক ধরিয়া বিদ্রূপ করিতেন। এখনকার কালে কয়জন বড়লোকে তা পারেন ? শম্ভুনাথ যাত্রা-মহোৎসবাদির পর্যবেক্ষণ করিতেন, সেই বৃহৎ গুম্ফজোড়া খাড়া হইয়া উঠিত। শান্তিপুরে একবার পাল্কী করিয়া শম্ভুনাথবাবু যান ; সেখানকার একজন দুষ্ট মেয়ে বলিয়াছিল, 'দিদি, দেখে যা, পাল্কীর মধ্যে একজোড়া গোঁফ যাইতেছে।' শান্তিপুরের মেয়েরা এবং উলার পুরুষেরা বড় রসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

উলার এক জন রসিক পুরুষের পরিচয় দিতেছি। **মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়** মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এক জন সভাসদ্ ছিলেন। সকলরূপ বিদ্রূপ চলিতে পারে বলিয়া, মহারাজ মুক্তিরামের সহিত 'বেহাই' সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। সর্বদাই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন। উলায় বহুতর কুলীনের বাস, এই জন্য নানা বিদ্রূপ চলিত। হরুঠাকুরের কবির দলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাতেই ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী দল গাহিয়াছিল,—

'এরা সব্ কুলীনের, সব্ কুলীনের ছেলে,
এদের গাল দিব কি ব'লে?'

এরূপ কথা কুলীনদের বিরুদ্ধে সে সময়ে সর্বদাই চলিত। মহারাজও করিতেন। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র একটি গালি স্থির করিয়া মুক্তিরাম সভায় প্রবেশ করিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁ হে! বেহাই, তোমাদের উলায় নাকি বৌ বিক্রয় হয়?' মুক্তিরাম অমনই হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞা হাঁ, নিয়ে-যাওয়া মাত্রই।' সকলেই হাসিয়া উঠিল, মহারাজ নীরব।

একদিন মুক্তিরাম মুখুয্যে ভাল মাগুর মাছ পাইয়া মহারাজকে পাঠাইয়া দেন। মহারাজ সামান্য জিনিসও আহ্লাদ করিয়া লইতেন। মহারাজ মাগুর মাছ পাইয়া বড় সন্তুষ্ট, তদধিক সন্তুষ্ট একটি গালি দিবার পন্থা বাহির করিয়া। এখন মাগুর-এর শেষের র বাদ দিলেই মাগু হয়, —স্ত্রীকে বুঝায়। তাই মুখুয্যে আসিবামাত্রই মহারাজ বলিলেন, 'ওহে বেহাই, ও-বেলা কি পাঠাইয়াছিলে, আমি তাহার অন্ত পাই নাই।' মুক্তিরাম বুঝিলেন, ব্যাপার কি! বলিলেন, 'মহারাজ, আমাদের পাগলের দেওয়া জিনিস, উহার আদি অন্ত দুই-ই ছিল না।' রাজা মুখের মত হওয়াতে বলিলেন, 'বটে বটে।' 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—এই সকল হাসিমস্করার এই পর্যন্ত থাকাই ভাল।

বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে উলা বিশেষ দ্রব্যসম্ভার দিয়াছে, এবং বিশেষ ছাপ পাইয়াছে। সেই দুর্গাপ্রসাদ হইতে এই চন্দ্রশেখর বসু পর্যন্ত সকলেই উলার অঙ্কনন্দন। যদি বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাচীন দশ জন লেখকের নাম করিতে হয়, তবে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীকার দুর্গাপ্রসাদের নাম তাঁহাদের মধ্যে দিতেই হইবে। গ্রন্থখানি নিরেট, অচ্ছিদ্র, ভাবে ভরপূর, রসে ডগমগ; ইহার ভাষা সরস, সরল, প্রাঞ্জল, ভক্তিরসে পূর্ণ, ভক্তিতরঙ্গিণীতে তরঙ্গিণী। এমন গ্রন্থ আজিকালি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। মধ্যে শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবু একবার ছাপাইয়াছিলেন; সে সংস্করণও বোধ হয় ফুরাইয়াছে। আবার মুদ্রিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আমরা বালককালে, ৮।১০ বৎসর বয়সে উলায় ছিলাম। তখন হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় গ্রন্থ লিখিতেছেন, আর তাহার পর পাঁচ যুগ—ষাটি বৎসর গিয়াছে—এখনও তাঁহার লেখনীর বিরাম নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'বাখরগঞ্জের বিবরণ' পিতৃদেবকে পড়িয়া শুনাইতেন, আমার বেশ মনে আছে। তাহার পর কত বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র হইতে সংকলন করিয়া চন্দ্রশেখরবাবু সাহিত্য-ভাণ্ডারে উপঢৌকন দিলেন, সে সকলই আমাদের শিক্ষা সুকর করিবার আয়োজন। তাঁহাকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি, উলাও ধন্য হইয়াছে।

সাহিত্য ২৪শ বর্ষ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩২০

হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা

হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত কিনা?—এই প্রশ্ন আর এক ভাবে বলিলে, এই বলিতে হয় যে বিধবার ব্রহ্মচর্য পালনীয় কিনা। বিধবার ব্রহ্মচর্য যদি সদনুষ্ঠান হয়, তবে পালনীয় বটে,—কঠোর হইলেও পালনীয়। সম্পূর্ণ যাজন অসম্ভব হইলেও, unpractical হইলেও, অবশ্য পালনীয়। তবে হিন্দু বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য সঙ্গত কি অসঙ্গত, ইহা বুঝিবার জন্য বিবাহ বলিলে হিন্দু কি বুঝেন, তাহা অগ্রে বুঝা চাই।

সকল অনুষ্ঠানই যেমন দুই দিক্ দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়, হিন্দুর বিবাহও সেইরূপ দুই দিক্ দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়। এক ভাবে বলা যাইতে পারে যে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। জড়দিক্ দেখিলে উদ্দেশ্য ঐরূপই বটে। কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য যদি ঐরূপই হইল, তবে আর অত বাঁধা-ছাঁদা কেন? উপবিবাহই ত যথেষ্ট। ইহার উত্তর স্বরূপে বলা হইয়াছে যে, পুত্রের জন্য বিবাহ করা আবশ্যক। ভাল, পুত্রেরই-বা প্রয়োজন কি? পিণ্ড-প্রাপ্তির জন্য পুত্রের প্রয়োজন। পিণ্ড আত্মতোষণের উপকরণ, উহাতে আর 'কেন' এই শব্দটা উঠিবে না। আত্মপোষণ, আত্মতৃপ্তি, স্বার্থ-রক্ষা, এই সকলের একটি-না-হয়-আরটিই, এইরূপ যুক্তির চরমপদ।

অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন—এ সিদ্ধান্ত

বিবাহের অতি নিকৃষ্ট ভাগ, অতি সামান্য ভাগ দেখিয়াই হইয়াছে। হিন্দু বিবাহের অতি উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে; সকল ব্যাপারেই হিন্দুর আধ্যাত্মিক দিকে দৃষ্টি প্রখরা। হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।

বিশাল হইতে বিশালতরে, বিশালতর হইতে বিশালতমে পরিণতি, অথচ বিলয়, ইহাই জগতের ক্রম, ইহাই জগতের নিয়ম, ইহাতেই জগতের সৌন্দর্য। এই ক্ষুদ্র মানবজীবনের বিশাল হইতে বিশালতমে পরিণতিই ইহার পরমার্থ। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাহার সুন্দর ক্রম আছে, সুচারু পদ্ধতি আছে। প্রথমে আপনার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, তাহার পর পারিবারিক বা সাংসারিক উন্নতি, তাহার পর সামাজিক উন্নতি, সর্বশেষ ঐশ্বরিক উন্নতি। জীবনের এই চারিটি ক্রম হইতেই চারিটি আশ্রম। দ্বিতীয় আশ্রমের, অর্থাৎ গৃহীর পারিবারিক জীবনের মূলগ্রন্থি গৃহিণী। গৃহিণী লইয়াই গৃহ। গৃহিণী না হইলে গার্হস্থ হয় না; গার্হস্থ আশ্রমের পরে না হইলে সন্ন্যাস ধর্ম হয় না। সন্ন্যাসরূপ বিশালতর সামাজিকতা হইতে বিশালতম বিশ্বযোগ বা সমাধি। কাজেই পণ্ডিতে বলিয়াছেন, 'হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য মুক্তি।' 'বিবাহ মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রণালী।' বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের অবলম্বন। 'অসম্পূর্ণ পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি' হন। হিন্দুবিবাহে পতিপত্নীর যেরূপ একত্ব হয়, 'এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই।' 'সে বিবাহ-প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আমরা দুইটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, সে বিবাহ-প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। 'জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিশিখাতে মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ তেমনই স্ত্রীতে, এবং স্ত্রী তেমনই পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে।' 'স্বয়ম্ভূ নিজদেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পুরুষ নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দুই খণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক স্বয়ম্ভূ প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে।' 'স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ মনুষ্যত্ব-সাধক।' হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য 'এই মিশ্রণ এবং একীকরণ।'

একটি পুরুষের সহিত একটি স্ত্রীর একীকরণের নাম বিবাহ বটে; কিন্তু সেই পুরুষ আকাশ-বিক্ষিপ্ত প্রান্তরস্থিত কোন ব্যক্তি নহেন; তিনি একটি বিশেষ গোত্রের, বিশেষ প্রবরের, বিশেষ কুলের অন্তর্গত এবং অঙ্গীভূত ব্যক্তি। স্ত্রীকে পুরুষের অর্ধাঙ্গ হইতে হইলে অগ্রে তাঁহার গোত্রান্তর আবশ্যক; হিন্দুর বিবাহ বিলাতের মত রূপজ, গুণজ মোহের মিলন নহে; নেড়ানেড়ির কাণ্ডও নহে। একটি পরিবারে দশটি স্ত্রীপুরুষ আছেন, আর একটি আসিয়া তাহাতে মিশিয়া যাইবে, তবে তাহার বিবাহ হইবে। সেই বিবাহের পর হইতে সেই পরিবার-মধ্যে আর একটি সম্পূর্ণ পুরুষ হইল, একথা ঠিক, কিন্তু একে আর একে মিলনে যে এরূপ হইল, তাহা নহে, দশে আর একে মিলন হইয়া, তবে সেই সম্পূর্ণতা সম্পাদন হইল। অতএব, কেবল একে আর একে মিলনের নাম বিবাহ নহে, আধখানিকে পুরা একখানি করিবার জন্য একটি পরিবার-মধ্যে একটি নারীর আগম, মিলন ও মিশ্রণই বিবাহ। বিবাহ—কুললক্ষ্মীর কুলে প্রতিষ্ঠা। ভবিষ্যদ্ গৃহিণীর গৃহে অধিষ্ঠান। বৈদেশিক বিবাহের পরই যুবক যুবতী মধুমাস—কুলভ্রষ্ট, গোষ্ঠীভ্রষ্ট, সমাজভ্রষ্ট হইয়া বাস করেন; আমাদের দ্বিরাগমনের নবোঢ়া সমস্ত পরিবারের সম্রাজ্ঞী-সেবিকারূপে অর্ধহস্ত গুণ্ঠনে গুণ্ঠিত হইয়া কুটনা কুটিতে বসিলেন। হিন্দুর বিবাহ একটি কুল-কর্ম—আত্মকৃতি নহে।

অতএব বুঝিতে গেলে বলিতে হয়, একটি পরিবারের সহিত একটি হিন্দু কুমারীর বিবাহ হয়; কেবল একটি পুরুষের সহিত নহে। আমাদের লৌকিক কথায় ও ব্যবহারেও আমরা সেইরূপ বুঝিয়া আসিতেছি। 'মেয়েটির কোথায় বিবাহ দিলেন, মহাশয়?' উত্তর, 'শ্রীপুরের চৌধুরীদের বাড়ী।' 'ভাল বংশ বটে, ভাতকাপড়ের দুঃখ হবে না।' তাহার পরের প্রশ্ন 'পাত্রটি কেমন?' 'কলেজে লেখাপড়া করিতেছে।' তবেই মুখ্য কথাটা হইল যে, কুল কেমন? কেন-না হিন্দু বুঝেন, বিবাহ কুলের সহিত, বিশেষ-পুরুষ কেবল পাত্র মাত্র।

বিবাহের মন্ত্রে বর বারংবার বলিতে থাকেন—

ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ, ধ্রুবা পৃথিবী,
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ,
ধ্রুবাসঃ পর্বতাইমে,
ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।

আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ধ্রুব, পর্বত সকল ধ্রুব, এই স্ত্রীও পতিকুলে ধ্রুব।

কন্যা বলেন—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহম্।
পতিকুলে ভূয়াসম্।

হে ধ্রুব নক্ষত্র, তুমি যেমন অচল, আমি যেন তেমনি পতিকুলে অচলা হই।

বর কন্যাকে বলিতেছেন—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব,
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব,
ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব,
সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।

শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূজনে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দায় সম্রাজ্ঞী হও, দেবর সকলে সম্রাজ্ঞী হও।

অতএব স্ত্রীকে কেবল The Empress of my heart হইলে চলিবে না. The Slave Empress of a whole family হওয়া চাই। 'যতগুলি লোক লইয়া পরিবার, পত্নীর ততগুলি সম্বন্ধ বা ততগুলি লোকের সহিত সম্বন্ধ।' 'হিন্দু পত্নীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচল ভাবে,' ধ্রুব নক্ষত্রের মত স্থির রাখিতে 'আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান্।'* হিন্দুর বিবাহে দুইটি তারা দেখিতে হয়— একটি অরুন্ধতি, আর একটি ধ্রুবতারা। অরুন্ধতিকে সাক্ষী করিয়া, আদর্শ করিয়া, কন্যা বলেন, 'হে অরুন্ধতি, আমি যেন তোমার মত পতিতে আবদ্ধ থাকি, (অরুন্ধতি বশিষ্ঠের জায়া, তিনি আকাশেও বশিষ্ঠের সহচরী), অর্থাৎ ইহকালে পরকালে যেন সমান আবদ্ধ থাকি। আর ধ্রুবকে সাক্ষী করিয়া বলেন, 'আমি যেন তোমার মত পতিকুলে চিরস্থির থাকি।'

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা বিধবা বিবাহ-সম্বন্ধে একটিও কথা কহি নাই, এখন একবার আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে, বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ কথাটা যেন কেমন-কেমন লাগে না কি? ধর্মের দিক্ দিয়া দেখিলে, হিন্দু নারীর বিবাহ যেরূপ পদার্থ, তাহাতে তাঁহার পুনর্বিবাহের কথা উঠিতেই পারে না।

হিন্দু রমণী একবার যে কুলে গৃহীতা, নীতা ও পরিণীতা হইয়াছে, সে কোন প্রকারেই আর সে-কুল ত্যাগ করিতে পারে না। কুলত্যাগিনী, কুলটা, ব্যভিচারিণী—আমাদের হিন্দুদের অভিধানে একই পর্যায়ভুক্ত। এই পরিভ্রাম্যমাণ জগতের মধ্যে এক মাত্র অচল, অটল পদার্থ ধ্রুব নক্ষত্রকে সাক্ষী করিয়া হিন্দু নারী বলিয়াছেন,—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহম্।
পতিকুলে ভূয়াসম্।

আমি যেন পতিকুলে অচলা হই; তবে আজি কোন্ প্রাণে সেই পতিকুল ত্যাগ করিবেন? তবে যে ধর্মের দিকে তাকাইবে না, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

তাহার পর আবার দেখ, বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মায় আত্মায় মিল। হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস, মানবের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তিতে তাঁহার আত্মার ধ্বংস হয় না, পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর জাতি-ধর্ম। এখন বলুন দেখি, হিন্দু নারী স্বামীর পরলোক-প্রাপ্তিতে কি বলিয়া পুনর্বার বিবাহ করিতে যাইবে? তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে স্বামী বিদেশে থাকিলে ত, তাঁহার পুনর্বার বিবাহের দাবি চলিবে। পবিত্র সাবিত্রী নামে উৎসর্গীকৃত এই লাইব্রেরীর অধিবেশ-অবসরে, এ সকল কথা মুখে আনিতেও কুণ্ঠা হয়। সাবিত্রী চতুর্দশীর ব্রতকথার শিক্ষা আমরা ভুলিতেছি; শাস্ত্রের উপদেশ যে, যিনি সতী তিনি স্বয়ং যম রাজকেও ভয় করেন না, কৃতান্ত তাঁহাকে পতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে

* বিবাহ-সম্বন্ধে সমস্ত উদ্ধৃত বাক্যই বাবু চন্দ্রনাথ বসু-কর্তৃক সাবিত্রী লাইব্রেরির পূর্ব এক বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত 'হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ও বয়স' নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

পারে না। এ কথা আমরা বিশ্বাস করি, সতী কখন বিধবা হন না; স্বামী দেশেই থাকুন, আর বিদেশেই থাকুন, ইহ লোকেই থাকুন, আর পরলোক-গতই হউন, দুই দিনের, দশ দিনের, যুগের, মহাযুগের বিচ্ছেদ হইলেও তিনি স্বামীর; স্বামী তাঁহার; তবে সতী আর বিধবা হইলেন কৈ? সাবিত্রী চতুর্দশীর ব্রতকথার এই গভীর উপদেশ। যে নারী এই মহান্ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। চমৎকার উপদেশ! চমৎকার ধর্ম!

দেখা যাইতেছে যে-দুইটি তারাকে সাক্ষী রাখিয়া হিন্দু নারী বিবাহিতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুই জনেই তাঁহার পুনর্বিবাহের একান্ত বিরোধী; অরুন্ধতি বলেন, 'তুমি যে আমার মত ইহকালে পরকালে স্বামি-সহচরী থাকিবে বলিয়াছিলে তোমার সে কথা থাকে কৈ?' ধ্রুব বলেন, 'তুমি যে আমার মত স্বামিকুলে অচল অটল থাকিবে বলিয়াছিলে, তোমার সে কথাটাই-বা থাকে কৈ?' তবে ত হিন্দু বিধবার আর বিবাহ করা হয় না? যদি নাই হয়, তবে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের পর্যন্ত কণ্ঠস্থ 'নষ্টেমৃতে' শ্লোকের কি দশা হইবে? দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভবও একপ্রকার বৈধ পুত্র, সে ব্যবস্থার কি হইবে?

মাংসাহার-সম্বন্ধে মনুর শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, হরিণটি, ছাগলটি—কোন কোন স্থলে খাইতে পার বটে, কিন্তু—

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে পারলেই ধর্ম। এ স্থলেও ঠিক তাহাই, 'নষ্টে' পারিবে, 'প্রব্রজিতে' পারিবে, ইত্যাদি, কিন্তু—

প্রবৃত্তিরেষা নারীণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, দেবল, নারদ, পরাশর, মনু—ধর্মশাস্ত্র-প্রযোজক সকলেরই এই মত; সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের এই মত। নষ্টে মৃতের পরের শ্লোকটি পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। মনু যেমন পৌনর্ভবকে পুত্র মধ্যে ধরিয়াছেন, তেমনই কানীন ও গূঢ়োৎপন্নকেও পুত্র বলিয়াছেন। যদি পৌনর্ভবের পুত্রত্ব দেখাইয়া বিধবা বিবাহ ধর্ম-সঙ্গত বলিতে পারা যায় তাহা হইলে কানীন ও গূঢ়োৎপন্ন পুত্রের দোহাই দিয়া, পিনালকোডের ধারা-বিশেষের ধর্মত সাফাই করাও চলে। না, শাস্ত্রের ওরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।

আদর্শ সমাজের রীতি-নীতি লইয়া শাস্ত্র নহে। ধর্মের আদর্শ ব্যবস্থা বলিয়া দিয়া, সমাজের সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সংস্করণ,—শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যে দেশে বন্য বিন্ধ্যাচল-বাসী হইতে, বেদ-নিরত ব্রাহ্মণ—চির দিনই আছেন, সে দেশে অষ্ট প্রকার বিবাহ, দ্বাদশ প্রকার পুত্র, শতকর্মে শত বিধ ব্যবস্থা থাকিবেই থাকিবে; অন্তত থাকাই স্বাভাবিক; মাংসাহার প্রসিদ্ধ, আবার নিষিদ্ধ; যজ্ঞে পশুবধ শ্রেয়, আবার অহিংসা পরমধর্ম; বিধবা বিবাহের নিষেধ, আবার বিধি;—এ সকলই থাকিবে; তাই বলিয়া তাহার সকল কথাই কি ধর্ম-সঙ্গত? কখনই কোন শাস্ত্রকার তাহা বলেন না। তাঁহারা সকলেই সকল কার্যে মুখ্য-গৌণ-ভেদ করিয়াছেন; যেটা হওয়া উচিত, কিন্তু পুরাপুরি হয় না, সেইটিই মুখ্য। তাহাই ধর্ম। সুতরাং শাস্ত্রের মুখ্য বিধিগুলিই ধর্ম। তবে আবার গৌণ ব্যবস্থাগুলি লইয়া আমরা ধর্মাধর্মের বিচারে প্রবৃত্ত হইব কেন? কোন্‌টি উচিত, কোন্‌টি অনুচিত,—ধর্মের নিকষেই তাহা স্থির হয়; মুখ্য ব্যবস্থা দেখিয়াই ধর্ম বুঝিতে হয়; 'নষ্টে মৃতে' ইত্যাদি গৌণ ব্যবস্থা লইয়া উচিত অনুচিত মীমাংসা করা যাইতে পারে না।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে-প্রণালী অবলম্বন করিয়া সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্র-বিচার করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে, হিন্দু শাস্ত্রের মর্মার্থ-গ্রহণের কতকটা সঙ্কেত পাই।

বিধবার ব্রহ্মচর্যের বিধিও শাস্ত্রে আছে, বিধবার সহমরণের বিধিও শাস্ত্রে আছে; মহাত্মা রামমোহন রায় বলেন যে দুইরূপ বিধি থাকিলেও কেবল ব্রহ্মচর্যই বিধবার অবলম্বনীয়। এই কথা লইয়া সে সময়ে ঘোরতর বিচার-বিতর্ক হয়। মহাত্মা কিরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেখুন—

কোন কোন শাস্ত্রে আছে বটে, 'যে-স্ত্রীলোক সহমরণ ও অনুমরণ করে, তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গ ভোগ হয়',

'কিন্তু বিধবা-ধর্মে মনু প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে অনুধাবন কর। আহারাদি বিষয়ে নিয়ম-যুক্ত হইয়া সাধ্বী স্ত্রী কেবল ধর্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান-পূর্বক থাকিবেন।' কিন্তু সহমরণ সকাম কার্য, ব্রহ্মচর্য নিষ্কাম ধর্ম। 'ভগবান্ মনু সর্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ হয়েন; তেঁহ ঐ দুই শ্রুতির অর্থকে বিশেষ জানিয়া সকাম শ্রুতির দুর্বলতা স্বীকার-পূর্বক, নিষ্কাম শ্রুতির অনুসারে, পতি মরিলে, স্ত্রীকে ব্রহ্মচর্যে থাকিতে বিধি দিয়াছেন।' যে হেতু 'ঐহিক কিংবা পারত্রিক ফল কামনাপূর্বক কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্মকে কাম্য কহা যায়, সে-কাম্য কর্ম সর্বথা নিষিদ্ধ।' আর প্রতিবাদীরা যে লিখিয়াছেন, 'কাম্য কর্মের নিষেধ কোথাও নাই,—এ অশাস্ত্র; যে হেতুক কাম্য কর্মের নিষেধক শ্রুতি ও স্মৃতি লিখিলে, স্বতন্ত্র বৃহৎ এক গ্রন্থ হয়।'* রাজা মহাশয় যদিও বৃহৎ গ্রন্থ লেখেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, নিষ্কাম আশ্রম-ধর্মের যাজনা করাই হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ; সকাম কর্মের নিষেধ শ্রুতিস্মৃতিতে,—উপনিষৎ, গীতায়—সর্বত্র সমান ভাবে আছে।

এখন মহাত্মার প্রদর্শিত যুক্তির অনুসরণ করিয়া হিন্দু বিধবার কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন;—বিধবা পুনর্বার বিবাহ করিতে পারেন, স্বামিসহমরণে তনুত্যাগ করিতে পারেন, আর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিপাত করিতে পারেন; মনে করুন শাস্ত্রে তিন পন্থাই দেখানো আছে—তিনটিই কি উচিত? তাহা কখনই হইতে পারে না। কোন্‌টি ত্যাজ্য, আর কোন্‌টি অবলম্বনীয়, হিন্দু তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

স্বামীর পরলোক-গতির পর, যে-রমণী বিবাহ করেন, তিনি আপনার জন্যই বিব্রত; তাহাও আবার কেবল নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থ করিবার জন্য উৎসুক। সুতরাং তাহার কার্য, কাম্য-মধ্যে ঘোরতম কাম্য। নিকৃষ্ট সমাজে এরূপ প্রথা তখনও ছিল,—এখনও আছে। নাগকন্যা উলূপী, রাক্ষস-জায়া মন্দোদরী বা বানরপত্নী তারা, পুনর্ভূ হয়েন; শ্রেণীবিশেষ-মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল বলিয়াই শাস্ত্রে এরূপ কাম্য কর্মের উল্লেখ আছে; কিন্তু কাম্য কর্মের নিষেধ, শাস্ত্রের প্রতি শাখায় প্রশাখায় দেখিতে পাওয়া যায়। সহমরণও কাম্য কর্ম; তবে পারত্রিক সুখভোগের কথাটা, স্বামীর ত্রিকোটি কুল উদ্ধারের কথাটা, উহার সহিত জড়িত থাকায়, এরূপ ঐহিক আত্ম-বিসর্জন, কাম্য কার্য-মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু তবু ত কাম্য বটে, সুতরাং হিন্দু বিধবার পক্ষে এক মাত্র ব্রহ্মচর্যই অবলম্বনীয়।

পতি-বিয়োগের পর স্বামীকে স্মরণ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম-পূর্বক যাঁহারা জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করেন, সকল সভ্য দেশেই এরূপ সাধ্বী নারী পুনর্ভূ অপেক্ষা সমধিক সম্মানিত, এবং আমরণ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারে জীবন যাপন করেন—এরূপ নরনারীর সম্প্রদায় প্রায় সকল সভ্য দেশেই আছে, আর সভ্য-জাতি-সেব্য সকল ধর্মেই এরূপ ব্রহ্মচর্যের আদর আছে। খৃস্ট ধর্মের ইউরোপে, মুসলমান ধর্মের আরব, পারস্য, তুরস্কে; বৌদ্ধ ধর্মের চীন, জাপানে—আছে। কিন্তু হিন্দু-মধ্যে ব্রহ্মচর্য কেবল মাত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সেব্য নহে। প্রতি গৃহের ভিত্তিরূপে এবং ছাদরূপে ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা। এই অধঃপতনের পূর্বে এমন দিন ছিল, যখন সাধারণত কৈশোরের ব্রহ্মচারী, যৌবনে গৃহী হইয়া আবার সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিতেন। যে জাতি সমগ্র মনুষ্য-জীবন কেবল মাত্র একটি অনুদ্যাপনীয় অনন্ত ব্রত বলিয়া এখনও মনে করে, সে জাতির পক্ষে এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে।

হিন্দুর সতীত্ব ধর্মের পরিষ্কার আদর্শ-বলে, হিন্দুর সমাজ-সংগঠনের আধ্যাত্মিক প্রণালী-প্রযুক্ত, হিন্দুর ব্রতবেদী গৃহের নিয়ম-অনুসারে, হিন্দু বিধবা আমরণ ব্রহ্মচারিণী। পতিভক্তি, পতিপ্রীতি, পরকালে স্থিরতর বিশ্বাস, সামাজিক ব্যবস্থায় আন্তরিক শ্রদ্ধা, পারিবারিক নিষ্কাম ধর্ম, এই সকল

---

* শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু-কর্তৃক প্রকাশিত মহাত্মার গ্রন্থাবলি-মধ্যে সহমরণ-বিষয়ক 'প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদ' হইতে উদ্ধৃত-বাক্যগুলি সমস্তই গৃহীত।

পবিত্র ভাব সংমিশ্রিত হইয়া হিন্দু বিধবাকে আম ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখে। সাধারণত হিন্দু সমাজ-ম যিনি হিন্দু বিধবার উপর বলব্যবস্থিত ব্রহ্মচর্যের (enforced widowhood) অত্যাচারের কথা বলেন, তাঁহার সহৃদয়তার প্রশংসা করিলে চলে, কিন্তু তিনি হিন্দু নারীর চিত্তক্ষেত্রের স্বচ্ছ, নির্মল, পবিত্র, নিষ্ঠাশক্তি যে সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

আধ্যাত্মিক আর্যধর্মের মহিমা-বলে, সর্বজনপূজ্য মন্বাদি মহর্ষিগণের ধর্ম-সঙ্গত সুব্যবস্থার গুণে, বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগুরুগণের প্রতিভাময়ী সৌন্দর্য-সৃষ্টির আকর্ষণে, মহা মহা মুনিঋষি-প্রণীত পৌরাণিক উপাখ্যান সকলের অপূর্ব উপদেশে, বহুকালের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষায়, সমাজের জলন্ত দৃষ্টান্তে, হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য—তাঁহার সহজ ধর্ম, স্বভাব ধর্ম প্রাকৃতিক ধর্ম হইয়াছে।

অথচ হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য জগতের একটি দুর্লভ পদার্থ। ছাদন দড়ি, গোদা নড়ীর মত এই পাতিব্রত্যে 'যখন যার, তখন তার' ভাব আসিতেই পারে না। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার মূল মন্ত্র 'সোহম্।' হিন্দু নারীর সতীত্বের মূলমন্ত্র 'সোহম্।' হিন্দুর ধর্মের মূলমন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্, হিন্দু নারীর সতীত্বের মূল মন্ত্র, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্। হিন্দু নারীর সতীত্বের এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভাব যাঁহারা নষ্ট করিতে উদ্যত, আবার বলি, তাঁহাদের হৃদয়ের যে-কোন ভাগের প্রশংসা করিতে হয় কর, কিন্তু তাঁহারা যে হিন্দু সমাজের শক্তিতত্ত্বজ্ঞ—এ কথা মুখে আনিও না।

হিন্দু নারী জানেন, কেবল একং এবং অদ্বিতীয়ং; কাজেই তিনি পতিচারিণী হইলেই একচারিণী; সেই পতি যখন ব্রহ্মে লীন হইলেন, কাজেই তিনি ব্রহ্মচারিণী।

সেই মূর্তি কি ক্ষেমঙ্করী, কেমন শান্তিময়ী; কেমন নিষ্কামে কার্যকরী; কেমন কোমলে কঠোর; যেন ইহকালে পরকালের ছায়া; সে সৌন্দর্যে বিলাস নাই; সে কোমলতায় আবেশ নাই; সে ললিত-ভৈরবে গিটকিরি কর্তপ নাই; সে বেহাগে 'ঢলিয়া পড়ি, ধর ধর' নাই। সে মূর্তি আপনাতে নির্ভর করিতে জানে, করিতে পারে; বিনা মূল্যে সংসারের সেবা করে; তাঁহার কাছে ভোগের সহিত সেবার বিনিময় নাই; তাঁহার কর্মই—প্রকৃত নিষ্কাম ক-, তাঁহার ধর্মই প্রকৃত—হিন্দুধর্ম; তাঁহার জীবন—মহাব্রত; তিনিই যথার্থ ব্রতধারিণী, ব্রহ্মচারিণী; তিনি নারী হইয়াও দেবী।

হিন্দু সমাজে, সধবার সন্তান-পালনী, গণেশ-জননী মূর্তি। সেই চোখে চোখে বজ্রহীন বিদ্যুতের ধীর, স্থির চালনা, সেই হৃদয়-নিঃসৃত ক্ষীরের সহিত স্নেহ-সঞ্চার, সে সকলই ভাল; সকলই সুন্দর; কিন্তু তবু তাহার অন্তরতম স্তরে এতটুকু 'আপনি' আছে: জননী আপনাকে ভুলিয়াছেন বটে, কিন্তু কেবল আপনারই জন্য; আপনার সন্তানের জন্য। ইউরোপের কবিরা এই মূর্তি ধ্যান করিয়াছেন; ইউরোপের ধর্মশাস্ত্র এই দেবীমূর্তি গ্রহণ করিয়াছেন; পূজা করিয়াছেন; অঙ্কে শিশু-যিশু-শোভিতা মেরী মূর্তিই গণেশ-জননী। কিন্তু হিন্দু বিধবার সংসার-পালনী ধাত্রী মূর্তি, ব্রহ্মচারিণী মূর্তি,—ইউরোপের কবিরা বুঝেন নাই, ইউরোপের শাস্ত্রজ্ঞেরা জানেন না। বিধবার মর্যাদা ইউরোপ জানে না। ননেরিতে * ব্রহ্মচর্যের অনুকরণ করিতে গিয়া ভ্রংশীকরণ করিয়াছে। সংসার-স্থিতা ব্রহ্মচারিণীর সংসার-নির্লিপ্তা মূর্তি, সংসার সেবিকার সংসার কর্ত্রীর মূর্তি, দাসীর দেবী মূর্তি—এ বৈচিত্র্য, এ রহস্য, ইউরোপ বুঝে না, জানে না; ইউরোপের সাহিত্যে নাই, কবিত্বে নাই, ধর্মে নাই, সমাজে নাই।

সেই রুক্ষ-কেশা, সামান্য-বেশা,—দেব-সেবানুরতা, ভোগ-রাগ-বিরতা,—অতিথি-সংকার-কারিণী, পরিবার-প্রতিপালনী—সেই সেবার কর্ত্রী, সর্বজনের ধাত্রী,—ব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণীই ত এই বঙ্গসমাজ রক্ষা করিতেছেন। তুমি, আমি—আমরা ত সকলেই—এক দিকে উদরের দায়ে ব্যস্ত, অন্য দিকে পৃষ্ঠের ঘায়ে ত্রস্ত। গৃহিণী সন্তানগণের সৃষ্টি-স্থিতি-দায়ে বিব্রত। কেবল হিন্দুর বিধবাই হিন্দুর ধর্ম রক্ষা করিতেছে। হিন্দুয়ানি রক্ষা করিতেছে; নহিলে এত দিন, আমাদের নিত্যসেবা উঠিয়া যাইত, ঠাকুরঘর drawing room হইত. তুলসী-মঞ্চে ক্রোটন বসিত.

শালগ্রামে বিলিয়ার্ড হইত; গৃহে ব্রাহ্মণ-ভোজনের পরিবর্তে ক্লবে ডিনর দিতাম, প্রাত্যহিক আতিথ্যের বদলে, Poor fund-এ subscribe করিতাম, মুষ্টি ভিক্ষুককে যষ্টি দিতাম। তাহা যে আজিও হয় নাই, চুণাগলি যে আজিও চুণাগলিই রহিয়াছে, এখনও রুই-কাতলার রাস্তা হয় নাই,—সে কেবল ঐ বিধবার ব্রত-পালনের ফলে। গৃহে গৃহে সেই নিষ্কাম ব্রত-পালনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এখনও আছে বলিয়া, এই ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে যেন আমরা একটু আলো দেখিতে পাইতেছি, আমরা এত-যে মূর্খ হইয়াছি, তবু যেন একটা মহৎতত্ত্বের আভাস বুঝিতে পাইতেছি। এই ঘোর অমাবস্যার কোটালের প্রবল বানের তুফান-তরঙ্গে পড়িয়াছি বটে, ভাসিয়াও যাইতেছি, তবু ঐ বেদ-ব্রাহ্মণ-অতিথি-পরিবারের সেবিকার মূর্তি দেখিলে মনে হয় যে এ তুফান থাকিবে না, এ তরঙ্গ কমিবে, এ বান ফুরাইবে, এ জোয়ার থামিবে। আমরা আবার সেই অনন্ত-বাহিনী সুরতরঙ্গিণীর মন্দ স্রোতে অনন্ত সাগরাভিমুখে ধীরে ধীরে পূর্বমত যাইতে পারিব।

বিনয়ে প্রার্থনা করি, হিন্দু সমাজের এখনকার দিনের এই একমাত্র জীবন্ত শিক্ষয়িত্রীকে, আপনারা ছলে, বলে, কৌশলে,—আইনে, আন্দোলনে—সহৃদয়তায়, সভ্যতায়—তাঁহার পবিত্র বেদী হইতে অবতারিত না করেন। প্রকৃত শিক্ষকের অভাবে, আমাদের মধ্যে দিন দিন শিক্ষা-বিভ্রাট হইতেছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা শিক্ষা দেন না, getup করেন; পরীক্ষার জন্য ছাত্র গঠন করেন; লড়াইয়ের জন্য মেড়া বানান। দীক্ষাগুরু মৃত মন্ত্র কাণে দেন; সে মন্ত্রের প্রাণ নাই, তাহা প্রাণে লাগিবে কেন? পুরোহিত ঠাকুর শিক্ষা দিবেন কি, নৈবেদ্যের গুরুত্ব বুঝিয়া নিবেদকের গৌরব করেন—শিক্ষার ধার ধারেন না, ভিক্ষারই অবতার। তবে আর শিক্ষা দিবেন কে? এক শিক্ষা দিবে ইতিহাস? তাহা ত জানি না; এক শাস্ত্র? তাহা ত বুঝি না; এক ধর্ম? তাহা ত মানি না; এক অন্যের কর্ম? তাহা ত দেখিতে পাই না। ব্রত শিক্ষা দিতে জীবনের মহাব্রত বুঝাইতে, বাঙ্গালা দেশে মানুষকে মনুষ্যত্ব শিখাইতে, বুঝাইতে, দেখাইতে,—এখনকার দিনে আছেন কেবল হিন্দুর বিধবা; প্রার্থনা করি, তাঁহাকে তাঁহার এই গরীয়সী বেদী হইতে, মহীয়সী পরিচর্যা হইতে যেন পরিভ্রষ্ট না করেন।

হিন্দু সমাজের সহিত হিন্দু বিধবা শিক্ষায়, দীক্ষায়, সুখে, দুঃখে, শিরায় শিরায় জড়িত। যেমন, আতিথ্য, দেবসেবা—ক্রিয়া, কর্ম—শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি লইয়া হিন্দু সমাজ বলিয়া, ইহার কিছুই ত্যাগ করা যায় না, তেমনই বিধবার ব্রহ্মচর্যও এ সমাজের নিতান্ত অঙ্গীভূত; কাজেই অবলম্বনীয়। উচ্চতর হিন্দু সমাজে বিধবার বিবাহ গরম গরম বরফের কুলপীর মত অতি উপাদেয় হইলেও, তাহা হয় না। গরম করিতে গেলে, বরফ থাকে না; বরফ রাখিতে গেলে, গরম করা হয় না। উচ্চতর শ্রেণীমধ্যে বিধবার বিবাহ দিলে, হিন্দুয়ানি থাকে না, হিন্দুয়ানি রাখিতে গেলে বিধবার বিবাহ হয় না। বরফ গরম করিলে, গরম জল হয়, গরম জল অনেক কাজে লাগে; কিন্তু তাহাতে ত প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য বড় ঠাণ্ডা জিনিস—প্রাণ-শীতলকারী পদার্থ; যেখানে তাহা আবশ্যক, সেখানে বিধবা বিবাহের উষ্ণতা আনিলে চলিবে কেন? অবশ্য বলিতে পারেন যে গরম জলও ত চাই? যেখানে চাই, সেখানে আছে; থাকিবেও।—নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আছেও বটে, থাকিবেও বটে।

সুতরাং উচ্চতর সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করা, একরূপ অসম্ভবের সম্ভাবনা করা। হিন্দুর আনুপূর্বিক ইতিহাস দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ত্রিশ বৎসরের আইনখানির দুর্দশা দেখাইয়া, এ কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হইয়াছে বলিলেও চলে; ত্রিশ বৎসর কেন বলি, সমস্ত কলিযুগ, বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। পরাশর ত কলিকালের ধর্মশাস্ত্র-প্রযোজক; কেবল কলির জন্যই ত বিধবা বিবাহের নিয়ম আছে; তবে কলিতেই আবার বিধবা বিবাহ দেখি না কেন? তবে কি মুসলমানেরা বন্ধ করিয়াছিলেন? না, তাহা ত কেহই বলেন না। তবেই বলিতে হইতেছে যে বিধবা বিবাহের আইন সমস্ত কলিকালেই আছে, তবে যেখানে খাটে, সেই খানেই খাটিতেছে।

বিধবা বিবাহের পূর্ব পক্ষ, উত্তর পক্ষ তর্কবাদ করা, আমার সংকল্প নহে। ধর্মাধর্মের দোহাই দিয়া যে সকল

কথা উঠে, প্রসঙ্গক্রমে আমি বোধ হয়, তাহার অনেক কথা বলিয়াছি; তবে সংক্ষেপে সেইগুলি এই সময় একবার ধারাবাহিকরূপে বলিলে ক্ষতি নাই।

ব্রহ্মচর্যের কঠোরতার কথা, ব্রহ্মাচারে ব্যভিচারের কথা, বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাতের কথা, অবিবাহিত পুরুষ সকলের বিবাহে সুবিধা হইবার কথা, এই সকল কথা নানা কারণে আমি এই স্থানে তুলিব না; যাঁহারা ইহার জন্য আমাকে অপরাধী করিতে চান, তাঁহাদের কাছে আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি।

কিন্তু ঐগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি কথা আছে;—একটি তর্ক আছে; তাহার মূল বিলাতি সাম্যবাদ। বিপত্নীক পুরুষ যদি আবার বিবাহ করিতে পান, তবে বিধবা কেন না-পারিবেন? কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদীই ইহার উত্তর দিতে পারেন; 'যে তবে বিপত্নীকের পুনর্দার-গ্রহণ রহিত হউক।' হিন্দু কিন্তু সে ভাবে উত্তর দেন না। হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না; হিন্দু মানেন অনুপাত-বাদ। ক খ যখন সমান নহে, তখন তাহারা সমান পাইবেও না, ক যেমন, তেমনই ক পাইবে; খ যেমন তেমনই খ পাইবে। ক খ মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, ক-র ও খ-র স্বত্বাধিকার মধ্যেও সেইরূপ অনুপাত হইবে। হিন্দু এই অনুপাতবাদী। হিন্দু স্ত্রীপুরুষের সাম্য স্বীকার করেন না; কাজেই হিন্দু স্ত্রীপুরুষ-মধ্যে অবস্থার সাম্য-ব্যবস্থা করেন না। সাম্যবাদ হিন্দুর নহে। যাঁহারা সাম্যবাদী তাঁহারা আপনারাই বলিবেন যে সাম্য হইতে বিধবার বিবাহ আসে না, বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ বারণ হয়।

আর এক কথা, বিধবার ব্রহ্মচর্য অননুপালনীয়, unpractical, সুতরাং উহা ধর্মই নহে। না, তাহা নহে; কেন-না যাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করা যায় না, অথচ পালন করিতে হয়, আর যত পালন করা যায় ততই সহজ হয়, তাহাই ধর্ম। বিধবার ব্রহ্মচর্য সেই জন্য মহাধর্ম।

শেষ কথা Individual Liberty, বা স্বানুবর্তিতা। হিন্দু বলেন, সামাজিকতাই ধর্ম, মনুষ্যত্বই ধর্ম; আত্মচারিতা ধর্ম নহে—ঘোরতর অধর্ম। বিধবা বিবাহের পোষকতায়, যিনি সম্প্রতি বঙ্গসমাজে এই তর্কের উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন; স্পষ্ট বলিয়াছেন যে আত্মচারিতা ধর্ম নহে। আমরা কোন নাম নির্দেশ না করিয়া পণ্ডিতবরের যুক্তির সেই ভাগ ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করিলাম।

"I advocate it (widow marriage) on the broad ground of individual liberty of choice.

"I have no daughter. If I had the misfortune to have a young widowed one in my house, I would have certainly tried my utmost to get her remarried; but in that case, I would have thought of her and her only, and never cast a glance about the effect of her marriage on the community at large. In other words, I would have claimed my individual liberty, the liberty of choice of my daughter, and *not the claims of Morality.*"

লেখক স্পষ্টই বলিতেছেন যে, যখন বিধবার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হই, তখন কেবল আত্মচারিতা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে অবসর দান করি, সমাজের দিকে তাকাই না, ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখি না। হিন্দু বলেন, ধর্মের দিকে, সমাজের দিকে না তাকাইয়া আত্ম-ইচ্ছার চরিতার্থ করা—কেবল অধর্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এক্ষণে যে সব মহিলা সাবিত্রী লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণের প্রস্তাব-অনুসারে এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের দুইটি কথা আপনাদের আলোচনার যোগ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিব।

টাকী শ্রীপুরের শ্রীমতী পটেশ্বরী অধিকারী অষ্টম বর্ষে বিধবা হন। তিনি বলেন—'বাল্য বিবাহই বৈধব্যের মূল কারণ।' আমরা বলি, একথা ঠিক; পুরুষের বাল্য বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, নীতি-বিরুদ্ধ কার্য। আসুন না, সকলে মিলিয়া আমরা বালক-বিবাহের কার্যত প্রতিবাদ করি। করিলে, বালবৈধব্যের প্রতিরোধ করা হইবে; যাহার বিবাহ হয় নাই, সে বিধবা হইয়াছে, এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না।

যদি কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার

বিবাহে হিন্দুসমাজ প্রশ্রয় দেন, তবে জানি না, কি বলিয়া সে সমাজ মজঃফরপুরের বহরমপুরার শ্রীমতী শিবদাস দেবীর যুক্তি খণ্ডন করিবেন, তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই বিবাহ না হইলে বিবাহ সম্পূর্ণ হইল না। প্রথম বিবাহে আমাদের শাস্ত্রমতে পিতা কন্যাকে দান করিলেন, কিন্তু পিতার ত কাহাকেও কন্যার শরীর ভোগের অধিকার দিবার ক্ষমতা নাই। সে অধিকার আপনার ভিন্ন আর কাহারই নহে। ঘটনা-বিশেষের পর স্ত্রীর সেই আত্মসমর্পণকে সেই জন্যই দ্বিতীয় বিবাহ বলে।

এই জন্য দ্বিতীয় বিবাহ না হইলে বিবাহ পূর্ণ নহে। দ্বিতীয় বিবাহের পূর্বে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, স্ত্রী মুক্ত হইলেন, তখন পিতা যাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তিনি আর নাই। তখন অবশ্যই তাঁহার অন্যকে আত্মসমর্পণ করিবার অধিকার হইল। যখন তাহার পূর্ণ বিবাহই হয় নাই, তখন কেন-না সে বিবাহ করিতে পারিবে?'

এই প্রশ্নের কি সঙ্গত উত্তর আছে আমরা জানি না; শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন উত্তর পাই নাই। ফল কথা, যদি এ স্থলেও নাম-মাত্র বিধবার বিবাহ দিতে হিন্দু সমাজের আপত্তি থাকে, তবে বালক-বিবাহের কার্যত প্রতিবাদ করা সকলের একান্তই কর্তব্য।

এক্ষণে ঢাকার শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর লিখিত প্রবন্ধের উপসংহার ভাগ, আমার শেষ কথারূপে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। যে দেশের শিক্ষিতা রমণী এরূপ উচ্চতর ভাবে উদ্দীপিত, সে দেশে মোহকর সমাজবিপ্লবের আশঙ্কা আমাদের না করিলেও চলে।—

'বিধবা বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইলে, ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টের পরিমাণ অধিক হইবে সন্দেহ নাই। যাহাতে হিন্দু বিধবাগণের সতীত্ব ধর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাঁহারা ধর্মচারিণী হইয়া চিরকাল পরোপকার-সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রত্যেক নর-নারীর যত্নবান্ হওয়া উচিত; যিনি একটি বিধবার জীবনও সৎপথে রাখিতে পারিবেন, তিনি হিন্দু সমাজের শত শত ধন্যবাদের পাত্র।

হিন্দু বিধবা রমণীগণ! আপনাদিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনারা বাল্য যৌবন, কি বৃদ্ধ, যে কালেই বিধবা হউন না কেন, পরম যতনে ধর্মসাধনরূপ মহৎব্রতে জীবনটি ব্রতী করুন; যথাশাস্ত্র যে ব্যক্তির সহিত আপনাদের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি পাপী থাকুন, আপনাদের প্রতি করুণা-শূন্য থাকুন, যাহাই হউন না কেন, তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া সেই মৃত স্বামীর ধ্যানে জীবন যাপন করুন; মৃত পতিকে বিস্মৃত হইয়া, বা অন্য পুরুষে প্রণয় স্থাপন করিয়া অধিক সুখী হইতে পারিবেন কি? কখনই না।

আপনাদের ভাল বসন, ভূষণ, উত্তম আহারাদি ও সন্তান-সন্ততি হইবে বটে, কিন্তু তাহাই কি মনুষ্য-জীবনের সার সুখ?

পত্নী-বিয়োগে পুরুষগণ যেরূপ আবার বিবাহ করিয়া অনেক বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা পান, সেরূপ আপনারাও পাইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে আপনাদের কি মহত্ত্ব হইল? বিবাহ না করিয়াও যখন ধর্মকার্যাদি আপনাদিগের আয়ত্তি রহিল, তখন পুরুষদের দাসীত্ব গ্রহণে কি ফল বুঝিতে পারি না।

মৃত পতির ধ্যানে জীবন যাপন করিলে, ধর্মবিষয়েও অনেক অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

আহা! যাহার সহিত একত্র চিরকাল ধর্মসাধন ও সাংসারিক সুখভোগাদি করিবেন বলিয়া, আপনারা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত যখন অকালে আপানাদের সেই জীবনসর্বস্ব পতি সাংসারিক সকল সুখ-ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন আপনারা কোন্ প্রাণে পুনঃ স্বামী গ্রহণ করিয়া অসার সংসার-সুখে মত্ত হইবেন? কোন্ প্রাণেই-বা সেই মৃত স্বামীর প্রেম-মুখ বিস্মৃত হইয়া অন্য পতির প্রতি অনুরাগিণী হইবেন?

সেই মৃত স্বামীর মূর্তি হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া ধর্ম-সাধনায় রত হউন, ইহকাল ও পরকালে আপনাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

মৃত পতির পাদ-পদ্ম-ধ্যান-মগ্না ব্রহ্মচারিণী বিধবার মূর্তি

কি রমণীয়! তিনি কি শ্রদ্ধার পাত্রী! তাঁহাকে দর্শন করিলেও জীবন পবিত্র হয়। ধর্মারাধনাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব; পশু-পক্ষী আদিও ত অন্যান্য ইন্দ্রিয় সুখের অধিকারী; মানবজীবন ধর্মারাধনাতেই সম্পূর্ণরূপে সফল হয়। আপনারা অন্যান্য সমস্ত সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধর্মারাধনায় রত হউন। আপনারা লোকের কথায় উতলা না হইয়া, আপনাদের জীবনের যথার্থ সুখের পথ খুলিয়া লইয়া নিজেরাও সুখী হউন, সমস্ত হিন্দু সমাজকেও পবিত্র করুন; আবার ভারতরমণীর সতীত্বের মহিমাতে পৃথিবী মোহিত হউক—এই আমাদের একমাত্র কামনা।*

নবজীবন ১ম ভাগ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

হিন্দুর পরিণয়-প্রথা

আজিকালি আমাদের দুর্দশার দিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। দুর্দশা প্রত্যক্ষ; দুর্দশা যে হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। এই দুর্দশার কারণানুসন্ধানে আমরা সকলেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রবৃত্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু কোন একটি বিষয়ের প্রকৃত কারণ স্থির করিতে হইলে যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের প্রয়োজন সেরূপ বিচারশক্তি এবং তজ্জন্য যেরূপ ধীরতা এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন তাহার কিছুই আমাদের নাই। অথচ দুর্দশা যখন হইয়াছে তখন তাহার একটা কারণ স্থির করা চাই। অনেকেই স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের শারীরিক দুর্বলতাই আমাদের বর্তমান দুর্দশার প্রধান কারণ।

আমাদের সমস্ত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিই আবার এই শারীরিক দৌর্বল্যের কারণ বলিয়া স্থির হইয়াছিল। আমাদের অশন, বসন, শয়নোপবেশন—সকল প্রকার রীতিনীতিই আমাদের শারীরিক দুর্বলতার কারণ বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি। আমাদের অশন পুষ্টিকর নহে; তাই আমরা দুর্বল। আমাদের বসন শরীরের তাপ-রক্ষণকর নহে; তাই আমরা দুর্বল। আমাদের উপবেশনভঙ্গি, শয়নপ্রথায় আমাদের অলস করিয়া তুলে; তাই আমরা দুর্বল। আমাদের অন্য সকল রীতিনীতি আমাদের শারীরিক দৌর্বল্যের হেতুভূত বলিয়া যেরূপ আক্রান্ত হইয়াছে আমাদের বিবাহ-পদ্ধতিও সেইজন্য সেইরূপ আক্রান্ত হইয়াছে।

আমাদের সকল আচার-ব্যবহারই যখন আমাদের শারীরিক দুর্বলতার কারণ, তখন আমাদের বাল্যবিবাহ প্রথা অবশ্যই দুর্বলতার কারণ; অর্থাৎ বাল্যবিবাহে দুর্বল বংশের সৃষ্টি হয়। এইরূপ যুক্তিবাদে এইরূপ ধারণা অনেকেরই হইয়াছে। এই ধারণার বিরুদ্ধে আমার মনে যে খট্‌কা আছে তাহা আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করা আমি কর্তব্য মনে করি।

পশ্চিম, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে বাল্যবিবাহ আছে অথচ ঐ সকল দেশের লোক দুর্বল নহে এবং পূর্বকালে বাল্যবিবাহ ছিল অথচ তখন লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এ সকল কথার আভাস পূর্বে আপনারা পাইয়াছেন; আমি এই সময়ের এই বঙ্গদেশের দুইটা কথা বলিতে চাহি।

বাঙ্গালার ছাগগবাদি পশুসকল বিহার প্রভৃতি প্রদেশের ছাগগবাদি অপেক্ষা দুর্বল। কাজেই আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, ভাল, আমরা যেন বাল্য-বিবাহ-দোষে গোল্লায় যাইতেছি—উহারাও কি সেই বাল্য-বিবাহ-নিবন্ধন উৎসন্ন যাইতেছে?

দ্বিতীয় কথা—গোপ, বাগ্‌দি প্রভৃতি বাঙ্গালার নিকৃষ্ট জাতি-মধ্যে বাল্যবিবাহ অত্যন্ত প্রবল। তাহাদিগকে পাঁচ-সাত বৎসরের বালিকা পাঁচ-সাত শত টাকা ব্যয় করিয়া ঘরে আনিতে হয়। অথচ দেখা যায় যে, নদে-শান্তিপুরের গড়ো, গোয়ালা এবং হুগলী-বর্ধমানের বাগ্‌দি, ডোম—বাঙ্গালার ডাকাতের ডাকাত, সর্দারের সর্দার এবং লাঠিয়ালের লাঠিয়াল। বাঙ্গালার নিকৃষ্ট জন্তুতে দেখা গেল যে, তাহাদের মধ্যে বাল্যসহবাস অসম্ভব হইলেও তাহারা দুর্বল এবং বাঙ্গালার নিকৃষ্ট জাতিতে দেখা গেল যে, তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ থাকিলেও তাহারা সবল। তবে কোন্ মুখে আর বলিতে পারি যে,

* বিগত ২৮শে বৈশাখ, ১২৯২, কলিকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরিতে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

বাল্যবিবাহ আমাদের শারীরিক দুর্বলতার একটি নিশ্চিত কারণ?

এখন যেন মনে করাই যাউক যে, ঐ সকল খট্‌কার মীমাংসা হইয়া স্থিরই হইয়াছে যে, বাল্যবিবাহ আমাদের শারীরিক দৌর্বল্যের অন্যতম কারণ। বলি, তাহা হইলেই কি স্থির হইবে যে, বাল্যবিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত?

পূর্বে বলিয়াছি যে অনেকেই মনে করেন, আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের দুর্দশার প্রধান কারণ। আবার অনেক বিজ্ঞ লোক মনে করেন যে, আমাদের চরিত্রগত দুর্বলতাই আমাদের দুরবস্থার মুখ্য কারণ। যাহা হউক দুর্দশার কারণ বিচারে চরিত্রের দুর্বলতা যে উপেক্ষণীয় পদার্থ নহে, তাহা বলিতেই হইবে। অনেকে বিবেচনা করেন যে বাল্যবিবাহে কিয়ৎপরিমাণে চরিত্র রক্ষা হয়। তাহা হইলে একটি কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইল। বিশ্বাস করিয়া লইলাম যে বাল্যবিবাহে ক্রমে শারীরিক বলক্ষয় হয়, বিশ্বাস করিয়া লইলাম যে বাল্যবিবাহে চরিত্রবল পোষণ বা রক্ষণ হয়। তবে এখন করিব কি? বাল্য-বিবাহে চরিত্রবলের দিকে লাভের অঙ্ক এবং শারীরিক বলের দিকে ক্ষতির অঙ্ক—ইহার কোন্‌টি বেশি তাহা কেমন করিয়া গণনা করিব? চরিত্রবলের সহিত শারীরিক বলের তুলনা করিবার জন্য বাটখারা কোথায় পাইব? আমি এই সমস্যা মীমাংসা করিতে অপারগ। আমি বলি, এই সকল কথা ভাবিবার বিষয়—কেবল বক্তৃতার বা হাততালির বিষয় নহে।

কন্যা-নির্বাচনের কথা। আমার বন্ধুবর বাবু চন্দ্রনাথ বসু বিশদ ভাষায় বুঝাইয়াছেন যে, হিন্দুর বিবাহ বা কুলে-কন্যা-আনয়ন কেবল বরের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য নহে। একটি গোটা পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদির জন্য। আমি অধিকন্তু আরও বলি যে, হিন্দুর বিবাহে একটি পরিবার কেন, একটি সমাজের সুখদুঃখ, অল্প হউক বিস্তর হউক, নির্ভর করে। একটি কন্যার উপর যখন কতকগুলি লোকের বা একটি সমাজের সুখদুঃখ নির্ভর করে, তখন সেই কন্যা-নির্বাচনের ভার, কোন্ যুক্তিতে, কোন্ বুদ্ধিতে একজনের খেয়ালের উপর দিব? কেমন করিয়া সেই গুরুতর কার্যের ভার একজন রূপ-লোলুপ যুবকের উপর ন্যস্ত করিব? এই জন্য হিন্দুর বিবাহে পাত্রীনির্বাচন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম-অনুসারে কুলপতি-কর্তৃক হইয়া থাকে। কুলপতিও আপনার খেয়াল মত পাত্রী নির্বাচন করিতে পারেন না; কেন-না পূর্বেই বলিয়াছি, বিবাহ একটি সামাজিক কার্য।

আমি হিন্দু বিবাহ প্রথার সমর্থন করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন না যে, আমি এখনকার কালে এই বঙ্গদেশে হিন্দুর বিবাহপ্রথা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে—তাহা ভাল বলিতেছি। পবিত্র বিবাহ-প্রথার আমরা বঙ্গদেশে অতি লজ্জাকর পরিণতি করিয়াছি। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিব না—আমি আপনার অস্থিমজ্জার কথা বলিব।

আমি সন্মৌলিক কায়স্থ—আমার * তিনটি কন্যাসন্তান আছে। সুতরাং কায়স্থের বিবাহ-প্রথা আমার কাছে কেবল বক্তৃতার কথা নহে—আমার অস্থিমজ্জার কথা। বলিতে ঘোরতর লজ্জা হয়, আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে মাথা হেঁট করিতে হয়—বঙ্গের কায়স্থ জাতি বিবাহ-প্রথাকে নিদারুণ ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছেন। বিবাহ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, বিবাহ ধর্ম-সংস্কার, বিবাহ কৌলিক অনুষ্ঠান—এ সকল আমাদের কাছে উপহাসের উপকথা হইয়াছে। কায়স্থ বরকর্তা মহাশয় সুলক্ষণা পাত্রীর অনুসন্ধান করেন না। বৈবাহিকের বংশ-ব্যবহার দেখেন না—কেবল খুঁজিয়া বেড়ান যে কোন্ পাত্রীর পিতা পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিবে। তাহাতেই বলিতেছি যে হিন্দুবিবাহ-সম্বন্ধে তখন কি ছিল তাহা মনে করিয়া উচ্চদিকেই দৃষ্টি করিব, না আমরা কি করিতেছি—সেই নিম্নদিকেই দৃষ্টি করিব? বলিতে কি, আমি মৌলিক কায়স্থ, আমার পক্ষে হিন্দু বিবাহের পূর্বতন গৌরবের কথা ভাবনা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই কায়স্থ জাতি সর্বদাই আপনার জাতি-গৌরব করিয়া থাকেন—ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবার জন্য, যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া সকলের অবশ্য নমস্য হইবার জন্য কখন কখন বড়

* তখনও চতুর্থ বা কনিষ্ঠ কন্যা জন্মগ্রহণ করে নাই।

ব্যগ্র হন। কিন্তু পবিত্র বিবাহ কার্যকে জঘন্য পণ্যব্যবসায়ে পরিণত করিয়া যে তাঁহারা দিন দিন নীচাদপি নীচ হইতেছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখেন না। আবার বলি, আমাদের কায়স্থ কুলাঙ্গারদের কৃতকার্যের জন্য লজ্জায় আমাদের হেটমুণ্ড হইতে হয়, ঘৃণায় মাটিতে মিশাইতে ইচ্ছা করে। আমি কায়স্থ, এ সকল আমার মর্মকথা—আমি কন্যাত্রয়ের পিতা, এ সকল আমার মর্মের কথা। মর্মের কথা বলিয়াই আমি এই কায়স্থ গোষ্ঠীপতিগণের ভবনে দণ্ডায়মান হইয়া কুলীন-কায়স্থ-কুলোজ্জ্বলকারী সভাপতি মহাশয়ের সমক্ষে বলিতেছি, আপনাদের মধ্যে যাঁহারা কায়স্থ আছেন তাঁহারা পাস-করা পুত্রপৌত্রাদির বিবাহ-সময়ে যেন স্মরণ করেন যে, হিন্দুর বিবাহ অতি গৌরবের প্রথা, ইহার অতি পবিত্র উদ্দেশ্য, হিন্দুর বিবাহ একটি কৌলিক অনুষ্ঠান—একটি ধর্মসংস্কার। বিবাহকে অর্থাগমের উপায় বলিয়া মনে করিলে, বিবাহ বৈদেশিক চুক্তির অপেক্ষাও শতগুণে অপবিত্র হয় এবং বিবাহ-সময়ে বরকর্তা প্রকারান্তরে কন্যাকর্তার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিলে আপনারই কুলগৌরব কমিয়া যায়। পণপ্রার্থী বরকর্তারা এইসকল কথা স্মরণে রাখিবেন—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

[১৮৮৭, ৬ই আগস্ট ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে অধিষ্ঠিত সভায় সাহিত্যাচার্য-কর্তৃক পঠিত এবং 'ভারতবর্ষ'-এ (চৈত্র ১৩৫২) সুসাহিত্যিক মন্মথনাথ ঘোষ-কর্তৃক প্রকাশিত হয়।]

শ্রীহরি

প্রশ্ন।—মহাশয়! * বর্ধমানে গেলেন, একটিও কথা কহিলেন না যে?

উত্তর।—অত 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্'এর ভিতরে, কথা কওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল; অত মিষ্টান্নের মাঝে দুটা মিষ্ট কথা বলি যে, সে ক্ষমতাও আমার ছিল না। কাজেই তৃতীয় দিন পূর্বাহ্নেই পলাইয়া আসিলাম।

প্রশ্ন।—সকলেই 'নারায়ণের' বঙ্কিম-সংখ্যায় লিখিলেন, আপনি কিছু লিখিলেন না যে?

উত্তর।—আমি সময়ে সাড়া পাই নাই।

প্রশ্ন।—চুঁচুড়া হইতে নূতন মাসিক বাহির হইল,—আপনি কিছু লিখিবেন না?

উত্তর।—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞা হাঁ লিখিব—নহিলে কৈফিয়তের দায়ে মারা যাইব। লিখিব কেন? লিখিতেছি—

এখন ইতিহাসের যুগ—একটু ইতিহাস লেখা যাউক। ঠিক চুঁচুড়া না হউক, নিকটস্থ বাঁশবেড়ে হইতে 'পূর্ণিমা' পত্র বাহির হইত। অধমও তাহাতে লেখনী চালনা করিত। দুর্ভাগ্যে বা সৌভাগ্যে সেখানি উঠিয়া গিয়াছে। এই পত্রের স্বত্বাধিকারিগণ 'পূর্ণিমার' লটবহর কিনিয়া লইয়াছেন এবং একখানি মাসিক পত্র বাহির করিবেন স্থির করিয়াছেন। পুরাতন 'পূর্ণিমা' নাম থাকিবে, না অভিনব কোন নাম দেওয়া হইবে, এই লইয়া কিছুদিন তর্কবিতর্ক চলিল। শেষে একটি নাম স্থির হইল। নামের ছাপ (block) কাটাইবার জন্য 'ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল' সমীপে কার্যাধ্যক্ষ উপস্থিত হইলেন। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের সহিত কথোপকথনের ফলে স্থির হইল, 'শিল্প ও সাহিত্য' কয়েক বৎসর বন্ধ আছে, সেইখানিই পুনর্জীবিত করা হউক; block প্রভৃতি ঠিক আছে—কাজের সুবিধা হইবে। যে কথা—অমনই স্থির; সুতরাং 'শিল্প ও সাহিত্য' বাহির হইল।

যেমন করিয়া আমি কয়েক বৎসর একঘেয়ে কান্না কাঁদিয়া স্বাস্থ্যে ও সাহিত্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি, তেমনি করিয়া আমাকে শিল্পে ও সাহিত্যে ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে হইবে না,—দেখাইতে হইলে, এ সূচনার সূচনাই করিতাম না।

সুকুমার শিল্পে ও সুকুমার সাহিত্যে সম্পর্ক সহজেই বুঝা যায়। শিল্প ও সাহিত্য দুই সহোদর ভাই—দুই সহোদরাকে বিবাহ করিয়াছে। শিল্পের সন্তান ভাব; সাহিত্যের সন্তান রস। রস এবং ভাব—ইহারা মাসতুত ভাই—চোরে চোরে। উভয়েই স্বভাব হইতে চুরি করে; চুরি করিয়া আপনাদের গোত্রজ রং ফলাইয়া চুরি চাপিবার চেষ্টা করে।

কেবল সৌন্দর্য লইয়াই যে শিল্পের বা সাহিত্যের কারবার বা কারখানা, এমন কেহ মনে করিবেন না। সৌন্দর্য- ও কদর্য-ভাব—এই দুয়ের উপরি শিল্পের ও

* বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

সাহিত্যের সমান অধিকার। সাহিত্যে শ্মশানবর্ণনা আপনারা অনেক স্থলে দেখিয়াছেন; শিল্পে চামুণ্ডার প্রতিমূর্তি আপনারা ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব* মধ্যে দেখুন। দেখিবেন, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর কি কঠোর কটাক্ষ! যাহার চক্ষু দেখা যায় না, তাহার কটাক্ষ; যাহার ভ্রূ নাই, তাহার ভ্রূকুটি! সুন্দরে বীভৎসে,—উৎকটে মধুরে,—বিকটে ললামে, সাহিত্যের ও শিল্পের সমান অধিকার। শিল্প ও সাহিত্য একই ঘরানা,—একই পরানা, একইরূপ ব্যবসায় ও একইরূপ লাভালাভ করে।

এই কথা বলিবার, এখনকার দিনে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সাহিত্যেই কি—শিল্পেই কি—এখনকার দিনে 'নেকি বদি' কিছুই বাদ পড়ে না। বিশেষ মাসিক সাহিত্যে। একটি উত্তম প্রবন্ধের পার্শ্বেই দেখিবেন, একটি বিকট বীভৎস প্রবন্ধ। একখানি ছবিতে প্রকৃতির লীলা ঢল ঢল করিতেছে। তাহার পার্শ্বেই একটা অদ্ভুত কৃষ্ণকামারি কাণ্ড। সকলকারই যখন হয়, আমাদেরও ত হইবে, সুতরাং পাকেপ্রকারে সূচনাতেই ঐ কথা আলঙ্কারিকের ভাবে বলিয়া রাখাই ভাল; কেন-না সূচনার পর আমি খালাস।

কেবল মাসিক পত্রের কথাই বলি কেন? যে-সে শিশুপাঠ্য পুস্তক একখানি লইয়া দেখিবেন, প্রথমেই মলাটে একখানি চিত্র আছে। একটি বালক হাসিতেছে। এমন বিকট হাসি শিশুর মুখে স্বভাবে প্রায়ই দেখা যায় না। তাহার উপর মুখগহ্বর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা স্ফীত, চক্ষু কোটরগত। যেন বীভৎস রসের শিশু-সংস্করণ! এই ত গেল শিল্পের পরিচয়—তারপর ভিতরে সাহিত্যে শিক্ষার পরিচয় লউন—

কে ধরেছে, কে মেরেছে
কে দিয়েছে গাল?
যাদুর গুণের বালাই নিয়ে
মরে যেন সে কাল!

অতি শৈশব হইতেই বালকের গালি দিবার শিক্ষা আরম্ভ হইল।

তারপর গল্প শুনিবেন—শতকিয়া বা জমাখরচ ছন্দেবন্দে শেখানো হইতেছে—হারাধনের দশটি ছেলে, নয়টি শ্লোকে—জলে, স্থলে, বিষে, বাঘে, নয়টি মারা পড়িল, তারপর যোগ্য উপসংহার—

হারাধনের একটি ছেলে
কাঁদে ভেউ ভেউ,
মনের দুঃখে বনে গেল
রইল না আর কেউ!

শিশুপাঠ্য পুস্তক বলিয়া নয়, মাসিক বলিয়া নয়, হরিঃ সর্বত্র গীয়তে। কদর্যে সৌন্দর্য সর্বত্র বিকশিত। 'সদ্যস্নাতা', 'সদ্যোস্নাতা', 'সদ্যঃস্নাতা' এতদিন মাসিকেই দেখিতেছিলাম —এবার দেখি সাপ্তাহিকেও আবির্ভাব। সেই পদ্মিনীর প্রফুল্ল মুখ—অথচ শঙ্খিনীর নিম্ন দেহার্ধযষ্টি। আর্দ্রবস্ত্র দেখাইবার শিল্পীর ব্যর্থ চেষ্টা এবং সেই ব্যথিত দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে জলশূন্য করিবার সন্তর্পণে চেষ্টা।

এইরূপ সৌন্দর্যে কদর্যভাবের সমন্বয় বঙ্গের সাহিত্য-শিল্প-কলায় সর্বত্র। সুতরাং আমরাও এই জগাখিচুড়ীর আসরে অবতীর্ণ হইলাম। এখন ডালে চালে না মিশিলেই হইল, তাতে দুঃখ নাই, তবে আলুনি চুঁয়া পোড়া না হইলেই হইল। সুখাদ্য আর সুপথ্য হউক না হউক উদর পূরণের মত কলেবর হওয়া চাই।

সাহিত্যের বা শিল্পের উন্নতির বা অবনতির কথা, এ সকল বাজে কথা—কাহারও প্রাণেও লাগে না, মনেও থাকে না। তবে এখন আবার 'গুরু গম্ভীর' হইয়া দুটা কাজের কথা বলি—'পূর্ণিমা'র স্থানে আমরা সুরেশবাবুকে পাইয়াছি। তিনি 'কণ্ব' লিখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বলিতে যাইতেছিলাম তিনি 'কর্ণধার'—মনে হইল, তা কেমন করিয়া হইবে? যার কর্ণ নাই—তার ধরিবেন কি? শিল্প ও সাহিত্য দুকাণ-কাটা, নতুবা এমন দুর্বৎসরে আসরে অবতরণ করে। না, আমাদের কর্ণধার বা হস্তধারক কেহ নাই। তবে সুরেশবাবু নিয়মিত লিখিবেন বটে। বিষ্ণুপদ অকালে বিষ্ণুপদে লীন না হইলে, তাঁহাকেও আমরা

* Mayurbhanja Archæological Survey by Nagendranath Vasu Prachyavidyamaharnava, M. R. A. S.

পাইতাম। বিষ্ণুপদ আমার ছাত্র—কিন্তু তাঁহার নাম এই পত্রের সূচনায় করিয়া আমি ধন্য হইলাম—আর মাসিককে পুণ্যময় করিলাম—সাহিত্যসেবায় অমন নিষ্ঠা এবং উৎসাহ আর পাইব না। 'পূর্ণিমা'র কাঞ্জিলালদ্বয় কৃতী পুরুষ, কিন্তু তাঁহাদিগকে আর দেখিতে পাই না। আমি ছাড়া আর আছেন—দাদা দীননাথ ধর। তিনি আমাপেক্ষা বৃদ্ধ—সুতরাং তাঁহার নিকট কিছু আশা করা, তাঁহাকে নির্বাচন করা—ওরূপ করা যখন আমি ভালবাসি না, তখন তিনি ভালবাসিবেন কেন ?

'শিল্প ও সাহিত্যের' প্রধান লেখক বোধ করি সকলেই এই পত্রে যোগ দিবেন। আমি সকলকে চিনি না। শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্তীর এই পত্রেই পরিচয় পাইয়াছি। অতি সুন্দর প্রবন্ধ। যদি বলেন, আমি সূচনা লিখিতে সার্টিফিকেট দিতেছি—এ কিরূপ কাণ্ড? আমি বলি কাণ্ড ভাল। এ বয়সে আপনার লোক বলিয়া যদি গুণের প্রশংসা করিতে না পাই, তাহা হইলে আমাকে আইন-কানুনে মারিয়া ফেলা হইবে। ওরূপে মরিবার আইন-কানুন মানিব না, সুরেশবাবুর ও মন্মথবাবুর প্রশংসা বারবার করিব।

আমার সূচনা শেষ হইল। আমরা সাত্ত্বিকতা মিছা করিয়াও মুখে আনিতে পারি না। লেখকগণ আপনারা রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণে মণ্ডিত মনে করিয়া বলিতেছি—একটা বড় কার্য করিতেছি, একটা সংকার্য করিতেছি—মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া শ্রীহরি স্মরণপূর্বক কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন, মনে বল পাইবেন, হৃদয়ে সাহস আসিবে। 'শিল্প ও সাহিত্যের' সেবা স্বচ্ছন্দে সাধিত হইবে।

শিল্প ও সাহিত্য (নবপর্যায়) আষাঢ় ১৩২২

ভূমিকম্প

উত্তানপাদের ঔরসে, সুনীতির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম। ধ্রুব ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন পাইয়াছিলেন, ধ্রুবলোকে বাস করিতেছেন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ—ইঁহারা ধ্রুবকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করেন। ইত্যাদি কথার তিন প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়।—

১। পৌরাণিক বা আধিদৈবিক। এই ব্যাখ্যায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বুঝেন যে, পুরাকালে বাস্তবিকই ধ্রুব নামে এক মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি সত্যসত্যই ভক্তি-বলে দেবতার সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করেন এবং এখনও ধ্রুবলোকে বাস করিতেছেন। ঋষিরা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতার্থ হন।

২। দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক। উত্তানপাদ—কিনা কঠোর তপশ্চর্যা, সুনীতি—কিনা উত্তম নীতি, অর্থাৎ তপস্যা ও নীতি হইতে—কিনা যম-নিয়ম ইত্যাদি হইতে ধ্রুব—কিনা নিষ্ঠা-যোগের উৎপত্তি হয়। সেই যোগে সমাধি লাভ করা যায়।

৩। আধিভৌতিক বা জড়বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা। ভারতবর্ষ বিশেষত আর্যাবর্ত বিষুবরেখার অনেক উত্তরে, সেই জন্য মেরুরেখা বা পৃথিবীর অক্ষরেখা (Axis of the Earth) উত্তানপাদ বলিয়া মনে হয়; এই উত্তানপাদ অক্ষরেখা যেখানে খগোল স্পর্শ করে, সেইখানকার নক্ষত্রটি স্থির বা ধ্রুব বলিয়াই বোধ হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষি-মণ্ডল এই উত্তর মেরুগত ধ্রুবকে কাজেই প্রত্যহ পরিবেষ্টন করেন।

যিনি ধ্রুবোপাখ্যান শুনিয়া, ঐ তিন প্রকার ব্যাখ্যাই সমান ভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু; যিনি না পারেন, তিনি প্রকৃত হিন্দু নহেন। যিনি কোন একটিতে বা দুইটিতে বিশ্বাস করিয়া অপর ব্যাখ্যায় বা অন্য দুইটি ব্যাখ্যায় উপহাস করেন, তিনি পাষণ্ড।

যিনি একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য শক্তি বা সত্তা স্বীকার করেন না বা বুঝেন না, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বলিতেছি, প্রকৃত হিন্দু আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিধাশক্তিতে বা সত্তাতে বিশ্বাসবান্। হিন্দু কেবল জড়বাদী বা Materialist নহেন, কেবল অধ্যাত্মবাদী বা Idealist নহেন এবং কেবল দৈববাদী বা Pantheist নহেন। হিন্দু মিশ্রবাদী—ত্রিধা সত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান্। এখনকার দিনে শিক্ষার দোষে এই বিশ্বাসে

ব্যাঘাত লাগিলেও হিন্দু এখনও মোটামুটি তিনটি সত্তাই বিশ্বাস করে।

সূর্যের পুত্র যম, সূর্যের পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সূর্যের পুত্র—কর্ণ। সূর্য দেবতা না বুঝিলে, এ সকল কথা বুঝা যায় না। সূর্য—দেবতা। আবার যদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরিত বা পরিচালিত হয়, তিনিও সূর্য বা সবিতা। তিনি আধ্যাত্মিক জগতের কর্তা। আবার ঐ যে জ্বলন্ত জড়পিণ্ড হীরার থালার মত ধ্বক্‌ধ্বক ঝক্‌মক করিতেছে, উনিও ত সূর্য—এই জড় জগতের তাপ-তেজোদাতা, গতি-শক্তি-বিধাতা। জড় সূর্য, আধ্যাত্মিক সূর্য, দেবতা সূর্য—এক সূর্যে আমরা তিন সূর্যই বিশ্বাস করি। ইহারই নাম হিন্দুর প্রকৃত বিশ্বাস।

আজি একমাস হইল (১৩০৪) এই বঙ্গদেশে বিশেষত উত্তরবঙ্গে এবং আসাম প্রদেশে মহা ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছে। কত গ্রাম নগর উৎসন্ন গিয়াছে, কত সৌধ প্রাসাদ চূর্ণীকৃত হইয়াছে, নদী চর হইয়াছে, চরে প্রবাহ ছুটিতেছে, রাজা মহারাজ হইতে পথের ভিখারী পর্যন্ত—কতলোক লীলা সংবরণ করিয়াছে, ধরিত্রী শত সহস্র ক্ষতমুখে রসধুম উদ্‌গিরণ করিয়াছেন—এ সকল কথা জানিতে কাহারও আর বাকি নাই। আজিকালি সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, ভূমিকম্পের কারণ কি।

হিন্দুর মতে সকল বিষয়েরই কারণ ত্রিবিধ আধি-দৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক। ভূমিকম্পেরও অবশ্য ঐ ত্রিবিধ কারণ হইবে। কারণ অবশ্য একটাই হয়, কিন্তু আমরা হিন্দু, আমরা সেই একটা কারণকেই তিন রকমে বুঝিয়া থাকি। তিন প্রকার কারণেই বিশ্বাস করিয়া থাকি।

ভূমিকম্পের কারণ—(১) আধিদৈবিক, বাসুকি দেবতা। বাসুকির জৃম্ভণে বা মস্তকের কম্পনে বাসুকি-ধৃতা ধরণীর কম্পন হয়। (২) আধ্যাত্মিক, পাপের ভার এমনই গুরুতর যে, এমন-যে সর্বংসহা ধরিত্রী সকলই সহ্য করেন, তিনিও বিষম পাপের ভার সহিতে না পারিয়া কাঁপিতে থাকেন, বিচলিত হন, তরঙ্গায়িত হন। (৩) আধি-ভৌতিক, ভূগর্ভস্থ অতীব উষ্ণ তরল পদার্থরাশি উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই উৎক্ষেপের আবেগে ভূকম্প হইতে থাকে।

আমরা বলিতেছি—ঐ রূপ ত্রিবিধ কারণে বা একই কারণের ঐ রূপ ত্রিবিধ ব্যাখ্যায় যিনি সমানে বিশ্বাস করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু।

এই কথাটা এখনকার দিনের ইংরাজিওয়ালাকে বড় বিষম লাগিবে। তিনি জানেন, বাসুকির কথা মূর্খের কুসংস্কার। কাজেই মূর্খেই বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়, পাপের ভারের কথা, ও-একটা কথার কথা মাত্র, লোকে মুখে দশবার বলে বটে, মনের মধ্যে কখন বিশ্বাস করে না। তৃতীয়, কথাই কথা।—পৃথিবী জড় পদার্থ, জড় পদার্থের কোনরূপ বিপর্যয়েই পৃথিবী বিচলিত হয়।

বাস্তবিক বাসুকি দেবতায় বিশ্বাস করা মূর্খতা বা কুসংস্কারের পরিচায়ক নহে। যদি আগুন ছাড়া অগ্নি-দেবতা, জল ছাড়া বরুণ-দেবতা, জড়পিণ্ড সূর্যের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এ সকলের কোন কিছু বুঝিতে পার, তাহা হইলে বাসুকি দেবতাও বুঝা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না। আর যদি কোন দেবতাই না বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে বাসুকি বুঝিতে ত অবশ্য পারিবে না, তবে মনে মনে এইটি বুঝিবার চেষ্টা করিও যে, তুমি হিন্দু-সন্তান হইলেও হিন্দু নহ।

হিন্দু জড়শক্তি এবং আত্মশক্তি ভিন্ন, আর একটি তৃতীয় শক্তি জানেন, বুঝেন ও মানেন। তাহার নাম দৈবশক্তি। এই দৈবশক্তি না বুঝিলে জড়ে ও আত্মায় যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝা যায় না। আত্মশক্তি ও জড়শক্তির মাঝে দৈবশক্তি। আবার দৈবশক্তি ও জড়শক্তির মাঝে আত্ম-শক্তি। মানব এই ত্রিশক্তি-কর্তৃক সমান চালিত।

প্রত্যেক ঘটনাতেই ত্রিবিধ শক্তির লীলাখেলা আছে, এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে, ঘটনা-পরম্পরার কার্যকারণ ভাব বুঝা যেন একটু সহজ হইয়া পড়ে। এই ভূমিকম্পের কথাটাই ভাবুন। ভূগর্ভস্থ উষ্ণতরল পদার্থের অবস্থা-বিপর্যয়ে ভূকম্পন হয়, বেশ কথা; সেই অবস্থা-বিপর্যয় কখন্ কখন্ হয়?—যখন পাপের ভার বেশি হয়, তখনই হয়। আচ্ছা তাহাই যদি হয়,—তা কখন্ পাপের ভার বেশি হইল, তাহা ভূগর্ভস্থ তরলপদার্থ-রাশি জানিতে পারে কি প্রকারে? দেবতায় অবশ্য জানিতে পারেন; তিনি নারায়ণ—তিনি অনন্ত—বাসুকি। সকল বিষয়েই হিন্দু এইরূপে চিন্তা করে,—এইরূপে মীমাংসা করে। আবার বলি ইহাই হিন্দুর হিন্দুত্ব।

পাপভরে ভূকম্প হয়। এই কথায় বিশ্বাস করা বড় কঠিন। কিন্তু এবারকার দুর্বৎসরের আর পাঁচটা ঘটনার সহিত ভাবিলে, তত কঠিন বোধ হইবে না। এ বৎসর অতি দুর্বৎসর। আমাদের দেশের কথাই অবশ্য বলিতেছি, কেন-না অন্য দেশের কথা ভাল জানি না, ভাল বুঝি না। দেশে অন্নকষ্ট, জলকষ্টের সীমা নাই। নানা রোগের ও মারীভয়ের জ্বালায় জ্বালাতন করিয়া রাখিয়াছে। এই জলকষ্ট, অথচ বর্ষারম্ভেই স্থানে স্থানে মহা জলপ্লাবন হইতেছে; শস্য দেখা দিতে না দিতে, পঙ্গপাল দেখা দিয়াছে; স্থানে স্থানে কর্দমবৃষ্টি হইয়াছে; কাবুলে, কলিকাতায়, পুনায়, পেশোয়ারে অকারণ শত শত নরহত্যা—গুপ্তঘাতে রাজপুরুষ হত্যা হইতেছে। দুর্বৎসরের দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি এই সকল দুর্ঘটনাস্রোতের মধ্যে অকস্মাৎ ভীষণ ভূকম্পনে কত নরনারীর অকালে অপমৃত্যু, কত গৃহস্থলোকের গৃহনাশে তরুতল একমাত্র আশ্রয় হইয়াছে। এই অসংখ্য দুর্ঘটনার মধ্যে বোধ হয়, যেন একখানা সুর বাঁধা রহিয়াছে। তীব্র সুর হইলেও বাঁধাসুর বটে। যে সুরের খরজ, সেই সুরেরই পঞ্চম বটে। অন্য জাতির এইরূপ মনে হয় কিনা জানি না, হিন্দুর এইরূপই মনে হইয়া থাকে। যে সুরে এই সকল দুর্ঘটনা বাঁধা—হিন্দু সেই সুরকে, উপর সপ্তক ভাবিয়া, বলে দেবতার কোপ। নিম্ন সপ্তক ভাবিয়া বলে, মানবের পাপ। আমাদের যতকিছু কষ্ট দেখিতেছ—সমস্তই দেবতার কোপে, অথবা আমাদের পাপে। আমাদের পাপেই দেবতার কোপ হয়। আমাদের পাপে সুতরাং দেবতার কোপে এই ভূকম্পন হইয়াছে। মধুসূদনকে স্মরণ কর।

যদি দেবতায় না নাচায়—দেবতায় না চালায়, তাহা হইলে জড়ের কি সাধ্য যে জীবকে জ্বালাতন করে? জড় সমবায় বটে, দেবতা নিমিত্ত কারণ। আমরা হিন্দু, আমরা বিশ্বাস করি—নিয়মের রাজ্যে, শৃঙ্খলার রাজ্যে, ভগবানের রাজ্যে, আমরা বাস করি। এ বিশ্বরাজ্য সয়তানের রাজ্য নহে। ভূগর্ভস্থ তরল পদার্থ বা অন্য কোন জড়পদার্থ আমাদের উপর অকারণ আধিপত্য করিতে পারে, সে বিশ্বাস আমাদের নাই। আমরা পাপ করিলে, দেবতার কোপ হয়, তাহাতেই জড়ের বিপর্যয় ঘটে; আমাদের শাস্তির জন্য আমাদের উপর উৎপাত—উপদ্রব হয়। চিরদিনই এইরূপ হইতেছে, এবার আমাদের পাপের ভার বড় বাড়িয়াছে, দেবতার কোপ সেই পরিমাণে অত্যধিক হইয়াছে। অতএব ভাই! পাপের পন্থা হইতে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা কর, মধুসূদনকে সর্বদা স্মরণ কর, তিনিই আমাদিগকে সহিষ্ণুতা ও শক্তি প্রদান করিবেন।

দেবতার—নিত্য সত্য চিন্ময় বিগ্রহ। সেই বিগ্রহের আমাদের চিদাকাশে ধারণা করিতে হয়। দেবতার অন্য নানারূপ বিগ্রহ আছে। ধাতুময়, শিলাময়, দারুময়, মৃন্ময় বিগ্রহের বঙ্গবাসীকে পরিচয় দিতে হইবে না। ইতিহাস-পুরাণে বিশ্বাস থাকিলে, দাশরথি, বাসুদেব প্রভৃতি অবতার বা নরবিগ্রহ বটেন। ঐ জ্বলন্ত জড়পিণ্ড সূর্যমণ্ডল সবিতৃ-দেবতার সাক্ষাৎ বিগ্রহ। ঐ ক্ষণে-বারি-বর্ষণকারী, বজ্রধারী, ক্ষণে-উজ্জ্বলসহস্রলোচনবিথারী নভোমণ্ডলও সেইরূপ পুরন্দরের সাক্ষাৎ মূর্তি। ভূমিকম্পের নিয়ন্তা বাসুকিরও সেইরূপ জড়বিগ্রহ, আমরা দেখিতে না পাই, বুঝিতে পারি। সেই বিগ্রহ আধুনিক জড়বিজ্ঞান-সম্মত।

সেই বিজ্ঞানে বলে, পুরাকালে পৃথিবী তপ্ত তরল পিণ্ড ছিল। কালে তাপ বিকীর্ণ হইয়া উপরে কঠিন স্তর পড়িয়াছে। দুধের কড়ায় যেমন উপরে সর পড়ে, তেমনি উপরটা কঠিন হইয়াছে। ভিতরে তেমনই তরল পদার্থই

আছে। নারিকেলের যেমন উপরে ছোবড়া, তাহার নিম্নে শক্ত নারিকেলের মালা, তাহার ভিতর জল, পৃথিবীও এখন কতকটা সেইরূপ। উপরে জল মাটি ছোবড়ার মত আছে; তাহার নিম্নে কঠিন প্রস্তর-স্তর নারিকেলের মালার মত। অভ্যন্তরে অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ, নারিকেলের জলের মত। এই তরল পদার্থ সর্বদাই আলোড়িত, সর্বদাই ঘূর্ণায়মান। মহাবেগে সেই তরল পদার্থ নানা পথে সেই কঠিন প্রস্তর-স্তর ভেদ করিয়া, ভূগর্ভ হইতে ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই বেগ কিছু অতিরিক্ত হইলেই ভূকম্পন।
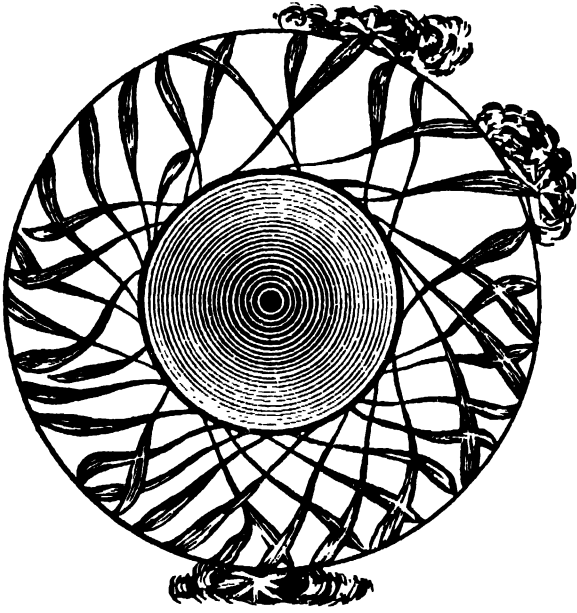
অনন্তদেব বাসুকি

সম্মুখস্থ ঐ চিত্র হইতে ভূগর্ভস্থ ঐ তরল পদার্থের প্রতিকৃতি ও গতি একরূপ মোটামুটি বুঝা যায়। পৃথিবীর হাজার হাজার ফাটল দিয়া সেই তরল পদার্থ উপরে উঠিতেছে, কোথাও আগ্নেয় গিরির মুখ দিয়া বা ভূপৃষ্ঠ দিয়া ধূমোদ্গিরণ করিতেছে। উহাই বাসুকির জড়বিগ্রহ। ঐ দেখ, মহাসর্পের ন্যায় মধ্যস্থলে মহাকুণ্ডলী। সেই কুণ্ডলী হইতে অনন্ত মস্তক অনন্ত দিকে উঠিয়াছে। এই সাগরাম্বরা ভূধরভূষণা ধরিত্রীকে অনন্ত মস্তকে ধারণ করিয়া আছে। সমগ্র দেহ ঈষৎ নীলাভ শ্বেতবর্ণের। জ্বৃম্ভণে ধূমোদ্গিরণ হইতেছে। মস্তকের ঈষৎ আলোড়নে পৃথিবী টলমল; উত্তরবঙ্গ—আসাম বিধ্বস্ত।

ইনিই বিষ্ণুর অনন্ত ফণাধারী, অনন্ত মূর্তি, বাসুকি বিগ্রহ। এই অভ্যন্তরস্থ উত্তাপের ফলেই উর্বীর উর্বরা-শক্তি, কৃষকের কর্ষণ-কৃতি; সুতরাং ইনিই হলধর বলদেব সংকর্ষণদেব। এস ভাই, ভীষণ ভূমিকম্পের ভয় ভাঙ্গিবার জন্য এই অনন্তের অর্চনা করি। হে অনন্ত! বুঝিতে পারিলে কে-না তোমায় নমস্কার করিবে?

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিত-বিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥

পূর্ণিমা ১৩০৪

'ছাইত্র'

ভাঙ্গা বাগান জোগান দেওয়া ভার,
ফুলের নাই বাহার!
শুকনো তালপুকুরে তোমরা দিতেছ সাঁতার,
ধূলামাটি গায়ে লেগে নাস্তানাবুদ সার।

পুকুর শুকাইলেও সাঁতার দিতে ছাড়ে না—বাঙ্গালার

রস-কস নাই, মাসিক পত্রে নষ্ট লোকে ভ্রষ্ট রস লিখিবার চেষ্ট করিতেছেন। বলেন, 'সাহিত্য' নয় 'ছাইত্ব'।

তা' ত হ'বেই। বিদ্যাসাগর সি. আই. ই. উপাধি পাইলেন; পণ্ডিতেরা তাঁহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাগর, এবার পেলে কি?' তিনি উত্তর করিলেন, 'সি আই ই।' পণ্ডিতেরা বলিলেন,—'হৈল কি?' সাগর বলিলেন,—'ছাই'। পণ্ডিতেরা বলিলেন, 'বেশ! বেশ! রাজমুখে সবই শোভা পায়!'

এখন সেই 'ছাই'-এর প্রিয় দৌহিত্র* যে কাগজের সঙ্গে লিপ্ত, তাহাতে যে ছাইত্ব আসিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

তবে কি না ভাই,

'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই,
পাইলে পাইতে পারো লুকানো রতন।'

উড়াইয়া দেখিয়াছ কি? কোনও রত্ন পাইয়াছ কি? পাও নাই? সে কি? আমরা ত বহু রত্ন পাইয়াছি। নবরত্ন বলিলে, নব বিক্রমাদিত্যের অবমাননা হয়। কেবল রত্ন কেন, আমরা ছাইত্বের সিংহাসন-পার্শ্বে রত্নাকর মহার্ণবকেও পাইয়াছি। আর নাটকের কালিদাস এখন চটকের দ্বিজু রায়। বররুচি হীরেন্দ্র, বেতালভট্ট সিংহ মহাশয়, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি দীনেশচন্দ্র, ক্ষপণক শাস্ত্রী। তাহার পর, ছাই ত দেবাদিদেব মহাদেবের বিভূতি। বিভূতির্ভূতিরৈশ্বর্যম্। মহাদেবের ঐশ্বর্য। জ্ঞানের ঐশ্বর্য 'শশধর' দীপ্যমান। ধ্যানের ঐশ্বর্য লাহার চিত্র—

কানুরে আনিয়া তথি,
বেশ করে যশোমতি।

যে-ঐশ্বর্যে মহাশ্মশান বিলাসভবন হয়, মহাকাল সর্প-বিভূষণ হয়, হলাহল পান করা যায়, জটায় গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতে থাকে—যে-ঐশ্বর্যে 'বাম উরু পরে বসি, অকলঙ্ক উমা শশী', সেই ঐশ্বর্য, সেই বিভূতি, সেই ছাইত্ব কি সহজ সাধনার ফল? শতক্রতু সুরেশই সে সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন। বহু সাধনায় সেই ঐশ্বর্য লাভ হয়। 'দেবদ্বিজে অসাধারণ ভক্তি' ত চাই, অনেক 'নষ্ট'-'ভ্রষ্টে'রও উপাসনা করিতে হয়। দেবদ্বিজের চরণামৃতপান, সে ত সহজ কথা; অনেক সময়ে অনেক দৈত্য-দানবের তাড়নামৃতও পান করিতে হয়। এত সাধনায় তবে জীবিত ও প্রেত ছাইত্বে উভয়েই লীলা-খেলা করিতেছেন। প্রেত বঙ্কিমচন্দ্র ও ঠাকুরদাস ছাইত্বে এখনও শোভা পাইতেছেন।

ছাইত্ব বলিয়া তোমরা উপহাস করিবে কেন? ছাইত্ব আছে বলিয়াই সুজলা সুফলা বাঙ্গালা শস্যশ্যামলা, ছাই আছে বলিয়াই মানের এত মান, ছাই আছে বলিয়াই মানের কুট্‌কুটুনি কমিয়া যায়, ওল মুখরোচক হয়। আবার এ দিকে দেখ, ছাইত্ব আছে বলিয়াই নবীন ডাক্তারবাবু শিশি ভরিয়া ছাইপাঁশ দিয়া আপনার ছাই পেটের গুজ্‌রান করিতেছেন। তাই বলি, ছাইত্ব বলিয়া আর উপহাস করিও না, বিদ্রূপ করিও না, ভ্রূকুটি করিও না, বরং শতমুখে বল যে, ছাইত্ব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হউক, দেশে বিদেশে যেখানে বাঙ্গালি আছেন, সেইখানে এই ছাই উড়িয়া গিয়া সকলের বিভূতি সম্পাদন করুক; নরনারীনির্বিশেষে ছাইত্ব অঙ্গের ভূষণ, প্রাণের আরাম, কষ্টের শান্তি, আনন্দের পরিবর্ধক-ভাবে 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ' সর্বত্র সকল সময়ে পরিগৃহীত হউক। এই ছাইত্বের জয়ে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য জয়যুক্ত হউক, এই ছাইত্ব নষ্ট-ভ্রষ্ট-গণের মুখে পড়িয়া ফুলচন্দন হউক, আর তোমরা এই নাবি বর্ষায় একটু জল পাইয়া আনন্দে সন্তরণ কর।

[মহার্ণব = প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু; হীরেন্দ্র = হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; দীনেশচন্দ্র = দীনেশচন্দ্র সেন; শাস্ত্রী = হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; শশধর = শশধর রায়; লাহা = ভবানীচরণ লাহা; ঠাকুরদাস = ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।]

সাহিত্য ২৩শ বর্ষ চৈত্র ১৩১৯

সমগ্র ভারত

এমন কেহ ভারতবাসী আছেন কি, যিনি সমগ্র ভারতের ভাবটি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন? ভূগোলে ভারতের বিবরণ বাল্যকাল হইতে পাঠ করা গিয়াছে,

* 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

ইতিহাসে ভারতের কথা পুনঃপুন শুনা গিয়াছে, আমরা ভারতবাসী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ভারতের স্তন-দুগ্ধে দেহ পুষ্ট হইতেছে—কিন্তু ভাই! ভারত কেহ দেখিয়াছ কি? তুমি অসাড় কোটি হস্তের দুইখানি হস্ত দেখিয়াছ, আমি অর্বুদ অচল, ভগ্ন পদের একটি পদ দেখিয়াছি, তিনি অগণিত রক্তস্রাবী ক্ষতের একটি ক্ষত দেখিয়াছেন। কেহ হিমালয়ের উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া আলুলায়িত কেশরাশিতুল্য বনরাজির একদেশ দেখিয়াছেন, কেহ-বা কুমারিকা অন্তরীপতটে উপবিষ্ট হইয়া তূলারাশিবহনকারী ঘোররাবী সুনীল সিন্ধুর আন্দোলনে অন্তরে অন্তরে মন্দ আন্দোলিত হইয়া ভারতের পদ-নখর গণনা করিয়াছেন। তুমি দক্ষিণ-সাবাজপুরে এক দিনের দীর্ঘনিঃশ্বাসধ্বনি শুনিয়াছ, অথবা দাক্ষিণাত্যের দুর্দিনের হাহা-ধ্বনি তোমার কর্ণগোচর হইয়াছে। কবি এক দিনের মলিন মুখচন্দ্রমার পাণ্ডুরচ্ছবি সন্দর্শন করিয়া হৃদয়পটে চির-অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, আর আমি দিল্লী-দরবারের সেই নিস্পন্দ, নিশ্চল, নিষ্কম্প বাষ্পভর ভাব ভাবিয়া এখনও বিচলিত হই,—কিন্তু তুমি, আমি, তিনি, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহা একদেশ মাত্র, ভারত-কণা মাত্র;—সমগ্র ভারত, সম্পূর্ণ ভারত ভারতের সন্তান দেখে নাই, দেখে না,—দেখার আশা হৃদয়ে ধারণ করে না।

এই সাগর-ভূধর-পরিবেষ্টিত, সহস্র পর্বতাবয়বে তরঙ্গায়িত-দেহ, সহস্র নদী-প্রবাহে বিধৌত-মল, শস্যশ্যামল, বনরাজি-সঙ্কুল, রত্নগর্ভ, উর্বরভূ, অনন্ত জীবকোটির বিচরণস্থল, বিংশতি কোটি মানবের আবাস-ভূমি ভারতবর্ষ—ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি। দেখিবার বস্তু বটে! কিন্তু আমরা ভারত-সন্তান এ হেন ভারত আমরা দেখি নাই, দেখি না! এই অধোগতির দিনে ভগবানের করুণ কটাক্ষে ভারতবাসী বঞ্চিত আছে কিনা জানি না, কিন্তু পূর্বকালে ভগবান্ যে, এই ভারতের জন্য আপনার সদাব্রত-ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।—এমন মনোহর তরুলতাপূর্ণ শিখরমালা, এমন শ্যামল মন্দ-মারুত-আন্দোলিত শস্যক্ষেত্র, এমন ধীর গভীর প্রবাহধার নদনদী, এমন শাল-তমাল-তাল-সঙ্কুল ঘন বিজন কানন, এমন পবিত্র সুপেয় পয়োনিঃসরণকারী প্রস্রবণ, সেই বিদ্যুদ্দামদীপ্ত, ঘনঘটাপূর্ণ, মুষলধারস্রাবী বর্ষার আকাশ-মণ্ডল, আর এই চূতমুকুল-সৌরভপূর্ণ, পাপিয়াকুল-কোকিল-আরাবিত বসন্তকাল—এমন কি আর কোথাও আছে নাকি? আদিকালে ভগবান্ ভারতের উপর করুণা-বিতরণে কৃপণতা করেন নাই।

আর ধর্ম—কত কাল ধরিয়া কত কীর্তিই-না ইহাতে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। কাশী, কাঞ্চী, মথুরা, অবন্তী—এমনও কি আর কোথাও আছে নাকি? আর ইতিহাস—কত যুগ-যুগান্তরের গৌরব—শুধু গৌরব কি?—হায় কত কালের কলঙ্কধ্বজা—বুকে করিয়া বসিয়া আছে। ভারত-সন্তান, এ সকল তুমি দেখিবে না ত দেখিবে কি?

তাহার পর ভারতের বৈচিত্র্য।—কত দেশ, কত নগর, কত গ্রাম, কত ভাষা, কতরূপ পরিচ্ছদ, কত বিভিন্ন প্রকারের আচার-ব্যবহার—এক দেশে এত আর কোথায় আছে? দেখিবার পদার্থ বটে, আলোচনার সামগ্রী বটে; তবে আমরা অভাগা দেখিলাম না; আমরা ভাবিতে জানি না, ভাবিলাম না। আর শিল্পচাতুর্য—তাজমহল, সেকেন্দ্রা, গুরু-দরবার, ইলোরা, তাঞ্জোর, কাঞ্চী, কাশ্মীর, ভুবনেশ্বর, পুরী—ভারতের এই কয়টি স্থানে যাহা আছে, সমগ্র পৃথিবীতে তাহা আছে কি? দেখিবার সামগ্রী বটে, কিন্তু আমরা দেখিলাম না।

ভারতবাসী ভারত কাহাকে বলে—জানে না, বুঝে না, ভাবে না; সমগ্র ভারতের বিস্ময়কর বিস্তারপূর্ণ বিশ্বোদর ভাব কোন ভারতবাসী হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। সমগ্র ভারত বলিলে প্রকৃত যে কি বুঝায়, তাহা আমরা বুঝি না—বুঝি কেবল একটা কথা মাত্র—ব্যাকরণের একটা সংজ্ঞা মাত্র!

আলোচনা ১২৮৯

দেশভক্তি

ইংরাজের মত স্বদেশানুরক্ত এবং স্বজাতিপ্রিয় জাতি বোধ হয় জগতে আর নাই। ইংরাজের স্বাবলম্বন, নির্ভীকতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়—ইংরাজের অহঙ্কার, দম্ভ,

ঘৃণা, তাচ্ছিল্য—ইংরাজের দোষ-গুণের অনেকটা ঐ স্বজাতি-প্রিয়তার ফল। ইংরাজ ঘোরতর স্বজাতিপ্রিয় বলিয়াই আপনাদিগকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া জানেন। সুতরাং বিপদে ইংরাজ অতুল সাহসী এবং কষ্টসহিষ্ণু, সম্পদে ইংরাজ উদার হইলেও অহঙ্কারী। ইংরাজ স্বজাতির নিন্দা সহিতে পারেন না, আপনার কথার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেশের কথা ভাবেন, আপনার জাতির কথা ভাবেন। যে আপনার ভাল করিতে শিখিয়াছে, ভগবান্ তাহার ভাল করেন। কাজেই ইংরাজ জগতে কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিয়া চলেন না; ইংরাজ আপনার দুই পদে ভর করিয়া, দুই বাহু সতেজে সঞ্চালন করিয়া, পৃথিবীর সর্বত্র সোজা হইয়া উন্নত মস্তকে প্রসারিত বক্ষে বিচরণ করেন। ইংরাজকে বাধা দেয় এমন কেহ জগতে নাই। ইংরাজের এত প্রতাপ, এত গৌরব, এত মান, এত সাহস কোথা হইতে হইল? ইংরাজের নানা গুণ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার অনেক গুণের মূল—তাঁহার স্বজাতিপ্রিয়তা এবং স্বদেশ-বাৎসল্য। এই স্বজাতিপ্রিয়তা হইতেই ইংরাজের এত মান, এত সম্ভ্রম, এত ধন, এত ঐশ্বর্য।

যদি ইংরাজের স্থানে আমরা এই স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করিতে পারি তবেই তাঁহাদের রাজত্ব এবং আমাদের দাসত্ব সার্থক হয়। স্বজাতিবাৎসল্য মানবের একটি উজ্জ্বল ধর্ম। যে কারণেই হউক আমাদের মধ্য হইতে এই ধর্ম তিরোহিত হইয়াছে, আবার ইংরাজ চরিত্রে এই ধর্ম প্রতি অঙ্গভঙ্গিতে জাজ্বল্যমান। অদৃষ্টচক্রের সুকৌশল বিঘূর্ণনে এখন ইংরাজ আমাদিগের আদর্শ-স্থানীয়। এমন অবস্থায় যদি ইংরাজের স্থানে স্বদেশানুরাগ শিক্ষা না কর, তবে শিখিলে কি? আর ইংরাজ যদি আমাদিগকে স্বদেশানুরাগ না শেখান, তবে করিলেন কি?

ইংরাজ যদি আপনার কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করেন, আমরা করিব কেন? ইংরাজের দৃষ্টান্ত অহরহ সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি—বিদ্যালয়ে, বিচার-স্থলে, পণ্যশালায়, শিল্পাগারে সর্বত্রই ইংরাজ সমান স্বদেশানুরাগী। সকল কার্যেই দেখিবে ইংরাজের স্বদেশানুরাগ জাজ্বল্যমান। এমন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি আমরা স্বদেশানুরাগ শিক্ষা না করি, তবে আমাদের মত মূঢ় এবং নির্বোধ আর নাই। কেবল মূঢ় কেন? প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুবিধা পাইয়াও তাহাতে পরাঙ্মুখ, সুতরাং পাপী।

এই পাপের ভাগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রাণে চেষ্টা করিয়া থাকি। জানিয়া শুনিয়া কে বল পাপের ভাগী হইতে যায়? আমরা জানি স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য কার্য; তাহাতে ত্রুটি করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে। তবে যাহাতে জনসাধারণের স্বদেশানুরাগ শিক্ষা হয়, এমন কথা না লিখিয়া, না বলিয়া নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় থাকিব কিরূপে?

স্বদেশানুরাগ শিখিবার অবশ্য নানা উপায় আছে। দেশের পূর্ব গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে, বর্তমান হীন অবস্থা বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং আশার দুয়ার খুলিয়া ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আভা প্রদর্শন করিতে হইবে। দেশীয় ভাষায়, দেশীয় সাহিত্যে যাহাতে সাধারণের শ্রদ্ধা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; প্রচলিত আচার-ব্যবহারের তত্ত্বসকল বুঝাইয়া দিতে হইবে, আর স্বদেশানুরক্ত মহাত্মবৃন্দের স্বর্গীয় কিরণ-ছটা-বিভাসিত চিত্রসকল মধ্যে মধ্যে জনসাধারণের নয়ন-সমক্ষে ধরিতে হইবে। পাঁচটা দেখিলে শুনিলে, পাঁচরূপ ভাবিলে চিন্তিলে, মহাত্মাদের মহদন্তঃকরণের দিকে আকৃষ্ট হইলে, তবে ক্রমে লোক স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করে। স্বদেশানুরাগ আরাধ্য বস্তু, জগতের দুর্লভ পদার্থ। আমাদের মত বাস্তুপ্রিয়, পরিবার-পোষক, সাংসারিক অথচ সংসারে উদাসীন জাতির হৃদয়ে অনেক কষ্টে দেশভক্তির সঞ্চার হয়, অনেক কষ্টে ইহার পরিপোষণ হয়, আর অনেক কষ্টে সেই দেশভক্তি সতেজ এবং সবল হয়। তবে এস, এই ইংরাজ-রাজত্বে ইংরাজের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, ইংরাজের প্রকাশিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া এই অপূর্ব স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করি,—উহার পরিপোষণ করি, উহাকে সতেজ এবং সবল করি।

নাটকের সৃষ্টিকাল

যে-সে সভ্যসমাজে লোকে মনে করিলেই, যখন-তখন নাটক সৃষ্টি করিতে পারে না। এ কথা—ঠিক কথা।

নাটক বল, নভেল বল, কাব্য বল, দর্শন বল, জগতে জড়, অজড় সকল পদার্থেরই বিকাশ বিশেষ নিয়ম-অনুসারে হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই আগম-নিগমের নিয়ম ও ক্রম আছে। সাহিত্যেরও সকল অবয়বের বিকাশের ক্রম-নিয়ম আছে। সেই সকল ক্রম-নিয়ম যে কি, তাহা বুঝা বড় কঠিন, তবে মোটামুটি এতটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, কোন দেশে পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতা যুগপৎ বৃদ্ধি পাইলেই যে সেই দেশে সাহিত্যের সর্ব অবয়বের সুন্দর বিকাশ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। বড় বড় জাতির বড় বড় কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালি জাতির ক্ষুদ্র বঙ্গসাহিত্যেই দেখুন—পণ্ডিত ও রসজ্ঞ অনেকেই আছেন, কিন্তু রাম বসুর মত আগমনী বা বিরহ অথবা হরু ঠাকুরের মত সখীসংবাদ কেহ লিখিতে পারেন কি? না, তা পারেন না। যখন-তখন, যে-সে জিনিস, মনে করিলেই হয় না।

প্রাচীন গ্রীসের একটি বিশেষ সময়ে এবং আধুনিক ইংলণ্ড, স্পেন, ফরাসি দেশের বিশেষ বিশেষ সময়ে বড় বড় নাটককার জন্মিয়াছিলেন, এইটি দেখাইয়া, এস্কাইলস্, সেক্সপিয়ার, হুগো প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া, ইউরোপীয় সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, যখন সভ্য দেশে যুদ্ধবিক্রমের, বাহু-বল-বিপ্লবের, জড় জগতের সহিত মানবের কার্যশক্তির বিশেষ প্রাবল্য হয়, তখনই নাটকের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

তাঁহাদের কথা এই যে, দেশে জীবন্ত ভাবে ঘাতপ্রতিঘাত থাকিলে, সাহিত্যে ঘাতপ্রতিঘাত-জীবনময়-নাটকের সৃষ্টি হইবে। দেশে ঘাতপ্রতিঘাত না থাকিলে, সাহিত্যে ঘাত-প্রতিঘাত হইবে কেন?

কাব্য-সাহিত্যের সমালোচনায় আমরা অনেকেই ইউরোপীর সমালোচকগণের মন্ত্রশিষ্য, কাজেই আমরা ঐ মতের অনুসরণ করিয়া, বাঙ্গালিকে নাটক লিখিতে নিষেধ করি, লিখিলে অবজ্ঞা করি, বিজ্ঞতা দেখাই; উপহাস করি, ঘৃণা দেখাই।

কিন্তু সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত-মধ্যে আমরা যে-নিয়ম স্থির করিতেছি বা ইউরোপীয়েরা স্থির করিয়া দিয়াছেন বলিয়া যাহা আমরা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, সেই নিয়মটি একটু বিচার-বিতর্ক করিয়া আমাদের এখনকার দিনে দেখা আবশ্যক।

এই কলিকাতায় এক দিকে, যেমন একজন প্রধান ধনি-সন্তান—লক্ষপতি বলিলে যাঁহার অবমাননা হয়—এহেন লোক নিভৃতকক্ষে পঞ্চ পারিপার্শ্বিকে পরিবৃত হইয়া তোষা-মোদ-সেবনের মায়া কাটাইয়া, অথবা তদপেক্ষা আরও নিভৃতকক্ষে মুহুরি-মহাফেজ লইয়া কড়াক্রান্তির হিসাবের মমতা ভুলিয়া, বিপুল অর্থদানে, ভূরি সময়দানে, নাটকের রঙ্গোৎসাহে অগ্রসর,—অন্য দিকে, তেমনই কবি-প্রসিদ্ধ দারিদ্র্যের সহচর কবিবর—রামায়ণ মহাভারতের অপূর্ব অনুবাদ-সুখের মায়া কাটাইয়া, ছোট ছোট খোসগল্পের ছাঁহুনি বাঁধুনি গাঁথুনির মমতা ভুলিয়া, সর্বস্বান্ত হইয়া, ঋণদায়ে জড়িত হইয়া, সেইরূপে বঙ্গনাটকের রঙ্গোৎসাহে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ। আর বৎসর দেখা গেল, নববিধানীরা বাঁশের বেড়ায় গোবর-মাটির প্রলেপ দিয়া বঙ্গনাটকের সেবা করিতেছেন, আবার এ বৎসর দেখা যাইতেছে, স্টার কোম্পানি সুবৃহৎ, সুরম্য, মর্মর-গ্রথিত হর্ম্য নির্মাণ করিয়া নাটকসেবার উদ্যোগে আছেন। এমন উৎসাহের দিনে, নাটকের সৃষ্টিস্থিতির বিলাতি নিয়মটি আমাদের বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

নাটকের জীবন—ঘাতপ্রতিঘাত বটে, কিন্তু অত অল্প কথায় বলিলে কিছুই বুঝা যায় না। আমরা অনেক স্থলে ঐ কথাটি অনেক প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, যদিও এখনও অনেক কথা বলিবার আছে—তথাপি অন্য ও-কথার আর নাড়াচাড়া করিব না। কিন্তু নাটকের জীবন ঘাত-প্রতিঘাত বলিয়াই—কোন সভ্য সমাজে ঘাতপ্রতিঘাত থাকিলেই যে সেই সমাজে নাটক সৃষ্ট হইবে—তাহা বোধ হয় না।

মুসলমান সভ্য জাতি। মুসলমান ইউরোপের সাক্ষাৎ শিক্ষাগুরু। মুসলমান যাহা হিন্দুর নিকট, য়ুনানীর নিকট শিক্ষা করিয়াছে এবং স্বয়ং শিক্ষা করিয়াছে, সেই সকল জ্ঞান-

বিজ্ঞান অতি সন্তর্পণে আবার আপনার শিষ্য ইউরোপীয়গণকে শিক্ষা দিয়াছে। মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র কোরান একরূপ সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ। পারসী ভাষার গীতিকাব্য হিন্দু-গ্রীকের সমতুল্য। যুদ্ধবিক্রমে, দিগ্বিজয়ে, অসি-দণ্ডের ঘাতপ্রতিঘাতে, পাঁচ শত বৎসর যাবৎ মুসলমান জগতে অতুল্য ছিল বলিলেও হয়।—এত ঘাতপ্রতিঘাতেও ত মুসলমানের সাহিত্যে—আরবী, পারসী, তুরকীতে—ঘাত-প্রতিঘাতময় নাটক একখানিও নাই। তবেই বোধ হইতেছে, কোন সভ্য সমাজে ঘাতপ্রতিঘাত থাকিলে, তাহাদের সাহিত্যেও ঘাতপ্রতিঘাতের ছায়া পড়িবে, এই নিয়ম সকল স্থলে খাটে না। এখন কথা হইতে পারে, কোন সভ্য সমাজে ঘাতপ্রতিঘাত থাকিলেই যে সেই সমাজের সাহিত্যে ঘাতপ্রতিঘাত থাকিবে—এ কথা ঠিক নহে বটে, কিন্তু সমাজে ঘাতপ্রতিঘাত না থাকিলে যে ঘাত-প্রতিঘাতময় নাটক হইবে না—তাহা ঠিক। এ কথারও বিচার করা আবশ্যক।

কোন একটি সমাজের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রের ঝঞ্চনানি অঙ্গ-গ্রন্থির কন্কনানি না থাকিলেই যে সে সমাজে কিছুমাত্র ঘাতপ্রতিঘাত নাই, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে নির্জীবপ্রায় এই বঙ্গসমাজে কতটুকু মানসিক ঘাতপ্রতিঘাত আজকাল চলিতেছে—তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বর্ষীয়ান্ পিতা, কিসে পুত্র ঠাটবাট বজায় রাখিয়া পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপ নষ্ট না করিয়া সুপরিচিত, চিরপ্রচলিত পথে চলিতে থাকিবে—নিয়ত সেই ভাবনায় বিব্রত; আর তাঁহার সেই যবীয়ান্ পুত্র কিসে সমাজ ভাঙ্গিবে, গৃহস্থালি নষ্ট করিবে, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিবে,—সেই ভাবনায় ভোর। ইহাতে আমাদের সমাজ-মধ্যে নিয়তই কি ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে না? অশিক্ষিত ভাবিতেছে উদর-নীতি; শিক্ষিত ভাবিতেছেন উদার-নীতি; গৃহিণী ভাবিতেছে অতিথি-অভ্যাগত, ক্রিয়া-কলাপ, ছেলেপিলে, আব্রু-আচ্ছাদন; বধূমাতা ভাবিতেছেন বন্ধু-বন্ধুনী, কৌচ-কেদারা, ডাকের পত্র, প্রিয়জনের ছত্র, সোসাইটীর মহাশ্মশান আর চিঁড়িয়াখানার জীবন্ত তীর্থ। দুইটি বিভিন্ন-মুখী স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাত বঙ্গসমাজে আজি অনেক কাল লীলাখেলা করিতেছে—সমাজে, সংসারে, এমন কি স্ত্রীপুরুষ-মধ্যে—ঘাতপ্রতিঘাত নিয়তই চলিয়াছে। বাঙ্গালির যতই চক্ষু ফুটিতেছে এই ঘাতপ্রতিঘাত ততই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। বাহ্যে ঘাত-প্রতিঘাত নাই বলিয়া অন্তরেও যে নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না। তবে যে-সমাজ অন্তর্বাহে সমানে নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল,—জড়, অসাড়,—উদাস, উদাসীন,—সে-সমাজে অবশ্য নাটক সৃষ্ট হইবে না; শুধু নাটক কেন—তাহাতে দর্শন-বিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য—অবশ্য মনুষ্য-ধর্মের কিছুই থাকিবে না।

তেমন জড় সমাজ, বঙ্গসমাজ নহে। অনেক দিন হইতে বাঙ্গালি কাঁদিতে শিখিয়াছে। অন্তর আলোড়িত হইয়া টগবগ করিয়া না ফুটিলে, কিছু বাষ্প উঠে না। বাঙ্গালি বহুকাল বাষ্পবারি ফেলিতেছে—অনেকদিন হইতে তাহার অন্তর আলোড়িত হইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর হইল, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আকস্মিক আঘাতে বঙ্গসমাজ সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল, অভিভূত হইয়াছিল—মন্ত্রমুগ্ধবৎ পরিচালকের অঙ্গুলি-ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছিল, অল্পে অল্পে তাহার সংজ্ঞা হইতেছে। সেই বিষম আঘাতের অল্প অল্প প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে। এমন আন্তরিক ঘাতপ্রতিঘাতে কি নাটকের কিছুই উপযোগিতা নাই? তোমরা অমন করিয়া মাথা নাড়িলে চলিবে কেন? আমি তোমাদের কথা ত বিশ্বাস করিব না। আমি স্বয়ং একখানা জীবন্ত নাটক, আমার হৃদয়ে দুইটি প্রবল প্রতাপ স্রোতের নিরন্তর ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছে—তোমরা আমাকে চিত্রিত করিলেই নাটক হইবে—তবে এ সময় নাটকের উপযোগী নয়, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? 'আমি জীবন্ত নাটক' এই কথা বলিয়া আমি আত্মগরিমা করিতেছি না—আমি অর্থে আমরা—আমি, তুমি, তিনি—সমগ্র শিক্ষিত সমাজ। আমরা শিরায় শিরায় পূর্বপুরুষদের নিতান্ত নিষ্কামতা বহন করত, শিক্ষাগুণে পশ্চিমপুরুষদের একান্ত সকামতা পাইয়াছি। পাইয়া হইয়াছি—নিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের গ্রন্থ—এক একখানি জীবন্ত নাটক। এরূপ আভ্যন্তরিক সংঘর্ষণ জগতে আর কখন হয় নাই। এমন

অপূর্ব সংঘর্ষণের ফল যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে না— সে বিশ্বাস আমাদের হয় না। সংসারধর্ম-সাধনার জন্যই বল, আর কাব্য-সাহিত্যের স্ফুরণ জন্যই বল,—আত্ম-চিত্তানুসন্ধান ও সেই চিত্তের চিত্রণই আমাদের অবশ্য কর্তব্য কার্য!

যে-সে সময়ে নাটক হয় না বটে, কিন্তু এ সময়ে যে বঙ্গসমাজে প্রকৃত নাটক একেবারেই হইতে পারে না— এমন কথা ইতিহাসের দোহাই দিয়া, জোর করিয়া বলিয়া আমরা নাটককারগণকে নিরুৎসাহ করিতে পারি না। প্রকৃত পন্থায় চেষ্টা করিলে, এ সময়ে নাটক সৃষ্ট হইলেও হইতে পারে।

প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করিতে হইলে, অনেক বিষয় শিখিতে হইবে। নাটকের উপযোগী গল্প নির্বাচন করাও শিখিতে হয়, না শিখিলে অতি সামান্য কর্মও হয় না— এ সকল ত অতি গুরুতর কাজ।

যে-সে গল্প লইয়া, অঙ্ক-দৃশ্য-বিচ্ছেদ করিয়া—কথোপ-কথনের ভঙ্গিতে পুঁথি লিখিলে, নাটক হয় না। গল্পের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের উপকরণ থাকা ত চাই, গল্পটিতে পূর্ণত্বও থাকা চাই। রাহুর মত কেবল মুণ্ডটা বা কেতুর মত মাথাকাটা ধড়টা লইলে হইবে না। একটি গাছের যেমন মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল থাকে— একটি নাটকোপযোগী গল্পেরও সেইরূপ পূর্ণবিকাশ থাকা চাই। পাণ্ডবনির্বাসন, মহাভারত-যুদ্ধ-রূপ মহানাটকের একটি মহামূল, সেইটি মাত্র লইয়া কখন নাটক হইতে পারে না—তবে যাত্রার মত নাটকে পালাগাঁথনি থাকিলে প্রথম দিনের পালায় গাওয়া যাইতে পারে।

নবজীবন ৪র্থ ভাগ ১২৯৪

তুকারাম ও চৈতন্যদেব

১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম; ১৪৫৫ শকে তিনি অপ্রকট হন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস তিনি অদ্যাপি মানব-শরীরে দেখা দিয়া থাকেন।

১৫২৯।৩০ শকে তুকারামের জন্ম; ১৫৭১।৭২ শকে তিনি বৈকুণ্ঠগমন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকট অবস্থায় তুকারামের সঙ্গে তাঁহার দেখা হওয়া অসম্ভব।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর তুকারাম চরিতে লেখা হইয়াছে, একদা মাঘের শুক্ল-দশমী বৃহস্পতিবার পাণ্ডুরঙ্গের মূর্তি ধ্যান করিয়া নিদ্রিত হইবার পর তুকারাম স্বপ্ন দেখিলেন যে, যেন তিনি ইন্দ্রায়ণী হইতে স্নান করিয়া বিঠোবার মন্দিরে গমন করিতেছেন, সেই সময় একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তুকারাম আপনার অভ্যাসানুযায়ী ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে তিনি তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে রাম-কৃষ্ণ-হরি এই মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং আপনার পরিচয় বা গুরু-পরম্পরা নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ভক্ত বৈষ্ণব রাঘব চৈতন্যের শিষ্য কেশব চৈতন্য, আমি তাঁহার শিষ্য; আমার নাম বাবাজী চৈতন্য; এবং তাহার পর বলিলেন, তুকারাম, তুমি কিছুতেই পাণ্ডুরঙ্গের উপাসনা ও ধ্যান পরিত্যাগ করিও না। তুকারাম পরম প্রীতমনে বলিলেন, আপনি আমার আশ্রমে পদার্পণ করিয়া আমাকে পবিত্র করুন। ব্রাহ্মণ স্বীকার করিয়া তুকারামের সঙ্গে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন; কিন্তু অবলাঈ অতিথিকে দেখিয়া তুকারামের সঙ্গে কলহ আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণ সেই অবসরে অন্তর্ধান করিলেন। এই সময় তুকারামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এবং স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অদর্শনে তিনি একান্ত ব্যাকুল হইলেন।…ব্রাহ্মণের অদর্শনে তুকারাম ভাবিলেন, সংসারে থাকাতে আমার স্বপ্নেও শান্তি ঘটিতেছে না। অতিথি-অভ্যাগতের সেবার জন্যই সংসার-ধর্ম, কিন্তু স্বপ্নেও যখন আমার সেই সেবাধর্ম প্রতিপালনের শক্তি নাই তখন এ সংসার পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি বল্লালের বন নামক একটি অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, প্রত্যূষে সেখান হইতে আসিয়া তুকারাম ইন্দ্রায়ণীতে স্নানান্তর বিঠোবার পূজা করিয়া পুনর্বার অরণ্যে প্রতিগমন করিতেন।

এই বিষয়ে তুকারামের অভঙ্গের অংশ—

সত্যাসত্য সাক্ষী করি আপনার মনে
লোকের গঞ্জনা বাক্য না শুনি শ্রবণে।

স্বপ্নে গুরুদত্ত মন্ত্র করিয়া গ্রহণ
করিলাম হরিনামে বিশ্বাস স্থাপন।
কবিত্ব শক্তি ক্রমে উপজিল মনে
স্থাপন করিনু চিত্ত বিঠোবা চরণে।

এখন কথা হইতেছে—পরিচয়, যদি শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয় হয়, মন্ত্র যদি তাঁহার প্রসিদ্ধ 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্রের সারাংশ হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেব অপ্রকট হওয়ার পর তুকারামকে দীক্ষাদান করেন, এরূপ বিশ্বাস করিতে বিশ্বাসী লোকের ক্ষতি কি? শ্রীচৈতন্যদেব ৪৮ বৎসর বয়সে অপ্রকট হন। তুকারাম দেখিলেন, একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ…। কেন এইরূপ হইল? এই জন্যই পূর্বেই বলিয়াছি, কাহারও কাহারও বিশ্বাস তিনি মানব-শরীরে দেখা দিয়া থাকেন।

চৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন—

অদ্যাপি মানব-লীলা করে গৌররায়
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।

তিনি মানবাকারে থাকিলে তুকারামের সময় তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধই হইবেন।

রাঘব চৈতন্যের উল্লেখে কিছু গোলমাল ঘটিয়াছে। ২০।২৫খানি প্রাচীন মারাট্টা পুঁথি দেখিলে সন্দেহের নিরাকরণ হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট অবস্থায় দক্ষিণ দেশে কতকগুলি ভক্তের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করেন।—কাহাকে কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়া, কাহাকে কীর্তন করিতে ধরাইয়া, কাহাকে কেবল হরিনাম দান করিয়া। এ সকল কথা বিশ্বাস করিলে অপ্রকট অবস্থায় তুকারামে শক্তিসঞ্চার করাও বিশ্বাস করা যায়। তুকারামে যে সেই দীক্ষার পর শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা ত দেখাই গিয়াছে। সেই দিন হইতে তাঁহার বৈরাগ্য ও অরণ্যবাস, হরিনাম-গ্রহণ এবং কবিত্ব শক্তির সঞ্চার।

[অপ্রকাশিতপূর্ব]

ইসারা

জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্যতে ঘটঃ
সহেতুঃ সর্ববিদ্যানাং ধর্মস্য চ ধনস্য চ।

আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বিন্দু-পরিমাণ, কিন্তু তুমি যদি আমাকে উপেক্ষায় অবহেলিত না করিয়া, রাগে পদদলিত না করিয়া তোমার বিপুল বক্ষে আমাকে রক্ষা কর, তাহা হইলে হয়ত আমি বিন্দু বিন্দু করিয়া তোমার ঘটে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চিত করিয়া দিতে পারি।—মনে নাই, সেই যে একটি ক্ষুদ্র প্রাণী নবনীত-পুতলী রাঙ্গা চেলীতে জড়াইয়া আদর করিয়া ঘরে তুলিয়াছিলে,—আজি দেখিতেছ না, সেই ক্ষুদ্র জীব তোমার হৃদয়ে কি বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। আদর করিয়াছিলে, ভালবাসিয়াছিলে বলিয়াই-না, এতটা হইয়াছে—আমাকেও তুমি ভালবাসিয়া, একবার আদরের চক্ষে বক্ষে ধারণ কর, ভাল দেখই না কেন আমিই-বা কি করি। আমি কি করিব—তাহা আমি জানি না, জানিলেও আমি প্রথম আলাপে কিছু বলিতেই পারিব না—আমি ছোট, আমার ছোট মুখে বড় কথা সাজিবে কেন?

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের একটি মাত্র চক্ষু ছিল, সেটি আবার অতি ক্ষুদ্র। কাজেই লক্ষ্মীকান্ত বলিত, 'ঐ যে অনেক লোকের নাকের দুদিকে দুটা আলু পটলের মত চ্যাপ্ চ্যাপ্ করে, ছ্যা! সে অতি বিশ্রী; চোখ থাকিবে ইসারায়।' আমিও বলি, আমাকে তুমি ইসারার মধ্যেই ধরিয়া লইও। ভাল, অনেক দিন ধরিয়া ত লম্বা-চওড়া কাঁদুনির প্রশ্রয় দিয়াছ—এখন একবার কিছুদিন ইসারাকে আশ্রয় দিলে ক্ষতি কি? আমি তোমাদের চোখে চোখে থাকিব, চোখের আড়াল হইব না। তোমরা যখন আহ্লাদে ইসারা-ইসিরি করিবে, তখন ত আমার আহ্লাদ ধরিবেই না—তোমাদের করুণ কটাক্ষেও আমি কাতর হইব না। আমি চাহি না,—গগনভেদী চীৎকার—আমি যে বুক-চেরা ইসারা। আমি চাহি না,—বিজয়রোলের অট্ট অট্ট হাস—আমি যে বিনীত বিজিতের অদৃষ্ট ইসারা। আমি চাহি না,—কাঁদুনির ফাঁদুনি—আমি যে চোখের কোণের বিন্দু-জলের অযাচিত ইসারা। আর, কাজে কাজেই আজি আমার এইখানে সমাপ্তি—আমি যে অতি ক্ষুদ্র ইসারা।

পূর্ণিমা ১ম বর্ষ বৈশাখ ১৩০০

সেকালের টোল

ক

নানা সময়ের, নানা দেশের ছাত্রবর্গের লেখাপড়ার কথা ও ছাত্রগণের পাঠাগারের বিবরণ অনেক ছাত্রেরই জানিতে কৌতূহল হইতে পারে। এরূপ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার চেষ্টা এই প্রবন্ধে করা হইল।

বর্তমান সময়ে কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করে। এমন কি এই ছাত্রগণের জন্য মধ্যবর্তী ভদ্রলোকের বাসা মিলা ভার।

কাশীতে ছাত্রসংখ্যা বিস্তর। এক কুইন্‌স কলেজে প্রায় ১,২০০ ছাত্র।*

কাশীর হিন্দু কলেজও দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে।

সমুদয় কাশীতে সংস্কৃত বিদ্যার্থীর সংখ্যা ৫ সহস্র। তাহার মধ্যে কেবল মহারাজ দ্বারবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত টোলে প্রায় ৮০০ বিদ্যার্থী থাকে।†

পশ্চিম দেশের আলিগড় কলেজেও ১,২০০ ছাত্র অধ্যয়ন করে। আলিগড় কলেজ এশিয়ার মধ্যে অপূর্ব বিদ্যামন্দির।

জাপানের রাজধানী টোকাইও নগরীতে লক্ষ ছাত্র অধ্যয়ন করে; ‡ তাহারা সকলেই নাকি নাস্তিক।

ইউরোপের মধ্যে বিলাতের অক্সফোর্ডে ১,৩০০ ছাত্র। জর্মান দেশের সাক্‌সনি প্রদেশের লীপ্‌জিগ কলেজের ছাত্র-সংখ্যা ৭০০।

আমেরিকার চিকাগো কলেজে ৯০০র অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করে; ১,১০০ পর্যন্ত ছাত্র থাকিবার সংস্থান আছে।

আফ্‌রিকার মিশর দেশের রাজধানী কাইরো নগরে ও তন্নিকটবর্তী অজ্‌হর বিদ্যামন্দিরে লক্ষাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করে। অজ্‌হরে ১৭,০০০ ছাত্র বিদ্যালয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করে। তাহাদিগের বেতন লাগে না। দুই ক্রোশ দীর্ঘ, অর্ধ ক্রোশ প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপরি এই বিদ্যামন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যানাদি প্রতিষ্ঠিত। এখনকার ইঞ্জিনিয়ারগণ মনে করেন ১০ কোটি টাকা ব্যয় করিলে এইরূপ বাড়ী এখন নির্মিত হইতে পারে।

এখন বিদ্যার্থিগণের জন্য বড় বড বাড়ীর প্রয়োজন হয়, ভাল ভাল ছাপার বই দিতে হয়, দুই বেলা তাঁহাদিগকে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। অজ্‌হরে প্রত্যহ আটাশ মন মাংস লাগে। কিন্তু এমন দিনকাল ছিল, যখন ছাত্রেরা কুটীরে বাস করিত, আপনার পড়িবার পুস্তক আপনি নকল করিয়া লইত এবং যৎসামান্য উপকরণে অর্ধসিদ্ধ অন্ন আপনি পাক করিয়া, তাহাই ভোজন করিয়া দিন যাপন করিত। শুষ্ক তালপত্রে অগ্নি লাগাইয়া তাহা প্রজ্বলিত হইলে তাহাতেই পাঠচর্চা করিত, এ কথা গল্প-কথা নহে।

বৌদ্ধ-গৌরবের সময়ে এক এক মঠে দশ হাজার, বিশ হাজার ব্রহ্মচারী ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করিত। শিলাদিত্যের রাজধানীতে এইরূপ মঠ চীন-পরিব্রাজক ফা হিয়ান স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

কুটীরবাসী ছাত্রের সংখ্যা নবদ্বীপে বহুতর ছিল। দুই শত বৎসর পূর্বে একজন ফরাসী স্বচক্ষে বিংশতি সহস্র ছাত্র নবদ্বীপে দেখিয়াছিলেন।

চারি শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিস্তারিত লিখিয়াছেন।—

নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥

পঢ়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপপুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে॥
একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যোন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ॥

* ইংরাজি কলেজ ২১০, সংস্কৃত কলেজ ৩৫৩, ইংরাজি-সংস্কৃত কলেজ ৪৮, কলেজিয়েট স্কুল ২৮৬, টাউন স্কুল ২৯১—মোট ১,১৮৮।

† অনেক কথাই ১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসের 'ভারতী' হইতে গৃহীত।

‡ Of the 100,000 students at Tokio, the great majority have abandoned the national faiths and as yet believe in nothing. *Gentlemens' Maga.*, August, 1901.

সেই সময়ের নবদ্বীপের ছাত্র-সংখ্যার কথা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। দুই শত বৎসর পূর্বে ছাত্র-সংখ্যা বিংশতি সহস্র ছিল, ফরাসী পর্যটকের এই কথাটুকু না পাইলে এবং এখনও কাইরো ও টোকাইও নগরীদ্বয়ে লক্ষাধিক ছাত্র বিদ্যাচর্চা করে, এ কথা না জানিলে আমরা বৈষ্ণব কবির বর্ণনা অতি সহজে অবিশ্বাস করিতে পারিতাম। এখন ঐ বর্ণনা পাঠ করিলে হৃদয়-মধ্যে বিস্ময় ও বিশ্বাসের তরঙ্গ উঠিতে থাকে।

খ

কেবল নবদ্বীপ বলিয়া নয়, নবদ্বীপের দক্ষিণে ও উত্তরে বহুদূর যাবৎ ভাগীরথীর দুই ধারে, বিশেষত পশ্চিম তটে, বহুতর টোল ছিল। সমগ্র রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় হইতে, বিশেষ ভাবে শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে, অনেক সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ নিত্য গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য এবং পুত্র-পৌত্রের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার জন্য এতদঞ্চলে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে, বিদ্যার পরিচয় দিয়া জীবিকানির্বাহের জন্য এই নবদ্বীপ অঞ্চলেই বাস করিতেন। আর বহুতর বিদেশী ছাত্র গুরুজন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এতদঞ্চলে গুরুগৃহে বাস করিতেন। বড় বড় অধ্যাপকের বড় বড় টোল ছিল।

টোল বাঙ্গালার অপূর্ব অনুষ্ঠান; এমন গৌরবান্বিত অথচ আড়ম্বর-রহিত অনুষ্ঠান জগতে বুঝি আর নাই। টোলের সুশৃঙ্খলা, আড়ম্বরশূন্যতা ও মিতব্যয়িতা জগতের সকল অক্স্‌ব্রিজকে ধিক্কার দেয় আর বাঙ্গালি ছাত্রগণকে বলে, —তোমরা তৃণপর্ণ-কুটীরের মর্যাদা বুঝ', প্রকাণ্ড প্রস্তর-প্রাসাদ দেখিয়া ঘূর্ণিতমস্তক হইও না।

টোলকে এখন চতুষ্পাঠী বলা হয়, পূর্বে 'চৌবাড়ী' বলিত। একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর চারিদিকে মেটে দেওয়াল-দেওয়া খড়ে-ছাওয়া লম্বা লম্বা ঘর। ঘরগুলি বারিকের মত খুব লম্বা; সেইগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরীতে বিভক্ত। কুঠরীগুলি ৩ হাত প্রস্থ, আর ৬ হাত দীর্ঘ। যে প্রাচীর-দ্বারা একটি কুঠরী অন্যটি হইতে পৃথক্ হইয়াছে, সে প্রাচীর চাল পর্যন্ত যায় নাই,—মাত্র ৪ হাত উচ্চ। কুঠরীগুলির সম্মুখে দাওয়া, —লম্বা, একটানা, খুঁটী লাগানো। এমনই একটি ঘরে কুড়িটি কুঠরী। প্রত্যেক দিকে এরূপ ৩।৪খানি ঘর আছে। কোন এক দিকে হয় ত একখানি ঘর কম আছে, সেই স্থান দিয়া অধ্যাপকের ভবনে যাইতে হয়। এই যে চত্বর—ইহাই চৌবাড়ী। এমন একটি চৌবাড়ীতে ২৫০।৩০০ ছাত্র স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। প্রতি কুঠরীতে এক এক জন ছাত্র রন্ধন, ভোজন এবং শয়ন করেন। কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ গৃহস্থালির সম্পর্ক নাই।

তবে এক কুঠরী হইতে পার্শ্বের কুঠরীর ছাত্রের সহিত কথাবার্তা কহা চলে; চারি-হস্ত-উচ্চ প্রাচীর ব্যবধান থাকায় পরস্পর মুখ দেখা চলে না। রন্ধন, ভোজন, শয়ন—একটি তিন-হাত-প্রস্থ ঘরের মধ্যে হয়, সে বড় বিচিত্র! বিচিত্র বৈকি। আগড় ঠেলিয়া বা কবাট খুলিয়া কুঠরীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিবে, ঠিক সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চাতের দেওয়ালে একটি বৃহৎ কুলুঙ্গী। সেই কুলুঙ্গীতে রন্ধনের পাত্র থাকে। তিন-হাত ছয় হাত মেজের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র 'দোপাকা' চুল্লী। অবশ্য রন্ধনের সময়েই ব্যবহৃত হয়।

দিনের বেলা পাঠাভ্যাস দাওয়াতেই হয়; কখন-বা অধ্যাপকের সমক্ষে, কখন-বা নয়। রাত্রির বিদ্যাচর্চা সেই কুঠরীর অভ্যন্তরে হইয়া থাকে। দোপাকা উনানের আলোকই দীপের কার্য করে। আহারান্তে পাঠাভ্যাস পারগপক্ষে দীপালোকে হয়। কুলুঙ্গীর বিপরীত দিকের দেওয়ালে, দীপ রাখিবার একটু হাত্তলের মত আছে।— ঘরের তিন কোণে শিকা আছে, চুল্লীর দিকে নাই। চুল্লীর বিপরীত দিকে ছোট একটি 'পেতেন' আছে; তাহাতে গোটা দুই হাঁড়ি ও ভাঁড়।

যেমন আবাস, আহারের বন্দোবস্ত তদনুরূপ বা আরও বিচিত্র। অধ্যাপক ছাত্রদিগকে তণ্ডুল ও কাষ্ঠ দিয়া থাকেন। তণ্ডুল রন্ধনোপযোগী দেন, কাষ্ঠ হয় বাগান না হয় জঙ্গল হইতে ভাঙ্গিয়া আনিতে হয়; নতুবা বড় বড় কুঁদো কাঠ অধ্যাপক মহাশয় সংগ্রহ করিয়া চত্বরের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই চেলাইয়া লইতে হয়। কিন্তু কেবল কাঠ আর চাল হইলেই ত চলে না; তেল-নুণ চাই, সামান্য ব্যঞ্জনও ত কিছু চাই, দালও ত কিছু চাই, আর বঙ্গদেশীয়

ছাত্র—কিছু মৎস্য না হইলেই-বা কিরূপে চলে? বাড়ী হইতে যে প্রচুর আনিতে পারিত, তাহার ত কথাই নাই। কিন্তু অনেকেই ত পারিত না; কাজেই তাহাদের দক্ষিণা ও দানের উপর নির্ভর করিতে হইত, এবং অতি কষ্টে চলিত। আর তাহাদিগকেই তালপাতা জ্বালিয়া পাঠচর্চা করিতে হইত। কিন্তু এই কঠোর জীবনের বিদ্যার আঁটনি বড়।

দুই শত বৎসর পূর্বে এইরূপ টোলই বাঙ্গালার এই সকল অঞ্চলে ছিল এবং অধিকাংশ ছাত্রই অতি কষ্টে দিনযাপন করিত। তবে দুই একটি সুবিধাও ছিল।

প্রথম সুবিধা, তখন সকল ভদ্র গৃহস্থেরই বাটীতে 'বার মাসে তের পার্বণ' ছিল। তাহা ছাড়া শান্তিস্বস্ত্যয়ন, ব্রতনিয়ম, দিনশ্রাদ্ধ, জন্মতিথি-পূজা—এ সকল ছিল, সুতরাং ছাত্রগণের এখন অপেক্ষা পাওনা অধিক ছিল।

দ্বিতীয় সুবিধা অন্য রূপের।—বাঁশবেড়ে হইতে মুর্শিদাবাদ খাগ্‌ড়া পর্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে কাঁসারির কারবার খুব চলিত। পিতল-কাঁসার তৈজস রাশি রাশি নির্মিত হইত। নির্মাণের জন্য কাঁসারিদের কাঠ-কয়লার প্রয়োজন হইত। গৃহস্থের বাড়ীতে কাঁসারির, কচিৎ স্বর্ণকারের লোকেরা কয়লা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত।

নবদ্বীপ, পূর্বস্থলী প্রভৃতি স্থানে বিস্তর কাঁসারি ছিল। একটা টোলে গেলে এক স্থানে ২০০।৩০০ চুল্লীর কয়লা পাওয়া যায়, কাজেই ছাত্রগণের কয়লা-বিক্রয়ের বড় সুবিধা ছিল। গরিব-দুঃখীর মেয়েরা ছাত্রদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিত যে, তাহারা ঘর নিকাইয়া, থালা মাজিয়া, কুট্‌না কুটিয়া, বাট্‌না বাটিয়া ও বাজার করিয়া দিবে, কেবল দুই বেলার কয়লাগুলি পাইবে। এইরূপ বন্দোবস্তে ছাত্রদিগের বড়ই সুবিধা ছিল। ছাত্রগণ প্রাতে সেই দুঃখিনীর হাতে দুইটি করিয়া পয়সা দিলেন, আর নিশ্চিন্ত। সে সেই সকল পয়সা লইয়া আট আনার কি দশ আনার বাজার আনিল। তৎপূর্বেই গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া, থালা-ঘটি মাজিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার পর বাট্‌না একত্র বাটিয়া, কুট্‌না একত্র কুটিয়া, এক একখানি পিতলের থালে বাট্‌না ও তরকারি, হয়ত কিছু মৎস্য সাজাইয়া প্রতি কুঠরীতে দিয়া চলিয়া গেল। প্রাতেই ছাত্রেরা তাহাকে বলিয়া দিতেন, 'আজি ত্রয়োদশী, বার্তাকু আনিও না', 'অদ্য হইতে মূলা আর চলিবে না।' পরিচারিকা পেটেল কুট্‌না, বাট্‌না, তরকারি দিয়া চলিয়া যাইত এবং ছাত্রদের ভোজনের পরই আসিয়া তাড়াতাড়ি কয়লায় জল দিত, কেন-না সেইগুলিই তাহার প্রধান সম্বল। কাঁসারিরা তাহার নিকট হইতেই কয়লা লইত। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মাতা টোলে এইরূপ পেটেল ছিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় চৌবাড়ীর সংলগ্ন আপনার মণ্ডপে প্রথমে অধিকতর কৃতবিদ্য ছাত্রগণকে পাঠ দিতেন। সেই ছাত্রেরা আবার তাঁহার সমক্ষে অন্য ছাত্রগণকে পাঠ দিত। কদাচিৎ তিনি কোন ঘরের দাওয়ার এক দিকের উচ্চ বেদীতে বসিয়া পাঠ দান করিতেন। বৈকালে বিদ্বান্ ছাত্রগণের মধ্যে শাস্ত্রের বিতণ্ডা বা বাদানুবাদ হইত।

গ্রামস্থ অধীত-শাস্ত্র ছাত্রগণ টোল ছাড়িয়াও ছাড়িতেন না; তাঁহারা প্রায়ই টোলে আসিতেন, অধ্যাপক যাহাদিগকে পাঠ দিতে বলিতেন, তাহাদিগকে পাঠ দিতেন এবং সেই টোলের নিমন্ত্রণ হইলে তাঁহারাও তাহার ফল ভোগ করিতেন।

এখন ঠিক এরূপ টোল দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ছাঁচ সেইরূপই আছে। তবে অনেক স্থলেই ছাত্রেরা এখন রাঁধা-ভাতের আব্দার করিয়া থাকেন। একটু-আধটু আব্দার হয় হউক, কিন্তু ছাত্রমাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বালক-কাল শিক্ষার সময়—বিলাসের সময় একেবারেই নয়। বালক-কালে কঠোরতা অভ্যাস করিলে পরে কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই মনে হয় না। লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সহিষ্ণুতা ও সংযম যত শিখিতে পারা যায়, ততই লাভ। এমন লাভ পারগপক্ষে তোমরা ছাড়িও না।

[এই প্রবন্ধটি একখানি খাতায় লিখিত ছিল; সম্ভবতঃ ১৩০৮ সালে লিখিত। ত্রিশ বৎসর পরে 'বঙ্গশ্রী'তে মুদ্রিত হয়। 'ভারতী'র লেখক ধর্মানন্দ মহাভারতী স্বয়ং কাইরো গিয়া অজ্‌হর দেখিয়া আসিয়া তাঁহার প্রবন্ধ লেখেন।]

পূজার গল্প

ও

কৌতুককৌমুদী

পূজার গল্প ও কৌতুককৌমুদী

পূজার গল্প

১

বিজয়কৃষ্ণের বয়স্ বাইশ বৎসর; বাড়ী বীরভূমির গোপালপুরে;—রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্। ছয় মাসের উর্দ্ধ হইল, এক সপ্তাহের মধ্যেই পিতামাতা উভয়েরই বিয়োগ হইয়াছে। শরতের শশধরের উপর পাতলা মেঘের আবরণের মত বিজয়ের মুখের উপর একখানি ছায়া আছে; ডান চক্ষুর ডান কোণ, বাম চক্ষুর বাম কোণ একটু যেন জলভরা জলভরা; নাসিকার দুই দিকে দুই চোখের দুই কোণে একটু যেন কালিভরা কালিভরা।

রথের পূর্বে বাড়ী আসিয়াছেন। মনে করিয়াছিলেন, পিতৃকৃত্যে বেশি খরচপত্র হইয়াছে, তাহাতে কালাশৌচ, এবার দুর্গোৎসব করিবেন না। সে কথা রহিল না। অনাহূত গ্রাম্য সমিতির সকলেই বলিল, 'মহামায়াকে আনিতেই হইবে। তবে সংকল্প রত্নমালার নামে করিলেই চলিবে।'

রত্নমালা বিজয়কৃষ্ণের ভগিনী, বাসর-বিধবা; বয়স্ বিংশতি বৎসর। বিজয়কৃষ্ণের বৃহৎ পরিবার; কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে, দাসদাসী-কৃষাণ-কুপোষ্যে দুই বেলায় পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশত পাতা পড়ে। রত্নমালা, মাতা দুর্গামণি জীবিত থাকিতেই এই বৃহৎ পরিবারের সহকর্ত্রী ছিলেন; এখন এককর্ত্রী। বেঁটেখেটে, কর্মিষ্ঠা, মুখরা, পবিত্রা।

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, 'রত্নমালা, এবার তোমার নামে সংকল্প হইবে।'

রত্নমালা। কিসের সংকল্প দাদা?

বিজয়। দুর্গোৎসবের সংকল্প। আমাদের যে কালাশৌচ।

রত্ন। দাদা, আমার ত সংকল্পও নাই, বিকল্পও নাই;—আমার যে মহা-অশৌচ। আমি যে-উচ্ছব নিয়ে আছি, তাই ভাল, আমার আবার দুর্গোৎসব কেন?

বিজয়। কেন, তোমার পূজা হইলে ক্ষতি কি?

রত্ন। ক্ষতি নাই?—মহা ক্ষতি। আমার ঠাকুর আমি বরণ করিব না, বরণডালা ছুঁইবো না,—অমন অর্ধেক পূজা আমি করি না। মহিষের উপর আমার মত ঠেঁটীপরা ঠাকুর আনিতে পার—আমার নামে সংকল্প হইবে।

বিজয়। তোমার সকল কথা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না, বোন।

রত্ন। তবে তুমি কি লেখাপড়া শিখিলে, দাদা? আবার এখন ধর্ম-কথা কও। আপনার মায়ের পেটের বহিনের মর্ম-কথাই বুঝিলে না, তবে আবার কি রকম ধর্ম-কথা কও?

বিজয়। আমি অত ভাবি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমার নামে সংকল্প হইবে, তোমার আহ্লাদ হইবে।

রত্ন। তা, তোমার আর মুখ ফিরাইয়া কাজ কি। তুমি যা মনে করিয়াছ, তাহাই হইবে। আমার এখনই আহ্লাদ হইতেছে। আমার নামেই সংকল্প হইবে; তবে রামজীবনপুরের আশ্বিনের কিস্তির টাকাটা আমায় রাখিতে হইবে; আমি অষ্টমীর ভোগে দিব।

বিজয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'তাহাই হইবে।'

রামজীবনপুর রত্নমালার স্বামিত্যক্ত সম্পত্তি। তিন মাস অন্তর ইজারদার নব্বই টাকা করিয়া আনিয়া রত্নমালাকে দিত। রত্নমালা রসীদ দিয়া টাকাগুলি গণিয়া সিন্দুকে তুলিতেন। ইজারদারকে আহারাদি করাইয়া তাহারই হস্তে প্রতিবার আশি-পঁচাশি টাকা আপন শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিতেন। বলিয়া দিতেন, বড় গিন্নীর এই, মেজ গিন্নীর এই, আমার দেখনহাসির এই, (রত্নমালা

নিজে সেজবৌ, আর ছোটবৌ তাঁহার দেখনহাসি), আমার গাঁটছড়ার এই ; আর এই চারি টাকা—এইখান হইতেই সন্দেশ লইয়া যাইবে। গোপালপুরের আধাছানার সন্দেশ সে অঞ্চলে বড় প্রসিদ্ধ।

সদ্যোবিধবা রত্নমালা বিবাহের পরদিন শ্বশুরালয়ে ক্রন্দনের রোলের মধ্যে নীতা হইয়া বিধবা ননদের অঞ্চলের সহিত আপনার অঞ্চলের গ্রন্থি দিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই তোমায় আমায় গাঁটছড়ার বন্ধন হইল।' সেই অবধি তিনি তাঁহাকে 'আমার গাঁটছড়া'—বলেন।

২

আজি মহাষ্টমী। গোপালপুরের বাঁড়ুয্যেদের পূজার মত পূজা। সপ্তমীর ভোজের ভাঁড়ে ও শালপাতে দীঘির পাড় পর্বতাকার হইয়াছে। কাকগুলো এঁটোপাতের ভাত খাইতেছে কি ছড়াইতেছে, তাহা বুঝা যায় না। কুকুরগুলা কলহ কোলাহল করিতে করিতে কাকেদের উপর গিয়া পড়িতেছে ; তাহার দুই চারিটা লাফাইয়া লাফাইয়া সরিয়া যাইতেছে। দুই চারিটা-বা একখানা পাখা তুলিয়া, একটু উঁচু হইয়া, একটু উড়িয়া বসিতেছে।

রত্নমালা অতি প্রত্যূষে স্নানাহ্নিক করিয়াছেন। পরিধানে ডুবরাজপুরের মট্‌কা,—ঘাড়ে বেড়দিয়া কোমরে গোঁজা ; লম্বিত কেশের নীচে একটি গ্রন্থি আছে। কতকগুলি কেশ কাণের উপর ফুলোফুলো, কাণ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রত্নমালা আজি সর্বত্র। যেখানে নৈবেদ্য হইতেছে, সেখানে প্রতি নৈবেদ্যের খুরী মিলাইয়া দেখিতেছেন। গঙ্গাজলের ভার আসিল নিজেই নামাইয়া লইলেন ; ঠাকুরঘরে রাখিয়া আসিলেন। গোয়ালবাড়ীর ছাই-গাদার পার্শ্বে মাছ কোটা হইতেছে। তিনি অলকীকে বলিলেন, 'ঐ ঝুড়িটা তোল ;' তাহার ভিতর হইতে একরাশি কোটামাছ বাহির হইল। গুলকীকে বলিলেন, 'ঐ ছাইগাদায় কি ?' গুলকী ছাইগুলা সরাইল। দুইটা রুয়ের মুড়া বাহির হইল। রত্নমালা যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, 'তোরা ত তেরজনেই চোর হইলি।'

ওদিকে অষ্টকুমারীর সাজসজ্জা হইতেছে। আটজন সধবা নাপিতানী আটজন কুমারীকে আল্‌তা পরাইয়া দিয়াছে। এখন আটজন সধবা কুটুম্বিনী তাহাদিগের কেশ-বিন্যাস করিয়া দিল। গন্ধতৈলের গন্ধে সে স্থল আমোদিত। রত্নমালা সেইখানে যাইবামাত্র, তাহারা ঢুপ্‌ঢাপ্ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রত্নমালা এদিকে বড় মুখরা, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও আশীর্বাদ করিতে পারিতেন না।

৩

পূর্ব হইতেই সকলে শুনিয়াছিল যে, রত্নমালা অষ্টকুমারী-পূজা করিবেন না। তিনি নাকি তাঁহার গাঁটছড়ার কাছে বলিয়াছিলেন, 'এ জন্মে এই জন্ম-কুমারী, আমি আবার কুমারী পূজা করিব ?'

যাহাই হউক কথাটা বিজয়কৃষ্ণের কাণে গিয়াছিল। যখন রন্ধনশালার দাওয়ায় রত্নমালা ভোগ-পরিচর্যায় নিযুক্ত তখন তাঁহার দেখা পাইয়া বিজয় বলিলেন, 'রত্নমালা, তুমি নাকি অষ্টকুমারীর পূজা করিবে না ?'

রত্ন। দাদা, আমারই কে পূজা করে, তাহারই স্থির নাই, আমি আবার আটটা ছুঁড়ীর পা-পূজা করিতে যাইব ?

বিজয়। আমাদের পুরুষ-পুরুষের প্রথা আজি তুমি মানিবে না ?

রত্ন। তোমাদের প্রথা তোমরা মানিও। এবার ত তোমার গোপালপুরের বাঁড়ুয্যেদের পূজা নয়। আমাদের হরিপুরের পূজা, আমরা গঙ্গাজলই বুঝি।

হরিপুরে রত্নমালার শ্বশুরগোষ্ঠীর মধ্যে যে-বাড়ীতে পূজা হইত, তাহারা বড় কৃপণ ; সে পূজা সত্য সত্যই গঙ্গাজল-বিল্বদলের বটে।

বিজয়কৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিলেন, 'তা সে কথা এখন থাকুক, তোমার পূজা যে অঙ্গহীন হইবে, তাহার কি ?'

রত্ন। তা হয় হবে, আমারই হবে ; অধর্ম হয়, আমারই হবে। ছুঁড়ীকয়টা বাড়ীতে আসিয়াই আমার পায়ে হাত দিয়া একবার প্রণাম করিয়াছে, আল্‌তা পরিয়া একবার করিয়াছে, চুল বাঁধিবার পর, এইমাত্র প্রণাম করিল। আমি ওগুলাকে পূজা করিতে, প্রণাম করিতে পারিব না।

বিজয় অর্ধস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, ‘এতদূর হইতে মেয়েগুলিকে আনানো গেল, এখন কি করা যায়?’

প্রৌঢ়া ঠাকুরানীদিদি পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন; বলিলেন, ‘তা রত্ন মন্দ কি বলিতেছে? সমানে সমানে নমস্কার হয় ত পাল্‌টাপাল্‌টি চলে; পায়ে ধরিয়া প্রণাম করার পাল্‌টাপাল্‌টি চলে না ভাই।’

বিজয় রত্নমালার দিকে পিছন করিয়া, অল্প মৃদুস্বরে উত্তরচ্ছলে বলিলেন, ‘তা ঠান্‌দিদি, তোমরা যার পা পূজা কর, তাকেই আবার পায়ে ধরাও; মনে করিলে, তোমরা সকলই পার।’ ঠাকুরানীদিদি একটু হাসিলেন মাত্র। বড় স্ত্রৈণ বলিয়া ঠাকুরদাদার সুখ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল।

রত্ন। তা ঠান্‌দিদির হয়ে আমিই বলি, তোমরাও একজনের পা পূজা করিয়া, আবার তাকেই পায়ে ধরাও। ওটা কেবল আমাদের একচেটে নয়।

বিজয়। তোমাকে ঠান্‌দিদির হয়ে উত্তর করিতে কে সাধিল?—কৈ ঠান্‌দিদি, আমরা কখন পূজনীয়ার পূজা লই কি?

রত্ন। লও বই কি! এই দুই বৎসর না যাইতে তুমিই লইবে।

বিজয়। তাকি কখন হয়?

রত্ন। নিতেই হবে। ঠান্‌দিদি তুমি সাক্ষী রহিলে।

ঠাকুরানীদিদি বলিলেন, ‘এমন ভাইবোন কি কেউ কোথাও দেখিয়াছে? পিটেপিটে কিনা, এখনও সেই ছেলে বেলার মত তেমনই ঝগড়া।’

৪

পূর্বতন প্রথা-অনুসারে গোপালপুরের বাঁড়ুয্যেবাড়ী অষ্টমীতে অষ্টকুমারীর পূজা হয়। প্রত্যেককে মটরাচেলী, সোঁসাজ সিন্দুর-চুপড়ি ও সোণার কঙ্কণ দিতে হয়।

সে বার কুমারীর পূজা হইল না, তবে যথারীতি অলঙ্কার-বস্ত্রাদি দেওয়া হইল।

ছয়টি কুমারী গ্রামেরই; দুইটিকে দূরবর্তী ভিন্ন গ্রাম হইতে অনেক যত্ন করিয়া রত্নমালা আনাইয়াছিলেন। গ্রামের কুমারীগুলি বস্ত্রাদি লইয়া আহার করিয়া আপন আপন বাড়ীতে চলিয়া গেল; অপর দুইটি পূজার কয়দিনের জন্য রহিল।

একটির বয়স্ দশ, একটির একাদশ। ছোটটির সিঁথে-সাজন্ত চুল, কপালে জোড়াভুরু; কিন্তু চক্ষু চঞ্চল, দাঁতগুলি ছোট ছোট, ঠোঁট পাতলা পাতলা—কিন্তু কথায় খুব ঠক্‌ঠকে। কল্‌কল হাসে, খর্‌খর হাঁটে; হাত নাড়িয়া কথা কয়, আর চারিদিকে চাহিতে থাকে। তাহার নাম বিজলী।

বড়োর ঘাড়টি একটু বাঁকানো, একটু নোয়ানো। চোখ দুটি ভাসা ভাসা, দৃষ্টি স্থির; গতি ধীর; অল্প পুরু পুরু ঠোঁটে পাতলা পাতলা হাসি মাখানো; কিন্তু ঐ পর্যন্ত;—সে হাসি উঠেও না, গড়ায়ও না,—ঐ মাখানই থাকে। নাম কোমলা।

বিজলী-কোমলা আর পাঁচজন কুটুম্ব কন্যার সঙ্গে বড় ঘরে পানের সজ্জায় রহিল।

ধুনা পোড়ানর বাজনা উঠিল। কুণ্ডলীকৃত মার্জনী-মস্তকে-আসীনা সধবা-বিধবায় পূজার উঠান পরিপূর্ণ হইল। জুম্বো জুম্বো, কালো কালো ব্রাহ্মণ-যুবকেরা সারির মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল; নারীগণের হস্তে মৃত্তিকার তাল দিতেছে; হাতে মাথায় মাল্‌সী বসাইতেছে; জ্বলন্ত কুলের কাষ্ঠ দিতেছে, ধুনা দিতেছে। দশ বিশটা মাল্‌সী একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের চণ্ডীমূর্তিও যেন একরূপ জ্বলন্ত হাসি হাসিতে লাগিলেন। সকলেই ধুনা পোড়াইল। রত্নমালা সে দিকেই আসিলেন না। তখন অন্দর বাড়ীতে কেহ নাই বলিলেই চলে, কেবল রত্নমালা বিজলীকে আর কোমলাকে বাহিরে যাইতে দেন নাই। বিজলী বলিল, ‘কেন দিদি, এখন বাহিরে যাইব না?’ রত্নমালা বলিলেন, ‘এখন ওখানে গেলে পুড়িয়া যাইবি যে ছুঁড়ী!’ উত্তর—‘তোমাদের বাড়ী এমন।’ কোমলা শুধুই হাসিল।

ব্রাহ্মণ-ভোজন শেষ হয়-হয়, এমন সময় বিজয় রত্নমালার কাছে দক্ষিণা ও পান লইতে আসিলেন। রত্ন অঞ্চল হইতে দক্ষিণার টাকা দিলেন, আর বলিলেন, ‘চল, ঐ বড় ঘরের পিঁড়িতে চল।’ সেইখানে আসিয়া বলিলেন, ‘দে লো

দাদাকে পান বাহির করিয়া দে।' বিজলী তাড়াতাড়ি কতকগুলো পান আনিয়া 'এই নাও' বলিয়া বিজয়ের হস্তে দিতে লাগিল। বিজয় বলিলেন, 'এই মেয়েটি বেশ চটপটে।' কোমলা থালে করিয়া কতকগুলি পান আনিয়া বিজয়ের সম্মুখে ধীরে রাখিয়া দিল। বিজয় কোমলার দিকে একবার দেখিয়া আবার বিজলীর দিকে চাহিলেন। বিজলী বলিল, 'আরও পান দিব ?' বিজয় 'এখন আর না' বলিয়া চলিয়া গেলেন। রত্নমালা বলিল, 'বুঝেছি, ইহার পর চাই যেটুকু বুঝিতে বাকি রহিল আর বৎসর বুঝিব।'

৫

সেই আর বৎসর আসিল। বিজয়কৃষ্ণের সংকল্পের প্রথম পূজা। তেমনই মহাষ্টমীর সুপ্রভাত; তেমনই করিয়া মুলালসিং দেউড়ির খাটিয়ায় সংএর শিবের মত কাত হইয়া ঝিমাইতেছে। তেমনই করিয়া সোণাসিং, রূপসিং রোয়াকে পাচারি করিতেছে। তেমনই করিয়া রত্নমালা সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। কথাই ছিল, কুমারীরা আর বৎসর বিনা অর্চনায় গিয়াছিল, এবার তাহারাই আসিবে। গ্রামের—ভিন্ন গ্রামের সকলেই আসিয়াছে। বিজলী ও কোমলা তেমনই বড় ঘরে পানের সজ্জায় আছে। বিজলীর দশে একাদশ উত্তীর্ণ হইয়াছে; বিশেষ বিভেদ লক্ষিত হইতেছে না। সেই ঢলঢল লোচন, কলকল হাস, থরথর গতি, আর ঠক্‌ঠকে কথাবার্তা। কিন্তু কোমলার এই এক বৎসরে বড়ই বিভেদ হইয়াছে। সমস্ত শরীরের উপর তারুণ্যের একটি লাবণ্যময়ী ছায়া পড়িয়াছে। ঘোলাটে ঘোলাটে জ্যোৎস্নায়, সন্ধ্যার সময় ভূরি-কুসুমিতা যূথিকা-লতা যেমন দেখায়, তেমনই দেখাইতেছে।

অষ্টকুমারীর অর্চনা হইতে লাগিল। কুমারীগুলি একদিকে সারি দিয়া আপন আপন আসনে বসিল। সম্মুখে সুপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ। পরিধান রক্তপট্টবস্ত্র। রক্তপট্টবস্ত্রের উত্তরী যোগ-পাটার মত করিয়া বুকে বাঁধা। বিজয়কৃষ্ণ একবার কুমারীগুলিকে দেখিতে লাগিলেন। ছোট একটি ছয় বৎসরের মেয়ে,—সেও এমন সময় আপনার গুরুত্ব বুঝিয়াছে,—গম্ভীর মুখে স্থিরদৃষ্টিতে বসিয়া আছে। আর একটি তাহার চেয়ে একটু বড়; তাহার ঝাঁপ্‌টা দুটিতে একটু ডাগর ডাগর ফাঁস দেওয়া। সে নত হইয়া বসিয়া আছে,—সেই ফাঁসগুলি দুলদুল দুলিতেছে। সেও গম্ভীর। তাহার অপেক্ষা একটি বড় মেয়ের কাণদুটি করবীর পুষ্পের মত, তাহাতে সবুজ দুল। সে টিপিটিপি হাসিতেছে। বিজলী গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু চক্ষু একবার পুরোহিতের দিকে, একবার প্রতিমার দিকে, একবার সম্মুখস্থ সিঁদুর চুপড়ির দিকে; বিজয়ের চক্ষুর দিকে চক্ষু পড়িতেই হাসিয়া ফেলিল। ঘাড় ফিরাইয়া কোমলাকে অস্ফুটস্বরে বলিল, 'হাতীতে কলাগাছ খাইতে ভালবাসে, তাই গণেশ কলাবৌকে বিবাহ করিয়াছে; নয় ভাই ?' কোমলা ভ্রূকুটি করিয়া অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল, 'মেয়েদের খাবার জন্য পুরুষেরা বিবাহ করে বুঝি ?' বিজলী বলিল, 'তা নয় ত কি জন্য করে ?'

বিজয়কৃষ্ণ ততক্ষণ দশভুজার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; তাহার পর বিজলীর মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন। বিজলী সে দৃষ্টি সহিল না—মুখ ফিরাইয়া পুনরুক্তি করিয়া কোমলাকে মৃদুস্বরে বলিল, 'খাবার জন্যই ত বিবাহ করে।'

বিজয় একে একে কুমারীগুলির পাদপূজা করিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। পরে একে একে ছয়টি বালিকার দক্ষিণ হস্তে কঙ্কণ পরাইয়া দিলেন। বিজলী বাম হস্ত বাড়াইয়া দিল; বিজয় কঙ্কণ-গাছটি সেই হস্তেই পরাইলেন। সকলে বলিল, 'ও কি হইল! বাম হাতে পরাইলে কেন ?' বিজয় তখন কঙ্কণ খুলিতে গেলেন। তাহারাই আবার নিষেধ করিল,—বলিল, 'পরাইয়াছ আর খুলিও না।' কেহ কেহ বলিল, 'তা এক হাতে হ'লেই হ'ল।' মুরুব্বিরা বলিল, 'তাও কি কখন হয় ? ওঁদের কৌলিক প্রথা রাখিবেন না ?' বিজয় যেন কত কুকর্মই করিয়াছেন! একটু হতভম্ব হইয়া আর যে একগাছি কঙ্কণ ছিল তাহাই বিজলীর দক্ষিণ হস্তে পরাইয়া দিলেন। বিজলী মনে মনে বলিল, 'বেশত—আমার দুহাতে দুগাছি হইল।'

কিন্তু কোমলার হাতে কি দেওয়া হইবে ? ভিতর-চণ্ডীমণ্ডপে রত্নমালা ছিলেন। বিজয় তাঁহার দিকে দৃষ্টি

করিয়া বলিলেন, 'যদি থাকে ত সিন্দুক হইতে একগাছি কঙ্কণ লইয়া এস।' রত্নমালা চকিতের মধ্যে একগাছি বড় কঙ্কণ আনিয়া বিজয়ের হাতে দিয়া বলিল, 'এই লও; এ মায়ের কঙ্কণ—বৌ এলে পরিবার কথা।' বিজয় বলিলেন, 'মা কিছু বলিয়াছিলেন কি?' রত্ন বলিলেন, 'না, তিনি আর বলিলেন কৈ? বাবার তেমন হওয়ার পর যে ছয় দিন বিছানায় ছিলেন, কোন কথাই ত কন নাই।' বলিতে বলিতে রত্নমালা চক্ষে অঞ্চল দিলেন। বিজয়ও বাষ্পাকুল-লোচনে কঙ্কণগাছটি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, 'হউক মায়ের কঙ্কণ, আর কাহারও পরিয়া কাজ নাই, মাই পরুক।' বলিয়া কোমলার দক্ষিণ হস্তে সেই বৃহৎ কঙ্কণ পরাইয়া দিলেন; দিয়া একবার মহাশক্তির মুখের পানে চাহিলেন। বিজলী অমনই কোমলার কাণে কাণে বলিল, 'তোর ত বেশ ছেলে! যেন দুর্গার ছেলের মত, নয়?' কোমলা বলিল, 'তা বেশই ত।' বিজয় কুমারীপূজা শেষ করিয়া সর্বশেষে কোমলার পদতলের কাছে প্রণাম করিলেন।

রত্নমালা বাড়ীতে আসিয়া ঠাকুরানীদিদিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'যেটুকু বাকি ছিল, বুঝিয়াছি। এখন দিদি তোমার আমার হাতযশ।'

৬

পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন কুটুম্ব-কন্যারা একে একে বিদায় লইতে লাগিল। রত্নমালা খিড়কী-পথের উপর কাহাকেও গোরুর গাড়ীতে, কাহাকেও পাল্‌কীতে হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিতে লাগিলেন। গাড়ীর মধ্যে পাল্‌কীর ভিতরে হাঁড়ী ভরিয়া সন্দেশ দিলেন। গাড়োয়ান-বেহারা-দের ভাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলপান লাড্ডু দিলেন। বিজয় একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। বিজলী তাঁহার দিকে গিয়া বলিল, 'আমরা চলিলাম।' বিজয় বলিলেন, 'এস।' কোমলাও বিজলীর সঙ্গে গিয়াছিল, কিছুই বলিতে পারিল না; কেবল নখে নখ খুঁটিয়া চলিয়া আসিল। বিজয় রত্নমালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাকে খাবার দিয়াছ?' রত্নমালা বলিল, 'দিয়াছি, সকলকেই দিয়াছি,—মাকে দিয়াছি, মার বৌকেও দিয়াছি।' বিজয় বলিলেন, 'মায়ের আবার বৌ কোথা হ'তে হইল?' রত্নমালা বলিলেন,—'না বিয়িয়ে কানায়ের মা হইতে পারিল—আর বিজলীর ঠাকুরন হ'তে পারিবে না? কাল যে, ওরা দুজনে 'বৌঠাকুরন' পাতাইয়াছে।—আমার দুখানা নূতন কস্তাপেড়ে শাড়ী গেছে, আর পাঁচসিকা গেছে; তোমায় কিন্তু দিতে হবে দাদা।'

বিজলী মাসীর সঙ্গে পাল্‌কীতে উঠিয়াছিল; বলিল, 'তা তোমাদের কাপড় তোমরা লও। এই আমার খানি লও; ঠাকুরন, তোর খানি দেত লা।—আর পাঁচসিকা সন্দেশের দিয়েছিলে, তা সন্দেশ ত নাই, এই হাঁড়ীর সন্দেশ লও।' রত্নমালা বলিলেন, 'আমি আমার দাদার কাছে দাম চাহিতেছি, তা তোমার এর মধ্যে এত মাথাব্যথা পড়িল কেন? এত ব্যথার ব্যথী এতদিন কোথায় ছিলি?' বিজলী বলিল, 'ব্যথার জন্য নয়,—আমাদের জন্য ত এত খোঁটা! তা তোমাদের কাপড় লওনা কেন?' রত্নমালা বলিলেন, 'ফাল্গুন মাসে এসো দিদি,—সব কাপড় চোপড় বুঝিয়া লইব।'

বিজলী। ফাল্গুন মাসে কি গা?

রত্নমালা দাদার বিয়ে।

বিজলী। কোথায় বিয়া হইবে?

রত্নমালা তোমাদেরই গ্রামে।

পাল্‌কী চলিয়াছে। বিজলী মাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মাসী, কোথায় বিবাহ হবে গা?' মাসী বলিল 'আমাদের গ্রামে ওঁদের ঘর আর কৈ? তোমার বাপেরাইত এঁদের পাল্‌টি ঘর। বিয়ে হয় ত, তোমার সঙ্গেই হইবে!' তখন বিজয়-কর্তৃক বাম হাতে কঙ্কণ পরানো হঠাৎ বিজলীর মনে পড়িল। সেই কঙ্কণের দিকে দেখিল; মনে হইল, এখনই বুঝি বিজয় কঙ্কণ পরাইল। পার্শ্বে প্রতিমা আছে মনে করিয়া, সেই দিকে মুখ ফিরাইল। দেখিল, দূরে দীঘির পাড়ে কলা-বাগানে হাতীতে কলাগাছ ভাঙ্গিতেছে। ইচ্ছা হইল, মাসীকে জিজ্ঞাসা করে যে, পুরুষে কি খাবার জন্য বিবাহ করে? মুখ ফুটিফুটি করিয়া ফুটিল না। বুক হইতে মাথার দিকে কেমন একরূপ ঝাঁঝের মত ছুটিতে লাগিল। হাতী একটা আস্ত কলাগাছ শুঁড়ে জড়াইয়া লইয়া সেই

দিকেই আসিতেছে। বিজলী একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল। হুম্মা হুম্মা করিতে করিতে পাল্‌কী দৌড়িতে লাগিল।

৭

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। মনোরম প্রভাত। ঝিরি ঝিরি বায়ু বহিতেছে। ধীরি ধীরি গাছের নীচের পাতাগুলি দুলিতেছে। বিজয়কৃষ্ণের বাটীর সম্মুখস্থ বকুল গাছে দুইটা দৈয়াল অতি প্রত্যূষ হইতে তিন ঘণ্টা সমানে আখ্‌ড়াই তান করতপ করিতেছে। তোমরা জানো, কাহার জন্য তাহারা এই গান করে? আর কে তাহাদের এই আখ্‌ড়া ঘরে তালিম দেয়?

বিজয়ের বহির্বাটীতে বৈঠকখানায় কেবল গোমস্তা আর একজন খানসামা অগাধ নিদ্রাভিভূত; ছেলেবুড়া আর কেহ নাই। দেউড়িতে চারিজন দরওয়ান শুইয়া আছে। বাহিরের বাড়ী যেন পালানো বাড়ী। গাড়ুগুলা স্থানভ্রষ্ট, গামছাগুলা সিঁড়ির উপর; আর চূণেহলুদে সমস্তই বিকৃত। কাল সন্ধ্যার পূর্বে বিজয়কৃষ্ণ দলবলে বিবাহ করিতে গিয়াছেন।

ঠাকুরানীদিদি অর্ধশয়না; তাঁহার পার্শ্বে মেঝেতে বসিয়া রত্নমালা চুল কুলাইতেছেন। গোছাগোছা চুল খুলিয়া আসিতেছে, তাহাই বাম হাতে জড় করিতেছেন। সহসা রত্নমালা বলিলেন, 'তা যাই হোক দিদি, আজি বেহারারা বাড়ীর মধ্যে পাল্‌কী লইয়া আসিলে, তুমি আমাকে ধরিয়া রাখিও—আমি সকলের সাক্ষাতে নাচিয়া না ফেলি।'

ঠাকুরানী। তা আহ্লাদের দিনে নাচিলেই বা।

রত্ন। ছি! লজ্জা করে যে।

ঠাকুরানী। লজ্জা করিলে আর নাচিতে পারিবে কেন?

রত্ন। যদি আহ্লাদে লজ্জা করিতে ভুলিয়া যাই।

ঠাকুরানী। নাচিবে।

রত্ন। তা হবে না, দিদি—তুমি আমার কোমর ধরিও।

ঠাকুরানী। তার জন্য আর ভাবনা কেন?

রত্ন। ঠাকুরানীদিদি, মা মরে অবধি আমার আর কিছুতেই সোয়াস্তি নাই। কিসে দাদার মনের মত বৌ আনিয়া ঘরে তুলিব, আমার অষ্টপ্রহর সেই ভাবনাই ছিল। এ দুবৎসর আমার আর ধর্মকর্ম কিছুই নাই। একে নিকটে দাদাদের ঘর জুটে না, তারপর, কি পছন্দ কি অপছন্দ তা'ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারি না যে, একটু খরখর আনিব, না মাটোমাটো আনিব। এইজন্য দুই রকমই জুটাইয়াছিলাম।

ঠাকুরানীদিদি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন, 'তোমাকে যখন অত ভালবাসে, তখন খর নহিলে ওর মন উঠিবে কেন বোন?'

রত্ন হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, 'সে তামাসা এখন থাক। আমি মায়ের পেটের বোন—আমায় ত ভাল বাসিবেই। আমার সঙ্গে যেমন নিত্য বিবাদ, পরের মেয়ে ঘরে এনে তেমনই নিত্য কলহ—দাদার ভাল লাগিবে কি?'

ঠাকুরানীদিদি এবার গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মস্তকের উপর দেওয়ালে কাত্যায়নীর চিত্র ছিল। সেই দিকে হস্ত তুলিয়া বলিলেন, 'জগদম্বা করুন, আমি এই প্রাতর্বাক্যে বলিতেছি, তোমাদের ভাইবোনে যেমন বিবাদ তেমনই বিবাদ বিজয়-বিজলীতে যেন চিরদিনই থাকে।'

তখন দুই জনেই সজল চক্ষে স্নানার্থ গমন করিলেন। যাইবার সময় উত্তরদ্বারী ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া রত্নমালা বলিলেন, 'ওলো কোমলামাসী! ওঠ না। তুমি বৌ-বেটাকে বরণ করিবে, তোমার আর ঘুমানো কেন?' কোমলা হাসিমাখানো মুখে বাহিরে আসিল। কোমলার ললাটের সিন্দুরবিন্দু বসন্তের শাল্মলীর মত রগ্‌রগ করিতেছে। কোমলার বিবাহ হইয়াছে। ছয়মাস পূর্বে যাহা লাবণ্যের ছায়া দেখিয়াছিলাম, এখন সেই লাবণ্যই এক ফোঁটা সিন্দূরের গুণে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে।

৮

একটু বেলা হইলেই মহা কোলাহল হইতে লাগিল। চূর্ণ-হরিদ্রাক্ত বস্ত্রে বরযাত্র সকলে দলে দলে আসিয়া অঙ্গন

পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। এখানেও কে কোথা হইতে গামলা গামলা চুণেহলুদ আনিয়া উপস্থিত। মোটা-মোটা-বালা-হাতে বড়-বড়-লাঠি-কাঁধে সর্দার সকল আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা, 'খাইয়েছে খুব, মশা বড়।' তাহার পর চারি দল রোসন-চৌকির বাদ্যধ্বনির সঙ্গে পঞ্চাশ জন বেহারার বিকট আওয়াজ।—তাই শুনা যাইতেছে, আর কিছুই শুনা যায় না। দুইজন ঝি-শুদ্ধ, আটজন বেহারার কাঁধে একখানা পাল্‌কী ভিতর বাড়ীতে উপস্থিত। জল ঢালিয়া পিছল করিয়াছে; চুণেহলুদে উঠান লাল করিয়াছে; তাহার উপর লাল কাপড় পাতিল। সেই কাপড়ের উপর পয়সা ছড়াইল, সিকি ছড়াইল,—টাকা ছড়াইল, তবে বেহারারা পাল্‌কী নামাইল। কোমলা কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে প্রণাম করাইতে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে প্রণাম করিয়া আসিয়া কন্যা বরকে প্রণাম করিবেন, এই প্রথা। বিজয় বড ঘরের রোয়াকে পশ্চিমাস্যে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুরানীদিদি কন্যাকে হাঁটাইয়া সঙ্গে করিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইলেন, গাঁটছড়ার একদিক্ কন্যার গলায় বেড দিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। অপর দিক্‌টি বিজয়কে ধরিতে বলিলেন। কন্যা ধীরে ধীরে বিজয়ের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। রত্নমালা বলিল, 'কেমন দাদা, তোমরা যাহাকে প্রণাম কর, তাহার প্রণাম লও ত?' বিজয় ঘাড় নত করিয়া বলিলেন, 'তোমার মনে এতটা ছিল, বুঝিতে পারি নাই।' ঠাকুরানীদিদি বলিলেন 'আর আমার মনে কতটা আছে, তা জান কি? ইহার পাল্‌টা পায়ে ধরা যে দিন হইবে, সেইদিন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে!' সাক্ষী রমণীবৃন্দ ঝঙ্কারে হুলু দিয়া উঠিল। বাহিরে সানাই বাজিল—

'হাসি পায় হে,—ধরাদিন—পড়্‌লে মনে।'

নবজীবন ৩য় ভাগ ১২৯৩

চন্দ্রালোকে

এই তৃণ-শষ্প-শোভিত হরিৎক্ষেত্রে, এই কলবাহিনী ভাগীরথী-তীরে এই স্ফুটচন্দ্রালোকে আজি দপ্তরের শ্রীবৃদ্ধি, কলেবরবৃদ্ধি করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না ট্রৈলস শর্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ করিয়া উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেন! এইরূপ চন্দ্রালোকেই না থিসবী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শিশির-পাত-সিক্ত শষ্প মৃদু পদে দলিত করিয়া পিরামসের সঙ্কেত-স্থানাভিমুখে অভিসারিণী হইতেন! অভিসারিণী শব্দটিতে অভি একটি উপসর্গ আছে, সৃ একটি ধাতু আছে এবং স্ত্রীত্ববাচক একটি 'ইনী'-আছে; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ধাতু ছাড়িল গঠিল দেখিলেন, কত ইনীও এলেন গেলেন, কিন্তু সোপসর্গ ধাতু-বিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলেন না। কমলাকান্ত-উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না। কমলাভিসারিণী এরূপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দধিদুগ্ধ-বিক্রয়ার্থ আগমন করে তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতে 'পসারিণী' বলিয়াছে—কখন অভিসারিণী বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম।

চন্দ্র তুমি হাস্য করিতেছ? হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ? তোমার সাতাইশ ইনী-শুদ্ধ আমাকে দেখিয়া চন্দ্রের প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছে? দক্ষরাজার যেমন কর্ম—একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্মা বিবাহের জন্য লালায়িত! অমল-ধবল-কিরণরাশি সুধাংশো! আর সকল তোমার থাক, তুমি অন্তত অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দাও, আমি ওই দুইটিকে বড় ভালাবাসি। আমার মত নিষ্কর্মা লোক উহাদের কল্যাণে অন্তত দুই দিন গৃহবাস-সুখ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভগিনীদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকালজন্য স্থান দান করিয়া সুখে কাল-কর্তন করিব। ইহাদিগের আরও অনেক গুণ আছে—লোকে নিজে অক্ষমতা-নিবন্ধন কোন কর্ম করিতে না পারিয়া স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের দোহাই দিয়া লোকের কাছে আস্ফালন করিতে পারে। আমিও নশীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্বুদ্ধিতা-বশত প্রতারিত হইয়া আসি, তবে আমার সহধর্মিণীদ্বয়ের স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারি।

চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না?

এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত বক্ষোবসন করস্পর্শে প্রতিভাসিত করিতেছে! এখনও মন্দসমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলকে ঝলক বর্ষণ করিবে? এখনও তৃণক্ষেত্রে মণি-মুক্তা-মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মুক্তা আর কেহ ছড়াক না ছড়াক, দেখিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক। আর আজ আমি ছড়াইব।

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাঁহার নির্-দুর্-বি-অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার চক্ষের উপরি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি. এ. না হ'লে বিয়ে হয় না। এইবার সংসার ডুবিল! উচ্চশিক্ষার ফল কি? ছাপর খাট, রূপার কলসী, গরদের কাচা, এবং স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা, পট্টবসনাবৃতা একটি বংশ-খণ্ডিকা! হরি হরি বল ভাই। তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী বি. এ. উপাধিধারী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নববঙ্গবাসীর কলসী-বস্ত্র-বংশ-খট্টাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল!!!* প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতি ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে। তিনি সহস্র তোলক পরিমিত রজতপাত্র, শত তোলক পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটীরের একমাত্র দণ্ডিকা একটি বংশ-খণ্ডিকা পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত হেমকূট পর্বত নিকটস্থ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন; হরি হরি বল ভাই! তাঁহার এত দিনে সমাধি হইল!!! তিনি উচ্চশিক্ষা-লাভার্থ বহু যত্নে কামস্কাট্‌কা দেশের নদীসকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি নিশীথ-প্রদীপে অনন্যমনে শাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্যই শার্লিমানের ঊর্ধ্ব বায়ান্ন পুরুষ, নিম্নে সাড়ে তিপ্পান্ন পুরুষের কুলচি মুখস্থ করিয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ; ইংরাজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল এবং বংশ-দণ্ডিকার স্থাপন করিয়া উমেদার-গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীবধর্মের চরিতার্থতা হইল।

এরূপ বংশ-দণ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নহি। আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয় তাহাও কর্তব্য তথাপি এরূপ বংশ-দণ্ডিকা-আশ্রয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে। যদি জীব-প্রবাহ বৃদ্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মৎস্যাদি বিবাহ করিব; যদি টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাঁকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যদি সৌন্দর্যার্থে বিবাহ করিতে হয় তবে ঘোম্‌টা-টানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব।

ভাগীরথি! যদি তুমি শান্তনু-বক্ষে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়-ভবনে অথবা আরও উচ্চতর ধূর্জটীর জটা-কলাপে বিরাজ করিতে তাহা হইলে কে আজ তোমার উপাসনা করিত? তুমি নীচগা হইয়া মর্ত্যে অবতরণ করিয়া সহস্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে বলিয়াই সগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে। সমীরণ! তুমি যদি অঞ্জনার অঞ্চল লইয়া চিরক্রীড়াসক্ত থাকিতে অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদ-ভবনে চন্দন-শাখা নমিত করিয়া বা এলালতা কম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে তাহা হইলে আর কে তোমাকে ত্বমেব জগজ্জীবনং পালনম্ বলিয়া তোমার স্তব-স্তুতি করিত? এই বাল-বসন্ত-বিহারী বিহঙ্গমকুলের কাকলি যদি কেবল নন্দনকাননেই প্রতিধ্বনিত হইত তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবর্তী তাহাদের নাম করিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মসী-লেখনীর অনর্থক ক্ষয় করিবে কেন? সুধাংশো! তুমি যদি তোমার ক্ষীরোদ-সাগর-তলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবাল-পালঙ্কে মৌক্তিক-শয্যায় শায়িত থাকিতে তাহা হইলে কে তোমার সহিত রমণী-মুখ-মণ্ডলের তুলনা করিত? অথবা তোমার ঐ সাতাশটি ক্রমান্বয় ভর্তৃকা লইয়া খলুসার শ্বশুর-মন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে তাহা হইলে আজি কমল শর্মা কি তোমার দর্শনাভিলাষী

---

* বোধ হয় এই রাত্রি হইতেই কমলাকান্তের বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। —শ্রীভীষ্মদেব খোসনবীশ।

হইয়া এই শ্মশান-নিকট বটতলার তীরস্থ হইয়া বাস করে ?

শশী যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্‌ বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিতে পারিব না—আমি এতক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম,—শশী, তুমি অনাথার কুটীর-দ্বারে প্রহরি-রূপ অনিমেষ নয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশু যখন নাচিতে নাচিতে তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা কর, বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবর-হৃদয়ে তোমায় একবার দেখিতে পাইয়া, একবার না পাইয়া তোমার সন্দর্শন-লাভার্থ ইতস্তত সরোবর-কূলে দৌড়িতে থাকে তখন তুমি এক একবার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকোচুরি খেলিতে থাক ; নববধূ যখন মন্দবাত-সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে তখন তুমি নারিকেল-কুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত-বর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রমে শীতল কর ; যখন তরঙ্গিণী আশা-তরঙ্গিত হৃদয়ে ধীর প্রবাহে মন্দগতিতে সিন্ধু-অভিগামিনী হয় তখন তুমিই তাহাকে স্বর্ণভূষণে ভূষিত করিয়া আশীর্বাদ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক ; গোলাপ যখন বসন্তরাগে এক বৃন্তে চারিদিক্‌ দেখিয়া হেলিতে দুলিতে থাকে তখন তুমিই তাহাকে মালতী লতাকে চুম্বন করিতে কাণে কাণে পরামর্শ দাও। আবার সেই তুমিই অসদভিসন্ধিৎসু নর যখন কুলকামিনীর ধর্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমনি ভ্রূকুটি করিতে থাক যে সে তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না ; তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারি-ফলকে বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া দাও, তাহার পাপ-শোণিত-বিন্দুতে চৌষট্টি রৌরব প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দাও।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী, তরুণের আশা-প্রদীপ, যুবকযুবতীর যামিনী-যাপনের প্রধান সম্ভোগপদার্থ এবং স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহরী—স্থির দীপধারী ; তুমি পথিকের পথ-প্রদর্শক, গৃহীর নৈশসূর্য, তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী ; পুণ্যাত্মার চক্ষে তাহার যশঃপতাকা। তুমি গগনের উজ্জ্বলমণি, জগতের শোভা। আর শ্মশান-বিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল ; তুমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ ; রসে রস—বিরসে বিষ। তুমি কমলাকান্তের সহধর্মিণী। শশী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে হরি হরি বল ভাই! আজ এইখানে বাসর-যাপন—সকলে একবার হরি হরি বল ভাই।

বম্‌ ভোলানাথ! চন্দ্র যে পুরুষ। তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল।

চন্দ্র আমাদিগের আর্যমতে পুরুষ বটে কিন্তু বিলাতীয় শর্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। আমাদিগের মতে চন্দ্র হি, * ইংরাজি মতে চন্দ্র শী, এখন উপায় ? হি কি শী তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে ?

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের ঐক্য হইল না। আমার এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদালি শাহা লক্ষ্ণৌনগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া হংস-হংসী কপোত-কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ-সহিত বারিহ্রদে নিত্য স্নান করিয়া স্বীয়াগুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সঘৃতপলান্ন প্রদান করেন,—তিনি হি না শী ? এবং যে মহিষী দেশ-বাৎসল্যে ঐহিক সুখ-সম্পত্তি বিসর্জন করিয়া রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়া অপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয় বোধে নেপালের পর্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন,—তিনি শী না হি ? তবে ত সাহসকে হি-শী-র প্রভেদক করা যায় না। তবে কি যুদ্ধ-নৈপুণ্যে হি-শী-র প্রভেদ হইবে ? যে জোয়ান ওর্লিয়ান্স দুর্গ আক্রমণ-কালে সর্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে শী বলিব না হি বলিব ? আর যে বেডফোর্ড তাহাকে পাকচক্রে ফেলিবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব না শী বলিব ? না, যুদ্ধকৌশলে বুঝিতে পারিলাম না। তবে শুনা যায় যে-বলীয়ান্‌ সেই পুরুষ আর যে-জাতি দুর্বল তাহারাই স্ত্রীলোক।

---

* হি শী কাহাকে বলে ? শুনিয়াছি দুইটি ইংরাজি সর্বনাম—হি পুংলিঙ্গ, শী স্ত্রীলিঙ্গ। —শ্রীভীষ্মদেব।

ভাল—কোম্‌ৎ আপনাকে নীতি-রাজ্যের সর্বেদর্বা স্থির করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কর যাজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে মাদম ক্লোতিলড দেবো স্বীয় প্রতাপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শী বলিব না হি বলিব? রোমক-পত্তনের কৈসরগণ এক একজন পৃথিবীর রাজা—যে মৈশরী রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা এইরূপ তিনজন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শী বলিব না হি বলিব? বাস্তবিক জগতে কে হি কে শী তাহা স্থির করা যায় না। সেদিন কীর্তন হইতেছিল, যখন কীর্তন-গায়িকা বলিল, 'সিংহিনী হইয়া শিবাপদ সেবিব?' এবং বঙ্গ-নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্ত্র-স্তব্ধবৎ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্তন-গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যুবককেই আমি শিবা-স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত এর কোন্‌গুলি হি কোন্‌গুলিই- বা শী, তাহা হইলে আমি অবশ্য বলিতাম যে, সেই কীর্তনকারিণীই হি এবং তাঁহার জড়বৎ শ্রোতৃবর্গই শী। বাস্তবিক বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী এবং সর্বত্র বিকল্পে ইট্‌ হন। তাহার নিত্য বিধিও আছে, যথা—ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী এবং বিষয়কর্মে ইট্‌। তাঁহারা বক্তৃতার সময়ে হন হি, নাট্যশালায় সাজেন শী, মদ খাইলে হন ইট্‌। ফলে ইট্‌ যাহাই হউক, হি-শী-র বিষয়ে আমার আপনা আপনি অনেক সন্দেহ হয়। মধু চাটুয্যে আমার নাম সংযোগ করিয়া কি বিদ্রূপ করিয়াছিল বলিয়া যে-প্রসন্ন স্বচ্ছন্দে পূর্ণ দুগ্ধকুম্ভ তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া চাটুয্যের বক্ষঃ-কবাটের বল পরীক্ষা-করণার্থ কোনরূপ বিশেষ আয়ুধ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে-প্রসন্ন সংসারের মতে হইল শী, আর আমি—নশীবাবু কিনা একদিন বলিয়াছিলেন, 'চক্রবর্তী, ঝিমুতে ঝিমুতে আজ বিছানাটা পোড়ালে, একদিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখছি।'—সেই ভয়ে আফিঙ্গের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই-আমি হইলাম হি? এইরূপ বিচারের জন্যই সংসারের সঙ্গে আমার বিবাদ-বিসংবাদ। ফল কথা, যখন আমি নিজে হি কি শী তাহা যখন নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি কিংবা শী তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে? যদি চন্দ্র হি হন ত আমি শী—কেন-না আমার সহিত চন্দ্রের ভালবাসা জন্মিয়াছে এবং আমাকে চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত একজন কমলাকান্ত চক্রবর্তীই হই তাহা হইলে চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণিগ্রহণ করিব।

এখন নানা মতে নানা কার্য হইতেছে; আমি বিলাতীয় মতে বিবাহ করিব। এখন দশাবতার দশকর্মান্বিত হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ টেবিলের শোভা সংবর্ধন করিতেছেন। নৃসিংহ-রাম কমলাকান্তরূপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদগণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় যুবকগণ আমার সোনার চাঁদ শশীকে স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করে। প্রথম রামের স্থানে ইঁহারা মাতৃসেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নীসেবা এবং শেষরামের নিকটে বারুণীসেবা শিক্ষা করিয়াছেন। ইঁহারা বৌদ্ধমতে সংসারের অনিত্যতা স্থির করিয়া কল্কিমতে সংহারমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। এখনকার কালে শাক্তমতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়; তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জিরুশালমের প্রথম গৌরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা করিতে হয়। মেজো গৌরাঙ্গে নবদ্বীপ-বাসীর মত হরি-সংকীর্তন করিতে হয়; রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে হয়।

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজি মতে শী স্থির করিয়া হোস বাহালে সুস্থ শরীরে, খোস-তবিয়তে ইচ্ছাপূর্বক বিবাহ করিলাম। আমি পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে পরম সুখে অন্যের বিনা সরিকতে তোমাতে ভোগদখল করিতে থাকিব। ইহাতে তুমি কিংবা স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা না-মঞ্জুর হইবে। তোমার সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইল।

আর অমন করিয়া পা টিপিয়া পা টিপিয়া চলিয়া পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে? আর অমন করিয়া মুচ্‌কে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে তরতম

করিয়া কতদূর চলিয়া যাইবে? ইতি কোর্টশিপ সমাপ্তঃ। এক্ষণে

গান্ধর্ব বিবাহ। আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি করমাল্য প্রদান কর।

কন্যাকর্তা হৈল কন্যা বরকর্তা বর।
নিজ মন পুরোহিত শ্মশানে বাসর॥

এবার হরি হরি বল ভাই। হরি হরি বোল।

আজ অবধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মুদিত হইবে না। কমল ফুল্ল হইতে দেখিলে আর চন্দ্র ম্লান হইবে না। এইবার ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল।

পূর্বে

কমল মুদিত আঁখি চন্দ্রেরে হেরিলে,

এখন

চন্দ্রেরে দেখিতে দেখ কমল আঁখি মিলে।

চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল

কমল-হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল।

আহা! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি। বর বড় না কন্যা বড়? এই দেখ বর বড়—

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি পায়।
চক্রবর্তী পরিপূর্ণ এক কাঁদি কলায়॥
সেই কলা কভু লুপ্ত কভু বর্তমান।
কমলের বাগানের সব মর্তমান॥

দেখ শশী, এখন নির্জন হইল। তোমাকে গোটাকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

তুমি তোমার রূপ-গৌরবে গর্বিতা হইয়া যেখানে সেখানে ও-রূপের ছড়াছড়ি করিও না। যখন পুত্রশোকাতুরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি করিবে? তখন কলঙ্কিনি! তোমার রূপরাশি গাঢ় মেঘান্তরালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিও। যখন সংসার-জ্বালাজালে লোক দগ্ধ হইয়া তোমার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিবে তখন তোমার সৌন্দর্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না; যে সংসারদগ্ধ তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য তীব্র বিষ-ক্ষেপরূপ হইবে। বরং রক্তরাগে তাহার সহিত আলাপ করিও। যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে কাহারও প্রীতি সে সহ্য করিতে পারে না।

আর যে ঐহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে আর বৃথা আশা দিয়া সান্ত্বনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার একভোগ্যা, তুমি আর কি দেখাইয়া অপরকে সান্ত্বনা দিবে? কিন্তু কমলা-কান্তের সময়-অসময় নাই, ঘটন-বিঘটন নাই, সুখ-দুঃখ নাই। তুমি সর্বদাই আমার নিকট আসিবে, তোমার নিজ কথা আমাকে বলিবে, আমার কথা শুনিয়া যাইয়া আপনার অন্তরে আপনার অস্থিমজ্জার সহিত সেই কথা মিশাইয়া রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যোৎস্না-রাত্রিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও এবং কোমল কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিও না। অদ্য আমাদের যে সুখের দিন তাহা তুমি-আমি ব্যতীত কে বুঝিতে পারিবে? অদ্য হইতে মাস গণনা করিয়া প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গাতীরে শষ্প-বাসর সমাপন করিব। সকল পূর্ণ মাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন করিও না; পঞ্জিকাকার-গণের সহিত দিনক্ষণের পরামর্শ করিয়া কমলাভিসারিণী হইও, নচেৎ একদিন রাহু তোমাকে পথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী করিয়া ক্লিষ্ট করিবে। আর এই বিবাহরাত্রিতে নববধূকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে ধর্মযাজকতার ভান হয়। সুতরাং অলমতি বিস্তরেণ।

এখন একবার কমল-শশীর বাসঘরে ডাক রে কোকিল পঞ্চমস্বরে! এখন শশী, একবার এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা-ছাঁদে নৃত্য কর দেখি! একবার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া—একবার অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উল্টাইয়া পড় দেখি! একবার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রন্ধ্রপথে একচক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি! একবার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে অমনি তাহাদের উভয় দলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি! একবার দ্রুত সঞ্চালনে শ্রান্তি

বোধ করিয়া মুক্তাবিনিন্দিত স্বেদবিন্দুসিক্ত কপালে ঘোম্‌টা তুলিয়া দিয়া গগন-গবাক্ষে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু-সেবন কর দেখি! একবার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোর-চক্রের অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তি-সাধন কর দেখি! একবার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন করিল।

শশী, তুমি ক্ষীরোদ-সাগরজা, ত্রিভুবন-বিহারিণী হইয়াও বালিকা-স্বভাব-সুলভ অভিমানের ভজনা করিলে? কমলাকান্ত কোন্ দোষে দোষী বলিতে পারি না—কখন একবার স্ত্রীপুরুষ-ভেদ-জটিলতা-জাল-ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসন্নর নাম করিয়াছিলাম বলিয়া এত অভিমান আজিকার রজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ, তুমি কলঙ্কিনী, তবু আজি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অদ্যাবধি lunatic* নাম ধরিলাম। জ্যোতির্বিদেরা বলিয়া থাকেন তুমি পাষাণী—তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তাঁহারা বলেন, তোমাতে মনুষ্যত্ব নাই—তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তবু রাগ? তবে এই সংসার-গরল-খণ্ডন, এই গিরিতরু-শিরসি-মণ্ডন ঐ কররেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যদি ঐ অনন্তনীল বৃন্দাবনে মেঘের ঘোম্‌টা টানিয়া একবার রাই মানিনী হইয়া বসো! আমি একবার স্ত্রীলোকের পায়ে ধরিয়া এ জড়-জীবন স্বার্থক করিয়া লই!† আজি শত দোষে দোষী হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্র-ফলক! আমার বৈতরণীর নবীন বৎস!

অমন করিলে আমি শত সহস্র বিবাহ করিব। এখন কমলাকান্ত নূতন বিবাহের রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কর্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে শিখিয়াছে, কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে। যখন দেখিব নব পল্লবিকা শাখাস্কন্ধ হইতে মুখ বাড়াইয়া করপত্র-সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে তখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। যখন দেখিব পদ্মমুখী স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ বঙ্কিম গ্রীবায় নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে তখনই আমি স্থলকমলে জলকমলে মিশাইয়া দিব। যখন দেখিব নির্ঝরিণী রামধনুক ধরিয়া আনিয়া তাহাই লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে তখনই তাহাকে সেই ধনুঃস্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া আমার সঙ্গিনী করিয়া লইব। যখন দেখিব অনন্ত শয্যায় স্বর্নদী মণিভূষায় শ্বেতাম্বরে ভূষিত হইয়া উত্তর-দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণি-গ্রহণে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া অর্ধাঙ্গের ভাগিনী করিব। যখন দেখিব কুঞ্জলতা কাণে ঝুমকা দোলাইয়া শ্যাম চিকুর-রাশি চারিদিকে ছড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে মৃদু সৌর কিরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, তখনই তাহার কেশগুচ্ছ-মধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া তাহার ঝুমকা সরাইয়া দিয়া তাহার বরকে চিনাইয়া দিব। কমলাকান্ত চক্রবর্তী এখন বিবাহ করিতে শিখিল, ঘটকালি শিখিল, আর কাহারও উপাসনা করিবে না। যদি তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর ত আমার মত বিবাহ কর—আমি বেশ ঘটকালি জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব।

বঙ্গদর্শন ২য় খণ্ড
(কমলাকান্তের দপ্তর ষষ্ঠ সংখ্যা) ফাল্গুন ১২৮০

* পাগল। † আমি জানি, কমলাকান্ত একদিন প্রসন্ন গোয়ালিনীর পায়ে ধরিয়াছেন। কিন্তু সে দুগ্ধের জন্য। —শ্রীভীষ্মদেব।

বিজ্ঞাপন

চৌকি (Chair) বিক্রী

মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ও তাঁহার বাইসের উপবেশনার্থ

চৌকির উপকরণের বিশেষ বিবরণ

প্রথম উপকরণ কাষ্ঠ—মেহগ্‌নি, সেগুন, শিশু ইত্যাদি নহে। এক অপূর্ব এবং অলৌকিক গুণ-বিশিষ্ট কাষ্ঠ, নাম হেঁজল কাষ্ঠ। বিশেষ বিবরণ আবশ্যক বলিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে যে,

পুরাকালে রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন নামক একখানি উক্ত কাষ্ঠের সিংহাসন ছিল। সে সিংহাসনের অলৌকিক গুণরাশির কথা কাহারও অবিদিত নাই। কাল-ক্রমে রাজার রাজ্য-পতনে, রাজভবন-ভঙ্গে সিংহাসনখানি ভূমিসাৎ হয় এবং ক্রমে তদুপরি মৃত্তিকার স্তূপ গঠিত হয়। রাজ্যখণ্ড যখন জনহীন সমতলভূমি, তখন ঐ সিংহাসন-প্রোথিত স্থানটি একটি মাটির ঢিপী-মাত্র। রাখাল বালকেরা মাঠে আসিয়া গোরু ছাড়িয়া দিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিত; কখন রাজাপ্রজা খেলা করিত এবং ঐ মাটির ঢিপী কথঞ্চিৎ উচ্চস্থান বলিয়া সেইটি সিংহাসন হইত। যিনি রাজা সাজিয়া তাহাতে বসিতেন তাঁহারই মস্তকে রাজবুদ্ধির ঢেউ খেলিত।

একদা এক দুঃখী ব্রাহ্মণ স্থানান্তরে গমন করিলে ব্রাহ্মণের স্ত্রীর প্রতি লোভাসক্ত এক ব্রহ্মদৈত্য ঐ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বাটীতে আসেন, যেন প্রকৃত ব্রাহ্মণই বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইলেন। ব্রহ্মদৈত্য ব্রাহ্মণীর সহিত ঘরকন্না করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণীর সংস্কার সেই তাহার স্বামী। তাহার পর প্রকৃত ব্রাহ্মণ প্রত্যাগত হইলে কে সত্য সেই ব্রাহ্মণ, এবং স্ত্রী কাহার এই সন্দেহ-তর্ক উপস্থিত হইলে মীমাংসার জন্য রাজকর্মচারীর নিকট স্ত্রী-সমভিব্যাহারে দুই জনে যাত্রা করেন।

কথিত আছে, বালকেরা সেইদিন রাজাপ্রজা সাজিয়া খেলা করিতেছিল। পথিমধ্যে তাহারা সবিশেষ অবগত হইয়া স্তূপারূঢ় কল্পিত রাজসমীপে বিবাদী সম্প্রদায়কে আনয়ন করে। রাখালরাজ সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক অবগত হইয়া একটি চর্মনির্মিত ক্ষুদ্র তৈলভাণ্ড গ্রহণ করিয়া বলেন যে, এই ভাণ্ডের মধ্যে বিবাদী দুই ব্যক্তির মধ্যে যিনি প্রবেশ করিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত ব্যক্তি—স্ত্রী তাঁহারই। ব্রাহ্মণের বদন শুষ্ক হইল, ছদ্মবেশী ব্রহ্মদৈত্যের মুখে আর হাসি ধরে না। ব্রহ্মদৈত্য তৎক্ষণাৎ আত্মদেহ সংকীর্ণ ও বায়ুবৎ করিয়া ভাণ্ডে প্রবেশ করেন; রাখালরাজ ভাণ্ডমুখ দৃঢ় বন্ধন করিয়া জলমগ্ন করাইলেন এবং ব্রাহ্মণকে স্ত্রীর সহিত বিদায় করিলেন।

রাখালরাজের এতাদৃশ চমৎকার সুচতুর রাজবুদ্ধির পরিচয়ে ব্রাহ্মণ অনেক বিবেচনায় স্থির বুঝিলেন যে, কথিত মৃত্তিকা-স্তূপ-নিম্নে নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক গুণবিশিষ্ট দ্রব্য আছে, নচেৎ এরূপ রাজবুদ্ধির পরিচালনা কদাপি হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ছিল না যে তাহার অনুমান সত্য কিনা তাহা পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করেন। বিপদুদ্ধারই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া রহস্যভেদের কোন চেষ্টা করেন নাই। তবে একটি সুবুদ্ধির কার্য করিয়াছিলেন,—এই ঘটনাটি এবং ঐ মৃত্তিকা-স্তূপের নির্দিষ্ট স্থানটি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ইংরাজ বাহাদুর যখন ভারতেই সেই প্রদেশ অধিকার করেন তখন রাজকার্যের নিয়মানুসারে ভাবী বন্দোবস্তের জন্য প্রজাগণের যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ রাজদপ্তরে জমা হয়। সেই সঙ্গে ঐ ব্রাহ্মণের লিখিত লিপিখণ্ড আসিয়া পড়ে। এতকাল সেই কাগজ ফরেন আফিসের দপ্তরখানায় পড়িয়া ছিল। মহাদক্ষ লর্ড রীপন ফরেন আফিসের কাগজের পোকা ছিলেন, তাঁহার নয়নে ঐ কাগজ পড়ে। আর যায় কোথায়, অমনি স্থান-নির্ণয়, লোক-নিয়োগ, মৃত্তিকা-স্তূপ-খনন এবং তন্মধ্যে কথিত অপূর্ব গুণবিশিষ্ট রাজসিংহাসন-প্রাপ্তি, কিন্তু সিংহাসনখানি ভগ্নাবস্থ। লর্ড রীপন ভারতের অদ্বিতীয় মঙ্গলার্থী, ভগ্ন সিংহাসনখানির কাষ্ঠে এই সকল চৌকি নির্মাণ করাইয়াছেন।

দ্বিতীয় উপকরণ বেত্র। চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর নামক মহাদেব (এই দেবের নামের উৎপত্তি এবং অর্থ আমরা জানি না) বেত-বন হইতে উঠিয়াছিলেন। জেলেরা স্বপ্ন পাইয়া তাঁহাকে তোলে। বেতকে চিঁচিড়া বলিত এবং তাহাতে ঐ নগরের নাম চুঁচুড়া। সেই বেত-বন কাটিয়া বসতি হয়। জেলেরা যত্ন করিয়া সেই বেত অনেক সংগ্রহ করিয়া রাখে। সংস্কার যে, এই বেতে মহাদেবের ভূতের আবির্ভাব হয়। গাজনের সময় ঐ বেতের এক একটি আটি হাতে করিয়া সন্ন্যাসীরা খাটাখাটুনি করে। বেতের গুণে সন্ন্যাসীদের মাথা চলে, ঘাড় কাঁপে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নানা প্রকার পক্ষাঘাতিক অবস্থা ঘটে। এমন কি মূল সন্ন্যাসী মরিয়া যায়, আবার কপালে বেতের ঘা মারিলেই বাঁচিয়া উঠে। বালির হালদারেরা ষণ্ডেশ্বরের পুরোহিত, জেলেরা

হালদারদের চেলা। জনৈক হালদার লাট সাহেবের কেরানি, তিনিই কতকগুলি সেই বেত লর্ড রীপনকে দেন। সেই ভূতাবিষ্ট বেতে এই চৌকিগুলি ছাওয়া।

তৃতীয় উপকরণ বার্নিস। সচরাচর স্প্রীটে গালা গলাইয়া বার্নিস প্রস্তুত হয় এবং রঙের জন্য খুন্খারাপি দেওয়া হয়। এ চৌকির বার্নিস স্বতন্ত্র প্রকারে প্রস্তুত। স্প্রীটের যে শক্তি গর্দভের মূত্রেও সেই শক্তি—রসায়ন-বিদ্যা-বিদেরা লাট সাহেবকে বলিয়া দেন এবং যাহারা স্প্রীট পান করিয়াছেন তাঁহারাও জানেন। গালার পরিবর্তে সজিনা গাছের আটা এবং খুন্খারাপির পরিবর্তে ছারপোকার রক্ত। এই তিন দ্রব্যে এই চৌকির বার্নিস প্রস্তুত হয়।

লর্ড রীপন এই সকল উপকরণে কতকগুলি চৌকি প্রস্তুত করাইয়া·ইলেক্‌টিভ সিস্‌টেম জারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি জেলায় দুইখানি করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন।

চৌকিগুলি দেখিতে সাদাসিদে।
চৌকির গুণ

১। গুণ অসীম; অনেকেই জানেন যে, বিলাতে দুষ্প্রবৃত্তি-সাধন-জন্য একপ্রকার কলের চৌকি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাতে বসিলেই কলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এরূপ আটকাইয়া যায় যে, উঠিবার শক্তি আর থাকে না। এই সকল চৌকিতে কলকজা নাই, কিন্তু একবার বসিলে আর উঠিবার যো নাই। দুই চৌকিতে প্রভেদ এই মাত্র যে, কলেরখানিতে বসিলে ইচ্ছা থাকিলেও উঠিবার শক্তি থাকে না, আর এই সকল চৌকিতে বসিলে উঠিবার ইচ্ছা পর্যন্ত একেবারে রহিত হইয়া যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

২। চৌকিতে বসিবামাত্রই মাথা চন্‌চন করিতে থাকে, ঘাড় কাঁপে, শরীর গরম হইয়া উঠে, আহ্লাদে মন উথলিয়া পড়ে, অহঙ্কারে ফুলিতে হয়, স্ফূর্তির ঢেউ চলে, ভূতে স্বর্গে তুলিয়া দেয় এবং মনে দৃঢ় সংস্কার জন্মে যে আমিই হর্তা-কর্তা-বিধাতা এবং দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

৩। সমস্ত রাত্রি হট্টমন্দিরে খোলা ভাঁটির দৌলতে পপাত মা ধরণীতলে, আর অরুণোদয়ে চৌকিতে বসিলেই সচ্চরিত্র, লোকাভিরাম, জিতেন্দ্রিয়—সাক্ষাৎ মহাদেব। গুলির আড্ডায় অষ্টপ্রহর অবস্থান কিন্তু চৌকিতে বসিলেই স্বয়ং বিষ্ণু অবতার। গোস্বামিরূপে মোহিনী-কুঞ্জে সতীত্ব-সংহারের হরি-সংকীর্তনে বিহ্বল, আর চৌকিতে বসিবামাত্রই জ্যোতির্ময় মূর্তিমান্ পবিত্র ধর্মাবতার।

৪। চৌকিতে সমস্ত বিদ্যার আবির্ভাব। বিচারে আইনের মুণ্ডপাত (আপিল নাই); হিসাবে গোজামিল (অডিটের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ); উপার্জনে গরীবের শোণিত-শোষণ (ভিখারীর টেক্স); ব্যয়ে টাকার পিতৃশ্রাদ্ধ; নির্মাণ-কার্যে প্রতি বৎসর সাঁকোর ও পয়োনালার পুনঃসংস্কার এবং নর্দমার পঙ্কে রাস্তা মেরামত। স্বাস্থ্যরক্ষায় পথের ধারে গামলা পুঁতিয়া ছিন্ন দরমার আবরণে পায়খানার ব্যবস্থা।

৫। শক্তির সঞ্চারণ। চৌকিতে বসিলেই ধমনীতে চঞ্চল ছাগরক্তের-সঞ্চালন, শরীরে সতেজ ষাঁড়ের বলের আবিষ্কার এবং মস্তকে বালবুদ্ধির উদ্ভাবনা। অকর্মণ্য পঞ্চান্ন-বিপদাপন্ন বৃত্তিভোগী বাইস-মান তাহার পরিচয়।

৬। সর্বভেদী দিব্য দৃষ্টি। আগেকার সাহেব চেয়ার-ম্যান ও তাঁহার বাইসকে সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইয়া সমস্ত দেখিতে হইত। এ চৌকি-শোভিত অচল দেবতা আপিস ঘরের প্রাচীর চতুষ্টয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সহরের সর্বত্র যাবতীয় কার্য দেখিতে পান।

৭। অহোরাত্র ঘোর মিথ্যার নরক-সৃজন, মিথ্যা মোকদ্দমার প্রশ্রয়দাতা সাক্ষাৎ অধর্ম অবতার, কিন্তু চৌকিতে বসিলেই ট্যাক্স-সম্বন্ধে দরখাস্তকারী মাত্রই হুজুরের সম্মুখে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত।

৮। হৃদয়ের প্রশস্ততা। কুকুরের মূত্রে রাজপথে জল-প্লাবন-জ্ঞান। জোনাকিপোকায় সহর আলোকময়-দর্শন। প্রজার সন্তরণ-শিক্ষার্থে বর্ষায় পথে জলাশয়-সৃষ্টির সদ্ব্যবস্থা। গলিতে পদব্রজে কেহ চলে না—এই সংস্কার।

৯। চৌকির উদারতা গুণ। অপরিমিত দয়া বড়মানুষ ও আত্মীয়গণের উপরেই; প্রমাণ—কীর্তি-কলাপ যত কিছু তাঁহাদেরই দ্বারে। অটল ভক্তি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের শ্রীচরণে, তাঁহারই ঘোটক-ভ্রমণের পথ স্বহস্তে পরিষ্কার-করণ। নম্রতা—স্বয়ং ঢাক ঘাড়ে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বগুণের সংকীর্তন; প্রমাণ—অধমতারণ স্টেট্‌স্‌ম্যানে।

১০। চৌকিগুলি নিদ্রার চিরবাসস্থান; তবে মধ্যে মধ্যে বড় বড় কাজের স্বপ্ন দেখিতে হয়, অর্থাৎ জলের কল, টাউন হল, গ্যাস লাইট আর এস্‌ট্রাণ্ড। টাকা—স্বপ্নের টাঁকশালে তৈয়ার করিতে হইবে।

অতএব অতীব আহ্লাদ-সহকারে সর্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, উপরি উক্ত অভূতপূর্ব শক্তিবিশিষ্ট উপকরণ-বিনির্মিত এবং এতাদৃশ দশ-দফা-গুণাবলি-ভূষিত চমৎকার চৌকি আর কখনই সৃষ্ট হয় নাই এবং কখনই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় নাই। লর্ড রীপনের আমলেই প্রথম আমদানী। প্রতি তিন বৎসর মফস্বল টাউনে এক একবার প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রয় হয়। সর্বাগ্রে প্রথম chance—এ দেশের পোঁটাচুন্নীর ছেলে পদ্মলোচনদের এবং আমড়ার ঢেঁকি-অবতারদের দেওয়া হয়। কিন্তু উচ্চ মূল্যে বিক্রয়-ব্যবস্থা।

মূল্য—ভোট, গল-লগ্নীকৃতবাসে তোষামোদ, হাতে পৈতা জড়াইয়া অভিশাপ এবং আত্মহত্যার ভয় প্রদর্শনে পাওয়া যায়। খরিদদারদের একটিমাত্র গুণ থাকা চাই,—মন-ভিজানো মিথ্যাপূর্ণ মিষ্টমুখ। এস খরিদ্দার, চলিয়া এস! ভোট লয়ে জল্‌দি এস—যায় চৌকি যায়! যায় চেয়ার যায়! আয় খরিদ্দার আয়!!!

নবজীবন ৫ম ভাগ আশ্বিন ১২৯৫

শকুন্তলা

প্রথম দৃশ্য

ক'নে-দেখানো

কালিদাসের শকুন্তলার বিস্তারিত পরিচয় দিতে গেলে পাঠকের ও মহাকবির অবমাননা হয়, তবে নাটকের ভাষ্য-রূপে যৎকিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। শকুন্তলার প্রথম দৃশ্য—স্বধর্মপরায়ণ বিবাহিত রাজা দুষ্মন্তের আবার বিবাহের জন্য ঘটকালি। ঘটকালির প্রধান কার্য—দোজবরে বরকে বয়স্কা ক'নে ভাল করিয়া দেখানো।

এক এক দিন বৈকালে আকাশে সোণামাখা রৌদ্র হয়, গাছপালায় সোণামাখা হাসি ভাসিতে থাকে,—মেয়েছেলে বলে, 'এই ক'নে দেখানোর বেলা' হইয়াছে। কালিদাস অতি অপূর্ব কৌশলে এইরূপ হাসিভরা ক'নে দেখানোর বেলা সৃষ্টি করিয়া তেমনি হাসিভরা, ফুলভরা, সোহাগভরা ক'নে দেখানোর মজলিস করিয়া তবে বরের সম্মুখে ক'নে বাহির করিয়াছেন। স্থান—মালিনীতীরস্থ শান্তিময় কণ্ব-মুনির আশ্রম। কাল—বসন্তমুখ। নবমল্লিকা এই সবেমাত্র মুঞ্জরিয়াছে, সহকারে নব কিসলয় এই উদ্ভূত হইয়াছে, ভ্রমর গুঞ্জন আরম্ভ করিয়াছে, আকাশে পঞ্চম স্বরে সুর অল্প অল্প লাগিতেছে। এই মোহকর ক'নে দেখানো সময়ে, কুমারী শকুন্তলা সখীগণ-সঙ্গে বৃক্ষবাটিকায় ছোট ছোট কলসী লইয়া জলসেক করিতেছে। যেমন সময়, যেমন স্থান, তেমনি সুকুমার কার্যেও ইঁহারা ব্যাপৃতা। তিন জন সম-বয়সীতে সময়োচিত কথা-বার্তাই হইতেছে,—

শকুন্তলাকে একজন সখী বলিল, 'ওলো! ভাল করিয়া জল দে লো, জল দে—ওর ফুল ফুটিলেই তোর ফুল ফুটিবে।' শকুন্তলা একটু হাসিয়া বলিলেন, 'তোমরা তামাসা করিবে বলিয়া আমি কি জল দিব না, নাকি? আমি যে এদের বড় ভালবাসি।' আপনারা এমন করিয়া ক'নে-দেখানো আর কোথাও দেখিয়াছেন কি?

ক'নে ত বাহির করা হইয়াছে, এখন বর কোথায়? বর বৃক্ষান্তরালে অবস্থিত হইয়া সকলই দেখিতেছেন, সকলই শুনিতেছেন। আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্রই তাঁহার বাহু-স্পন্দন হইয়াছিল। তাহাতে বিবাহের সম্ভাবনা বুঝায়, সেইজন্য তিনি ভাবিয়াছিলেন যে,—এমন আশ্রমে এ আবার কি? এখানে আবার বিবাহের সম্ভাবনা কোথায়?—আবার ভাবিলেন যে, ভবিতব্য কোথায়-বা না ফলে?

ইহার পরেই সম্মুখে কন্যা-সজ্জা বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিতে পাইলেন, তখন ভবিতব্য বলবান্ বলিয়া বোধ হইল। এই ক'নে-দেখানো দৃশ্যই অদ্য আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। এখন আপনারা বলুন যেন মহাকবির মহা ঘটকতা আমরা ভালয় ভালয় সম্পূর্ণরূপে দেখাইতে পারি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বরকন্যার পূর্বালাপ

এবার কোর্টশিপ্ বা বরকন্যার পূর্বালাপের পরিচয় দিব। পাঠকের অবশ্য স্মরণ আছে, রাজা দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে সখীগণ সহ শকুন্তলার পুষ্পবাটিকায় জলসেচন দেখিতেছিলেন এবং তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা দুষ্ট মধুকর শকুন্তলাকে বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিল। শকুন্তলা সখীদের বলিলেন, 'ওলো! তোরা দেখ্ না ভাই—এই ভোম্‌রাটা যে আমাকে একেবারে মেরে ফেল্লে!' সখীরা দেখিল, শকুন্তলা একটা ভ্রমর তাড়াইতে পারে না; বলিল, 'আমরা কি করিব ভাই! তুমি রাজাকে ডাকো, ত্বরায় বিপদ্ হইতে যদি রাজা রক্ষা করিতে পারেন তবেই তোমার নিস্তার!' রাজা দেখিলেন যে, ঋষি-কন্যাদের সম্মুখে আসিবার তাঁহার বেশ সুযোগ হইয়াছে—আবার ভ্রমর শকুন্তলার মুখের কাছে বোঁ বোঁ করিতে লাগিল!—শকুন্তলা বলিয়া উঠিলেন, 'রক্ষা কর! রক্ষা কর!' রাজা অগ্রসর হইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'আ! কে মুগ্ধা ঋষি-কন্যাদের উপর দৌরাত্ম্য করিতেছে রে!—সে কি জানে না যে দুষ্টের দমনকর্তা পুরুবংশীয়েরা পৃথিবী শাসন করিতেছেন।'

আপনারা পূর্বে ক'নে-দেখানোর কৌশল দেখিয়াছেন—এখন একবার ক'নের কাছে বর দেখানোর ঘটা দেখুন। আর্তের পবিত্রতার মূর্তিতে রাজা দুষ্মন্ত আপনার ভাবী মহিষীর সম্মুখে সহসা আবির্ভূত। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়-মূর্তি জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। ঋষি-কন্যারা সন্ত্রস্তা হইলেন—সখীরা বলিলেন, 'না মহাশয়! এমন কিছু নয়—এই একটা দুষ্ট মধুকর আমাদের এই প্রিয় সখীকে বড় ব্যাকুল করিয়াছিল!' রাজা শকুন্তলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'অয়ি তপোবর্ধতে! কেমন গো, ধর্মকার্য বেশ হইতেছে ত?' দুষ্মন্তের ক্ষত্রিয়-মূর্তি শকুন্তলাকে অভিভূত করিয়াছে, তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না—অনসূয়া তাঁহার হইয়া বলিল, 'আজ্ঞে হাঁ, সম্প্রতি অতিথি-বিশেষের আগমনে ধর্মানুষ্ঠানের আরও সুবিধা হইল।' এ স্থলে, অনসূয়া শকুন্তলা-কর্তৃক নবমল্লিকায় একান্তমনে জলসেচন তাঁহার প্রধান তপস্যা মনে করিয়া, অতিথি-বিশেষের সমাগম সেই তপস্যার অনুকূল—সে যাহা খুঁজিতেছিল, তাহাই পাইয়াছে—এরূপ শ্লেষ করিয়াছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না—সে রহস্য-কথা কালিদাস জানেন আর শকুন্তলা বুঝিয়াছিলেন।

অনসূয়া ছায়াশীতল সপ্তপর্ণবেদীতে রাজাকে বসিতে বলিল। রাজা আপনি বসিলেন, তাঁহাদিগকে বসিতে বলিলেন—সকলেই বসিলেন।

দুষ্মন্ত ক্রমে শকুন্তলার পরিচয় পাইলেন; বলিলেন, 'বুঝিলাম ইনি অপ্সরা-সম্ভবা—তাই ত ভাবিতেছিলাম, বলি, এমন প্রভা-তরল জ্যোতি ভূমি হইতে উঠিবে কেন?' পরে বলিলেন, 'তবে কি মহর্ষি ইঁহাকে তপশ্চারণে রাখিবেন?' প্রিয়ংবদা বলিল, 'না, অনুরূপ পাত্রে সম্প্রদান করিবেন।' রাজা মনে মনে বলিলেন, 'হৃদয় আশ্বস্ত হও—যাহা অগ্নি মনে করিয়া আশঙ্কা করিতেছিলে তাহা স্পর্শ-শীতল রত্ন।'

এইরূপ নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল। শকুন্তলার সহিত রাজার একটিও কথা হইল না। মনের কথা মাটির আওয়াজে মিটে না। শেষে একটা মত্তহস্তী তপোবনের বিঘ্ন করাতে সকলকে আপন আপন স্থানে যাইতে হইল—অনসূয়া প্রিয়ংবদা অগ্রে অগ্রে যাইতেছে—শকুন্তলাকে সর্বপশ্চাতে যাইতে হইল। যাইতে যাইতে শকুন্তলা বলিলেন, 'ওলো—অনসূয়া! একটু দাঁড়া না, ভাই! আমার পায়ে কুশাঙ্কুর ফুটেছে, কুরুবক-শাখায় আঁচল আটকাইয়া গিয়াছে—ছাড়াইয়া নি—একটু দাঁড়া না, ভাই'; এই বলিয়া সতৃষ্ণ নয়নে রাজাকে দেখিতে লাগিলেন—রাজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন,—'সকলেই গেল, তবে আমিও যাই।' ইহাই আপনাদের চিত্র।

তৃতীয় দৃশ্য

সন্তাপ-সন্দর্শন

যখন শকুন্তলা রাজাকে দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলেন, রাজাকে তখন আমরা আপনা আপনি বলিতে শুনিয়াছি,—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ-সংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

—আমি অগ্রসর হইতেছি, আমার চঞ্চল মন কিন্তু পিছন দিকে দৌড়িতেছে।—বাস্তবিক রাজার মন পিছন দিকেই পড়িয়া রহিল। রাজা অহোরাত্র কেবল সেই অনাঘ্রাত নবমালিকা কুসুম, সেই নখাঘাতশূন্য অক্ষুণ্ণ কিসলয়, সেই বহু পুণ্যের ফলস্বরূপ শকুন্তলার ধ্যানে নিমগ্ন। আকাশে মেঘ উঠিলেই সাগর-বক্ষে ছায়া পড়ে—শকুন্তলাও সেই রাজর্ষির সন্দর্শনাবধি দিন দিন ম্রিয়মাণা হইতে লাগিলেন—ক্রমে যেন কেবল একটি লাবণ্যময়ী মূর্তিমাত্র রহিয়াছে।

উভয়ের এইরূপ অবস্থায়, পুনঃসংমিলনের দৃশ্য দেখুন। সেই শকুন্তলা, সেই অনসূয়া, সেই প্রিয়ংবদা—সেই পাদপান্তরালে রাজা দুষ্মন্ত তেমনি করিয়া লুকাইয়া আছেন, কিন্তু আমাদের প্রথম দৃশ্যের মত ক'নে-দেখানো বেলা নাই, সে পুষ্প-বাগিচায় জলসেচন নাই, সহকারে তেমন করিয়া নবমুঞ্জরিতা মাধবী নাই, তেমন করিয়া সে ফুল-ফুটানো কথাবার্তা নাই। এখন উগ্রতপা বেলা, মালিনী-জলে মধ্যাহ্নরশ্মি চক্‌ চক্‌ করিতেছে, তীরস্থ বেতস-বিজনে ঝিল্লীসকল অস্ফুট ঝিঁ ঝিঁ রবে নিদাঘ-মধ্যাহ্নের তুষ্ণীম্ভাব ভঙ্গ করিতেছে। সেই মালিনী-তীরস্থ বেতসলতামণ্ডপের শিলাপটে কুসুমাস্তরণে ম্রিয়মাণা শকুন্তলা অঙ্গে উশীর লেপন করিয়া সোণার লতার মত শুইয়া আছেন; অনসূয়া ও প্রিবংবদা শুশ্রূষা করিতেছে; পদ্মপাতায় বাতাস করিতেছে। রাজা অন্তরালে থাকিয়া ইঁহাদের কথাবার্তা শুনিতেছেন। প্রথম দৃশ্য—ক'নে-দেখানো ও এই তৃতীয় দৃশ্য সন্তাপ-সন্দর্শন—এই দুই দৃশ্য একরূপ হইয়াও দেখ কত ভিন্নরূপ। পাত্র-পাত্রী সমস্তই এক—কিন্তু তখন নব বসন্তের সেই মনোহর বৈকাল কাল, আর এখন বাহ্য সন্তাপদগ্ধ মধ্যাহ্ন সময়। তখন তিনজন সখীতে তরুলতার সেবায় নিযুক্ত—এখন হৃদয়াতপে অত্যন্ত অসুস্থশরীরা শকুন্তলার জন্য সখীরা মহা ব্যাকুলা। বাহিরের রৌদ্রের ধূ ধূ—আর ভিতরের প্রাণের হু হু—উভয়ে দেখুন কি এক উৎকট সম্মিলন হইয়াছে—এই দৃশ্য সন্তাপ-সন্দর্শক। সখীরা বলিল, 'ভাই শকুন্তলা! পদ্মপাতের বাতাস তোমার ভাল লাগিতেছে ত?'

শকুন্তলা কাতর কণ্ঠে বলিলেন, 'তোমরা কি আমায় বাতাস করিতেছ?' শকুন্তলা এমন শীতল বাতাসও অনুভব করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া সখীরা পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। রাজা দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'ইহার শরীর কি অসুস্থ? —না, আমারই মত হৃদয়সন্তাপে দগ্ধ হইতেছেন?'

ক্ষণেক পরে অনসূয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, 'সখী, একটি কথা বলিব?' শকুন্তলা বলিলেন, 'কি বলিবে বল।' অনসূয়া বলিল, 'তোমার মনের কথা ত, বোন, জানিতে পারি নাই, কিন্তু প্রণয়ীজনের অবস্থার কথা গল্পে ত শুনিয়াছি; তোমারও ভাই, সেইরূপ দেখিতেছি—তা তুমি বল, তোমার কি হইয়াছে; রোগটা না জানিতে পারিলে, চিকিৎসা কি করিয়া হয় বল?'

শকুন্তলা বলিলেন, 'ভাই, আমার রোগ বড় কঠিন—কি যে রোগ তা হঠাৎ আমিও বলিতে পারিতেছি না।'

প্রিয়ংবদা বলিল, 'অনসূয়া ত ঠিক বলিতেছে; আপনার রোগ লুকিয়ে রেখে তুমি দিন দিন কেবল ক্ষীণ হইতেছ—শরীর ত আর নাই—কেবল একখানি লাবণ্যময়ী ছায়া রহিয়াছে।' শকুন্তলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আমিই তোমাদের দুঃখহেতু—আমার কথা তোমাদিগকে না বলিয়া আর কাহাকে বলিব বল?' সখীরা বলিল, 'তাই ত ভাই, তোমাকে ব'লতে বল্‌ছি—আপনার লোকের কাছে দুঃখ জানাইলে, তবু অনেকটা লাঘব হয়।' শকুন্তলা বলিলেন, 'যে অবধি তপোবন-রক্ষাকর্তা সেই রাজর্ষিকে দেখিয়াছি'—লজ্জায় আর বলিতে পারিলেন না। উভয়ে বলিল,—'তা বল না—বল না।' শকুন্তলা বলিতে লাগিলেন,—'সেই অবধি তদ্‌গতচিত্ত হ'য়ে এই অবস্থা হয়েছে।' উভয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল, 'তা ভাই! হর পূজে বর মিল্‌লো ভালো—গঙ্গা সাগর ছাড়িয়া আর কোথায় যাইবে বল?'

রাজা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'যাহা শুনিবার তাহাই শুনিলাম, বিষের ঔষধ বিষই বটে।'

শকুন্তলা সখীদিগকে বলিতে লাগিলেন,—'তা তোমাদের যদি অনুমত হয়, তবে যাহাতে আমার উপর সেই রাজর্ষির অনুকম্পা হয়, তাহা কর—না কর, আমাকে মনে রাখিও।'

প্রিয়ংবদা শকুন্তলার কাতরকণ্ঠের ব্যাকুলতা বুঝিতে

পারিয়া চুপি চুপি অনসূয়াকে বলিল, 'দেখ ভাই, সখী ত নিতান্তই তদ্‌গতপ্রাণা হইয়াছে—আর বিলম্ব করা ত চলে না।'

অনসূয়া—তাই ত, তবে নিভৃতে ও সত্বরে সখীর মনোরথ পূর্ণ হইবার উপায় কি ?

প্রিয়ংবদা—তবে নিভৃত হওয়াই ভাবনার কথা, শীঘ্র হওয়া দুষ্কর নয়।

অনসূয়া—কিসে বুঝিলে বল দেখি।

প্রিয়ংবদা—রাজারও সখীর উপর শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে—আজকাল তাঁহাকে অনিদ্রায় কৃশ দেখিতে পাও না ?

রাজা আপনার দিকে দেখিয়া বলিলেন,—'সত্যই ত।'

প্রিয়ংবদা চিন্তা করিয়া বলিল, 'তবে একটু প্রণয়-পত্র দাও; আমি ফুলের ভিতর ক'রে রাজাকে দিয়া আসি।'

অনসূয়া—এ কথা ভাল, শকুন্তলা কি বল ?

শকুন্তলা—তোমাদের পরামর্শে আমি কি অন্যথা করিব ?

এই স্থলেই সন্তাপ-সন্দর্শনের শেষ হইল।

চতুর্থ দৃশ্য

যুগল-মিলন

(উপক্রমণিকা)

যখন শকুন্তলাকে তদ্‌গতপ্রাণা জানিয়া ও তাঁহার সন্তাপ সন্দর্শন করিয়া অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে বলিল, 'তাই ত তবে নিভৃতে ও সত্বরে সখীর মনোরথ পূর্ণ হইবার উপায় কি ?' তখন প্রিয়ংবদা কোন দিকে না চাহিয়া, একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিল, 'নিভৃত হওয়াই ভাবনার কথা, শীঘ্র হওয়া দুষ্কর নয়।' অনসূয়া বলিল, 'কিসে বুঝিলে বল দেখি ?' প্রিয়ংবদা বলিল, 'রাজার যে সখীর উপর শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে,—আজকাল অনিদ্রায় তাঁহাকে কৃশ করিয়াছে।' এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা একটু আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার সন্তাপদগ্ধ হৃদয়ে একটু যেন আশার ছড়া পড়িল। 'ভালবাসি যারে—সে ভালবাসে আমারে' —এই বিশ্বাস দূরাগত চাতকের রবের সঙ্গে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহাতেই—সখীরা তাঁহাকে প্রণয়পত্র লিখিতে বলিল, তিনি সহজে সম্মতা হইলেন।

প্রিয়ংবদার কথায় আশান্বিতা হইয়া সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই শকুন্তলা আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিলেন—তাঁহার হৃদয়ে আবার আশঙ্কাও উঠিল। বলিলেন, 'পত্র ত লিখিব, কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন—এই আশঙ্কায় হৃদয় কাঁপিতেছে।' সখীরা বলিল, 'ভাই, তোমার সে-ভাবনা ভাবিতে হইবে না—সন্তাপবারিণী শারদীয়া জ্যোৎস্না কেহ কি ছাতা দিয়া নিবারণ করে ?'

তখন শকুন্তলা পত্র লিখিলেন; সখীদের শুনাইতে লাগিলেন,—

> তব হস্তে সঁপিয়াছি মম মনোরথ,
> অবলারে বল করে, তাই মনোরথ ;
> নিদয় হৃদয় তব নাহি জানি আমি,
> জানি মাত্র মম গাত্র তাপে দিবাযামি !

রাজা অবসর বুঝিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; উত্তরচ্ছলে বলিলেন—

> তব তনু তাপে তন্বী ! মম দেহ দহে ;
> দিবসে শশাঙ্ক ম্লান—কুমুদিনী নহে।

(আরম্ভ)

তখন সখীরা বড় আদরে রাজাকে সম্ভাষণ করিলেন ; শকুন্তলা উঠিতে যান, রাজা নিবারণ করিলেন; সখীরা শকুন্তলার শয্যাবলম্বন সেই শিলাতলে রাজাকে উপবেশন করিতে বলিল ; শকুন্তলা না উঠিয়াই একটু সরিয়া গেলেন ; রাজা বসিলেন ; বলিলেন, 'তোমাদের সখীর শরীরের তাপ একটু শান্ত হইয়াছে ত ?' প্রিয়ংবদা প্রিয়-কথা বলিতে জানে, কিন্তু বড় চতুরা—একটু হাসিয়া বলিল, 'এখন ঔষধ মিলিল, উপশম হবে বৈকি ?' শকুন্তলা প্রিয়াদের কথায় লজ্জিত হইলেন। তখন প্রিয়ংবদা একরূপ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সকল কথাই বলিল। রাজাও আপনার মনোভাব গোপন রাখিলেন না। এতক্ষণে শকুন্তলা প্রিয়জন-প্রথম-সমাগম-সুলভ লজ্জার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন ; অনসূয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ওলো, রাজাকে এখন কিছু বলিস্‌ নে—উনি অনেকদিন বাড়ীছাড়া—বড় উৎকণ্ঠিত আছেন।'

তপোবনে কুরঙ্গিণীর সঙ্গিনী করিয়া বনলতায় জল-সেচনে বা তপশ্চারণের পরিচর্যায় পরিবর্ধিতই কর—আর জনাকীর্ণ নগরে নাগরিক-মধ্যেই পরিপালিত কর—ভবী কখন আপনার ভাব ভুলে না—হিন্দু ললনার হৃদয়ে যখনই প্রণয়ের সূত্র-সঞ্চার দেখিবে, তখনই দেখিবে যে, তাহার হৃদয়ে স্বামীর প্রতি সপত্নী-সোহাগের সন্দেহ যেন অল্প অল্প অঙ্কুরিত হইতেছে! এমন যে প্রেম-ভক্তির আদর্শ-সাধিকা রাধিকা—তিনিও ত কাতরকণ্ঠে বলিতে ছাড়েন না—

তোমারও অনেকও আছে,
আমার কেবল তুমি হে!

এমন যে সরলা শকুন্তলা—কৈ তিনিও ত দুষ্মন্তের প্রতি সপত্নী-সোহাগের সঙ্কেত করিতে ছাড়িলেন না? তাহাতেই বলিতেছিলাম—যেমন করিয়াই রাখ—আর যে ভাবেই রাখ—ভবী আপনার ভাব ভুলে না।

অনসূয়া পন্থা পাইয়া অনুনয় করিয়া রাজাকে বলিল, 'আমরা শুনিয়াছি, রাজারা বহুবল্লভা—তা আমাদের প্রিয়সখীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাহাতে পরে আমাদিগকে অনুশোচনা না করিতে হয়, আপনি তাহাই করিবেন।' রাজা বলিলেন, 'ভদ্রে, অধিক আর কি বলিব? আমার যতই কেন পরিগ্রহ থাকুক না—এই সমুদ্র-মেখলা মেদিনী আর এই—তোমাদের সখী শকুন্তলা—ইঁহারাই আমার কুলের গৌরবভূতা থাকিবেন।'

একটু পূর্বে দেখিয়াছি, ভবী আপনার ভাব কিছুতেই ভুলে না—এখন দেখিতেছি, ভবাও আপনার ভাব ছাড়ে না। ক্ষত্রিয় রাজা আপনার পৃথ্বীপতিত্ব ভাব, এমন সম্মুখস্থা সন্তাপহারিণী নায়িকার সমক্ষেও ভুলিতে পারিলেন না। ভুলা দূরে থাকুক—কৈ গোপন করিতেও ত পারিলেন না। বরং অগ্রে সমুদ্র-মেখলা মেদিনীর কথা বলিয়া, পরে শকুন্তলার কথা বলিলেন। আর মেদিনীর বেলা তিনি বিশেষণে বিভূষিতা—বড় সহজ বিশেষণ নহে—'সমুদ্র-বসনা'—শত উর্মিতে শত-চন্দ্র-সূর্য-প্রতিফলিত সেই অনন্যসাধারণ চন্দ্রহার সুশোভিত গৌরবভরা ধরণী। আর শকুন্তলার বেলা—কেবল 'তোমাদের সখী'মাত্র—এ কি শকুন্তলাকে অবজ্ঞার ভাব? তা নয়—রাজার রাজভাষা—দুষ্মন্ত অদ্য সদ্যঃ-প্রস্ফুটিতা নায়িকার সেবক বটেন, কিন্তু দুষ্মন্ত যে রাজা, তা কি দুষ্মন্ত কখন ভুলিতে পারেন? যখন প্রথম দৃশ্যে আমরা দুষ্মন্তকে শকুন্তলার সমক্ষে প্রথম উপস্থিত হইতে দেখি—তখনও দেখিয়াছিলাম, তিনি রাজার মতন ভয়-ত্রাতার রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন—আজি তিনি শকুন্তলা-পরিগ্রহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন, আজিও তিনি তাঁহার সেই রাজভাব ভুলেন নাই, লুকান নাই—বরং স্পষ্টত প্রকাশই করিতেছেন। বলিহারি, কালিদাস! তোমার পাকা ঘটকালি!

(অন্তরা)

রাজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা একটা ছল করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল—শকুন্তলা বলিলেন, 'আমাকে অসহায় করিয়া তোমরা এখান হইতে যাইও না।' সখীরা বলিল, 'পৃথিবীনাথ যার পার্শ্বে বসিয়া, সেই ত অসহায় বটে!' রাজা যে পৃথিবীনাথ তাহা তিনি একটু পূর্বে নিজেই বলিয়াছেন—সখীরা সেই কথা আবার বলিয়া রাজার মান রক্ষা করিল, অবলার মান বাড়াইল। সখীরা চলিয়া গেলে শকুন্তলা বলিলেন, 'সত্য কি তোমরা গেলে নাকি?' রাজা বলিলেন, 'সুন্দরী,—তাহাতে উৎকণ্ঠা কেন? আমিই এখন তোমার সখী; বল কি করিতে হইবে—

স্নিগ্ধকর-জল-মাখা, লয়ে পদ্ম-পত্র-পাখা,
মন্দ মন্দ করিব কি বায়ু সঞ্চালন?
কিংবা ক্রোড়ে লয়ে মম, কোমল কমল-সম,
তব পাদ-পদ্ম বল, করি লো সেবন?'

শকুন্তলা যেন একটু বিরক্ত হইলেন, হইতেই পারেন—সোহাগ-সম্মিলন নাটকের চতুর্থ অঙ্কের 'দেহি পদ-পল্লব-মুদারম্' একেবারে প্রথম অঙ্কে আসিয়া উপস্থিত। শকুন্তলা নাটকের পাঠ জানুন আর নাই জানুন,—একটু রাগ করিতে পারেন বৈকি। শকুন্তলা প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। রাজা গতিরোধ করিলেন; শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, 'পৌরব! বিনয় রক্ষা করুন, ঋষিরা ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন।' রাজা বলিলেন, 'গান্ধর্ব-বিবাহ গুরুজনের অনুমোদিত; তুমি লতামণ্ডপ হইতে

বাহিরে যাইতেছ কেন?'—বলিয়া শকুন্তলাকে ছাড়িয়া দিয়া লতামণ্ডপে ফিরিয়া গেলেন। শকুন্তলা বলিলেন, 'পৌরব! আমি আপনার অভিলাষ পূরণ করিলাম না—সম্ভাষণ মাত্রে পরিচিতা রহিলাম, তথাপি আমাকে ভুলিবেন না।' রাজা বলিলেন, 'তুমি যতই কেন দূরে যাও না, আমার হৃদয় ছাড়া হইবে না—এই যে বৈকালে বৃক্ষের ছায়া কত দূরে যায়—তবু বৃক্ষতল ছাড়াইতে পারে কি?'

(আস্থায়ী)

এইবার সংস্থান পরিবর্তিত হইল। রাজা লতামণ্ডপে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—শকুন্তলা বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রাজা বলিতেছেন—

'শিরীষ-কুসুম-সম তব কোমল আকার—
শিরীষের বৃন্তসম হৃদি কঠিন আবার।—

তবে আর একা বসিয়া কি করি?'—ভাবিয়া যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনই সম্মুখে শকুন্তলার হস্তভ্রষ্ট মৃণালবলয় দেখিতে পাইলেন। বড় আদরে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন—বলিতে লাগিলেন, 'এই অচেতন লীলাভরণ তোমার রমণীয় ভুজ ত্যাগ করত এখানে থাকিয়া আমা হেন হতভাগাকে আশ্বস্ত করিতেছে—আর, প্রিয়ে! তুমি চেতনাবতী হইয়াও আমাকে কিন্তু আশ্বাস দিতে পারিলে না?' শকুন্তলা আর থাকিতে পারিলেন না—বলয়ানুসন্ধানচ্ছলে সম্মুখে আসিলে, রাজা বড় হৃষ্ট হইলেন; বলিলেন, 'এত কষ্টের পর দেবতারা ত প্রসন্ন হইবারই কথা, তাই জীবিতেশ্বরী আসিয়াছেন।' শকুন্তলা বলিলেন, 'বলয় লইতে আসিয়াছি।' রাজা বলিলেন, 'একটি কথা রাখিলে বলয় দিতে পারি।' শকুন্তলা বলিলেন, 'কি কথা?' রাজা বলিলেন, 'আমি যথাস্থানে পরাইয়া দিব।' শকুন্তলা—আর ত উপায় নাই—কাজেই সম্মতা হইলেন। রাজা বলিলেন, 'তবে এই শিলাতলের এক দিকে বসো।' তখন উভয়েই বসিলেন। রাজা শকুন্তলার হস্ত ধারণ করিলেন—স্পর্শে অবশেন্দ্রিয় হইলেন। শকুন্তলা বলিলেন, 'আর্যপুত্র! সত্বর হউন, সত্বর হউন।' রাজা বুঝিলেন, এই 'আর্যপুত্র' সম্বোধনে শকুন্তলার আত্মসমর্পণ। তখন রাজা বলিলেন, 'সুন্দরী! এই মৃণাল-বলয়ের জোড় ভাল মিলে নাই—তোমার অভিমত হইলে আমি অন্য প্রকারে যোজনা করিতে পারি।'—শকুন্তলা একটু হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার যেমন অভিরুচি।' রাজা কতই বিলম্ব করিতে লাগিলেন—শেষে বলিলেন, 'দেখ যেন ক্ষীণ চন্দ্র আকাশ ত্যাগ করিয়া মৃণাল-বলয়রূপে তোমার হস্তে আশ্রয় লইয়া জড়াইয়া রহিয়াছে।' শকুন্তলা বলিলেন, 'কর্ণোৎপলরেণু আমার চোখে পড়িয়াছে, আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।' রাজা বলিলেন, 'যদি বল ত ফুঁ দিয়া পরিষ্কার করি।' শকুন্তলা বলিলেন, 'আপনার অনুকম্পা বটে। কিন্তু অতদূর বিশ্বাস করিব কি?' রাজা বলিলেন, 'নূতন ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে না।' শকুন্তলা বলিলেন, 'ঐ অতি ভক্তিই চোরের লক্ষণ।'—তখন বামহস্তের দুইটি অঙ্গুলি দিয়া শকুন্তলার মুখ উত্তোলন করিয়া ফুৎকার দিতে লাগিলেন।—ইহাই আমাদের চিত্র।

(আভোগ)

সম্মুখে মালিনী নদী অনন্ত কমল-সম্ভার বক্ষে করিয়া দুলিতেছে, হেলিতেছে—মৃদুমন্দ চলিতেছে, আর মিটি মিটি করিয়া টিপি টিপি হাসিয়া কি যেন দেখিতেছে। মালিনী! আর দেখ কি! এই অপূর্ব যুগল-মিলনের সাক্ষী হইয়া তুমি জগতে অমরত্ব লাভ করিলে! তুমি সত্য সত্যই এখন হাসিতে পার। যতক্ষণ সন্তাপ-সন্দর্শন করিয়াছিলে, কৈ তুমি একবারও ত হাস নাই?—মধ্যাহ্নের সূর্যরশ্মি-প্রপীড়িত কমলিনীকে বক্ষে করিয়া কেবল মর্মবেদনায় কাঁপিতেছিলে। এখন সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছেন—তুমিও হেলিয়া দুলিয়া নিঃশব্দে যুগলমিলন দেখিতে দেখিতে চলিয়াছ। বেশ! বেশ!—দেখ—তুমিও দেখ, আমরাও দেখি—যে কখন দূতীগিরি করিয়াছে, এমন দিনে সেই আড়ি পাতিবার আনন্দ কি তাহা বুঝিতে পারে। প্রিয়ংবদা! অনসূয়া!—কোথায় গেলে?—কত দূরে?—বলি, মনে কিছু হিংসা ঈর্ষ্যা হয় নি ত? না, তা হবে কেন? হয় নি তা জানি,—তবে আহ্লাদীরা অত দূরে গেলে কেন? শুন আসিয়া ঐ যে রাজা কি বলিতেছেন—

চারুণা স্ফুরিতেনায়মপরিক্ষত কোমলঃ।
পিপাসতো মমানুজ্ঞাং দদাতীব প্রিয়াধর॥

এখন কি কেবল 'অনুজ্ঞাং দদাতি?' ইহার পূর্বে যে বলিয়াছিলেন—

পিপাসা-ক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বু পক্ষিণা।
নবমেঘোজ্ঝিতা চাস্য ধারা নিপতিতা মুখে॥

পিপাসা ত তখনও দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি—তবে এখন কেবল 'অনুজ্ঞাং দদাতি' হইয়াই থাকিবে কেন? ধারা নিপতিতা মুখে হয় না কেন? শকুন্তলা বলিতেছেন —'পরিজ্ঞান-মন্থর ইবার্যপুত্রঃ।' বাস্তবিক তোমার আর্য-পুত্র বড় পরিজ্ঞান-মন্থরই বটে! রাজা আবার কি বলিতেছেন?—

ইদমপ্যুপকৃতিপক্ষে সুরভিমুখস্তে যদাঘ্রাতম্।
ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ॥

কে তোমায় মাথার দিব্য দিয়া বলিল, তুমি গন্ধমাত্র লইয়াই চলিয়া যাও?

শুন, শকুন্তলা স্বয়ং হাসিয়া কি বলিতেছেন—

'অসন্তোষে পুনঃ কিং করোতি।'

শকুন্তলা—অসন্তুষ্ট হইয়াই বা কি করিবে?

রাজা—ইহাই করিবে। (চুম্বন)

জিতা রহো, দাদা!—এখন কালিদাসও নিষ্কৃতি পাইলেন, আমরাও পাইলাম। এমন করিয়া নিরর্থক আড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকা যায় না!

(উচ্ছ্বাস)

Rich the treasure,
Sweet the pleasure,
Sweet is pleasure after pain.

সেই সন্তাপ-সন্দর্শনের পর এই যুগলমিলন is sweet indeed—

Happy, happy, happy pair!
None but the brave,
None but the brave,
None but the brave
Deserve the fair.

এখন এই শকুন্তলার বাসরঘরে,
ডাক রে কোকিল পঞ্চমস্বরে।

যাও, মালিনী!—এখন গঙ্গার আশ্রয় লইয়া তোমার সাগরের অনুসন্ধান কর গিয়া—এখন নাচিতে নাচিতে যাও।—পোড়ারমুখী পাপিয়া! চিরকালই তোদের চোখ টাটাইবে, আর চোখ গেল বলিবি?—উহু উহু—হুহু হুহু হুহু—যা তোরা আকাশের প্রান্তে যা।—দিনমণি! বড় ঢলিয়া পড়িতেছ যে—ভাবিতেছ বুঝি যে—এত রৌদ্র কি কেবল তোদের বেতস-কুঞ্জের তরেই করিয়াছিলাম—এত উত্তাপ সমস্তই কি মন্ত্রবৎ মন্ত্রবলে শীতল হইল?—তা হবে বৈকি—এ যে প্রাণেপ্রাণে

যুগল-মিলন!

তিয়াস পিয়াসী অব্ পাই গেল শীতল বারি।
প্রাণে প্রাণে চরকি চরকি দুঁহে দুঁহু বদন নেহারি॥

শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা

(অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত) ১২৯৪

কবি না পাচক

১

আমি কবিদিগকে খাদ্যকার ব্রাহ্মণ মনে করি। যখন তাঁহাদের কাব্য পড়ি তখন আমার ভোজনপাত্রের কথা কেবলই মনে পড়ে। মনে হয় বুঝি চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় কতরূপ রসেই পাত্র পূর্ণ রহিয়াছে। মনে মনে

চুক চুক চুক চূষ্য চুষিয়া কচর মচর চর্ব্য চিবিয়া
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া চুমুকে চক চক পেয় পিয়া—

হরিষে অবশ অলস অঙ্গ হইয়া পড়ি। তাই ইচ্ছা হয় একবার সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া সে ভোজনের ব্যাপারটা দেখাই। কিন্তু ভয় হয় পাছে এত রকম-বরকম, তর-বতর আয়োজন দেখিয়া তাঁহাদের রসনা লালায়িত হয়।

কথাটায় কেহ হাসিও না। রস লইয়াই কাব্য, আর রস লইয়াই ভোজন। প্রকৃতি এক দিকে আমাদের রসনা সৃষ্টি করিলেন আর সেই সঙ্গে তাহার ভোগের জন্য, তাহার তৃপ্তির জন্য, সৃষ্টি হইল রস-তন্মাত্র। সুতরাং রসনার সহিত

রসের বড় নিকট সম্বন্ধ (অর্থাৎ খাদ্যখাদক সম্বন্ধ)। সেইরূপ আমাদের মনের রসনেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি হইল কাব্য। রস-তন্মাত্র হইতে মোটে ছয়টা মূল রস সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পর তাহার নানারূপ সংমিশ্রণ-বিমিশ্রণ-দ্বারা রস হইল তেষট্টি প্রকার। আবার মানুষের হাতে পড়িয়া ভাল পাচকের পাকে রস অনন্ত হইল—শেষে রস গড়াইল। তাই বুঝি নানা রসের খাদ্য দেখিলে রসনার রসও গড়ায়।

সেইরূপ কাব্যের রসও প্রথমে হইল নয়টি। প্রকৃতির নিয়মে যতই তাহা ক্রমপরিবর্তন-দ্বারা উন্নত হইতে থাকে ততই একের বহুত্ব হয়—বিশ্লেষণের কিছু বাড়াবাড়ি হয়। সুতরাং এই নয়টি রস হইতে আবার সংমিশ্রণাদির দ্বারা নানা প্রকার মিশ্ররসের সৃষ্টি হয়। শেষে কবি-সূপকারের হাতে পড়িয়া রসের অনন্ত পরিণতি হইয়াছে। এই কাব্য-রসে আর আস্বাদনরসে আবার অনেক সাদৃশ্য আছে। পাঠকের যদি রসাস্বাদনে ইচ্ছা থাকে তবে তাহার দুই-একটি নমুনা দিই।

আদিরস আর অম্লরস—আমি দুই একধাতুর মনে করি। দুই বেশ মুখরোচক কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে পীড়াদায়ক হয়—দাঁত টকে, আঁত টকে—নানা গোলযোগ বাধে। আবার যাহারা অম্বুলে রোগী বা রুচি-বায়ুগ্রস্ত তাহাদের পক্ষে অম্ল বা আদিরস বড়ই অনিষ্টকর। সেইরূপ করুণরস আর মধুররস দুই এক ধাতুর। ভোজন যেমন মধুরেণ সমাপয়েৎ করিতে হয়—মিষ্ট না হইলে যেমন জল গ্রহণ করা চলে না—কাব্যেও সেইরূপ কিঞ্চিৎ করুণরস দিয়া শেষ করিতে হয়। মিষ্ট ব্যতীত বাঙ্গালির আহার বৃথা, আর করুণরস ব্যতীত বাঙ্গালির কাছে কাব্য বৃথা। কিন্তু বাঙ্গালির মধ্যে বহুমূত্ররোগী বা অম্বুলে রোগী বড় বেশি। পঞ্চানন্দ বলিয়াছেন, বিনামূল্যে অম্বলের ঔষধ বিতরণের বিজ্ঞাপন দিলেই বাঙ্গালার লোক-সংখ্যা ঠিক করা যায়। সুতরাং এহেন বাঙ্গালিকে আমরা কিছু অল্প করিয়া আদিরস ও করুণরস আস্বাদন করিতে ব্যবস্থা দিই।

এইরূপ বীররসটা আমাদের তিক্তরসের সমান। বসন্তকালে যেমন তিক্ত খাইতে হয় শরীরটা একটু গরম করিবার জন্য সেইরূপ জীবনের বসন্তকাল যৌবনেও কিঞ্চিৎ বীররস আস্বাদনের প্রয়োজন—প্রাণটা একটু মাতানো চাই। আবার যেমন চিরজ্বরা বাঙ্গালির একস্ট্রাক্ট অব নিম ঔষধ সেইরূপ ভীরু, প্যানপেনে করুণরসের আধার বাঙ্গালির পক্ষে একটু বীররস মন্দ ঔষধ নহে। তবে নাটুকে ও যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি হাতুড়ের হাতে পড়িয়া ঔষধটায় বড় গুণ দেখিতেছে না। হাস্যরসটাকে আমরা লবণরস মনে করি। দুইটাই শুধু খাওয়া যায় না, কিন্তু সকল রসের সহিতই বেশ মিশ খায়। তবে লবণে আর মধুরে যেমন বিরোধ হাস্যে ও করুণে সেইরূপ বিরোধ আছে। এইরূপ বীভৎসরসে আর কষায়রসে, শান্তরসে আর অম্লমধুর রসে, অদ্ভুতরসে আর লবণাম্ল রসে, রৌদ্ররসে আর কটুরসে এবং ভয়ানকরসে আর কটুকষায়রসে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক এখন রসের কথায় আর কাজ নাই। একবার বাঙ্গালি কবি-সূপকারদের রন্ধন-ব্যাপারটা দেখা যাউক। আর যদি তাহা আস্বাদন করিতে ইচ্ছা হয় তবে সাবধানে করা চাই যেন পরিপাক হয়।

২

ক) আমাদের প্রথম কবি-পাচক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। কিন্তু ইঁহাদের কাব্যে পাকের কার্য বড় অধিক নাই। মানুষগুলা প্রথম অবস্থায় রাঁধিতে জানিত না—তখন মানুষ (cooking animal) পাচক-জন্তু হয় নাই। তাই বুঝি বাঙ্গালির আদি কবিদের কাব্যে রন্ধন-ব্যাপারটা দেখিতে পাই না। পূর্বে বাঙ্গালির সকের খাবার ছিল চিঁড়াদৈ। বাঙ্গালি তখন তাহাতেই ভরপূর হইত। সুতরাং বিলাতি মতে—অনুমান খণ্ডের সাহায্যে—ডারুইনের আবিষ্কৃত তত্ত্বের বলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বাঙ্গালি তখন পূরো সভ্য হয় নাই। যাহা হউক আজিও অনেক বনেদিঘরের বনেদি পর্বোৎসবে ফলারের ব্যাপারে চিঁড়াদৈয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে—বিশেষ পল্লীগ্রামের বড়ঘরে এখনও এ নিয়ম বলবৎ। এখনও পাড়াগাঁয়ে বিবাহের বরযাত্র গিয়া অনেকের ভাগ্যেই লুচির পরিবর্তে চিঁড়ার ফলারমাত্র জুটে।

সুতরাং বাঙ্গালির প্রথম কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যে আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইতে পারিবেন ইহা সম্ভব নহে। তাই বলি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কাব্য আমাদের চিঁড়ার ফলার। ইহার মধ্যে বিদ্যাপতির ফলার কিছু জাঁকালো রকমের। ইহাতে দৈয়ের বদলে ক্ষীর আছে—গুড়ের বদলে সন্দেশ আছে। যাঁহারা ফলারে ব্রাহ্মণ তাঁহাদের নিকটে এ ফলার বড়ই মধুর। যাঁহারা আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব তাঁহারা ইহার মধ্যে ভক্তিরস ছাড়া কিছুই দেখেন না। তবে যাঁহারা সে রসের রসিক নহেন, তাঁহাদের জন্য কবিরা কিঞ্চিৎ চিনি-পাতা-দৈ ও ভাল আনারসের চাটনিও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ চণ্ডীদাসের কাব্যও আমাদের চিঁড়ার ফলার। ইহাতে বিদ্যাপতির ন্যায় ক্ষীর-সন্দেশ নাই বটে, কিন্তু ভাল আমকাঁটালের রস আছে—সুতরাং ইহাও বড় সুতার। ইঁহাদের পরবর্তী গোবিন্দদাসের ফলারও বড় মন্দ নহে। সাদাসিদে হইলেও মাথার গুণে বড় মিষ্ট লাগে। আজকালের দিনে সভ্যতার খাতিরে অনেকে কাঁচা ফলারে বড় নারাজ। কিন্তু ভুক্তভোগিমাত্রই স্বীকার করিবেন, ইহা খাইতে যেমন মধুর, যেমন সুতার তেমনই স্নিগ্ধকারী অথচ আদৌ পীড়াদায়ক নহে।

খ) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরেই চৈতন্যের আবির্ভাব। লোকটা বড় রসিক। সমস্ত দেশময় নানারূপ রস ঢালিয়া গিয়াছেন। এ দিকে যেমন প্রেমঘৃতে পাক করিয়া, ভক্তিরসে মজাইয়া ভক্ত বৈষ্ণবদের উপাদেয় করিয়া গিয়াছেন, যেমন ভোজনে 'মাল্‌সি ভোগ', 'মাল্‌পো ভোগ' প্রভৃতি নানারূপ নূতন ভোগের ব্যবস্থা করিয়া—কাঁচা চিঁড়াদৈয়ের ফলারকে ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে একস্তর উঠাইয়া দিয়াছেন, সেইরূপ আবার কতকগুলি প্রেমিক ভক্তকে কবি করিয়া বাঙ্গালার পুরাণো কাব্যরসের এক নূতন অদ্ভুত রকমের পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন। এইসকল বৈষ্ণব কবিদের কাব্যমধ্যে জীব-গোঁসাইয়ের কড়চা, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত আর কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতই প্রধান। সংসারের একটা আশ্চর্য নিয়ম এই যে, সময়ে সময়ে একটা শক্তিই নানারূপে কার্য করিয়া নানাভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। সুতরাং সে কার্যগুলির মধ্যে একটা বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে; যে শক্তির ক্রিয়া হইতে মাল্‌সি ভোগের উৎপত্তি সেই শক্তিই রূপান্তর হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কাব্যের সৃষ্টি। তাই মাল্‌সি ভোগের সহিত এই সকল কাব্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মাল্‌সি ভোগ—এই কাব্যগুলিও তাই। যাঁহারা মাল্‌সি ভোগের মজা জানেন তাঁহারাই বুঝিবেন জিনিসটা কি উপাদেয়। এ রসে রসিক বৈষ্ণবগণ, বোধ হয়, অমৃত ফেলিয়া এই মাল্‌সি ভোগের আদর করেন। যাহা হউক যদি চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে, তবে প্রথমখানি মাল্‌সি ভোগ আর দ্বিতীয়খানিকে মাল্‌পো ভোগের সহিত আমরা তুলনা করিতে পারি। অনুরোধ করি, পাঠকগণ একবার সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া—সভ্যতার গর্ব ত্যাগ করিয়া এই উপাদেয় মাল্‌সি ভোগ ও মাল্‌পো ভোগ ভোগ করিয়া দেখিবেন; আশা করি, একবার খাইলে ছাড়িতে পারুন আর নাই পারুন কখন ভুলিতে পারিবেন না।

গ) তাহার পর রামায়ণ-মহাভারত। আমি মহাভারত-রামায়ণে বড় তফাৎ দেখি না; তবে মহাভারতে রকম অনেক বেশি—বৈচিত্র্যই ইহার প্রাণ, তাই কথায় বলে, 'ভারত ছাড়া কথা নাই।' রামায়ণে এত বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু রামায়ণের কবিত্ব কিছু উচ্চদরের। রামায়ণ—এই ভেতো বাঙ্গালির শাদা ডাল-ভাত—না হইলে আমাদের বুঝি একদিনও চলে না। ভাতের ন্যায় রামায়ণ আমাদের শরীর ও মনের পুষ্টি করে। ইহার দ্বারাই সাধারণ বাঙ্গালির চরিত্র সংগঠিত ও সংশোধিত হয়। আমরা শিশুকালে বর্ণমালা শিখিয়াই ঠাকুরানী দিদির কাছে বসিয়া পা ছড়াইয়া সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতে বসিতাম—বাটীর সকলে আসিয়া কাছে বসিয়া সে অপূর্ব কাহিনী শুনিত। এখন সে দিন গিয়াছে কিন্তু এখনও সামান্য দোকানদার হইতে সকলেরই রামায়ণ প্রধান পাঠ্যপুস্তক। তাই বলি, রামায়ণ আমাদের শাদা ডাল-ভাত, নহিলে এক দিন চলে না। সভ্য হইয়াছি মনে করিয়া যেন কেহ এই ডাল-ভাত উপেক্ষা করিও না, তাহা হইলে বাঙ্গালির জীবন বৃথা হইবে।

আর মহাভারত—সে ত গৃহস্থ বাড়ীর মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ। বাস্তবিক ইহাতে শাদা-ভাত হইতে আরম্ভ করিয়া পায়সান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি সমস্তই আছে—প্রাণ পরিতোষ করিয়া যত পার তত উদরসাৎ কর। কোন অপকার নাই অথচ বেশ উপাদেয়; তবে রামায়ণের শাদা-ভাতে রন্ধনে যেমন একটু বিশেষ রকমের মধুরতা—যেমন উপাদেয়ত্ব আছে মহাভারতে তত নাই। আর কর্মবাড়ীর নানারূপ তরিতরকারির মধ্যে যে সবই ভাল হইবে ইহা তোমার আশা করাই অন্যায়। গৃহিণী স্বামিপুত্রের জন্য কায়মনোবাক্যে অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে যাহা রাঁধিলেন তাহা সামান্য হইলেও ভোজনে যত তৃপ্তি হয় কর্মবাড়ীর পাঁচটার কারবারে গণ্ডগোলে—তাড়াতাড়িতে ততদূর হইবে কেন? যাহা হউক পাঠকগণ কি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন? আমাদের কিন্তু শাদা-ভাতের নিমন্ত্রণ করিতে ভয় হয়, পাছে সভ্যমহোদয়গণ সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন। আমরা জানি, ইঁহারা 'যগ্‌গী'-বাড়ী গিয়া শাদা-ভাত খাইতে বড় নারাজ; সুতরাং ইঁহাদের নিমন্ত্রণ করাও দায়, আর নিমন্ত্রণ করিলেও হয়ত লোক দিয়া দুইটাকা প্রণামী বা দক্ষিণা (তাও বটতলার অনুগ্রহে দশ আনা মাত্র) পাঠাইয়া দিবেন—নিজে সেমুখো হইবেন না। সুতরাং এরূপ লোকের যে কখন মহাভারত পড়া ঘটিবে সে বিশ্বাস আমাদের নাই। কিন্তু এইসব সভ্যলোককে আমরা নিমন্ত্রণ করি আর নাই করি, সাধারণ পাঠক ত সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন।

ঘ) এখন কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কথা বলি। চণ্ডী পড়িলেই আমার শ্রাদ্ধবাড়ীর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পাকা লুচির ফলার বা জলপান মনে হয়। লুচি বাঙ্গালির কাছে বড়ই উপাদেয়, বুঝি এমন ভাল জিনিস আর নাই। ফলারে ব্রাহ্মণ আধ-ক্রোশ দূর হইতে ত লুচির গন্ধ পায়, তাহার প্রাণ আন্‌চান করে, মন আহ্লাদে লাফাইয়া উঠে। শিকলে বাঁধা শিকারী কুকুরগুলা দূরে শিকার দেখিলে যেমন সমুখের দুই পা তুলিয়া শিকলে জোর দিয়া দাঁড়ায় লুচির গন্ধে মনও তেমনি করিয়া হামাগুড়ি দিয়া উঠে। এমন লুচি যে আমাদের প্রধান খাদ্য নহে, এ কথা কোন্ পাষণ্ড বলিতে সাহসী হইবে? চণ্ডীপাঠেও আমাদের মনে ঠিক সেইরূপ আনন্দ হয়—আবার লুচির ফলার জুটিল মনে হয়। বাস্তবিক ইহাতে এমনই পরিতৃপ্তি হয় যে, দুই-একদিন ভোজন না জুটিলেও চলিতে পারে। আজকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাতি অখাদ্যভুকের মধ্যেও অনেককে লুচির বিশেষ পক্ষপাতি দেখা যায়। স্বয়ং দত্তজা মহাশয়ই আমাদের কবিকঙ্কণকে দেশী 'চসার' মনে করিয়া লাল ফেলিয়াছেন।

ঙ) তাহার পর আমাদের মনসার ভাসান। মনসার ভাসান পড়িলেই আমার আরান্ধের (অরন্ধনের) পান্তা ভোজন মনে পড়ে। জিনিসটা সকলের ভাল লাগে না। বিশেষত যাহারা ছেলেবেলা শীতকালে সকাল বেলা রৌদ্রের দিকে পিঠ দিয়া, আলুপোড়া আর পান্তা ভাত না খাইয়াছে সে হয়ত চিরজীবনে কখন আরান্ধের পান্তা ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে না। তবে আজকাল অনেক বাবু বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে, আমপাকানে গরমের দিন সক করিয়া বিকালে ভিজা ভাতও খাইয়া থাকেন—শরীর ঠাণ্ডা হয়—বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ দূর হয়। আশাকরি, ইঁহারা আরান্ধের নিমন্ত্রণ অবহেলা করিবেন না, কারণ সে দিন মা মনসার বরে পান্তাভাত খাইতে বড় ভাল লাগে; আর তাহাতে আমোদও বিলক্ষণ আছে। দেশী লোক দেশী চালে, দেশী ধরণে, পুরাণো ধরণে যে রীতিটা রক্ষা করে, তা তুমি নিজে রক্ষা কর আর না কর তাহার উপর কখন নাক তুলিয়া তাকাইও না।

চ) এখন রামেশ্বরের শিবায়ন জিনিসটা কিরূপ দেখা যাউক। আমার মনে হয়, শিবায়ন আর সাড়ে আঠারো ভাজা দুই এক পদার্থ। ইহাতে নাই এমন জিনিস নাই। কোথায় শিবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইবে—না তাহার সহিত রুক্মিণীর ব্রত, রামনাম-মাহাত্ম্য, সতী-মাহাত্ম্য, নানারূপ ব্রতকথা, বাণ রাজার উপাখ্যান প্রভৃতি হরেক রকম পৌরাণিক উপাখ্যান আরও কত চুটকি কথাই ইহাতে বর্ণিত আছে। আবার গল্পগুলিও সহজভাবে লিখিত নহে। নানারূপ রং দিয়া নানা ঢংয়ে সাজাইয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার করা হইয়াছে। আমাদের সাড়ে আঠারো ভাজাও তাহাই—নানারূপ জিনিস লইয়া, তাহাদিগকে ভাজিয়া রূপান্তরিত

করিয়া একরূপ নূতন আস্বাদ করা হয়। ভাজাগুলি স্বতন্ত্র খাইলে তত ভাল লাগে না, ইহাদের সংমিশ্রণেই এত সুস্বাদু বোধ হয়—খাইতে লাগে ভাল। শিবায়নও তাহাই, ইহার এক-একটি স্বতন্ত্র গল্প তত ভাল হউক না হউক—সকলগুলির সংমিশ্রণে যে জিনিসটা হইয়াছে তাহা বড় সুন্দর। সাড়ে আঠারো ভাজা বাদ্‌লার দিন বড় ভাল লাগে, আর লোক-বিশেষের কাছে তাহার আদরের ত কথাই নাই। সাড়ে আঠারো ভাজার প্রধান উপকরণ চালভাজা আর মুড়ি, শিবায়নের মূল কাণ্ড শিবের উপাখ্যান। এক চালেই আমাদের চিঁড়া হয়, পায়েস হয়, পোলোয়া হয়, খিচুড়ি হয়—শাদা-ভাত হয়। এক শিবের উপাখ্যান লইয়াও তেমনি নানা কবি নানারূপ কাব্য লিখিয়াছেন। তবে রামেশ্বর শিবকে কৃষক সাজাইয়া, শাঁখারি সাজাইয়া, কুচনী-পাড়ার মধ্যে দেখাইয়া, কখন-বা ভগবতীকে বাগ্‌দিনী সাজাইয়া—নানা রঙ্গ করিয়াছেন। তাই বলি, শিবায়নের শিবচরিত আমাদের সেই চালভাজা; জিনিসটা বড় মজাদার হইয়াছে, খাইতে মন্দ লাগে না—কিন্তু আসল জিনিসটা বিকৃত হইয়াছে। সাড়ে আঠারো ভাজার আর এক মজা ইহাতে ঝাল আছে, কিঞ্চিৎ তিক্ত আছে, কিছু কিছু সব রসই আছে, নাই কেবল মিষ্ট আর কিছু অম্বল। শিবায়নেও কিছু কিছু সবই আছে, নাই কেবল করুণরস আর রীতিমত আদিরস। তাই বলি, শিবায়ন আর সাড়ে আঠারো ভাজা একই জিনিস।

ছ) আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে একজন প্রাচীন কবি নূতন পরিচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছেন। প্রাচীন 'মহাকবি' ঘনরাম সাহিত্য-সংসারে দেখা দিয়াছেন। সুতরাং এই কবি-পাচকের পরিচয় দিতে আমরা বাধ্য। ইহার শ্রীধর্মমঙ্গল পড়িলেই আমার পৌষপার্বণের কথা মনে পড়ে। পৌষপার্বণে পিঠা, পুলি, পায়েস প্রভৃতি নানারূপ খাদ্য-ভোজনে যে পরিতৃপ্তি হয়, ঘনরাম পড়িয়া সেই ফল পাওয়া যায়। বিশেষ যাঁহারা পূর্বাঞ্চলের পৌষপার্বণের নিমন্ত্রণের ব্যাপার জানেন, তাঁহাদের কাছে পৌষপার্বণ বড়ই আদরের সন্দেহ নাই। ঘনরামের চরিত্রগুলি প্রায়ই নীচশ্রেণী হইতে গৃহীত—পিঠেপুলির কোটা চালও তাহাই। তাঁহার কাব্যে বড় অধিক শিল্প-কৌশল আছে বোধ হয় না—পিঠেপুলি প্রস্তুত করিয়াও অবশ্য কোন গৃহিণীকে শিল্পে গর্ব করিতে শুনি নাই। যাহা হউক পিঠেপুলি যেমন খাইতেও মন্দ নহে, বিশেষ পাঁচজনে একত্র খাইতে বেশ আমোদ আছে, ঘনরাম পড়িতেও মন্দ নহে, বিশেষ পড়িলে শিক্ষা হয়, জ্ঞান লাভ হয়, পাঁচজনে একত্র হইয়া পড়িতে বা গান শুনিতে বেশ আমোদও আছে। পিঠেপুলির ভোজে ঝাল আর কটু ছাড়া সকল রসই কিছু কিছু পাওয়া যায়, তবে মিষ্ট রসের বড় বাড়াবাড়ি। ঘনরামেও রৌদ্র, বীভৎস ছাড়া আর সব রসই প্রায় কিছু কিছু মিলে, তবে করুণ-রসের কিছু বাড়াবাড়ি আছে। আজকাল এই সভ্যতার খাতিরে যদি কেহ পিঠেপুলি না-ঘৃণা করেন, তবে তিনি আনন্দের সহিত ঘনরাম পড়িবেন—সন্দেহ নাই।

জ) সে যাহা হউক এখন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কথা বলি। তাঁহার পদাবলির ন্যায় মধুর পদার্থ বুঝি সংসারে আর কিছুই নাই। পদাবলির নাম শুনিলে আমাদের কি এক অপূর্ব আনন্দ হয়, কি অদ্ভুত মোহ আমাদের মনকে অভিভূত করে, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণকে কিরূপ আকুল করে। ইহার তুলনা মিলে কি? সমস্ত জগতের সাহিত্যে বুঝি ইহার জোড়া নাই। যদি আমাদের অমৃত-আস্বাদনে অধিকার থাকিত, তবে বলিতাম, এ পদাবলি অমৃত বৈ আর কিছুই নহে। অন্তত যদি সোমরস কি তাহা বুঝিতাম, তবে হয়ত সেই সোমরসের সহিত ইহার তুলনা দিতাম। বাস্তবিক এইখানেই কবি-পাচক সাধারণ পাচককে হারাইয়া দিয়াছেন।

কবিরঞ্জনের কালীকীর্তন জিনিসটাও বড় সুন্দর। লোকটা অদ্ভুত রকমের ভক্ত ছিল—ভক্তিরসে নিজে যেমন গলিয়া যাইত তেমনি অন্যকেও গলাইতে পারিত। কালী-কীর্তনে সেই ভক্তিরসের ছড়াছড়ি, আমরা ভক্তিরসকে খাঁটি সন্দেশ মনে করি। ইহা প্রধানত করুণরস-দ্বারাই পরিপুষ্ট এবং ছানার কিঞ্চিৎ অম্লরস-দ্বারা প্রস্তুত। সুতরাং যদিও ইহাতে অম্লমধুররস পাওয়া যায়, কিন্তু ময়রার পাকের কৌশলে ইহাতে যে একরূপ নূতন সুস্বাদ হয়, তাহা সাধারণ অম্লমধুররসে মিলে না। যাহা হউক কবিরঞ্জন-কালীকীর্তনও

একশ্রেণীর সন্দেশ মাত্র। কবিরঞ্জন আমাদের নানারূপ সন্দেশের নমুনা দিয়াছেন, যথা—

ভক্ষ্য দ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা মনোহরা।

* * *

অপূর্ব সন্দেশ নাম এলাইচ দানা।

(বিদ্যাসুন্দর)

আমরা এই এলাইচ দানার সহিত তাঁহার কালীকীর্তন তুলনা করিতে পারি।

তাহার পর কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর। আমরা তাঁহার বিদ্যাসুন্দরকে ভুনি খিচুড়ি মনে করি। ইহাতে যেমন ঘি-মশলা বেশি আছে, তেমনি রন্ধনেও কিছু পারিপাট্য আছে। এইখানে বলিয়া রাখি, ভুনি খিচুড়িটা নেহাত দেশী রান্না নহে। বাঙ্গালা অনেক দিন ধরিয়া মুসলমানদের অধীন ছিল। এতদিনের সংঘর্ষে যে বাঙ্গালি মুসলমানদের কিছুই অনুকরণ করিবে না, ইহা সম্ভব নহে। বিশেষ মুসলমানী রন্ধন বড় পরিপাটী। নবাবী রান্নার বুঝি কোথাও তুলনা মিলে না। বাঙ্গালি এমন উৎকৃষ্ট রান্না (অজ্ঞাতসারেই হউক, আর জ্ঞাতসারেই হউক) অনুকরণ করিবে ইহা আশ্চর্য নহে। যাহা হউক যে নবাবী বা বিলাসিতার ফল এই নবাবী রন্ধন সেই বিলাসিতার ফলই মুসলমানী সাহিত্য। সুতরাং বাঙ্গালি কবি জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে সেই মুসলমানী সাহিত্যের অনুকরণ করিবেন ইহা আশ্চর্য নহে। তাই ভুনি খিচুড়ি যেমন মুসলমানী বাঙ্গালি রান্না, কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরও তেমনি মুসলমানী বাঙ্গালি কাব্য। খিচুড়িতে যেমন ঘি-মশলার সহিত রাঁধিবার কৌশল আছে বিদ্যাসুন্দরেও সেইরূপ ছন্দের পারিপাট্য, রচনার কৌশল, বর্ণনার কারিগরি আছে। খিচুড়ির যেমন জিনিসগুলি সবই দেশী—কোনটিই হিন্দুর অখাদ্য নহে, বিদ্যাসুন্দরেও তাহাই; প্রভেদ কেবল রন্ধন-কৌশল আর শিল্প-কৌশল লইয়া। যাহা হউক বোধ হয় ভুনি খিচুড়ী বা বিদ্যাসুন্দর উপেক্ষা করেন, এরূপ লোক কেহ নাই। আমরা পাঠকদের কবিরঞ্জনের ভুনি খিচুড়ি খাইতে অনুরোধ করি, ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে চাটনি আর শেষে মিষ্টান্নও যথেষ্ট পাইবেন—কোন ত্রুটি নাই।

ঝ) তাহার পর ভারতচন্দ্র। আমরা ভারতের অপূর্ব কাব্যকে ভাল পোলোয়া মনে করি। ভারত যে সম্বত পলান্ন খাওয়াইয়া 'হরিষে অবশ অলস অঙ্গ' মহাদেবকে নাচাইয়াছেন ···, তাঁহার কাব্য পড়িয়া আমরাও সেইরূপ আনন্দে বিভোল হইয়া যাই, তাঁহার নাচনি ছন্দের সহিত আমাদেরও তালে তালে নাচিতে ইচ্ছা করে। বাস্তবিক যেমন পোলোয়ার মত ভাল খাবার আমাদের আর নাই, তেমনি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে ভারতের অন্নদা-মঙ্গলের ন্যায় কাব্যও আর নাই। এমন সুতার মুখপ্রিয় জিনিস বুঝি আর প্রস্তুত হয় না। তবে পোলোয়ায় কিছু ঘৃতের ভাগ অধিক থাকে, সুতরাং মুখপ্রিয় হইলেও অধিক খাওয়া যায় না—শীঘ্রই মুখমেরে যায়; কিন্তু যাহা খাওয়া যায় তাহাই যথেষ্ট, তাহাতেই উদরের পরিতোষ হয়। শুধু তাহাই নহে, দুই-তিন দিন হয়ত পেট এমনি ভার থাকে যে, আর কিছু খাইতে ইচ্ছা করে না। ভারতের কাব্যে তাহাই—পড়িলে এত পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তখন আর কোন কাব্য পড়িতে ইচ্ছা করে না। আবার পোলোয়া যেমন বড় গুরুপাক—খাইলে সকল লোক তাহা হজম করিতে পারে না—বিশেষ যাহার অভ্যাস নাই তাহার বড় বিপদ্ হয়, সেইরূপ অন্নদামঙ্গলও। বিশেষ তাহার বিদ্যাসুন্দর অংশ সকলের পক্ষে পাঠ্য নহে, ইহা রুচিবায়ু-গ্রস্ত পেটরোগাদের পক্ষে বড় পীড়াদায়ক। যাহা হউক যদিও আমাদের দেশে পূর্বে পোলোয়া প্রস্তুত করা জানিত কিন্তু ইদানীং সকলে মুসলমান ধরণেই তাহা রাঁধিয়া থাকে। তাহার চাল, ঘি, মাংস, মশলা সকলই দেশী জিনিস সন্দেহ নাই, কোন হিন্দুরই তাহা খাইতে বিশেষ আপত্তি নাই তবে রান্নাটা নিতান্ত মুসলমানী ধরণের। যাহা হউক পোলোয়া রান্নায় রাঁধুনির বড় বাহাদুরি চাই; শতকে একজন লোকও পোলোয়া রাঁধিতে পারে না; ভারতের কাব্যেও যে অদ্ভুত শিল্প-কৌশল আছে, তাহা কয়খান কাব্যে দেখিতে পাই? বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই বলিলেও চলে।

যাহা হউক, আজকাল নব্যবাবুরা হিন্দুয়ানি মানেন না —পোলোয়ায় তাঁহাদের পলাণ্ডুর রস নহিলে চলে না, কিন্তু

গোঁড়া হিন্দুর তাহা অখাদ্য হইয়া পড়ে, তাঁহারা সে পোলোয়া স্পর্শ করেন না। ভারত তাঁহার অন্নদামঙ্গল-পোলোয়ায় পলাণ্ডুরস দেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার বিদ্যাসুন্দর চাট্নিটা মুসলমানী ধরণের করিতে গিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঐ রস দিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং গোঁড়া রুচিবীরগণের নিকট তাহা অখাদ্য হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার বর্ণনা-বিশেষকে আমরা পেঁয়াজের রস মনে করি,—তাহার উপর আবার স্থানে স্থানে রসুনের দুর্গন্ধও পাওয়া যায়। ভারতের চাট্নির মধ্যে তাঁহার রসমঞ্জরীটা সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু যাহাই বল, অনেকে কেবল চাট্নির খাতিরে বেশি পোলোয়া খাইতে পারে, সেইরূপ আমরা জানি অনেক লোক শুধু বিদ্যাসুন্দরের খাতিরেই অন্নদামঙ্গল পড়িয়া থাকেন। চাট্নি নহিলে বুঝি পোলোয়া-ভোজন সম্পূর্ণ হয় না। যাহা হউক নেহাত্ চাষা ব্যতীত কেহই পোলোয়ার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে না, আর নেহাত্ অরসিক ব্যতীত কেহই ভারতের কাব্যরস-পানে উপেক্ষা করে না, সুতরাং এ স্থলে সুপারিশ নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের পরেই আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান কাল। এ কালে ইংরাজি চালচলন, ধরণধারণ সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। বর্তমান যুগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই একমাত্র দেশী কবি ছিলেন—তাঁহার কাব্য আর মাছের ঝোল যে একরূপ তাহা পূর্বে নবজীবনে দেখানো হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ নবজীবন পড়িয়া বলিয়াছিলেন শুনিয়াছি, না, ও মাছের ঝোল হইতে গেল কেন? ও যে আমাদের ছেঁচ্ড়া! আমরা কি বলিব? —ভিন্নরুচির্হি লোকঃ, না, আত্মবন্মন্যতে জগৎ?

যাহা হউক আজ আমরা বর্তমান কালের বাঙ্গালি কবিদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। সে অনেক কথা, আবার তাহা বলিতে গেলেও অনেক গোল আছে—লোকের গায়ে লাগিবে। আজকাল আর সেকেলে গৃহিণী খুঁজিয়া পাই না। স্বামিপুত্র-সেবার জন্য, পাঁচজনের জন্য, কর্তব্য-বোধে কায়মনোবাক্যে হেঁসেলঘরের অন্ধকূপে বসিয়া ধোঁয়ায় নাকের জলে চোখের জলে হইয়াও মহা আনন্দের সহিত রন্ধন করে—এরূপ এখন কয়টা গৃহিণী মিলে? এখনকার বাবু-গৃহিণীদের রান্না কেবল সখ—কেবল নাম লইবার জন্য—আমি রাঁধিতে জানি, এই বাহাদুরি দেখাইবার জন্য। কালেভদ্রে কদাচ একদিন তাঁহারা রসুইঘরে প্রবেশ করেন মাত্র। শুধু তাহাই নহে—তাঁহাদের রান্না যেরূপই হউক ঢালাও প্রশংসা করা চাই—নহিলে নিস্তার নাই—তাহা না হইলে অভিমানে রাগে আর রক্ষা থাকিবে না। আজকালের কবিরাও সেই ধাতুর। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের কাব্যলেখা সখে—কর্তব্যবোধে নহে। তাহার উপর যদি কেহ তাহা মন্দ বলিল তবে রক্ষা নাই—সে এক মহাবিভ্রাট। এমন স্থলে আজ আমরা তাঁহাদের কাব্য-সমালোচনা নাই করিলাম।

তবে উপসংহারে একটা কথা বলিয়া রাখি। যে ইংরাজি শিক্ষার ফলে বিদেশী আচার-ব্যবহার অনুকরণ-প্রবৃত্তি আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, যে কারণে আমরা অখাদ্য-ভোজনে লোলুপ হইয়া চুপে চুপে গুপ্তদ্বার দিয়া উইল্‌সন হোটেলে যাইতে শিখিয়াছি, সেই প্রবৃত্তির বলেই দেশী ধরণে, দেশী ভাবে লিখিত বাঙ্গালি কাব্য আমাদের ভাল লাগে না। আমরা চণ্ডী ফেলিয়া চসার পড়ি, ভারত ছাড়িয়া পোপ পড়ি, চরিতামৃত ছাড়িয়া সনেট পড়ি। যেমন দেশী সূপকার আমাদের অখাদ্য-ভোজন-স্পৃহা-নিবারণ-জন্য 'শকুন্তলা হোটেল' খুলিলেন, গৃহিণী যেমন ফাউল করি রাঁধিবার জন্য স্বতন্ত্র হাঁড়ি কাড়িলেন সেইরূপ দেশী কবিও গতিক দেখিয়া কেহ ফাউল করি, কেহ পোটেটো চপ, কেহ মটন চপ, কেহ কট্‌লেট, কেহ রোস্ট রাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের জয় হউক।

নবজীবন ২য় ভাগ আষাঢ় ১২৯৩

হলধর ঘটক

হলধর ঘটক বড় তৈয়ার লোক ছিলেন। আয়-উপায় যৎসামান্য, কিন্তু তাহাতেই সদা প্রফুল্ল; তবে, 'ছি বাবা!' বলিয়া, কখন কখন চটিয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রফুল্লতা নষ্ট হইত না। তিনি সর্বদাই হাস্য-বদন;

কিন্তু সেই হাস্তের সঙ্গে শ্লেষ যেন সর্বদাই মাখানো রহিয়াছে। কথায় তিনি তুখড়। তিনি বলিতেন যে, কথা কাটাইতেই মনুষ্য-জন্ম, তা কথায় হটিলে মনুষ্যত্ব থাকে কৈ?

হলধর খুড়োর অনেক কাহিনী আমরা জানি, কিন্তু সামান্য লোকের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সভ্য-রীতির বিরুদ্ধ; কাজেই আমরা সকল কথা বলিব না। তবে গোটাকতক কথা না বলিয়াও থাকা যায় না।

দেশভ্রমণ হলধর খুড়োর একটা রোগ ছিল। এখনকার মত তখন এত রেলপথ হয় নাই, সুতরাং পদব্রজে কেবল এ-গ্রাম ও-গ্রাম করিয়া বেড়াইতেন। শুধু শুধু ত আর দেশভ্রমণ হয় না, লোককে বুঝানো দায়; তা'র উপর তেমন সংস্থানই-বা কৈ? কাজেই হলধর খুড়ো ঘটকালির একটা অছিলা করিয়াছিলেন। সেই অছিলায় বহুতর ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে কাহারও-না-কাহার অবশ্যই তাঁহাকে স্মরণ আছে।

প্রথম রেল হইতেই হলধর খুড়ো বর্ধমানে উপস্থিত। স্টেশন হইতে বাহির হইয়া ব্রাহ্মণ-মিঠাইওয়ালার দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান। বড় বড় খাজার দাম চারি পয়সা করিয়া; অতি অল্পই আছে, কয়জন খরিদ্দার বাছিয়া গুছিয়া বড় বড় দেখিয়া লইয়া গেল। হলধর খুড়ো বলিলেন, 'একখানা চারি পয়সার খাজা দাও ত বাবা।' মিঠাইওয়ালা সেই বাছ-পড়া খাজা হইতে একখানা দিল। খুড়ো বলিলেন,—'এ যে বড় ছোট হে বাপু!' মিঠাইওয়ালা বলিল, 'তাতে ক্ষতি কি? তোমায় বেশি বহিতে হইল না, ভালই ত।' খুড়ো আর দ্বিতীয় কথা কহিলেন না, পকেট হইতে তিনটি পয়সা বাহির করিয়া ময়রার হাতে দিলেন! ময়রা বলিল, 'মহাশয়, তিনটে দিলেন যে?' খুড়ো বলিলেন, 'তাতে ক্ষতি কি? বেশি গুণতে হইল না, ভালই ত।' মিঠাই-ওয়ালা একটা মোড়া বাহির করিয়া দিয়া বলিল, 'তামাক ইচ্ছা করিবেন না?' সেই হইতেই মিঠাইওয়ালা ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইল; যখনই বর্ধমানে যাইতেন, তাহার কাছে একদিন থাকিতে হইত।

হলধর খুড়ো রাজবাড়ী দেখিতে গেলেন। বড় বৈঠক-খানায় (এখন তাহা ভাঙিয়া মহাতাপ-মঞ্জিল হইয়াছে) সারি সারি রাজার পূর্বপুরুষদের চেহারা টাঙানো রহিয়াছে। প্রথমে আদি পুরুষের, তাহার পর তাঁহার পুত্রের, তাহার পর তাঁহার পৌত্রের ছবি কুলজিনামা-অনুসারে সাজানো রহিয়াছে। একখানি ছবিতে বেশ নধর সুন্দর গোলালো গোলালো একটি ছেলের মাথায় জরির তাজ, তাহার পরের খানিতে শাদা চোগোপ্পা, কপালে বয়সের ত্রিবলী। হলধর খুড়োর সঙ্গে পল্লীগ্রামের একটি লোক সব ছবিগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিল। এই দুইখানি ছবি দেখিয়া বলিল, 'মহাশয়, এ যে ছেলের বয়স বাপের বয়সের চেয়ে বেশি দেখিতেছি গা?' হলধর খুড়ো বলিলেন, 'তবে বুঝি পোষ্যপুত্র হইবে।' সে লোকটা বলিল, 'তাই হবে।'

হলধর খুড়ো শহরে বেড়াইতেছেন; রাজবাড়ীর বড় গাড়ী চারিদিকে খড়খড়ি আঁটা গড়গড় করিয়া চলিয়া গেল। একজন বলিল,—'যেন মড়া ফেলিবার গাড়ী করিয়াছে।' আর একজন বলিল, 'মেয়েদের জন্য গাড়ী ঐরূপই ত হবে।' হলধর খুড়ো বলিলেন, 'তবেই হ'ল!'

হলধর খুড়ো মাহেশের স্নান-যাত্রা দেখিতে আসিয়া বৃহৎ একটা কাঁটাল কিনিয়াছিলেন। বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছেন কাঁটালটা আর বহিয়া লইয়া যাইতে পারেন না। হন্ হন্ করিয়া একখানা ফেরৎ গোরুর গাড়ী যাইতেছে। হলধর গাড়োয়ানকে বলিলেন, 'বাবা, আমার এই কাঁটালটা তোর গাড়ীতে যদি নিস্—বহিতে আর পারি না।' গাড়োয়ান বলিল, 'তা ত নেলাম, তুমি গাড়ীর সঙ্গে আসতে পারবা কি?' হলধর বলিলেন, 'আমিও কাঁটালের সঙ্গে চেপে লব।' গাড়োয়ান হলধরের মুখের দিকে একবার দেখিয়া স্বীকার করিল। সেই অবধি হলধরে মামজুতে বড় প্রণয় হয়।

কিছুকাল পরে দেনার দায়ে মামজু গাড়োয়ানের দেও-য়ানী জেল হইল। মামজু গাড়োয়ান খুব মর্দ, খায়ও তেমনি। ডিক্রীদারকে রোজ চারি আনা মামজুর খোরাকী দিতে হয়। এমনই করিয়া প্রায় এক মাস গেল। ডিক্রী-দারের বিশ্বাস যে মামজুর কিছু আছে। হলধর খুড়ো মামজুর ঘরের খবর বেশ জানিতেন; প্রথমেই ডিক্রীদারকে বলেন, সে তাহা বিশ্বাস করে নাই। একমাস পরে হলধর

খুড়ো ডিক্রীদারের বাটীতে উপস্থিত ; অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'রায় মহাশয় ! এমন করিয়া দিন চারি আনা করিয়া পয়সা আর কত দিন দিবেন ? ইহাতে আপনারও ত ক্ষতি, মামজুর পরিবারদেরও ক্লেশ। আমি একটা ঠাহরিয়াছি, সেইরূপ বন্দোবস্ত করুন।' ডিক্রীদারের মুখ চক্ চক্ করিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল—টাকার একটা কিনারা হইবে। উত্তরে হলধর খুড়োকে বলিলেন, 'ভালই ত ; যা হউক একটা বন্দোবস্ত কর না। একটা লোক জেলে থাকে, তাকি আমার সাধ ?' হলধর খুড়ো বলিলেন, 'আমিও তাই বলি, আপনি মামজুকে খালাস দিয়া দিন। তাহাকে ছয় পয়সা করিয়া দিবেন, আর বাকি দশ পয়সা আপনার দেনার হিসাবে কাটিয়া লইবেন। কেমন, এ বন্দোবস্ত ভাল নহে কি ?' ডিক্রীদার একটু হাসিলেন। তিনি আর খোরাকীর টাকা জমা দিলেন না। মামজু খালাস হইয়া আসিল।

হলধর খুড়ো যাত্রা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যাত্রা শুনিবার জন্য তিন-চারি ক্রোশ পথ হাঁটা তাঁহার গায়েই লাগিত না। সকল অধিকারীর সঙ্গেই তাঁহার আলাপ ছিল ; দলের অধিকাংশ ছেলেও তাঁহাকে চিনিত। সেবার গোপীনাথপুরে বদন অধিকারীর দল যাত্রা করিতে আসিল ; সেই সময় হলধর খুড়ো সেই খানে। ভাগাভাগি করিয়া কয় ঘর ব্রাহ্মণের বাড়ী দলের লোকের মধ্যাহ্নের বন্দোবস্ত হইয়াছে। চারি-পাঁচটি ফুট্‌ফুটে ছেলে এক বাড়ীতে তিনটার সময়ে আহার করিতে বসিয়াছে। হলধর খুড়ো হুঁকা হাতে করিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন ; প্রাচীনা বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা পরিবেষণ করিতেছেন। বয়োজ্যেষ্ঠ বালককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাবা, তোমরা এত রোগা কেন ?'

বালক। মা, নিত্য রাত্রি-জাগরণে কি আর শরীর থাকে ?

ব্রাহ্মণী। বাছা, তা তোমরা কি পাও ?

বালক। কি পাব মা ? এ বেলা এই তোমার এখানে প্রসাদ পাইলাম, রাত্রিতে চারিটি জলপান। আর পালে-পার্বণে টাকাটা সিকেটা পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণী। যদি পাওয়া-থোওয়া নাই, তবে এত কষ্ট কর কেন ?

বালক উত্তর দিতে পারিল না, নীরব রহিল। হলধর একমনে উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনিতেছিলেন। এতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণকন্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—'তা দিদি, বিদ্যা শিখিয়াছে, জাহির করিতে ত হইবে !' ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'তা বটে।' তখন এত বাঙ্গালা খবরের কাগজ হয় নাই, এত কাগজওয়ালাও ছিলেন না,—থাকিলে হলধর খুড়ো ঐ কথাই বলিতেন,—'বিদ্যে শিখেছে, জাহির করিবেন না।'

হলধর খুড়োর সর্বত্রই গতিবিধি ছিল ; তবে তিনি আইন আদালতের বড় ভয় করিতেন। ১৯ আইন জারি হইলে, হলধর খুড়ো প্রায় মাসাবধিকাল বিষণ্ণ ছিলেন। ইহার পূর্বে এত দীর্ঘকালের জন্য তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদ কখনই জায়গা পায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বারই তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হয়। তখন ইংরাজিওয়ালা উকিলের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ঢেরা করিয়া বুকে উড়ানী দেওয়া শামলা-মস্তক জীবশ্রেণীর সেই প্রথম অভ্যুদয়ের কাল। উকিলবাবু চক্ষু কট্‌মট্ করিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, তোমার কাছ থেকে সেই জায়গা ঠিক কতদূর বল দেখি ?' হলধর খুড়ো ধীর শান্তভাবে উত্তর করিলেন, 'দশ হাত দশ আঙ্গুল।' উকিলবাবু এবার হাসিয়া গ্রীবা বক্র করিয়া বলিলেন,—'এত ঠিকঠাক জানিলে কি করিয়া ?' হলধর খুড়ো পূর্বমত বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—'দুষ্ট লোকে সওয়াল করিবে বলিয়া মেপেছিলাম।' হাকিম গোপীনাথবাবুর সহিত সেই অবধি হলধর খুড়োর আত্মীয়তা হয়। গোপীনাথবাবু এজলাসে আপনার সম্মুখে হলধরবাবুকে বসাইয়া রাখিলেন। মধ্যে মধ্যে একটি আধটি কথা চলিতে লাগিল। এমন সময় পুলিশের এক দারোগাবাবু সাক্ষ্য দিতে আসিলেন। মোকদ্দমা পুলিশের সংসৃষ্ট নয়। তবু দারোগাবাবু সোঁসাজে আসিয়াছেন ; ভাবটা আপনার গৌরব দেখানো। আবার সেই উকিলবাবু জেরা করিতে আসিলেন। তিনি দারোগাবাবুর পরিচ্ছদের উপর লক্ষ্য করিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া সওয়াল করিলেন,

'মহাশয়, হাঙ্গার কিরীচ হইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন কেন?' দারোগাবাবু সে সওয়ালের কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, হলধর খুড়ো হাকিমবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'তা বাবুদের কাছে আসিতে হইলে আপ্তসার করিয়া আসিতে হয় বৈকি। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আমাকেও রাম-কবচটা পরিয়া আসিতে হইয়াছে।' উকিলবাবু একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'প্রথম আলাপেই এত! আপনার দেখিতেছি খুব সৌজন্যতা।' হলধর খুড়ো আপনার সেই মৌরশি হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'বাবুজি! অনর্থক কথা বাড়ান কেন?' উকিলবাবু সিনিয়ার ছাত্র; কোকিলের 'ফেমিনিন' 'মেদী কোকিল' লিখিয়া বাঙ্গালায় পাস হন। হলধর খুড়ো টোলে বসিয়া তামাক খাইতেন মাত্র; শুনিয়াছিলেন যে, 'সৌজন্য' কথার উপর আর 'তা' কথা হয় না।

উকিল, ডাক্তার উভয়ের উপরেই হলধর খুড়োর সমান ভক্তি ছিল! তিনি ডাক্তারদের কথা উঠিলে বলিতেন,—'যাহারা বাড়ীতে পা দিয়াই তোমাকে জিহ্বা বাহির করিয়া কালী হইতে বলে, তাহারা যে তোমাকে কালের উপরে সমর্পণ করিতে ব্যগ্র, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?' একবার গোপীনাথবাবুর সামান্য পীড়া হয়; ঔষধ খাওয়াইবার জন্য ডাক্তারবাবুর জেদাজেদি। শেষে তিনি বলিলেন, 'আপনি খান, উপকার না হয়, আমি আর আপনার বাড়ীতে চিকিৎসা করিব না।' হলধর খুড়ো বলিলেন,—'তবে আপনাকে ঔষধ খাইতেই হইতেছে; যেরূপ বন্দোবস্ত হইল, তাহাতে এ-দিকে না হয় ও-দিকে উপকার হতেই হবে।'

বাপ-পিতামহকে লইয়া লুকোচুরি, দোকানদারি—খুড়ো দুই-ই দেখিতে পারিতেন না। পূর্বপুরুষদের পরিচয়েই যাহাদের পরিচয়, নিজের পরিচয় দিবার কিছু নাই, তাহাদিগকে খুড়ো বলিতেন—'মুদ্দোফরাস।'—বলিতেন, উহাদের সমস্ত পুঁজিই শ্মশানে; শ্মশানের সমস্ত সংবল লইয়াই উহাদের ব্যবসা। আবার দীনদয়াল বড় দুঃখী ছিল; ছেলের চাকরি হওয়ায় কিছু বারফট্‌কাই আরম্ভ করে। হলধর খুড়ো একদিন একখানি পুরাতন কাশ্মীরী শাল গায়ে দিয়াছিলেন দেখিয়া দীনদয়াল বলে, 'কি বাবা, বৃদ্ধপিতামহের আমলের বমাল বাহির করিয়াছ যে।'— খুড়ো উত্তর দেন, 'ছেলের আমলের চেয়ে ভাল ত?'

হলধর খুড়োর গল্প আর কত বলিব—সে এক গঙ্গা। তেমনই কলকল, ছলছল; একদিকে তাহার ধস্ ভাঙ্গে, অন্যদিকে চড়া পড়ে,—তাহাতে কত মাটিময়লা হয়, আবার কত ফুলবিল্বপত্র ভাসে। তোমরা তাহার সব কথা শুনিতে পারিবে কি? হলধর খুড়োর কাহিনীতে দেশ-উদ্ধার নাই, বক্তৃতা নাই,—তোমাদের সাক্ষাতে আমাদের বলিতেই লজ্জা করে, তা তোমাদের শুনিতে লজ্জা করিবে না?

তবে হলধর খুড়োর কাছে এমন অনেক জিনিস ছিল বটে যে, সে সকল চিরকালই উপদেষ্টাদিগের পক্ষে উপদেশ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার ভাষা ও ভঙ্গি ভেদ করা অনেক সময় কঠিন। এক দিনকার একটা গল্প বলি—

বলরামপুরের বিজয়বাবুর বড় বেশি বিষয় আশয় নয়—চারি-পাঁচ হাজার টাকার মধ্যেই; অথচ ক্রিয়া-কাণ্ড, দান-ধ্যান, লোক-লৌকতায় বড় বড় বড়মানুষেরাও তাঁহার মত যশ লইতে পারেন না। একদিন হলধর খুড়োর সাক্ষাৎে সেই কথার উত্থাপন হইয়াছিল। অনেকেই বলিলেন যে, কিরূপে যে বিজয়বাবুর ওরূপ চালচলনে চলে, তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। হলধর খুড়ো বলিলেন,—'বিজয়বাবু যে আপনার বিষয়কার্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার চাকরি করিয়া থাকেন।' একজন বলিলেন,—'তা ত এতদিন জানি না; তাইত বটে, তা নইলে কুলায় কোথা হইতে? তা কোথায় চাকরি করেন?' হলধর খুড়ো বলিলেন,—'তিনি নিজের বাড়ীতেই মুহুরিগিরি করিয়া থাকেন।' তখন সকলে বুঝিল। আমাদের বিষয়ী পাঠকবর্গ-মধ্যে কেহ বুঝিলেন কি? যদি কার্যত বুঝেন, তবে তাহাই অদ্য আমাদের বিদায়ী দর্শনী। ইতি।

নবজীবন ২য় ভাগ ১২৯২

বদ্‌রসিক

বেতালা, বেসুরো বদ্‌রসিকের দল দিন দিন বড় বাড়িতেছে; আমাদের আর ভদ্রস্থতা নাই। সেকালের মত সদানন্দ লোক প্রায়ই দেখা যায় না; সেই চোখ-ভরা চাহনি, গাল-ভরা হাসি, প্রাণ-ভরা খুসি, তেমন মজ্‌লিস্‌-ভরা লোক, কৈ আর ত প্রায়ই দেখিতে পাই না। এখন দেখিতে পাই—কেবল কতকগুলা হিংসে-ভরা, রগ্‌টেপা, ক্রূর-কটাক্ষ, বিষদিগ্ধ, বেতালা বেসুরো বদ্‌রসিক।

হচ্ছে হেমবাবুর কবিতার কথা—সেই বিষয়ে ভাল-মন্দ যাহা ইচ্ছা হয় বল, বড় রসিক বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয়,

'বঙ্গের বিধবা বিনা মধু কোথা কুসুমে'—

ইত্যাদি আওড়াইয়া দুটা রঙ্গ-রসের ব্যঙ্গ কর; না হয় বল—হেমবাবু বাঙ্গালির পিণ্ডার, রসের ভাণ্ডার, কবিকুল-গণ্ডার—তা নয়, মাঝে হইতে তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, এবার দুর্ভিক্ষে বর্ধমান জেলায় কয়জন লোক মরিল? লও, একেবারে 'ক সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়ামতিঃ' কোথায় হেমবাবুর কবিতা, আর কোথায় বর্ধমানের দুর্ভিক্ষ,—একেবারে ময়রানী হইতে বড়াল-গিন্নী। এমন বেতালা বদ্‌রসিক এখন অলিতে গলিতে। এদের জ্বালায় কোথাও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার যো নাই।

কতকগুলা আছে, তাহাদের আবার আপন কথাই পাঁচ কাহন। যে সকল গল্প তিন পুরুষ শুনিয়া আসিতেছি, সেইগুলা খামকা বলিতে থাকিবে; তাই যদি গুছাইয়া বলিতে পারে, তাহা হইলে আপত্তি কি। তা কৈ? চিবাইয়া চিবাইয়া বলিবে, আগাগোড়া উলট্‌-পালট্‌ করিবে, আর যেখানটা গল্পের জান্‌, সেইখানটাই ভুলিয়া যাইবে। বদ্‌রসিকের গল্প এইরূপ—

কৃষ্ণনগরের রাজার বাড়ীতে, জান, অনেক দিনের কথা—জান, গোপাল ভাট নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার দুই স্ত্রী ছিল; তা জান, তার ছোট স্ত্রী বড় সুন্দরী। গোপাল ভাট বড় উপস্থিত বাগ্মী ছিল। তা জান, রাজা একদিন সেই ছোট স্ত্রীর কথা মনে করিয়া বলিলেন, 'ভাটজী, তোমাদের ওখানে নাকি বৌ বিক্রী হয়?'—ভাটের উপস্থিত কবিতা, ভাট বলিল,—'তা হয় বৈকি।' * এই ত গল্পের শ্রী; তাহার উপর তৎক্ষণাৎ একখানা ভয়ানক হাসির ঘটা,—স্থূল জিহ্বা উল্টাইয়া তালুর কাছে লইয়া গিয়া, বদন ব্যাদান করিয়া বটব্যালের মত একটা বিকটাকার হাসি। হাসির সেই ব্যালোল তরঙ্গে তখন সেই রস-ঘাতকের উপর ঘৃণা ভাসিয়া যায়; বাতুলের বিকৃতিতে আমাদের পশু-প্রকৃতি যেমন মধ্যে মধ্যে হাসিয়া উঠে, সম্মুখের সেই বিকৃতি দেখিয়াও তখন আমরা সেইরূপ হাসি হাসিয়া উঠি! বদ্‌রসিক মনে করে, বড় রসিকতাই বুঝি হইয়াছে।

বদ্‌রসিকের গল্পও যেমন, গানও তেমনই। বিবাহ-বাসরে গান করিবে,—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর—
অন্যে কথা কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

বাইজির সাম্‌নে গিয়া, তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিবে,—

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারই।

শ্যামাপূজার রাত্রিতে হোরির গান গাইবে,-

শ্যাম মতে মার পিচিকারী হো,
ভিঙ্গি গেই মেরি নীল শারী হো।

আর ঝুলনের রাত্রিতে গাইবে,—

নীলবরণী নবীনা রমণী,
নাগিনী-জড়িত জটাবিভূষণী।

বদ্‌রসিকের কাছে সুরের তাল নাই, লয় নাই, রাগের

* গল্পটি শাস্ত্রোক্ত মতে এইরূপ—

উলার মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়কে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বৈবাহিক বলিতেন; বৈবাহিক সম্পর্কে তাঁহার সহিত রসভাষ করিতেন। উলা ব্রাহ্মণ-কুলীন-মণ্ডলীর স্থান। কুলীনগণের কলঙ্ক চিরপ্রসিদ্ধ। কুলীন-কন্যাগণের কলঙ্ক-কথায় কটাক্ষ করিয়া রাজা মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, 'মুখুয্যে, তোমাদের উলায় নাকি বৌ বিক্রী হয়?' মুখুয্যে অমনই ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—'আজ্ঞে হাঁ, যখনই নিয়ে যাবেন!'

কাল নাই, অকাল নাই। এই সকল মহাপ্রভুদের গুণেই চৌতালে মালকোষের টপ্পা নাই এবং ঠুংরিতে কালাংড়ার ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

বদ্‌রসিকের গন্ধ-জ্ঞানও চমৎকার! টাকায় চৌষট্টি পয়সা, সুতরাং টাকার জিনিস সুগন্ধ, আর পয়সার জিনিস দুর্গন্ধ বলিয়া বদ্‌রসিকের ধারণা আছে। আমাদের বোধ হয়, বদ্‌রসিকের বিস্তার হওয়াতেই বড়বাজারে বাদামে-বরফি বিক্রয় হইয়া থাকে। ওরূপ দুর্গন্ধ দ্রব্য বোধ হয় দুনিয়ায় আর নাই। বাদামে-বরফি বড় মানুষের বৈঠকখানায় রূপার সাল্‌বোটের উপর হইতে স্বচ্ছন্দে বুক ফুলাইয়া বলিতে পারে,—

কি ছার পোকার গন্ধ ছারপোকা গায়ে!

অথচ সকল দিকেই রসজ্ঞতার অভাবে এইরূপ কদর্য পদার্থের ক্রমেই প্রাদুর্ভাব হইতেছে। খরতর জাফরানের জ্বালায় কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া মুখে আনা যায় না, পোলোয়ায় ম্যাজেন্টা দেখিলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে, আর খাদ্যদ্রব্যমধ্যে গন্ধদ্রব্য কস্তুরির বিস্তার দেখিয়া হতাশ হইতে হয়।

যখন তুমি দারুণ যম-যন্ত্রণায় কাতর, পরমাত্মীয়ের বিয়োগে ব্যাকুল—বেতালা তালকাণা সেই সময়ে আসিয়া তোমার কাছে তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনের আড়ম্বর বৃদ্ধি করিবার অভিলাষে ঋণ যাচ্ঞা করিবে; আর তুমি যদি তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় তাহার সামিয়ানাটি আনিয়া থাক, তবে সে আঁশপান্নার দিন রাত্রি দুপুরের সময় তোমার উঠান হইতে সেইটি খুলিয়া লইতে আসিবে।

ইহাদের সহিত পথ চলা, গাড়ী চড়া, নৌকা ভাসানো বড়ই বিড়ম্বনা। পথ চলিতে হইলে দশ পা গিয়াই পথ হাঁটার কষ্ট ব্যাখ্যা করিতে থাকিবে। —ধূলা বড়, আবুড়ো খাবুড়ো, টক্কর লাগে—রোডশেসের টাকাগুলা যায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সম্বন্ধীর উদরে—রাস্তার ধারে ভাগাড় কেন? এইরূপ ঘেন-ঘেনানি সমস্ত পথটা। শস্য-শ্যামলক্ষেত্রের উপর পবন-গমনে যে সবুজ সাগরের ঢেউ খেলাইতেছে, চক্ষু বুলাইয়া তাহা কখন দেখিবে না, দেখাইলেও বুঝিবে না; পথের পাশে কুলগাছের উপর আল্‌গোছ লতা সোণার ছাতার মত রহিয়াছে, সেওড়া গাছটিকে লতাপাতায় ঘেরিয়া সবুজ গোঁয়ারার মত করিয়া তুলিয়াছে, উহার উপরে তু-পাপড়ি শাদাফুলগুলি পুট পুট করিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে, কুল কুল করিয়া মাঠের জল আসিয়া খালে পড়িতেছে, তালপুকুরের ঘাটে বসিয়া পল্লীগ্রামের রূপসীরা একই কার্যে অঙ্গ-সংস্কার, হরিদ্রার শ্রাদ্ধ এবং অশ্লীলতা-নিবারণী সভার পিণ্ডাস্ত পিণ্ডশেষ করিতেছে,—যে কেবল পথের কষ্ট ভাবে, সে কি এ সকল ভালমন্দ কিছু দেখিতে পায়?

নৌকাতে ইহাদের কষ্ট তদধিক; আর সঙ্গীদের ত কষ্টের সীমা নাই। শুশুক ভাসিলেই হাঙ্গর, মেঘ ডাকিলেই সাইক্লোন, আর নৌকা নড়িলেই মহাপ্রলয়। কাহাকেও একটু থুথু ফেলিবার জন্য নড়িতে দিবে না,—নৌকা বান্‌চাল হইবে, নৌকা বসিয়া যাইবে।

রসহীন ব্যক্তিগণের সকল কার্যই এইরূপ। যাহার রসবোধ নাই, তাহার সাহস নাই, স্থৈর্য নাই, প্রফুল্লতা নাই,—কিছুই নাই। ইহাদের সহিত বাস করা অপেক্ষা বিরাগী হইয়া বনে যাওয়া ভাল; ইহাদের সহিত পথ চলা অপেক্ষা আলিপুর জেলের কয়েদী হওয়া ভাল।

গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্—আবার রসিকতা-ব্যবসায়ী বদ্‌রসিক আছেন; ইহারা কখন কথক, কখন লেখক, আর কখন-বা সমালোচক।

ইহাদের কথার নমুনা কতক কতক দেওয়া গিয়াছে; তুলনা ইহাদের অদ্ভুত। কবে তাঁহার পিত্তজ্বর হইয়াছিল, একবাটি পিত্ত বমন করিয়াছিলেন, তাই যেখানে যখন ভোজের নিমন্ত্রণে যাইবেন, সেইখানেই সেই পিত্তের সহিত তুলনা করিয়া মাছের ঝোলের ব্যাখ্যান করিবেন। আর 'শীতল যেমন আগুন', 'মিষ্ট যেমন নিম-বেগুন'—এ সকল বাঁদি বদ্‌রসিকতা ত চিরদিনই সমান কপ্‌চানো আছে।

রসবোধরহিত গুণধামগণ যখন লিখিতে বসেন, তখন খোঁজেন কেবল নূতন পন্থা। সকলেই কামিনীদিগের কোকিল-কণ্ঠের সুখ্যাতি করিয়াছেন, ইনি কাজেই প্রেয়সীর পাপীয়া-কণ্ঠ বড়ই পিয়ার করেন। কমলাকান্ত বলিয়াছেন,—মনুষ্য গাছের ফলের মত নানারূপ হইয়া থাকে; এই সকল লেখকেরা উদ্ভাবনী শক্তিদ্বারা নূতন কথার আবিষ্কার

করিয়া আস্ফালন করেন, বলেন,—মনুষ্য গাছের পাতার মত, তাহাতে শির আছে, ডাঁটা আছে, কখন হলদে, কখন কালো, কখন শাদা। 'জোনাকি-ব্রজ' এবং 'অঢের সৈন্য' ইহাদেরই ভাষা; আর মনুসংহিতা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মে আপন গালে চূণকালি মাখা ইহাদের রসিক ভাবের জ্বলন্ত পরিচয়।

সমালোচক ভাবেই বদ্‌রসিকের পূর্ণাবতার। এই বেশে তাঁহাদের বদ্‌সুর, বেতাল, ভগ্নকণ্ঠ, বিকৃত মুখভঙ্গি,—সকলই পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। 'ঘৃণা! ঘৃণা!' বলিয়া এই শ্রেণীর সমালোচকগণ আপনাদের রসজ্ঞতার পরিচয় দেন। লেখক যাহা বলেন নাই, ভাবেন নাই, সমালোচক তাহাতে তাহা আরোপ করেন, তাহার পর পেশাদারি রসিকতার সুরে লেখেন, —'এ হেন লেখক যখন এ হেন কথা বলিতে পারেন, তখন এ ঘৃণা কোথায় রাখিব?' সুরসিকের উত্তর দিবার ইচ্ছা থাকিলে অবশ্য বলিতে পারেন, 'সকলে যখন এ ঘৃণা তোমাতেই ন্যস্ত করিয়াছে, তখন তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এখানে সেখানে রাখিয়া গচ্ছিত ধন নষ্ট করিবে কেন? ঘৃণা যেখানে দশজনে রাখিয়াছে, সেইখানেই থাকুক।' ইহাদের মুখে যেমন 'ঘৃণা! ঘৃণা!' পেটেও তেমনই ঈর্ষা ও হিংসা। এঁরাই এখনকার দিনে মজ্‌লিসি লোক হইয়াছেন। প্রথমেই বলিয়াছি, এখন এই সকল রগ্‌টেপা, হিংসে-ভরা, কোটর-চক্ষু, বিষদিগ্ধ লোকের ক্রমেই প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ইহারা সকল কথাতেই একটু ঘৃণা-মিশ্রিত দন্তের হাসি হাসিয়া বলেন, 'হ'ল কি?'—আমরা বলি হ'বে আর কি?—অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্!

নবজীবন ১ম ভাগ ১২৯১

মশক

আ রাম! বড় বিরক্তই করিল যে! এই ঘরের কোণের মশাগুলা, আর এই সংসারের কোণের মশাগুলা। আজি কোথা মনে করিলাম যে, একটু মাত্রা চড়াইয়া একবার freedom এবং free will (অদৃষ্ট ও পৌরুষের) তর্কটা মীমাংসা করিব, না কোথা হইতে দুই কাহন ক্ষুদ্র পতঙ্গ আসিয়া শরীরের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া ডবল মাত্রায় নেশাটা একেবারে নির্মাত্র করিল।

সংসারের ক্ষুদ্র মশকগুলা আরও বিরক্তকর। কোন একটি বিষয়-কার্যের একটু সূত্রপাত করিয়া কেহ বসিল যদি, অমনি জঙ্গল কর্দম অন্ধকার হইতে পালে পালে পতঙ্গ উড্ডীন হইতে আরম্ভ হইল। মৃদু গুন্ গুন্ মৃদু গুন্ গুন্, ক্রমে দংশন ও শোণিত-শোষণ।

পুঁথিতে পড়িলাম যে, অতি অপরিষ্কার জল হইতে মশার উৎপত্তি হয়। বারাণসীস্থ জ্ঞানবাপীর অপূর্ব পয়োরাশির আস্বাদ ও আঘ্রাণের কথা তখন আমার স্মরণ হইল। হিন্দুধর্মের কল্যাণে ও আমার পূর্বজন্মের পুণ্য-ফলে, সেই উদক এক গণ্ডূষ আমি উদরস্থ করিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হইল। মনে হইল, সেই জ্ঞানবাপীর এক গণ্ডূষ জল আনিয়া এই জীবতত্ত্বের রহস্য পরীক্ষা করিব। কিন্তু জ্ঞানবাপী কাশীধামে, আর আমি অজ্ঞান পাপী নদী-ধামে। সুতরাং সে জল আমার অতীব দুষ্প্রাপ্য। তখন মনে হইল, বোধ হয় কালাপাহাড়ের ভয়ে বিশ্বেশ্বর সেই পথে পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার জল ঐরূপ সমল ও দুর্গন্ধ হইয়াছে। মানবই হউন আর দেবতাই হউন, পলায়নের পথে সৌরভ ছুটিবে কেন? সেই পথ অবশ্য আলোকহীন হইবে, তাহার বায়ু দূষিত হইবে, গন্ধ দুর্গন্ধ হইবে ও জল পঙ্কিল হইবে। তবে আমার স্বদেশে এমন জল বিস্তর পাইব; যে পথে নবদ্বীপ হইতে লাক্ষ্মণেও পলায়ন করেন, তাহাই আমার বঙ্গের জ্ঞানবাপী; সেই জল হইতেই আমার জীবতত্ত্বের পরীক্ষা হইবে। কিন্তু তাহার ত চিহ্ন দেখি না। সেই পথ থাকিলে আমি সেখানে একটি মেলা বসাইতাম। নব্যবঙ্গ-সন্তানকে একবার সেই ধূলা মাখাইয়া দিয়া বলিতাম, 'যাও বাছা, শ্রীক্ষেত্রে যাও; যে পথে তোমার ধার্মিক রাজা গমন করিয়াছেন, সেই পথে যাও।' তা—তাহারও কোন চিহ্ন নাই! বিশ্বেশ্বরের পথের জল আনিতে আমি যাইতে পারিলাম না, বঙ্গেশ্বরের পথের সন্ধান নাই। তবে এখন প্রসন্নর গোশালায় আশ্রয় লইতে হইল। স্বয়ং কমলা-

কান্ত অনেকবার সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন। সেই জলেও কার্য হইতে পারে। অমনি আমার চিরেতার শিশিটি ধুইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। প্রসন্ন আসিলে বলিলাম, 'প্রসন্ন! সে দিন তোমার সেই পাড়া-বেড়ানর পঙ্করসের সেই যে এক গণ্ডূষ দিয়াছিলে, মনে আছে ত?' প্রসন্ন যেন একটু অপ্রভিত হইয়া বলিল, 'ঠাকুর মহাশয়, আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার সে দুধ আপনাদের ঠাকুর দেবতার জন্য নহে। আপনার কি মনে হইল, কিছুতেই ছাড়িলেন না, তাহাতেই সে দুধ আপনাকে একটু দিয়াছিলাম।' প্রসন্নকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া আমি বলিলাম, 'আমি সে জন্য তোমাকে অনুযোগ করিতেছি না; তুমি যে-জল দিয়া সেই পঙ্করস প্রস্তুত কর তাহা আমাকে এই শিশিটির এক শিশি দিতে হইবে।' প্রসন্ন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ঠাকুর মহাশয়, আমরা কি দুধে জল দি?' আমি বলিলাম, 'তা যাই হউক সেই জল একটু দিতে হইবে।' আমি শুনিয়াছিলাম (বোধ হয় দেখিয়াও থাকিব) প্রসন্নর গোশালার নিভৃত কোণে মৃৎপাত্রে জল থাকিত, যাহারা দুর জ্ঞাতি-কুটুম্বগণকে দুধেবড়ি খাওয়াইবার জন্য সুলভ মূল্যে নির্জল দুধ লইত, প্রসন্ন তাহাদিগকে সেই গোশালার বাহিরে দাঁড় করাইয়া গাভী দোহন করিত। গোশালায় কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না; তাহা হইলে কাঁচা গাই চম্‌কিয়া উঠে। যাহা হউক প্রসন্ন আমাকে সেই অমৃত-কুণ্ডের জল প্রদান করিয়াছিল। শিশিটি আমি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলাম।

সূত্রবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট তাহার মধ্যে অনবরত উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া খেলা করিতে লাগিল। তল হইতে উর্ধ্বে উঠিতেছে, উর্ধ্ব হইতে তলে নামিতেছে; উঠিবার সময় যেমন ক্রীড়া, নামিবার সময় তেমনই ক্রীড়া। ক্ষুদ্র জীবের উত্থান-পতন জ্ঞান নাই। সূক্ষ্ম সূত্র-কীট উঠিতে পড়িতে লাগিল। আমি বসিয়া থাকি।

ক্রমে সেই সূত্রগুলি স্ফীত হইতে লাগিল, এক দিক্ কিছু স্থূলতর হইল। তখন সেই দিক্ মুখ বলিলে বলা যায়। পূর্বে সূত্র-কীটগুলি নিমেষ-কাল স্থির থাকিতে পারে নাই; এখন বয়ঃপ্রাপ্তে কথঞ্চিৎ স্থির হইল, আর জলের উপরি মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। দুই-এক-দিন পরে একটি মৃতবৎ ভাসিয়া রহিল, কচিৎ কিঞ্চিৎ চেতনা-যুক্ত বোধ হয়, কখনও-বা একেবারে জড়বৎ। আমার শয্যা হইতে উঠিতে কিছু বিলম্ব হয়, পরদিন উঠিয়া দেখি, একটি মশক শিশির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর জলোপরি একটি ক্ষুদ্র কীটনির্মোক ভাসিতেছে। একটি, দুটি, তিনটি, চারটি করিয়া ক্রমে আমার এক শিশি মশা হইল। আমার বিজ্ঞান-পরীক্ষার সার্থকতা অবলোকনে আমি পরিতুষ্ট হইলাম। একদিন নশীবাবুর গৃহিণীর স্বহস্তপ্রস্তুতীকৃত পায়স-পিষ্টক সেবনে চিত্তের কিছু প্রশস্ততা লাভ করিলাম। সুন্দর উদর-পূর্তি না হইলে মানবের উদারতা হয় না। সে দিন সন্ধ্যার পর উদার মনে একে একে ছিপি খুলিয়া সেই পতঙ্গগুলিকে বিপুল বিশ্বে বিচরণ করিতে দিলাম। শিশিটি সরকারদের ছাদের উপর ফেলিয়া দিলাম, চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। জীব-রহস্যোদ্ভেদ হইল। এইরূপে জন্ম যে জীবের, সেই জীব আমাকে আজি বিরক্ত করিল, আমার নেশা দূর করিয়া আমাকে লেখকের আসনে বসাইল। একেই বলে মানবের অহঙ্কার। But man is the Lord of Creation—but না yet!*

বাস্তবিক মনুষ্যের এই অহঙ্কারের কথাটি মনে হইলে এত মশার কামড়ে হাসি পায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বকলমে কলমবন্দী করিলেন, 'ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্।' ইংলণ্ডের অন্ধকবি লিখিয়াছেন যে,—

গদ্যে পদ্যে অচেষ্টিত সাধন সাধিব।

* শুনিয়াছি এই ইংরাজি কথা কয়টিতে ব্যাকরণের তর্ক আছে। দুইটি ইংরাজি অব্যয়ের তর্ক আছে। অব্যয় লইয়া এত বাক্যব্যয় করিতে কমলাকান্তের মত নব্যয় পারে,—ভব্যয় পারে না। বাতুল জ্ঞানবাপীর জল আনিয়া মশা করিতে যায়। সেই জল স্পর্শ করিলেই যে, জীব মুক্ত হয় তাহা জানে না! আর নবদ্বীপের শ্রীমহাপ্রভুর মেলার যে কিরূপ বিদ্রূপ করিয়াছে, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ।

আমাদের বাঙ্গালির সাহিত্য-বিপাক-বিপত্তে মধুসূদন শ্রীমধুসূদন লিখিয়াছেন,—

'—রচিব মধুচক্র
গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে
পান সুধা নিরবধি।'

মানবাবতার মহাপ্রভু হর্শেল লিখিলেন যে, 'মানব—সৃষ্টির মহাপ্রভু।' আমি কমলাকান্তও মধ্যে মধ্যে উত্তম পুরুষের গৌরব গান করিয়া থাকি। এ সকল কি হাস্যকর নহে? সত্য সত্যই কি মনুষ্য সৃষ্টি-কাণ্ডে একেশ্বর প্রভু? এই যে ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র প্রাণী আশীবিষ-বিষে তড়িৎ-গতিতে শমন-সদনে রপ্তানি হইতেছে,—yet man is the Lord of Creation! এই যে কোথাও একটি ক্ষিপ্ত শৃগালের দৌরাত্ম্য হইলে অমনি শত শত সাপ্তাহিক পত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকটিত হইতে থাকে,—yet man is the Lord of Creation! এই যে বিডন সাহেবের বেলবিডিয়র-বাসে চিত্র-প্রদর্শনের প্রথম দিনে, একটি শার্দূলের পিঞ্জর-দ্বার অবদ্ধ ছিল বলিয়া শত শত শ্বেত পুরুষ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইলেন, বিবিদের ত কথাই নাই,—yet man is the Lord of Creation! যে-মানব বাতবৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য অনবরত গুহা রচনা করিতেছে, কীট-পতঙ্গ-বিনাশের জন্য দিবারাত্র যন্ত্র সৃষ্টি করিতেছে, তাহার এরূপ আত্মগরিমা ভাল দেখায় না। সাগরের জল-বুদ্বুদ সাগরশাসক নাম ধারণ করিলে ভাল দেখায় না। ভীষণ মারীভয়ে গ্রাম নগর দেশ অঞ্চল নির্মানব হইতেছে, তবু বলিবে মানব সৃষ্টির একেশ্বর! ব্যোমদেবের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে চীন হইতে পীরু উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, তবু বলিবে মানব বিশ্বসংসারের একেশ্বর! দেবী ধরণীর হৃদয়াবর্তভরে উদ্গীরিত বহ্নি-রাশি জীব-কাকলি-পরিপূরিত জনপদ জলন্ত কবরে প্রোথিত করিতেছে, তবু কি বলিতে হইবে যে, মানব বিশ্বরাজ্যের রাজা। আর এই মৃদু-মধুর-তারস্বরানুকরণ-কারী অণুপতঙ্গে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে,—তথাপি আমাকে বলিতে হইবে যে, আমি ও আমার স্বজাতিগণ প্রকৃত ধরাধিপ। এ অনৃতবাদে কোন প্রয়োজন নাই। আমি সর্বেশ্বর বলিলেই যদি এই দুর্বৃত্তগণ দূরীভূত হইত, তাহা হইলে আমি স্বয়ং মশা-বিষয়িণী গাথা প্রকটিত না করিয়া, কমলাকান্তের স্তব রচনা করিতাম। কিন্তু এই দুর্বৃত্তগণ হর্শেলের ন্যায়-শাস্ত্রের বলবত্তা বুঝিতে পারে না। অতএব আজি আমি বাঙ্গালির ন্যায়-শাস্ত্রের সহায় গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে দূরীভূত করিব। বাঙ্গালির ন্যায়শাস্ত্রের অর্থ 'গালাগালি'। বড় ছোটকে গালি দিবে, ছোট বড়কে গালি দিবে, সমানে সমানে গালাগালি চলিবে, ইহার নাম argument বা যুক্তি। আমি এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া আজি কলির মশামেধ-যজ্ঞে এই পূর্ণাহুতি প্রদান করিলাম।

রে কীট-প্রসূত ক্ষুদ্র পতঙ্গ! অভিমানী মানবের তুই চির শত্রু, কমলাকান্তকে আর জ্বালাতন করিস না। কমলাকান্ত সন্ন্যাসী—অভিমানের সঙ্গে তাহার চিরশত্রুতা। দূর হ রে! পতঙ্গ-মশক। আর দূর হ রে! মানব-মশক।

ক্ষুদ্র কীট, তোর গুন্ গুন্ মধুর সমালোচন, তোর অকারণ পৃষ্ঠ-দংশন, নীরবে শোণিত-শোষণ—আর আমার সহ্য হয় না। তামস-প্রিয়! তুই অদ্য হইতে আর আলোকে দেখা দিস না। কোণ-প্রিয়! সমাজে যেন তোকে আর দেখিতে না হয়। সন্ধ্যামোদি! দিন-দেবের রাজত্বকালে তুই আর কদাপি নির্গত হইস না। কর্দমে, জঙ্গলে, বনে, পূতিগন্ধে, পয়োনালীতে তোর জন্ম—অন্ধকারে, নিভৃত লূতা-নিকেতনে, শয়নতলে তোর আবাস; পৃষ্ঠ-দংশনে আর শোণিত-শোষণে তোর আমোদ—পক্ষ হেলনে, পক্ষ কম্পনে মৃদু গুন্ গুন্ রব তোর তোষামোদ গান। কিন্তু কে তোর এ রবে মোহিত হইবে? যে হয়, সে হউক, কমলাকান্ত চক্রবর্তী কখনও মোহিত হইবে না। তোরা আমাকে জ্বালাতন করিয়াছিস। অল্পপ্রাণ পতঙ্গ! ক্ষীণ জীব! তুই প্রভাকরের প্রভায় নষ্টপক্ষ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'স, শীত-সঞ্চারে পলায়ন করিস, সমীরণের ঈষদ্বেগে কোথায় চালিত হ'স তাহার স্থিরতা নাই, দেবানন্দ সুগন্ধ সর্জরসধূমে তোর ধ্বংস হয়। রে কীটস্য কীট পতঙ্গাধম, অদ্য হইতে তোকে যেন আর সম্মুখে বা পৃষ্ঠে না দেখিতে হয়, আর অদ্য হইতে যেন কমলাকান্ত চক্রবর্তীকে সামান্য মশা-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প

হইয়া ভীষণ মহাদণ্ডুরে মসীবর্ষী ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপ না করিতে হয়। মশা মারিতে নিত্য কামান পাতিলে লোকে বলিবে কাপুরুষ কমলাকান্ত চক্রবর্তী।

বঙ্গদর্শন ৪র্থ খণ্ড ১২৮২

(কমলাকান্তের দপ্তর)

কুঞ্জ সরকার

ক

কুঞ্জ সরকারকে কুঁজো মহাশয়ও বলিত। তিনি বাস্তবিক কুব্জ ছিলেন। কুঁজো মহাশয়ের নামে ও আকৃতিতে এইরূপ সাদৃশ্য লইয়া রাঢ় অঞ্চলে একটা বড় গণ্ডগোল ছিল। একদিন একজন পড়ো গাছে চড়িয়া আমড়া পাড়িতেছিল, কুঞ্জ সরকার তাহাকে কিছু অতিরিক্ত ভর্ৎসনা করেন; শেষে বলিয়া ফেলেন যে, 'ঐরূপ মামড়া-ধরা গাছে চড়িয়াই আমার এহেন দুর্দশা, তুই আবার ঐরূপ গাছে উঠিলি!'

এই দিন হইতে মহাশয়ের নামের ও আকৃতির সাদৃশ্য লইয়া মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। মহাশয় যদি জন্মধারণের পর হইতেই কুঁজো নহেন, তবে উঁহার কুঞ্জ নাম হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের নানা জনে নানারূপ মীমাংসা করিত। কেহ বলিত, 'মহাশয় বড় সেয়ানা, কুঁজো হওয়ার পর হইতেই আপনার গ্রাম-বদল ও নাম-বদল করিয়াছে; মনে ভাবিয়াছে যে, লোকে ত কুঁজো বলিবেই, তবে কুঞ্জ নাম লওয়াই ভাল।' মুরুব্বিরা বলিতেন যে, উঁহার জন্মের পর গণকে গণিয়া বলিয়া দেয় যে, ও কুঁজো হইবে, তাহাতে বৃশ্চিকরাশিতে জন্ম, কাজেই বাপমায়ে ককারের নাম দিতে গিয়া আদর করিয়া কুঁজো বলিয়া ডাকিত। কেহ বলিত,—না, উঁহার মামড়া-ধরা আমড়া গাছ হইতে পড়ার কথাটা একেবারে মিথ্যা, ওটা পড়ো-শাসনের ছলনা। অমন মিথ্যা কথা, ও রোজ সাড়ে সতর গণ্ডা কয়। মীমাংসকেরা বলিতেন যে, ও বরাবরই একটু কুঁজো ছিল বটে, আমড়া গাছ হইতে পড়িয়া অবধি একেবারে কাঁদিশুদ্ধ কলাগাছ-ভাঙ্গার মত হইয়াছে। এইরূপে নানা জনে নানা কথা কহিত। রাঢ় অঞ্চলে কুঞ্জ সরকারের কুব্জাকৃতি লইয়া বড়ই একটা গণ্ডগোল ছিল। একজন গুরুমহাশয়ের নাম লইয়া একটা অঞ্চলের লোক গণ্ডগোল করিত, এ কিরূপ কথা? তাহা যদি না হইবে, তবে তাহার কথা কে লিখিতে যাইত? আরও ত শিক্ষক রহিয়াছেন, শ্লেট ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠ লইয়া, সেই কাষ্ঠখণ্ড আবার ছাত্রের পৃষ্ঠে ভাঙ্গিতেছেন, কৈ কাহারও নামে প্রবন্ধ লেখা গেছে কি? না, ক্ষণজন্মা লোক না হইলে তাহার স্থান-জন্মের কথা ভাবিবই বা-কেন? আর দশের কাছে শাদা কাগজ কালো করিয়া ছাপিতে যাইবই বা-কেন? না, কুঞ্জ সরকার এক সময়ের এক প্রদেশের প্রসিদ্ধ লোক বলিয়াই তাঁহার পরিচয় দিতে আমরা প্রয়াস পাইতেছি।

আমড়া গাছের ঘটনা না ঘটিলে, কুঞ্জ সরকারকে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘাকৃতি মানুষ বলা যাইত। এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মানুষ বলাই একরূপ কবিত্ব। তিনি দ্বিপদ হইয়াও প্রায় চতুষ্পদ। কোমরটা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে শরীরটা মাটামের মত হইয়াছে, হাত দুখানা আর একটু হইলেই ভূমিতে ঠেকিত। শরীরটা আসল তিন ভাঁজ। প্রথম ভাঁজ অবশ্য পা হইতে কোমর পর্যন্ত; ঠিক খাড়া। তার-পর কোমর হইতে কণ্ঠা,—দ্বিতীয় ভাঁজ; সমতল। তৃতীয় ভাঁজ মুখখানা; আবার বেশ খাড়া। সেই মুখের উপর দুই চক্ষু—

> সিঁদুর ত সবাই পরে,
> সিঁদুর কপাল-গুণে ঝল্‌মল করে।

মুখের উপর দুই চক্ষু, অনুমান করি, অন্ধ ও কাণার ছাড়া আর সকলেরই আছে। কিন্তু কুঞ্জ সরকারের সেই দুই চোখ, আর তোমার আমার চোখ? ভাষা সঙ্কীর্ণ; তাই সেই হৃৎপিণ্ড-পরীক্ষক লৌহশলাকাসমষ্টি-আধারের নামও চক্ষু, আমার কপালের নিচের এই পীতপিঙ্গল পরকলাও চক্ষু, আর, (কুরুচি বাঁচাইতে গেলে) ঐ ঘুম-মাখানো ঘুম-ভাঙ্গানো মন্ত্র মণিদ্বয়ও চক্ষু। বাস্তবিক কিন্তু এ সকল এক পদার্থ নহে। কুঞ্জ সরকারের চক্ষু জ্যোতির্ময়—এ কথা যে বলিতে হয়, বলুক, কিন্তু আমরা তাহা বলি না; কেন-না, আমরা জানি কুঞ্জ সরকারের ছাত্রদের বোঝা বোঝা শোলা আনিতে হইত এবং কোন দিন দৈবাৎ পড়োরা শোলা

পোড়াইয়া রাত্রির জন্য রাখিয়া না গেলে, পরদিন অন্তত দশ পনের জন কঠোর বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হইত। কুঞ্জ যে তীব্র দৃষ্টিতে লোকের চালের লাউ-কুমড়া দেখিতেন, তাঁহার চক্ষুতে তেজ থাকিলে অবশ্যই নিত্য লঙ্কাকাণ্ড ঘটিত। না, মহাশয়ের চক্ষু তেজোময় নহে, পূর্বেই বলিয়াছি ওদুটি কেবল নিরাকার লৌহশলাকাময়। সেই শলাকার দ্বারা তিনি লোকের হৃৎপিণ্ড মানসে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার মধ্যে ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, ভণ্ডামি কতটুকু আছে তাহা বুঝিতে পারিতেন। সেই চক্ষু নিয়তই ঘুরিতেছে,—দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, নিম্নে সকল দিকেই ঘুরিতেছে কিন্তু কখন উপর দিকে যাইবে না। অনেকে বলিত যে, কুঞ্জ সরকার ঐহিক, পারত্রিক কোনরূপ উপরওয়ালা মানেন না বলিয়াই তাঁহার দৃষ্টিও কখন উপরের দিকে উঠে না। কিন্তু কুঞ্জ সরকারের সম্বন্ধে ও-কথাটা যে বড় ধরা আবশ্যক, তাহা আমরা বিবেচনা করি না; কেন-না, তাঁহার চক্ষু উপর দিকে ঘুরিলেও দৃষ্টি কখনই ভ্রূ ছাড়াইয়া উঠিতে পারিত না। খড়খড়ি জানালার উপর বাহিরের দিকে দেওয়ালের গায়ে যেমন কাঠের গড়নের টপ থাকে, কুঞ্জ সরকারের খুব কালো খুব ঘন মোটা চুলের ভ্রূজোড়াটি সেইরূপ তাঁহার চক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। সেই ভ্রূকে আর দু'জোড়া গোঁপ বলিলেই চলে। সঙ্কল্পবাদীরা বলেন যে, চক্ষুতে কুটিকাটি না পড়িতে পারে, এই জন্য মনুষ্য-ললাটে ভ্রূ দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কুঞ্জ সরকারের বেলায় ধাতার সে সঙ্কল্প যে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়,—কুটিকাটা দূরে থাকুক টিকটিকি আরশোলাও মাথার উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িলে, সেই ভ্রূজালে বাধিয়া থাকিত। তারপর সেই নাসিকা, সে ত খগ-দর্প-নাসিকা নহে, নগ-দর্প-নাসিকা; অটুট, অনড়, অসাড়, মুখমণ্ডলের মাঝে সিংহল-দ্বীপের আদিম শিখরের মত দাঁড়াইয়া আছে, আর বন-জঙ্গল-কর্দম-পিচ্ছিল-পরিপূর্ণ দুই গুহা নিম্নে হাঁ হাঁ করিতেছে। আর সেই নাসিকার সেই পাঠশালার আট-চালার কলরবভেদী গর্জন! জড়জগতের কেমন আশ্চর্য কৌশল, সেই গর্জনেই ছাত্রগণের সন্ত্রাস এবং নিকটস্থ বাপীকুল-সমাগত যুবতী-প্রৌঢ়াগণের হাস্য-পরিহাস! গর্জনের পর বর্ষণ আছে বলিয়াই ছাত্রগণের গর্জনে সন্ত্রাস। আহারের পর কুঞ্জ মহাশয় একখানি পড়ো মাদুরি বিছাইয়া, চালার শালের খুঁটিতে একখানি পিঁড়ে লাগাইয়া, তাহাতে ঠেসান দিয়া বাম হাঁটুর উপরে দক্ষিণ পা রাখিয়া ভরপুর গুড়ক সেবা করিতে করিতে একেবারে বিশ্রাম করিতেন। চক্ষুর চঞ্চলতা ক্রমে সংবরণ করিয়া, স্তম্ভলম্বিত বেত্রদণ্ডে স্থাপিত করিতেন। তখন তদীয় সেই বেত্রনিহিত একদৃষ্টি দেখিলে ভাবুক অবশ্যই বুঝিতেন যে, কুঞ্জ মহাশয় সার বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইহকাল, পরকাল, সকাল, বিকাল —সকলই সেই বেত্রের ভরসা; বুঝিতেন যে, কুঞ্জ মহাশয় একান্ত মনে ভাবিতেছেন—

ত্বয়া বেত্রদণ্ড-করস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এই নিদিধ্যাসনের পর সমাধির গর্জন। গর্জন যদি হটাৎ একটু থামিল, তবেই অমনই পার্শ্বস্থিত ছপ্‌টি, প্রকৃতির বারি-বর্ষণের মত যেখানে সেখানে পাত্র-নির্বিশেষে ছাত্র-গণের শরীরে পতিত হইবে। সুতরাং গর্জনের পর বর্ষণ নিশ্চয় জানিয়া ছাত্রেরা গর্জনে বিষম সন্ত্রস্ত ছিল। আর, যুবতীর হাস্য-পরিহাস? তা পুরুষের অনেক গর্জনেরই ঐরূপ পরিণাম—কুঞ্জ সরকারের নাসিকার তাহাতে বিশেষ সৌভাগ্য বা 'দৌর্ভাগ্য' নাই। স্ত্রীলোকেরা জানিত যে, নিম্ন গহ্বরের গর্জনকালে উচ্চ কোটরের লৌহশলাকা সকল নিস্তব্ধ থাকে; তাঁহাদের সেই লাভ। অভ্যাসবশত গুরুমহাশয় নরনারী পশুপক্ষী এমন কি গাছপাথর পর্যন্ত তাঁহার পড়ো বলিয়া মনে করিতেন; সেই নব বেদান্ত-জ্ঞানেই তিনি বাপীকুলাগত রমণীকুলের উপর তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন। তাহারা কিন্তু ভাবিত যে, কাঁধের কাছে কাপড় একটু ছেঁড়া আছে, বাম পদের বাঁকমল একটু ঢিলা হইয়াছে, কপালের টিপ একটু বাঁকা হইয়াছে, দুষ্ট গুরুমহাশয় বুঝি তাহাই দেখিতেছে। মহাশয়ের সহিত নারীগণের বিরোধ হইবারই কথা। তা সকল দেশেই হয়, মহাশয়দের সহিত মহাশয়াদের বিরোধ ত চির প্রসিদ্ধ। বালিকারা পাঠশালার আশে পাশে দৌড়িয়া বেড়ায়, মহাশয় তাহা অবশ্য সহ্য করিতে পারিতেন না। কখন এক আধটিকে পড়ো দিয়া

ধরিয়া আনিতেন, তাহারা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইত, ছেড়ে দিলেই দূরে গিয়া এক চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে 'পোড়ারমুখো মহাশয়' বলিত।

যুবতীদের সহিত আরও ঘোরতর বিবাদ। কুঞ্জ public instructor অর্থাৎ সরকারি গুরুমহাশয়, যুবতীরা প্রত্যেকেই private tutor অর্থাৎ খাসগুরু। অথচ উভয়েরই মনে বিশ্বাস আছে যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই জগৎ-গুরু। এই প্রথম বিরোধ। তারপর কুঞ্জ মহাশয় কদাকার, কুব্জ, কঠোর; যুবতীরা কান্তিমতী, কমনীয়া, কোমলা। ইহাতে দ্বিতীয় বিরোধ। মহাশয় বেত্র-বল, মহাশয়াগণ—(বলিতেই হইতেছে) নেত্র-বল; আর বাড়াবাড়িতে কাজ নাই, সুতরাং যুবতীগণের সহিত মহাশয়ের নানাদিকেই বিরোধ। আর প্রৌঢ়ারা ত একেবেরেই গুরুমহাশয়কে দেখিতে পারিতেন না। সোণার গোপালের পিঠ যে দুবেলা দাগড়া দাগড়া করিয়া দেয়, তাহাকে কখন গোপালের মা ভাল বলিয়াছেন কি? না, এ দেশে মাতৃশরীরে শাসনের ভাব কখন দেখা যায় নাই। আমাদের দেশের ভদ্রসন্তানগণের দুর্দশা, প্রধানত মায়ের আদরে, ঠাকুমার প্রশ্রয়ে, পিসিমার গুণেই হইয়া থাকে। মা যে সেই মুখখানি কাঁদ কাঁদ করিয়া কোলে বসাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে কপাল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, 'হোক মেনে একটা যেন অকাজই করিয়াছিল, তা এমনই করে কি লাঞ্ছনা করে গা?—শরীরে কি একটু দয়া নাই?' সেই দিন হইতেই ছেলের পরকাল খসিতে লাগিল। —তা খসে খসুক,—আমরা কেন আসল কথা হইতে খসিয়া পড়ি?—প্রৌঢ়ারা গুরুমহাশয়কে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা—বালক, যুবক, বৃদ্ধ কেহই দেখিতে পারুক আর নাই পারুক, অথবা দেখিয়া হাসুক বা কাসুক, তাহাতে কুঞ্জ সরকারের বড়-একটা দৃক্‌পাত ছিল না। আটচালার মধ্যে হইলে, বেত্রপাত ছিল। যুবতীরা মহাশয়ের খাস রাজধানীর মধ্যে আসিতেন না,—তাই রক্ষা। গুরুমহাশয় কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতেন না, কিন্তু দুইটি পদার্থে তাঁহার হৃৎপাত হইত। বোস-বাগানের তলায় পথ দিয়া যাইতে হইলে দিনের বেলাতেই তিনি জড়সড় হইতেন, রাত্রিকালে সর্বত্রই তাঁহার সমান ভূতের ভয় ছিল।

খ

তোমরা সকলেই বলিতেছ কুঞ্জ সরকার ফুটিতেছে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ভরাভাদ্রের দুর্দিনের দুর্যোগ-সময়ে, তুমি কোন্ কুঞ্জে কয়টা ফুল ফুটন্ত দেখিতে পাও? কৃষ্ণকলি জলপ্রপাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে, দোপাটির চারা ডাঁটাসার—পাপড়িগুলা মাটিতে পোঁত পড়িয়াছে; রজনীগন্ধা নববিধবার মত বিষণ্ণ শুভ্রচ্ছদে নতমুখে চোখের জলে মাটি ভিজাইতেছে; গোলাপের বৃন্তগুলি আছে, পাপড়ি নাই; রাশীকৃত কুন্দ কাদামাখা হইয়া অনাদরে তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে।

আমাদের কুঞ্জ সরকারের সময়, রাঢ় অঞ্চলে এমনই দুর্যোগ, এমনই দুর্দিন। তখন ললাটী, কপালী, নাক-কাটী, বিশালী, চোরচণ্ডী, রণঝণ্ডী, রঙ্কিণী, শঙ্খিনী প্রভৃতি দেবীমূর্তিসকল দস্যুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়া জাগ্রদ্‌ভাবে শীধু-মাংস-পশু-প্রিয়া নামের সার্থকতা করিতেছেন। তখন বাগ্‌দী ডোম চৌকিদারে দিনে দুপুরে দীঘির পাড়ে হত্যা করে; নায়েব হিসাব করিয়া দারোগার জমাদারের বক্‌সির আপনার এবং উপরওয়ালার মাসোহারা গণ্ডা দস্যুদের স্থানে বুঝিয়া লয়। বিষ্ণুপুর-রাজের তিন শত ষাট শিব-মন্দিরে তখন দস্যুদলই নিত্য অতিথি। তখন মন্দিরের পূজারী দস্যু, সেবক দস্যু, কাম্‌দার দস্যু, ভাণ্ডারী দস্যু। সরকার বাহাদুর সিপাহী পাঠাইয়া এই দস্যুতা নিবারণের উদ্যোগী হইয়াছেন। ক্রমে বিষ্ণুপুরের উপর তাঁহাদের শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। ঘাটওয়ালি জমা একে একে বাজেয়াপ্ত হইতেছে; বিষ্ণুপুরকে বনবিষ্ণুপুর করিয়া মদনমোহন বাগবাজারে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার গুপ্ত বৃন্দাবন এরণ্ডবন হইতে লাগিল।

রাঢ়ের এমনই দুর্দিনে কুঞ্জ সরকারের আবির্ভাব বা স্থিতিভাব। তখন লাঠির জোরে রাঢ় অঞ্চলে যে ফুল যে ভাবে ফুটিয়াছিল, তাহার নামগন্ধ আমাদের কুঞ্জ সরকারে নাই। আর তোমরা যাহাকে 'ফুটন্ত' বল তাহাও কুঞ্জ সরকারে নাই। যদি অলৌকিক শক্তির হঠাৎ আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়রসে চক্ষু বিস্ফারিত করাই সহজ

সাহিত্য-পাঠের চরম আনন্দ বলিয়া তোমাদের ধারণা থাকে, তবে আমাদের কুঞ্জ সরকারে তাহা পাইবে না। তথাপি বলিয়া রাখি কুঞ্জ সরকার এক সময়ের এক অঞ্চলের প্রসিদ্ধ লোক।

কুঞ্জ সরকার ক্ষণজন্মা বলিয়া একব্রতী কিনা তাহা বলিতে পারি না, লোকে তাহাই বলিত; কিন্তু এতটুকু বলিতে পারি যে তিনি একব্রতী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। শাসনের সহিত শিক্ষাদানই কুঞ্জ সরকারের এক কার্য, এক ব্রত এবং সমস্ত জীবন। তবে জীবন-ধারণের জন্য দুই চারিটি নিত্য কর্ম ছিল বটে।

দিবা দ্বিপ্রহরের পর কুঞ্জ মহাশয় দরিয়া-দীঘিতে স্নান করিতেন। স্নানের পর একবার সেই ত্রিভাঁজ শরীর বক্র করিয়া সূর্য প্রণাম করিতেন; সেই তাঁহার একমাত্র প্রকাশ্য আহ্নিক। দিনান্তে একবারও সূর্যদেব দেখা দিলেন না, এমন হইলে, অবশ্য পাঠশাল বন্ধ থাকিত; কুঞ্জ মহাশয় সে দিন আহার করিতেন না। সেইজন্য লোকে আরও বিশ্বাস করিত যে, কুঞ্জ মহাশয় সূর্যোপাসক। স্নানের পর রন্ধন। পড়োরা যে দিন যাহা জোগাড় করিয়া দিবে, কুঞ্জ মহাশয় সে দিন তাহাই রন্ধন করিবেন। আহারের সঞ্চয়ভাণ্ড বা ভাণ্ডার কুঞ্জ মহাশয়ের ছিল না। তবে হাঁড়িতে দুটি পর্যুষিত অন্ন এবং তিজেলে একটু তেঁতুলের চাঁচি বার মাসই তাঁহার থাকিত। আহারের পর তাঁহার কেলো'কে দুই থাবা অন্ন দিতেই হইবে। কেলো কুকুর তাঁহার পুষ্যি পড়ো। কেলো কষিতে বা ঘুসিতে পারিত না বটে, কিন্তু মহাশয় তাহার সেই মহা ভ্রূ একটু কাঁপাইয়া, সেই অধরোষ্ঠের দক্ষিণ-কোণ একটু প্রসারণ করিয়া—একটু যেন গর্বে, একটু যেন আহ্লাদে বলিতেন, 'কেলো তরিবতে অনেক পড়োর চেয়ে ভাল।'

'নীতি' বা 'শিক্ষা' এই দুইটি কথা, গুরুমহাশয় চাণক্য-শ্লোক পড়ানর সময় ছাড়া বোধ হয়, আর কখনই মুখে আনিতেন না। তিনি বলিতেনও তরিবত্, বুঝিতেনও তরিবত্। পড়োর তরিবত্ ভাল হইলেই সে মহাশয়ের পরম প্রিয় হইত। যখন এরূপ কোন ছাত্রকে তিরস্কার করিতেন, তখন বলিতেন, 'সোঁদর গাধা।' যাহাদের তরিবত্ হয় নাই, তাহাদের বলিতেন, 'বাঁদর গাধা'। যে সব বয়স্ক ছাত্র তরিবতে তাঁহার প্রিয়, তাহাদিগকে বামে লইয়া বসিতেন এবং উল্লাসের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। নৌকা আঁকিয়া ফাঁড়ে দীর্ঘের মাপ বুঝাইতেন, 'ছাঁদে যত বাঁধে তত' কথার অর্থ বলিয়া দিতেন। রাস-মণ্ডলের চারিধারে থাকে থাকে ষোলশ' গোপিনী সাজাইয়া মধ্যে শ্রীমতীকে রাখিতেন। তাহার মধ্য হইতে থাক বদলাইয়া শ্রীকৃষ্ণ দুই শত গোপিনী লইয়া নিধুবনে গেলেন, অথচ শ্রীমতী দেখিতেছেন যে, সেই ষোলশ' গোপিনী তাঁহার সম্মুখেই আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেম-রহস্যের গণিত-রহস্য কুঞ্জ মহাশয় ধীরে ধীরে ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেন। সেই সময়, ছোট ছোট ছেলেরা এক দিকে দাঁড়াইয়া 'কুঞ্জ-খেলার' আর্যা বলিত—

দেখ, শ্রীরাসমণ্ডলে ছিল ষোলশ' গোপিনী।
মদনমোহন মাঝে, বামে বিনোদিনী।
হেথা দুই শত সখী তার পাইয়া ইঙ্গিত,
তমাল-কুঞ্জের আড়ে যায় আচম্বিত।
রাইকে, মদনমোহন বলে বচন মধুর,
ডেকেছে আমারে মধু মঙ্গল ঠাকুর।
আমি, ঝটিতি আসিব ফিরে সাঙ্গাতি শুনিয়ে,
যেখানেতে যত সখী দেখহ গণিয়ে।
তখন, দলে দলে রাখি সখী রাধিকা গণিল,
চৌদিকে চৌশত দেখি ষোলশ' বুঝিল।
হেথা বুঝিয়া লইল রাই সব সখীগণে;
দুই শত লয়ে কানু গেল নিধুবনে।
হোথা কুঞ্জ খেলে গোপীচুরি লীলা চমৎকার।
কুঞ্জ-খেল ভেঙ্গে দিল কুঞ্জ সরকার॥

এখনও তোমরা বেশ মুচ্‌কি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতেছ,—কুঞ্জ সরকার কুটিল না,—তবে তোমাদেরই জিজ্ঞাসা করি, কি ভাবে, কোন্ ছাঁদে, কোন্ ভাষায় কুঞ্জ সরকারকে ফুটাই বল দেখি?

কুঞ্জ সরকার সরোবরের কমলিনী নহে যে, ধীর-মলয়-সমীর-সঞ্চারে, গুঞ্জনমত্ত মধুব্রতের ঝঙ্কারে, প্রভাত-অরুণের তরুণ কিরণে ধীরে ধীরে ফুটাইতে থাকিব; সরোবরের ঘাটও

নহে যে, আগ্রীব-নিমজ্জিতা অর্ধাবগুণ্ঠন-গুণ্ঠিতা, দ্বাদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্তার চাঁদের হাট ঘাটে আনিয়া বাপীকূল প্রস্ফুটিত করিব। জল ছাড়িয়া স্থলে চল ;—কুঞ্জ সরকার বেলি চামেলি নহে যে, শ্বেত শোভায় হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যা-সমীরণে দুলিতে দুলিতে ফুটিয়া উঠিবে। রাজপথের ধারের দ্বিতল ভবনের বিস্তৃত গবাক্ষ নহে যে, কোলের ছেলে ফেলিয়া রাখিয়া, উনুনের হাঁড়ি আধ-সিদ্ধ নামাইয়া, মুক্তবেণী, যুক্তবেণী যুবতীগণকে ঘোম্‌টা খুলিয়া, লজ্জা উড়াইয়া, দলে দলে আনিয়া দিব ;—আর শতদলে উৎপল ফুটিতে থাকিবে। স্থল ছাড়িয়া অন্তরীক্ষে ;—কুঞ্জ সরকার আকাশের রাঙ্গা মেঘে ভাঙ্গা রোদের খেলা নহে যে, পশ্চিম দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাশি রাশি শিমুল, পারুল ফুটাইব। সাগরতীরের সন্ধ্যাকালের নক্ষত্র নহে যে, একটি করিয়া মিটিমিটি সরমের দিঠির মত, সেঁজুতির দেউটির মত নীরবে ফুটিতে থাকিবে। কুঞ্জ সরকার সীতাকুণ্ডের জল নয় যে, টগ্‌বগ করিয়া—তুবড়ির বাজী নহে যে, ফর্‌ফর করিয়া—ফুটিয়া উঠিবে।

কিন্তু মানুষ ত ফুটিয়া উঠে ? কুঞ্জ সরকার কেন সেই-রূপেই ফুটুন না ? তাহাও অসম্ভব। কুঞ্জ সরকার স্বামি-সমীপে প্রথম সমাগতা, নব-বিবাহিতা তরুণী নহেন যে, দুরু দুরু বুকে, অবনত মুখে, ধীরে ধীরে বসিয়া, লীলা হেলায় বস্ত্রাঞ্চল টানিতে টানিতে, সরমের আঁখি মরমের সগার দিকে উন্মীলিত করিতে করিতে, বনান্তরালের বনমল্লিকার মত মৃদু মৃদু ফুটিতে থাকিবেন। কুঞ্জ সরকার বাগ্বিদ্যাবিশারদ বাগ্মী নহেন যে, বঙ্গবাসিনী ব্যভিচারিণীর উপর সমাজের বিপুল যাতনা বর্ণনা করিয়া, হিন্দুজাতির তুষানল ব্যবস্থা করত, হিন্দু-শাস্ত্রসকলকে কলিকাতার কসাই টোলার চীনা-ম্যানদের বিপণিতে উপানতের আবরণ-উপকরণে পরিণত করিয়া, চোগা দোলাইয়া, বক্ষ ফুলাইয়া, দক্ষিণে হেলিয়া, উর্ধ্বহস্তে লম্বকণ্ঠে, বালক যুবকের খর করতালে দুলিতে দুলিতে উৎকট বিকট ভাবে ফুটিতে থাকিবেন। না, কুঞ্জ সরকারকে নীরবে, সরবে, গৌরবে, সৌরভে—কোনরূপেই ফুটাইতে পারিতেছি না।

ব্যক্তিবিশেষও বায়ুবিশেষে ফুটিয়া থাকে। ডফ্ ফুটিলেন হেমনাথ বসুর পালায়, ফীয়ার ফুটিলেন কালী বন্দ্যোর জ্বালায়। বীডন ফুটিলেন মহামারীর কটকে, ইডেন ফুটিলেন পাদরিনীর চটকে। নরেশ ফুটিলেন শালগ্রামে, রমেশ ফুটিলেন গুণগ্রামে। যতীন্দ্র ফুটিলেন ৯ আইনে, সুরেন্দ্র ফুটিলেন বেআইনে। শিবপ্রসাদ ফুটিলেন কৃতাঞ্জলিতে, ভূদেব ফুটিলেন পুষ্পাঞ্জলিতে। টম্‌সন ফুটিলেন ফিরিঙ্গি নাটে, রীপন ফুটিলেন কঙ্করডাঁটে। কিন্তু এরূপ ফুটনও ত কুঞ্জ সরকারের ঘটিবে না।

আর ফুটাইবার যে ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মার বরেই হউক, আর দুর্বাসার শাপেই হউক, এ দুইটার মধ্যে একটা কারণ অবশ্য হইবে, কুঞ্জ সরকারে তাহা খাটে না। ফুটনকারিণী রমণী-গণের সহিত কুঞ্জ সরকারের চিরবিরোধ, স্বামিবিরোধ এবং সুমেরু কুমেরু ভেদ। অভাগা কুঞ্জ মহাশয়কে ফুটানো মহা দায়। রূপ থাকুক আর নাই থাকুক, যদি একজন যেমন-তেমনও যুবতী সরকারিনী আনিয়া অর্ধরাত্রে ব্যজনীহস্তে কুঞ্জ সরকারের পাশে বসাইয়া বলাইতাম, 'তুমি ত রহিলে পড়োর পাল লয়ে, এখন মেয়ের বিয়ের কি হবে বল দেখি ? শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, বিরাজকে যে আর রাখা যায় না।' আর আমরা সেই সময়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পট তুলিতে পারিতাম, তবে দেখিতে কুঞ্জ সরকার ফুটিত কি না ফুটিত ?

তাও না হইয়া যদি মহাশয়কে কলির সত্যবান্ করিয়া একজন সাবিত্রী আনিয়া প্রান্তরস্থিত ভাঙ্গা ঘরে আধুনিক পশুপতি-সংবাদ যাত্রার সাবিত্রী-চতুর্দশী পালার উদ্যোগ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ফুটুক আর না ফুটুক ফুটিবার বাতাস ত লাগিত। যদি সে দিকের পন্থা থাকিত, তবে ঐ বৃহৎ রাঢ় অঞ্চলে, তেমন ডাঁটোখাটো না হউক একটা ভাঙ্গাচুরো গিরিজায়া আনিয়াও কি সেই কোমল হস্তের সাময়িক সম্মার্জনীর অবতারণা করিয়া কুঞ্জ সরকারকে একরূপ দিগ্বিজয় ফুটন ফুটাইতে পারিতাম না ? না, সে দক্ষিণ দিকের মলয় বাতাসের পন্থা গুরু মহাশয়ের আটচালায় নাই। আমাদের কুঞ্জ সরকার ফুটিবেন না, নাই ফুটিলেন। তোমরা কিছু সত্য সত্য বয়সের দায়ে সলমনের কীর্তি-প্রয়াসী নহ, তবে আধ-ফুটন্ত তাচ্ছিল্য করিবে কেন ?

নবজীবন ১ম ভাগ ১২৯১

সন ১২৯৬ সাল

সন ১২৯৬ সাল অদ্য শুভাগমন করিলেন। পুরো একটি বৎসর সংসারে বাস করিয়া তাহার পর ইনি পঞ্চানন্দের স্কন্ধ ছাড়িবেন। বর্ষে বর্ষে তোমরা নূতন পঞ্জী সংগ্রহ করিয়া থাক, সুতরাং তোমাদের পক্ষে ইহা নূতন সংবাদ; কিন্তু প্রাচীন পঞ্চানন্দ এই পুরাতন তথ্য পুরাকাল হইতেই অবগত আছেন। সন ১২৯৬ সাল অদ্য আসিলেন, এক বৎসর তিষ্ঠিবেন; তাহার পর তোমার-আমার সকলেরই যে দশা, তাঁহারও তাই—সেই দেহান্তরপ্রাপ্তি। চাও না চাও, বিশ্বাস কর আর নাই কর, নিশ্চয় দেহান্তরপ্রাপ্তি। তবে এক বিষয়ে প্রভেদ আছে—তোমার-আমার পাপ-পুণ্য আছে, ভোগ-রাগ আছে, যোগ-যাগ আছে, ১২৯৬ সালের সে-সব কিছু নাই। তুমি-আমি ঠিক স্বধর্ম পালন করি না, হয় কঠোর তপস্যা করি, না হয় উৎকট পাপ করি; হয় অকালে কাল-প্রাপ্ত হইব, না হয় কালের মাত্রা ছাড়াইয়া চলিয়া যাইব। ১২৯৬ সাল কেবল স্বধর্ম পালন করিবেন। অকপটে, বিনা-বিচারে, বিনা-তর্কে স্বধর্ম পালন করিবেন, করিয়া পরিতুষ্ট হইবেন। তাই তাহার পরমায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। হইবার মধ্যে হইবে কালের বশে যথাকালে তাহার দেহান্তর-প্রাপ্তি। তোমার-আমার যেমন, এই ১২৯৬ সালেরও তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তি অপরিহার্য এবং অনিবার্য।

আপনি আসিয়াছেন।

সন ১২৯৬ সালকে কেহ ডাকিয়া আনে নাই, ডাকিতে গেলেও তিনি আসিতেন না, আসিতেও কেহ বারণ করে নাই, বারণ করিলেও তিনি মানিতেন না। আবাহন নাই, বিসর্জন নাই, অভ্যর্থনা নাই; অবহেলা নাই, কলঙ্কও নাই, মানও নাই। তিনি আপনি আসিয়াছেন, আপনি যাইবেন। আসা অনেকে দেখিল না, যাওয়াও অনেকে দেখিবে না; কিন্তু পঞ্চানন্দ জানেন, তিনি যেমন আপনা আপনি আসিয়াছেন, তেমনি আপনা আপনি যাইবেন। বাস্তবিক

অমন লোক হয় না।

ঐ যে কালপুরুষ বোঝা মাথায় করিয়া স্থির-পাদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন, উনিই ১২৯৬ সাল—উঁহার মতন লোক আর হয় না। তমসাবৃত, ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাই তাঁহার আকৃতি স্পষ্ট দেখিতেছ না; আকৃতি দেখিয়া প্রকৃতির অনুমান করিবে, তাহার পন্থা পাইতেছ না। ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট, অনিশ্চয়। দোষ কালপক্ষে কি তোমার চক্ষে, তাহা বলিয়া কাজ নাই; কিন্তু কালাবতারের মূর্তি তোমার অন্তঃকরণের আয়ত্ত হইতেছে না। ভ্রূক্ষেপ নাই কি ভ্রূকুটি আছে, তাহা তোমরা বুঝিবে না। ও মুখে হর্ষ কি বিষাদ, রোষ কি প্রসাদ, কান্না কি হাসি, খেদ কি খুসি তাহা তোমরা কিছুই বুঝিবে না; আরও বুঝিবে না যে—

বোঝায় কত মজা আছে।

পঞ্চানন্দের কথা শুন—বোঝায় সব আছে। বুঝিলে সবই আছে, না বুঝিলে কিছুই নাই। আছে অথচ তোমার জ্ঞানগম্যে নাই। আছে জন্ম, আছে মৃত্যু; আছে বিচ্ছেদ, আছে মিলন—সমস্তই আছে। তোমার আশা, তোমার আশঙ্কা ঐ বোঝাতেই আছে। লাভালাভ, শুভাশুভ, জয়পরাজয়—বোঝাতেই আছে। তুমি ফিকিরই কর আর ফাঁকিই দাও, ফাঁকিতে সে পড়িবে না, ফিকিরে সে ফিরিবে না। তুমি বুঝ আর নাই বুঝ তাঁহার বোঝায় তোমার জন্য যাহা আছে তাহা তোমাকে দিবেই দিবে।

ভাবিলে কি হইবে?

ভাবিও না, ভয় করিও না। বরং ভরসা কর—ভয় টুটিবে, ভাবনা ছুটিবে। ছুটাছুটিতে ফল নাই—সবুরেই মেওয়া ফলে। ধীর হও, স্থির হও, গম্ভীর হও। যেমন পঞ্চানন্দ তেমনি হও। হাসি মুখে অগ্রে গিয়া সন ১২৯৬ সালকে আগাইয়া লও। তাঁহার বোঝা তিনি যেমন আপনি বুঝিবেন, তুমিও তেমনি আপন বোঝাই বুঝিয়া রাখ। মাথা ঠিক না থাকিলে বোঝা ঠিক থাকে না, ঠিকরিয়া পড়িয়া যায়।

যে বুঝে না সে বর্বর।

নহিলে এত তাড়াতাড়ি কেন? ফল ত ঐ হাতে হাতে। চক্ষু চাহিয়া দেখ না কেন সকল পালোয়ানই পঞ্চানন্দের পিছনে পড়িয়াছেন। পাছে পড়িলেও দোষ

ছিল না, কিন্তু পালোয়ানের দল পাছেও পড়েন, পিছনেও লাগেন। শেষে কেবল মুখশিঁটকানি আর চক্ষুঃস্থির। এত যে চোগাচাপকান, চেঁচাচেঁচি, চট্‌পটানি—তবু সেই সব ১২৯৬ সালের সাম্‌নে পড়িয়াই চক্ষুঃস্থির। কিন্তু বলিই-বা কারে? বুঝেই-বা কে? কিন্তু চেষ্টা করা কর্তব্য, যদি চর্চার গুণেও চৈতন্য হয়।

চাঁদবদনীদের চেহারা—

আঁকা হয় নাই। তা হইলে কি আর রক্ষা ছিল! একে ত এই বেজায় গরম সহজেই প্রাণ যায় যায়; তাহাতে আবার মশার ভন্‌ভন আর পিত্তি পোড়াতে দংশন। এখন যদি মশারির বহির্দেশে নির্বাসনের আদেশ হয়, তাহা হইলে কি রক্ষা আছে? পঞ্চানন্দের ত পাঁচটা মাথা নয় যে, চাঁদ-বদনীদের চেহারা এঁকে বছরের এই পহিলা দিনে প্রলয় ঘটাবেন? সকলই সহিতে পারেন—পাঁচু, সেওয়ায় সেই সন্ধ্যাবেলা ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়া পাঁচীর সেই ছাঁচি খেংরার ছেঁচুনি। স্বাদ ত জান, তবে আর মিছা জ্বালাও কেন? তাহে আবার বিবিজান বিদ্বান্ হইতে বসিয়াছেন; বিদুষী নহেন—বিদ্বান্; এখন আর গিন্নী নয়—গুণ্ডা। সেকালে জেনানা পাশে বদ্ধ থাকিয়া অন্তঃপুরেই এ-পাশ ও-পাশ করিতেন, তখন একবার পাশ কাটাইয়া পালাইতে পারিলেও প্রাণের আশা ছিল; এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পাস, আর পোড়া কপালের সর্বনাশ। আগে যা কিছু হইত সব অজ্ঞানে, এখন আগাগোড়া বিজ্ঞানে। কিন্তু কাজ নাই আর কুৎসায়, দিন যায়, না ক্ষণ যায়! দুটা কাজের কথা কহা যাক। ভূমিকায় যিনি ভড়্‌কাইয়া যান নাই, তিনি ১২৯৬ সালের

নূতন পঞ্জিকা

শুনুন। প্রথমে পদ্যে পত্তন।

পঞ্চাধিক নবতির আয়ু হইল শেষ।
ষন্নবতি আসিলেক শনিবারে দেশ ॥
মূর্তি দেখে স্ফূর্তিহীন লাগে ভেবাচেকা।
কেবল অটল বুদ্ধি পঞ্চানন্দ একা ॥
কাতরে কহিছে সবে করুণা করিয়া।
বছরে কি হবে প্রভু বল বিবরিয়া ॥
পাঁচু কন পেঁচো-পাওয়া বক্কেশ্বরগণ।
নূতন পঞ্জিকা-ফল করহ শ্রবণ ॥

অস্মিন্ বর্ষে

দ্বাদশ মাস। তত্র কমিবেশি নাস্তি।
বিশেষতঃ দ্বাদশ মাসের ফল কথনং।
বৈশাখেতে বিড়ম্বনা জ্যৈষ্ঠে জ্বালাতন।
আষাঢ়ে আশ্বাস নাই, শ্রাবণে তেমন ॥
ভাদ্রে ভয়, আশ্বিনেতে আশা কিছু নাই।
কার্তিকে কৃতান্ত-ভয় মার্গশীর্ষে তাই ॥
পৌষ মাসে পিঠে খাবে—পেটে কিছু নয়।
মাঘ মাসে মহাকষ্ট হবে দেশময় ॥
ফাল্গুনে ফেরার হৈতে যাহা বাকি রবে।
চৈত্রের চালানে চিন্তা তার কিছু হবে ॥
বার মাস সমভাব হ্রাস-বৃদ্ধি-হীন।
পাঁচুর প্রসাদে কিবা রাত্রি কিবা দিন ॥

ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী পৃষ্ঠা ৬১৮
(বঙ্গবাসী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত)

কঙ্করস

[অর্থাৎ পঞ্চানন্দ হচ্ছেন খেজুর গাছ, তারই জিরেন কাটের রস]

এবার বারো বছরী; আর সম্মতির অপেক্ষা নাই। কাজে কাজেই আইনের জোরে জোর বাঁধিয়া পঞ্চানন্দের মুখাপেক্ষা না করিয়া আদি সমাজের আধ পোয়া পথ উত্তরে সোণাগাছির গা ঘেঁসিয়া পাঁড়ালের আড়ালে কঙ্করসের কারখানাটা এবার খুবই হইয়া গেল। অধুনা পঞ্চানন্দের বুড়ো বয়স্, নিচের পাটীর তিনটি দাঁত গিয়াছে। উপর পাটীতেও নড়াচড়া আরম্ভ হইয়াছে। ও-বেলা আধাদশী আর এ-বেলা আধাদশী করিয়া যোগাযোগে একাদশী সারিয়া কোন রকমে ধর্মরক্ষা হইতেছে। কাজে কাজেই এখন চলচ্ছক্তিহীন। ও-পাড়ার গতিবিধিটা আর ঘটিয়া উঠে না। কোনক্রমে কাণে শুনিয়া কাজ সারিতে হয়, তাহাতেই দিনগত পাপক্ষয়; আর রাত্রিটাও কষ্টে

কাটিয়া যায়। যাঁহাদের এখন চলা-ফেরা অভ্যাস আছে, তাঁহারা চক্ষু চাহিয়া দেখিবেন, আর যদি পঞ্চানন্দের ভুলভ্রান্তি দেখেন তবে না হয় থুড়ি দিয়া লইবেন।

যাহা হউক সময় থাকিতে স্বর্ণ খালাস পাইয়াছে, এই পরম সৌভাগ্য। বিশারদের বৃষোৎসর্গটা আগে আগে চুকিয়া গেলেই ভাল হইত। যা হয় নাই, তার চারা নাই। কষ্টে মষ্টে ছকুড়ি সাত, আর হাতের পাঁচে পিত্তরক্ষা ত চাই। খেলা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যাওয়া—বাপ! তাও কি প্রাণে সহ্য হয়।

নীলু খুড়োর মাসী উনুনের উপর চাটু চাপাইয়া দেখিলেন, ভাঁড়ে তেল নাই। নীলু সুবোধ ছেলে, ভাঁড় হাতে করিয়া বাজারে ছুটিল,—রাস্তার ধারে তিনজন ইয়ার আর একজোড়া তাস। কাজে কাজেই কাতের অভাব। ভাঁড় থাকিল, বাড়ীতে চাটু ফাটিতে লাগিল, নীলুর মাসী কান্নার চোটে পাড়ায় হাট বসাইলেন। এদিকে নীলু আস্তে আস্তে ভাঁড়টি নামাইয়া রাখিয়া গ্রাবুর সাহেব বিবি বাছিতে লাগিল, আর গোলামের গৌরব দেখিয়া সুখানুভব করিতে লাগিল। আমার কথা নহে, পঞ্চানন্দের বাক্য নহে—ঐ নীলু খুড়োই স্বয়ং বলিয়াছিল। পরদিন পাড়ার লোকে কৈফিয়ৎ তলব করিলে বলিয়াছিল, 'খেলা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যাওয়া, বাপ! তাও কি প্রাণে সহ্য হয়।'

বুড়ো বয়সের দোষই এই। কি বলিতে বলিতে কি কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। কহিতে গেলাম কঙ্গরসের কথা, দেখ দেখি, আসিয়া পড়িলাম কোথা? কিন্তু তাও বলি, আবোল তাবোল আমি একা বকি না, ওটা যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। একালে বড় বেশি দিন ত কেহ বাঁচে না, কাজেকাজেই ছেলেতে বুড়োতে তফাৎ খুব কম।

তা হউক। একবার ধৈর্য ধরিয়া কোমর বাঁধিয়া বার-বছুরী কঙ্গরস-কাহিনী কহা যাউক। বঙ্গদেশে কঙ্গরসের সৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত, ভারতের অলিগলি হইতে ভারতের ভ্রাম্যমাণ অলিকুল অগত্যা উড্ডীয়মান। কেহ সখে, কেহ পেটের দায়ে, কেহ চক্ষুর্লজ্জায়, কেহ সঙ্গদোষে। মহা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ। অন্তঃসত্বা রেলের গাড়ী (খ্রীলিজে ঈপ) তাড়াতাড়ি আসিয়া হাবড়ার প্লাটফরমে পৌছিতে না পৌছিতে—কুরুচির কথাটা আর উল্লেখ করিব না।

এখন অভ্যর্থনা করে কে? অর্থাৎ আঁতুড় ঘাঁটে কে! বুড়োর ত মহাভাবনা, বুক টিপ্‌টিপ করিতে লাগিল,—সুতরাং পাত্রের অভাবে পত্র, বচনের বদলে রচন—তাই-বা শুনায় কে?—রাসে বিহরিতে পারে যে, অথচ নির্দোষটুকু হওয়া চাই, কেন-না রসের ব্যাপার হইলেও এ ত বাজে রস নয়—কঙ্গরস। যাহাই হউক এবার তিলকাঞ্চনেই কার্যোদ্ধার। তবে এটা মানা উচিত যে, তিল সোণাও তাহার উপযুক্ত।

খুব রগড় লাগিয়া গেল। সুরে আরম্ভ, আর চিরকাল যা হয়, বে-সুরেই শেষ। রূপের ছবি, কালের কবি, স্বয়ং রবি গলা ছাড়িয়া গাহিলে কার কোমল প্রাণ এত কঠোর যে ঘুপ্‌চি মেরে আর ঘরের ভিতর বসিয়া থাকে? সেকালে গানে গানে ভুলিত কেবল গয়লানী, একালে—যেখানে রাজা ও রানী—কুচপরোয়া নেহি, বলিয়াই ফেলি—সেইখানেই বৌঠাকুরানীর হাট।

ভানু সিংহ গাহিয়াছিল—এখনকার কেশরদংষ্ট্রানখ-বিশিষ্ট ভানু সিংহ নহে; কিন্তু তস্য দাদা পরদাদার পরদাদা বৃদ্ধ গলিত-নখদন্ত ভানু সিংহ গাহিয়াছিল—

রসবতি, কি কহব তোয়
লাজে ডারলি মোয়।
বাঁশরি রব শুনি জাতি কুল নাহি গণি
ধাবন উচিত কি হোয়!
তুঝে গোকুলে মানত
তু ঝে লো সেয়ানী
ভানু নাহি জানত
তু হু অ-গেয়ানী।

একালে যে আবার তাই গাহিতে হইবে, এ-বাপু কে জানিত! বেটাছেলে, কাছাখুলে, জাতিকুল ভুলে এই ঘোর কলিকালে এমন ছুটাছুটি করিবে, তা কি আমি জানি? নে মেনে, আমারি হার, কি তোদের ত এই সেয়ানী।

তারপর রথ দেখা আর কলা বেচা—অর্থাৎ কেন-

কাহিনী। এ কেনটা বাঙ্গালা কেন নহে, এটা আসল বিলাতি কেন্—যাহার মানে বেত্র অর্থাৎ বেত। বিশ্বাস না হয়, পিঠের কাপড় খুলিয়া দেখ। আর তখন যাহারা হাত বুলাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল, এখন বহুত দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে তেল বুলাইতে হইবে। পাঁচু বড়-একটা ফাঁস কথা কন না, বরং তোমরা মিলাইয়া দেখিও।

তার পরেই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ; বর্ণনে কেবল পুঁথির বৃদ্ধি—বাহারও নাই, বলিহারিও নাই।

এইসব হইল আড়ে আড়ে কথা। একটু বাঙ্গালা করিয়া বলি। যাহারা ভেতো বাঙ্গালি, তাহারা শুনুক, শিখুক, বুঝুক আর মজুক।

কঙ্গরসটা হইতেছে ভারততোলানী মেলা। ভারত এখন পতিত, তাকে একটু টেনে টেনে তোলা, তাই দশে মিলে সুতরাং মেলা।

এখন ঐ তোলাটা একটু আধটু তোলা নহে, একেবারে তেতলায় তোলা। কঙ্গরসে গোড়ায় গড়াগড়ি, তাহার পর হুড়াহুড়ি, তাড়াতাড়ি, বিলাতি ছড়ি, তাহার পর দৌড়াদৌড়ি, অবশেষে যে যার আপন আপন বাড়ী। বছর বছর এই। সকল তন্ত্রেই ঐরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়,—পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে; উত্থায় পুনঃ পীত্বা ইত্যাদি। সোজা বাঙ্গালায় নাগরদোলা বলিলে কতক কতক আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

সেকালে ছিল অজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান মোটেই ছিল না। এখন ত সেকাল নাই, এখন একাল; সাফ বিজ্ঞান, একেবারে বিগত। সেকালে যদি কেহ পড়িত অন্যে তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিত। এখন যদি তুলিবি তবে পুলি আন; এ পুলি তোমার পৌষ মাসের পিঠেপুলি নহে। বিলাতি বিজ্ঞানের দড়ি দিয়া হেঁচকা টানের আসল পুলি, বাঙ্গালিতে যাকে বলে কপিকল; কপির দল কিনা!

সাহেব স্বয়ং বুঝাইয়া বলিলেন যে, ভারত যদি তুলিতে হয় তবে পুলি চাই, আর কুলি চাই। তা আখেরে তোমরা আছ, এ দিকে বড় ভাবনা নাই; বিলাতের বিল্ববৃক্ষে আমি পুলি বাঁধিয়া দিব, তোমাদের ভাবনা কি? তোমরা দড়ির জোগাড় কর, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত।

প্রভু পঞ্চানন্দ কহিতেছেন যে অস্মদ্ অর্থাৎ এই অধম জন এ কাজে অপারগ। বুড়ো হইয়াছি, মাথার চাঁদি ফাঁক হইয়াছে, আর বেলতলার কথা আমার কাছে তুলিও না। তায় এ পক্ষ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বর্ণে কাক। ও-বেল পাকাই হউক আর কাঁচাই হউক, আমার কি? তবে তোমরা, হে ভারতমাতার কৃতিসন্তানেরা, তোমরা নাকি হাটের নেড়া, তোমরা সবই পার; সাধ থাকে বড় বড় বিলাতি থান মস্তকে জড়াও আর উচ্ছন্নের ঢালুতে খুব কষিয়া গড়াও।

আমি শারীরিক ভাল আছি। আগতে তোমাদের কুশল লিখিবে। আমার নাতনীগুলিও ভাল আছে। সে খপর অবশ্যই তোমরা জানো। পাঁড়ালের পরদার আড়ালে তাদের কেউ কি যায় নি? বে-পরদার কথা আমি কহিব কেন?

ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী পৃষ্ঠা ৬৬৭

(বঙ্গবাসী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত)

এবার উপন্যাস

প্রথম অধ্যায়—পত্তন

ত্রিপান্তর মাঠ ধূ ধূ করিতেছে; অথবা রাত্রি না হইয়া যদি বৈশাখের মধ্যাহ্ন হইত, তাহা হইলে ধূ ধূ করিত। নীল-নিথর আকাশের সীমান্ত প্রান্তে বসিয়া বিমল সুধাকর হাস্য করিতেছে। (করুক; কিন্তু নিথরটা কি, তাহা ভাল বুঝা গেল না।) সেই অপরূপ হাস্য-জ্যোতিতে নিরন্তর সান্দ্র সুধাবৃষ্টি হইতেছে।

(উপন্যাসের গোড়াপত্তনটাই একটু শক্ত। প্রথমে, শব্দচ্ছটায় একবার জমাট বাঁধিয়া লইতে পারিলে পশ্চাৎ আর বড় ভাবিতে হয় না; তখন পাঠিকারা ভাষা-স্রোতে ভাস-মানা হইয়া আপনা-আপনি ভাব-রসের কুমুদ-কহ্লার-কাননে লীলা-তরঙ্গ আরম্ভ করিয়া দেন। পাঠকগণ তটস্থ হইয়া দেখেন, অর্থাৎ নিরীক্ষণ করেন কিংবা নেহারেন, আর আনন্দ-সাগরে উপপ্লুত হইয়া ক্রমেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তখন আর ভাবনা কি?—উপন্যাস লিখিয়া গেলেই হইল।)

(ত্রিপান্তর লেখাটা ভাল হয় নাই।) প্রকাণ্ড প্রান্তর। দুই ক্রোশের মধ্যে কোন দিকে মনুষ্যের আবাসভূমি (উঁহু হইল না।—পুনশ্চ আরম্ভ!)

প্রকাণ্ড প্রান্তর। চতুর্দিক্ ধূ ধূ করিতেছে। দুই ক্রোশের মধ্যে কোন দিকে মানববসতির সংস্পর্শ নাই। পূর্ণিমা রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্র নীল-নভস্তলে ঢলঢল করিতেছে আর সেই চন্দ্রানন হইতে ঝলকে ঝলকে সুধারাশি উছলিয়া সংসারে পড়িতেছে। মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতিদেবী নীরব—নিস্তব্ধ। (জমাট হয় আর কি! ঝিঁঝিঁ পোকার সেই সুমধুর সংস্কৃত নামটি কি? কাব্যে সেটা খোলে ভাল। হুঁ—ঝিল্লীরব। পোকাটির নাম ঝিল্লী আর শব্দটির নাম ঝিল্লীরব। এইবার আর বদ্‌লানো হইবে না; দুর্গা বলিয়া আরম্ভ করা যাক।)

প্রকাণ্ড প্রান্তর। (ওঃ—এবার খুব!) শারদ পৌর্ণমাসী রজনীতে স্বর্ণকান্তি সুধাকর নীল-নভস্তলের মধ্যস্থলে আসীন হইয়া সংসারের উপর সুধাবৃষ্টি করিতেছেন। জগৎ নীরব—নিস্তব্ধ। প্রকৃতি সুন্দরী মাধুরী মুগ্ধ হইয়া যেন দিশাহারা হইয়াছেন। নিকটে লোকালয় নাই; দুই ক্রোশের মধ্যে কোন দিকে মনুষ্যের বসতি নাই। যদি থাকিত তাহা হইলেও সকলি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। (আহা!) নিঃশব্দ মৃদুল-পদ-সঞ্চারী পবনের গতিমাত্র আছে, যেন শব্দ-বহনের শক্তি আর নাই। কোন দিকে ঝিল্লীরব শুনা যাইতেছে না। কেবল সেই নিস্তব্ধ নীল আকাশকে ভেদ করিয়া জগৎকে যেন সুধায় প্লাবিত করিয়া কোমল কামিনী-কণ্ঠ-নিঃসৃত করুণ গীতিস্বর ভূর্লোক, দ্যুলোক, নক্ষত্রলোক ভেদ করিয়া উধাও হইয়া কোথায় চলিতেছে! জগৎ যেন একতন্ত্রী হইয়া সেই একমাত্র স্বরশ্রবণে একাগ্রচিত্ত হইয়া রহিয়াছে। স্বর যেন মর্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া মন্দাকিনী-ধারায় ঊর্ধ্বমুখে ছুটিয়াছে। (আহা!) গীত হইতেছে—

পিলু—যৎ

মনোজ সরোজ মরি
কোরকে শুকাইল!
শারদ শিশির
কেন তারে পরশিল!
সমীর করে সমর
রজনী তাহে তিমির
শশাঙ্ক সশঙ্ক যেন
মেঘাম্বরে লুকাইল।
আশা ছিল মনোলোভা
হইবে সৌরভ-শোভা
দয়িত-পদ-দলিত
কে জানে কেন হইল।

সেই প্রান্তরের মধ্যস্থলে অশ্বত্থমূলে বসিয়া উদাসিনী একাকিনী এই গান গাহিতেছে। (অবশ্য উদাসিনীর বয়স্ অল্প, নহিলে উপন্যাসে আসিবে কেন?)

অদূরে সরোবর-তটে কেতকী-বন। কেতকী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধ-বিস্তারে জগৎ আমোদিত করিতেছে।

কিসের ঐ ছায়া? জনপ্রাণী দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তবে কিসের ঐ ছায়া? (এইবার একটি পুরুষ আসিবেন আর কি। কিন্তু আজ থাক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুরুষপ্রবরকে দেখিলেই হইবে।)

(এ দেশে আঁতুড়ে নামকরণের নিয়ম নাই; যথাসময়ে উপন্যাসের নামকরণ হইবে।)

ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী পৃষ্ঠা ১০৩
(বঙ্গবাসী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত)

নাতনীর ভাবনায় পঞ্চানন্দ

[এবার সিদ্ধ-মৌলিক কায়স্থ দাদৃদেহে আবির্ভূত]

নাতনী! তোর ভাবনা ভেবে ভেবে
শরীর আমার কালি হলো;
নাত্‌জামাই জুটবে মোর ক'তো দিনে?

ভবভূমে কপোতাক্ষ-কবির আবির্ভাবের বহু পূর্বের ঐ অমিত্রাক্ষর কবিতা আজিকালি আমার জপমালা। অপার্যমানে নাত্‌জামাই—তাও পোড়া সিদ্ধ-মৌলিক—জন্মে জুটে না। সাধ্য বাহান্তরে নামিবার সাধ্য কখনই ছিল না। সিদ্ধ সমান ঘরে পূর্বে চলিত, বিস্তার প্রসারে সে

পথ বন্ধ। কুলীনের প্রথম পুত্র বামনের পক্ষে প্রাংশুলভ্য অংশুমৎ ফল—কাজেই কবিতাই একমাত্র অবলম্বন—

নাত্‌জামাই জুটবে মো—র ক—তো দিনে?

ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইতেছে যে, আমাদের এই কায়েত্‌গুলাই, বিশেষ কুলীন কায়েত্‌গুলাই, যত অনর্থের মূল। বৈবাহিক অনর্থ, সামাজিক অনর্থ, রাজনৈতিক অনর্থ, অঙ্গচ্ছেদের অনর্থ—সকল ছেদের অনর্থের মূল এই না-ক্ষত্রিয়, না-শূদ্র, না-ব্রাহ্ম, না-পতিত যমের জাতি এই কায়স্থগুলা।

তার মধ্যে সকল অনিষ্টের গোড়া এই মহামান্য ঘোষ-ধন্য চন্দ্রমাধব খুড়ো। বাবা! সভা করিবে ত সভাই করিবে। বক্তৃতা হবে, হাততালি পারতালি হবে, দরখাস্ত হবে, দেশোদ্ধার হবে। বস্! তা নয়, তুমি কিনা চাহিলে, চারি জাতি কায়স্থ একত্র করিতে। তা নয়, ছাই! কেবল সভাতেই হউক, কাগজে কলমে থাকুক; তা কোথায়? সভা করিবার আগে হইতেই বেঙ্কে বেঙ্কে মেলন, আবার সেদিন কিনা বেঙ্কে বারে মেলন! বলি এখন—

কোথায় বঙ্গজ তুমি, বারেন্দ্র কোথায়?
এবে যে 'আসামী' হয়ে খাড়া কাট্‌রায়।
বড়ুয়া বেহাই কর, বাড়িবে বড়াই,
রাঢ়ী সঙ্গে রেড়ো হয়ে, আর কাজ নাই॥
গুমান হইল শুঁড়া, নবীন বিধানে—
পাণ্ডব-বর্জিত তুমি ধর বক্রবানে॥

সভা করিয়া, কুটুম্বিতা করিয়া চারিজাতি এক করিবে কি? এখন জিওগ্রাফীর জ্বালায়, ভূগোলের গণ্ডগোলে অস্থির হইতে হইল যে,—তার কি? যদি এতদিন বিবাহের ব্যয় কমাইবার কিছু করিতে পারিতে, তবে কত লোকের কত আশীর্বাদ পাইতে। আজি আর আমাকে অনবরত জপ করিতে হইত না—

নাত্‌জামাই জুটবে মোর কতো দিনে?

আর খুড়ো, তোমাকেও এই পঞ্চানন্দ পড়িয়া হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে হইত না।

তারপর, ঘোষ ধরিয়াছি, ঘোষেদের কথাই বলি; মহামান্যের পর দেশমান্য আইনের ডাক্তার খণ্ডঘোষের কথাই বলি। তুমি, দাদা, তুমিই কি সেদিন কম অনর্থটা করিলে? তোমার সভা করার বাতিক ত বড় ছিল না। পতি হবার সাধ ত অনেকদিন মিটাইয়াছ! তবে আবার সভা করিয়া সেই সভার পতি হইতে গেলে কেন? তোমার আছে তিনটা জিনিস—পকেট, প্রাণ আর মগজ। পকেট পূরিবে, প্রাণ দিয়া খাটিবে আর মগজ হইতে আইনের প্রস্রবণ বাহির করিবে। তুমি সভা করিতে গেলে কেন? তুমিই ত বলিয়াছিলে, বড় শ্লেষের সহিতই বলিয়াছিলে, হিন্দুরা দিগ্বিজয় করিতে, দেশ দমন করিতে না জানিতে পারে, কিন্তু তাহারা বাঁচিতে জানে ও মরিতে জানে। লাট মহালাট বলিতেছেন, মরিতে জানো ত মরো। তোমাদের আর মাথা কুটিলেই কি? বুক ফাটিলেই বা কি? গাও, দাদা, খুব চাপান দিয়াছিলে, এইবার ৭ই আগস্ট উতোর গাও।

আর একদিকে আর এক ঘোষ নটবর গিরিশচন্দ্র। 'বিল্বমঙ্গল', পূরণো পাগল—এ সকল মন্দ নহে। সৎনামি সম্প্রদায়ের কথা লিখিতে গিয়াছিলে নাকি? তাতে কেবল অসৎ নাম হইয়াছে মাত্র; একে ত ঘোষ নামেই খোস্‌নাম; তাহার উপর শিশির ঘোষের কাছেই থাক—তাহার উপর সৎনাম কেন দাদা? তোমার চেলার 'বিভ্রাটের' পর তোমার পুরো 'বলিদান' ভাল; কিন্তু ও সকলে আমাকে আরও ভাবাইয়া তুলে—

নাত্‌জামাই জুটবে মোর কতো দিনে?

ঘোষের পর বসু কুলীনদের উপরই না আমার রাগ। শ্রীভূপেন্দ্র বসু কোর্টে থাকুন, কৌন্সিলে থাকুন। বেশ। কন্‌সেণ্ট আইনে রাজপক্ষে মত দিয়াছেন, তাও ভাল—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। কিন্তু কন্‌ফারেন্সে চৌকিদারি * করিতে ময়মনসিং যাওয়া কেন? সে মুলুকে লোক ছিল না, তাই অভাব পূরণ করিতে গমন? না, রাঢ়ে বঙ্গে ভ্রাতৃভাবে বন্ধন করিতে প্রয়াস? বলি এখন? এখন যে ভ্রাতৃভাবে বৈমাত্রেয় ভাব আনিবার জন্য অঙ্গচ্ছেদের

---

* Chairman—শব্দার্থে ও ভাবার্থে চৌকিদার হওয়াই ঠিক। শব্দার্থ—যে চৌকি পায়; ভাবার্থ—যে চৌকি দেয়—সকলকে সামলাইয়া রাখে।

ব্যবস্থা হইয়াছে; এখন সূর্যনারায়ণ, জগৎনারায়ণ দুই ত আমাদের সমান হইবেন। আর ময়মনসিংহে পতিত্ব করিবার সুবিধা ত হইবে না। তোমরাই ঘুচালে? তাহাতেই বলিতেছিলাম, কুলীন কায়স্থই যত অনর্থের মূল।

আর এক বসু—গিরিশের গণ্ডশিষ্য অমৃতলাল বসু। তিনিও একটি কম নন। বিবাহ-বিভ্রাট বাধাইবে বাধাও। ক্ষত্রিয়ত্বের প্রয়াসিগণ রাণা প্রতাপের কথা কহিবে কেন? তাহাতেই বলিতেছিলাম, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের আস্বাই—অঙ্গবঙ্গে একজাতি হইবার আস্বাই যত অনর্থের মূল। এই আস্বার জোরেই ত ভাঁড় দ্বিজ আজি রামদাস স্বামীর স্পর্ধায় স্পর্ধান্বিত। এত কি সয় গা?

বলিতে হইবে না, সকলেই জানেন, ঘোষের পাপে মিত্র, দত্ত সমান পাপী! পুঁটুলি কষিয়া বাঁধিতে কানি ছিঁড়িল—এখন রাস্তায় খুদের ছড়াছড়ি। জাতির বন্ধন দিবে কি? এখন দেশ পৃথক্, রাজ্য পৃথক্, রাজা পৃথক্ হইল। কায়স্থই এই অনর্থের মূল। আর কায়স্থের কায়স্থ রিজলি সাহেব সকল মূলের মহামূল। কন্‌সেণ্ট আইনের মূলে রিজলির কায়স্থ কলম। তাহাতে কি গণ্ডগোলই না হয়। সেন্‌সাস রিপোর্টেও সেই কলমের খোঁচা বাঙ্গালার কায়স্থপুঙ্গবগণকে ক্ষেপাইয়া তুলে ও কায়স্থসভার সৃষ্টি সাধন করে। এবারও রিজলির সেই কায়স্থ কলম বঙ্গের বলিদান সাধন করিল। যমায় চিত্রগুপ্তায় রিজলিসাহেবায় নমঃ। আমি বোধ করি, সত্বর কায়স্থ-সভা আহ্বান করিয়া কায়স্থের কায়স্থকে রিজলি গুণধামকে সভাপতি করিলে আমরা এই অনর্থ হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইতে পারি, আর তিনিও বোধ করি অর্ধ অঙ্গের লাটিয়তি না পাইয়া আমাদের গরীয়সী সভার পতিত্ব পাইলে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারেন। এখন সেই কথা, নাত্‌নী তোর ভাবনা ভেবে ভেবে পাগল হ'লাম—

কায়স্থেরে গালি পাড়ি পঞ্চানন্দ রঙ্গে।

ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী. পৃষ্ঠা ৭১০

(বঙ্গবাসী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত)

[শেষের চারটি রচনা সাহিত্যাচার্যের লিখিত, কিন্তু ভ্রমক্রমে 'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী'-ভুক্ত হইয়াছে। 'পরিচিতি'-তে 'পূজার গল্প ও কৌতুককৌমুদী'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।]

সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকার

বহুকাল হইল সুন্দরবন অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। এখনও তাহার নানা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। নিবিড় জঙ্গল-মধ্যে প্রস্তরময় সোপানশোভিত বৃহৎ সরোবর, কারুকার্য-খচিত বিশাল শিব-মন্দির, ভগ্ন অট্টালিকাসমূহের ক্রোশব্যাপী ধ্বংসাবশেষ সুন্দরবনের যেখানে সেখানে এখনও আছে। ফরাসী রাজধানী প্যারিস্ নগরে বঙ্গদেশের যে অতি পুরাতন মানচিত্র আছে, তাহাতে সুন্দরবন-মধ্যে পাঁচটি জীবন্ত নগরের নাম ও চিহ্ন আছে; আর সুন্দরবনের সমৃদ্ধির কথা বৃদ্ধ জনগণের মুখেও শুনা গিয়াছে। কিন্তু এখন সমস্তই কালকুক্ষিগত। কিসে গ্রাম, নগর, গৃহ, গোষ্ঠ সমস্তই উৎসন্ন গেল? কেমন করিয়া জনাকীর্ণ জনপদ গভীর নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল?

প্রসিদ্ধ ভূকৈলাসের যোগীকে ভট্টপল্লীর একজন ভট্টাচার্য ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। যোগী নিতান্ত স্বল্পভাষী ছিলেন; উত্তরে বলেন, 'সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকার হওয়াতে এবং সুন্দরবন-বাসীরা দুর্মতিবশত ব্যাঘ্র-ধর্ম অবলম্বন করাতে, কালে সুন্দরবন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।'

এ কথা বড় বিচিত্র। ইতিহাসে এরূপ আর কোথাও হইয়াছে কিনা জানি না। মানুষ ব্যাঘ্র-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল, এ কথা বিস্ময়কর ও হাস্যকর। কিন্তু আবার পরিণাম ভাবিলে বোধ হয় নিতান্ত বিষাদপূর্ণ। ভট্টাচার্য মহাশয় কথাটি যে ভাবে বিবৃত করেন, আমরা সেই ভাবেই বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। তিনি একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, যদি তাঁহার বিবরণে কার্যকারণের পরম্পরা-নির্ধারণে কিছু গণ্ডগোল থাকে, তবে তাহাতে তাঁহার 'দীধিতি' দায়ী।

এককালে চন্দ্রদ্বীপের রাজারা বড়ই প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। বঙ্গদেশের দক্ষিণ-ভাগ তাঁহারা সমস্তই অধিকার করেন। তখন সুন্দরবন বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। সাগর-সন্নিকট হওয়াতে বৈদেশিক নৌ-বাণিজ্যের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠী জাতীয় নিরীহ বণিক্‌গণ ধান্য, তাম্রকূট, মধু, মোম প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া অতুল সম্পত্তি করিয়া-

ছিলেন। পৌণ্ড্রবংশীয় অগণিত কৃষিবলের পরিশ্রমে সমস্ত ভূভাগ সংবৎসর যাবৎ শস্য-শ্যামল থাকিত। ব্রাহ্মণগণ দেব-প্রসাদে ঐহিক চরিতার্থতা লাভ করিয়া পারকালিক সুখাশায় দিনাতিপাত করিতেন। দিবসে প্রান্তরে কৃষকগণের নীরব শ্রম-চালনায়, গ্রাম-নগরে বাণিজ্যের উৎসাহময়ী নিরন্তর গতিতে এবং রাত্রি চারিদণ্ড পর্যন্ত দেবমন্দিরের ও বৌদ্ধ মঠ সকলের বাদ্যঘণ্টা-রবে সমস্ত জনপদ আকুলিত থাকিত।

সুন্দরবনের পূর্বে-পশ্চিমে বন ছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজারা পূর্বদিকের বন কাটিয়া নগর পত্তন করিতে লাগিলেন, পশ্চিম দিকের জঙ্গল তাড়না করিয়া নবাগত মুসলমানেরা সেনানিবাস স্থাপন করিতে লাগিলেন। দুই দিক্ হইতে তাড়িত হইয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি শ্বাপদ সকল সুন্দরবন আক্রমণ করিতে লাগিল। এখন এই মহামারীপূর্ণ বঙ্গদেশের কোন কোন পল্লীগ্রামে যেমন দিবারাত্র শৃগালের উপদ্রব হইয়াছে, প্রথম প্রথম, সেই সময়ে সুন্দরবনে সেইরূপ বাঘের উৎপাত হইল। তবে শৃগালের উপদ্রব অপেক্ষা বাঘের উৎপাত অবশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর। শৃগালে এখন ছোট ছেলেটিকে তেল-হলুদ মাখাইয়া পীঁড়ার উপর রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখিয়া নবপ্রসূতি পুকুরঘাটে গিয়াছে দেখিলে, ছেলেটিকে বনে লইয়া যায়; ছোট বউকে মাছ ধুইতে খিড়কীর ঘাটে নামিতে দেখিলে, পাশের কচুবন হইতে মাছের পেতে ধরিয়া টানাটানি করে; চৌরী ঘরের মেঝে হইতে পাকা কাঁটাল মাথায় করিয়া পালায়; কাঁধাকাঁধি করিয়া রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়া ইলিশ মাছের হাঁড়ি খায়; আবার দুই-দশটা হন্নে হইলে, যাকে পায় তাকেই কামড়ায়, বাধা বন্ধক মানে না, লোকজনকে ভয় করে না, মারিতে গেলে ঘাড় ফিরাইয়া লাঠি কামড়াইয়া ধরে। এখনকার দিনে এই বিপুল অর্থ-ধ্বংসকারী পুলিশ-প্রহরী-বেষ্টিত বঙ্গ-মণ্ডলে, এই বন্দুক-বেটন-সঙ্গিন-প্রবল সঙ্গিন দিনে যখন সামান্য শৃগালের এইরূপ উপদ্রব হইয়া উঠিয়াছে, তখন সেই সেকালে, সেই শ্রেষ্ঠি-পৌণ্ড্র-পূর্ণ নিরীহ নিবাসে আবাস-তাড়িত ব্যাঘ্রের উৎপাত যে কি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রথমে ছাগ, মেষ নিঃশেষ হইতে লাগিল; তাহার পর গোষ্ঠে আর বৎসতরী থাকে না, ক্রমে রাখালের গো-মহিষ কমিতে লাগিল; দুটি দশটি করিয়া রাখালবালক মারা পড়িল; তাহার পর অবেলায়, রাত্রি বেলায়, সকাল বেলায় মাঠেঘাটে আর কেহ চলে না। ক্রমে গ্রাম-নগরেও ঐ সময়ে চলাচল বন্ধ হইল, কাজেই খরদিনের বেলা ছাড়া আর দোকান-পশার হয় না। লোমশ লাঙ্গুল উত্তোলন করত লক্ লক্ করিয়া লালায়িত দংষ্ট্র-জিহ্বার ক্ষীণ প্রভার শ্মশান-আলোকে ভীষণ মুখমণ্ডল ভীষণতর করিয়া বৃহৎ বৃহৎ রাজব্যাঘ্র সকল পথে, ঘাটে, পাঁদাড়ে বিচরণ করিতে থাকে; সহজে ক্ষুধানিবারণের উপাদান না পাইলে গোশালার সন্নিকটে গিয়া ভীম গর্জন করে, দুই-একটা ভীরু গোরু দড়ি ছিঁড়িয়া, আগড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ে, অমনই ঘাড় ভাঙ্গিয়া পিঠে ফেলিয়া লাঙ্গুল আছড়াইতে আছড়াইতে লম্ফে লম্ফে পগারের মধ্যে লইয়া গিয়া উদর পূরিয়া তাহার রক্ত শোষণ করে। ক্রমে গো-সেবক হিন্দু তাহার বহু দিনের অভ্যস্ত হিন্দুয়ানি ভুলিতে লাগিল। রোগা ভাঙ্গড়া বুড়ো গোরু আর গোয়ালে বাঁধিত না—ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের নজরানারূপে তাহাই রাত্রিকালে গো-শালার বাহিরে বাঁধিয়া রাখিত; কিছুদিনে গো-মহিষ, ছাগ-মেষ সকলেই প্রায় অর্ধসার হইল; দুধ ত আর মেলেই না; চাষীর চাষ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; ছোট ছোট ছেলেপিলে দুধ বিনে মারা পড়িতে লাগিল; তখন সুন্দর-বন-অধিবাসীরা দারুণ অন্নকষ্ট আসন্ন দেখিয়া নানারূপ ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মনুষ্য-শরীরে ব্যাঘ্রের মত বল নাই বলিয়া মনুষ্যের এরূপ দুর্দশা হইতেছে, অতএব শরীরে ব্যাঘ্রের মত বল করা নিতান্ত আবশ্যক। ব্যাঘ্র লম্ফঝম্প দিয়া চলে ফিরে, তাহাতেই উহাদের অত বল, অতএব লম্ফঝম্পে চলাফেরা করা নিতান্ত আবশ্যক। রাত্রিতে উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে কবাটে লৌহ অর্গল লাগাইয়া বালক বৃদ্ধ যুবা ব্যাঘ্রবৎ হুহুঙ্কারে লম্ফঝম্প করিতে লাগিল। দুই দিন এইরূপ হয়, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে; আবার দশদিন কামাই যায়।

ধুতি লট্‌পট্‌ করিয়া ত শার্দূল-কুর্দ্দন হয় না; ব্যাঘ্রের মত অঙ্গচ্ছদ করাই ভাল,—তাহাতে নানাদিকে সুবিধা আছে। এক ত ব্যাঘ্র-ঝম্পের সুবিধা, দ্বিতীয় গরম কাপড়ে শরীরে বলাধান হয়। তৃতীয় আপাদমস্তক লোমশ কাপড়ে দেহ মোড়া থাকিলে, ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে অনেকটা রক্ষা আছে। চতুর্থ ব্যাঘ্র-বোধেও ভুলক্রমে ব্যাঘ্র-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভোট কম্বলের পা হইতে মাথা পর্যন্ত 'বাঘথাব্বা' বানাইয়া সুন্দরবনের তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীরা ও ধনবানেরা তাহাই পরিধান করিতে লাগিলেন। উহারি মধ্যে একজন সুবুদ্ধি বলিলেন যে, লম্ফের সহায় লাঙ্গুল; বিশেষ পশু, পক্ষী, সরীসৃপ সকল জীবেরই যখন লাঙ্গুল রহিয়াছে, তখন মনুষ্যেরও থাকা চাই, তবে-যে স্বভাব হইতে নাই, সেটা কেবল মনুষ্যের বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য। মানুষের গাত্রে দীর্ঘ লোমও ত নাই, তাহা বলিয়া মনুষ্য কি লোমশ অঙ্গচ্ছদ পরিবে না? সিদ্ধান্ত মত কার্য হইল; শুষ্ক বেতস লতায় কম্বল-চীর জড়াইয়া তাহাই মনুষ্যের অঙ্গচ্ছদ মেরুদণ্ডের নিম্নে লাগাইয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞেরা লাঙ্গুলের আর্যা স্থির করিয়া দিলেন, পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অর্ধ হস্ত, পনের বৎসর পর্যন্ত এক হস্ত, তাহার পর—

প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে সার্ধদ্বিহস্তকো ভবেৎ।

স্থির হইল যে, ব্যাঘ্রের মত এই লাঙ্গুল ভয়ের সময় হাতে ধরিয়া টানিয়া নত করিতে হইবে; লম্ফঝম্ফ কালে বেতের রোক ছাড়িয়া দিবে, লেজ বাঁকা হইয়া লক্‌ লক্‌ করিবে। ক্রমে অবশ্যই ইঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, হাতেপায়ে না চলিলে লক্‌লকায়িত লাঙ্গুলের শোভা হয় না, বিশেষ হাতেপায়ে হাঁটিলে অনেক চলা যায়, স্ফূর্তিতে চলা যায়, আর শীঘ্র হাঁপাইতে হয় না—সুতরাং বুদ্ধিজীবীরা হাতেপায়েই চলিতে লাগিলেন।

এইরূপ করিতে করিতে বুদ্ধিজীবীরা ক্রমেই আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে সম্পূর্ণ-ব্যাঘ্র-ধর্মাবলম্বী হইলেন। শরীরের পশম নষ্ট করাই ভুল, এই ধারণা হইল। প্রথমে দাড়ি রাখিতে লাগিলেন; তাহার পর মাথায় বড় বড় চুল রাখিলেন; তাহার পর বাঁকা বাঁকা নখ। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আঁচড়-কামড়ের প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল। ক্রমে স্নান-আচমনাদি মনুষ্যের অহঙ্কার জাত কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ব্যাঘ্র-ভয়েও বটে, ব্যাঘ্র রাজ্যাধিকারী বলিয়া তাহাদের অনুকরণেও বটে, ক্রমে রাত্রিতে অর্গলবদ্ধ গৃহে কাজকর্ম হইতে লাগিল। তবে যাতায়াতটা দিনদুপুরে চারি পায়ে, লাঙ্গুল নত করিয়াই হইত; সেই সময়ে পথিকেরা কম্বলের 'বাঘথাব্বা'র ছিদ্র প্রসারিত করিয়া মুখব্যাদান করিতেন এবং লিহ্‌লিহ্‌ ভাবে লোলজিহ্বা আকুঞ্চন-প্রসারণ করিতেন। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া হুঙ্কারে বলিতেন—"আলুম", তাহাতে আগমন বার্তা জানানো হইত এবং অবলম্বিত ব্যাঘ্র-ধর্মও রক্ষা হইত। বুদ্ধিজীবীগণের দেখাদেখি অনেক গরীবদুঃখীও ব্যাঘ্র-ধর্ম অবলম্বন করিল; যাহাদের কম্বল জুটিল না, তাহারা নারিকেল ছোলের কাঁথার 'বাঘথাব্বা' করিল, আর কুটীর-মধ্যে গর্ত করিয়া রাত্রিতে তাহারই মধ্যে বাস করিতে লাগিল।

ছাগ, মেষ কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্যাঘ্রের মত মাংস না খাইলে শরীরে বল হইবে কি প্রকারে? অনেকেই আহারার্থ কুক্কুট পালন করিতে লাগিলেন; কুক্কুটগুলা বাঁধিয়া রাখিয়া, লম্ফ দিয়া তাহাই শিকার করা হইত। প্রথমেই ঘাড় ভাঙ্গিয়া আমরক্ত ভক্ষণ করা হইত। ব্যাঘ্র-ধর্মবিৎগণ বলিতেন, এমন উপকারী পানীয় আর নাই। আর মাংসও অনেকে অসিদ্ধ ভক্ষণ করিতেন,—যাহারা ঐরূপ করে, তাহারাই ত বলশালী। ভক্ষ্যগুলার অস্থিপঞ্জর গৃহমধ্যে ছড়ানো থাকিত; পণ্ডিতে স্থির করিয়াছিলেন যে, উহাতে দূষিত বায়ুর দোষ নষ্ট করে এবং গন্ধে বলাধান হয়।

সুন্দরবন স্বভাবের উপবন-স্বরূপ ছিল; ক্রমে ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইল। ব্যাঘ্র জঙ্গলে বাস করে সুতরাং মানবগণের জঙ্গলে বাস করাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইল। কাজেই কেহ আর জঙ্গল কাটে না; তাহাতে চাষবাসের হ্রাস হওয়াতে মাঠ-ঘাট সমস্তই জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল। কুক্কুট-গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল; গ্রামের নিকটস্থ জঙ্গলে পালে পালে বৃহৎ কুক্কুটগুলা কেবল "কুঃ কুঃ" করিয়া পাখা ঝট্‌কাইতে ঝট্‌কাইতে উড়িয়া বেড়ায়, আর পালে পালে

বনের ডালে ডালে লাফালাফি করে। এখন ব্যাঘ্র ত সুন্দরবনে রাজরাজেশ্বর হইয়াছে। ব্যাঘ্র শব্দের পূর্বে রাজ শব্দ যোগ না দিয়া, কথাটা মুখে আনিতে কেহই সাহস করিত না। সেই অবধি সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের নাম রাজবাঘ (Royal Tiger) হইয়াছে। সুন্দরবনের বীরগণ সকলেই তখন 'নরব্যাঘ্র', 'নরশার্দূল' পদে অভিহিত হইতেন এবং ঐরূপ বিশেষণে শ্লাঘা মনে করিতেন। 'বিদ্যাবাগীশ', 'ন্যায়বাগীশ' উপাধির যে দুই-দশজন ভট্টাচার্য ছিলেন, তাঁহাদিগকে কেহ 'বাঘীশ' বলিলে আহ্লাদিত হইতেন।

সবল পৌণ্ড্রেরা অনেকেই 'বাঘ', 'বাঘেয়া' ও 'বাঘচি' উপাধি পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিল। এইরূপেই রামধন বাগের এবং কৈলাস বাগদীর পূর্বপুরুষের নামকরণ হয়। কেবল বিশেষণ শব্দে বা জাতিবিশেষের নামেই যে সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকারের পরিচয় আছে এমন নহে—'বাগ্' পাওয়া, 'বাগিয়ে' লওয়া ইত্যাদি নূতন ক্রিয়া সেই সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতে বাঙ্গালার অভিধান পুষ্ট হইয়াছে। সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকারের আরও বিস্তর প্রমাণ আছে।

সুন্দরবন-বাসীরা ব্যাঘ্রধর্মাবলম্বী হওয়াতে ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য উঠিয়া গেল; চাষ-বাস কমিয়া গেল; অনেকেই নির্ধন হইল। কেবল লম্ফঝম্ফেই মন,—জ্ঞান-চর্চা উঠিয়া গেল, তাহারা মূর্খ হইল। অল্পাহারে শরীরে বল করিতে গিয়া অধিকতর বলহীন হইল; ঘোরতর জঙ্গলে একরূপ জঙ্গল-জ্বর জন্মিল; তখন সেই দারুণ জ্বরে, অর্থাভাবে, পথ্যাভাবে, ক্ষীণপ্রাণে তাহারা কতদিন যুঝিবে? প্রত্যহ সহস্র প্রাণী মরিতে লাগিল, ব্যাঘ্রধর্মাবলম্বী অধিবাসীরা প্রায় সকলেই উৎসন্ন গেল, আর রাজব্যাঘ্র সকল সেই ভীষণ গহন শ্মশান-বনে শৃগাল-হরিণ শিকার করিয়া একাধিপত্য রাজত্ব করিতে লাগিল। কথাটা শুনিলে হাসি পায়, ভাবিলে গা শিহরিয়া উঠে!

নবজীবন ১ম ভাগ ১২৯১

সমালোচনা

সমালোচনা

জয়দেব

সেন রাজগণের সময় হইতে বর্তমান বঙ্গদেশ। তাহার পূর্বের বৌদ্ধবঙ্গকে মধ্যযুগের এবং আরও পূর্বের বঙ্গকে প্রাচীনকালের বঙ্গ বলা যাইতে পারে; আধুনিক বঙ্গ আট-শত বৎসরের। আধুনিক বঙ্গে গান বা গীতিকাব্যের প্রভুত আধিপত্য। ইহার সাহিত্য সঙ্গীতময়, ইহার কাব্য সঙ্গীতময়; ইহার আমোদ-আহ্লাদ, বিলাস-কৌতুক সকলেই সঙ্গীত; ধ্যান-ধারণা, কীর্তন-ভজন—সঙ্গীতে, ক্রন্দন-কলহ—তাহাও সঙ্গীতে। বঙ্গদেশ যেমন গীতি-কবিতাকে আপনার সর্বাবয়বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়াছে—গীতিকবিতাও সেইরূপ বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বাঙ্গালির গীতিকাব্য বাঙ্গালি বিচিত্র বিধানে অঙ্কিত করিয়া 'এই দেখ' বলিয়া জগতের সমক্ষে ধরিতে পারে। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের মধুর পদাবলি, সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতির কালী-কীর্তন, হরুঠাকুর প্রভৃতির কবিগান, নিধুবাবু প্রভৃতির টপ্পা—আমাদের গৌরবের সামগ্রী, পরিচয়ের স্থল। ইংরাজি সাহিত্যের আগমে বঙ্গসাহিত্য নূতন পরিচ্ছদে নিত্য পরিশোভিত হইতেছে, কিন্তু এখনও গীতিকবিতা তেমনই উজ্জ্বলা, তেমনই মধুরা। রাজা রামমোহন রায়ের বিবেক-সঙ্গীত, সত্যেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা, হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীত, বিহারীলালের সারদা-মঙ্গল, গোবিন্দবাবুর যমুনালহরী প্রভৃতি শত সহস্র গান, গীতি ও উচ্ছ্বাস—এখনও জগতে প্রদর্শনের সামগ্রী।

সেই 'জয় জগদীশ হরে' হইতে এই 'বন্দে মাতরম্' পর্যন্ত, সেই—

ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে,
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত- কুঞ্জকুটীরে

হইতে এই—

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্।
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্॥

পর্যন্ত এক অনন্ত স্রোত, অনন্ত প্রবাহ অবিরাম গতিতে, অবিচ্ছিন্ন অবয়বে দুকূল ভাসাইয়া, কুলুকুলু রব করিয়া বাঙ্গালির প্রেমভক্তি, বাঙ্গালির আনুরক্তি, বাঙ্গালির কোমল হৃদয়ের কোমল ধর্ম, বাঙ্গালির সরল প্রাণের তরল মর্ম—এই আটশত বৎসর সমানে বহিয়া আনিয়া অনন্তের চরণ-প্রান্তে নীত করিতেছে। ইহাই বাঙ্গালির জীবন, ইহাই বাঙ্গালির ইতিহাস। আমরা ভাল বা মন্দ আর পাঁচজনে বিচার করুন; কিন্তু আমরা যে-কি তাহা অগ্রে আমাদের বুঝা চাই। আমরা স্বভাবের সৌন্দর্যের গোলাম; গোলাম বটে, কিন্তু পিয়ারের গোলাম,—মনিবের হাবভাব, লীলা-লাবণ্য, রসরঙ্গ—সকলই বুঝি; তিনি তাঁহার লীলাখেলা আমাদের দেখাইতে ভালবাসেন, আমরা দেখিতে ভালবাসি। তিনি হেলিয়ে দুলিয়ে, দুবাহু পসারি রূপরাশি ছড়ায়ে যান, আর আমরা সেই সৌন্দর্যরাশি ভিজায়ে ভিজায়ে, মজায়ে মজায়ে ভোগ করিয়া থাকি।

দুঃখও মজায়ে মজায়ে ভোগ করিতে শিখিয়াছি। দুঃখের মজা ক্রন্দনে; আমরা দুঃখে মজিতে জানি, কাঁদিতে জানি। কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে জানি। গাহিতে গাহিতে সুখদুঃখের সমাধিদাতাকে ডাকিতে জানি। স্বভাবের সৌন্দর্য-বোধের এই উচ্ছ্বাস, আর সেই সৌন্দর্য উপভোগের উল্লাস, দুঃখের হৃদয়দ্রাবী ক্রন্দন, আর ক্রন্দনের পর নিবেদন, আর সুখদুঃখ সকল সময়েই ভক্তিভরে ভগবানের ভজন—এই পঞ্চোপকরণে বাঙ্গালির গীতিকাব্য; আর সেই গীতিকাব্যই বাঙ্গালির নিত্যজীবন এবং ধারাবাহিক ইতিহাস।

এই অনন্তচারিণী, সুখ-দুঃখ-ভক্তি-বাহিনী-সুরধুনী—গীতিকবিতার অমৃত-ধারার হরিদ্বার-ক্ষেত্র—জয়দেব গোস্বামী। জাহ্নবী সর্বত্রই পূতসলিলা, তথাপি হরিদ্বার সেই পূতবারির পূততম পুণ্যতীর্থ। গীতগোবিন্দ সেইরূপ বাঙ্গালির গীতিকাব্যের অপূর্ব পুণ্যতীর্থ। বাঙ্গালায় যেখানে যে প্রবর, শাখা, সম্প্রদায় থাকুক সকলেরই এক গোত্রে উৎপত্তি। বাঙ্গালার গীতিকাব্য একমাত্র জয়দেব-গোত্রজ।

পূর্ব প্রবন্ধে (১৩৩ পৃষ্ঠা) আমরা দেখাইয়াছি, জয়দেব গোস্বামী হইতে বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্মের রাগমার্গের পরম ও চরম স্ফূর্তি হয় এবং সেই রাগমার্গ হইতেই মহাপ্রভুর প্রণোদিত ভক্তিমার্গের উৎপত্তি।

জয়দেব প্রভৃতি বঙ্গে যেরূপ ভক্তিক্ষেত্র স্থাপনা করেন সেইরূপ এক অভিনব সাহিত্য- এবং সঙ্গীত-ক্ষেত্রও সংস্থাপন করেন। জয়দেবের ভাষা, জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদবিন্যাস-পদ্ধতি এবং সঙ্গীত-রীতি আর পাঁচটা জিনিসের সংঘর্ষণ পাইয়া ক্রমে ক্রমে এই ছন্দোবন্ধময়ী পদ-লালিত্য-সমন্বিত সঙ্গীত-জীবন সৃষ্টি করিয়াছে।

জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্তিনী ভাষা।* একটু অনুধাবন করিলেই গীতগোবিন্দের শ্রোতারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

দিনমনি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন
মুনিজন-মানস-হংস।
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন
যদুকুল-নলিন-দিনেশ ॥
মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন
সুরকুল-কেলি-নিদান।
অমল-কমল-দল-লোচন ভব-মোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান ॥

বাঙ্গালির মুখে এরূপ নাম-সঙ্কীর্তন বাঙ্গালা বলিব না ত কি বলিব ?

চন্দন-চর্চিত-নীলকলেবর-
পীতবসন-বনমালী—

আর, ধীর-সমীরে যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী—

এইরূপ পদসকল চিরদিনই আদর্শ বাঙ্গালা বলিয়া গৃহীত হইবে।

চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং
শীলয় নীল নিচোলম্—

দূতীর মুখে এইরূপ ভারতী শুনিলে একটু হাসি পায় ; মনে হয়, দূতী বুঝি আপনার উপদেশের গাম্ভীর্য-প্রদর্শন-জন্যই অনর্থক অনুস্বর দিয়া বাঙ্গালাকে সংস্কৃত করিতেছে। বাস্তবিক জয়দেবের গানগুলির ভাষা এমনই সহজ, এমনই সরল, এমনই বাঙ্গালার মতনই বটে।

বাঙ্গালা পদ্যের ছন্দ প্রধানত দুইটি—পয়ার ও ত্রিপদী। ঐ দুইটির লঘু-গুরু, ভঙ্গ-অভঙ্গ, কুঞ্চিত-বিস্তৃত, মিত্র-অমিত্র করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা কাব্য গ্রথিত হইয়াছে। তদ্‌ভিন্ন একাবলি আদি যে সকল ছন্দ আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই বাঙ্গালা ছন্দের পরিবার-মধ্যে পরকীয়া পরিচারিকা। বাঙ্গালার আসরে না নাচিতে পারে, না গাহিতে পারে ; পাঁচটার মিশালে একটু আসর জাঁকাইয়া বসিয়া থাকে মাত্র। আসরের জুড়ী—পয়ার ও ত্রিপদী।

জয়দেবের গীতগোবিন্দে ঐ দুই ছন্দের পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হয়।

বাঙ্গালার কোন ছন্দই প্রথমে অক্ষরবৃত্তি ছিল না, সকল ছন্দই মাত্রাবৃত্তি ছিল। দশ হইতে বিশ পর্যন্ত এক এক চরণে অক্ষর-সংখ্যা থাকিলেও ছন্দ সাধারণত পয়ার নামে অভিহিত হইত। একাবলী, দ্বাদশাক্ষরী প্রভৃতি ছন্দের পৃথক্ নাম ছিল না। পদ্য মাত্রকেই পয়ার বলা হইত। দুই চরণে এক পয়ার ; দুই চরণের শেষের দুই অক্ষরে মিল থাকিবে, আর প্রতি চরণে পাঁচ হইতে দশ যে কোন অক্ষরের পর যতি থাকিলেই চলিবে। যখন চোদ্দ অক্ষরের চরণ লইয়া পয়ার হইয়াছে, তখনও ছয়, সাত, আট—ইহার মধ্যে যে কোন অক্ষরের পর যতি থাকিত। এমন-কি ভারতচন্দ্রেও এরূপ আছে। জয়দেবের অনেকগুলি গান এইরূপ পয়ার বলিলেই চলে।

সরস মসৃণমপি মলয়জপঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥

---

* ১২৮০ সালের অর্থাৎ ২য় বৎসরের ৭ম সংখ্যার বঙ্গদর্শনে আমরা এই মত প্রথমে প্রকাশ করি। জয়দেব-চরিতে রজনীকান্ত গুপ্ত সেই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ এবং জয়দেবের জীবনী ও সমালোচনা সমেত যে একখানি উৎকৃষ্ট গীতগোবিন্দ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও বলা হইয়াছে, 'জয়দেব বাঙ্গালি কবিগণের আদিগুরু, তাঁহার ভাষা প্রায় বাঙ্গালা।'

এই পাদটীকা-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রবন্ধ-শেষে লিখিত হইয়াছে।

দিশি দিশি কিরতি সজল কণজালং।
নয়ননলিনমিব বিদলিত নালম্॥
নয়ন বিষয়মপি কিশলয়তল্পং।
গণয়তি বিহিত হুতাশ বিকল্পম্॥
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলং।
বালশশিমিব সায়মলোলম্॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং।
বিরহবিহিত মরণেব নিকামম্॥

এইটি চতুর্থ সর্গের গীতাংশ। এইরূপ ষষ্ঠের, সপ্তমের, নবমের এবং একাদশের অনেকগুলি গীতে দৃষ্ট হইবে। সকল স্থলেই দুই চরণ, শেষে মিল, চরণের মধ্যে যতি এবং তের, চোদ্দ বা পনের অক্ষর মাত্র আছে।

ত্রিপদীতে দুই চরণ এবং চরণের শেষে পরস্পর মিল থাকে। প্রতি চরণে দুইটি করিয়া মধ্যযতি থাকে। তাহাতেই প্রতি চরণ ত্রিপদী হয়। দুইটি যতি-স্থলে আবার মিল থাকে। জয়দেবে তিনটি ত্রিপদীর গান আছে, একটির কিয়দংশ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, 'দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন' ইত্যাদি। এখনকার দিনে ঐটিকে ভঙ্গ ত্রিপদী বলিতে হয়। আর একটিরও দুই চরণ, 'ধীর সমীরে' ইত্যাদি এবং 'চল সখি কুঞ্জং' ইত্যাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। এইটি ত্রিপদী, তবে কোথাও পাঁচের পর, কোথাও ছয়ের পর মধ্যযতি আছে। তৃতীয়টির ভণিতা এইরূপ—

ইহ রসভণনে কৃত-হরিগুণনে মধুরিপু পদ-সেবকে।
কলিযুগ-চরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপ-জয়দেবকে॥

ঐ তিনটি সম্পূর্ণ গান ত্রিপদী। এক-আধ চরণ ত্রিপদী অন্য গানের মধ্যেও আছে; জয়দেবের প্রসিদ্ধ

স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।

এইরূপ।

জয়দেবের ভাষা- ও ছন্দ-সম্বন্ধে বোধ হয় যথেষ্ট বলা হইল। এক্ষণে তাঁহার গান-সম্বন্ধে কিছু বলিব। বাঙ্গালার কীর্তনাঙ্গ সঙ্গীত-নায়কগণের নিকট বড় আদরের জিনিস, অথচ সাধারণের হৃদয়গ্রাহী। এরূপ হৃদয়-দ্রাবিণী করুণাগীতি জগতে আর আছে কিনা জানি না। কীর্তনে সমজ্‌দার অসমজ্‌দার নাই। যে-কোন ভাবের মানুষ হও না—ভদ্র-অভদ্র, পাষণ্ড-ভণ্ড, মূর্খ-জ্ঞানী, দুঃখি-ধনী কীর্তন সকলকে সমতলে বসাইবে, হৃদয় গলাইবে, দুই গণ্ড দিয়া দর-বিগলিত ধারা বহাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, দুঃখের মজা ক্রন্দনে। এখন বলি, ক্রন্দনের মজা কীর্তনে। বাঙ্গালি কান্নার মজা জানে বলিয়াই কীর্তন পাইয়াছে, আর কীর্তন পাইয়াছে বলিয়াই কান্নার মজা বুঝিয়াছে। যে কাঁদে নাই সে মানুষ নহে, আর যে কীর্তনে কাঁদে নাই সে বাঙ্গালি নহে। এই কীর্তনের পরিচিত আদিগুরু জয়দেব গোস্বামী।

জয়দেবের পদাবলি আজি আটশত বৎসর ধরিয়া সমানে একই ভাবে গীত হইতেছে। আর কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে কিনা, জানি না। বেদের সামগীতি বা দায়ুদের সামগীতি (psalms) সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গীত হইতেছে বটে, কিন্তু সে সকল মানব-জীবনের অত্যদ্ভুত স্ফূর্তি-ব্যঞ্জক বিকাশ এবং মানব-হৃদয়ের আশ্চর্য উচ্ছ্বাস হইলেও সঙ্গীত নহে; তালের খেলা, তানের লীলা, যন্ত্রযোগে সুর-সঙ্গতি, দ্রুত-বিলম্বিত গতি—এ সকল তাহাতে নাই। সামগানাদি সঙ্গীত নহে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কিন্তু রাগে-তালে, সুরে-লয়ে ভরপুর। এই বিগত আটশত বৎসর বাঙ্গালি সঙ্গীত-চর্চায় শিথিল-প্রযত্ন হয় নাই; বনের মধ্যে বন-বিষ্ণুপুর দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে, পাহাড়ের উপর ত্রিপুরা নানা রাগের ধ্রুবপদ সৃষ্টি করিয়াছে, আর বঙ্গকেন্দ্র নবদ্বীপে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়াতে সমগ্র বঙ্গের সর্বত্র গোস্বামী বৈষ্ণবগণ কীর্তনের ঐকান্তিকী সাধনা করিয়াছেন। এত সাধনাতেও আধুনিক কীর্তন কিন্তু জয়দেবকে এক বিন্দু অতিক্রম করিতে পারে নাই। কোরানের ভাষার মত জয়দেবের কীর্তন চিরদিনই অনুকরণীয় এবং অনুল্লঙ্ঘনীয় রহিয়াছে। অথচ একইভাবে সমানে গীত হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছিলাম, আর কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জানি না। জয়দেব আমাদের আদি অথচ চিরকালই জীবন্ত গুরু।

জয়দেব হইতে যে কেবল বঙ্গের কীর্তনাঙ্গের উৎপত্তি

হইয়াছে এমন নহে, পাঁচালি প্রভৃতিও জয়দেবের অনুকরণে স্বষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

গান-সময়ে গায়কের স্থিতি ও গতির বিভেদ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালায় গান-পদ্ধতির বিভেদ হইয়াছে এবং বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। গায়কেরা পাদচারণ করিয়া বেড়াইলে পাঁচালি, নাচিয়া নাচিয়া গাহিলে নাচাড়ি, বসিয়া গান করিলে বৈঠকী ও কেবল দণ্ডায়মান থাকিয়া গান করিলে দাঁড়াগান। যে-কোন প্রকারের গান গায়ক যে-কোন ভঙ্গিতে গাহিবেন—এমন নহে; এক একরূপ কেতার গান এক একরূপ ধরণে গীত হইত; এখনও প্রায় তাহাই হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রধানত পাঁচালি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে পাঁচালি ও নাচাড়ি দুই আছে। নাচাড়ি অতি অল্প। আমরা যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে ধর্মের গানে নাচাড়ি খুব বেশি ছিল। তখনকার ধ্রুবপদ ও ভজন, সঙ্গে সঙ্গে এখনকার খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা—এই সকল প্রধানত বৈঠকী গান। কীর্তন পত্তনে প্রধানত বৈঠকী। প্রাচীন সখীসংবাদাদি দাঁড়াকবি বলিয়া পরিচিত।

প্রাচীন পাঁচালি-পদ্ধতির বক্ষ্যমাণ লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁচালিতে গান থাকে ও ছড়া বা পয়ার থাকে। ইহাতেই সাধারণ ভাষায় বলে, 'খানিক তার রাগ-রাগিণী আর খানিক তার মুখ-জবানী।' পাঁচালিতে যে গান বা 'পদ' থাকিত, তাহার মুখটুকু ধ্রুব বা স্থিরপদ; ইহাকে ধুয়া বলিত, আর বাকিটুকু অন্তরা। অন্তরায় দুই চারি বা অনেক কলি থাকিত, প্রত্যেক কলির পর ধুয়াটি গাহিতে হইত। ছড়ার পর গান; আবার ছড়া, আবার গান—এইরূপ ক্রমাগত থাকে। প্রতি ছড়া ও তাহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী গান প্রায় একই ভাবের হয়, অর্থাৎ যে বিষয়ের গান সেই বিষয়েরই ছড়া হয়। বর্তমান সময়ে পাঁচালি প্রায় ঐরূপই আছে; তবে গানের মুখভাগ এখন আর প্রায়ই ধুয়ার মত করিয়া গীত হয় না।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাঙ্গালার আদিপাঁচালি বলিলেও চলে। ইহাতে ছড়া, গান, ধুয়া, অন্তরা ঠিক পাঁচালির মতনই আছে। তবে বাঙ্গালায় যাহাকে ছড়া বলে, সংস্কৃতে তাহাকে শ্লোক বলিতে হয়—এই মাত্র প্রভেদ।* জয়দেব-কৃত প্রসিদ্ধ দশাবতার বর্ণনে, 'জয় জগদীশ হরে'—এইটুকু ধ্রুবপদ বা ধুয়া। আর—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্
কেশব-ধৃত-মীনশরীর—

ইত্যাদি দশটি পদ দশটি কলি। প্রতি কলির শেষে ধুয়া ধরিতে হয় 'জয় জগদীশ হরে!' আর শেষের এই শ্লোকটি ছড়া—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোল-মুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্র-ক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

জয়দেবে প্রায়ই অগ্রে গান, তাহার পর সেই বিষয়ের শ্লোক বা সংস্কৃত ছড়া আছে। জয়দেবের দশাবতার-বর্ণনের গানটি ছাড়া আর সকল গানেই আটটি করিয়া কলি এবং এক একটি ধুয়া আছে। শেষের কলিটিতে ভণিতা থাকে, তাহাতে ধুয়া লাগে না।

জয়দেবের গানে এবং শ্লোকে বিভেদ না বুঝিয়া কচিৎ কোন কোন গায়কে দুই একটি শ্লোকও গান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাল ভাল গায়কে যেমন শ্রীযুক্ত গোপাল দাস, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস প্রভৃতি প্রায়ই সেরূপ ভুল করিতেন না।

গীতগোবিন্দ হইতেই যে ধুয়া-লাগানো গান এবং সেই গান ও ছড়ার মিশালে পাঁচালি স্বষ্ট হইয়াছে তাহা একরূপ অনুমান করিতে পারা যায়; অন্তত এ কথা বলিতে পারা যায় যে, ঐরূপ ছড়া, গান ও ধুয়া-মিশ্রিত কোনরূপ

---

* বালক-কালের মামুলি বিদ্রূপ এই যে, যদি কেহ শ্লোক বলিতে বলিল, অমনই বলিতে হইবে—

শোলোক মোলোক বাঁশের গোঁজা।
ভাতটি খেলেই পেটটি সোজা॥

প্রাচীনদের একটি শ্লোক ছিল—

শোলোক শিখিনু বালক-কালে।
শোলোক ভুলিনু ঘর কুটিলে

এইসকল স্থলে শ্লোক অর্থে ছড়া।

ধরণ যে জয়দেবের পূর্বে বঙ্গদেশে ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বঙ্গের কীর্তনাঙ্গের সহিত যে গীতগোবিন্দের ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। নাচাড়ি গান পাঁচালির অঙ্গজ, কিন্তু কখন স্বতন্ত্র ছিল কিনা সন্দেহ। তখনও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ রামায়ণ, চণ্ডীর গান প্রভৃতির অঙ্গীভূত হইয়া আছে।

উত্তর-পশ্চিম ও বেহার প্রদেশ ধরিয়া বলিতে গেলে 'রামযাত্রা'ই আদিযাত্রা। রামায়ণ ও রামযাত্রা—একই কথা। অয়ন এবং যাত্রা—দুই কথার একই অর্থ। রাম-যাত্রা নামের অনুকরণে 'কৃষ্ণযাত্রা' কথার সৃষ্টি হয়; ক্রমে অভিনয় মাত্রই যাত্রা হইয়াছে। রামায়ণের আদিগায়ক কুশ ও লবের নামে অভিনেতা মাত্রের নাম কুশীলব হইয়াছে। হিন্দুস্থানের (রাম) যাত্রায় এখনও দুই জন বালক কুশীবল—প্রধান গায়ক। এই দুই বালক অভি-নেতার, অর্থাৎ কুশীলবের অনুকরণে বাঙ্গালায় যাত্রার জুড়ী হইয়াছে। সমগ্র হিন্দুস্থানে আদিযাত্রা রামযাত্রা হইলেও ইদানীন্তন বঙ্গে সর্বাগ্রে কৃষ্ণযাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে। কুশী-লবের পরিবর্তে শ্রীদাম-সুবলের জুড়ী* করিয়া কৃষ্ণযাত্রার অবতারণা হয়। বোধহয় প্রথম যাত্রায় কালীয়-দমনের পালা গীত হইয়া থাকিবে, নহিলে পূর্বে কৃষ্ণযাত্রা মাত্রকেই কালীয়-দমন বলিবে কেন? যদিও জয়দেবের বহুকাল পরে বঙ্গে কালীয়-দমনের সৃষ্টি হয়, তথাপি জয়দেবের পদাবলি কালীয়-দমন যাত্রার জান্ ছিল প্রথমে পরমানন্দ অধিকারী, তাহার পরে বদন ও গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার মধ্যে জয়দেবের পদাবলি আবৃত্তি করিতেন, ব্যাখ্যা করিতেন, গান করিতেন; মধ্যে মধ্যে ঘটকালি ও কথোপকথন থাকিত মাত্র। জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মহাজন পদাবলিও আবৃত্ত, গীত ও ব্যাখ্যাত হইত। এখনও নীলকণ্ঠ গীতরত্ন সেই প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষা করিতেছেন।

বাঙ্গালার কবিগান প্রধানত চারিভাগে বিভক্ত—ঠাকুরন-বিষয়, সখীসংবাদ, বিরহ ও খেঁউড়। তাহার মধ্যে ঠাকুরন-বিষয় কেবল বন্দনা বলিলেই হয়, আর দুর্গোৎসব-সময়ে বিশিষ্ট লোকের ভবনে কবিগান হইত বলিয়া ঠাকুরন-বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আগমনী, অষ্টমী, বিজয়া প্রভৃতি গীত হইত। খেঁউড় কবির পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, বাঙ্গালার রুচির গুণে কবিগান যখন পক্ষবিস্তার করিয়া বাঙ্গালা জুড়িয়া বসিতেছিল, তখন ইহার পুচ্ছধারী হইয়া-ছিল মাত্র। সুতরাং কবির প্রধান অঙ্গ সখীসংবাদ ও বিরহ।

দেখিতে গেলে গীতগোবিন্দের বার-আনা-ভাগ সখী-সংবাদ। প্রথম সর্গে মূলগ্রন্থারম্ভ সখীসংবাদে—'রাধাং সরসমিদমূচে।' ইহাতে জয়দেবের প্রসিদ্ধ সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণন। প্রথম সর্গের দ্বিতীয় কল্পও সখ্যুক্তি—'সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাং।' ইহাতে শ্রীহরির রাসবিলাস বর্ণন। দ্বিতীয় সর্গ সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি। ইহাকেও সখী-সংবাদ বলা যায়। তৃতীয় সর্গ শ্রীহরির স্বগত বিলাপ, আবার চতুর্থ সর্গ শ্রীহরি-সমীপে সখীসংবাদ। পঞ্চমে রাধিকার নিকট সখীসংবাদ। ষষ্ঠে আবার শ্রীহরির নিকটে সখীসংবাদ। এই তিনটিতে নায়ক-নায়িকার বিরহ-বর্ণন। সপ্তমে রাধিকা স্বগতা। সপ্তমের দ্বিতীয় কল্প সখীর প্রতি রাধিকা। শেষের শ্লোক কয়টি আবার স্বগত। অষ্টমে রাধাকৃষ্ণ-সংবাদ। নবমে সখীসংবাদে রাধিকাকে প্রবোধ-দান। দশমে শ্রীহরি-কর্তৃক রাধিকার মানভঞ্জন। একাদশের প্রথম কল্প সখীসংবাদে উপদেশ। একাদশের দ্বিতীয় কল্প হইতে দ্বাদশের শেষ পর্যন্ত—মিলন। তাহাতেই বলিতে-ছিলাম, জয়দেবের বার-আনা-ভাগ সখীসংবাদ; তবে মাথুর সখীসংবাদ জয়দেবে নাই। জয়দেবের সখীসংবাদের প্রায় অর্ধেক বসন্ত- ও বিরহ-বর্ণন। সুতরাং এদিকেও দেখা যায়, জয়দেব হইতেই সখীসংবাদের ভাবভঙ্গি এবং বিরহের উপকরণ অনুকৃত, আকৃষ্ট ও সংগৃহীত হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘ সমালোচনায় আমরা একরূপ বুঝিতে

* অনেকে অনুমান করেন, শ্রীদাম-সুবল এক ব্যক্তি বা দুই ব্যক্তির নাম। কিন্তু শ্রীদাম-সুবলের পুরাতন গান যে শ্রীদাম-সুবলের উক্তিতেই শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয়। ইহার একটি সুবৃহৎ গান শ্রীদাম-সুবলের উক্তিতে গোবিন্দ অধি-কারীর যাত্রায় একবার শুনিয়াছিলাম—দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার কিছুই মনে নাই।

পারিতেছি যে, বাঙ্গালার কি কীর্তন, কি পাঁচালি, কি যাত্রা, কি কবি অল্পবিস্তরে কোন-না-কোন বিষয়ে জয়দেব গোস্বামীর কাছে সকলেই ঋণী। এখনও বঙ্গের গীতি-সাহিত্য সেই মহাজনের দ্বারস্থ, তাঁহার নিকট পদানত।

জয়দেব, এক দিক্ দিয়া দেখিলে, যেমন বঙ্গের গীতি-গঙ্গা-স্রোতের হরিদ্বার-স্বরূপ আমাদের মূল প্রস্রবণ, চির মহাজন, মহাগুরু এবং আদিকবি ; সেইরূপ অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে, সংস্কৃতরূপ বিশাল ভারত-সাগরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ আমাদের গঙ্গাসাগর। হরিদ্বারই বল আর গঙ্গাসাগরই বল—জয়দেব উভয় ভাবেই আমাদের পুণ্যতীর্থ। গঙ্গাসাগর বিশাল ভারত-সাগরের অতি ক্ষুদ্র অংশ হইলেও আমাদের নিজস্ব সাগর, আমাদের কূলপ্লাবন—কূলপাবন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের সহজ-লভ্য নমুনা। সেই ঘন-নীল-জলদোপম সতত চঞ্চল জলরাশির উপরি সহস্র খণ্ডে খণ্ডীকৃত শুভ্র স্ফটিকরাশি নিয়ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সেই সহস্র রশ্মির সহস্র কিরণ লক্ষ লক্ষ জল-কণার অবয়বে নিয়ত প্রতিফলিত হইয়া মধুরে উজ্জ্বলে নানা বর্ণ বিকিরণ করিতেছে, সেই নীলসলিলপৃষ্ঠে সমীরণের অপরূপ লীলাখেলা, আর সেই অবিরামগতি সমীরণের অঙ্কে সলিলের আনন্দ-কুন্দন, সেই অবয়ব-আবর্তনে যাদোগণের জলকেলি, আর সেই সাগর-চর বকরাজির বক্ররেখায় বিচরণ—সকলই গঙ্গাসাগর হইতে দেখিতে পাই। সেই অনন্ত কুলকুল-স্বরে প্রাণ ভরিয়া উঠে, সেই অনন্ত দৃশ্যে নয়ন ভরিয়া যায়, আর সেই অনন্তের অনন্তদেবের আমেজ পাইয়া প্রাণ আকুল হয়। জয়দেব আমাদের এই গঙ্গাসাগর ; জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাগরের সুন্দর নমুনাও বটে, সহজলভ্য নিকটস্থ পন্থাও বটে। গীতগোবিন্দ হইতে সংস্কৃত কোমল কাব্য-সাগরের সেই বিশাল, নীল, উজ্জ্বল, তরল, রসাল ছটা আমরা কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারি এবং ক্রমে সেই পন্থা দিয়া মহাসাগরে নীত হইতে পারি।

মধুর-কোমল-কান্ত-রসের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে কঠোর বা উৎকট রসের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। সমগ্র গীতগোবিন্দ-মধ্যে দুই-চারিটি মাত্র স্থলে উৎকটের একটু-আধটু আভাস আছে ; একটি স্থলের উপমা অতুল্য—অমূল্য।

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্॥

একটি উপমায় যেন জগৎ জাগিয়া উঠে ; সেই উজ্জ্বল, বিশাল, ঘোরালো, করাল কেতু-করবাল দেখিয়াছি বলিয়া সেই ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনকারী কল্কি-মূর্তিও চোখের উপর ভাসিতে থাকে। বারটি অক্ষরের ভাবে যেন আকাশ জুড়িয়া আছে—স্বর্গ-মর্ত্যে যেন সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে—হিন্দুর আশা যেন ফুটাইয়া দিতেছে। বলিহারি উপমা, আর বলিহারি কবিত্ব!

জয়দেবের ললিত-কোমল-কান্ত পদ-বিন্যাসের গুণে প্রসিদ্ধ উপমা সকলও নব কলেবর ও নব রস ধারণ করে ; তাঁহার 'অনিল-তরল-কুবলয়-নয়ন,' 'বিকসিত-সরসিজ-ললিত মুখ,' 'স্থল-জল-রুহ-রুচিকর চরণ,' 'নিকষ-কনক-রুচি-শুচি বসন,'

'প্রচুর-পুরন্দর-ধনু-রনু-রঞ্জিত মেদুর-মুদির-সুবেশং,'
'শশি-করণচ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর-সকুসুম-কেশম্,'
'রাধা-বদন-বিলোকন-বিকসিত বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গং
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল-দর্শন তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্।'

—এ সকলই সুন্দর ও মনোহর।

তাঁহার—করতল-তাল-তরল-বলয়াবলি-কলিত-শিঞ্জিত-কারিণী-নৃত্যপরা গোপিনীর বিলাস-বর্ণন, আর, পতিত পতত্রে, বিচলিত পত্রে,—পাখীটি নড়িলে, পাতাটি পড়িলে নায়িকার আগমন-আশঙ্কা করিয়া যে নায়ক চকিত নয়নে ক্ষণে ক্ষণে পথপানে চাহিতেছেন—তাঁহার উৎকণ্ঠা-বর্ণনা প্রভৃতি শতবিধ চিত্র—সকলই বিচিত্র। বনস্থলীর বসন্ত-প্রভাতের মত সেই সকল চিত্র নিয়তই আপন আপন ভাবে ভোর হইয়া হাসিতে থাকে, আর ভাবুকের মনে ধীর-মলয়-সমীরে মৃদুমন্দ ভাসিতে থাকে।

জয়দেবের বসন্ত বড় জীবন্ত, বড় রসবন্ত। প্রকৃতির বসন্তে যেমন পুরাতনপ্রায় শীতশুষ্ক জগৎ আবার জীবন্ত রসবন্ত হইয়া জাগিয়া উঠে, জয়দেবের কবিত্বগুণে কাব্যের চিরপ্রসিদ্ধ, চিরপরিচিত, চিরব্যবহৃত পুরাতন সাধন সকল

আবার তেমনি নবজীবন্ত হইয়া উঠে। মলয়-সমীর কবিগুরু বাল্মীকি হইতেও পুরাতন; তবু যখন সেই মলয়-সমীর কুসুমিতা ললিতা লবঙ্গলতাকে ধীরে ধীরে দুলাইয়া, ভ্রমর-ভ্রমরীর গুঞ্জনের সহিত আপনার প্রাণ মিলাইয়া বনস্থলীর কুঞ্জকুটীরে সমাগত হয়, কে বল এমন আছে, যে একবার আহা বলিয়া তাহাকে হৃদয়ে ধারণ না করিবে! বকুলতলায় বকুল ফুল চিরদিনই দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি; কিন্তু তবু বকুলের থোলো থোলো ফুলে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর পড়িয়া আসল জটাধারী যোগীর মত বকুলকেও আকুল করিতেছে, শুনিলেই পুরাতন বকুল যেন নবকলেবর ধারণ করে। বসন্তে সকলই বিকশিত, প্রফুল্লিত, চালিত, কূজনিত; এ সকল কথাই পুরাতন; সকল কথাই জানি; কিন্তু সেই সঙ্গে যদি শুনিতে পাই যে, জগতের আজি লজ্জা গলিয়া গিয়াছে, তাই ছোট চারাটি, ক্ষুদে লতাটি, বৃহৎ বটরাজি, গভীর বন, অনন্ত আকাশ—সকলেই হাসিতেছে, সকলেই নাচিতেছে, সকলেই গাহিতেছে, সকলেই মাতিয়াছে, তাহা হইলে বসন্তের বসন্ত বুঝিতে পারি, জয়দেবের কবিত্ব চিনিতে পারি; বুঝি যে,

শ্রীজয়দেব ভণিত-মিদ-মুদয়তি হরিচরণ-স্মৃতি-সারং।
সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণন-মনুগত-মদন-বিকারম্॥

জয়দেবের সম্যক্ পরিচয় প্রদান আমাদের অসাধ্য। আমরা পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, জয়দেবের রাগমার্গ অবলম্বনে বঙ্গে ভক্তিমার্গের অবতারণা হয়। বঙ্গের বৈষ্ণবধর্মের আদিগুরু জয়দেব গোস্বামী। এই প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বঙ্গের কবিত্ব-সাহিত্যের পরিবার সকলই জয়দেব গোত্র-সম্ভূত। আমরা জয়দেবের নিকট চিরঋণগ্রস্ত। তিনি আমাদের মহাজন, তাঁহা হইতেই গীতি-কাব্যের উৎপত্তি—তিনি আমাদের হরিদ্বার; তিনিই আমাদের মহাসাগরের মহাপন্থা—আমাদের মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর। বঙ্গের সাহিত্য-জগতে জয়দেব আদিগুরু, তিনি গীতিকাব্যের কল্পতরু। বঙ্গের ধর্ম-জগতে জয়দেব কোমল-কর চন্দ্রমা—চৈতন্যদেব প্রদীপ্ত সূর্য। এই চন্দ্র-সূর্যের আলোকে উত্তাপে বঙ্গ-বৈষ্ণবের দিবা-বিভাবরী আলোকিত ও পুলকিত রহিয়াছে।

[বঙ্কিমচন্দ্র রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

'জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্তিনী ভাষা'। তবে কি আমরা বলি যে সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা হইয়াছে। না, তাহা বলি না। সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালার জননী, মাতামহী বা পিতামহী নহেন। তবে জয়দেবের সংস্কৃত এ দুয়ের মধ্যবর্তী কিরূপে? সজীব প্রাণী হইতে উদ্ভিদ তরুলতাদির জন্ম হয় নাই অথবা উদ্ভিদ্ হইতে জন্তু সৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু পুরুভুজ বা প্রবাল একজাতি ও জীবজাতির মধ্যবর্তী। জয়দেবের ভাষাও সেইরূপ। যে ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত, অথচ "চলসখি কুঞ্জং" বলিলে নায়িকাকে আধঘোমটা-টানা পেড়ে-শাড়ী-পরিহিতা বলিয়াই বোধ হয়। যেন বাঙ্গালির মেয়ে বাঙ্গালা কথাই কহিল। কোন গ্রন্থোক্তা নায়িকা সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিতেছে, এমন বোধ হয় না। তাহাতেই বলিতেছিলাম, জয়দেবের ভাষা বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের মধ্যবর্তিনী। বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৮০]

নবজীবন ৩য় ভাগ চৈত্র ১২৯৩

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও তাঁহার কাব্য

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বড় কবি নহেন। ক্ষুদ্র বাঙ্গালি জাতির মধ্যেও উচ্চতর কবিও নহেন, কিন্তু হয়ত তিনি শেষ কবি। দরিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রাটি হয়ত চিরদিনের তরে হারাইয়াছে, আর ফিরিয়া পাইব না, সেইজন্য আমরা ঈশ্বর গুপ্তকে বড় ভালবাসি।

গুপ্ত কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে, আর একটি কথা বুঝা আবশ্যক। অনেকের মনে একটি ধারণা হইয়াছে যে, রচনায় ভাবই সর্বস্ব—ভাষাটা কিছু নয়। কিসে ভাব পরিস্ফুট হইল, তাহাই দেখিবে, ভাষার পারিপাট্য বিষয়ে

দৃষ্টিই দিবে না। এটি বড় ভুল। মহাকবি কালিদাসের মহাকাব্যের প্রথম শ্লোক দেখুন,—

বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ॥

আমি বন্দনা করিতেছি,—কিসের জন্য? না—বাক্য এবং অর্থ উভয়েতেই যাহাতে আমার প্রতিপত্তি হয়, সেই জন্য; কাহার বন্দনা করিতেছি? না—বাক্য এবং অর্থের মত যাঁহারা নিয়ত সম্বদ্ধ, সেই পার্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা করিতেছি।

মহাকবি বুঝিতেন যে, বাক্য অবহেলার পদার্থ নহে; ভাবটিতে যেমন প্রতিপত্তি চাই, ভাষাতেও তেমনই চাই। দুয়েতে সমান দখল চাই; কেন-না ভাব এবং ভাষা, পুরুষ-প্রকৃতির মত জড়িত। যাঁহার কাব্য হইতে দশটি নিরর্থক, শুদ্ধ-মাত্র-পাদ-পূরক বিশেষণ খুঁজিয়া পাওয়া ভার, তিনি যদি বাক্যের গৌরব না বুঝিবেন, তবে কে বুঝিবে বল? আমাদের সাধারণ কথায় বলে যে, সরস কথায় গালি দেয়, তাও সহা যায়, তবু কর্কশ কথায় প্রশংসা করিলে সহা যায় না। বাস্তবিক সরস কথার মাহাত্ম্য এইরূপই বটে। ইটগুলি সুপোড় হইবে, পাড়ন বেশ সোজা হইবে; তাহার পর জলে ভিজাইতে হইবে, পাটা ধরিয়া বসাইতে হইবে; তবে ত গাঁথনি ভাল হইবে। কেবল আমাঝামা-টেরাবাঁকা ইট হইলে, গাঁথনিও হয় খগাবগা। উপাদানের গুণেই ত গঠন। সুতরাং পচা বা শুকা মাছের ঝোল আর নীরস বাক্য-সংযোগে রচনা—পরিপাটী সুন্দর হইবে, প্রত্যাশা করাই ভুল।

গুপ্ত কবির রচনাতে খুব গূঢ়ভাব বা কল্পনার বিশেষ লাবণ্যময়ী লীলা-খেলা না থাকিলেও, ভাবকে কখন ভাষার বিরাগ-জন্য ম্রিয়মাণ হইতে হয় নাই। অনেক সময় হয়ত গরীয়সী ভাষার রূপচ্ছটায়, অলঙ্কার-ঘটায় কিশোরভাব বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রৌঢ়ভাব কখন রুগ্ণা, ভগ্না, রোগিণী ভাবাকে সঙ্গিনী পাইয়াছে বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা চিরদিনই চিরযৌবনা। ভাষা কোথাও তুবড়ির মত ফুটিতেছে,—আর চারিদিকে কেবল ফুল কাটিতেছে। কোথাও এই ভাদ্রের ভরা গঙ্গায় মত ছুটিতেছে, পাল-ভরে কত তরীই না তাহাতে চলিয়াছে। কোথাও বসন্ত-লতার মত ধীরে ধীরে দুলিতেছে, ফুলের গন্ধে ভোর করে। কোথাও ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের মত তড়্‌তড় করিয়া শিল পড়িতেছে। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা,—দুরন্ত বালকের মত ধরি ধরি করিতে করিতে, কুঁদিয়া চলিয়া যায়, ঠাকুরদাদাকে একটি চড় মারিয়া, ঠাকুরনদিদির দিকে একবার সহাস্য মুখভঙ্গি করিয়া তবে নাচিতে নাচিতে ফিরিয়া আসে। ভাষা বড় দুরন্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যঙ্গ-বিশারদ; রহস্যে রসরাজ—সেই জীবন্ত দুরন্ত ভাষা, আর সেই রঙ্‌-বিরঙের ব্যঙ্গ; বাসরঘরের বুড়ী ঠাকুরনদিদির মত সে এক ঢঙই স্বতন্ত্র। তাহার মধ্যে অশীল আছে, অশ্লীল আছে; রঙ্গ আছে, ব্যঙ্গ আছে; হাসি আছে, খুসি আছে; উপদেশ আছে, নিদেশ আছে; কুন্দন আছে, ক্রন্দন আছে। কিন্তু তাহাতে হিংসা নাই, ঈর্ষা নাই; নাকশিটানি নাই, চোখটাটানি নাই; অন্তর-প্রবাহে অন্তর্দাহ নাই। ঈশ্বর গুপ্তের রাগ—ভোলানাথের খোলাকথা। তুষের আগুনের মত সে রাগ, কখন গুমরে গুমরে থাকে না। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ, ইয়ারের রঙ্গ, তাহাতে দ্বেষের লেশ নাই। ঈশ্বর গুপ্তের দুঃখ, বিশ্বেশ্বর-সমীপে হৃদয়ের ব্যাকুলতা, তাহাতে দুরাকাঙ্ক্ষার নিরাশা নাই। আর ঈশ্বর গুপ্তের আনন্দলহরী—বাঁধা সুরের সাধা রাগিণী—তাহাতে অহঙ্কারের গীট্‌কারি বা ঘৃণার টিটকারি নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যঙ্গবিশারদ হইয়াও নিঃসম্প্রদায়ী লোক; তাঁহার কাছে দল-বিদল ছিল না। হিন্দু-মুসলমান,—একেলে-সেকেলে, — ব্রাহ্ম-খৃস্টান,—মেয়ে-পুরুষ, —রেঢ়ো-বাঙ্গাল,—শহুরে-পাড়াগেঁয়ে—সকলেরই উপর গুপ্ত কবির সমান দৃষ্টি আছে। যেখানে কোন ব্যতিক্রম-বিড়ম্বনা দেখিয়াছেন, সেইখানেই গুপ্তকবি প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে দুইদশ কথা বলিয়া আসিয়াছেন। আর সেই কথায় তাঁহার লক্ষ্য-অলক্ষ্য-নিরপেক্ষ সকলেই হাসিয়াছে, রসের কথায় গালি দিলেও হাসি পায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, গুপ্তকবির গরীয়সী ভাষার রূপচ্ছটায় এবং অলঙ্কারঘটায়, অনেক সময় তাঁহার কিশোরভাব বিলীন হইয়া যায়। বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যের ঐটিই

প্রধান দোষ। এমন সময় সময় হয় যে মজ্‌লিসে ধ্রুপদ শুনিতে গিয়া কেবল মৃদঙ্গীর হস্তের করতপের কেরামত দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম; সেইরূপ অনেক সময় হয় যে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পড়িলাম, ভাষাতে ছন্দেতে মেশামিশি করিয়া কাণের ভিতর দিয়া হিয়ার মাঝারে ঝড় বহিয়া গেল, অথচ কবিতায় যে একটা স্থায়িভাব তাহার কিছুই পাইলাম না। কিন্তু যেখানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কথার করতপের লোভ সংবরণ করিতে পারেন, সেখানে তাঁহার কবিতা প্রকৃতই রসময়ী। নিম্নোদ্ধৃত এই কয় পঙ্‌ক্তিতে কেমন একটি মনোহর চিত্র আছে দেখুন—

রজনীতে ভাগীরথী

আহা মরি তরঙ্গিণী কিবা শোভা ধরেছে।
রজত-রঞ্জিত শাটী অঙ্গ বেড়ি পরেছে ॥
শূন্য'পরে শশধরে হেমছটা ক্ষরিছে।
সুশীতল নিরমল করদান করিছে ॥
তটিনী-তরঙ্গে তারা কত রঙ্গে খেলিছে।
পবন-হিল্লোল-যোগে ঘন ঘন হেলিছে ॥
যেন কোন বিয়োগিনী নিদ্রাভরে রোয়েছে।
স্বপ্নযোগে পতিলাভে প্রমোদিনী হোয়েছে ॥
হাস্য-বশে সুবদন ঝলমল করিছে।
থরথর কলেবর নিথর শিহরিছে ॥

চাঁদনী রজনীতে তটিনীর ঢুলুঢুলু কুলুকুলু ভাবের সহিত, তরতর লাবণ্যের ভাব মিশ্রিত থাকে; প্রবাসগত স্বামীর সুখস্মৃতিতে উৎফুল্লা বিয়োগিনীর স্বপ্নাবস্থার উপমায়, সেই আবেশ-উল্লাস-মিশ্রিত ভাব কেমন উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে! তটিনী আপনার বশে আপনি নাই; দূরে শশধর সুশীতল নিরমল কিরণ বিকিরণ করিতেছেন, সুমন্দ সমীরণ মৃদু মৃদু বহিতেছে, আর সেই সকল কিরণমালা ঝিকিঝিকি ধীকিধীকি চলিতেছে। বিয়োগিনী মহিলাও আপন বশে নাই; স্বামি-সমাগম-স্মৃতি, দূরস্থিত শশধর-কর মত তাঁহার সর্বাঙ্গ বিভাসিত করিতেছে, বদনে মৃদু হাস্য ঝলমল করিতেছে। আর 'থরথর কলেবর নিথর শিহরিছে।' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ঐ কয় পঙ্‌ক্তি পড়া থাকিলে, জ্যোৎস্না রাত্রিতে তটিনী-তটে দণ্ডায়মান হইয়া সেই আবেগের প্রশান্তির সঙ্গে মৃদু উল্লাসের চাকচিক্য দেখিলে এই 'নিথর শিহরিছে' কথাটি আপনা আপনি মনে পড়ে।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব-বর্ণন প্রসিদ্ধ; এবারকার এই ঘোরতর বর্ষার দুর্দিনে, তাঁহার বর্ষা-বর্ণনের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভয়ঙ্কর জলধর কলেবর গরগর,
নিরন্তর গরজে সঘনে।
দীপ্তিহীন দিবাকর, শোভাশূন্য শশধর,
তারা-হারা হইল গগনে ॥
গগনের উচ্চদেশ রৌদ্রের উজ্জ্বল বেশ
পরিধান নাহি করে আর।
বুঝে তার দম্ভ রীতি, সম্প্রতি বাড়ায় প্রীতি,
বরষার প্রীতি চমৎকার ॥
ভয়ঙ্কর মেঘাম্বর পরিলেক অতঃপর,
ত্যজি উগ্র গ্রীষ্মের কিরণ।
সোণার দামিনী হার, গলায় দুলিছে তার,
পরিহার তারার ভূষণ ॥
বরষার কিবা ভাব, ক্ষেত্রের নির্মল ভাব,
নাহি আর কর্দম দর্শনে।
স্থলে জল, জলে জল, কেবল জলের দল,
ঢলাঢল প্রবল বর্ষণে ॥
হেরিয়া জলের বল আনন্দে মীনের দল,
কলকল রবে করে খেলা।
সমূহ শাবক সঙ্গে, ইতস্তত মহা রঙ্গে
ভ্রমে, ভ্রমক্রমে নাহি হেলা ॥
প্রচণ্ড মারুত বীর নহে স্থির, যেন তীর,
বৃক্ষের শরীর করে চূর্ণ।
পর্বতের অঙ্গ নড়ে, অট্টালিকা ভেঙ্গে পড়ে,
সিন্ধুজলে শূন্য হয় পূর্ণ ॥
গলাগলি তরুগণ গাঁথিয়া গহন বন,
পবনের পথ ঢেকে আছে।
ঘন ঘন শির'পরে, মত্ত বায়ু নৃত্য করে,
তরুর-তরঙ্গ তায় নাচে ॥

সাজিয়া ভীষণ সাজে, বরষা গগন-মাঝে
বিরাজ করেন অতঃপর।
মাঝে মাঝে শুভ কাজে, বজ্রের বাজনা বাজে,
বিরহীর বুকে বাজে শর॥
গ্রীষ্মের প্রতাপ-বলে, পূর্বে ছিল ধরাতলে,
কৃশা নদী বালিকার প্রায়।
না ছিল রসের রঙ্গ, ধূলায় ধূসর অঙ্গ,
তরঙ্গের রসহীন তায়॥
রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার,
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার।
হেলে হেলে চলে যায়, বিপুল সংগ্রাম তায়,
সলিলে সুখের নাহি পার॥
বরষার আবির্ভাবে, দিবানিশি সমভাবে,
হরিষে বরিষে বৃষ্টিধার।
আনন্দে অবনী ভাসে, স্বভাবে সন্তোষে হাসে,
জ্যোতি রাশি নাশে অন্ধকার॥
সতত শঙ্কার সঙ্গে, অন্ধকার মহারঙ্গে,
সমূহ প্রতিভা করে গ্রাস।
দিক্ দশ অপ্রকাশ, পরিয়া কালির বাস,
করে কাল দৃষ্টির বিনাশ॥
তমোমাখা নিশি প্রায়, দৃষ্টিপথে দীপ্তি পায়,
অর্ধরূপী শরীর সকল।
নির্ণয় করিয়া রূপ, উথলে সংশয়-কূপ,
সময়ের এমনি কৌশল॥

সমগ্র বর্ণনে বর্ষার ললিত ভৈরব দুই মূর্তিই চিত্রিত আছে, আমরা কেবল ভৈরব মূর্তির চিত্রই উদ্ধৃত করিলাম। ময়ূর, ময়ূরী, কদম্ব, ডাহুক,—ছাঁটিয়া ফেলিয়া কেবল ভয়ঙ্কর জলধরের ঘনঘটা, প্রচণ্ড মারুতের লীলাখেলা এবং অন্ধকারের মহারঙ্গ দেখাইতেছি। দেখিবেন উৎকট বর্ণনে গুপ্তকবি কেমন প্রতিভাশালী।

গলাগলি তরুগণ গাঁথিয়া গহন বন,
পবনের পথ ঢেকে আছে।
ঘন ঘন শির'পরে, মত্ত বায়ু নৃত্য করে,
তরুর-তরঙ্গ তায় নাচে॥

এই একটি শ্লোকে বর্ষাবাত্যার কেমন অপূর্ব উৎকট দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছে।

আর—

তমোমাখা নিশি প্রায়, দৃষ্টিপথে দীপ্তি পায়,
অর্ধরূপী শরীর সকল।

এই অর্ধ শ্লোকে বর্ষার অন্ধকার রাত্রির কেমন একরূপ ভীষণ বিভীষিকা যেন মাখানো রহিয়াছে।

বর্ষা-বর্ণনের কথায় গুপ্তকবির আনারস ও তপ্‌সে মাছ-বর্ণনার কথা মনে আসে। খাদ্যসামগ্রী আদি ভোগ্য বস্তুর ঈশ্বর গুপ্ত যখন বর্ণন করিতেন, তখন মনে হইত, তিনি বুঝি এতকাল কেবল সেই সকল জিনিস খাইয়াই বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার বর্ণনীয় বস্তুর সহিত তিনি যেন অভেদ আত্মা।—তাঁহার তপ্‌সে মাছ,—

কষিত কনক-কান্তি, কমনীয় কায়।
গাল-ভরা গোঁফ-দাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥

আর তাঁহার আনারস—

লুণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি॥
টুকি টুকি খেলে পরে রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল, মুখে পড়ে লাল॥

—এ সকল অতুল্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্বদেশপ্রীতি এবং মাতৃভাষায় ভক্তি তাঁহার সহজ ধর্ম ছিল। টেনেবুনে বা পেটের দায়ে পেট্রিয়টি তাঁহাকে করিতে হয় নাই। তাঁহার সময়ে স্বদেশভক্তির এত মুখভারতি ছিল না, এত আস্ফালন ছিল না। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, তখন তন্ত্র বা কোম্‌ৎ পড়িয়া শিখিতে হইত না; স্বজাতির প্রতি বা স্বভাষার প্রতি ভক্তি তখনকার একরূপ সহজধর্ম, স্বভাবধর্ম ছিল। সে ভক্তি রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল নহে। হিন্দু-মুসলমান, জৈন-বৌদ্ধ—সমগ্র ভারতবাসী একজাতি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া একরূপ জাতি-ভক্তি উঠিতেছে, পূর্বকার লোকে সে জিনিসটা যে-কি, তাহা বুঝিতেন না। অথচ স্বদেশভক্তি, স্বজাতিভক্তি একরূপ

ছিল। গুপ্তকবির কাব্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা একস্থান হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

স্বদেশ

জান না কি জীব তুমি জননী—জনম-ভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
ভূমেতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পুরাও আশ,
জাগিলে না দিবা-বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ॥
প্রসূতি তোমার যেই, তাঁহার প্রসূতি এই
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার॥
কত শস্য ফল মূল, না হয় যাহার মূল
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষত নিজ দেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥
মিছা মণি-মুক্তা-হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া!
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

বিদেশের ঠাকুর অপেক্ষা স্বদেশের কুকুরও ভাল;— জিজ্ঞাসা করি এখনকার ম্যাট্রসিনিগণ এই কথা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন কি? হৃদয়ে হাত দিয়াই উত্তর দিবেন।

ঈশ্বর গুপ্তের মাতৃভাষায় ভক্তিও তাঁহার সহজধর্ম; রাজনীতির দায় নহে। মাতৃভাষার সেবাতেই ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি হরু ঠাকুরের মত সহজ বিশ্বাসেই বুঝিতেন যে—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশীয় ভাষা,
পূরে কি আশা?

মাতৃভাষার সেবা ও মাতৃসেবা তিনি সমান জ্ঞান করিতেন। মাতৃভাষা সেবার পক্ষে তাঁহার যুক্তি এক, লক্ষ্যও এক। তিনি বলেন, তুমি শৈশবে অসহায় অবস্থায় যে ভাষার সাহায্যে আত্মকষ্ট বেদন করিয়াছিলে, আবার বার্ধক্যে অসহায় অবস্থায়, যে ভাষায় অসহায়ের সহায় ভগবান্‌কে ডাকিবে, তুমি সেই মাতৃভাষার সেবা করিবে না ত আর কাহার সেবা করিবে?

মাতৃভাষা

মায়ের কোলেতে শুয়ে, ঊরুতে মস্তক থুয়ে,
ঘন ঘন সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদু স্বরে,
আধো আধো বচন-রচন॥
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি ফুটে ভাষা,
ব্যাকুল হোয়েছ কত তায়।
মা-ম্মা-মা, বাব্বা-বা-বা, আধো, আধো, আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়॥

ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো পিসে, খুড়া বাপ, জুজু ভুত, ছুঁচো সাপ,
স্থল জল আকাশ অনল॥
ভালমন্দ জানিতে না, মলমুত্র মানিতে না,
উপদেশে শিক্ষা হোলো যত।
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত॥
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তুবোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার॥
যে ভাষায় হয়ে প্রীত পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে॥

'খাও, দাও—খাওয়াও, দেওয়াও' ঈশ্বর গুপ্তের সামাজিক ধর্ম। হাসি খুসি প্রফুল্লতা, তাঁহার নিত্যধর্ম। অতি সহজ ভাষায় তাঁহার ফিলসফি তিনি পরিস্ফুট করিয়াছেন।—

প্রভাতে উঠিয়া করি, হাস্য পরিহাস।
সে দিন করিতে হয়, যদি উপবাস॥
যায় যায় উপবাসে, দিন যায় যাবে।
সাধুসহ সদালাপে, কত সুধা খাবে॥
অমৃত ভোজন করি, যদি যায় দাঁত।
হরিগুণ লিখিয়া যদ্যপি যায় হাত॥
যায় দাঁত, যায় হাত, কিছু ক্ষতি নাই।
লেখ লেখ হরিগুণ, সুধা খাও ভাই॥
লক্ষীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥

বাস্তবিক কথা,—যদি খেতে আর খাওয়াতে গিয়া লক্ষী-ছাড়া হইতে হয়, ওতে যদি লক্ষী ছাড়েন, তাহা হইলে তিনি আলোয় আলোয় দিন থাকিতে তাঁহার সখের প্যাঁচা লইয়া সরে পড়ুন—সেই ভাল।

ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরবাদ,—যেন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতেছে। এ বিষয়ে তিনি রামপ্রসাদের নিকৃষ্ট হইলেও এখনকার ভূমানন্দ-বাগীশগণ অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গুপ্তকবি এক স্থলে বলিতেছেন, তিনি জগদীশ্বরের জনক। কল্পনা অতি বিষম, সন্দেহ নাই, কিন্তু কথা কয়টি শুনুন—

নাস্তিকেরা 'নাস্তি' বোলে করিছে নিধন।
'অস্তি' বোলে আমি করি তোমার স্থাপন॥
তোমার 'অস্তিত্ববাদ' করেছি যখন।
পাকাপাকি একখানা করিব তখন॥
জন্ম দিয়া 'বাপ' তুমি হয়েছ আমার।
জন্ম দিয়া আমি তবে কে হব তোমার?
যদ্যপি আদর কর মনেতে বিচারি।
এ সুবাদে তোমার ত 'বাবা' হতে পারি॥
বারবার 'বাবা' বলে ডেকেছি তোমায়।
একবার 'বাবা' বলে ডাক না আমায়!
ছেলের এ আবদারে আদর ত চাই।
'বাপ' বলে ডাকিলে তো লজ্জা কিছু নাই॥
অধমে বলিতে 'বাপ' লজ্জা যদি হয়।
যা বলিবে তাই বল, বিলম্ব না সয়॥
ছেলে বল, দাস বল, বলা কিন্তু চাই।
না বলিলে কোন মতে ছাড়াছাড়ি নাই॥
ফুটে না বলিতে পার, ভঙ্গি ক'রে কও।
'ওরে বাবা আত্মারাম' হাবা কেন হও?
যেরূপে জানাতে হয়, সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয় সেরূপে মানাও॥

নানা বিষয়ে গুপ্ত কবির রচনা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু স্থান-সঙ্কুলান হয় না। এবার যুগমাহাত্ম্যের নানারূপ বিড়ম্বনা-বর্ণন উদ্ধৃত করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

আচার-ভ্রংশ

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব॥
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লা-ভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বসে মুর্গি-মাস নিয়া॥
এক দিকে কোষাকুষী, আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেভিলে খায় খানা॥
ভূতের সংসারে, এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ, ছোঁড়া পূজে ভূত॥
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, ব্যাটা দেয় পেটে॥
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব, জন্তুভাব শিশু।
বুড়া বলে রামকৃষ্ণ, ছোঁড়া বলে ঈশু॥
হাসি পায় কান্না আসে, কব আর কাকে।
যায় যায় হিন্দুয়ানি আর নাহি থাকে॥

বোধেন্দু-বিকাশ হইতে ঐ মর্মের একটি গানও এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।

রাগিণী—বাহার। তাল—খেমটা

প্রাণে জ্বোল্‌তে হোলেই বোল্‌তে হয়।
পোড়া দেশের লোকের আচার দেখে
চোল্‌তে পথে করি ভয়॥
ঢুকে কারাগারে, সাধু হোলো চোর
বন্দীগুলো ফন্দি কোরে, পালায় ভেঙ্গে দোর।
এক ফাঁকা-ঘরে, শোল্‌তে জ্বলে,
জোর বাতাসে, সে-কি রয়? ।১।
ওরে 'পাঁচঘরা' আর 'দশ্‌ঘরার' মেলা,
সাৎগাঁয়ের কাছে 'এক্ গাঁয়েতে',
কোর্তেছে খেলা।
কোরে ঢলাঢলি দশ দিকেতে,
ঢোল্‌তে থাকে সমুদয়। ।২।
এরা অগ্রদ্বীপের মেলা কোরে সায়
নেড়া হোয়ে নবদ্বীপে, চোলে যেতে চায়
কেটা জলের ঘরে আগুন জ্বালে?
সহজ বড় সহজ নয়। ।৩।
হয়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাৎসমুদ্র পার
কাছে থাক্‌তে পারে, রাখ্‌তে পারে,
শক্তি আছে কার?
ওরে, মুখের বাহির হোলে পরে
সাধ্য কি আর কথা কয়? ।৪।
মুখে, প্রেমানন্দ-হাটে কর হাট, আমার
আমার, তোমার তোমার ছাড়ো মিছে ঠাট
এই ভাঙা হাটে, ঢেঁটুড়া পিটে,
দিচ্ছ কারে পরিচয়? ।৫।
দেখি সমভাবে, সবগুলো অসৎ,
কেউ বেঁচে থেকে সং হোলো না, মোরে হবে সৎ,
যার মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
ক্ষেপেছে সব জগৎময়। ।৬।

গুপ্তকবির পুরণোপঞ্জী হইতে লুপ্ত উদ্ধার করিয়া আমরা আমাদের পাঠিকাগণকে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম; তাঁহারা যেন না বলেন যে কই, আমাদের কথা গুপ্তকবি কি কিছু বলেন নাই? বলেছেন বৈকি। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী শুনুন,—

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রত কর্ম কোর্তো সবে।
এক বেথুন এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ বি শিখে, বিবি সেজে,
বিলিতি বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে;
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে!
সব কাঁটা চাম্‌চে ধোর্বে শেষে,
পিঁড়ে পেতে আর কি খাবে?
ও ভাই, আর কিছু দিন বেঁচে থাক্‌লে,
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

আছে গোটাকতক বুড়ো য দিন,
ত দিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই, তারা মলেই দফা রফা,
এককালে সব ফুরিয়ে যাবে।

নবজীবন ২য় ভাগ ভাদ্র, আশ্বিন ১২৯২

কাব্যি-সমালোচনা

কল্পনা কি ছায়াময়ী? আমি ত বলি, কল্পনা সুস্পষ্ট-অবয়বা, সুদৃষ্ট ভঙ্গিমতী এবং উজ্জ্বলবর্ণা। কল্পনার প্রিয় সহচরী কবিতাও ত ছায়াময়ী নহে, তবে তোমরা এরূপ কুয়াসার কুহেলিকায়, নিরাশার প্রহেলিকায় বঙ্গসাহিত্য গোধূলি গোধূলি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন?

প্রকৃতিতে যে পরাকৃতির অংশ আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়াই কল্পনার লীলাখেলা, তাহা লইয়াই কবিতার কুন্দন। পরাকৃতি ত অস্পষ্ট ছায়ময়ী নহে—সুস্পষ্ট কায়াময়ী। তবে সুস্পষ্টকে অস্পষ্ট করিবার জন্য তোমরা পাঁচজনে এত ব্যগ্র হইয়াছ কেন?

আছে—প্রকৃতিতেও ছায়া আছে। ছায়া প্রকৃতি ছাড়া নহে। আবার ছায়াতেও পরাকৃতিভাব আছে এবং সেটুকু কবিতার লীলাস্থলীও বটে। কিন্তু আমরা যখন নিরাশার কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন হই, তখনই আমাদের সেই ধুঁয়া ধুঁয়া ভাব ভাল লাগে; ভাল না বাসিলেও ভাল লাগে। অতীত যখন আমাদিগকে প্রতারণা করে, বর্তমানের বিকট ভ্রূকুটি যখন সহ্য করিতে পারি না, যখন আমরা আপনাদিগকে ভবিষ্যতে অবলম্বনশূন্য মনে করি, তখন দৃষ্টি ক্ষীণ হয়, কর্ণে কেবল ঝীম ঝীম রব শুনিতে পাই, শিরায় শিরায় রীন রীন করিতে থাকে। তখন অন্তরে ধুমা, বাহিরে ধুমা, অনন্তে ধুমা—সকলই ধুমাময় বোধ হয়। যে সৌন্দর্য দেখিতে শিখিয়াছে, সে সেই কুজ্ঝটিকা-মধ্যেও অনন্তের ছায়া দেখিতে পায়। আর, অনন্তের উপলব্ধি ছায়াময়ী হইলেও তাহাতে সৌন্দর্য বিভাসিত হয়। স্বীকার করি, সৌন্দর্যের সেই অপূর্ব বিকাশ কবিতার সম্পত্তি, তথাপি জিজ্ঞাসা করি যে, এই নিরাশার কুয়াসা লইয়াই কি কবিতা মুগ্ধ থাকিবে? সংসার নিরাশা? না, আশা?—জীবন নিরাশা? না, ভরসা?

এই হেমন্তের প্রাতঃকালে একবার ঘনঘটিত কুয়াসায় এই মহানগরী সমাচ্ছন্ন ছিল বটে। বৃক্ষ জড়সড়, লতা গুঁড়িসুঁড়ি, পাতা টস্‌টস, ঘাস ভিজেভিজে, ময়দান ধুঁয়া, কেল্লা ধুঁয়া, চারিদিকে ধুঁয়া—মাঝে মনুমেণ্ট ধুঁয়ার র‍্যাপার মুড়ি দিয়া কেবল ধুঁয়াই দেখিতেছিল—কিন্তু সে ভাব আর এখন আছে কি? ঐ দেখ, একটু বেলা হইয়াছে, তরু সর্‌সর করিতেছে, তবু দেখ, লতা তাহার সর্ব শরীর বঙ্কিম করিয়া বাম দিক্ হইতে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে; ঐ দেখ, এই রহস্য দেখিয়া পাতা করতালি দিতেছে; ঘাস আনন্দে লুটিতেছে; স্বয়ং ময়দান সমস্ত বক্ষে লইয়া চৌরঙ্গির চৌঘুড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটাছুটি করিতেছে; কামান কোটর সকল বিকাশ করিয়া কেল্লা-দানব দন্ত করিতেছে; জাহ্নবী শত জাহাজ বক্ষে ধারণ করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে; —আর মনুমেণ্ট নগ্নদেহে, সমানে উত্তরে বাতাসকে উপহাস করিতেছে। ইহাতে আশা দেখিতেছ? না, নিরাশা দেখিতেছ?

চল, তোমার আকাশেই চল; অনন্ত হইতে অনন্তেই চল। ঐ যে নীলাকাশে অনন্তের বক্ষে ধীরে ধীরে পাখা মেলিয়া চীল উড়িতেছিল উহা নিরাশা? না, আশা? ঐ যে দিবাদেব অলক্ষ্য গতিতে ক্রমে তোমার দিকেই অগ্রসর হইতেছেন,—সেই ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর মূর্তি নিরাশার? না, আশার? বিশ্বের সর্বত্রই ত গতিশক্তি, সর্বত্রই ত চলাচল, সর্বত্রই ত বৈচিত্র্য, সর্বত্রই আশা—জীবনে-মরণে, সংসারে-বাহিরে, অনন্তায়-অনন্তে। সর্বত্রই আশা—তবে তোমরা কেবল নিরাশ-নিরাশ! হুতাশ-হুতাশ! উদাস-উদাস! শব্দে সাহিত্য পরিপূরিত করিবে কেন?

জগদ্‌গ্রন্থের প্রথম পাঠ না পড়িয়া, আপনাকে আপনারা বুঝিতে না পারিয়া, আত্মপ্রতারিত হইয়া তোমরা অনর্থক নিরাশার কুহকে পড়িয়াছ, কাজেই কুহেলিকা দেখিতেছ আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে শিক্ষা করিয়া সেই বাষ্পময়শ্বাসে কেবল কুহেলিকা নিঃসরণ করিতেছ। না—ওরূপ আর করিও না, ওরূপ চলিবে না।

তোমাদের কথায়, শেলির সেই নদীগর্ভে নৌকার উপর ন-পুং-ন-স্ত্রী জীবসৃষ্টি মনে পড়ে। তোমাদের গুরুভক্তি ধন্য; তোমাদের মহাগুরুর আদর্শ তোমাদের কবিতার সর্বত্রই বিরাজমান। তোমাদের উচ্ছ্বাস—ন-কাব্য, ন-কবিতা—কেবল কাব্যি—না-মরদ, না-মহিলা—কেবল কাব্যি।

শেলির অন্তর্জগৎ সত্যসত্যই কুজ্ঝটিকাময় ছিল। সেই অন্তরের কুয়াসায় তিনি তাঁহার বহির্জগৎ আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। শেলি মনে করিতেন, তিনি বসন্তের বুল্‌বুলের মত শাখীতে শাখীতে গান গাহিয়া, ফুলে ফুলে উড়িয়া উড়িয়া জীবন যাপন করিবেন; কিন্তু তাঁহার বিষম শিক্ষা-বলে তাঁহার সাধের বসন্তে চিরদিনের তরে কেবল কালবৈশাখী লাগিয়া ছিল। সেই কালবৈশাখী তাঁহার শাখী ভাঙ্গিতে লাগিল, তাঁহার ফুল ছিঁড়িতে লাগিল; শেষে হঠাৎ তুফান তুলিয়া তাঁহার সাধের তরণীস্থ সোণার খাঁচা ডুবাইয়া দিল।

শেলি শিক্ষাদোষে অভ্যাস করিয়া আপনার অপূর্ব বসন্তে কুয়াসা করিয়াছিলেন। তিনি বায়রনের ধূপছায়ায় ধূপ ফুটাইতে না পারিয়া কেবল ছায়ার মায়ায় মজিয়াছিলেন। বায়রন নিঃশ্বাস ফেলিতেন, ধূমের সহিত তাহাতে অগ্নি নিকষিত; শেলি নিঃশ্বাস ফেলিতেন—ধূঁয়া—ধূঁয়া—কেবল ধূঁয়া।

পাহাড়ের অসাড়, অনড়, কর্কশ, কঠিন কঠোরতা,—সাগরের দুর্জয় গর্জনের সঙ্গে উত্তাল তরঙ্গ,—প্রভঞ্জনের নিদারুণ ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ-বজ্র-ভরা প্রখরা বৃষ্টি,—গ্রীষ্মের ভীষণ প্রতাপ,—বসন্তের অনন্ত সৌন্দর্য—সর্বত্রই বায়রনের লীলা-খেলা। শেলি খুঁজিতেন কেবল ছায়া, নিভৃতি, নিরালয়, বাসি ফুলের ম্লানভাব, কুল্যার অর্দ্ধস্ফুট কুলকুল রব; বাতাসের হুতাশ, আকাশের উদাস, চাতকের পিপাসা, আর পাতকীর নিরাশা।

শেলি বায়রনের শেড, শেলি বায়রনের ছায়াভাগ, শেলি বায়রনের কালিমার অংশ,—বিলাতের উনবিংশ শতাব্দীর সেই অর্দ্ধগঠিত, অসম্পূর্ণ ছায়াময়ী মূর্তি তোমরা আদর্শ করিবে কেন?

লঙ্কায় গেলেন দরিদ্র, লইয়া এলেন হরিদ্র। বিলাতে সোণা আনিতে গিয়া ভাই! সোণার রংই দেখিলে—ওজনও দেখিলে না, উজ্জ্বলতাও বুঝিলে না। যদি শেক্সপিয়ার-প্রমুখ বিলাতের পূর্বতন কবিগণ পুরনো পাপী বলিয়া তোমাদের পরিত্যাজ্যই হইয়া থাকে, যদি নূতনেই মজিতে হয়, আর এই উনবিংশ শতাব্দীই তোমাদের আদর্শের এলাকা হয় তবে নূতন ছায়ায় মজিলে কেন? নূতন কায়ায় মজিলে না কেন? বায়রনের যে জ্বলন্ত প্রত্ন-ভক্তিতে ইটালি কাঁপিতে থাকে, য়ুনানী মাতিয়া উঠে,—কৈ তোমার সেই প্রত্ন-ভক্তি, সে দেশ-ভক্তি, সে আশা, সে উৎসাহ, সে সাহস, সে সজীবতা, সে স্ফূর্তি কৈ? একে এদিকে বণিগ্-বৃত্তি বিদেশীয় রাজার শোষণে এবং কতকগুলি পাশব-বৃত্তি রাজকর্মচারীর পেষণে আমাদের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, অন্য দিকে কতকগুলি নির্বোধ ব্রাহ্মণের অর্থলোভে আর কতকগুলি দুর্বোধ সংস্কারকের নাম-লোভে আমাদের সামাজিক গগন ধূলিধূসরিত, তাহার উপর তোমরা যদি আমাদের নবমুকুলিত সুকুমার সাহিত্য-সহকার-কুঞ্জে কেবল কুয়াসার সংঘটন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অকালে মুকুলগুলি চুঁইয়া যাইবে—ফলের আশা দুরাশা হইবে। তাই বলি, তোমরা কৃতী হইতে গিয়া আর এমন অকীর্তির উদ্‌যোগ করিও না।

সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের চিরন্তন আদর্শ। সংস্কৃতে কোথাও কোথাও জটিলতা, কুটিলতা, কূট, কাটব্য আছে; জটিলতাতে কোথাও অস্পষ্টতাও হইয়াছে। কিন্তু সেটা ভাষার দোষে—ভাবের পূর্তি হয় নাই বলিয়া নহে। মূর্তির অস্পষ্টতা—প্রচলিত সংস্কৃতে নাই বলিলেও চলে। কালিদাসের ছায়াময় মেঘের মায়া কাহিনীতেও দেখ কেমন স্পষ্ট ছবি। নির্বাসিত যক্ষরাজ রামগিরির কন্দর উষ্ণশ্বাসে পরিপূরিত করিতেছে, কিন্তু তাহার ভূধর, নগর, নদী, নগরীর বর্ণনা—কেমন উজ্জ্বল, কেমন রঙ্গভরা; কেমন সুন্দর, কেমন সুস্পষ্ট। যক্ষ-কর্তৃক যক্ষপত্নীর ধ্যান কেমন জীবন্ত, প্রতিভাত, সহজ এবং সরল! সে সকল উজ্জ্বল আদর্শ কিসে যে তোমাদের পরিত্যাজ্য হইল তাহা বুঝি না।

বাঙ্গালা সাহিত্য সূতিকাগার হইতেই সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব

কবিগণের নন্দ-যশোদা, শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীমতী, বৃন্দাচন্দ্রা, শ্রীদাম-সুবল, মান-মাথুর, রাস-প্রভাস—সকলই বর্ণনার গুণে আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ। যেখানে জগদ্‌বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ-বংশী আপনার সম্মোহিনী ধ্বনিতে সংসার আচ্ছন্ন করিতেছে, সেখানেও দেখিবে চিত্র অতি স্পষ্ট—প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান।—

যতেক গোধন নাহি খায় তৃণ
জড়বৎ কোন কারণে;
যমুনার জলে বহিছে উজান
তরু হিলে বিনা পবনে।

যেখানে বিদ্যাপতি অনন্তের উপাসনায় বিভোর সেখানেও অনন্তের চিত্র সুস্পষ্ট।—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা;
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা।

—বিশাল সাগররূপ অনন্তের বক্ষে ব্রহ্মা আদি দেবগণ লহরীর মত উঠিতেছেন পড়িতেছেন। এই সামান্য সরল কথায় অনন্তের লীলাখেলা যেন চোখের উপর ভাসিতে থাকে।

ঐ ত কবিত্ব, ঐ ত কল্পনা। অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া দৃষ্টিপথে ধরিবে, তবেই ত তুমি কবি; নহিলে আমাদের যে সামান্য দৃষ্টিটুকু আছে তাহাও যদি কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া রোধ কর তাহা হইলে আর কবিত্ব কোথায়? সে ত কেবল কাব্যি।

কেবল বৈষ্ণব কবিগণ বলিয়াই নহে, বাঙ্গালার পূর্বতন সকল কবিই সুস্পষ্ট চিত্রণে সমীচীন। গীতিকাব্যের ত কথাই নাই, উহা জগতে অতুল্য। বাঙ্গালির গান বর্ষার রামধনুর মত নিবিড় কাদম্বিনী-কোলে জ্বল্‌জ্বল করিতে থাকে।

বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্যগুলিও জলন্ত অক্ষরে লেখা। কবিকঙ্কণের দারিদ্র্য-দুঃখ-বর্ণনা, যে কখন দুঃখের মুখ দেখে নাই তাহাকেও দীন-হীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

দুঃখ কর অবধান—দুঃখ কর অবধান—
আমানি খাবার-গর্ত দেখ বিদ্যমান!

—দুবেলা দুসন্ধ্যা অন্ন জুটে না, কোন দিন ভাত খাই, কোন দিন-বা আমানি খাইয়া কাটাই। খাবার ত কোন পাত্র নাই; ভাত পাতে খাওয়া যায়, আমানি ত পাতে খাওয়া যায় না, হাঁড়িতেও খাইতে নাই, মেঝেয় গর্ত করিয়া করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতেই ঢালিয়া আমানি খাই। যে আমানি খাইয়া মধ্যে মধ্যে দিন কাটায় সে অত কথা বলিবে কেন? সে বলিল, আমাদের দুঃখ বুঝিবে ত ঐ আমানি খাবার গর্ত দেখ। দারিদ্র্যের কি কঠোর অভিব্যক্তি! কথা কয়টা বুকের ভিতর বসিয়া যায়! ভাঙ্গা ঘরের গর্ত কয়টা বিলাসিগণের জটে ধরিয়া, তাহাদিগকে নাড়া দিতে থাকে। আবার বলি ইহাই সার্থক কবিত্ব, সার্থক কল্পনা—সার্থক প্রতিভা।

আর নদীর ধারে কসাড়বনে তোমাদের জ্যোৎস্না গা ঢালিয়া দিয়া ঘুমায়, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘোলা ঘোলা কবিত্বও ঘুমাইতে থাকে। এ পোড়া ঘুম কি আর ভাঙ্গিবে না? দেখিয়াছি, চাঁদনি চক্‌চক করিতে থাকে—নদী ঝক্‌মক করিতে থাকে—জ্যোৎস্না জাগিয়া উঠে। তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে না কেন? ঘুম ভাঙ্গিলেও অহিফেন-সেবীর মত ওরূপ অনন্ত ঝিমুনিতে ঝিমাইতে থাক কেন?—একবার চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাও, ছায়ার মায়া কাটাইয়া উঠ। দেখ চারি দিকেই আশা, চারি দিকেই ভরসা; সৌন্দর্য ফুটিতেছে, উৎসাহ ছুটিতেছে, রূপরাশি ফুটিয়া পড়িতেছে—আনন্দের উৎস উঠিতেছে। উঠ, চক্ষু মেলো; দেখ—আর তোমাদের সামর্থ্য আছে, দশজনকে এই সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য দেখাইয়া জীবন সার্থক কর।

কবিতা আশাময়ী, কবিতা কায়াময়ী, কবিতা আলোক-ময়ী, কবিতা প্রভাময়ী, কবিতা উচ্ছ্বাসময়ী, কবিতা আনন্দ-ময়ী, কবিতা করুণাময়ী, কবিতা চিত্রময়ী, কবিতা বৈচিত্র্য-ময়ী, কবিতা সৌন্দর্যময়ী। কবিতায় আকৃতির বৈচিত্র্য—প্রকৃতির বৈচিত্র্য—বর্ণের বৈচিত্র্য—স্বরের বৈচিত্র্য—তালের বৈচিত্র্য—তানের বৈচিত্র্য—নানারূপ বৈচিত্র্য আছে।

কেবল সে-যেন, কি-যেন, কেন-যেন, কোথা-যেন, যেন-যেন করিলে কবিতা হয় না।—

সে-যেন কোথায় হায়! কি-যেন বলেছে,—
কেন-যেন তার স্মৃতি অন্তরে আমার
জ্বলেও না—নিভেও না; শুধুই সে-যেন
নিরাশ হতাশ করে, উদাসিয়া মন—
বিহ্বল, বিভোর—যেন তামসে আবৃত।

এমন করিয়া কেবলই যেন-যেন করিলে, ছায়া-ছায়া আঁকিলে আর হতাশ, হুতাশ, উদাস, আকাশ বলিলেই কেবল কবিতা হয়—আর কিছুতে হয় না, এমন নহে। কবিতার অস্থি আছে, মজ্জা আছে, রক্ত আছে—মাংস আছে; কবিতা কেবলই ছায়াময়ী কায়ার বাষ্পময় দীর্ঘশ্বাস নহে।

শেলি, শেলি, শেলি—কেবল শেলির দোহাই দিয়া কি এই কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, কবিরঞ্জনের পরিপুষ্ট ও পরিত্যক্ত অপূর্ব সাহিত্য-সম্পত্তি নষ্ট করিবে?

বায়রন-সম্প্রদায়ের জীবন্ত জ্বলন্ত প্রতিমায় শেলি-সম্প্রদায় শেড লাগাইয়াছেন বলিয়াই শেলি-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব। একবার বায়রন-সম্প্রদায়ের জ্বলন্ত মূর্তি উঠাইয়া লও, দেখিবে বিলাতের উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত ছায়াময় কাব্য অতলের অতলে ডুবিয়া যাইবে। ধূপছায়ায় ধূপের গুণেই ছায়ার আদর। তোমরা ছায়া—তোমাদের ধূপ কৈ? ছায়া—কিসের ছায়া? বায়রনের ছায়া শেলি; শেলির ছায়া হইবে? একে ছায়ার ছায়া, তাহাতে বিদেশের ছায়া—এ দেশে লাগিবে কেন?

নবজীবন ৩য় ভাগ অগ্রহায়ণ ১২৯৩

কাব্য ও

যাহা মস্তিষ্ক মাত্র স্পর্শ করে, হৃদয়ের সহিত যাহার কোন সংশ্রব নাই, তাহার নাম বিজ্ঞান; আর যাহা মস্তিষ্ক স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে আঘাত করে তাহার নাম কাব্য। জ্ঞানাত্মক কথার নাম বিজ্ঞান, আর রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য।

বিজ্ঞান ও কাব্যে আন্তরিক বিভেদ এইরূপ। এতদ্ভিন্ন এতদুভয়ের মধ্যে গঠন-প্রণালীর বা অঙ্গসংস্থানেরও বিশেষ বিভেদ আছে। বিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে পরিপুষ্ট; কাব্য প্রায়ই সমকেন্দ্রী অবয়ব-বিশিষ্ট। উদাহরণে বুঝা যাইবে। ইউক্লিডের জ্যামিতির একটি প্রতিজ্ঞায়, প্রথম কথাটি হইতে দ্বিতীয় কথাটি, তাহা হইতে তৃতীয়টি, এইরূপে শেষ কথাটি বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত গ্রন্থখানিই এইরূপ; ইহাকেই বলি ক্রমান্বয়ে পরিপুষ্ট। কিন্তু কাব্যের প্রকৃতি বিভিন্ন। কাব্যের সকল অঙ্গগুলিই স্বাধীনভাবে কোন একটি রসের পরিপোষণ করে। রতিবিলাপের যেখানটি পড়িবে, সেই খানটাই করুণ রসের পোষণ করিবে, ইহাকেই বলিতেছি সমকেন্দ্রী অবয়ব-বিশিষ্ট।

চলন-বলন, বেশ-ভূষা লক্ষ্য করিয়া কাব্য এবং বিজ্ঞান উভয়েরই আর এক প্রকার বিভেদ হইয়া থাকে। তাহার নাম গদ্যপদ্য-ভেদ। সোজাসুজি কথাবার্তার মত বলিলে বা লিখিলে গদ্য হয়; আর পদ বা ছন্দ অথবা তাল থাকিলে পদ্য হয়। পদ্যে বিজ্ঞান, যেমন ভাষাপরিচ্ছেদ, লীলাবতী প্রভৃতি; গদ্যে কাব্য, যেমন কাদম্বরী, টেলিমেকস প্রভৃতি।

সাধারণত কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষা—গদ্য ও কাব্যের ভাষা—পদ্য, এবং এইরূপ হওয়াই উচিত। তাই বলিয়া পদ্য-রচনা দেখিলেই যে তাহা কাব্য বলিব এমন কিছু কথা নাই; গলায় উপবীত দেখিলেই ব্রাহ্মণ বলিতে পারি না।

পদ্যকে কাব্য বলি না, পরন্তু পদ্য অপেক্ষা কাব্যের প্রাধান্য স্বীকার করি; অথচ পদ্যকে অবহেলা করিতে পারি না। শরীর অপেক্ষা মনের প্রাধান্য স্বীকার করি; অথচ যিনি মানসিক উন্নতীচ্ছু হইয়া শরীরে অবহেলা করেন তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি না। সেইরূপ যিনি কবিত্ব-প্রয়াসী হইয়া পদ্যে অবহেলা করেন, তাঁহার উপরও আমাদের শ্রদ্ধা নাই।

বাঙ্গালির মত শরীরের দিকে না তাকাইয়া কেবল মানসিক উন্নতির চেষ্টা করিলে যেমন অধঃপতন হয়, শেষে কোন উন্নতিই হয় না, সেইরূপ কাব্যে ও পদ্যে উভয়ে সামঞ্জস্য করিয়া না চলিলে, কোনটিই ভাল হয় না। কিন্তু রুচির পরিবর্তনে এক এক সময়ে এক এক দিকে লোকের ঝোঁক যায়। আমরা বালককালে কেবল পদ্যের দিকে লোকের বিষম ঝোঁক দেখিয়াছি। তাহার পরিণাম—

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হরিশ্চন্দ্র মিত্র ও দাশরথি রায়। সেই সময় ইংরাজি চর্চা বাড়িতে লাগিল, ইংরাজিতে কাব্য বেশি, পদ্য কম। সুতরাং ইংরাজি চর্চার আধিক্যে আর ঐ কয়জন পদ্য-রচয়িতার বাড়াবাড়িতে স্রোত একটু উল্টা বহিতে লাগিল। এখন যেন বোধহয় যে, গ্রন্থকারগণের কাব্যের দিকে যেরূপ ঝোঁক পদ্যের দিকে সেরূপ নাই। এটিও ভাল বলি না।

২৭ চৈত্র ১২৮৩] [সাধারণী—৭ ভাগ, ২৪ সংখ্যা

নাটক

[আধুনিক বাঙ্গালা নাটক]

কোন এক প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন যে, মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্যই মনুষ্যের উৎকৃষ্টতম পাঠ্যপুস্তক। কবি বা দার্শনিক, ব্যবসায়ী বা রাজনীতিজ্ঞ—সকলের পক্ষেই মনুষ্যচরিত্রের কোন-না-কোন ভাগ মূলধন। যিনি মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি কবি হইলে ব্যাস বা সেক্সপিয়ার, দার্শনিক হইলে শঙ্করাচার্য বা কোম্‌ৎ, ব্যবসায়ী হইলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, এবং রাজনীতিজ্ঞ হইলে কনিক বা মেকিয়াভেলি, চাণক্য বা ডিস্‌রেলি।

এই মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য নানা প্রকারে সাধিত হয় মনুষ্য সময়স্রোতের তাড়নায় নিরন্তরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এইরূপেই প্রাচ্যে আর্যজাতির অভ্যুত্থান। এইজন্যই ইংলণ্ড তেরিজ-জমা-খরচ দেখিতেছে, স্পেন গৃহবিবাদ করিতেছে, ফ্রান্স ক্ষত দেহে প্রলেপ দিতেছে, প্রুসিয়া অস্ত্রবলে গর্বিত, তুর্কি খৃস্টানগণের ষড়যন্ত্র-ভয়ে বিকম্পিত—ইত্যাদি রূপে সময়স্রোতের তটাভিঘাত ইতিহাসের সমালোচ্য। মনুষ্য আবার কিয়ৎপরিমাণে ক্ষিত্যপ্‌তেজোব্যোমবৎ এই ভূত চতুষ্টয়ের দাস; এবং আহার ও পরিচ্ছদ-বৈচিত্র্যেও মানবীয় চরিত্রের বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। এজন্যই নাকি তণ্ডুল-ভোজী ভারতবাসী, গোল-আলু-ভোজী আইরিস ও রম্ভাফলভোজী দক্ষিণা-মেরিক, মাংসভুক্ বিজেতার চিরদাসত্বে নিযুক্ত রহিয়াছে। এজন্যই ভারতবর্ষের বুদ্ধির দীপ এত ঝঞ্ঝাবাতেও নির্বিয়াও নিবে না, আর ল্যাপলাণ্ড দেশবাসীর তিমি-পঞ্জর-নির্মিত কুটীর-মধ্যে তিমিতৈল পান করাও ঘুচিয়াও ঘুচে না। মনুষ্যচরিত্র লইয়া শীতবাতাতপের এইরূপ ক্রীড়াকুর্দন উন্নত পদার্থবিদ্যার এবং আধুনিক বাকলবিদ্যার সমালোচ্য সামগ্রী।

আবার দেখিতে গেলে মনুষ্য কিয়ৎপরিমাণে নীতিশিক্ষার স্বহস্তগঠিত পুতুল। বণিগ্‌বৃত্তিক ইংরাজের নিকট নিত্য নীতিশিক্ষা করিয়া, আধুনিক আর্যসন্তান এখন অনায়াসে অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করেন ও স্বীয় ভবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন; মুসলমানের নিকট নীতিশিক্ষা করিয়া পক্ক দ্রাক্ষাফলের মত, সুগন্ধি কর্পূরখণ্ডের মত, মহিলাগণকে বায়ুস্পর্শবিরহিত অবরোধ-রুদ্ধ করিয়া রাখেন। আবার এই নীতিশিক্ষার প্রভাব-বলেই পরমভাগবত নিত্যানন্দ-গোষ্ঠীসম্ভূত যুবক সুরা সেবনে ঘৃণিত, আর এই শিক্ষা-বলেই প্রবঞ্চকের প্রিয়শিষ্য ধর্মাচার্যের পদে অভিষিক্ত।

আর একপ্রকার দেখিতে গেলে মানুষ বাতশলাকার ন্যায় সর্বদাই তাড়িত হইয়া থাকে। সেই তাড়নাকারী কারণসমষ্টিকে সংসার বলা হয়। সকল মনুষ্যই এই জগৎ-সংসারের ক্রীড়াকন্দুক। সময়ের তরঙ্গাভিঘাতকে, জড় জগতের শক্তিসামর্থ্যকে বা নীতির উপদেশ পরিচালনাকে সংসারতাড়না বলি না; মানুষ এই কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় আবেগের উপর যে পরকীয় আবেগের আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই সংসারতাড়না বলি। সংসারতাড়নার যে একটি অপূর্ব নিয়ম আছে তাহা এইরূপ—দশদিক্ হইতে দশজনে ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে তোমায় তাড়না করিতেছে, অথচ তোমার প্রকৃতিবলে তুমি একটি নির্দিষ্ট দিকে চালিত হইতেছ। আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলিলাম, এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা তাহাকেই অদৃষ্ট বলেন। এই অদৃষ্ট বা প্রকৃতি-পরিণত-মানবের সহিত, সংসার বলিয়া অভিহিত পরকীয় আবেগ-সমষ্টির যে-যুদ্ধ, তাহাই নাটকে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই যুদ্ধ যে একের সহিত অনেকে করিতেছে, এমন নহে। এই সংসারে সকলেই সকলের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, অথচ সময়-বিশেষে এই সমরক্ষেত্রে এক একজন মাত্র অধিনায়ক বা অধিনীতরূপে পরিলক্ষিত হইতেছেন।

কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরে সপ্ত অক্ষৌহিণীর সহিত একাদশ অক্ষৌহিণী সমরে প্রবৃত্ত ছিল, অথচ তাহার ভাগ-বিশেষ অধিনায়কের নামে ভীষ্মপর্ব বা দ্রোণপর্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সংসারও সেইরূপ; কত শ্বেত পুরুষ ভারতবাসীকে উৎপীড়িত করিতেছেন, এবং স্বকীয় অমল শ্বেত অঙ্গে ফুৎকার দিয়া রাজদ্বার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন! কিন্তু সময়ে সময়ে কেবল মিয়র্স বা ফুলারই অধিনায়ক বা অধিনীতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। নাটকে সেইরূপ কেণ্ট, গ্লস্টর, এড্‌মণ্ড, এড্‌গার, বিদূষক, গনরিল, রিগাল, ও কর্দেলিয়া—সকলের মধ্যেই আবেগের 'ঘাতপ্রতিঘাত' চলিয়াছে; কিন্তু সকলের মধ্যে বার্ধক্যের বেগপরিচালিত নৃপতি লীয়রই অধিনীত, সুতরাং সমস্ত নাটকখানির নাম 'লীয়র'। নাটকের অভিমন্যুরূপী দিনেমার রাজকুমার সপ্তরথি-পরিবেষ্টিত, রজনীযোগে ভূতযোনি-কর্তৃক আক্রান্ত, পরদিন প্রণয়িনী-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত; কখন পাপিষ্ঠা গর্ভধারিণীর সহিত বাগ্‌যুদ্ধ করিতেছেন, আবার কখন-বা প্রাণবন্ধু হোরেশিয়োর পরামর্শে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; লিয়ার্টিসের বিষাক্ত বাণে জর্জরিত-কলেবর হইয়া ঈদৃশ কপটাচরণে ঘৃণায় অভিভূত—আবার সেই মুহূর্তেই বন্ধুর প্রাণরক্ষার জন্য মৃত্যুশয্যা হইতে উত্থান করিতেছেন। তিনিই অধিনায়ক এবং তিনিই অধিনীত; সুতরাং সেই নাটকের নাম 'হ্যামলেট'।

স্থূলত বলিতে গেলে, অধিনায়ক বা অধিনীত-বিশেষের সংসার-তাড়নায় বা পরকীয় আবেগসমষ্টির উত্তেজনায় যে চরিত্রগত পরিবর্তন ও পরিণাম হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। যিনি শিখিতে জানেন তিনি নাটক হইতে ইহলোকের চরমশিক্ষা লাভ করিতে পারেন। বিষভক্ষণে মৃত্যু হয়, বঙ্গদেশে বাস করিলে শরীর দুর্বল হয়, কেবল মাত্র অন্নভোজী হইলে মনুষ্য লম্বোদর সুতরাং অলস-প্রকৃতি হয়, বিলাসপ্রিয় জাতি ক্রমে কঠোরপ্রাণ জাতির কর-কবলিত হয়—ইতিহাস বা বিজ্ঞানের সমীপে যেমন এইরূপ নানা কথা শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ কাব্য-নাটকের স্থানেও আমরা গভীর নীতি শিক্ষা করিয়া থাকি। যদি ঘৃণাক্ষরেও সরলা প্রণয়িনীকে অনর্থক অবিশ্বাস কর, তবে তুমি ওথেলো বৃথা পাঠ করিয়াছ; আবার যদি প্রণয়িনীর অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করিতে ঘৃণাক্ষরে সম্মত হও, তবে তুমি ম্যাকবেথ বৃথা পড়িয়াছ। সম্মানলুব্ধ ব্যক্তিরা প্রায়ই চাটুবচনপ্রিয়। তুমি লীয়র পড়িয়াছ, এখনও কি চাটুবচনে নৃত্য করিবে? আর তুমি নেপোলিয়ন, লিঙ্কন, বিসমার্ক বা ডিস্‌রেলি—তোমরা কি মনে কর যে কেবল সীজরের বিরুদ্ধেই ব্রুটাসের বিশ্বাসঘাতকতার সমাধা হইয়াছে? শত শত ব্রুটাস হয়ত এই মুহূর্তেই তোমাদের নিমিত্ত গুপ্ত অস্ত্র শাণিত করিতেছে। কবির কল্পনা হইতে এইরূপ গভীর উপদেশ সকল পাওয়া যায়। তবে কেহ তিন বৎসরেও ঋজুপাঠের ব্যাখ্যা করিতে পারে না, আর কেহ যাবজ্জীবনেও উৎকৃষ্ট নাটকের মর্মকথার বর্ণমাত্র বুঝিতে পারে না। সংসারতাড়নায় অধিনায়ক বা অধিনীত-বিশেষের চরিত্রগত পরিবর্তন ও পরিণাম যখন নাটকের উদ্দেশ্য, এবং মানসিক আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের 'ঘাতপ্রতিঘাত'ই যখন নাটকের জীবন, তখন কথোপকথন বা স্বগত বচনই নাটকের একমাত্র দেহ।

অন্যরূপ কাব্যে কল্পনার অধিকতর লীলাচাতুরী আছে; সৌন্দর্যের স্ফুটতর বিকাশ আছে; হৃদয়ের তরতর উচ্ছ্বাস আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাম অবশ করে এমন মোহিনী শক্তি আছে, এবং হয়ত অনেক স্থলে আবেগের তরঙ্গ আছে, কিন্তু কেবলমাত্র নাটকেই সেই তরঙ্গের 'ঘাতপ্রতিঘাত' দেখিতে পাওয়া যায়। একজন কোন বন্ধুর নিকট চিত্তাবেগ প্রকাশ করিলেন, বন্ধু তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে উত্তর দিলেন, প্রথম বক্তার আবেগ অমনিই অন্যদিকে ধাবিত হইল, বন্ধুহৃদয়ের আর এক দিকে এবার আঘাত লাগিল, বন্ধু এবার সান্ত্বনা না করিয়া সহানুভূতিভরে দুইটি কথা কহিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন, তাহাতেই আবার প্রথম বক্তা বিচলিত হইলেন। এইরূপ কথোপকথন নাটকের দেহ। কিন্তু কথোপকথন থাকিলেই যে নাটকের বার-আনা হইল এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। তাহা হইলে প্লেটোর তর্কবাদ বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষড়্‌-দর্শন-সংবাদ উৎকৃষ্ট নাটক; কেন-না তার্কিকের মধ্যে যত আবেগ আছে, এত

বোধহয় সংসারে আর কাহারও নাই। কিন্তু তাহাতে সংসার কৈ? সংসারে তাড়না কৈ? অধিনায়ক বা অধিনীত কৈ? ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন, ঐ ষড়্‌দর্শন-সংবাদ বা প্লেটোর তর্কবাদে যদি দুই একটি স্ত্রীলোক থাকিত, ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর গল্প থাকিত, তাহা হইলেই ঐ গ্রন্থগুলি নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। এটিও নিতান্ত ভ্রমের কথা। তাহা যদি হইত তবে টেক-চাঁদের[১] হরিহর পদ্মাবতীর কথোপকথন, এবং যদুবাবুর[২] 'ধাত্রী-শিক্ষা'ও উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া সেক্সপিয়ারের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিত।

আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের দেহ আছে, প্রায়ই প্রাণ নাই। কেবল রসপূর্ণ কথোপকথন আছে, আবেগ-তরঙ্গের চলাচল নাই। কেবল নাটক বলিয়া নয়, আমরা সর্বত্রই শুধু বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখি, এবং বাহ্য চিত্রের উদ্দেশ্য কি তাহা ভুলিয়া যাই। অন্যান্য কাব্যেও এইরূপ হইয়াছে। এতদিন বাঙ্গালা যাহাকে প্রধান কবি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে-ছিল, সেই ভারতচন্দ্র একজন বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় কবি; তাঁহার দৃষ্টি কেবল ছন্দে আর লালিত্যে, অনুপ্রাসে ও যমকে। এখনও যাঁহাদিগকে আমরা কাব্যকাননের সারীশুক বলিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করি, তাঁহারাও কি অনেক সময়ে কেবল বাগ্বিন্যাসমত্ত নহেন? তখন সাতুবাবু, নিধুবাবু কোকিল, কমল, ভ্রমরগুঞ্জন, কদম্ব, দাড়িম্ব লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, এখন হইয়াছে 'নৈশগগনের সান্ধ্যসমীরণ'—আর 'নৈদাঘ তপনের মুর্মুরদাহন'। ফলকথা বর্ণনকাব্যে এখনও আমরা শব্দের অনুচিত শাসন এড়াইতে পারি নাই। সেইরূপ সঙ্গীতে দেখিবেন, কলবত কেবল তান লয় মান প্রভৃতি সঙ্গীতের বাহ্য প্রকৃতি লইয়াই ব্যস্ত। এদিকে করুণ রসের গানে বীভৎস-রস-পূর্ণ গমক সন্নিবেশিত করিতেছেন, বা ভক্তিরসে উৎকট বিকট গীট্‌কারী যোজনা করিয়া সম্পূর্ণ রসভঙ্গ করিতেছেন, সঙ্গীতের অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিই নাই। এইরূপ সকল বিষয়েই আমরা বাহ্যাড়ম্বরে সন্তুষ্ট। আমাদের মধ্যে সভা আছে, সমিতি আছে, সমাজ আছে। কিন্তু একতা নাই। ত্রিকণ্ঠী-শোভিত, ত্রিপুণ্ড্রক-চর্চিত, সর্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত গোস্বামী বাবাজী আছেন, আর ইমন্‌গীতি-পরিপূরিত, চন্দ্র-বীজন-সেবিত, স্ফাটিক-দীপাধার-বিলম্বিত প্রার্থনা-মন্দির আছে, কিন্তু কোথাও এক শতক ভক্তি আছে কিনা সন্দেহ! এখন গেরুয়া বসন পরিধান করিলেই যোগী, আর কথোপকথন-প্রসঙ্গে গল্প রচনা করিলেই নাটক। অহো কি দুর্ভাগ্য!

কথোপকথন নাটকের শরীর, এই কথায় নাটকাবয়ব-বর্ণনের পর্যাপ্তি হয় না। আবেগের তরঙ্গচলাচল সাধারণত কথোপকথনেই বিকশিত হয় বটে, কিন্তু আবেগচলাচলের আরও দুইরূপ পরিণাম আছে। এক, আবেগের দুইটি প্রতীপগামী সংঘাত হইতে ঘোরতর সংশয়ের উৎপত্তি এবং সেই উচ্ছ্বাসের পরিণাম গান। এই আত্মচিত্ত-পরীক্ষা ও কণ্ঠোচ্ছ্বাস উভয়ই স্বগত হইয়া থাকে, এবং ইহাও নাটকের অবয়বের মধ্যে। একাধিক ব্যক্তি মিলিয়া যে নাটকের মধ্যে গান করে, এবং কাহারও আত্মচিত্তের পরীক্ষা না হইয়াও যে স্বগত বাক্যের বিস্তার থাকে—সে সকল নাটকের অঙ্গীভূত পদার্থ নহে।

এখন নাটকের পরিচ্ছদের কথা। নাটকের ছন্দে বন্ধন, ভাষার গাঁথনি বা রচনা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত? এইবার অনেক কৃতবিদ্যের মতের সহিত আমাদের মতবিরোধ উপস্থিত। আমাদের মূল সূত্রানুসারে বঙ্গীয় নাটককারের আবেগের তরঙ্গেই যখন নাটকের জীবন, তখন ইহার পরিচ্ছদ বা ভাষাও সম্পূর্ণ তরঙ্গায়িত হওয়া আবশ্যক। ভাষার নিয়মিত তরঙ্গকেই রচনার ছন্দ বলিতে পারা যায়। নাটকের সেইরূপ ছন্দোবদ্ধ রচনা হইলেই স্বভাবসঙ্গত হয়। স্বভাবে যেখানে দেখিবেন মানসিক উদ্বেগ, সেইখানেই দেখিবেন কথা ছন্দোময়ী। আনন্দের যে নৃত্য, তাহাতে যেরূপ ছন্দ আছে, শোকের যে উচ্ছ্বাস ও ক্রোধের যে গর্জন, তাহাতেও সেইরূপ ছন্দ আছে।

মনুষ্যমন আবেগপূর্ণ হইলেই কথা কেন ছন্দোময়ী হয়, যদিও এ প্রশ্নের উত্তর দান করা তত সহজ নয়, কিন্তু এরূপ যে হইয়া থাকে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এইজন্য

[১] টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র।

[২] ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

পৃথিবীর সকল উৎকৃষ্ট নাটককারই ছন্দোময়ী ভাষাতে নাটক রচনা করিয়াছেন। যদিও সংস্কৃত ভাষার প্রধান নাটক-কারর। গদ্য-পদ্য উভয়বিধ প্রকারেই নাটকের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের মূল সূত্রের সমর্থন হয়, অপিচ খণ্ডন হয় না; কেন-না সংস্কৃতের যে গদ্য তাহা অন্য ভাষার পদ্য বলিলেও চলে। যখন শাপবশে লুপ্তস্মৃতি দুষ্মন্ত নৃপতি শকুন্তলাকে শুদ্ধান্তশ্চারিণী করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন সেই-যে শকুন্তলা একবার মাত্র ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করিয়া আবার নতনয়না হইয়া সর্বংসহাকে সম্বোধন করিয়া হৃদয়ভেদিনী উক্তি প্রয়োগ করিলেন,—বলিলেন 'ভঅবদি বসুন্ধরে দেহি মে অন্তরম্'—এই উক্তিকে আমরা গদ্য বলি না, ইহা পদ্যের চরমোৎকর্ষ। ইহাতে তরঙ্গ আছে, ছন্দ আছে, ন্যাস আছে, লয় আছে। সংস্কৃত নাটকের গদ্য এইরূপ, আর তাহাতেই সংস্কৃত নাটকে গদ্য-পদ্য উভয় পরিচ্ছদই সন্নিবেশিত আছে। বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা সেরূপ নহে, বাঙ্গালা এখনও এলাইয়া এলাইয়া পড়ে, ধরি ধরি করিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং বাঙ্গালা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক। যে ছন্দে হিন্দুস্থানী সিপাহী দুর্বল বাঙ্গালির উপর স্বীয় ক্রোধ প্রকাশ করে, যেরূপ ছন্দে পুত্রশোক-বিহ্বলা জননী বিনাইয়া বিনাইয়া আপনার শোক প্রকাশ করে, আবেগের তাহাই প্রকৃত পরিচ্ছদ। আবেগ-জীবন নাটকে সেইরূপ তরঙ্গায়িত রচনা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ নাটকের ভাষা সাধারণত অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলা আমাদের নিতান্ত কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের ভাষা কেবল তরঙ্গায়িত বা ছন্দোময়ী হইলেই যথেষ্ট হইবে না। ভাষার জমাট গাঁথনি হওয়া চাই। যেখানে মানসিক আবেগের গভীরতা আছে, সেখানে ভাষার গাঁথনি কখন বালকের মত আধ-আধ বা গোস্বামীর গীতিকাব্যোক্ত ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরের ন্যায় ধীরবাহী ও নিদ্রাকর্ষণকারী হয় না। না-বাঙ্গালা দেশেই আছে, আর না-বাঙ্গালা কাব্যেই আছে, কোথাও শোকের বা ক্রোধের, ঘৃণার বা সাহসের গভীরতা নাই। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা সর্বত্রই চির-বিরহান্তে মিলিত নায়কসমীপে রসালসা নায়িকার মত কেবলই এলাইয়া এলাইয়া যায় ও হেলিয়া হেলিয়া পড়ে। ভাষার এ বিলাসিতা হইতে আমরা কবে মুক্তিলাভ করিব বলিতে পারি না।

সংবাদপত্রে সর্বদা দেখিতে পাই, বাঙ্গালি আজিকালি পৃথিবীর মধ্যে সর্বপেক্ষা নিষ্পীড়িত জীব। শুনিতে পাই, এই দুর্বল বাঙ্গালির উপর নাকি স্বদেশী বিদেশী উভয়েই সমান অত্যাচার করিয়া থাকেন। শুনিতে পাই, সাহেব বা সাহেবের কর্মচারী, জমিদার বা মহাজন, মহামারী বা জলকষ্ট—সকলই নাকি বাঙ্গালির উপর সমান দৌরাত্ম্য করে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই নিষ্পীড়িত জাতির ভাষার এত বিলাসিতা কেন? যাহার মর্মে পীড়া, গাত্রে কশাঘাত, হৃদয়ে বেদনা, সে কেন গলি গলি আধ্ধার তালে ঝিঁঝিট খাম্বাজ গাইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়? তাহার ভাষায় আবার এত রসাবেশ কেন? লালিত্য কেন? মাধুর্য কেন? আর সেই বাঙ্গালির রচিত নাটক-নামধারী কথোপকথন-ঘটায় এত প্রণয়, প্রণয়, প্রণয় কেন? বাস্তবিক এই বাল-স্বভাব-সুলভ অল্পপ্রাণ প্রণয়েই বাঙ্গালার কাব্য বল, নাটক বল, সমাজ বল, আর যাহাই বল, সকলই ছারখার হইল। পূর্বে এই প্রণয়ের তাড়নায় জটাবল্কলধারী যোগী সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই প্রণয়ের বেগে শত শত সতী নারী জ্বলন্ত চিতায় সুখশয্যাবোধে মৃত পতিপার্শ্বে শয়ন করিতেন, আর এখনকার প্রণয়িণীগণ ভর্তার দৃঢ় অনুরোধে দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করেন, আর প্রণয়াবতার প্রণয়প্রতিমার অনুরোধে তাহাকে সঙ্গে লইয়া ইডন উদ্যানে বায়ুসেবন করিতে যান। সমাজে প্রণয়ের বেগ এইরূপ; তবে নাটকে তদপেক্ষা যে গভীর হইবে, তাহার সম্ভাবনা কেন কর? রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ডবাসীর মনে আবেগের গভীরতা ছিল। সেই সময়ের ভাষার প্রগাঢ়তাও সেইরূপ ভূরি পরিমাণে ছিল, তাহার ফল বেকন ও ফ্লর, রালী ও সেক্সপিয়ার। আমরা মনোমধ্যে একটু আবেগ হইলেই শফরীর মত ফর্ফর করি, দুখানি ক্ষুদ্র পক্ষ পাইলেই পিপীলিকার মত আকাশে উড্ডীন হইয়া হিংস্র পক্ষিগণের কবলাশ্রয়ে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হই। আমাদের

মনের যেরূপ বেগ নাই, আমাদের ভাষার সেইরূপ গাঢ়তা ও তেজ নাই। সেক্সপিয়ারের প্রণয়বীর রোমীয় যখন একটিমাত্র শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারণ করেন,—He jests at scars, that never felt a wound —আমাদের লীলাবতীর প্রণয়বাতুল ললিতমোহন সেই সময়ে আপনার পুস্তকাগারে বসিয়া কেবল হৃদয়ভাবের ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা ও টীকার উপর টীকা ও ভাষ্যের উপর অনুভাষ্য জল্পনা করিত। যাহাদের যেরূপ স্বভাবচরিত্র, তাহাদের ভাষাও সেইরূপ, কাব্যও সেইরূপ, নাটকও সেইরূপ। তাহাতেই নাটকের সুদীর্ঘ বক্তৃতা সকল জমাট করিয়া লিখিতে বলি। একে সংস্কৃত কূটগ্রন্থাবলীর অর্থবাদ করিতে এই 'সাধু'ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক বালকগণের সম্প্রসারিত অনুবাদে বা তাহাদের উপযোগী অধিকতর সম্প্রসারিত পাঠ্যপুস্তকে তাহার স্থিতি হইতেছে, ইহার উপর যদি আবার তুলি ঘষিয়া বর্ণকের উপর বর্ণক ফলাইয়া কেবল রং চড়াও, ও চিত্র বিস্তৃত কর, এখনও যদি হে জীবিতেশ্বর, হে দয়িতপ্রাণবল্লভ, হে কাশী-কাঞ্চি-দ্রাবিড়-মথুরা-উৎকল-অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-ভ্রমণ-কারিন্! হে তাল-তমাল-শাল-হিন্তাল-পিয়াল-রসাল-কিশলয়-সদৃশ শ্যামল-শোভন-নয়ন-রঞ্জন! হে বিপুল-বিশাল-বক্ষ, অতুল-রসাল-চক্ষু, কমলচরণ, চম্পকাঙ্গুলি, বিশেষবিদ্বান্, অশেষগুণনিধান বলিয়া সম্প্রসারিত পদে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে বস, তাহা হইলে আর নিস্তার নাই।

যদি বাঙ্গালির কোথাও কিঞ্চিন্মাত্র স্বাধীনতা থাকে, তবে সে কেবল ভাষাতেই আছে। আমাদের সর্বস্ব গিয়াছে কেবল মাত্র এক সম্বল আছে এই ভাষা। বিদেশী রাজা যাহাকে আদর করিয়া উপাধি প্রদান করেন, আমরা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মনে করি যে তিনিই বাস্তবিক একটি গণ্যজীব; বিদেশী শাসন-কর্তা যদি কাহারও দণ্ডবিধান করিলেন, অমনি আমরা তাঁহাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করি। বিদেশী রাজা বলিলেন এটি একটি অপরাধ, আমরা অমনি সেটিকে মহাপরাধ বলিয়া মনে করি। এইরূপে আমরা আচারে-বিচারে, শাসনে-রক্ষণে, প্রবৃত্তি-পরিচ্ছদে দিন দিন অস্থি-মজ্জায় পরাধীন হইয়া পড়িতেছি। একটু মাত্র স্বাধীনতা আছে মাতৃভাষায়। যদি আমরা বেওয়ারিশ ময়দার মত তাহা লইয়া এখন খেলা করি, তবে কি আমরা মহাপাপে পাপী নহি? এইজন্য এক নাটকের ভাষা উপলক্ষ করিয়া আমরা এত কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। কষ্ট করিয়াও কাব্য-নাটকের ভাষা আমাদের সংযত করা কর্তব্য। ভাষার ভরে ক্রমে ভাবের প্রগাঢ়তা জন্মিবে, তাহা হইলে হৃদয়ের আবেগপুঞ্জও ক্রমে গভীর হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা উপরি উক্ত হেতুবাদে সাধ্যসাধনের বিপর্যয় ঘটনা করিতেছি। আবার ঘোটকের অগ্রে শকট যোজনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহা নহে। আপাতত বোধ হইতে পারে বটে যে অগ্রে মানসিক পরিবর্তন তাহার পর ভাষার পরিবর্তন ও তাহার পর কাব্য-নাটকাদির পরিচ্ছদের পরিবর্তন। অনেক স্থলে এইরূপ যে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় ভাষার উন্নতির বলে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি হওয়াও বিচিত্র নহে। জর্মনীর পঞ্চম চার্লস বলিতেন যে আমি নূতন একটি ভাষা শিক্ষা করিলে আমার বোধহয় যেন আমি আর একটি অভিনব আত্মা পাইয়াছি।—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই। একজনকে বেকনের প্রগাঢ় ভাষার শিক্ষাদান করুন, দেখিবেন তিনি ক্রমেই স্থির—গম্ভীর হইবেন। ভাষার এইরূপ মহীয়সী শক্তি আছে বলিয়াই আমরা নাটকের ভাষার দিকে নাটক-কারগণকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলি।

এখন নাটকের পরিণামের কথা। এস্থলে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের সহিত, আমাদের বাঙ্গালির প্রচলিত প্রবৃত্তির সহিত এবং ড্রাইডেন প্রভৃতি সমালোচকগণের 'কাব্যে সুবিচার চাই' ইত্যাদি কথার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ মতবিরোধ। উৎকৃষ্ট নীতি ও উৎকৃষ্ট নাটক একই শিক্ষা প্রদান করে, উভয়েই স্পষ্টবাক্যে আমাদের মনে করিয়া দেয়, 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর'। মনুষ্যজীবনের যে পরিণাম, সংসারতাড়িত মনুষ্যজীবন-চিত্রেরও তাহাই পরিণাম। ঐ যে জনাকীর্ণ সভাস্থলে ঘোর বাগ্মী স্বদেশী বিদেশী উভয়কে দক্ষিণে বামে কশাঘাত করিতেছেন, তাঁহার পরিণাম কি? আর ঐ যে পতিবিয়োগবিধুরা বঙ্গীয় বালা নীরবে—অতি নীরবে, অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে, উহারই-বা

পরিণাম কি? ঐ যে কঠোরপ্রাণ, কবাটবক্ষ, বজ্রমুষ্টি সাহেব স্বীয় দুর্বল ভৃত্যকে পাশব বলপ্রয়োগে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া ঘর্ঘরচক্র শকটে ভজনালয়ে গমন করিলেন উঁহারই-বা পরিণাম কি? আর ঐ যে শতগ্রন্থিবসনা ভিখারিণী রোগ-শোক-জরা-জীর্ণা হইয়া রাজপথপার্শ্বে পড়িয়া আছে, উহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কেহ শুনিয়াও শুনিতেছে না, উহার রক্তহীন পাণ্ডুরচ্ছবি কেহ দেখিয়াও দেখিতেছে না, উহারই-বা পরিণাম কি? সকলেরই একই পরিণাম—সেই সার্ধত্রিহস্তপরিমিত ভূমিখণ্ডোপরি 'দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ, হিম-কলেবর।'

এই জন্যই সকল ভাষারই উৎকৃষ্ট নাটকের পরিণাম সেইরূপ হৃদয় ভেদ করে। নাটক বলিয়া নহে, উৎকৃষ্ট কাব্য মাত্রেরই পরিণাম এইরূপ। বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের অদ্ভুত গ্রন্থদ্বয়, হোমরের ইলিয়দ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিসৃষ্ট পৌরাণিক কাব্য বা মহাকাব্যগুলির পরিণামের বিষয় সকলেই জানেন। সুতরাং নাটকের পরিণামও যে সেইরূপ ঘোর বিষাদপূর্ণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? নাটকের বিষাদ-পরিণাম-সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি আছে। আমরা বলিয়াছি যে 'মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ'—এই কথাই স্বাভাবিক এবং নাটকে তাহাই থাকে মাত্র। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে স্বাভাবিক হইলেই যে কাব্যোপযোগী হইবে, এমন কি কথা আছে? বরং কবির সৃষ্টি সংসার-সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কবি আবেগপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কল্পনার সাহায্যে মানব-মণ্ডলীকে শিক্ষাপ্রদান করেন; সুতরাং তাঁহার সংসার-কৌশল স্বাভাবিক না হইয়া বরং অনেকটা কাল্পনিক; সুতরাং কাব্যের পরিণাম সংসারের পরিণামের অনুরূপ না হইলেও ক্ষতি নাই। যাঁহারা এইরূপ যুক্তিবাদ প্রদর্শন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে, 'কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্,' যাঁহাদের মতে কাব্যকলাপ তাসক্রীড়ার মত কাল কাটাইবার ও বিনোদনের সামগ্রী, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন তর্ক নাই। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষা-বলে কাব্যের উচ্চতর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং মহর্ষি বাল্মীকি বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সংহিতাকারগণ অপেক্ষা আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বিষাদ-পরিণাম নাটক হইতে আমরা গভীরতর উপদেশ প্রাপ্ত হই, এবং সেই সকল উপদেশ গভীরতর খাতে হৃদয়ে বহিতে থাকে। কেন থাকে তাহা পরে দেখানো যাইতেছে; এক্ষণে আপত্তিকারিগণের আর দুই একটি হেতুবাদের কথা বলিব।

অনেকে বলিতে পারেন যে, কবিগণকে নীতিশিক্ষক বলিয়া স্বীকার করিলেও বিষাদ-পরিণাম নাটক যে অন্য নাটক অপেক্ষা অধিকতর নীতিপূর্ণ একথা স্বীকার করা যায় না। প্রথম আপত্তি এই, সংসারে এত বিষাদ আছে যে, বিষাদে হৃদয় দ্রাবিত করিবার জন্য ঐরূপ কাব্য নাটক পাঠের কোন প্রয়োজন নাই। এই তর্ক সারগর্ভ হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে সাগর দেখিয়াছে সে আবার বায়রন বা কালিদাস হইতে সাগরবর্ণন কি পাঠ করিবে? যুবক-যুবতী যদি বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তবে তাহারা আর জয়দেবভারতী শ্রবণ করিয়া কি করিবে? ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যখন সংসার রহিয়াছে তখন আবার কাব্য কেন? স্বভাব সৃষ্টির যথেষ্ট, ইহার উপর আবার কবির কল্পনা কেন? বাস্তবিক বিবেচনা করিতে গেলে কবির কাব্য এরূপ অপদার্থ বস্তু নহে। কাব্যজগৎ এই জড়-জীব-জগতের সার,—এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে এসেন্স বা আরক। কাব্যশোধিত সংসার এক অপূর্ব সামগ্রী। কাব্যে যে তীব্রতা, যে উপকারিতা আছে, সংসারে তাহা নাই; কেন-না সংসার যদি গোলাপবারি হয়, তবে আমরা বলিব কাব্য আতর; আবার সংসার যদি দ্রাবক হয়, তবে কাব্য মহাদ্রাবক। কাব্য তীব্র বলিয়াই অধিকতর উপকারী; সুতরাং সংসারে বিষাদ আছে বলিয়া কাব্যনাটকে বিষাদ থাকিবার প্রয়োজন নাই, একথা সারগর্ভ নহে। সংসারে তুমি-আমি আছি বটে, আমাদের বিষাদও আছে, কিন্তু কাব্যে রাম ও হরিশ্চন্দ্র, জোভ ও হ্যামলেট, ওথেলো ও লীয়র, সীতা ও দেস্‌দিমোনা আছেন, সংসারে সেরূপ কোথাও নাই। যে জন্য কর্পূর থাকিতেও কর্পূরের আরকের প্রয়োজন সেই জন্যই কাব্যের প্রয়োজন। আর এক প্রকার আপত্তি আছে।—কেহ কেহ বলেন যে, বিয়োগ-পরিণাম-নাটকের একটি মহান্ দোষ এই যে, ইহাতে মনোমধ্যে সহানুভূতি সমুত্থিত হয়, অথচ তাহা হইতে কোন কার্য হয়

না। এইরূপ বারংবার হইলে মনের এমনই একটি স্বভাব হইয়া উঠে যে তাহাতে কেবল সহানুভূতিই হইতে থাকে; সেই চিত্তবেগ কখনও কার্যে পরিণত হয় না। এ কথাটি সম্পূর্ণ মনুষ্যস্বভাবের গতির বিপরীত কথা। মহাবীর আলেকজাণ্ডার জপমালার মত হোমরের অদ্ভুত গ্রন্থ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন; এরূপ প্রবাদও আছে যে, উহার সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কে বলিবে যে সেই বীররসাত্মক মহাকাব্য পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে কেবল বীররসের উদ্দীপনা হইত, কখন প্রবর্তনা হইত না। মহাবীর নেপোলিয়ন সেইরূপ জুলিয়সের স্বরচিত ইতিহাস অত্যন্ত ভালবাসিতেন। নেপোলিয়ন কি কিছুই বীরের কার্য করেন নাই? চৈতন্যদেব দিবারাত্র বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির কৃষ্ণভক্তির পদাবলী পাঠ করিতেন। গৌরাঙ্গ কি কেবল ভক্তিতেই অভিভূত রহিয়াছিলেন, কোন কার্য করেন নাই? বালকবালিকার মনে যত ভয়ের ভাব উদ্দীপন করিবে, কার্যকালে তাহারা তত ভীত থাকিবে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণেরও এই মত। তাঁহারা বলেন যে, কোন রসের স্থায়িভাব হইতেই কার্যের উৎপত্তি হয় এবং সকল কাব্যেরই প্রধান উদ্দেশ্য হৃদয়মধ্যে স্থায়িভাবের উদ্দীপনা। উৎকৃষ্ট নাটকের স্থায়িভাব শোক। যিনি কাব্যের লুক্রিশিয়া বা দ্রৌপদী দেখিয়া শোকতপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি নব্য টারকুইন বা জয়দ্রথ দেখিলে অবশ্য তাহার আক্রমণ বিফল করিতে অগ্রসর হইবেন। আরও এক প্রকার আপত্তি আছে; প্রকৃত প্রস্তাবে সেটি আপত্তি নহে, আব্দার। অনেকে আব্দার করেন যে, ভগবানের সৃষ্টিতে সুবিচার হউক-না-হউক, অন্তত কাব্যে সুবিচার চাই। এ সকল কাব্যপ্রিয় শিশুপ্রকৃতির সমালোচক মহর্ষি বাল্মীকিকে দেখিতে পাইলে এইরূপে সৎপরামর্শ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন,—'মহর্ষে! আপনি আপনার মহাকাব্যের পরিণামে সীতাদেবীকে পাতালগতা করাইয়া সুবিচারকের কার্য করেন নাই। আহা! সেইদিন যদি রামচন্দ্র সীতা সতীকে বামে বসাইতেন, আর কুশীলব যদি তাঁহাদের অঙ্কে উপবিষ্ট হইত, তাহা হইলে কি শোভাই না হইত! কি আহ্লাদের কথা হইত! আবার কিছুদিন পরে অষ্টভ্রাতার বিবাহের পর সীতা ভগিনীত্রয় সহ নবদম্পতী চতুষ্টয়কে বরণ করিয়া গৃহে লইতেছেন, দেখিতে কি সুন্দর হইত! এই সকল সমালোচকের ইচ্ছা যে, নিমজ্জমানা ওফিলিয়াকে কোন ধীবর-গৃহে লইয়া গিয়া রাখে, আর হ্যামলেট লিয়ার্টিসকে বধ করিয়া ও ক্লদিয়সকে কারারুদ্ধ করিয়া গোরার বাজনা বাজাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসেন। ইহাদের ইচ্ছা যে ছদ্ম লীয়র কর্দেলিয়ার পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার বড় মাসীদের রীতিচরিত্রের ব্যাখ্যা করেন। ইহাদের ইচ্ছা যে স্ত্রীবধোদ্যত ওথেলোর নিকটে কণ্ঠাগতপ্রায় ইয়াগো মুমূর্ষুক্তিতে আপনার ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে এবং যেরূপ একটি ক্ষুদ্র শিশু দ্বাপরের ভাদ্রাষ্টমীর নিশীথে বসুদেবের ক্রোড় হইতে যমুনায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুদিন পরে সেইরূপ একটি নীলকান্ত কালমাণিক ওথেলোর অঙ্গ হইতে দেসদিমোনার গলা জড়াইয়া ধরে। এ সকল বালকের আব্দার—বালকের মুখে শুনিতে মন্দ শুনায় না, কিন্তু বঙ্গীয় সমালোচকগণ যখন ড্রাইডেনের চর্বিত চর্বণ করিতে করিতে কুন্দনন্দিনীর সমালোচনার উপলক্ষে এই সকল কথার উল্লেখ করেন, তখন আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি না।

যদি কর্দেলিয়া আবার বাঁচিয়া উঠিতেন, তবে লীয়র যাহা বলিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহাই প্রকৃত হইত। তাহা হইলে লীয়রের যে এত শোক তাহা কেবল উপন্যাসের রচনাভঙ্গীমাত্র, আর কিছুই নহে। সেক্সপিয়ার কিন্তু তাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্য কয়খানিতে সেপ্রকার উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেন নাই। তিনি এক একখানিতে এক একটি গভীর রসের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। আজি লীয়রের জন্য কাঁদিতেছি, কাল আর লীয়রের দৌহিত্রের সঙ্গে কৌতুককলাপ দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছি, এরূপ কাব্য লীয়র নাটক নহে। লীয়রের জন্য যে দুঃখ তাহা আমাদের হৃদয়ে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে। সেইরূপ হ্যামলেট, সেইরূপ ওথেলো। সসত্ত্বা শকুন্তলাকে যখন দুষ্মন্ত পরিবর্জন করেন, তখন কেবল দুর্বাসার উপরেই ক্রোধ হয়, শকুন্তলার জন্য তত দুঃখ হয় না, কেন-না জানি যে, আবার সেই রাজদম্পতীর মিলন হইবে। কিন্তু চিরদুঃখিনী সীতার দুঃখের কথা

স্মরণে আছে বলিয়া অদ্যাপি কেহ আপন কন্যার নাম সীতা রাখিতে পারে না। আমাদের পূর্বতন মহর্ষিগণ বা পাশ্চাত্য কবিগণ যদি এখনকার যাত্রাকারগণের মত যুগলরূপের মিলন করিয়া সকল কাব্যের সমাপ্তি করিতেন, তাহা হইলে করুণরসের স্থায়িভাব আমরা কাব্যে কখনই দেখিতে পাইতাম না। তাহা হইলেই হৃদয়ের প্রধান শিক্ষার অভাব থাকিত। হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা এই রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য-জরা-জড়িত সংসারে; মানবহৃদয়ে প্রধান শিক্ষা করুণরসের স্থায়িভাবে। যে পরের দুঃখ দেখিয়া অন্তরের সহিত চিরদিন কাঁদিতে পারে, কখনও ভুলে না, ইহজগতে তাহার নীতিশিক্ষার পরা কাষ্ঠা হইয়াছে। একদিন ছিল, এককাল ছিল, যখন আর্যসন্তান সেইরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া পরের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেন। তখন আর্যসন্তান বুঝিতেন যে, যে-নদীতে জল ওদিকে যায় আবার এদিকে আসে, তাহা জোয়ার-ভাঁটার নদী, সমুদ্র-উচ্ছ্বাসের লীলাখেলার সামগ্রী, কিন্তু কখনই গভীর নায়াগ্রা প্রপাতের মত আত্মার উচ্ছ্বাসক নহে। তখনই রামায়ণ মহাভারতের সৃষ্টি হয়। তাহার পর আর্যের অধঃপতন। এই অধঃপতনের পর না হইলে ভবভূতি কখনও রামসীতার পুনর্মিলনের কল্পনা করিয়া বালকবৃন্দের করতালির প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান হইতেন না। তদবধি আমরা অধঃপাতে যাইতেছি, তাহাতেই আমরা এখন শোকের স্থায়িভাব যত্নপূর্বক পরিহার করি। আর তাহাতেই নীলদর্পণ আমাদের তত ভাল লাগে না। বাস্তবিক ভারতবাসীর এখন আর হৃদয় নাই, মর্ম নাই, আবেগ নাই। তীব্রতর, কঠোরতর, গভীরতর, গম্ভীরতর, ভাব প্রকৃতিতে কিছুই নাই। এখন বালকের মত কখন তাথিয়া তাথিয়া আছে, কখন-বা খাবার বায়না করিয়া 'মা মা' বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার আছে, কখন-বা 'দিলি না' বলিয়া কেশাকর্ষণ করিয়া ভূমে গড়াগড়ি আছে, আর কখন-বা রজ্জুতে সর্প বোধ করিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া মুদিত নয়নে অবস্থান করা আছে। সকলই বালকের মত। হৃদয়-মধ্যে কোন ভাবেরই স্থায়িত্ব নাই, গভীরতা নাই, প্রগাঢ়তা নাই। জলতলে শৈবালরাজির ন্যায় আমাদের হৃদয়ভাব সকল পবনদেবের স্বেচ্ছাচার-ফুৎকারে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে যাইতেছে; ভীমের স্ত্রীবেণী-বন্ধনের ন্যায়, ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের ন্যায়, পাষাণে গভীরখাতে ক্ষোদিত নদীশয্যার মত চিরদিন একদিকে বহে না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মানসিক আবেগের বা অন্তঃ-প্রকৃতির উচ্ছলিত তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতই নাটকের জীবন। এখন আর আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিক প্রকৃত আবেগ নাই। মানসিক হ্রদে সামান্য কুলকুলি আছে, কিন্তু গভীর প্রপাতের সহিত কল্লোল নাই। আমরা এখন বাতুলের মত হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলি। সুতরাং আমাদের মধ্যে এখন উৎকৃষ্ট নাটকের প্রত্যাশাও করা যাইতে পারে না। ভাল নাটক যে হয় না, সে এখন আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বৈগুণ্য-হেতু—কেবল গ্রন্থকার-গণের দোষ নহে। এইজন্য আমাদের দেশে ভাল নাটক হয় নাই, অথচ ভাল প্রহসন হইয়াছে। এরূপ প্রহসন অন্য কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ। কবি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা নাটকগণনায় কোথায় স্থান পায় তাহা নির্দেশ করাও কঠিন; কিন্তু দত্তজকৃত একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় শালিকের খাড়ে রোঁ নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বয় প্রহসনের আদর্শ। আবেগপূর্ণ মানবচরিত্রের কিছুই তাহাতে নাই, কিন্তু যেরূপ গৌরাঙ্গের জীব সকল এখন বাঙ্গালায় ক্রীড়া করিতেছেন, তাহাদের চিত্র সেই প্রহসন-দ্বয়ে সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

তাহার পর পণ্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্ন। বিবেচনা করিতে গেলে তিনি পণ্ডিতের পদ্ধতিতে প্রহসনের কবি, নাটকের কেহ নহেন। তাঁহার *কুলীনকুলসর্বস্ব পাঠ করিলে, কুলীন কন্যাগণের কথাবার্তা শুনিলে, যেমন সকলই গড়াপেটা বলিয়া বোধ হয়—মর্মকথা যেরূপ কর্ণে বাজে সেরূপ হয় না। আর তর্করত্নের নাটক বিষাদ-পরিণাম

* কুলীনকুলসর্বস্ব সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় লেখা প্রথম নাটক। কৌলীন্য প্রথার বিষময় পরিণাম-প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য। চুঁচুড়ায়, কলিকাতার বাহিরে মফস্বলে, অভিনীত (১৮৫৭) ইহাই প্রথম নাটক। পিতাপুত্রের ৩৮ পৃষ্ঠায় ইহার উল্লেখ আছে।

হইয়াও একরূপ প্রহসন। তর্করত্নের নাপিতানী ভাল, যখন সে অলক্তক-সজ্জা লইয়া—

'বাড়ী মোর বংশীপুরে, দেখা যায় কিছুদূরে,
ঘেরা ঘোরা ঘর দুইখানি।'

বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে দিতে রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করে, তখন আমরা তাহাকে ভারতের হীরার সহচরী করিতে প্রস্তুত হই, আর তাঁহার উদরপরায়ণ শর্মা যখন—

'ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।'—

বলিয়া উত্তম ফলার বর্ণনা করিতে থাকেন, তখন তর্করত্নের নরম লেখনীর গুণে সত্য সত্যই আমাদের রসনা রসাল হইয়া উঠে, এবং পণ্ডিতবর রামনারায়ণকে বৈদিক কুল-চূড়ামণি বলিয়াই বোধ হয়। তর্করত্নের নব নাটকও সেই—নাটক নহে, প্রহসন। নব নাটকের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গবেশবাবুকে ভুলি নাই।

তাহার পর দীনবন্ধু। দীনবন্ধু এককালে প্রকৃত দীনবন্ধুই ছিলেন।—প্রপীড়িত প্রজার জন্য দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, এখন পর্যন্ত বাঙ্গালার কোন গ্রন্থকার তাহা করেন নাই। তাঁহার অক্ষয় কীর্তি—সেই নীলদর্পণ। অনেকে মনে করেন যে, নীলদর্পণ কেবল সাময়িক তরঙ্গের উচ্ছ্বাস মাত্র; এই কথাটা কতক দূর সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। নীলদর্পণ যদি সত্য সত্যই একদিন বা দশ-দিনের জন্য হইত, যদি জেতৃবর্গের অত্যাচার কেবল দেশেই পর্যাপ্ত হইত, তাহা হইলে এ সংসার সোণার সংসার, এ ভারত সোণার ভারত। আমেরিকায় যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও একরূপ নীলদর্পণের অভিনয়। তবে সেখানে শতসহস্র বিন্দুমাধব ও নবীনমাধব একেবারে উত্থান করিয়াছিলেন, আর এখানে কচিৎ এক-আধ জন দেখা দেন—এই মাত্র প্রভেদ। বহুদিন হইল মিস্ স্টোয়ে আঙ্কল টমস্ কেবিন লিখিয়াছেন, তাহাও নীলদর্পণ। আর বৃটিশ গায়েনার শ্রমজীবী গৃহস্থগণের কষ্ট বর্ণনা করিয়া একজন বিলাতের ব্যারিস্টার যে কুলী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাও নীলদর্পণ। যতদিন এই বণিগ্‌বৃত্তিক রাজপুরুষ অন্নসংস্থান-জন্য এ দেশে আগমন করিবেন, আর যত দিন ইংরাজ রাজ বিচারে শ্বেত-কৃষ্ণের প্রভেদ করিবেন, ততদিন-নীলদর্পণে আমাদের জাতীয় জীবনের যথার্থ চিত্র থাকিবে। নরহত্যাকারী ফুলরের উপযুক্ত শাস্তি হয় নাই, এই কথা নবাগত গভর্নর বলিয়াছিলেন বলিয়া, দেখিতেছ না এখনকার পি. পি. উড ও ডবলিউ. ডবলিউ. রোগগণ কিরূপ গর্জন করিতেছেন; তবে আর কোন্ প্রাণে বলিব যে নীলদর্পণ ক্ষণস্থায়ী সমাজ-চিত্র মাত্র। তাহা যে নহে এই আমাদের দুঃখ।

দীনবন্ধু বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নাটককার। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে নীলদর্পণ রচনার পর হইতেই তাঁহার কাব্য-রস তরল হইতে থাকে। তাহার পরিচয়—সধবার একাদশী। তাঁহার নিমে দত্ত কবির একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। নিমে দত্ত স্বর্গভ্রষ্ট সয়তান, তাহার সম্মুখে কাচপাত্রে নরকাগ্নি; নিমচাঁদ এখন আর স্বর্গে অধিকার নাই বলিয়া, স্বর্গের উপর রাগ করিয়া, অবাধে সেই নরকাগ্নি দিবারাত্র গলাধঃকরণ করিতেছে। এই স্বর্গ-নরক-সমষ্টিকে দীনবন্ধু তরলমতি বঙ্গীয় যুবকের দলে স্থাপিত করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার নিমচাঁদ পূর্ণকলেবর হইয়াও স্ফূর্তি পায় নাই। নিমচাঁদের প্রয়োজন ছিল কেবল এক নরকাগ্নি। এ স্বর্গভ্রষ্ট সমাজে তাহার অভাব কোথায়? যে নরকাগ্নি হরিশ্চন্দ্রকে অকালে অতলে লইয়া গেল, যে অগ্নিতে রামগোপাল এতদিন দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে অটলের টেবিলে, গোকুলের উপবনে, কাঞ্চনের ভবনে, নিমচাঁদকে পাঠানো কেন? নিমচাঁদকে সেই হরিশ, সেই রামগোপালের মধ্যে স্থাপিত করিতে হয়—তবে নিমচাঁদ স্ফূর্তি পাইত। আর নীলদর্পণকার যেরূপ পল্লীগ্রামের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ নাগরিক চিত্রের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অধিকতর যশস্বী হইতেন। তাহা হয় নাই; দীনবন্ধু ক্রমেই তরলভাব অবলম্বন করেন। সেইজন্য তিনি নবীনতপস্বিনীতে নাটক লিখিতে বসিয়া প্রহসন করিয়াছেন, আবার জামাইবারিক প্রহসন লিখিতে গিয়া নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার লীলাবতীর নায়ক-নায়িকাকে যত-না মনে পড়ে, তাঁহার নদেরচাঁদকে তাহার অধিক মনে পড়ে। প্রহসনে দীনবন্ধু অদ্বিতীয়।

তাহার পর নয়শো রূপেয়া-কার।* তাহার নায়ক-নায়িকা ঠিক লীলাবতীর মত, কিন্তু তাহার সাতুলাল একটি প্রকৃত শোধিত চিত্র। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, সাতুলাল গাঁজায় নিমচাঁদ, সুতরাং বাঙ্গালার পূর্বতন নাটককারগণ সকলেই প্রহসনে পটু—কেবল এক নীলদর্পণ-কারই প্রগাঢ় এবং নীলদর্পণ প্রকৃত নাটক-পদবাচ্য।

এক্ষণে আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের একে একে তরঙ্গ গণনা করা আমাদের অসাধ্য, তবে সৌভাগ্যক্রমে যে কয়েক-খানি নাটক আমাদের সম্মুখে আছে, সেইগুলিকে আদর্শ করিয়াই আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারি। আধুনিক নাটক প্রধানত তিন শ্রেণীর। ১) দেশহিতৈষিতা-প্রাসঙ্গিক ২) অনুবাদ-মূলক ৩) প্রণয়-জীবন-নাটক।

আমাদের উল্লিখিত কয়খানি নাটক এই তিন শ্রেণীর; তবে দুই একখানি একটু বিশেষ সমালোচনার যোগ্য—শরৎ-সরোজিনী গ্রন্থ নিতান্ত তরলমতি বালকের জন্য নহে। শরৎ-সরোজের প্রণয় প্রগাঢ় ও পরীক্ষিত, শরতের দেশ-হিতৈষিতা তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আর ভুবনমোহিনীর প্রতিহিংসাও নিতান্ত অশ্রদ্ধার সামগ্রী নহে। ইহার ভাষা প্রায়ই প্রগাঢ়, ছন্দোবদ্ধ হইলে আরও অধিকতর আবেগপূর্ণ হইত। এক স্থলে ভুবনমোহিনীর উক্তির মধ্যে এইরূপ আছে—

'এই ভেবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কল্লেম (দন্ত-ঘর্ষণ) যে, মতিলালের রক্তে চান করে আমার মেয়েজনম সার্থক করব।' আমরা বলি এইরূপ স্থলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইলে অধিকতর আবেগপূর্ণ হইত,—

মনে মনে তাই ভাবি করিনু প্রতিজ্ঞা,
মতিলাল পাপিষ্ঠের রক্তে স্নান ক'রে,
আমার এ নারীজন্ম করিব সার্থক।

যাহাই হউক গুণগণনায় শরৎ-সরোজিনী প্রথম স্থানীয়া ও শরৎ-সরোজিনী-কার আধুনিক নাটককারগণের মধ্যে সর্বপ্রধান।

(পুরুবিক্রম নাটক-রচয়িতা কর্তৃক-প্রণীত।*)

তাহার পর হেমলতা। হেমলতা নাটকে দেশহিতৈষি-তার সঙ্গে সঙ্গে বীররস-উদ্ভাবনের চেষ্টা আছে। আমাদের পূর্বকথিত নানা কারণে হরলালবাবু ইহাতে বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু গ্রন্থকার যে কেবল প্রণয় লইয়া মত্ত না হইয়া সঙ্গে সঙ্গে টপ্পা-প্লাবিত দেশে, বীররস উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। হেমলতার কমলা দেবীতে আমরা বাৎসল্য রসের বিলক্ষণ পরিপুষ্টি দেখিতে পাই।

তাহার পর মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক। ইহাতে যবন-কলঙ্ক ঔরঙ্গজিবের হস্তে মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক শম্ভুজির দুর্দশার কথা বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে সাময়িক চিত্র প্রদর্শনের অনেক ব্যতিক্রম আছে; আর এখনকার প্রথামত তূলিকার উপর তূলিকা ঘষিয়া সুদীর্ঘ আত্ম-সমালোচনা ও বক্তৃতা আছে। বন্ধুঘাতক শম্ভুজি গদ্যে পদ্যে আওড়াইয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা স্বগত ঢালিয়াছেন; সুতরাং আবেগের ও ভাষার প্রগাঢ়তা ইহাতে অতি অল্পই আছে। কিন্তু তথাপি মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সর্বপ্রধান নাটক।

তাহার পর চারিখানিতে একই সময়ের চিত্র। তন্মধ্যে গৌরবে প্রথম 'যৌবনে যোগিনী'। ইহার অধিনায়ক একদিকে পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি, অন্যদিকে কুতবউদ্দীন প্রভৃতি।

দ্বিতীয়। 'ভারতবিজয়'। ইহারও অধিনায়কগণ পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র একদিকে, অন্যদিকে কুতব, মামুদ, রহিম প্রভৃতি।

তৃতীয়। 'ভারতের সুখশশী যবন কবলে'। ইহাতেও ঐ সকল অধিনায়ক।

এক্ষণে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে সংক্ষেপে সার-সংগ্রহ করিব।

* 'নয়শো রূপেয়া' নাটকে গ্রন্থকারের নাম ছিল না; কাহার কাহার ধারণা ইহা অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষ-প্রণীত, কিন্তু ইহার প্রকৃত লেখক শিশিরকুমারের সহোদর হেমন্তকুমার। সে সময়ে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-সমাজে পাত্রপক্ষ হইতে নগদ টাকা লইয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রথা ছিল। তাই কন্যাবিক্রয়ার্থ তাহাকে নিলামে চড়াইয়া এই প্রহসনে ডাক হইতেছিল—'নয়শো রূপেয়া' প্রভৃতি।

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত—গ্রন্থে প্রথমে গ্রন্থকারের নাম ছিল না।

মনুষ্য নানারূপে তাড়িত। সংসার-তাড়িত মানব-বিশেষের পরিবর্তন ও পরিণাম-প্রদর্শন করা নাটকের উদ্দেশ্য। মনুষ্য-হৃদয়ের আবেগ-পরম্পরা চলাচলে এই পরিবর্তন হইয়া থাকে। জীব-শরীরে শোণিত-সঞ্চালন যেমন জীবনীশক্তির মূল, আবেগ-চলাচল সেইরূপ নাটকের জীবন। আবেগপূর্ণ কথোপকথন বা স্বগত আত্মচিত্ত-পরীক্ষা বা কণ্ঠোচ্ছ্বাস নাটকের শরীর। তরঙ্গায়িত বা ছন্দোবদ্ধ রচনাই নাটকের উপযুক্ত পরিচ্ছদ। অন্য পরিচ্ছদে একরূপ চলে, কিন্তু সাজেনা। উৎকৃষ্ট নাটকের পরিণাম অতীব শোককর। এরূপ না হইলে ভাবের প্রগাঢ়তা হয় না এবং রসের স্থায়িত্ব হয় না।

উৎকৃষ্ট কাব্যনাটক রচনার জন্য ভাষার প্রগাঢ়তা অবলম্বন করা আমাদের নিতান্ত কর্তব্য ; নহিলে রসের ভাব ঘনীভূত হয় না। ভাষার প্রগাঢ়তা হইতে আমাদের ভাবের গভীরতা হইবে, তাহা হইলে ক্রমে আমরা কার্যকর মনুষ্য হইব। এখন আমাদের যেরূপ জাতীয় স্বভাব আর যেরূপ এলায়িত ভাষা, ইহাতে উৎকৃষ্ট কাব্য-নাটকের উৎপত্তি হওয়াই অসম্ভব। ভাল প্রহসন হইতে পারে, তাহাই হইয়াছে। মধুসূদন, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু ইঁহারা সকলেই প্রহসন-লেখক। প্রহসনে বাঙ্গালা অদ্বিতীয়। আধুনিক বাঙ্গালা নাটক—কেবল দুই একখানি ব্যতীত সকলগুলিই অসার। যেখানে দেশহিতৈষিতা উদ্দীপনের চেষ্টা সেখানে গ্রন্থকার প্রায়ই অকৃতকার্য। বাঙ্গালি দেশ-হিতৈষিতা কহিতে শিখিয়াছে, মর্মকথার দীর্ঘশ্বাসে এখনও অপরের হৃদয়ে দেশবাৎসল্য উদ্দীপনা করিতে শিখে নাই। কোমল বাঙ্গালি একটু কোমল প্রণয় লিখিতে, বলিতে শিখিয়াছে। অপকৃষ্ট নাটকগুলি তাহা লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আমরা পূর্বে বলিয়াছি, আবারও বলি—মর্মে যাহার পীড়া, গাত্রে যাহার কশাঘাত, মস্তকে যাহার অগ্নিবৃষ্টি, পদেপদে যাহার বিপদ্, সে কেন আধ্ধার তালে ঝিঁঝিট রাগিণীতে প্রণয়ের গীত গাইয়া বেড়ায়! বঙ্গবাসিন্, একবার প্রগাঢ় ভাষায় কঠোর ভাব উদ্দীপন করিবার চেষ্টা কর দেখি।

বান্ধব শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৩

গীতায় ভক্তিবাদ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত

'গীতায় ঈশ্বরবাদ'-এর সমালোচনা

এই অপূর্ব গ্রন্থে হীরেন্দ্রবাবু প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু কেবল সেইজন্য এই গ্রন্থের প্রশংসা করিলে গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয় না। যে সুন্দর শৃঙ্খলায় সমগ্র গ্রন্থ গ্রথিত হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থের বিশেষ গুণপণা। **গীতায় ঈশ্বরবাদ** বুঝাইতে গিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, ষড়্দর্শনের অনেকগুলিই হয় একেবারে নিরীশ্বরবাদ, না হয় সেগুলির ঈশ্বরবাদ একটা বাজে কথা মাত্র। এই কথাগুলি বুঝাইবার জন্য হীরেন্দ্রবাবু সমগ্র ষড়্দর্শনের ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। এই ভাগের ধীরতার, পুঙ্খাপুঙ্খ পর্যালোচনার ও পাণ্ডিত্যের সম্যক্ প্রশংসা করা অসাধ্য। এইরূপ দেখাইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, প্রায় সমস্ত দর্শনগুলিই যেন অসম্পূর্ণ বোধ হয়, আর মনে হয় গীতার ঈশ্বরবাদেই সেইগুলির পূর্ণতাসাধন করা হইয়াছে। এই সকল কথা তিনি অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে এবং গীতার যোগব্যাখ্যায় ঈশ্বরবাদের কথা ছাড়া হীরেন্দ্রবাবু আরও কিছু বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন, এই কথাটি উল্লেখযোগ্য। পাতঞ্জলোক্ত মুক্তি—সুখদুঃখের অতীত কৈবল্য অবস্থা। ইহাতে দুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু সুখের প্রাপ্তি ঘটে না। গীতা কিন্তু যোগের ফল অন্যরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতা বলেন—

সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥

যে-অবস্থাবিশেষে (অবস্থান-কালে) যুক্ত ব্যক্তি সেই-যে অনির্বচনীয় বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের অতীত অনন্তসুখ বোধ করেন এবং যে-অবস্থায় আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না (তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে)। ৬ অ. ২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

যে অবস্থায় অপর লাভকে তাহার অপেক্ষা অধিক মনে

করেন না, যে অবস্থায় থাকিলে মহাদুঃখেও অভিভূত হন না (তাহাই যোগশব্দবাচ্য জানিবে)। ৬ অ. ২২

তং বিদ্যাদ্ দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগ-সংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥

এবংভূত অবস্থাবিশেষকে সুখদুঃখ-সম্পর্কশূন্য যোগশব্দ-বাচ্য জানিবে। ৬ অ. ২৩

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥

(এইরূপ) রজোগুণহীন প্রশান্তচিত্ত, নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত এই যোগীকে উত্তম সুখ আপনিই আশ্রয় করে। ৬ অ. ২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাঽত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

এইরূপ সদা মনকে ব্রহ্মে যুক্ত করিতে করিতে নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ সর্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ জীবমুক্ত হন)। ৬ অ. ২৮

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥

বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয়সকলে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি আত্মাতে যে-শান্তিসুখ, তাহা লাভ করেন ; তিনি ব্রহ্মে যোগদ্বারা যুক্তাত্মা হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। ৫ অ. ২১

'পাতঞ্জল মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন। যোগের যে চরম অবস্থা নির্বীজ সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র, —ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। গীতার মতে কিন্তু যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা সাক্ষাৎলাভ হয়।...মৎসংস্থামধিগচ্ছতি— ৬ অ. ১৫। আসল কথা পতঞ্জলি বলেন, ঈশ্বর প্রণিধান করিলেও যোগ হইতে পারে ; গীতা বলেন, ঈশ্বর প্রণিধান করিলেই যোগ সম্ভব হয়।'—আবার বলি, এই সকল কথা হীরেনবাবু অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তবু যেন মনে হয়, তিনি আর একটু কিছু বলিলে বুঝি আরও ভাল হইত।

গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, 'নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কারের বশে আমরা গীতাকে রঙিল কাচের মধ্য দিয়া দেখি, তাহার ফলে গীতার শুভ্র জ্যোতি রঞ্জিত হইয়া আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। আমার চক্ষের উপরেও সেই রঙিল কাচ রহিয়াছে ; অতএব আমি যে গীতার মর্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিব, সে দুরাশা করি না।' হীরেন্দ্রবাবুর যুবার রঙিল কাচ ; আমার মূর্খতার ভ্রান্তি-ঠুলি আবার তাহার উপর বয়সের ছানি। আমি দেখি গীতায় **ভক্তিবাদ**। ভক্তিবাদের অঙ্কুর এবং যুগল পলাশ। আর ঐ-যে সুখ বা আনন্দ—ভক্তিবাদের ফুল এবং ফল। সুখ বা আনন্দের কথা গ্রন্থকার বিস্তারিত লিখিয়াছেন, ভক্তিবাদের অঙ্কুর ও মজ্জার কথা আমি সামান্যরূপে বলিবার চেষ্টা করিব।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন শোকে মগ্ন—'সংবিগ্নমানস'। তাঁহাকে শান্ত করিতে দ্বিতীয়-তৃতীয় অধ্যায় গেল। এই দুই অধ্যায়ে সমগ্র গীতার অনেক কথাই সংক্ষেপে আছে, কিন্তু আসল কথা শোকে শান্তিপ্রদান। চতুর্থ অধ্যায়ে পুরাতন যোগ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কথা অতি পুরাতন কিন্তু কালে সেই মহাযোগ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, এই সময়ে বলিতে হইল। অর্জুন সখা-ভক্ত বলিয়া তাঁহাকেই বলা হইতেছে। গীতায় ভক্তিযোগের কথাই প্রধানত আছে। কাজেই ভক্তকেই বলা হইতেছে ; —ভগবান্ আর ভক্ত—এই-যে যুগল, এ চিরদিনই আছে। 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।' তোমার আমার বহু অতীত জন্ম হইয়াছে। অর্জুন মনে মনে ভাবিতেছেন, ভাল, আমারই যেন অনেক জন্ম হইল, ভগবানের জন্ম আবার কিরূপে হয়? তিনি অজ, তিনি অব্যয়াত্মা, তিনি 'ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ', তাঁহার জন্ম কিরূপে হয়? এই সন্দেহ দূরীকরণ-জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, 'স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায়'—নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, নিজ প্রকৃতি বজায় রাখিয়া 'আত্মমায়য়া'—নিজেরই মায়া-দ্বারা ; 'সম্ভবামি'—আমি জন্মগ্রহণ করি। অর্জুন মনে মনে ভাবিতেছেন, ভাল, তাই যেন হইল, কিন্তু তোমার গরজ কি ঠাকুর? ঠাকুর ঐ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, গরজ আছে বৈকি, আমি যে মঙ্গললীলাময়, আমি যে ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান দেখিতে পারি না ; যে-যে সময়ে

ধর্মের গ্লানি বা অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই-সেই সময়েই আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ভক্তিবাদের এইটি একটি মূলকথা। ভগবানের এই মহাবাক্যে যিনি বিশ্বাস করিতে পারেন, তিনি মহাসৌভাগ্যবান্ পুরুষ। পরমসুন্দরের গোলোকধামে নিত্য রাসলীলা যদি আমরা বুঝিতে না পারি, কিন্তু ভূলোকে লীলাময়ের এই নৈমিত্তিক মঙ্গললীলাও যদি উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা ধন্য হইতে পারিব। ভগবান্ নিজেই বলিতেছেন, আমার এই প্রকার দিব্য জন্মকর্ম যে বুঝিতে পারে দেহান্তে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না—সে আমাকে লাভ করে। আমি আসিয়া ত্রিবিধ দিব্যকর্ম করি,—সাধুদিগকে পরিত্রাণ করি, দুষ্কৃতের বিনাশ করি, আর ধর্ম সংস্থাপন করি। এই কুরুক্ষেত্রের উপরে দুইটা কাজ ত হইতেছে বুঝিতেছ, আর তোমাকে উপদেশ দিয়া তৃতীয় কাজটাও হইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিবে।

তাহার পরেই গীতার দ্বিতীয় মহাবাক্য। এমন আশ্বাসবাণী আর কেহ কখন বলে নাই, কেহ কখন শুনে নাই। স্বয়ং ভগবান্ না বলিলে এ কথা কেহ কখন মনে করিতে পারে না, মুখে আনিতেও পারে না। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। যে আমাকে যে ভাবে চায় আমি তাকে সেইভাবে ভজনা করি। আমি তাহাকে সেইভাবে সিদ্ধিদান করি বা বরদান করি, সেইভাবে তাহার কামনা পূর্ণ করি বা তাহাকে সেইরূপ সদ্গতি দিয়া থাকি অথবা (যেমন দ্বাদশ অধ্যায়ে) মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে তাহাকে উদ্ধার করি, তাহাকে সেইভাবে নির্বাণপদ দিয়া থাকি, কিংবা তাহাকে নিত্যধামে—আমার পরমধামে স্থানদান করি,—এরূপ কোন কথা নহে। ঐ সকল আশ্বাসবাণী অন্যান্য গ্রন্থে এবং এই গীতারও নানা স্থানে আছে। কিন্তু আমি ভগবান্ তাহার ভজনা করি, এমন কথা আর কোথাও নাই। এমন স্বল্পাক্ষরে, অসন্দিগ্ধ ভাষায় এমন সারবতী কথা আর কোথাও নাই। যে আমাকে যে ভাবে চায়, আমি তাহাকে সেইভাবে ভজনা করি। ভগবান্ না বলিয়া দিলে এ কথা কল্পনাতে আসে না; এই কথায় বিশ্বাস না হইলে এ কথা মুখে আনিতেও ভয় করে। এই আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া ভক্তগণ কৃতার্থ হন। ভগবদ্গীতা যে ভক্তিবাদের গ্রন্থ এই মহাবাক্যই তাহার প্রচুর প্রমাণ।

এইস্থানে একটি অবান্তর কথা তুলিব—

হীরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'গীতার কালনির্ণয় সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিছু বলা হয় নাই। গীতা মূল ভারতের অন্তর্গত কিনা, গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কতদূর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহারও এ গ্রন্থে কোন আলোচনা নাই। এ সম্বন্ধে আমি একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতেছি। আশা আছে, কয়েক মাসের মধ্যে তাহা প্রকাশিত করিতে পারিব।' গীতার কালনির্ণয় হয় হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু গীতা মূল ভারতের অন্তর্গত কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা কি ইহার নামকরণে হয় নাই? 'বৈয়াসিক্যাং সংহিতায়াং শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাসূপনিষৎসু'—ব্যাসসংহিতা মহাভারতের উপনিষৎ ভগবদ্গীতায়—এই কথায় কি বুঝিতে হইবে না যে, গীতা মহাভারতের অন্তর্গতও বটে, নাও বটে। আর গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কতদূর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা যায় না বটে, কিন্তু বড় কথাগুলা যে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত তাহাতে কি কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে? ব্যাস হউন, সঞ্জয় হউন, বা আর কেহ, ভগবান্ স্বয়ং না বলিলে, 'ভজাম্যহম্' বলিতে পারিত কি? এ ত কল্পনাতীত কথা আরোপ করিতে সাহসে কুলায় না। গীতায় যে ভগবদ্‌বাক্য আছে, আমি বোধ করি, এই 'ভজাম্যহম্' তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

গীতায় ধর্মের সকল কথাই আছে; কিন্তু ভগবান্ যখনই কোন কথা শেষ করিয়াছেন, সেইখানেই ভক্তির তত্ত্বকথা উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চমের উপসংহারে—আমিই সকল লোককে যজ্ঞতপের ফলভোগ করাই, আমিই সকল লোকের মহেশ্বর, আমাকে সর্বভূতের সুহৃৎ বলিয়া জানিলে লোকে শান্তিলাভ করে। আবার বলি, অর্জুন সখা-ভক্ত বলিয়াই এই উপদেশের উপযোগিতা। উপদেশের শেষ কথা সখ্যবাদ। ষষ্ঠের উপসংহারে—তপস্বী হইতে, জ্ঞানী হইতে, কর্মী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ। অর্জুন তুমি যোগী হও। (কিন্তু এটি মনে রাখিও) সকল প্রকার যোগীর মধ্যে যে-শ্রদ্ধাবান্

ব্যক্তি মদ্‌গত-অন্তরাত্মা হইয়া আমাকে ভজনা করে সেই শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রদ্ধাভক্তি-ভজনার কথা। নবম অধ্যায়ে চতুর্থাংশের অধিক শ্লোকে ভক্তি, ভক্ত ও ভজনার কথা। দশমে বিভূতিযোগ। যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা-কিছু ভাল, যাহা-কিছু মঙ্গলকর, শ্রীসম্পন্ন,—সকলই আমি। বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমি বাসুদেব, আর পাণ্ডবদের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়। এই বিভূতিযোগ-মধ্যেও সেই সখাযুগল।

তাহার পর একাদশের সেই বিশ্বরূপ-বর্ণনা। ইহার তুলনা হয় না। এই বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুন মহাগৌরবান্বিত হইয়া আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চন মনে করিলেন। বিস্ময়াবিষ্ট, হৃষ্টরোমা হইয়া কম্পান্বিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া ভয়ে ভয়ে বারংবার নমস্কার করিতে লাগিলেন। গদ্‌গদ বচনে স্তব করিতে লাগিলেন। সখাভাবে পূর্বে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার স্তবেই বুঝা যায়। বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুন এখন কবি—মহাকবি, সে কবিত্বের তুলনা হয় না। অতি পাষণ্ডেও কণামাত্র ভক্তির ছায়া লইয়া সেই স্তব পাঠ করিতে পারিলে আপনাকে সার্থক মনে করে। তাহার পর ভগবান্ আবার মানুষরূপে প্রতিভাত হইলেন, অর্জুন প্রকৃতিস্থ হইলেন। সখার কাছে সখাই হইলেন। তখন ঠাকুর চুপি চুপি বলিতেছেন, দেখ হে, অর্জুন, আমার যে রূপ আজি দেখিলে বেদে, তপস্যায়, দানে, যজ্ঞে এ রূপ দেখা যায় না, কেবলমাত্র অনন্য ভক্তিতে এই রূপ দেখা যায়, বুঝা যায়, ইহার তত্ত্বে প্রবেশ করা যায়—এই ভক্তি যাবতীয় ধর্মের পরাকাষ্ঠা। সেইজন্য দ্বাদশের উপসংহারে বলিতেছেন, যে সকল পরম ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্বক এই ধর্মামৃত সেবা করে, তাহারা আমার অতীব প্রিয়। এই জন্যই চতুর্দশের উপসংহারে বলা হইয়াছে, 'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে'—সে ঐকান্তিক সুখ পায়—আমি সেই সুখের প্রতিষ্ঠান। তাই বলি, ভগবদ্‌গীতায় ভগবানের ভক্তিবাদেরই প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে।

হীরেন্দ্রবাবুর অপূর্ব গ্রন্থের বার্তিকরূপে এই কয়টি কথা আমি বলিলাম মাত্র।

জাহ্নবী ৩য় বর্ষ বৈশাখ ১৩১৪

আমার জীবন

নবীনচন্দ্র সেন-প্রণীত

১

(১ম ও ২য় খণ্ড)

প্রথমেই নিবেদনে লেখা আছে, 'বহু বৎসর ব্যাপিয়া লেখকের অবসরক্রমে এই জীবনী লিখিত'—ইহাতে 'স্থানে স্থানে পুনরুক্তি হইয়াছে।' উপক্রমণিকায় লেখা আছে, 'এই মধ্য জীবনে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলে, যে সকল ঝটিকা-বিলোড়িত অরণ্যানী ও ভূধরমালা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাহস ও শান্তি লাভ করিতে পারিব; সমাজের ও সংসারের যে সকল বিশ্বাসঘাতক বালুকাচর ও গহ্বর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিয়া অনেক শিক্ষা, অনেক সতর্কতা, লাভ করিতে পারিব; এবং মেঘান্তরিত প্রাবৃট্‌-চন্দ্রমার ন্যায় কদাচিৎ যে সুখের, শান্তির ও স্নেহের মুখ দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ কথঞ্চিৎ আশায় পূর্ণ করিতে পারিব; এই সাহস, এই শিক্ষা, এই সান্ত্বনার আশায় আজ আত্মজীবনের আলোচনা করিতে বসিলাম।'

দ্বিতীয়খণ্ডের নিবেদনে লেখা আছে, 'এই "আমার জীবন" পাঁচ ভাগে বিভক্ত।' কবি নবীনচন্দ্রের বড় ইচ্ছা ছিল যাহাতে এই পাঁচ ভাগই তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। কবির মৃত্যুতে তাহা হইল না। প্রথমভাগ বোধ হয় তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়ভাগ তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান্ নির্মলচন্দ্র সেন প্রকাশ করিয়াছেন। আর বাকি তিন ভাগও যাহাতে শীঘ্র প্রকাশিত হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন। সেও আজ এক বৎসরের কথা। তৃতীয়ভাগ যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। প্রথম দুই ভাগই আমরা 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গ্রন্থখণ্ডের সমালোচনা সম্ভবে না, তথাপি দুইচারি কথা লিখিতেছি।

সমালোচনার মোটামুটি দুইটা উদ্দেশ্য। ১) গ্রন্থের পরিচয়-প্রদান। ২) গ্রন্থের উন্নতিকল্পে গ্রন্থকারকে

উপদেশ-দান। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সমালোচনার এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থাকিতেই পারে না। গ্রন্থের পরিচয় আমরা অতীব আহ্লাদ-সহকারে পাঠকবর্গ-সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি।

বাঙ্গালায় দুইচারিখানি আত্মচরিত আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ের মাতৃদেবীর স্ব-লিখিত আংশিক জীবনচরিত, বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক'গণের কাহার কাহার অল্পবিস্তর জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি দুইচারিখানি গ্রন্থ আছে, নবীনচন্দ্রের আমার জীবনের মত এত বড় সুবৃহৎ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই। কবি ইহাতে আপনার শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষার বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। আপনার জীবনকাল-ভোর বঙ্গের অনেক স্থলের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'পিতৃহীন যুবকের' দুর্দশার কথা এমন করুণচ্ছন্দে, এমন হৃদয় খুলিয়া বিবৃত করিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত হয়, কবির ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে কাঁদিতে ইচ্ছা করে, আর জীবন্ত দুঃখ সম্মুখে মূর্তিমন্ত দেখিয়া, কবিকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা-করণার্থ, ভগবানের সমীপে কাতর কণ্ঠে নিবেদনধ্বনি আপনা আপনি পাঠকের মুখ হইতে বিনির্গত হয়।

প্রথমভাগে নবীনচন্দ্রের ছাত্র-জীবন বিবৃত হইয়াছে। পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভাষায় বলিতে গেলে নবীন বড় দুরন্ত বালক ছিলেন। কিন্তু বড় মেধাবী। ছেলে ভাল, কিন্তু বড় দুষ্ট। নবীন আপনার দুষ্টামির অনেক পরিচয় দিয়াছেন, অবশ্য অনেক দেন নাই। সকল কথা কিছু আমার জীবনে লেখা যায় না। যে সকল দুষ্টামিতে কিঞ্চিৎ রঙ্গরস ছিল, তাহার কতক কতক আমরা পাইয়াছি। তাহাতেই আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে। একজন মাস্টার, একজন পণ্ডিত এবং একজন মুনসী সাহেবের যে ফটো আমরা পাইয়াছি তাহা জীবন্ত প্রতিকৃতি।

প্রথমখণ্ডে অনেকগুলি ফটো আছে। এই খণ্ড একখানি আল্‌বম বা ফটো-সংগ্রহ বলিলেই চলে।

নবীনচন্দ্রের পিতৃদেবের—গোপীমোহনের—চিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র-স্নেহপূর্ণ হৃদয়, বিপন্নের প্রতি করুণাসিক্ত মন, উজ্জ্বল গৌরাঙ্গ দেহ, একান্ত মনে দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী পূজা-অর্চনা, অবারিত দ্বার, আত্মীয়-পোষণ ও রক্ষণ, অকাতর-মুক্তহস্ততা, এবং সেই মুক্তহস্ততার জন্য ক্রমেই অধিকতর ঋণগ্রস্ত হওয়া, এবং শেষে সেই ঋণভারে তনুত্যাগ,—এই সকল অতি উজ্জ্বল বর্ণে, মনের ঐকান্তিক প্রীতি, চক্ষুর ধারাবাহিক অশ্রু দিয়া নবীনচন্দ্র চিত্রিত করিয়াছেন। মাতার স্নেহ, অমায়িকতা, সরলতা, পতিনিষ্ঠা অপরিস্ফুট বর্ণে হইলেও স্পষ্ট রেখায় চিত্রিত হইয়াছে। জ্ঞাতিগণের ঈর্ষ্যা এবং উপদ্রবের উপরি নবীনচন্দ্রের নিয়ত কটাক্ষ আছে। তাহার ফল বড় বিষময়।

নবীনচন্দ্র ষোল বৎসর বয়স্ পর্যন্ত চট্টগ্রামেই বিদ্যাশিক্ষা করেন। ঐখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসেন। চারি বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া এল. এ. ও বি. এ. দিয়া ডেপুটি মাজিস্ট্রেটি চাকরি পান। এইখানেই প্রথমভাগের শেষ।

প্রথমভাগে দুইটি বাল্যানুরাগের গল্প আছে। আর বিবাহের বৃত্তান্ত আছে। লেখার ভঙ্গিতে সেগুলি সুপাঠ্য হইয়াছে। কলিকাতায় মেসের বাসায় উপনিবেশকালে নবীনচন্দ্র আপনার সুখ-দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন। ছাত্রদিগের মধ্যে তিন-চারিজন তাঁহার আত্মীয় ছিলেন, নবীনের সঙ্গে তাঁহাদের অবশ্য সহানুভূতি ছিল, আর দুইজনকে তিনি দ্বেষী মনে করিয়াছিলেন, নড়িতে চড়িতে তাঁহাদের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। জ্ঞাতিদ্রোহের এই একটি বিষময় ফল। নবীন-চরিত্রে এই জ্ঞাতিদ্রোহের আরও বিষময় ফল ফলিয়াছে। ১৪০ পৃষ্ঠায় নবীন প্রথমে লিখিলেন, 'আমার সমস্ত কবিতা সে পথে প্রেরণ করিলে, (অর্থাৎ না ছাপাইয়া ধ্বংস করিলে) এ জীবনে এত ঈর্ষ্যা, এত শত্রুতা, এত দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না।' তাহার পরে বলিতেছেন, 'পরের প্রশংসা শুনিয়া ও দেখিয়া এ জগতে কয়জন মর্মাহত না হইয়া থাকিতে পারেন?' তাহাতেই বলিতেছি, বাল্যাবধি জ্ঞাতিদ্রোহের মধ্যে লালিতপালিত হওয়াতে নবীনের হৃদয় নিতান্ত

কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। পরের ভাল দেখিয়া অনেকেই যদি মর্মাহত হয়, তাহা হইলে এই সংসার সয়তানের রাজ্য! তুমি যে মঙ্গলময়ের মাঙ্গল্য বলিয়াছ, তাহা কেবল মুখের কথা! চন্দ্রকুমার তোমার Friend, philosopher and guide—তোমার সুহৃৎ, 'জ্ঞানগুরু' এবং পথপ্রদর্শক—সেই চন্দ্রকুমারের চরিত্রে যখন তুমি ঈর্ষ্যা আরোপিত করিয়াছ, তখন তুমি নিতান্ত কুসংস্কারান্ধ, তোমার জন্য দুঃখ হয়। প্রথমভাগের এই ঈর্ষ্যা-আরোপ—এই ভাগের কলঙ্ক। ইহার আদ্যোপান্তে কিন্তু লোকচ্ছবি বড় উজ্জ্বল।

নবীনচন্দ্র তান্ত্রিক পিতার পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনিও পিতাকে পরম ভক্তি করিতেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, নবীনচন্দ্র শঙ্কর পুরী স্বামী নামক একজন 'সন্ন্যাসীর কাছে, সন্ন্যাস-নিয়মে কর্পূরালোকে' দীক্ষিত হন। সুতরাং সুরাপানে পাপ, এ কথা জীবনে কখন নবীনচন্দ্র মনে করিতে পারেন নাই। তাহার পর, নবীন যখন চট্টগ্রাম স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন, তখন সেই শ্রেণীর একজন শিক্ষক তাঁহাকে মুসলমান-পদ-পেশনে প্রস্তুত পাওরুটির লোভ দেখাইয়া 'ব্রাহ্ম' করেন। তৎপূর্বে তিনি পৌত্তলিক ছিলেন। কলিকাতার বাসায় তাঁহারা তিনজন ব্রাহ্ম ছিলেন। 'মাঘ মাসে দারুণ শীতে পাতকুয়ার বরফের মত জলে প্রত্যূষে স্নান করিয়া, আমরা পাতলা ফিন্‌ফিনে উড়ানী মাত্র গায়ে দিয়া—না হয়, ত্যাগস্বীকার*—প্রত্যেক রবিবার কেশববাবুর বাটীতে ছুটিতাম।' কেশববাবু তখন উপাসনা করিতেন। একদিন এই উপাসনায় বিরক্ত হইয়া নবীনের মনে খটকা উঠিল। নবীন লিখিতেছেন, 'আমি সে দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িলাম এবং কর্ণহীন ক্ষুদ্র তরীর মত সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলাম।' ব্রাহ্মধর্ম ছাড়িলেন বটে, কিন্তু পাওরুটি নবীনকে ছাড়িল না, আর সুরা ত আছেই। সুতরাং যাহারা আচারকে ধর্মের অঙ্গ বলে, তাহাদের উপর নবীনের তীব্র কটাক্ষ সমানে এই দুই খণ্ডে আছে। হিন্দু-বিবাহ-রীতির উপর নবীনের ভ্রূকুটি কটাক্ষ খেলা করিতে ছাড়ে নাই। এক স্থানে বলিতেছেন, 'ইহাদের (হিন্দুদের) দুরদৃষ্ট কি শুভাদৃষ্ট বশতই হউক—ঘোরতর মতভেদ আছে; ঘোড়ার আগে গাড়ী, লেখার আগে রেজিষ্টরি, আগে বিবাহ পরে প্রেম।' ইহাতে এমন কেহ মনে করিবেন না যে 'আগে বিবাহ পরে প্রেম' এই ব্যাপার নবীনচন্দ্র ভালরূপে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া, তিনি হিন্দু নরনারীর আদর্শ জীবনের গৌরব বুঝিতেন না। সে সকল তিনি অতি সুন্দর বুঝিতেন, এখনকার উপন্যাসী স্ত্রীশিক্ষায় তিনি বিষম কটাক্ষক্ষেপ করিয়াছেন। গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে—

'যদি কথায় কথায় সূর্যমুখীর মত গৃহত্যাগ, কুন্দনন্দিনীর মত বিষপান, ভ্রমরের মত দারুণ অভিমান স্ত্রীশিক্ষা হয়, তবে আজ স্ত্রীশিক্ষায় দেশ টলটলায়মান। যদি বিমলার চতুরতা, গিরিজায়ার চটুলতা এবং আসমানীর বণিক্‌তার অনুকরণ স্ত্রীশিক্ষা বল, তবে আজ স্ত্রীশিক্ষায় দেশ টলটলায়মান। যদি অহোরাত্র স্বামীর দোষ অনুসন্ধান ও তন্য শাসন, উপন্যাসোদ্ধৃত তীব্র বাক্যানলে তস্য অস্থিমজ্জা দাহন ও পরিবারবর্গের মর্ম-পীড়ন স্ত্রীশিক্ষা হয়, তবে আজ স্ত্রীশিক্ষায় সত্য সত্যই দেশ টলটলায়মান। যদি সংসারে অসচ্ছলতা, হৃদয়ে অশান্তি, কর্তব্যে ভ্রান্তি, স্ত্রীশিক্ষার ফল হয়, তবে আর ভাবনা নাই, আজ স্ত্রীশিক্ষায় দেশ টলটলায়মান।'

অন্যত্র দেখুন—

'অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত বৎসর বাড়ী বাড়ী রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ পাঠ হইত। এক একজন কি মধুর কণ্ঠে, কি ভাবতরঙ্গ তুলিয়া সে সকল পবিত্র কাব্য পাঠ করিতেন। নবীনা, প্রবীণা, বালবৃদ্ধ দিবসের কার্য সারিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সে সকল উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে শোকে ও ভক্তিতে অশ্রু বর্ষণ করিতেন এবং প্রেমে পবিত্রিত, বীরত্বে উদ্দীপিত, পুণ্যে মোহিত, পাপে রোমাঞ্চিত হইতেন। এই মহাগ্রন্থ সকল তাঁহাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের শোণিতে শোণিতে সঞ্চারিত হইয়া, তাঁহাদের শরীর ও চরিত্র গঠন করিত এবং কর্মে নিষ্কামতা, ধর্মে ভক্তি অবিচলতা, অধর্মে ঘৃণার

* 'নহিলে ত্যাগ-স্বীকার হয় না'—এইরূপ ভাষা হইবে বোধ হয়।

পরা কাষ্ঠা, পুণ্যে প্রবৃত্তি, পাপে নিবৃত্তি, জীবে দয়া, সত্যনিষ্ঠা, সতীত্বে সুখ শিক্ষা দিত। এমন উচ্চ শিক্ষা, তাহার এমন সহজ উপায়, তাহার এমন দেশব্যাপী সুফল, আর কোন দেশ কি কখনও দেখাইতে পারিয়াছে?···এসকল পুঁথির স্থান উপন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। সীতার স্থান সূর্যমুখী, রামচন্দ্রের স্থান সীতারাম, সাবিত্রীর স্থান কুন্দনন্দিনী, বেহুলার স্থান বিমলা, শ্রীকৃষ্ণের স্থান সত্যানন্দ, অর্জুনের স্থান জীবানন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ভরতলক্ষ্মণের স্থান শূন্য। কাজে কাজেই কেবল স্ত্রীশিক্ষায় নহে পুরুষ-শিক্ষায়ও দেশ টলটলায়মান।'

এই প্রথমভাগে নবীনচন্দ্র তাঁহারই কবিত্ব-শক্তি-সঞ্চারের ইতিহাস দিয়াছেন। এই পরিচয়-প্রদান-অবসরে তিনি বাঙ্গালা দেশের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর উপর বিষম বিদ্রূপ বিক্ষেপ করিয়াছেন, আর শিক্ষাবিভাগের উপর তীব্র কশাঘাত সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে। কবি দেখাইয়াছেন, একে কবিতানুরাগ তাঁহার বংশগত, তাহার উপর তাঁহার পিতা কবিতা পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি 'সুরসিক, সুগায়ক, সুকবি', তাহার পর 'চট্টগ্রামবাসী মাত্রই কবিতা-প্রিয়,' আর নবীনের মাতৃভূমি প্রাকৃতিক কবিত্বময়।

'মাতার অধিত্যকায়, উপত্যকায়, বনে বনে কবিতা; বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায়, ফুলে ফলে কবিতা; পর্বত-বিভক্ত পীত শ্যামল শস্যক্ষেত্রে কবিতা। মাতার সমুদ্র-গর্জনে কবিতা, নির্ঝরিণীর তরতর কণ্ঠে কবিতা, সংখ্যাতীত বন-বিহঙ্গের কলকণ্ঠে কবিতা। যাহার এরূপ পিতা, এরূপ বংশ, এরূপ মাতৃভূমি, তাহার হৃদয়ে যে শৈশব হইতেই কবিতানুরাগ সঞ্চারিত হইবে, কল্পনায় অকুণ্ঠ হিল্লোলমালা খেলিবে, তাহা আর আশ্চর্য কি? অতএব পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল।'

প্রথমভাগে, কবির দরিদ্রতার যেমন শোকপূর্ণ বর্ণন আছে, তেমনই করুণাপূর্ণ হৃদয়বান্ ব্যক্তিবৃন্দের দয়াশীলতার উচ্ছ্বসিত পরিচয় আছে। সদয় সাহেব-বাঙ্গালির সমানে সুখ্যাতি আছে। লোকের দুঃখদারিদ্র্যের পরিচয় পাইলে দুঃখ হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি দেখা যায় দশজনে সেই দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর, তাহা হইলে করুণায় হৃদয় পরিপূরিত হয়, ক্রন্দন সংবরণ করা যায় না। নবীনের বর্ণনায় আমরা চোখের জল রাখিতে পারি নাই। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর, নবীন উহা সুন্দর দেখাইয়াছেন। দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচরণ সরকার, কেশববাবু, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, গিরিশচন্দ্র দেব প্রভৃতি বাঙ্গালির এবং প্রিন্সিপাল সট্‌ক্লিফ ও অগিল্‌বি, সেক্রেটারি স্টানস্‌ফীল্ড, ভাম্পিয়ার, ব্যাপমান্ প্রভৃতি সাহেবের দয়ার জীবন্ত পরিচয় এবং আনন্দাশ্রু-বিজড়িত সুখ্যাতি আছে। পিতৃবিয়োগে হঠাৎ নিঃস্ব হইয়া নবীনচন্দ্র দুঃখের সহিত ঘনিষ্ঠতা করেন, পাঁচজনের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেন, সহৃদয় সাহায্য পাইয়া তিনি দুঃখের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন—তাহার কথা তিনিই বলুন।

'তাঁহার সৃষ্টিতে এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য, এত বিপদ্ কেন, ইহা ভাবিয়া বড় বড় দার্শনিকগণও তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন হইয়াছেন। ···হায়! হায়! মানুষ বুঝে না সোণা পোড়াইলে আরও নির্মল হয়। পোড়ানই কেবল নির্মল করিবার উপায়। মানুষ বুঝে না যে তদ্রূপ দুঃখও মানুষকে নির্মল ও পবিত্র করে, মানুষকে মানুষ করে। আমি দুঃখে না পড়িলে এই দেবতুল্য আদর্শ সকল দেখিতাম না; মানবের মহত্ত্ব কি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, বুঝিতে পারিতাম না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিতে পারিয়াছি এবং আত্মজীবনে কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা এই ঘোরতর বিপদের ফল। আজ বুঝিতে পারিতেছি আমার সেই বিপদের গর্ভে আমার কি মঙ্গল নিহিত ছিল, সে অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারা ভগবান্ আমার কি উন্নতি, কি মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। আমি আজ যাহা, সেই বিপদ্ তাহার সৃষ্টিকর্তা। আমি আজ যাহা, সেই বিপদে না পড়িলে তাহা হইতাম না। আজ সেই বিপদের আলোচনা করিতে, পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার ঘন-ঘোর-ঘটামণ্ডিত মুখচ্ছবি দেখিতে, মনে কি আনন্দ, কি গৌরব, কি পবিত্রতা সঞ্চারিত হইতেছে! তদ্ভিন্ন যে কখনও দুঃখের মুখ দেখে নাই, সুখ কি তাহা সে বুঝিতে পারে না। সুখদুঃখ কিছু নিত্য সনাতন পদার্থ নহে।··· সুখদুঃখ মনের

অবস্থা মাত্র। মানুষের অবস্থা ভেদে, প্রকৃতি-ভেদে ইহার অনন্ত তারতম্য। স্তরের পর অনন্ত স্তর, সোপানের পর অনন্ত সোপান আছে। যে দুঃখ ভোগ করে নাই, সে সুখের পাশব ভাব ভিন্ন, তাহার উচ্চ মহান্ ভাব বুঝিতে পারে না। ভগবান সচ্চিদানন্দ। তিনি সর্ব আনন্দের আধার। মানুষ যত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই মানুষ হইবে, সুখী হইবে। সুখের দ্বিতীয় পথ নাই। মানুষ দুঃখে না পড়িলে তাঁহার দিকে চাহে না। তাঁহার বিপদ্‌ভঞ্জন সুখ কি মধুর!

বিপদঃ সন্তু বা সর্বা যত্রতত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যত্র ন পুনর্ভব দর্শনম্॥

মহাভারত।'

এই সকল কথা পড়িতে পড়িতে আমরা নবীনের জ্ঞাতি-দ্রোহ-জড়িত পূর্ব কথা ভুলিয়া যাই, আর নবীনের জন্য দুঃখ করিতে আনন্দ হয়।

২

(৩য় খণ্ড)

প্রথম দুই খণ্ডের সমালোচনার অবসরে যাহা বলিয়াছি, আবার তাহাই বলিতেছি, 'খণ্ডগ্রন্থের সমালোচনা সম্ভবে না।' অথচ কিছু না বলিলেও চলে না, তাই বলিতেছি। প্রথমখণ্ডের কথাই আমরা বেশি করিয়া বলিয়াছিলাম, দ্বিতীয়খণ্ডের কথা প্রায় কিছুই বলা হয় নাই; দ্বিতীয়খণ্ডে নবীনচন্দ্রের দাসত্ব-জীবনের বা চাকরির কথাই বেশি, এই তৃতীয়খণ্ডেও তাহাই। দাসত্ব-জীবনের সমালোচনা চলে না; তবে নবীনচন্দ্র নিজ দাসত্ব-জীবনের উপরে এমন একটি শিল্পীর কাজ ও পালিস্ করিয়াছেন যে, তাহাতে পাঠককে একটুতেই মোহিত করে। মনে হয়, গোলামি জিনিসটা ভাল নহে বটে, তবে গোলামিতে একটু সর্দারি করিতে পারিলে মন্দ হয় না।

এই তৃতীয়ভাগ ছয় খণ্ডে বিভক্ত। দাস-সর্দারের সিংহাসনের পরিচয়ে খণ্ডগুলির নামকরণ হইয়াছে; যথা,—শ্রীক্ষেত্র, মাদারিপুর, বেহার, ভাগলপুর, নওয়াখালি। কেবল ৫ম খণ্ডের নাম স্বদেশ বা চট্টগ্রাম—কবির স্বদেশ। কবি তখন ছুটীতে বাড়ীতে ছিলেন; পিতৃশ্মশানে শিবস্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ভাগকে দাসত্বের জীবন না বলিলেও চলে। কবির দাসত্ব-জীবনের কৃতিত্বের পরিচয়, গ্রন্থে ভূয় পরিমাণ থাকিলেও অন্য কথা নাই এমন নহে; সঙ্গে সঙ্গে ভালমন্দ অনেক কথা আছে। ভালগুলির একটু পরিচয় দিতেছি,—প্রথম দুই খণ্ডের সমালোচনায় বলিয়াছি—যাহারা আচারকে ধর্মের অঙ্গ বলে, তাহাদের উপর নবীনের তীব্র কটাক্ষ সমানে দুই খণ্ডে আছে; এই তৃতীয় খণ্ডেও আছে।—তাই বলিয়া নবীনচন্দ্র নাস্তিক বা একেবারে অহিন্দু ছিলেন না। নবীনচন্দ্র আপনাকে প্রতিমা-উপাসক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। শ্মশানে শিবপ্রতিষ্ঠা-সংকল্পে নবীনচন্দ্র বলিতেছেন, 'শিবলিঙ্গ আমার কাছে বড়ই ঘৃণিত বোধ হয়, আমি সে জন্য মূর্তি স্থাপন স্থির করিলাম।' মূর্তি স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলে কবি আবার বলিতেছেন, 'শিবমূর্তিতে পিতৃদেবকেই আমি দেখিতেছিলাম, আর বালকের মত কাঁদিতেছিলাম। প্রতিমা-উপাসকদের এই আন্তরিকতা ও সার্থকতা অন্য ধর্মাবলম্বীরা কেমন করিয়া বুঝিবে?' নবীনচন্দ্র কেবল বীরাচারী নহেন, অনাচারী। কিন্তু অনাচারী হইয়াও প্রতিমা-উপাসক। এইজন্য তীর্থমহিমার এবং বিগ্রহ-মহিমার কীর্তনে, তিনি বিশিষ্ট ক্ষমতা ও সিদ্ধহস্ততা দেখাইতে পারিয়াছেন। কবি যখন যেখানে গিয়াছেন, কোথাও 'তীর্থ' করিতে ছাড়েন নাই। পুরীতে গিয়া রথের সমস্ত কর্তৃত্বই পাইয়াছিলেন। কবি শিক্ষা-বিভ্রাটের তাড়নায়, আপনাকে হিন্দু হইতে যেন একটু পৃথক্ ভাবিয়া লিখিয়াছেন, 'হিন্দুদের বিশ্বাস জগন্নাথদেবের এ নবযৌবন যে প্রথম দর্শন করে, এবং তাঁহাকে এ সময় যে প্রথম আলিঙ্গন করে, সে সশরীরে স্বর্গে যায়। তাঁহারা (অর্থাৎ পাণ্ডারা) জোর করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করাইলেন। অকস্মাৎ আমার হৃদয়েও কি এক ভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিল, যাহা জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। সমস্ত জগৎ ও আমার সর্বাঙ্গ এখন কি এক অমৃতে সিক্ত হইল। তাঁহাদের মত আমারও কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।'

কবি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া পীড়িত হন, সেখানে এক ব্রাহ্মণ-

বাড়ী তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর আশ্রয় ছিল। পীড়িত নবীনচন্দ্রকে ব্রাহ্মণের তিনটি যুবতী কন্যা বিশেষ সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন, 'ভূতলে রমণীহৃদয়ই স্বর্গ। বুঝিলাম হৃদয়ের এই প্রেমপ্রবলতায় বৃন্দাবনবাসিনীরা শ্রীভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন, এবং ভারতের ধর্মেতিহাসে এরূপ নিষ্কাম প্রেমের জন্যই তাঁহারা পূজিতা।'

কবি নিজ দাসত্বের জীবনের গৌরব করিতে করিতে এইরূপ অনেক সুন্দর কথা, ভাল কথা বলিয়াছিলেন। আর দাসত্ব-জীবনে ধিক্কারও যথেষ্ট দিয়াছেন। তবে মানুষ —বিশেষ নবীনবাবুর মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ লোক—যেটা লইয়া কাল কাটান, সেটার সমস্ত দোষ পরিষ্কাররূপে দেখিতে ক্রমেই অসমর্থ হইয়া উঠেন, তবে ধিক্কার মধ্যে মধ্যে ফুটিয়া উঠে বৈকি।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, নবীনচন্দ্রের কবিত্বের ক্রমবিকাশের পরিচয় এই তৃতীয়খণ্ডে পাইব। কিন্তু সে সকল প্রায় কিছুই নাই। কেবল—'জুমিয়া জীবন,' এবং 'শ্মশানে শিবপ্রতিষ্ঠা'র যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে এবং 'রঙ্গমতী'র একটু বাহ্য ইতিহাস আছে। তাহাতে কাহারও তৃপ্তি হইতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক ভাল কথা গ্রন্থে বিস্তর আছে, মন্দ কথাও আছে। কবি অবাধ লেখনীতে লিখিতে গিয়া কোন কোন স্থলে আপনাকে বেয়াড়া বয়াটে বানাইয়াছেন। কেবল ইয়ারকি হইলে আমরা কথা কহিতাম না, কিন্তু এক-আধ স্থলে নিতান্ত ব্যলীকতা আছে। তৃতীয়ভাগের ৫০০ পৃষ্ঠার পর একটি গল্প আছে। হীরেন্দ্রবাবু সমস্ত গ্রন্থের প্রুফ দেখিয়াছেন, তিনি একজন সমীচীন ব্যক্তি; এই দুই-এক পৃষ্ঠা বাদ দিলেই ভাল করিতেন।

কবি বলিয়া নহে, সমালোচক বলিয়া নহে, আমরা আজিকালি অনেকেই আক্ষেপ করি যে, বর্তমান বঙ্গসমাজ হইতে আন্তরিকতা দিন দিন সরিয়া যাইতেছে। শিক্ষিতের প্রাণে যেন আর সে প্রাণ নাই। সকলের মনে যেন স্বার্থপরতাজনিত সঙ্কীর্ণতা ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। দয়ামায়া যেন সংসার হইতে চলিয়া যাইতেছে। কেবল হিসাব ও নিকাশ—ধন ও ঋণ লইয়াই যেন সংসার। বঙ্গসমাজের এইরূপ পরিবর্তনের জন্য দুঃখ—নবীনচন্দ্র শতবার করিয়াছেন। ভাগলপুরে মন্দার পর্বত দর্শন করিয়া নবীন যখন ফিরিতেছেন, তখন পথে একজন ডেপুটি (Sub-Divisional Officer) তাঁহাকে লট্‌কাইয়া লইয়া, নিজ শিবিরে উত্তমরূপ অতিথিসৎকার করেন।

নবীনবাবু লিখিতেছেন, 'ডেপুটিবাবু তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। শত নিষেধ সত্বেও তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। বলিলেন—সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্র। আর কবে ইহাকে পাইব। আমি তোমাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকিব। কিছুদূর গিয়া নামিয়া আসিব।—তাহাই হইল। প্রায় দুই মাইল পথ আসিলে, আমরা জোর করিয়া তাঁহাকে নামাইয়া দিলাম, গাড়ী খুব বেগে চলিল। হায়! এই শিষ্টাচার, এই অতিথিসৎকার এবং প্রাণভরা আত্মীয়তা ও আমোদ ইতিমধ্যেই এই সার্ভিসের স্বপ্ন হইয়াছে। বর্তমান বঙ্গসমাজ হইতেও একপ্রকার তিরোহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।'

আর একটি কথা বলিয়াই এই অংশ শেষ করিব। অগ্রে আমার কথা একটু বলি।—অতি বালককাল হইতে পিতৃদেব আমাকে ভাবপ্রবণ করিয়া তুলেন। একটি গল্প বেশ আরম্ভ করিয়া, একটি ভাল লোককে এমনই বিপন্ন করিয়া তুলিতেন যে, আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতাম না। প্রত্যহই সেইরূপ হইত; প্রত্যহই বুঝিতাম গল্প বাবার বানানো মিথ্যা কাহিনী; তবুকিন্তু প্রত্যহই আমাকে কাঁদিতে হইবে। যৌবনের পড়াশুনাও সেই দিকে, সেই করুণরসের দিকে, প্রবাহিত হইল। পত্নীর সমক্ষে সমগ্র লীয়র অনুবাদ করিয়া পাঠ করিয়াছি। লীয়রের সঙ্গে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছি! বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রাণ ভরিয়া সেবা করিতে লাগিলাম; এত কান্না বুঝি আর কোথাও নাই। সংযোগে বিয়োগে সমান কান্না। মিল্টনে কান্না নাই, ও ভাল লাগিল না; মাইকেলে আছে, ভাল লাগিল। ক্রমে কান্নাই আমার সাহিত্যের কষ্টিপাথর হইয়াছে। সেই কষ্টিপাথরে কষিয়া নবীনের নিজ জীবনচরিত আমি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিতেছি। আছে বৈকি ইহাতে জাতিবিদ্রোহের কটুতা —আছে বৈকি ইহাতে অল্পস্বল্প কুরুচির বা ব্যলীকতার দুর্গন্ধ —কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ ক্রন্দনের উৎস। নবীনের অপূর্ব লিখন-

কৌশলে, আমরা 'জীবন্ত দুঃখ সম্মুখে মূর্তিমান্ দেখি, আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়, মনের মলামাটি ধুইয়া যায়, দুঃখভরে দুঃখিতের জন্য সমবেদনা হয়, সমবেদনায় আমরা নব-দেবত্ব লাভ করি।' নবীনের কাব্যে যে জিনিসটার ছায়া দেখিয়াছিলাম, এই আত্মচরিতে তাহা জীবন্ত দেখিতে পাইলাম।

৩

(৪র্থ খণ্ড)

বহু দিন পূর্বে তৃতীয়ভাগ সমালোচনা করিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম ৪র্থ, ৫ম একবারে সমালোচনা করা যাইবে; তাই ৪র্থ ভাগ পাইয়াও সমালোচনা করি নাই। এখন দেখিতেছি, আমরা সমগ্র বাঙ্গালার সাহিত্যসেবী চৈত্র মাসে, * নবীনচন্দ্রের জন্মভূমি চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম, এ সময়ে একবার সকলকেই নবীনের কথা শুনাইলে মন্দ হইবে না। রায় কালীপ্রসন্ন এবং সেন নবীনচন্দ্র পূর্ব-বাঙ্গালার সহিত আমাদের বন্ধনের প্রধান রজ্জু ছিলেন; সেই দুইটি রজ্জুই ছিঁড়িয়াছে; তবে এবার চট্টগ্রাম-সম্মিলনী আর একরূপে বন্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন; আমরা চন্দ্রশেখরাদি দেবদর্শন করিয়া, চট্টলের সাহিত্যসেবিগণের সহিত সম্মিলন করিয়া ঐহিক, পারত্রিক কার্য করিয়া আসিয়াছি।

তৃতীয়খণ্ডের সমালোচনার সময় বলিয়াছিলাম, 'নবীনচন্দ্রের কবিত্বের ক্রমবিকাশের পরিচয় তৃতীয়খণ্ডে পাইব। কিন্তু সে সকল প্রায় কিছুই নাই।' এবার অর্থাৎ ৪র্থ খণ্ড পাইয়া আর আমাদের সে আপশোস করিবার উপায় নাই। শতপৃষ্ঠারও বেশি রৈবতক কাব্য ও কুরুক্ষেত্র কাব্যের ইতিহাস ও সমালোচনা আছে। এই সুদীর্ঘ সমালোচনা আলোচনা করারপূর্বে গোটা কত গোড়ার কথা মনে করিতে পারিলে ভাল হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙ্গিন কাঁচখণ্ড-ভিতরে-দেওয়া কাচের চোঙা লইয়া বালক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখে, আর প্রতিবার নূতন নূতন সুন্দর চিত্র দেখিতে পাইয়া, কত আনন্দ উপভোগ করে।* শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ঠিক সেইরূপ জিনিস; দুইবার সমান দেখা যায় না—অথচ প্রত্যেক বারই অতি সুন্দর, নয়নাভিরাম, বৈচিত্র্যময়, শৃঙ্খলাপূর্ণ, শতকোণ-বিশিষ্ট। আবার একটু একটু করিয়া ঘুরাও আর দেখ—উঠিছে, পড়িছে, ভাঙ্গিছে, গড়িছে, অথচ সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা সকল সময়েই ফুটিয়া উঠিতেছে।

বহু পূর্ব হইতে, শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের নানা রূপ ছিল। রাধাকৃষ্ণ, কুব্জাকৃষ্ণ, রুক্মিণীকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ। ভারতবর্ষে বিভিন্ন মূর্তির উপাসক বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, তাহাদের উপাসনার প্রকরণ-পদ্ধতি পৃথক্, অঙ্গের চিহ্ন পৃথক্। আজি চারিশত বৎসর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইয়াছে। আমাদের সময়েও চারিজন প্রসিদ্ধ লোকে চারি রূপে কৃষ্ণচরিত্র বিবৃত করিয়াছেন। ১) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ, ২) বঙ্কিমচন্দ্র, ৩) নবীনচন্দ্র, ৪) শিশির-কুমার ঘোষ। সকলেই জানেন প্রথম তিনজন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট এবং শেষোক্ত ব্যক্তি রাজনীতির ঘুণ। কেদার-বাবুর শ্রীকৃষ্ণসংহিতা সংস্কৃত গ্রন্থ, অনুবাদ আছে। পুরাণ বলিলেই হয়। বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র অনুশীলন তত্ত্বের (culture theory) দৃষ্টান্ত। নবীনবাবুর রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নববঙ্গের মহাকাব্য। শ্রীল শিশিরকুমারের কালাচাঁদ-গীতা অভিনব রসমঞ্জরী। এই সকল লইয়া বিচার-বিতণ্ডা করা চলে না। যিনি যে ভাবে যে দিক্ ধরিয়া আমাদিগকে দেখিতে বলিতেছেন, সেই ভাবেই আমরা দেখিব, আর চিত্রের সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিব। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু যুষা বা ঈষা, মহম্মদ বা নেপোলিয়ন নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব বৈচিত্র্যের, সর্ব সৌন্দর্যের আধার। যত বিভিন্নভাবে তাঁহার চরিত্র অনুশীলিত হইবে, ততই তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষিত হইবে। নবীনবাবু বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী; বঙ্কিমবাবু বলেন, (There never was a greater champion of

---

* ৯ই ও ১০ই চৈত্র, ১৩১৯ চট্টগ্রামে ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল; সাহিত্যাচার্য মূল সভাপতি হন। 'তিনটি অভিভাষণ'-এ তাঁহার অভিভাষণত্রয় মুদ্রিত হইয়াছে।

* Kaleidoscope

it.)—তিনি ব্রাহ্মণ্য-স্থাপনের সর্বপ্রধান উদ্যোগী। নবীনবাবুর গ্রন্থ হইতেই দুইটা উদাহরণ লওয়া যাউক। ধরুন যেন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজা বন্ধ করিয়া গোবর্ধন-পূজা প্রচলিত করেন। ইন্দ্র দেবরাজ মহাবর্ষণে ব্রজমণ্ডলের লোকগণকে ব্যতিব্যস্ত করেন, বজ্রপাতে মধ্যে মধ্যে সংহারমূর্তিতে তাহাদের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করেন; আর গোবর্ধন বিষম বন্যার জল আটকাইয়া গোকুল রক্ষা করেন, আর মহাপ্লাবনের সময় নিজের উচ্চ সানুদেশে শস্যসম্ভার রক্ষা করিয়া, গোজাতির পোষণের আয়োজন করিয়া রাখেন—শ্রীকৃষ্ণ যদি ঐ ভাবের পূজা না করিয়া এই রক্ষাকর্তা পোষণকর্তার পূজার বিধান করিয়া থাকেন—তাহা হইলে তাঁহাকে কি ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী বলা যাইবে? তাহার পর, নবীনবাবু বলিতেছেন, 'যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা ক্ষুধার্ত কিশোর কৃষ্ণকে এক মুষ্টি অন্ন পর্যন্ত ভিক্ষা দেয় নাই'—ঠিক, কিন্তু তিনি বলেন নাই আমরা বলিতেছি, তাঁহাদেরই ব্রাহ্মণীরা অতি যত্নে তাঁহাকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দিয়াছিলেন—তাহাতে কি কোনরূপ বিরোধ বুঝায়? না, বুঝায় যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কঠোর নিয়মপালনকারী ও তাঁহাদের সহধর্মিণীগণ কোমলহৃদয়া।

বঙ্কিমবাবু বন্ধুভাবে মুরুব্বিভাবে নূতন করিয়া কৃষ্ণ গড়িতে নবীনবাবুকে নিষেধ করেন; বলেন, 'Krishna preached, if he preached any thing, devotion to the Brahmans. It is against all tradition and written knowledge to set him up against the Brahmans. But the modern poet is of course welcome to give new character to Krishna.' অন্যত্র 'The old Mahabharat is so grand and has such a deep hold of your readers that only first class execution can make the new acceptable to them.' কৃষ্ণ যদি কিছু উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণভক্তিই উপদেশ দিয়াছেন; মহাভারত লোকের মনে এত বসিয়া গিয়াছে যে, তাহার স্থলে আর কিছু বসানো একপ্রকার অসাধ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ পরামর্শ পাইয়া নবীনবাবু প্রথমে দমিয়া গিয়াছিলেন বটে, শেষে কিন্তু নূতন কৃষ্ণ খাড়া করিয়া কাব্য প্রকাশ করেন। তাহার ফল কি হইয়াছে, আমি কিছু বলিব না, পাঠক মহাশয়েরা সকলেই জানেন। বিশেষ নবীনচন্দ্র একটি কথা বলিয়া, সকল সমালোচনা বন্ধ করিয়াছেন। সেটি এই—

'রৈবতক, কুরুক্ষেত্র আমি কেন লিখিয়াছি, তাহাদের চরিত্রাবলি কেন এরূপভাবে অঙ্কিত করিয়াছি, জরৎকারুর চরিত্রই-বা কেন এরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছি, তাহা আমি কিছুই জানি না। কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি যেরূপ লেখাইয়াছেন, আমি সেরূপ লিখিয়াছি। কোন সর্গ লিখিতে বসিলেও যদি কেহ সেই সর্গে কি লিখিব জিজ্ঞাসা করিত, আমি তাহা বলিতে পারিতাম না।' ইহার উপর কোন কথা বলা আর চলে কি? তা কখনই চলে না। এখন ত নবীনচন্দ্র আমাদের দুর্ভাগ্যবশত পরলোকগত, তিনি ইহলোকে থাকিলেও আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিতাম না। সময় তাঁহার একমাত্র সমালোচক।

নবীনচন্দ্রের সানুবাদ-গীতা পাওয়ার কিছু দিন পরে, আমি তাহাকে যাহা লিখিয়াছিলাম, নবীনচন্দ্র তাহাই সার্টিফিকেটের মত এই খণ্ডে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে একটু আমারও সার্টিফিকেট হইয়াছে, সেই জন্য আমিও উদ্ধৃত করিতেছি, "দাদা অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিলেন, 'তোমার গীতা তোমার বউঠাকুরানীর কাছে তোমাপেক্ষাও আদরের বস্তু হইয়াছে। প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ের বাঙ্গালা ভাগ অনেক মুখস্থ। শিবপূজার পরে এক বা দুই অধ্যায় প্রত্যহ ঠাকুর ঘরে পাঠ করেন। গীতার প্রচার দিন দিন বাড়িতেছে; তুমি অর্ধমূল্য করিয়া দিলে, তোমার গীতারই ভূয় প্রচার হয়।' তদনুসারে আমি এক টাকা হইতে উহার মূল্য আট আনা করিয়া দিয়াছিলাম।" এই শেষ কথা কয়টিই আমার সার্টিফিকেট।

নবীনচন্দ্র ও তাঁহার গীতানুবাদের কথা উঠিয়াছে, এই অবসরে, তাঁহার অনুবাদে একটি গুরুতর ভ্রমের কথা গীতানুবাদ-প্রকাশকদের নিকট জানাইতেছি। গীতার একাদশ অধ্যায়ের বত্রিশ শ্লোক—

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥

'ঋতেঽপি ত্বাং' নবীনচন্দ্র অর্থ করিয়াছেন 'বিনা তুমি' এটি ভুল।

যথা—

বিনা তুমি আর থাকিবে না কেহ
প্রতি সৈন্যস্থিত অন্য যোদ্ধাগণ।

এই অর্থ হইতেই পারে না, তাহা হইলে ভগবান্ মিথ্যাবাদী হন

এইরূপ হইবে—

তুমি নাহি থাকিলেও মরিবে সকলে,
সেনার মণ্ডলীমধ্যে যত যোদ্ধ্‌গণ।

ভাবী সংস্করণে এইটি শোধন করিলে ভাল হয়।*

রানাঘাট অবস্থানকালে কবি নবীনচন্দ্র সাহিত্যতীর্থ সন্দর্শন করিতে যান। অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কৃত্তিবাস, রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্ত এবং আজুগোঁসাই—ইঁহাদের ভিটার বা সাধন-মন্দিরের দুরবস্থা দেখেন; অতি ভক্তিভরে সেই সকল বর্ণন করিয়াছেন, এবং হরিদাসের ভিটায় দীনদুঃখী বৈরাগীরা 'একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপন করিয়াছে' তাহাও বলিয়াছেন।

পরিশেষে সাহিত্য-পরিষৎকে লক্ষ্য করিয়া গুটিকত কথা হৃদয় হইতে বলিয়াছেন, আমরা সেই কথাগুলি আমাদের নিজের কথা ভাবে গ্রহণ করিয়া সেই কথা কয়েকটিতেই এই সমালোচনার উপসংহার করিলাম—

'সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যের এই তীর্থস্থানগুলির সংরক্ষণে হস্তক্ষেপ করিবেন কি? ইহা অপেক্ষা গুরুতর কার্য তাঁহাদের আর কিছু নাই।† বৎসর বৎসর বঙ্গের এই অমর পুত্রদের পুষ্প-চন্দনে পূজা করিয়া, তাঁহাদের চরণতলে যাঁহার যথাসাধ্য প্রণামী দিলে, এই অর্থের দ্বারা সেই তীর্থগুলি রক্ষিত হইতে পারিবে। বঙ্গসাহিত্য-সেবীদের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সম্মিলনের ও বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্র আর কি হইতে পারে? বৈরাগীদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সাহিত্যসেবীরা ভারতচন্দ্রের, মুকুন্দ-রামের, রামপ্রসাদের, কৃত্তিবাসের, কাশীদাসের, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, মধুসূদনের, দীনবন্ধুর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান সংরক্ষণ ব্রতে ব্রতী হইলে, কেবল বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত হইবে এমন নহে, আমরাও মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব।'

বঙ্গদর্শন ১০ম, ১১শ ও ১৩শ বর্ষ ১৩১৭, ১৩১৮ ও ১৩২০
(নবপর্যায়)

* ঋতেঽপি ত্বাং—তুমি ভিন্নও, তুমি কিছু না করিলেও—যুদ্ধ না করিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেও।

† আছে বৈকি! তাঁহাদের গ্রন্থ রক্ষা করা,—কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস—কোন গ্রন্থই সমগ্র বিশুদ্ধ পাওয়া যায় না।—লেখক।

ফোয়ারা

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

ললিতবাবু ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্ব

সমালোচনা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। অথচ প্রতিদিন দেখিবেন, সাহিত্য পত্র-পত্রিকায়, রাজনৈতিক ও সামাজিক খবরের কাগজে সমালোচনা নাম দিয়া কিম্ভূতকিমাকার বিড়ম্বনা বাহির হইতেছে। পড়িলে সমালোচকের উপর কেবল অশ্রদ্ধা হয়, আর কিছুই হয় না। না, গ্রন্থখানি কিরূপ তাহা বুঝা যায়; না, সমালোচক কি বলিতেছেন, তাহা বুঝা যায়; যদি কখন বুঝা গেল, ত তিনটি কথা বুঝা যায়। ১) লেখক গ্রন্থকারকে সার্টিফিকেট দিতেছেন, আর আশীর্বাদ করিতেছেন। আশীর্বাদ করিতেছেন বলিয়া সমালোচক লেখকের গুরু, আর ক্রীতদাসের মত তোষামোদ করিতেছেন বলিয়া তিনি দাস; সুতরাং কেহ রাগ না করিলে, এই সকল সমালোচনাকে গুরুদাসী বলা যাইতে পারে। ২) আর একটা কথা বুঝা যায় যে, লেখকে ও সমালোচকে অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু কি কি বিষয়ে মতভেদ তাহা কিছুতেই জানা যায় না। মত-সামঞ্জস্য ত পরের কথা। ইহাকে মতভেদীই বলা যাউক। ৩) আর এক প্রকার—কণাধারী; বিমান অর্থে আকাশ হইতে পারে না; বিষণ্ণ শব্দের শেষের অক্ষরটি দুইটি ণত্ব নহে—একটি মূর্ধন্য একটি দন্ত্য; পিতামাতা ভুল—রাতা-

পিতা বলিতে হইবে। প্রধানত এই তিনরূপ—গুরুদাসী, মতভেদী ও কণাধারী সমালোচনা ছাড়া অন্যরূপ সমালোচনা আর প্রায়ই দেখা যায় না।

তাহাতেই বলিতেছি, প্রকৃত সমালোচনা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। যখন বয়স্ ছিল, সময়-সুযোগ ছিল, প্রবৃত্তি ছিল, তখন, পাপমুখে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি, আমি প্রকৃত সমালোচনা করিবার যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিতাম। একখানি মাসিক, একখানি সাপ্তাহিক—নিজের দুইখানি কাগজ ছিল; সেইজন্য কতকটা প্রথার দায়ে, আর মাতৃভাষা স্বর্গাদপি ভালবাসি—সেই মাতৃ-অঙ্কে আবর্জনা না লাগে, এইরূপ একটা দুরাকাঙ্ক্ষার বশে নিরপেক্ষ, নির্ভীক, প্রকৃত সমালোচনা করিবার নিয়মিতরূপে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু, তেহি নো দিবসা গতাঃ। সে দিন আর নাই। সে দুরাকাঙ্ক্ষা ত নাই-ই, অধিকন্তু ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে, সমাজে হউক, সাহিত্যে হউক, চরিত্রে হউক কেবল দোষদর্শন অভ্যাস করা একটা মহা পাপ। পাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি, দুর্বল বলিয়া পারি না। কম্‌লি ছোড়্‌তি নেহি।

সৌভাগ্যবলে, ২০।২৫খানি পুস্তক উপহার পাইয়াছি। তাহার সকলগুলিই যে সমালোচনা করিতে হইবে, গ্রন্থকার-দিগের এমন অনুরোধ নাই, তবে গ্রন্থকারদিগের আবার দালাল আছেন। কাজেই সৌভাগ্যবলে যাহা পাইয়াছি, দুর্ভাগ্যবশত তাহারই সমালোচনা করিতে হইবে। সুতরাং আমি বিপন্ন,—আপনারা হাসিতেছেন না ত? যদি হাসিয়া থাকেন, তবে মনে করিবেন, সকলকেই সময়ে সময়ে বলিতে হয়,—'আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা।'

তবে ললিতবাবু এবং তাঁহার পুস্তকের কথা স্বতন্ত্র। স্বচক্ষে না দেখিলেও ভালবাসা জন্মে। রূপে নয়, গুণে। ১৯০৪ সালে আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ অজরচন্দ্র 'বঙ্গবাসী' কলেজে ললিতবাবুর পাদমূলে ইংরাজি পড়িত। তাহার নিকট ললিতবাবুর পাঠনার, ছাত্রগণের সঙ্গে ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা শুনিতাম। তোমরা হয়ত আবার হাসিবে,—আমি কিন্তু সেই অবধি লোকটিকে ভালবাসিয়াছি। তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন, তাহা আমি জানিতাম না। তাহার পর, তিনি লেখকরূপে ক্রমে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। আমি সন্তর্পণে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকিলাম। ক্রমেই বুঝিলাম, তিনি 'রঙ্গরস' লিখিবার জন্য একটু অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন। আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। মনে হইল, একটি গুণবান্ পুরুষ এইবার বিপথগামী হইতে লাগিলেন।

সেই ভালবাসার সঙ্গে এই আশঙ্কা মিলিয়া আমাকে এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে।

ললিতবাবু সকলরূপ লেখা লিখিতেই অগ্রসর। গদ্য, পদ্য, চটুকে, চুট্‌কি, কৃষ্ণকথা, পত্নীতত্ত্ব, সমালোচনা, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকলরূপই তিনি লিখিতেছেন। এক 'ফোয়ারা' গ্রন্থ ধরিলেই প্রায় তাঁহার সকলরূপ রচনার নমুনা পাওয়া যায়। আমরা সেইখানিকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার কৃতিত্বের আলোচনা করিব।

আমার মত পণ্ডিতের পক্ষে 'প্রকৃতিবাদ'ই প্রধান সম্বল। 'প্রকৃতিবাদে' ফোয়ারা শব্দ নাই, ফুয়ারাও নাই। উৎস দেখিলাম—উৎস অর্থে ফোয়ারা। বড় বিড়ম্বনায় পড়িলাম। গ্রন্থকারের আশ্রয় লইলাম। 'বালুকাময় মরুভূমিতেও স্থানে স্থানে ফোয়ারা আছে। শিক্ষকের শুষ্ক জীবনেও মাঝে মাঝে ভাবের ফোয়ারা খেলে।' শিক্ষকের শুষ্ক জীবন—স্বীকার করি না; তাহা হইলে শিক্ষককে না দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিলাম কি করিয়া? শিক্ষকের মত সরস জীবন আর হইতেই পারে না। শিক্ষক সমাজ-বিধাতা। এই ভারতবর্ষ রাজার দ্বারা গঠিত কোন কালে হয় নাই। ভারত ব্রাহ্মণ-গঠিত, অর্থাৎ শিক্ষক-গঠিত। জগতের সেই শিক্ষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই শিক্ষাদানের অধিকারী হইয়া ললিতবাবু আপনাকে কেন হীন মনে করেন, তাহা বুঝা যায় না। এটা তাঁহার একটা বিষম ভুল; মানসিক বল কেন্দ্রীভূত করিয়া মন হইতে এই ভুল তাঁহাকে দূর করিতে হইবে। যে নিজের শুষ্ক জীবন, এই বিশ্বাসে লিখিতে আরম্ভ করে, সে বাহির হইতে যতই রস আনুক না কেন, সে সমস্ত রস শুকাইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত উৎসের রস ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে, তাহা ত কখন শুষ্ক হয় না।

ফুৎকার, ফুৎকারা, ফুয়ারা, ফোয়ারা। ফুৎকার নীরসও হয়, সরসও হয়। 'ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি, পুন কর বিশ্বসৃষ্টি'

—সে জলভরা শুণ্ডের ফুৎকার। সুতরাং তাহাতে বিশ্ব আবার ফুটিয়া উঠে। আর শুষ্ক জীবনের ফুৎকার কেবল আবেগভরে বাহির হয়, একটু ফুর্ ফুর্ করে, আর কিঞ্চিৎ যেন অবহেলা এবং অবজ্ঞা দেখায়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ললিতবাবুর জীবন শুষ্ক নহে এবং দেখিতেছি তাঁহার এই ফোয়ারাও একটা ফুৎকারমাত্র নহে। তবে, কবি যে বলিয়াছেন,—

না হ'লে রসিকে বয়োধিকে রস জানে না,
এ রস প্রবীণে বিনে নবীনে সম্ভবে না।

—সে কথাটাও একেবারে তুচ্ছ করিবার মত নহে। ললিতবাবুর জীবনে যথেষ্ট রস আছে, কিন্তু সে রসের পরিপাক এখনও হয় নাই। রসে বড় বেশি তরলতা আছে। কাজেই চাঞ্চল্য আছে, চাপল্য আছে।

এই তারল্য আছে বলিয়া অনেক সময় তাঁহার রচনায় কেন্দ্র স্থির থাকে না। ফোয়ারার প্রথম প্রবন্ধ লইয়াই এই কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিব। গোরুর গাড়ী ভাল? না, রেলগাড়ী ভাল? তুমি যদি আপনার সুখদুঃখকে কেন্দ্র করিয়া বল, দুই-ই কষ্টকর বা দুই-ই সুখকর, অথবা একটি সুখকর, অন্যটি কষ্টকর, তাহা হইলে, সে লেখা বুঝা যায়। তাহা না লিখিয়া, তুমি লিখিলে,—'বিলাতী সভ্যতার হিড়িকে আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথাগুলি একে একে লয় পাইতেছে; বহু-বিবাহ উঠিয়াছে, অবরোধ-প্রথা, জাতি-ভেদ-প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা যায় যায় হইয়াছে, আমাদের সনাতন চকমকির স্থান বিলাতী অগ্নি, দেশালাই রূপী দখল করিয়াছে, নবাবী আমলের অম্বুরী খাম্বিরা ছাড়িয়া আজি ভারতবাসী মার্কিনের বড্‌সাই ফুঁকিতেছে। আবার বুঝি বিধিবিড়ম্বনায় আমাদের সনাতন ঋষিদিগের উদ্ভাবিত অপূর্ব যান গোরুর গাড়ীও বিলয় প্রাপ্ত হয়।' এ লেখা বুঝা যায় না। বুঝা যায় না—তুমি জজ অথবা উকীল। জজ বিচার করেন, তুমি তাহা করিতেছ না। উকীল একটি পক্ষ সমর্থন করেন—তুমি ত তাহাও করিতেছ না। তোমার অপক্ষপাতিত্বও নাই, পক্ষপাতিত্বও নাই—তোমার কেন্দ্র স্থির নাই; সুতরাং তোমায় বুঝা যায় না। তুমি বলিবে, 'আমি রঙ্গরস লিখিতেছি, আমার আবার কেন্দ্র কেন?' এ একটা বিষম ভুল কথা; এ কথা থ্যাকারে বলিলে বলিতে পারেন, কিন্তু ডিকেন্স কখনই বলিবেন না। বিনয়ে বলি, তোমরা কেহ যেন থ্যাকারের শিষ্য হইও না। দুই দিকে চাবুক মারিতে চাও বেশ ত। নূতনকেও মার পুরাতনকেও মার—কিন্তু নিজের কেন্দ্র স্থির রাখিও। সকল বিষয়েই ঘোলষাঁড়ের আদর নাই—বিশেষ এই রসরচনায়। কেন্দ্র না থাকিলে এলোপাথাড়ি মারধর করিলে প্রশংসা নাই, উহাতে জয়বিজয়ও হয় না। আর কেন্দ্র স্থির রাখিয়া অস্ত্রচালনা করিলে, হারিলেও জিত আছে; লেখা খুব উজ্জ্বল না হইলেও কেন্দ্রাবলম্বী লেখার একটা নিজের স্থির প্রভা আছে।

পর প্রবন্ধ 'তীর্থ-দর্শনে'ও কেন্দ্র স্থির নাই। এক পৃষ্ঠায় (২৬) উপর দিকে কেন্দ্র যেরূপ, নিম্নে তাহার বিপরীত ভাবে। 'ঘাটের উপরি ভাগ ও সোপানশ্রেণী মনুষ্যমূত্রের গন্ধে ও কুক্কুরবিষ্ঠায় (ইহার মধ্যে মনুষ্য-কুক্কুরও আছে) অশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। ... ... ইহা হিন্দু সমাজের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার বিষয়।' নিম্নদিকে,—'পতিতপাবনী সুরধুনীর ন্যায় বিশ্বনাথের পুরীও পাপীর সংস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই, বরং পাপীদিগকে নিজ ক্রোড়ে স্থান দিয়া তাহাদের পাপক্ষালনের পথ দেখাইতেছে।' এইরূপ কেন্দ্র-পরিবর্তন সর্বত্র। এই দোষে এমন সুন্দর লেখা অনেকটা ফলহীন হইয়াছে। আমরা গুণশালী লেখককে কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করিয়া কেন্দ্র স্থির রাখিতে পরামর্শ দিই।

তাহার পরে 'বারাণসীদর্শনে' ক্ষুদ্র কবিতাটিতে বেশ কেন্দ্র স্থির আছে। একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

'জাহ্নবীর বারি
সুস্নিগ্ধ নির্মল; স্নানান্তে জুড়ায় দেহ,
আত্মার কলুষ কাটে, ভরে মনঃপ্রাণ
শান্তির বিমল রসে। প্রভাতে সন্ধ্যায়
তীরে বসি পূজে ভক্ত নিজ ইষ্টদেবে;
বসি সাধু দণ্ডী কাছে শুনে ধর্মকথা
কেহ শুদ্ধচিতে। বিরাজিত শান্তি সদা
এ পবিত্র ধামে, ভুলে নর শোক-তাপ;
আত্মার পিপাসা মিটে শান্তি-সুধা পানে।

যুগে যুগে যোগি-ঋষি-সাধু-ভক্তগণ
পবিত্র করেছে পুরী চরণ-পরশে ;
পুণ্য রজঃস্পর্শে প্রতি ধূলিকণা
পূরিত অধ্যাত্ম-বলে ; তাই বুঝি প্রাণ
শান্তিরসে অভিষিক্ত, বৈরাগ্য-মণ্ডিত
হয় প্রতিক্ষণে ; ছেড়ে যেতে আঁখি ভরে
অশ্রুনীরে, শূন্য ঠেকে হৃদয়-পঞ্জর—
বুঝি না অজ্ঞান মোরা কেন হেন ভাব।'

উপসংহারে কবি লিখিতেছেন—

'ইস্‌লাম মজিদ হোথা উচ্চ চূড়া তুলি,
বিরাজে তাহার পাশে শ্রীবিন্দুমাধব ;
আদি-বিশ্বেশ্বর-স্থান হয়েছে মজিদ ;
খৃস্টান ভজনালয়, শিবের মন্দির
রহে পাশাপাশি, কি উদার ধর্মভাব।
বহু ধর্ম বহু যুগে উদিত ভারতে
সংঘর্ষণ-সমন্বয় বারাণসী ধামে।'

লক্ষ্য করিবেন, আরঙ্গজীবের মজিদ দেখিয়াও কবির মনে, ধর্মবিদ্বেষের কথা উঠিল না। এ স্থলে তিনি কেন্দ্র স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার মনে কেবল ধর্ম-সমন্বয়ের উদারতার কথা উঠিয়াছে। তাই ত চাই।

তাহার পর ললিতবাবু একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন 'সুখের প্রবাস'। প্রবন্ধের মুখবন্ধে ললিতবাবু বলিতেছেন, 'এবার আর শীতলা ঘাড়ে করিয়া বাহির হই নাই। একা আসা, একা যাওয়া, একের কর ভাবনা—মহাপ্রয়াণের এই সারতত্ত্ব বুঝিয়া একাই বাহির হইয়া পড়িয়াছি।' কিন্তু শীতলা-বিরহিতা অবস্থাকে 'সুখের প্রবাস' বলায় শীতলা মহা রৌদ্রা হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য পর মাসের প্রবন্ধ 'বিরহ'—তাহার উপসংহার—বৈষ্ণবের সার কথা—

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥

তাহার পর চুটকি সাহিত্য। তাহার একটি ভূমিকা আছে। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন, 'একটু রসিকতা থাকিবে, কিন্তু তাহা হাল্‌কা হইবে না, ভাবটি গভীর হইবে, অথচ তাহাতে বিকট গাম্ভীর্য থাকিবে না, চাই কি একটু বিদ্রূপের কটাক্ষ থাকিবে, অথচ * করুণার অন্তঃসলিল প্রবাহ ধীরে বহিয়া যাইবে। এইরূপ উজ্জ্বল-মধুরে মিশিলেই এই প্রকারের সাহিত্য সার্থক হয়।' এই লক্ষণটি অতি সমীচীন। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার স্বয়ং নিজনির্দিষ্ট লক্ষণ অনুসরণ করিতে পারেন নাই। আমরা নির্বন্ধসহকারে নিবেদন করি, গ্রন্থকার যেন চুটকি সাহিত্যে আর কখন হস্তার্পণ না করেন।

দুই একটি চুটকির দৃষ্টান্ত দিব—

একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী বড় মানুষের বাড়ী সামিয়ানা চাহিতে গেলেন। সামিয়ানার চারি কোণে চামড়া দিয়া সেলাই করাইয়া মজবুত করা হয়। ব্রাহ্মণ অতি বিনীতভাবে বলিলেন, আমার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ-উপলক্ষে আপনার নূতন সামিয়ানাখানি দুইদিনের জন্য চাহিতেছি। বড় মানুষ সহাস্য বদনে বলিলেন, আপনাকে দিব কি, ঠাকুর! এখনও মুচির কর্ম হয় নাই। ব্রাহ্মণ সেইরূপ সহাস্যে বলিলেন, না দিলেই হইল।—দেখুন কেমন তীব্র শ্লেষ, অথচ বিকট গাম্ভীর্য নাই ; করুণায় অন্তঃসলিল প্রবাহের মধ্যে কেমন একটু বিদ্রূপ-কটাক্ষ। ললিতবাবুর লক্ষণের সঙ্গে কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিল।

সেকালে আর একরূপ চুটকি ছিল যাহার কথা একটু উলটিয়া বা বাড়াইয়া দিয়া তাহাকেই উত্তর দেওয়া। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উলার মুক্তিরাম মুখুয্যেকে বড় ভালবাসিতেন ; বেহাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন ; সেই সম্পর্কের দোহাই দিয়া তাঁহাকে লইয়া নানা রঙ্গরস করিতেন। উলায় বহুতর কুলীন ব্রাহ্মণের বাস, সেই উপলক্ষ করিয়া রাজা মুখুয্যেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'হাঁ হে বেহাই! তোমাদের গ্রামে নাকি বৌ বিক্রয় হয়!' এটা অবশ্য গালি। মুক্তিরাম কিন্তু গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে মহারাজ! নিয়ে যাবা মাত্রই।' মহারাজ নিস্তব্ধ।

* মূলে 'অথবা' ছিল, আমি 'অথচ' লিখিলাম ; কেন-না করুণার অন্তঃসলিল সকল সময়েই থাকা আবশ্যক। অ. চ. স.

এইরূপ রস-ভাব বাঙ্গালার ভদ্র সমাজে সর্বদাই শুনা যাইত। আমরা বহুতর শুনিয়াছি। আমাদের সময়ে যে তিন জন রসরচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন—শিশিরকুমার, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইন্দ্রনাথ—তাঁহারা তিনজনই বিশেষ হৃদয়বান্ ব্যক্তি। এ কথা বলাতে এমন বলা হয় না যে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ, তিনি একজন হৃদয়হীন লোক; তাহা যদি বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে ভালবাসি বলিয়া এই প্রবন্ধের সূচনা করিতাম না। আমার বিশ্বাস, ললিতবাবুও সহৃদয় ব্যক্তি; তবে বোধ করি, শিক্ষা-বিভ্রাটে, অথবা এখনকার কালের বিষম উৎসাহ-বাত্যায় হৃদয়ের ভাবের পরিপাক হয় নাই। চাঞ্চল্যবশে তাঁহার অপরিপক্ক ভাব পাকাইয়া উঠে, আর বন্ধুবান্ধবদিগের উৎসাহ-দোষে তাহাই 'পয়সা পোয়া' বলিয়া বাজারে আনীত হয়। কাগজের সম্পাদকদিগকে আমি সেইরূপ বন্ধুবান্ধব বলিয়া অনুমান করিতেছি। অনুমান সমস্তই অমূলক হইতে পারে, হইলে আমাকে মার্জনা করা ব্যতিরেকে আপনাদের আর কি গতি আছে?

বড়ই গুরুমহাশয়গিরি করিয়াছি, একটু অন্যদিকে যাই।

ললিতবাবু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতেও হাত দেখাইয়াছেন। রবিবাবুর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য, তস্য সমালোচনা, তস্যাঃ সমালোচনা এইগুলি পাঠ করিয়া তবে সেটি পড়িতে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। এরূপ দারুণ অনুরোধ এ বয়সে রক্ষা করা কঠিন, কিন্তু তাহাও করিয়াছি। কিন্তু কোন ফল পাই নাই। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝিবার পক্ষে কোন ফলই পাই নাই। নতুবা রবিবাবুর কাব্যপাঠের ফল অবশ্য পাইয়াছি। এই কাব্য-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলিয়াছেন, 'ইহার সুন্দর ভাষাও মধুর ছন্দোবন্দ, ইহার উপমাছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।' শেষের দগ্ধ করা কথাটি ছাড়া আর সকল কথাই আমার শিরোধার্য। আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—সেটিও শিরোধার্য; 'যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই। সব নায়ক আর নায়িকা।' চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই কথাটি আমি বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু শুনিবার লোক নাই। বিদেশের Love লইয়াই আমরা ব্যস্ত। আমাদের তপোবনের সীতা, মহাভারতের কুন্তী, বৈষ্ণবের যশোদা ও শাক্তের মেনকা আমরা ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছি। ভুলিয়া পাইতেছি কিনা 'পোড়ারমুখী' ভ্রমরা ও কলঙ্কিনী শৈবলিনী। মরি রে! স্বদেশী! তোর বালাই লয়ে মরি।

কাব্যে মাতা-কন্যা নাই বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের যে দুঃখ তাহা সহজ, স্বদেশী। তবে কাব্যে যে নৈতিক আক্রোশ—এটা সম্পূর্ণ বিদেশী বস্তু, কৃত্রিম কোপ। 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলাম, প্রেম যে কখন কলুষিত হইতে পারে, কলুষিত প্রেমরূপ যে কোন পদার্থ আছে, বৈষ্ণব কবিরা তাহা অনুভবও করিতে পারেন নাই। তবে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, 'রবিবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব-কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে।' তাহাই যদি হয়, সে কবিতা সদোষ হইল বটে, কিন্তু একেবারে দগ্ধ করিবার উপযুক্ত কি?

এ সকল কথা আমাদের প্রবন্ধের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কশূন্য, তবে ললিতবাবু যে বলেন, আমাদের সমাজে দাম্পত্যপ্রণয়ের পূর্ণ পরিণতি এই কাব্যে দেখানো হইয়াছে, তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাহা কিছুই বুঝা যায় না। বুঝা যায়, লেখক টেনেবুনে কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন, এইমাত্র। তাহাতে কাব্য বুঝিবার বা সমাজ বুঝিবার কোন সুবিধা হয় নাই এবং দ্বিজেন্দ্রবাবু যে নৈতিক খট্‌কা তুলিয়াছেন, তাহার কোন মীমাংসাও হয় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, ললিতবাবু বঙ্গসাহিত্যের অনেক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। 'ফোয়ারা' অবলম্বন করিয়া তাহারই কতক কতক আলোচনা করিলাম। এইবার তাঁহার কাব্য-সমালোচনার কথা বলিব।

গত আশ্বিনের 'প্রবাসীতে' দুই কলমের আটচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক রবিবাবু নিজেই নামকরণ করিয়াছেন বলিয়া নাটক বলিতেছি। ২রা আশ্বিনে সেই 'অচলায়তনে'র সমালোচনা লিখিয়া ললিতবাবু 'আর্যাবর্তে' ছাপিতে দিয়াছিলেন। এই ক্ষিপ্রকারিতা-দ্বারাই ললিতবাবুর উপর আমাদের আরোপিত

চাপল্য প্রমাণীকৃত হইল। দেখা যাইতেছে, ললিতবাবু যেমন 'অচলায়তন' পাঠ করিলেন, অমনই বিষম চঞ্চল হইয়া সমালোচনা লিখিতে বসিয়া গেলেন। পড়ার পরই লেখা, লেখার পরই ছাপাইতে দেওয়া—তিলার্ধ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। বাহাদুর পুরুষ বলিতে হয়। কিন্তু এই বাহাদুরি না কমাইলে রসের পরিপাক হয় না। যদি বা হয়, ত কেন্দ্র স্থির থাকে না। আবার চাপল্যের নানা বিষময় ফল আছে। এই দেখুন, সমালোচনার প্রথম পৃষ্ঠারই ছয়পঙ্‌ক্তি পরে ললিতবাবু লিখিতেছেন, 'ভারতীয় আর্যধর্ম মন্ত্রোচ্চারণ, বেদগান, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠানবাহুল্যে সংহিতাব্রাহ্মণ আরণ্যকাদি প্রপীড়িত।' কে প্রপীড়িত? ভারতীয় আর্যধর্ম? না, আরণ্যকাদি? না, উভয়ই? আপাতত আমরাই প্রপীড়িত—যিনি বাক্যরণবিড়ম্বনার কথা লইয়া বঙ্গসাহিত্য কিছুদিন যাবৎ আলোড়িত করিতেছেন, তিনি কিনা নিজ ক্ষিপ্রকারিতাদোষে নিজেই বিড়ম্বিত হইলেন! এরূপ দেখিয়া কপালে ঘা মারিতে ইচ্ছা করে, আর বলিতে ইচ্ছা করে, 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?'

এখন একবার সমালোচনাটি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

'অচলায়তনের' মূল কথার ললিতবাবু যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। আমরা কণাধারী সাজিব না।

'অচলায়তনের' আসল জিনিস পঞ্চকের গানগুলি। সেইগুলি-সম্বন্ধে ললিতবাবু বলিয়াছেন—ঐ গুলিতে 'সাধকের প্রেমময় হৃদয়ের একটি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। ভাষা যেমন সরল, তেমনই মধুর। গানের নূতন দোদুল ছন্দে ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল আহ্বান শুনিয়া পাঠকের মনঃপ্রাণ ভরিয়া যায়!' বাস্তবিক পঞ্চককে বালক রবীন্দ্রনাথ বলিয়া মনে হয়।

এই কথা লিখিতে গিয়া একটা কথা মনে পড়িল। অচলায়তনের সমালোচনার একটা ফুটনোটে ললিতবাবু লিখিয়াছেন, আমার 'সনাতনী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' একই সময়ে প্রকাশিত হইল ইহা significant নহে কি? আমিও একটা significant সমাবেশ পাইয়াছি, বলিতে দোষ কি?

আশ্বিনের 'প্রবাসীতে' 'অচলায়তনের' পরেই রবিবাবুর 'জীবনস্মৃতি'তে 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' বাহির হইয়াছে। পঞ্চককে বালক রবীন্দ্রনাথ বলিতে গিয়াই আমার মনে হইল, এই ভৃত্যরাজকতন্ত্রই কি তবে অচলায়তন? তবে কি রবিবাবু আপনার জীবনস্মৃতি রূপক-এ ও স্বরূপে দুই ভাবেই লিখিতেছেন?

রূপকের অচলায়তন অবশ্য এক সুবৃহৎ চত্বর, রবিবাবুর বাল্যজীবনের অচলায়তন একটি ঘর,—সেই ঘরের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার বিচরণ-স্থান; * গুণের মধ্যে সেই ঘরের উত্তরদিকের জানালা খুলিলে প্রায়শ্চিত্তের বিধি ছিল না। সেই জানালাতে একাদিক্রমে ৬ ঘণ্টা ৮ ঘণ্টাকাল কেবল পাঁচ জনে কে কেমন করিয়া গা ধুইতেছে, মাথা রগড়াইতেছে দেখা, ইহা পঞ্চকের 'তট তট তোটয় তোটয়' অপেক্ষা দশগুণ বেশি কষ্টকর, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিশেষ রবিবাবু নিজেই ধরা দিয়াছেন, —তিনি অচলায়তনকে **ঘর** বলিয়াছেন—

'বেজে উঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে উঠে বন্ধ এ **ঘর**
বাহির হতে দুয়ারে কর,
কেউ ত হানে না!'

সুতরাং নিজের ঘরের কথাই রবিবাবু যে অচলায়তনে লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ত ঘর-প্রাচীরের কথা, তাহার পর শাসনের কথা শুনুন। রবিবাবু স্বরূপ বর্ণনায় লিখিতেছেন,—

'ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি, তখন তাহার

---

* "বাহির বাড়িতে দোতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত। আমাদের এক চাকর ছিল।......সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডী কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত গণ্ডীর বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ।" জীবনস্মৃতি। প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩১৮।

মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই সকল রাজাদের পরিবর্তন বারংবার ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকলতাতেই **নিষেধ** ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।' এসকল কি অচলায়তনের বর্ণনা নহে? রবিবাবুর আশ্বিন মাসে প্রকাশিত জীবনস্মৃতির শেষ কথা—'আমরা যেমনই পড়া স্থরু করিতাম, অমনই মাথা ঢুলিয়া পড়িত। চোখে জল-সেক করিয়া বারান্দায় দৌড় করাইয়া কোন স্থায়ী ফল হইত না। এমন সময় বড়দাদা যদি দৈবাৎ স্কুল-ঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন, তবে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পর ঘুম ভাঙ্গিতে আর মুহূর্তকাল বিলম্ব হইত না।' জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—এই 'বড়দাদা' অচলায়তনের 'আচার্য' নহেন কি?

'অচলায়তন' সম্পূর্ণ গ্রন্থ, 'জীবনস্মৃতি' ক্রমশ প্রকাশ্য। এই উভয়ের মধ্যে সমালোচনা এখন ভাল নয়। তবে ললিতবাবুর ফুটনোটের significance দেখিয়া এই significance মনে উঠিল—তাই এত কথা বলিলাম।

এখন আসল কথা পঞ্চকের গানগুলি যেমন স্থন্দর, প্রাণস্পর্শী হইয়াছে, পাত্রগণের কথাবার্তা তেমনই নীরস, একঘেয়ে, ছড়ানো—কোনরূপ কাব্যের অনুপযুক্ত হইয়াছে; ললিতবাবু যে তাহা একেবারে ধরিতে পারেন নাই তাহা নহে। তিনি বলিতেছেন, 'আর্ট হিসাবে নাটকখানির একটি দোষ দেখা যায়, রচনাটি যেন অত্যন্ত diffuse; হিং টিং ছটের সে compactness ইহাতে নাই, হেঁয়ালি নাট্যের সে খোলা প্রাণের (wit) রসিকতা যেন ঈষৎ অম্লত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।' যদি মিষ্টে ঈষৎ অম্লত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহার নিছনি লইয়া বরণ করিয়া ঘরে তুলিতাম। তা কোথায়? সেই ঈশ্বর গুপ্তের কথা—

এখনকার নাটক
না-মিষ্ট, না-টক।

তাই কি ঝাল আছে গা? 'বিষদিগ্ধ বিদ্রূপবাণ?' কি এইরূপ? কথায় বলে,

হাস্‌তে হাস্‌তে মার্‌বে ঠোনা,
লাগবে যেন বিদ্যুৎ ঝন্‌ঝনা।

তাহা কি অচলায়তনের কোথাও আছে? তাহা নাই—থাকিলে হৃদয়ে না রাখিতে পারি, মাথায় লইতাম। আছে কেবল—একরূপ বিকৃত হিন্দুয়ানির উপর নপুংসকের নৃত্য ও লাঞ্ছনা। গানগুলি ছাড়া সমস্ত পুস্তকখানি রবিবাবুর একেবারে অনুপযুক্ত।

ললিতবাবুকে ছাড়িয়া আমরা যেন অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বাস্তবিক তাহাই কি? আমার বোধ হয় ঠিক তাহা নহে। এখনকার দিনে গুরুমহাশয়গিরি করা বড় শক্ত; যাহাকে দাঁড়ি ফেলিতে শিখাইতে হইবে, তাহাকে বলিতে হইবে, "ভাই রামকল্প! এই চণ্ডীমণ্ডপের জোড়া খুঁটি দুটা কি রকম—লেখ ত।" তবে সে পত্‌তাড়িতে হাত দিবে। এখন সকল কথাই ঘুরাইয়া বলা চাই।

ললিতবাবুর মত শিক্ষিত লোককে উপদেশ দিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমার নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, ভালবাসার সঙ্গে আশঙ্কা যদি না আসিত ত আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতাম না; তবে বলিতেছি বলিয়া শুষ্ক নীরসভাবে বলিব? একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতেছি।

'ফোয়ারা' একখানি পুস্তক নহে যে, সেইখানি লইয়া দুচার কথা বলিব! ছাপাকর বা দপ্তরি কতকগুলি প্রবন্ধ লইয়া যে ভাবে ছাপিয়াছে বা বাঁধিয়াছে, সেই ভাবেই একটা ভাবের তাড়া হইয়াছে। তাহার একটা ক্‌ৎপ্ত সমালোচনা হইতে পারে না। কণাধারী না হউক, খণ্ডধারী হইতেই হইবে।

সমালোচনা সাহিত্যের একটা অঙ্গ। সম্মুখস্থ কার্ত্তিকের আর্যাবর্তে দেখিলাম ললিতবাবু সমালোচকরূপে অবতীর্ণ; কাজেই সেই সমালোচনা জড়াইয়া লইয়া আমার এই সমালোচনার অন্তর্গত করিলাম। কিন্তু করিয়া ভাল করিলাম, কি মন্দ করিলাম, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি না। রবিবাবুর 'অচলায়তন' নাটক-অংশে বা কাব্যাংশে এমন কি রঙ্গাংশে কিছুই হয় নাই, এ কথা বলাতে রবিবাবুর কিছুই আসিয়া যাইবে না—কেন-না রবির কলঙ্ক-দ্বারা রবিবিম্ব প্রকৃতি বুঝা যায়, আকর্ষণের বা তেজের খর্বতা হয় না। কিন্তু যে সময়ে আমাকে এই কথাটা বলিতে হইল, এটা

নিশ্চয়ই অসময়। রবিবাবুকে লইয়া শীঘ্রই একটি বিশেষ উৎসব হইবে। আমি সেই উৎসবে যোগ দিতে পারি, আর নাই পারি, আমার এই লেখা দেখিয়া যদি কেহ সময়-গুণে মনে করেন যে, আমি রবিবাবুর গুণগ্রাহী নহি, তাহা হইলে আমার উপর নিতান্ত অন্যায় করা হইবে। রবিবাবুর 'নৈবেদ্য' আমি মাথায় করিয়া লইয়া দেবী সরস্বতীর পাদপীঠ-সম্মুখে নৃত্য করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি।

এখন ললিতবাবুর কথা—ললিতবাবুর অসামান্য ক্ষিপ্র-কারিতা বা চপলতাই যদি ললিতবাবুকে বুঝাইয়া থাকে যে, অনাটক—নাটক, অকাব্য—কাব্য, তাহা হইলে তিনি একটু ধীর স্থির হইয়া কার্য করিলেই চলিবে। আর কাহাকে বলে 'বিষদিগ্ধ বিদ্রূপবাণ' কাহাকে বলে 'শ্লেষ-বিষ' তিনি যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আমরা সকলরূপ শ্লেষ-রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে নির্বন্ধসহকারে নিষেধ করি। চুট্‌কি লিখিতে নিবারণ করিয়াছিলাম, এখন বলি—সকলরূপ বিদ্রূপাত্মক রচনায় তিনি যেন হস্তক্ষেপ না করেন। ইন্দ্রনাথ কবুল জবাব দিয়াছেন যে, বিলাতি বিদ্রূপাত্মক লেখা বাঙ্গালায় চালাইতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইয়াছেন। বিদেশী জিনিস আমদানী করিতে না পারাই ভাল। ললিতবাবু ফরাসী সাহিত্যের দোহাই দিয়াছেন—'সে রসে বঞ্চিত কবি রায়গুণাকর', কাজেই সে বিষয়ে কোন কিছু বলিতে পারিব না। তবে মোটের উপর বলিতে পারি, রহস্য-রচনায় তাঁহার হাত না দেওয়াই ভাল। ইহাতে তিনি এমন মনে না করেন যে, সমগ্র রসরচনা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিতেছি। না, তা কি হয়, সাহিত্য-মাত্রেই রসরচনা। সেই সাহিত্য হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলে আমরা আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিব যে।

ভাষা একটা অঙ্গচ্ছদ; তবে শম্বুকের শঙ্খের মত। শঙ্খ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে শম্বুকও নষ্টপ্রাণ হয়। তবে অঙ্গচ্ছদের আবার অঙ্গচ্ছদ লইয়া ললিতবাবু বড় খুঁটিনাটি করেন। ফোয়ারার মধ্যেও সেইরূপ আছে; সেগুলিতেও হস্তার্পণ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। এই খুঁটিনাটিগুলি থাকিলে এবং টেনেবুনে রঙ্গরস লিখিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিব, এ ভাবটি মন হইতে ললিতবাবু দূর করিতে পারিলে এবং বক্তনীর মায়া কাটাইতে পারিলে ললিতবাবু একজন ভাল লেখক হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস তিনি পণ্ডিত লোক, লেখাপড়া জানেন; আমার বিশ্বাস তাঁহার প্রাণ আছে; আমার বিশ্বাস ছন্দের পারিপাট্যসাধনে তিনি সুপারগ; আমার বিশ্বাস অনেকের অপেক্ষা তিনি দেশের অবস্থা বা দুরবস্থা ভালরূপ জানেন; আমার বিশ্বাস তিনি কাঁদিতে জানেন—তবে তিনি সুপথে যাইতে শিখিলে ভাল হইবেন না কেন?

ললিতবাবুকে বিনয়ে বলি, তিনি সাময়িক সাহিত্যে খণ্ড লেখা লিখিয়া—সময়-প্রসঙ্গে যে কথাটা ভাসিয়া উঠে, সেই বিষয়ে দু'চারিকথা ভালমন্দ লিখিয়া—তাঁহার সাহিত্য-জীবন যেন নষ্ট না করেন। কোন একটি বিষয়ে নিজের মন, প্রাণ, আত্মা ভরপুর করুন, করিয়া সেই বিষয়ে ক্রমশ লিখিতে আরম্ভ করুন। Out of the abundance of the heart the mouth speaketh. এটি বড় পাকা কথা। যে প্রাণ ভরিয়া কোন বিষয়ের চর্চা করিয়াছে, সে কখন না-লিখিয়া থাকিতে পারে না। তবে কি, যে কাঁদিতে পারে, সেই লিখিতে পারে, না, তা নয়; লেখার একটা অভ্যাস থাকা চাই। ললিতবাবুর সে অভ্যাস বেশ সুন্দর হইয়াছে, এখন কেবল স্থির হইয়া ভাবা চাই ও সংযত হইয়া ধীরে ধীরে লেখা চাই।

আর একটা কথা আবার বলি,—পেশাদারের মত রঙ্গ-রসের আড়ম্বর করিয়া দোকান সাজাইবেন না। আপনার বাড়ীতে গিয়া আপনার প্রাণের যৎকিঞ্চিৎ আয়োজনেও আমরা প্রসাদ পাইয়া প্রসন্ন হইব। আপনি হালুইকরের দোকান খুলিলে তাহার ত্রিসীমানায় যাইব না। আমাদের দেশের কোন ভদ্রলোকই হোটেলে বা দোকানে খাইতে ভালবাসে না—পেশাদারিকে আমরা এমনই ভয় করি!

আর রস টানিয়া-বুনিয়া হয় না। সেকেলে পাকা কথা আছে—

কবিতা কোমলবনিতা
আয়াতা সুখদায়িকা,
বলাদানীয়মানা সা
সরসা বিরসা ভবেৎ।

তবে এই মধুরেণ সমাপয়েৎ। সকলে আমার শত ত্রুটি মার্জনা করিবেন। আমি ইচ্ছা করিয়া এ বয়সে কাহারও মনে কষ্ট দিবার জন্য লেখনী ধারণ করিতেছি না।

আর্য্যাবর্ত ২য় বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩১৮

গৃহশ্রী

দীনেশচন্দ্র সেন-প্রণীত

দীনেশবাবুর পরিচয় বাঙ্গালায় দিতে হয় না। শুধু বাঙ্গালাই-বা বলি কেন—বিদেশের অনেকস্থলেও দিতে হয় না। সুতরাং কেবল তাঁহার এই নূতন গ্রন্থের পরিচয় দিব।

গ্রন্থখানির নাম 'গৃহশ্রী'; এই নামে ভিতরকার ব্যাপার বেশ বুঝা যায় না। যাহাতে মধ্যবিধ ভদ্র গৃহস্থের গৃহে শ্রী থাকে বা হয়, তাহারই কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা ইহাতে আছে। সবগুলির নাই—সে কথা পরে বলিব।

গ্রন্থকার স্বয়ং ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'বাড়ীর মেয়েদের ঘরকন্না-সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া এই পুস্তকের সূত্রপাত করিয়াছিলাম…। নিজের বহুদর্শিতার ফল ইহাতে দিতে চেষ্টা করিয়াছি, শাস্ত্র ঘাঁটিয়া শ্লোকের অর্থ বাহির করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে যাই নাই।'

এ অতি উত্তম কথা,—পুস্তকও হইয়াছে উত্তম। রচনার ভাল-মন্দ চিরিয়া চিরিয়া দেখাইবার একটা প্রথা ছিল; এখন ত কোন প্রথাই নাই। না থাকাই ভাল। সৌন্দর্য দেখা ও দেখানো ভাল, কুৎসিতভাগ উপেক্ষা করিয়া যাওয়াই ভাল এবং পাঁচজনকে না দেখানোই ভাল। তবে যেখানে কুৎসিত ভাগ বেশি, সেখানে অগত্যা সে কথাটা বলিয়া দিতে হয়। গৃহশ্রীতে দোষ আছে বটে, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য জাজ্বল্যমান। আর 'কুৎসিত' নাই বলিলেই হয়।

গ্রন্থের প্রধান সৌন্দর্য—ঈশ্বরে নির্ভর করা ভিন্ন গৃহস্থালিতে আমাদের আর গতি নাই, এই কথা চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝানো। গৃহিণী লইয়া গৃহ ও গৃহের শ্রী। সেই গৃহিণীদের অবস্থা অনেক সময় কিরূপ হয় শুনুন,—'তারপর দুর্দিন আসিল, যৎসামান্য খাদ্য পতিপুত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া নিজে অপরের অলক্ষ্যে ক্রমাগত উপবাস করিতে লাগিলেন। তখন তিনি কাহাকে ডাকিয়া থাকেন? যিনি নিজের অদৃশ্য অঞ্চল দিয়া মায়ের মত গোপনে আসিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দেন, দুঃখের সময় তাঁহারই শরণ লইয়া তিনি সান্ত্বনা পাইয়া থাকেন। …… উপবাস ও দুশ্চিন্তায় শরীর কৃশ, সমস্ত সংসারের ভার তাঁহার উপর। ছেলে খারাপ হইয়া গিয়াছে, দুই দিন বাড়ী আসে নাই, স্বামীকে বলিতে গেলে, তিনি মুখভার করেন ও কুপুত্রের নাম শুনিতে চান না; কিন্তু মাতৃস্নেহ কি কোন-কালে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করিয়া থাকে? তিনি দুহাতে চক্ষের জল মুছিয়া তখন কাহার শরণ লন? অপরের অদৃশ্য-ভাবে কাহার পায়ে আত্মনিবেদন করিয়া দেন?…কেহ যখন দুঃখ বুঝিবার নাই, দুঃখ বুঝাইবার শক্তি নাই; তখন দিন-রাত্র তাঁহাকেই ডাকেন—যিনি সকলের অনন্যশরণ—এক-মাত্র গতি। রোগীর পার্শ্বে বসিয়াও সেই নিরাশ্রয়ের স্মরণ করা ভিন্ন তিনি কি করিতে পারেন।'

এই দুঃখের ছায়া-মণ্ডপ-মধ্যে করুণার বেদীতে ভক্তির প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা। এই প্রকরণ-পদ্ধতি গ্রন্থে ওতপ্রোত। ইহাই ইহার প্রথম ও প্রধান সৌন্দর্য। বাঙ্গালার অধুনা-প্রচলিত কয়খানি গ্রন্থে আমরা এরূপ দেখিতে পাই? ঈশ্বর-নির্ভরতা যে বাঙ্গালির সহজ ধর্ম—এ কথা এখনকার দিনে স্বীকার করিতেই অনেকে প্রস্তুত নহেন।

এই ঈশ্বর-নির্ভরতা, যুবতীর যৌবনশ্রীর মত গৃহশ্রীর সর্বাঙ্গে ফুটিয়া আছে। বঙ্গ-যুবতী যখন যৌবনশ্রীতে ভরপুর, তখন তাহাতে খুঁত বাহির করিতে যাওয়া যেমন বিষম বিড়ম্বনা, এই গৃহশ্রীতে খুঁত বাহির করিতে যাওয়া তদপেক্ষাও বিড়ম্বনা। বাঙ্গালায় পুরুষের যৌবন কতদিন পর্যন্ত থাকে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বাঙ্গালার ভদ্রনাম-ধারী পুরুষবৃন্দ হক্‌-না-হক্‌ কতকগুলি দুশ্চিন্তায় শ্রী হারাইতে বসিয়াছেন। ৺পূজার সময় দেওঘরে দুই তিনজন ধনবান্ ব্যক্তি বাস করিতেছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার প্রতিবেশী বলিলেও চলে। তিনি দুশ্চিন্তায় এমন বিষণ্ণভাব লাভ করিয়াছেন যে, তাঁহার মুখে

দেখা করিতেই আমার প্রবৃত্তি হইল না। সেই বিষাদের ছড়াছড়ির মধ্যে গিয়া অনর্থক আপনাকে বিষণ্ণ করিব কেন? দীনেশবাবুর যৌবন গিয়াছে কিনা বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার গৃহশ্রীর যৌবন দেখিলে তাঁহাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতে হয়। গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন, নিজের ঘরকন্নার কথা লইয়া মূলত এই গ্রন্থ। পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়ার কথায় দীনেশবাবু বলিতেছেন,—'কিন্তু যিনি পিতামাতাকে কষ্ট দিয়াছেন, তাঁহার পশ্চাৎ তাঁহাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঘেরিয়াছে,—তাঁহারা সংসারের উন্নতির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া হৃদয়ের জ্বালার হাত কিছুতেই এড়াইতে পারেন নাই। এরূপ নিঃস্বার্থ প্রেমের অপমানে বিধাতা প্রসন্ন হন না। আমি নিজে এ বিষয়ে অপরাধী এবং সেই অপরাধের বহু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া একথা লিখিতেছি।'—যেন অত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাঁহার লিখিবার শক্তি বা প্রবৃত্তিই হইত না। বাস্তবিক পাপী প্রায়শ্চিত্ত না করিলে—কি নিজ অপরাধের কথা বলিতে পারে? তা পারে না। এই যে প্রায়শ্চিত্তের উৎফুল্লতা ইহাকেই গৃহশ্রীর যৌবনশ্রী বলিতে ছিলাম। প্রায়শ্চিত্তের পর যে উৎফুল্লতা, সেই উৎফুল্লতাই পাপকে নরকের নিভৃত-নিলয়ে পাঠাইয়া দেয়। পাপী পাপবিমুক্ত হইয়া অপূর্বশ্রী ধারণ করে। সেই শ্রী বোধ করি যৌবনশ্রী হইতে মধুর। এই সকল অংশ উদ্ধৃত করিলেই সমালোচনা হইল।

কিন্তু এখান হইতে, সেখান হইতে একটু-আধটু উদ্ধৃত করিয়া শ্রীর পরিচয় দেওয়া যায় না। প্রতিমার শ্রী বা সৌন্দর্য একদেশ-নিবদ্ধ নহে। দুর্গাপ্রতিমায় দ্বিজিহ্ব দুই জিহ্বা বিস্তার করতেছে, সিংহ দংষ্ট্রা বিকাশ করিয়া অসুরকে কামড়াইতেছে, শক্তির হস্তে নানাবিধ শাণিত অস্ত্র, একদিকে রামধনুর বর্ণবিস্তারী ময়ূর, অন্যদিকে কালো কুট্‌কুটে চক্ষু লইয়া মূষা—এ সকলই ত আছে; এ সকল দেখিলে ত সৌন্দর্য বুঝায় না; কিন্তু সেই সমগ্র সপ্তপুত্তলী-শোভিত প্রতিমায় ত শোভা ধরে না,—সে যে পূর্ণশ্রী! এই গৃহশ্রীরও শোভা-সৌন্দর্য—পূর্ণশ্রী এই সমগ্র গ্রন্থের সম্যক্ ধারণার উপর নির্ভর করে। এমন গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর একখানি নাই। বাঙ্গালির গৃহপীঠে, অনন্ত দুর্দশার মধ্যে, ভগবানে ভক্তি থাকিলে, কিরূপে সমস্ত দুর্দশার মধ্য হইতে শ্রী—লক্ষ্মী ফুটিতে পারে, দীনেশবাবু আস্তে আস্তে অতি সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। দীনেশবাবু বাঙ্গালিমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। বিশেষত কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শহরতলীর সকলের। প্রধানত শহরের কাণ্ড লইয়াই গ্রন্থকার বিব্রত। তিনি এখন কলিকাতাবাসী—আপনাদের কথা লিখিতে গিয়া তিনি কলিকাতার কথা বিশেষ করিয়াই লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ কলিকাতাবাসীর পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াও আমাদের সমগ্র বাঙ্গালিজাতির পক্ষে অসম্পূর্ণ। কেন, তাহা বলিতেছি।

একস্থানে গ্রন্থকার লিখিতেছেন, 'দান, সেবা ও প্রেম —এই সংসারে সেই দেব-মন্দিরের পথে মানুষকে লইয়া যায়।' অর্থাৎ ধর্মের দিকে মানুষকে টানে। অতি সত্য কথা ও নিগূঢ় কথা। এই গ্রন্থে কিন্তু দান ও সেবার কথা প্রায় কিছুই নাই, এক স্থানে মাত্র আছে,—'গৃহস্থের গৃহে দরিদ্রের জন্য একটা দরজা খোলা রাখা উচিত; অতিরিক্ত ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা করিয়া সেই দরজাটা একেবারে বন্ধ করা উচিত নহে।' তাহার পর গ্রন্থকার বুঝাইয়াছেন, যে হরিনাম গান করে সেও আমাদের অমূল্য রত্ন দিয়া থাকে; সুতরাং তাহাকে দান করিলে গৃহস্থের লাভই হয়,— লোকসান হয় না। তাহার পর গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'অন্ধ আতুরের প্রতি দয়া রাখা গৃহস্থের কর্তব্য।' এ সকল কথা ঠিক, কিন্তু বড় অপ্রচুর। যে দেশে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য বিবেকানন্দের 'বাণী'—'অতিথি নারায়ণ' বজ্রনির্ঘোষে ঘোষিত হওয়ায় ভারতের সর্বত্র সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সেই দেশের পক্ষে ইহা একেবারেই অপ্রচুর।

বিশেষ বাঙ্গালাদেশে গৃহস্থালির জান্ হইতেছে—<u>সেবা</u> ও <u>দান</u>। <u>সুরে সেবা, পঞ্চমে দান</u>। এই সুর-পঞ্চমে জুড়ি মিলাইয়া বাঙ্গালির গৃহস্থালির গান। একান্নবর্তী পরিবার ভাল কেন? না, ইহাতে আর্তের সেবার সুবিধা হয়। একান্নবর্তী পরিবার ভাল—অনায়াসে দরিদ্রকে অন্নদান করা চলে। পল্লীবাস ভাল,—এত ম্যালেরিয়াতেও ভাল— কেন-না অতিথি-সেবার সুবিধা হয়। এইরূপ যেদিক্ দিয়াই দেখা যাউক, ঐ সেবা ও দান সকল দিক্ দিয়াই আমাদের

লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং সমগ্র বাঙ্গালার কথা ভাবিতে গেলে গ্রন্থ বিষম অসম্পূর্ণ হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে এ দোষ আর দেখিতে হইবে না।

সমগ্র বাঙ্গালির জন্য ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং সম্পূর্ণ গ্রন্থ; কেবল কলিকাতার জন্য নহে এবং কোন বিষয় ছাড়িয়া দেওয়াও নাই। 'পারিবারিক প্রবন্ধ'ও ভূদেববাবু নিজ পরিবার লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে পারিবারিক মূল কথা বিস্তর আছে। প্রবন্ধ ৪৮টি, সকলগুলিই প্রয়োজনীয় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু উহাদের মধ্যে গুটিদশের ভাব এই গৃহশ্রীর দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত হইলে সোণায় সোহাগা হইবে। সেই প্রবন্ধগুলি এই,—১) দাম্পত্য-প্রণয়, ২) উদ্বাহ-সংস্কার, ৩) গৃহিণীপনা, ৪) কুটুম্বতা, ৫) অতিথি-সেবা, ৬) পরিচ্ছন্নতা, ৭) চাকর-প্রতিপালন, ৮) বৈধব্য-ব্রত, ৯) একান্নবর্তিতা এবং ১০) রোগীর সেবা।

বাঙ্গালায় গৃহিণীপনা-বিষয়ে অসংখ্য পুস্তক হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'গৃহলক্ষ্মী' বেশ ভাল। দীনেশবাবুর গৃহলক্ষ্মীর দুই ভাগ থাকিলে ভাল হয়। আসল কথা এই গৃহশ্রীর দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা এই সকল বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা দেখিবার ভরসা করি।

দীনেশবাবু যে ভাবে নিজ গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। সেই ঈশ্বর-পরায়ণতার কথা —'গোপনে আনন্দময়ের প্রেমরস-দ্বারা হৃদয় পুষ্ট রাখিলে সংসারের দুর্গতি কি করিতে পারে? বিপদ্ ব্যাঘ্রের মত আসিয়া মেষের ন্যায় হইয়া যায়।......যে পাদপদ্মের প্রভায় তোমার জীবন উজ্জ্বল হইবে, তাহা তোমার মাথার কাছেই আছে। দেহকে পবিত্র কর, সেই দেহই তাহার বেদী হইবে। তখন বিদ্যাপতির কথায় বলিতে পারিবে,—বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে, ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে। —এই দেহ বেদী হইবে এবং মাথার চুল, যাহা এত গৌরবের জিনিস, তাহার দ্বারা ঝাঁটা বানাইয়া সেই বেদী পরিষ্কার করিব, অর্থাৎ আমার যত পার্থিব গৌরব, তাহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করিয়া তাঁহারই পদধূলির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিব। তাঁহারই জন্য পথের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইলে কোন শ্যাম সন্ধ্যায় বা নিস্তব্ধ রজনীতে বা প্রাতের শুভ্র শেফালিকার পতন-শব্দে হয়ত সত্য সত্যই এই হৃদয়কুঞ্জে তাঁহার পাদক্ষেপ শোনা যাইতে পারে; তখন দশ ইন্দ্রিয় ধন্য হইয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা করিতে দাঁড়াইব,—তখন জীবনে যাহা-কিছু বিফল হইয়াছে, তাহা সফল হইবে এবং যত-কিছু দুঃখ, তাহা সৌভাগ্যের শুভচিহ্ন হইয়া কপালে ভক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া দিবে।'

ভক্তিমানের চিত্ত একবার ভক্তিতে দ্রবীভূত হইলে, সেই কোমল হৃদয় সকল সময়ে, সকল স্থানে, সর্বাবস্থায় আনন্দ উপভোগ করে, সেই আনন্দের কার্যে গৃহে গৃহশ্রী পূর্ণ প্রকটিত হয়।

ভারতবর্ষ ৩য় বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

শূন্য পুরাণ

৺ রামাই পণ্ডিত-প্রণীত

শূন্যপুরাণ—৺ রামাই পণ্ডিত প্রণীত, নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনী ও গ্রন্থকারের জীবনী-সহ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত।

প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চা হইতেই বাঙ্গালা ভাষার পুরাতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত কাব্য হইলেও বাঙ্গালার একখানি মূল গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; আর বিদ্যাপতি মৈথিল হইলেও তাঁহার পদাবলি বাঙ্গালির ও বাঙ্গালা ভাষার আদরের ধন বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। বিশেষ বাঙ্গালির মহাপ্রাণ শ্রীচৈতন্যদেব যখন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সর্বদা আলোচনা করিতেন, তখন বিদ্যাপতি যে, সকলের আদরের বস্তু তাহাতে সন্দেহ কি? তাহার পর শ্রীচৈতন্যের ধর্মপ্লাবনে বাঙ্গালা ভাষার শক্তি সঞ্চারিত হওয়াতে, সে ভাষা যে নবজীবন লাভ করে তাহাও বেশ বুঝা যায়। শ্রীচৈতন্য-প্রাণ পদাবলি ও গ্রন্থাদি সকলেই আলোচনা করিতে থাকেন।

কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের সমাদর বাঙ্গালায় ছিল; তবে কৃত্তিবাস যে শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী লেখক একথা অনেকেই জানিতেন না ও মানিতেন না। স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা ঘটকদিগের কারিকা হইতে দেখাইয়া দেন। এখন বুঝা গিয়াছে যে কৃত্তিবাস প্রায় পাঁচশত বর্ষ পূর্বের লোক। এই সকলই বৈষ্ণবগ্রন্থ; চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল শাক্ত গ্রন্থ। বাঙ্গালা ভাষায়, পুরা হউক, আংশিক হউক, কোনরূপ বৌদ্ধ গ্রন্থ যে আছে, একথা পূর্বে কেহ জানিত না, ভাবিত না। বিংশতি বৎসর মধ্যে এই কথাটা প্রচারিত হইয়াছে। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু যখন ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশ করেন, তখনও তিনি এ কথার ইঙ্গিতও করেন নাই।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মাতৃভাষার সেবায় ধন্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, এই তিন মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচ্ছন্ন সুপ্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-বাদ থাকার কথা প্রচার করিয়াছেন।

আমাদের সম্মুখস্থ শূন্য পুরাণ, সেই প্রচারের আপাতত শেষ ফল। গ্রন্থের মুখবন্ধে ৭৩ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল কথার সম্যক্ সমালোচনা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা সম্ভবে না, আমি সাধারণ পাঠকের জন্য আয়াস পাইতেছি মাত্র। পণ্ডিত পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন। মোটামুটি দুই-চারিটি কথায় বৌদ্ধবাদ ধরা যায়—১) আদি দেবের কথা বা সৃষ্টিতত্ত্বে ২) পূজার পদ্ধতিতে ৩) পূজাকর-পরিচয়ে। সৃষ্টিতত্ত্বে শূন্য হইতে আরম্ভ; আদি, অনাদি বা ধর্ম বলিয়া এক দেবতা—এ ধর্ম আমাদের যমায় ধর্মরাজায়—সে ধর্ম নহেন। পদ্ধতিতে 'দ্বার মোচন' 'চলা পারু'…'ঢেঁকী মঙ্গলা' 'গাম্ভরী মঙ্গলা' 'ঘাট মোচন' 'মমুই' প্রভৃতি কত জানা-অজানা কাণ্ডাকাণ্ড আছে! পূজাকর-পরিচয়ে হাড়ী, ডোম, বাইতি প্রভৃতি নীচ জাতির বিবরণ আছে। এই সকল দেখিলেই মনে হয়,—জিনিসটা ব্রাহ্মণ্য প্রধান ধর্মের অঙ্গ নহে, আর কিছু। বাঙ্গালায় নিম্নশ্রেণী-মধ্যে যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই কিছু-না-কিছু এখনও রহিয়াছে।

রামাই পণ্ডিতের সময়-নির্ণয়-কল্পে নগেন্দ্রবাবু 'বিশ্বকোষে', তাঁহাকে বঙ্গের প্রথম ধর্মপালের সমসাময়িক বলিয়াছিলেন; এখন সে মত পরিবর্তন করিয়া, তাঁহাকে আর দুই শত বৎসর পরের লোক স্থির করিয়াছেন। নিজের ভ্রম নিজে দেখাইতে গিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, সাধারণ পাঠকের তত কথা জানিবার প্রয়োজন নাই। সিদ্ধান্ত এই হইয়াছে—উত্তর রাঢ়ে যে সময় (১০১২ খৃঃ অব্দ হইতে ১০২৭ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত) ১ম মহীপালের অভ্যুদয়, তাহারই অব্যবহিত পূর্বে রাজা ২য় ধর্মপাল, রামাই পণ্ডিত, মানিক চাঁদ, গোবী চান্দ বা গোবিন্দ চন্দ্র ও লাউসেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই ধর্মপাল রঙ্গপুর জেলায় ডিম্‌লা থানার অন্তর্গত ধর্মপুর নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। এখনও লোকে সেই ধর্মপালের পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর রাজধানী হইতে পূর্ব দিকে ১২।১৩ মাইল দূরে ময়নাপুর গ্রাম। ময়নাপুরের ৩॥ ক্রোশ উত্তরে দ্বারিকেশ্বর নদীর তীরে চাঁপাতলার ঘাট বিদ্যমান। ময়নাপুর ও চাঁপাতলার মধ্যে প্রাচীন হাকন্দ গ্রাম। এইখানেই শূন্য পুরাণ রচিত হয় বলিয়া ঘনরাম প্রভৃতি ইহাকেই হাকন্দ পুরাণ বলিয়াছেন। শূন্য পুরাণের প্রথম কয় পঙ্‌ক্তি আর বারমাসি হইতে খানিকটা গদ্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সৃষ্টি-পতন

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥১
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার নছিল নছিল কৈলাস ॥২
নহি ছিল ছিষ্টি আর নছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥৩
দেবতা দেহারা নছিল পুজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ ॥৪
রিসি জে তপসী নহি নহিক বাম্ভন।
পাহাড় পব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম ॥৫
পুণ্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥৬

নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল নছিল আঁবর ॥৭
বার বরত নহি ছিল রিসি জে তপসী।
তীথ থল নহি ছিল গঙ্গা বরানসী ॥৮
পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার ॥৯
দসদিকপাল নহি মেঘ তারাগন।
আউ মিত্তু নহি ছিল জমের তাড়ন ॥১০
চারি বেদ নহি ছিল সাস্তর বিচার।
গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করতার ॥১১
জীব জন্তু নহি ছিল নছিল বিম্বুপাত।
দেব থল নহি ছিল নছিল জগন্নাথ ॥১২

অথ বারমাসি

কোন্ মাসে কোন্ রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হয় সুখি আমনি ধামাৎ কম্নি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংস্থর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারীপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে সুখ মুকতি। এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার ॥ দাতার দানপতির বিঘ্ন জাব নাস। কোন্ মাসে কোন্ রাসি। বৈশাখ মাসে মেস রাসি হে বসুদেব! বার ভাই বার আদিত্য। হাস্ত পাতি লেহ সেবকর পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কম্নি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি সাংস্থর ভোক্তা আমনি। সন্নাসী গতি জাইতি। গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে সুখ মুকতি। এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতার দানপতির বিঘ্ন জাব নাস।

যদিও রামাই পণ্ডিতের সময় এখন হইতে প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্বের স্থিরীকৃত হইয়াছে, তথাপি সম্পাদক বলেন যে সেই ভাষার উপর এত শুদ্ধীকরণ চলিয়াছে যে ৬০০ বৎসর পূর্বের ভাষার ছায়া ইহাতে বিস্তর পড়িয়াছে; এমন কি অনেক স্থলে ৩০০ বৎসর পূর্বের শুদ্ধীকরণও আছে। তাহার পর নানা কারণে সম্পাদককে 'অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইয়াছে।' তবে তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, 'ভবিষ্যতে উক্ত স্থান সমূহ দর্শন ও রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণের সহিত দেখা করিয়া শব্দার্থ ও অজ্ঞাত তত্ত্বসমূহ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।' আমরা প্রার্থনা করি, তাঁহার আশা সফলা হইবে।

বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) কার্তিক ১৩১৬

রামায়ণের ছবি ও কথা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী-লেখক
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত

বড় দুঃখ করিয়াই যোগীনবাবু বলিয়াছেন, রামায়ণ ও মহাভারত যে-দুই মহাগ্রন্থ একদিন আমাদিগের প্রকৃতি-গঠনে সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য করিয়াছিল, এখন আর তাহা বালক-বালিকাদের হস্তে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। 'ভূতুড়ে' ও 'আষাঢ়ে গল্প' এখন তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে; এইরূপ বিড়ম্বনা হইতে বাঙ্গালার বালকদিগকে রক্ষা করিতে যোগীনবাবু সংকল্প করিয়াছেন। এই সৎ সংকল্পের জন্য যোগীনবাবু বাঙ্গালি মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

যোগীনবাবু সংকল্প করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন; প্রভূত পরিশ্রম, বিশেষ যত্ন এবং ব্যয়সাধ্য আয়োজন—কোনটিতেই তাঁহার ত্রুটি দেখা যায় না।

রামায়ণের কথাগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায়, কোমল পদবিন্যাসে, বাঙ্গালির প্রাণের ছন্দ পয়ারে,—আগাগোড়া লেখা; পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন ভারতচন্দ্র ও মদন-মোহন, কৃত্তিবাস ও কাশীরাম বেহালা লইয়া, দুই পাশে সুর দিতেছেন, আর মধ্যস্থলে মধুসূদনের জীবনী-লেখক যোগীন্দ্রনাথ কোমল কণ্ঠে রামায়ণ গান করিতেছেন।

একটু নমুনা দেখিলেই সকলে আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন—

হেথা জানকীর সনে রাম রঘুপতি
পঞ্চবটী বনে সুখে করেন বসতি।

রাম সীতা অধিষ্ঠানে প্রফুল্ল কানন,
স্থাবর জঙ্গম সবে আনন্দে মগন।
পুলকে পাদপরাজী দেয় ফুল, ফল,
মধুর সঙ্গীত গায় বিহঙ্গম দল।
গুঞ্জরে মধুপ-কুল, কোকিল কুহরে;
ময়ূর ময়ূরী-সনে, সুখে নৃত্য করে।
কলকল তানে বহে গোদাবরী জল,
সরসী-হৃদয়ে সুখে ফুটে শতদল।
কুসুম সুবাসে বায়ু হ'য়ে আমোদিত,
শ্রীরামে তুষিবে বলি, হয় প্রবাহিত।
বসিবেন রাম, সীতা, শ্রান্ত কলেবর,
শিলাসন পাতে, তাই হরষে ভূধর।
পাছে ব্যথা পান চারু-চরণ-কমলে,
বসুধা সাজেন তাই নব দূর্বাদলে।
নিজে বনদেবী, নিত্য হয়ে হরষিত,
বাজাইয়া বন-বেণু করেন সঙ্গীত।
সরল হৃদয়া যত ঋষি বালাগণ
সীতারে তোষেণ করি প্রিয় সম্ভাষণ।*
লক্ষ্মণ করেন সেবা, সদা শুদ্ধ চিত,
নাহি শ্রান্তি নাহি ক্লান্তি, নিত্য অবহিত।
অতিথি-সেবার তরে, করিয়া যতন,
আনি দেন ফল, মূল করি আহরণ।
নিশীথে শ্রীরাম, সীতা নিদ্রা যান ঘরে,
লক্ষ্মণ প্রহরী র'ন ধনুর্বাণ করে।
স্বকরে কুসুম তুলি, পুলকিত মনে,
সীতারে সাজান রাম ফুল-আভরণে।
রহেন শ্রীরাম-সীতা আনন্দিত মন,—
বনবাস-ক্লেশ বলি না হয় স্মরণ।

দেখিলেন ত, রামায়ণের কথাগুলি, কেমন সুন্দর,—যেন প্রাণের ভিতর বসন্তবায়ু খেলিতে থাকে—আবার চিত্রগুলিও তেমনই সুন্দর। কিন্তু চিত্রের ভাবভঙ্গি বুঝাইয়া দেওয়া বড় কঠিন,—তথাপি একটু পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা করিব।

* 'আলাপন' বলিলে আরও ভাল হয় না কি?

৭ম পৃষ্ঠায় বালিকা সীতাদেবী। ঘাঘরা করিয়া কাপড় পরানো, ফুট্‌ফুটে ক্ষুদে মেয়েটি পাঁচ বছরের, কি ছয় বছরের বলিতে পারি না, কিন্তু অমৃতের পুত্তলী। ক্ষুদে মেয়ে—কিন্তু পদ্মপলাশলোচনা, ভারিভারি গাল দুটি, হাসিবে কি কথা কহিবে, তাহাও বুঝা যায় না, তবে এটা বেশ বুঝা যায়,—লক্ষ্মী যদি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে এইরূপেই হইয়াছিলেন। ক্ষুদে মেয়ে—কিন্তু চরণপূজা করিতে বাসনা হয়। এই চিত্র সুন্দর ও সরস হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ বিংশখানি চিত্র পুস্তকে আছে। সকলগুলিই সুন্দর; একেবারে নির্দোষ না হইলেও সুন্দর। প্রারম্ভ-পত্রে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা—চিত্র অতি সুন্দর, কিন্তু বোধ করি 'সাকেতন' পুরীর চিত্র নহে। সাকেতন পুরীতে সৌধচূড়ে কেতনরাজি থাকিবে ত? আমার নিকট কোন গ্রন্থই নাই, কিন্তু আমি বোধ করি,* অযোধ্যা নগরী সহস্র শতঘ্নী সজ্জিতা, প্রস্তর প্রাচীর-বেষ্টিতা পুরী ছিল। কলানৈপুণ্য-গণনায়, 'লঙ্কাদৃশ্য' প্রথম শ্রেণীর চিত্র। বাড়ী নাই, ঘর নাই, মনুষ্য নাই বলিলেই হয়, পশুপক্ষী কিছু নাই, আছে অগাধ জলরাশির উপরে একখানি জেলে ডিঙ্গী, আর আশেপাশের কালো বন, আর লম্বা লম্বা সুপারি বৃক্ষ—কিন্তু ছবিখানিতে কিছুক্ষণ চক্ষু রাখিলেই প্রাণমন উদাস করিয়া দেয়। বলিহারি চিত্রকরের তুলিকা, আর সেই চিত্রকরের চিত্রিত সমুদ্রের অতুল নীলিমা।

পুস্তকখানি ৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। লেখার নমুনা দিয়াছি, চিত্রের যথাসাধ্য পরিচয় দিলাম। কাগজ উত্তম, ছাপা উত্তম। শক্ত মলাটে বাঁধানো। মূল্য আট আনা। এই পুস্তকে বালকবালিকাদের হাসিখেলার সঙ্গে সদুপদেশ লাভ হইবে, এবং বর্ষীয়ানেরাও পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন—অর্থের অপব্যয় হইল মনে করিয়া, কুতী

* শব্দটি সাকেত 'সাকেতন' নহে। তবে নগরটি যে প্রাচীর-পরিখা-পরিবেষ্টিত, দুর্গ ও শতঘ্নী-সুরক্ষিত, ধ্বজ-পতাকা-সুশোভিত ছিল—সমালোচক মহাশয়ের অনুমান ঠিকই হইয়াছে। বাল্মীকীয় রামায়ণের বালকাণ্ড পঞ্চম সর্গে অযোধ্যার এইরূপই বর্ণনা আছে।
—'মৃন্ময়ী'-সম্পাদক লিখিত পাদটীকা।

গ্রন্থকারকে বা অকৃতী অধম সমালোচককে অনুযোগ করিতে পারিবেন না।

মৃন্ময়ী
(ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরি
সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা)

শঙ্খ

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল-প্রণীত

বহুকাল পরে বঙ্গক্ষেত্রে বড়াল কবির সন্দর্শন পাইয়া পুলকিত হইলাম ; এবার তিনি শঙ্খহস্তে। অপূর্ব মূর্তি!

কবি প্রবীণ হইয়াও নবীনত্ব রাখিয়াছেন ; নিজ শঙ্খের ভাষায় বলিতেছেন,—

হে রমণী, লও, তুলে লও,
তোমাদের মঙ্গল উৎসবে,
একবার ওই গীতিগানে
বেজে উঠি সুমঙ্গল রবে!

তাহার পর রথী, মহারথীকে সম্বোধন করিয়া, যোগী, ঋষি, পূজককে আহ্বান করিয়া, শঙ্খে ফুৎকার দিতে বলিয়াছেন ; কবির সাধারণ পাঠককে আহ্বান নাই। আমরা নারী নহি, ঋষিযোগীও নহি, আমরা নিতান্ত অনাহূত হইয়া উপস্থিত ; ফুৎকার দিতে না পারিলেও শঙ্খধ্বনি শুনিতে আমরা অধিকারী। ধ্বনি সেই—সুপরিচিত নিস্বন—মধুরে গম্ভীর, গম্ভীরে মধুর—সেই ষড়জ-পঞ্চম-গান্ধারের অপূর্ব মিশ্রণ!

কবির বঙ্গমাতার বন্দনা অতুল্য, সূত্রগ্রন্থ 'বন্দেমাতরমের' উৎকৃষ্ট বার্তিক। পড়িতে পড়িতে আত্মগৌরবে আত্মহারা হইতে হয় ; মনে হয়, এমন সুমাতার আমরা কেন কুপুত্র হইব। ভাই আমাদের এমন স্তুতিগানে মাতৃকীর্তন করিতেছেন, আমাদের দুঃখ কি? মাতৃবন্দনার সাতটি 'চৌশাড়ি' উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

প্রণমি তোমারে আমি সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্যময়ী, অয়ি জননী আমার!
তোমার শ্রীপদ-রজ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার!

শতশৃঙ্গ বাহু তুলি হিমাদ্রি শিয়রে—
করিছেন আশীর্বাদ—স্থির নেত্রে চাহি ;
শুভ্রমেঘ জটাজাল দুলে বায়ুভরে
স্নেহ অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষবাহি।

গভীর সুন্দরবনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী,—
বসি স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল।
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কালভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা' দুখানি আগ্রহে শার্দূল।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে—
ব'সে আছ মেঘস্তূপে অমিতবরণা।
নক্রকুল নততুণ্ড পড়ি পদমূলে,
তুলি শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

মূর্তিমতী হ'য়ে সতী, এস ঘরে ঘরে
রাখ ক্ষুদ্রকপর্দকে রাঙ্গা পা দুখানি!
ধান্যশীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে যাই সর্বদৈন্য, সর্বদুঃখগ্লানি!

হেরি—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনতশিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী।
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্তি—অতীত কাহিনী!

এসো—চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্যপ্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞান-দীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি!
প্রতাপ-কেদার-বাপ্পা, গণেশ-সুকৃতী
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী!

দেখুন কবিতার কেমন সুন্দর ক্রমবিকাশ—

মা! তুমি সাগরসম্ভূতা ষড়ৈশ্বর্যময়ী লক্ষ্মী! জগজ্জননীর জনক নগাধিরাজ নিয়ত তোমায় আশীর্বাদ করিতেছেন শান্তিজল গঙ্গাবারি নিয়ত তোমার শ্রীঅঙ্গে ঢালিয়া

দিতেছেন ; মা! সর্বজীব তোমার সেবায় ব্যস্ত, ভুজঙ্গিনী তোমার শিরে ছত্র ধরে, শার্দূল পদলেহন করে, নততুণ্ড নক্রচক্র তোমার পদমূলে পড়িয়া আছে ; করিযূথ উর্ধ্বশুণ্ডে তোমার অভিষেক সম্পন্ন করিতেছে, আমি শঙ্খ, অতিক্ষুদ্র শঙ্খ ; আমি কপর্দক আমায় বক্ষে মা! তোমার রাঙ্গা পা দুখানি রাখ,—

ধান্যশীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে যাই সর্বদৈন্য, সর্বদুঃখগ্লানি!

অয়ি আত্মবিস্মৃতে! ভগ্নস্তূপে, বিনষ্ট মন্দিরে, কিসের সন্ধান কর, মা? মা! তুমি কি জান না যে তুমি চিরদিনই রত্নপ্রসবিনী! তুমি মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী, তুমি রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-গিরিশচন্দ্রের প্রসবিত্রী! তুমি ত চিরদিনই রত্নপ্রসবিনী। তুমি পুরনো মন্দিরে কি খুঁজিতেছ, মা? তুমি কি জান না মা, আমরা তোমার প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে, হৃদয়ে হৃদয়ে গড়িয়াছি, জ্ঞানে অজ্ঞানে তোমারই পূজা করিতেছি। কবির এই পূজা আমাদের সকলেরই প্রাণের পূজা।

গ্রন্থের গুণ গ্রন্থন করিতে হইলে, অন্তত অর্ধেকের অধিক উদ্ধৃত করিতে হয় ; সে ত সম্ভব নহে। কবি সুপরিচিত প্রবীণ কবি। তবে তিনি প্রবীণ হইয়াও নবীনত্ব রক্ষা করিয়াছেন, ইহাই দেখাইবার জন্য আমরা যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম মাত্র।

বসুধা ১১শ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

এষা

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল-প্রণীত

এষা—বনিতা-বিয়োগ-বিধুর বড়াল কবির শান্তি-অন্বেষণ। 'অন্বেষণ'কে প্রাচীন গাথায় 'এষা' বলে,—তাই এই গীতি-কাব্যের নাম 'এষা'।

এই ব্যাধি-মন্দির-দেহে, এই জরা-মন্দির-জীবনে, শোক-মন্দির-সংসারে—শোকের কুঁদের মুখে সকলকেই পড়িতে হয়। সেই কুঁদের মুখে আর বাঁক থাকে না, শোকে সকলকেই সরল করে। আঁক-বাঁক ঘুচাইয়া, মলা-মাটি ধুইয়া সরল করে, নির্মল করে। তবে কেহ কাঁদিতে পারে, কেহ পারে না।

কেহ বলে—

যে করে বুকের ভিতরে—
ও-সে বুক চিরে দেখাবার নয়।

আবার কেহ বলে—

দর্দে দিল্‌কো খোদা জানতে হেঁ,
রাহা নেহী দিল্ পহ্‌চান্‌নে কো।*

কবির প্রাণে কাব্যস্ফূর্তি হয়। রবিবাবুর হইয়াছিল ; এই বড়াল কবির হইয়াছে

অক্ষয়কুমার অনেক দিন হইতেই কবি, কিন্তু এবার তাঁহার কবিত্ব বুক চিরিয়া বাহির হইয়াছে, খোদার কাছে তাঁহার আরজ্ পৌঁছিয়াছে।

শোকে অনেকের বুকের ভিতর তাল পাকাইয়া থাকে। খেই হারানো রেশম সুতার পুঁটলির মত, বিয়োগবিধুর ব্যক্তি খেই খুঁজিয়া না পাইয়া কাঁদিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে না। গুম্‌রিয়া থাকে—'সে যে তুষের আগুন পুড়াইয়ে করে খুন।'

বড়াল কবি, কিন্তু একবারও খেই হারান নাই। স্ত্রীর মুমূর্ষু অবস্থা হইতে কবিতা আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড, মৃত্যু।

কন্যা বলিতেছেন—

বাবা,
মা কেন এত জপ করে আজ,
করে এত ঠাকুর-প্রণাম?

কবি উত্তর দিতেছেন—

কাছে যা বাছা রে, শুনা গে তাহারে
জনমের মত হরিনাম।

হরিস্মরণে কি সুন্দর আরম্ভ!

* (আমার) অন্তরের ব্যথা ভগবান্(ই) জানেন, হৃদয় জানিবার কোন পথ(ই) নাই।

তাহার পর,

শান্ত—তৃপ্ত, ধীরে পার্শ্বে ফিরে
করিল শয়ন—
ফুরাল জীবন!

কবির তখন সন্দেহ হইল,—সকলেরই হয়—

এই কি মরণ?
এত দ্রুত—সহসা এমন!

তাহার পর কবির ক্রন্দন। একটু পরে আবার একটা কথা মনে হইল,—অনেকেরই হয়—'মরণে কি মরে প্রেম?' তাহার পর শ্মশানে একবার মরিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু

মরিয়া জুড়াতে চাই,
মরিতে সাহস নাই!
শিথিল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা।

তাহার পর একরূপ দৃশ্য, অতীতের সহিত ভবিষ্যৎ জুটিতেছে—

গৃহতলে আছে বসি পুত্রকন্যাগণ
করিয়া মণ্ডল;
নববস্ত্রপরিহিত বাক্যহীন, সঙ্কুচিত
ম্লান মুখ, রুক্ষ কেশ, নেত্র ছলছল।

'নববস্ত্রপরিহিত'—'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।' শাস্ত্রকারগণ এই কথা ঐরূপে শিক্ষা দেন। তাহার পর **অশৌচে** কবি ভাবিতেছেন,—

হে পূত তুলসী, বিষ্ণুর প্রেয়সী,
বিবর্ণ তোমার দল।
প্রভাতে আসিয়া প্রণাম করিয়া
কেবা মূলে ঢালে জল।
সন্ধ্যায় আসিয়া, গলে বস্ত্র দিয়া
কেবা তলে দীপ জ্বালে;
নীরস মঞ্জরী পড়ে ঝরি ঝরি
লূতা-তন্তু ডালে ডালে।

ভক্তি-ভরা এই সকল শোকের কথা বড় সুন্দর।

তাহার পর **আত্মশ্রাদ্ধ**—

সদ্যঃস্নাত জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুণ্ডিত-মস্তক,
বসি কুশাসনে;
গলে উত্তরীয় বাস, পড়ে ঘন দীর্ঘশ্বাস,
পড়ে মন্ত্র গাঢ় স্বরে, স্খলিত-বচনে।

তাহার পর **শান্তিজল**—ওঁ মধু মধু মধু, জগৎ মধুময়। কবিত্বের গুণে আমাদের মনে হয় যেন আমরা হিন্দুর শ্রাদ্ধাদির আধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকি। যেন হিন্দুয়ানির বার আনা বুঝিতে পারি।

তাহার পর **শোক**। শোক-কথা আর তুলিব না, বলিব না।

তাহার পর **সান্ত্বনা**।

সতি, মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি!
তুমি যাহে দেছ পদ
সে-যে ফুল্ল কোকনদ!
সে নহে শ্মশান-চুল্লী—ভীষণ-মূরতি।
মৃত্যু যদি নাহি হয়
প্রেম হতে মধুময়,
দিবেন কন্যায় মৃত্যু কেন বিশ্বপতি?
তুমি চোখে মুখে হেসে,
উড়ায়ে আঁচলে কেশে,
চলে গেলে নিজ দেশে অতি হৃষ্টমতি!
মানিলে না কোন মানা
আমি কেন ভাবি নানা?
চায় না দেখিতে বাপে কোন্ স্নেহবতী?

* * *

হে মরণ, ধন্য তুমি! না বুঝে তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে;
জগতে—তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায়!
আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা—
ভাসিছে ইন্দিরা সমা সৃষ্টি নীলিমায়!

সে কিরূপ, তাই বলিতেছেন—

কি স্বপন সুমধুর!
দূর—দূর—অতি দূর—

বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে স্বর্গ-অলিন্দায়
দিয়া ভর একাকিনী
দাঁড়াইয়া বিষাদিনী !
হেরিছে কাতরনেত্রে ধরিত্রী কোথায় !
নীলবাসে দেহ ঢাকা,
মেঘে ঢাকা শশী রাকা,
ঝলকে ঝলকে কিবা আভা উছলায়।
সবৃন্ত মন্দার দুটি
বাম করে আছে ফুটি,
সোণার আঁচল লুটি পড়ে রাঙ্গা পায়।

* * *

আঁচলে মুছিয়া আঁখি
করেতে কপোল রাখি,
আবার আগ্রহে কত চায়—চায়—চায় !
ওই না কন্দুক-প্রায়
সে ধরণী দেখা যায়।
ওই না পূর্ণিমা-চাঁদ রৌপ্য রেণু-প্রায়।

দেখিতে দেখিতে গোলোকের মহিমা কবির নয়নে উদ্ভাসিত হইল—

সূর্য নয় চন্দ্র নয়—
গোলোকে আলোকময়
বিষ্ণুর প্রশান্ত স্নিগ্ধ নেত্র-নীলিমায়।
নহে মধু ফুলবাস—
কমলার ধীর শ্বাস
বহিছে কি প্রেমানন্দে প্রেম-গরিমায়।
নীল মেঘ নিরুপম
ছেয়ে আছে স্বপ্ন-সম,
চপলা চেতনা-সম কভু শিহরায়।
স্বর্ণগৃহে—চুড়ে চুড়ে
নব ইন্দ্রধনু স্ফুরে,
ময়ুর-ময়ুরী নাচে মণি-প্রস্তরায়।
কল্পতরু সারি সারি,
আলবালে কাঁপে বারি,
হরিণী অলস-আঁখি শীতল ছায়ায় ;
পারিজাতে সুধাগন্ধ,
আনন্দে ভ্রমরী অন্ধ,
শাখায় শাখায় পিক মৃদু কুহরায়।
শূন্যে বাজে বীণা বেণু,
শষ্পভূমে কামধেনু,
ধূ ধূ উড়ে স্বর্ণরেণু বিরজা-বেলায়।
দীর্ঘ নেত্র দীর্ঘ ভুরু,
ক্ষীণ কটি, শ্রোণী গুরু,
দুলিছে তরুণী কত লতার দোলায়।
কত সুকুমার শিশু,
ফুল্ল পারিজাত ইষু,
হেলে দুলে হেসে গেয়ে নাচিয়া বেড়ায়।
কত যুবা, কত বৃদ্ধ,
কত ঋষি, কত সিদ্ধ,
সর্বাঙ্গে মাখিয়া রজ আনন্দে গড়ায়।
কি মহান্—কি গম্ভীর,
প্রলয়-জলধি স্থির—
বিরাজে সর্বতোভদ্র রুদ্র মহিমায় !
কি বন্ধুর—কি সরল,
কি কঠোর—কি কোমল,
পৌরুষে বিস্ময় ভয়, মোহ সুষমায় !
উত্তুঙ্গ শিখর-চুড়ে,
গরুড়-কেতন উড়ে ;
নবগ্রহ নবদ্বারে গোপুর-মাথায়।
গায়ে ফুল লতা পাতা,
কত-না কাহিনী গাথা ;
প্রাচীরে উদ্ভিন্ন মূর্তি—নানা দেবতার।
মণ্ডপ সহস্র-দ্বারী,
রুদ্রকণ্ঠ স্তম্ভ সারি,
ঝলকে খিলান-ছাদ নীল মণিকায়।
তলভূমি ঢাকা ফুলে,
ফুলের ঝালর ঝুলে,
ফুলের লহরী দুলে চারু বোধিকায়।

যুগে যুগে নারীনর,—
নতজানু, যুক্তকর,
প্রেমে গদ্‌গদস্বর রাসলীলা গায়!
বাজে শঙ্খ ঘন ঘন,
ফুটে পদ্ম অগণন,
ঘুরে চক্র সুদর্শন তড়িৎ-প্রভায়!

কবি প্রার্থনা করিতেছেন—

গর্ভগৃহে পদ্মাসন,
বসি লক্ষ্মীনারায়ণ,
বাক্য-মন অগোচর—নমামি তোমায়!
সৃজন-পালন-লয়
শ্রীপদে জড়িত রয়—
দেহি দেহি পদাশ্রয় শোকান্ধ জনায়!

পত্নী-প্রেম হইতে লক্ষ্মীনারায়ণের রূপদর্শন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অন্যরূপে লিখিয়াছেন—

দ্বৈতরহস্য।—
যে ভাবে রমণীরূপে আপনি মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি,
* * *
যে ভাবে লতায় ফুল নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
* * *
যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করে লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণগন্ধগীত করিছে রচনা,
হে রমণি, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

এই দ্বৈতবাদের রহস্য রবীন্দ্রনাথ উপসংহারে বলিতেছেন—

আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ!
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজ মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।

বড়াল কবির প্রার্থনা অন্যরূপ—

দাও প্রেম—আরও প্রেম, চিরপ্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!
জীবন মরণ-পানে
বহে যাক সুরে গানে,
হোক প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয়!
ক্ষম এ ক্রন্দন-গীতি—শোক-অবসাদ।
সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া!
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ!
এখনও সে যুক্তকরে
মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা স্নেহ শুভ আশীর্বাদ।

সতী যে পতির শুভাকাঙ্ক্ষিণী, সে ত জীবনে মরণে সমানই আছে; আমার তরে এখনও তোমার আশীর্বাদ মাগিতেছে—সেই পুণ্যে আমি আজি তোমার আস্বাদ পাইতেছি।

বলিহারি কবির কল্পনা—আর ধন্য কবির বিশ্বাস! এই বিশ্বাস পাষণ্ডীকেও বিশ্বাসী করিয়া তুলে।

সাহিত্য ২৩শ বর্ষ কার্ত্তিক ১৩১৯

প্রবাহ

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী-প্রণীত

মাতৃহীনা পতিহীনা সরলার অশ্রুপ্রবাহ। ইহার সমালোচনা কি, জানি না। সরলা এই অশ্রুপ্রবাহ মায়ের নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন; বলিতেছেন—

অনাবৃত হিমময় হৃদয় আমার,
চারিদিকে কঠিন তুষার।

তোমার প্রখর তেজে গলিয়া গিয়াছে সে যে,
নাহি আর কঠিন তুষার,
আজি সে পাষাণ-গেহে, যে প্রবাহ যায় বহে,
শুন কলধ্বনি-স্তুতি তার! (১ পৃষ্ঠা)

মাতৃস্নেহের জ্বলন্ত স্মৃতি, আজি বিধবার পাষাণ-হৃদয়ে প্রবাহ তুলিয়াছে। বিধবা মনে করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় পাষাণে-শ্মশান, কিন্তু মাতৃস্নেহের স্মৃতিতে তাঁহার হৃদয় সিক্ত হইল, উৎস উঠিল, প্রবাহ ছুটিল, কলধ্বনিতে মাতৃস্তুতি গীত হইতেছে—

যে তোমার কথা বলে, মা,
ফেলে তুই ফোঁটা আঁখিজল,
ইচ্ছা হয় ধরি মাথায় আমার
তাহার দু'খানি পদতল। (৩ পৃষ্ঠা)

'সন্ধ্যাবেলা'— তারা ফোটে শত লক্ষ কোটি—
প্রশান্ত স্নেহেতে ভরা
সুকৃষ্ণ সে দুটি তারা
কোথা মা তোমার আঁখি দুটি।
(৭ পৃষ্ঠা)

এ-পার ও-পার—ইংলোক পরলোক—

নদীতে ভাসাই যাহা, মনে করি পাব তাহা
ও-পারের দেশে!
জননি গো জান তুমি, আছে কি গিয়াছে সব
নদীস্রোতে ভেসে। (১১ পৃষ্ঠা)

জননী সরস্বতী লেখিকার লেখনী-মুখে বসিয়া উত্তর দিতেছেন—

এ জগৎ ত্যজি, গেছে নূতন জগতে, যত
তোমাদের আপনার জন
একদিন কতদিনে আবার তাদের সনে,
সেথা গিয়া হইবে মিলন।
যতনে গঠন কর আপনারে আজি হ'তে
মিলনের সে দিন ভাবিয়ে,
সে দিন তাদের সনে যেন গো মিলিতে পার
ধরা হ'তে সুন্দর হইয়ে। (১৫ পৃষ্ঠা)

এই অশ্রুপ্রবাহে হৃদয়ের সমস্ত মলামাটি বিধৌত হইয়াছে; আছে কেবল অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা। স্মৃতিতে আশাতে মাখামাখি হইয়া সরলার প্রাণমন সুন্দর করিয়াছে। পোড়া মানুষ তবু কি আশঙ্কার হাত এড়াইতে পারে? পারে না। 'প্রবাহে' বিস্তর আশঙ্কার কথা আছে। এই আশঙ্কা হইতে বিধাতার উপর আক্রোশ ও আব্দার-

হে বিধাতা বিশ্বস্রষ্টা, শুনি তুমি দয়াময়,
সুধাই তোমায়
সর্বস্ব যে ছিল মোর, তাহারে কাড়িয়া নিলে
একি কিছু নয়? (১৮১ পৃষ্ঠা)

বলে, 'ছিল না কথা, দিয়েছে গাল, আজি না হয় হবে কাল।' যে বিধাতার উপর আক্রোশ করিতে পারিল, সে তাঁহার চরণের ছায়া পাইবেই। তাই,—

দেবতার মন্দির আমার!
কতদিন পরে ভুলি দুয়ার গিয়াছে খুলি
অভাগায় এত কৃপা কার? (২০৮ পৃষ্ঠা)

তাহার পর ভাব-সম্মিলনের পর সমর্পণ!—

হৃদয়-সহিত সম্পদ্ মোর
তুমি লও তার ভার,
দাতা, ভিখারীর ভিক্ষার ধন
কোথায় রাখিব আর? (২৫০ পৃষ্ঠা)

সকল প্রবাহেরই পরিণাম অনন্তে।

জাহ্নবী ২য় বর্ষ ফাল্গুন ১৩১৩

ফোক্‌লা দিগম্বর

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

গ্রন্থের অধিনায়ক সমাজ মানেন না, বন্ধুর পরামর্শ শুনেন না, পিতামাতার সুখদুঃখ বুঝেন না, নবপরিণীতার মুখের দিকে তাকান না। এই সমাজে তিনিই কি

'বঙ্গবাসী' যদি সনাতন হিন্দুসমাজকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে অগ্রসর, তবে 'ফোক্‌লা দিগম্বর' নামে পুস্তক উপহার দিয়া সেই পুস্তক প্রচারের সহায়তা করেন কেন? 'ফোক্‌লা দিগম্বরে'র নায়ক হীরারাল। হীরালাল পল্লী-গ্রামের বড়মানুষের ছেলে, কলিকাতায় পড়েন; ছুটোছাটা ছুটিতে কলিকাতার নিকটস্থ পল্লীগ্রামে বন্ধুভবনে বেড়াইতে গেলেন। বৈকালে একগাছি পুঁটিধরা ছিপ নিয়ে—গ্রামের প্রান্তভাগস্থিত একটি বাগানের মাঝখানে পুষ্করিণীতে একলা, নির্জনে মাছ ধরিতে লাগিলেন। নায়ক ঐখানেই থাকুন। নায়িকাকে আনিয়া দেখাইতেছি।

একটি ছোট্ট কোঠাবাড়ী। তাহাতে দুটি ঘর। ঘরের সম্মুখে একখানি চালা। সেই চালার আধখানিতে একটি আঁতুড় ঘর। তাতে জন্মাল এক মেয়ে। ছয় দিনের দিন মা গেল মরে। মাসী মেয়েটিকে পালন করিতে লাগিল। মেয়ের বাপ শোকে অধীর হইলেন। সুতিকাগারে পত্নীর পীড়া হইয়াছে শুনিয়া, রোগিণীর নিমিত্ত কলিকাতা হইতে এক বোতল ব্রাণ্ডি লইয়া গিয়াছিলেন। শোক-নিবারণের নিমিত্ত সেই ব্রাণ্ডি তিনি একটু একটু পান করিতে আরম্ভ করিলেন। আজও করিলেন কালও করিলেন। ক্রমে অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেন। চাকরী ছাড়িয়া পাগলের ন্যায় দেশ পর্যটনে বাহির হইলেন। ব্রহ্মদেশে গিয়া আবার এক চাকরী পাইলেন। এই বাপের নাম রসময় রায়। রসময় ব্রহ্মদেশে কর্ম পাইয়া প্রথম প্রথম ভায়রাভাইকে অর্থাৎ কন্যার মেসোকে চিঠিপত্র লিখিতেন, টাকাকড়িও মাঝে-মিশালে পাঠাইতেন। ক্রমে কিন্তু তাঁহার পানদোষ আর একটি বিশিষ্ট দোষকে টানিয়া আনিল। পত্র লেখা বন্ধ হইল, টাকাকড়ির ত কথাই নাই। ক্রমে মেয়েকে ভুলিয়া গেলেন। বাপে লালনপালন করিলেও মেয়েগুলো বাড়ে, না করিলেও বাড়ে। সেই ছয় দিনের বালিকা এখন বার বৎসরের নায়িকা হইয়াছে। মেসো মহাশয় ভাল জল না হইলে খান না, কাজেই কলসী লইয়া সেই যেখানে নায়ককে ছিপ হাতে করিয়া বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি, তাহারই বিপরীত দিকের ঘাটে গিয়া উপস্থিত। বালিকা পিছলে পড়িয়া গেল, কলসীটি গড়াইয়া জলের ভিতর গেল। থাক এখন কলসী ঐখানে। গ্রন্থ হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া এই স্থানে গ্রন্থকারের লেখার পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

'যুবক মনে করিল যে, বালিকাকে অতিশয় আঘাত লাগিয়া থাকিবে; সেই জন্য সে কাঁদিতেছে, সেই মুহূর্তে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন কথা না বলিয়া, বন ভাঙ্গিয়া অতি দ্রুতবেগে সে উপরে উঠিতে চেষ্টা করিল। বনে ছিপের সূতা জড়াইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া এক টান মারিয়া সে সূতা ছিঁড়িয়া ফেলিল। ছিপগাছটি এক গাছে লাগিল। ক্রোধভরে ছিপটি ভাঙ্গিয়া সে দূরে নিক্ষেপ করিল। বন পার হইয়া সে উপরে উঠিল; বন পার হইয়া পুষ্করিণীর পাড় প্রদক্ষিণ করিয়া, যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সে ঘাটের দিকে দৌড়িতে লাগিল। কাঁটা-খোঁচায় তাহার পরিধেয় কাপড় ফালা ফালা হইয়া ছিঁড়িয়া গেল; পদদ্বয়ের নানা স্থান হইতে রক্তধারা পড়িতে লাগিল। সে-সমুদয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সে বন-জঙ্গল অতিক্রম করিতে লাগিল। অবশেষে ব্যস্ত হইয়া সে সেই ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বালিকার নিকট যাইবার নিমিত্ত সেই পিচ্ছিল নিম্নগামী পথ দিয়া সেও দ্রুতবেগে নামিতে লাগিল। কিন্তু হায়। কথায় আছে যে,—দেরি তুমি যাও কোথা? না, তাড়াতাড়ি যেথা। তাড়াতাড়িতে যুবকেরও পদ স্খলিত হইল, যুবকও সেই পিচ্ছিল নিম্নগামী পথ দিয়া একেবারে জলে গিয়া পড়িল।'

নায়ক, নায়িকা, গ্রন্থকারের লেখার পরিচয় পাইলেন, এখন আমাদের রসগ্রাহিতার পরিচয় লউন। আমরা গ্রন্থকারের অপূর্ব কৌশল বুঝিতে পারিয়াছি। রামচন্দ্র কত বনে বনে রাক্ষস মেরে, ধনুক ভেঙ্গে, তবে সীতা পান। বটে ত! অর্জুন ভিখারীবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া তবে ত লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদী-লাভ করেন। আমাদের হীরালাল কি কম গা! একটা গোটা ছিপ ভেঙ্গে, একটা আস্ত সূতা ছিঁড়ে, পুকুরের একদিকের বন-জঙ্গল ভেঙ্গে, পরিধানের বস্ত্রখানি শত ছিন্ন করে, একটি লম্বা আচাড়ের পর, পুকুরে নাকানিচোপানি খেয়ে, তবে ত নায়িকার সহিত কথা কহিতে পেলেন! একেই ত বলে,—

'None but the brave deserve the fair.'

কেমন, গ্রন্থকারের লেখার রসগ্রহণ করিয়াছি ত? পাঠকও কিছু পাইলেন ত?

নায়িকার নাম কুসুমকুমারী। গ্রন্থের আগাগোড়া কুসী বলিয়া পরিচিত। এখন যে-কলসী ডুবিয়া গিয়াছিল সেইটিই কুসীদের একমাত্র কলসী। সুতরাং কুসীরা বড় দরিদ্র। হীরালাল তাহাদের দুঃখে বড়ই দুঃখিত। দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া পড়িয়া বন্ধু রামপদ বলিল, 'তুমি বড়মানুষের ছেলে, তোমাদের অর্থের অভাব নাই; তুমি কুসীকে বিবাহ করিলেই তাহাদের দুঃখ মোচন হইবে।'—হীরালাল বলিল, 'তাহা করিলে পিতা আর আমার মুখদর্শন করিবেন না।' রামপদ বলিল, 'তুমি কলিকাতা চলিয়া যাও; আর এ স্থানে থাকিও না।' কিন্তু বিধির নির্বন্ধে আর ত্রৈলোক্যবাবুর ঘটকালীতে হীরালালের কলিকাতা যাওয়া ঘটিল না। এক সময়ে রামপদকে গিয়া বলিল, 'আমি তাহাকে (কিনা কুসীকে) নিশ্চয়ই বিবাহ করিব।' রামপদ বলিল, 'তোমার পিতা?' হীরালাল উত্তর করিল, 'আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু সে ভয় করিয়া আমি কাপুরুষ হইতে পারি না।'

ভাল জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ ছিপ-ভাঙ্গা, সুতা-ছেঁড়া, বাপের অবাধ্য বীরপুরুষের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কি হিন্দুসমাজের সংরক্ষণ হইবে? সেই জন্যই কি এই সদ্‌গ্রন্থের উপহার বিতরণ হইতেছে?*

তাহার পর রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,—'যদি সত্যসত্যই তোমার পিতা তোমাকে বাটী হইতে দূর করেন, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? নিজের-বা কি করিবে, আর ইহাদেরই বা কি করিবে?' হীরালাল উত্তর করিল, 'সেই জন্য বিবাহ গোপন করিতে চাহিতেছি, সে জন্য এ কথা আপাততঃ গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিতেছি।'

অকাপুরুষ হীরালাল বিবাহ করিল; গোপন রাখিল। পরে আর একটি বিবাহের উদ্যোগ দেখিয়া পিতাকে বিবাহের কথা বলিল। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারবান্‌দিগকে আজ্ঞা করিলেন—উহাকে দূর করিয়া দাও। বাপের তিরস্কারে হীরালাল আপনাকে নিতান্ত অবমানিত বোধ করিল, মায়ের কাছ হইতে কতকগুলি টাকা লইয়া গৃহত্যাগ করিল। নৌকাযোগে চলিয়া আসিবে পথিমধ্যে নৌকাডুবি হইল। হীরালাল কোন প্রকারে প্রাণে রক্ষা পাইল। বিষম জ্বরে পড়িল। আরোগ্য লাভ করিয়া দেখিল, সংবাদপত্রে তাহার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। হীরালাল সে সংবাদের প্রতিবাদ করিল না। 'আমি ভাবিলাম যে আমাকে যেরূপ তিনি (পিতা) দুঃখ দিয়াছেন, সেইরূপ তিনিও দিনকতক পুত্রশোক ভোগ করুন।' বেশ বাবা তুমি—আদর্শ পুত্র!

এইবার নায়ক হীরালালের চরিত্র, বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা সকলই সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইতেছে। হীরালাল সেই খবরের কাগজে প্রকাশিত আপনার মৃত্যুসংবাদে দাগ দিয়া, সেই ছাপার কাগজখানি, দুই শত টাকার নোট ও একখানি জাল চিঠিতে আপনার মৃত্যুসংবাদের বিবরণ দিয়া কুসীর মাসীর কাছে রেজেস্টারী করিয়া পাঠাইয়া দিল। পাঠক মহাশয়, আরো কি কিছু শুনিতে চান? তবে শুনুন—

অপমানের জ্বালায় পিতাকে অনর্থক পুত্রশোকে পীড়া দিতেছিল। আর যাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য পিতার অবাধ্য হইয়াছিল, তাহাকে জালজুয়াচুরি করিয়া মিথ্যা সংবাদ দিয়া পতিশোকে কাতরা করিল। হীরালালের বুদ্ধিমত্তার, সত্যপ্রিয়তার, প্রণয়ের, পিতৃভক্তির—কিসের যে অধিক প্রশংসা করিব তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। তবে গ্রন্থকারের গুণপণার প্রশংসা করাই ভাল। তাঁহার এই আদর্শগুণ পুরুষের গুণগাথা তিনি যে 'বঙ্গবাসী'র উপহাররূপে চালাইয়াছেন ইহাই তাঁহার প্রধান গুণপণা। আর গুণপণা কুসীর মাসীর। তিনি 'বিধবা' কুসুমকে কুমারী কুসুম বানাইয়া আবার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টায় রসময় প্রধান সাহায্যকারী। ফোক্‌লাদিগম্বরের ডোক্‌লা বুদ্ধির জন্য এবং হীরালালের সন্ন্যাসিবেশে রঙ্গভূমিতে হঠাৎ অবতীর্ণ হওয়ায়, সে বিবাহ ঘটে নাই। হীরালালের পিতা হারানিধি হীরালালকে

* তখন 'বঙ্গবাসী' পূজার সময় এবং অন্যান্য বিশেষ সময়ে পাঠকদিগের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বিবিধ গ্রন্থ 'উপহার' বিতরণ করিতেন।

পাইয়া সব কথা ভুলিয়া পুত্রবধূকে যথারীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বিধবা-বিবাহ দিতে না পারিয়া অবশ্য ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি হীরালালের পিতামাতার সহিত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। সে আনন্দে আমরা আর নিরানন্দ ছড়াইব না।

পূর্ণিমা ৯ম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

দেবী যুদ্ধ

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত

বঙ্গদর্শনের অধ্যক্ষ স্বয়ং হাতে করিয়া আমার হাতে ৩খানি বিচিত্র পুস্তক দিয়াছেন; অনুরোধ, আমি সমালোচনা করি বঙ্গদর্শনের জন্য। কিন্তু দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিলে, অনুরোধটি দাঁড়াইয়াছে, বঙ্গদর্শনের জন্য নহে—রঙ্গদর্শনের জন্য। বঙ্গদর্শনের আদিযুগের একটা কথা মনে পড়িল। বহরমপুরে নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইয়াছে, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। আমিও তখন বহরমপুরে থাকি। সম্পাদকের নিজস্ব নম্বরখানিতে শ্রীমতী কর্ত্রীঠাকুরাণী সদর পৃষ্ঠায় যে-বড়-বড় অক্ষরে বঙ্গদর্শন ছাপা আছে, তাহারই 'ব'র নিচে কখন একটি 'শূন্য' বসাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদকের কনিষ্ঠা কন্যা তখন সবেমাত্র দ্বিতীয় ভাগ পড়িতেছেন; তিনি সেই বঙ্গদর্শনখানি লইয়া তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া অনুযোগ করিলেন, বাবা তুমি যে বলিয়াছিলে 'বঙ্গদর্শন' এ যে 'রঙ্গদর্শন'? বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তোমার গর্ভধারিণীর গুণে রঙ্গ হইয়াছে, আমি কি করিব, মা!' এখন আমার কপালগুণে দেখিতেছি—বঙ্গদর্শন আবার রঙ্গদর্শন হইয়া পড়িল। বুঝাইয়া বলিতেছি।

প্রথম পুস্তকখানি 'দেবীযুদ্ধ' ১৩০৭ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থকার এই পুস্তক সেই সময়েই উপহার দেন, আমি আমার যথা জ্ঞান ও পোষ্টকার্ডের যথা মান, উহার সমালোচনা করিয়াছিলাম। গাম্ভীর্যের, মাধুর্যের ও গাঁথুনির গুণপনার প্রশংসা করিয়াছিলাম। আর এখনকার দিনের একটা সর্বনেশে কথা তখন হয়ত বলিয়া থাকিব,—বলিয়া থাকিব যে, গ্রন্থকার স্বজাতিবৎসল। সেই গ্রন্থ এখনকার দিনে, এই রাজনীতিভীতিগ্রস্ত বৃদ্ধকে সমালোচনা করিতে অনুরোধ করা—কেবল কি রঙ্গদর্শনের জন্য নহে? সদাশয় সহৃদয় পাঠকবর্গ, আপনারাই বুঝুন না কেন,—আমি যদি এখন বলি, এই গ্রন্থের আরম্ভেই, রাজ্যচ্যুত দেবগণ অসুরহস্ত হইতে পুন রাজ্য-উদ্ধারের জন্য পরামর্শ করিতেছেন—সে কথাটা, তাহা হইলে এখনকার দিনে কি অনর্থ না ঘটায়? ১৩১৪ সালে এসকল কথার সমালোচনা কি চলে? প্রথম পৃষ্ঠাতেই আছে—

> পথে ঘাটে সদা দৈত্যের প্রহরা,
> জুড়ি তিনলোক দানবের থানা,
> দেবের কপালে যথেচ্ছ বিহার,
> কথোপকথন পরস্পরে মানা!

'তিনলোক' বলিতে নিশ্চয়ই তিনটি জেলা—বরিশাল, ময়মনসিং আর কুমিল্লা,—এইরূপ ব্যাখ্যা যদি কোন বিবৃতি-বিশারদ রায়বাহাদুর করেন, তখন কি দিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিবে, বল দেখি? ৪র্থ পৃষ্ঠায়—

> স্বর্গমন্দাকিনী ত্রিলোকতারিণী,
> দেবলোক তৃপ্ত সলিলে যাঁহার,
> অসুরের ত্যক্ত মলমূত্রে হায়
> আজি সে সলিল অপবিত্র তাঁর।

যদি কোন ব্যাখ্যানবিশ বলেন যে, এ কেবল সেপ্টিক ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত করা। কি করিয়া সে ব্যাখ্যার অন্যথা করিবে বল?

১১শ পৃষ্ঠায়,—

> দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিবে দেখিয়া
> অগেই অসুর হরিল তাঁহারে;
> দেবতাপূজিত সুরগুরু আজ
> বন্দী অসহায় দৈত্য কারাগারে:

যদি বিচক্ষণ বিদ্যাবাগীশ বলেন যে, এখানটা আশঙ্কিত শিখগুরু অজিতসিংহের নির্বাসনে কারাবাসের কথা—তা হ'লেই ত বিষম কাণ্ড বাধিবে। না, এসকল কথা এখনকার

দিনে ভদ্রলোকের মুখে আনিতে নাই—সমালোচনা ত দূরমাস্তাম্। না, এসকল দৈত্য-দানবের কথা আর তুলিব না, বলিব না। অধ্যক্ষের রঙ্গদর্শনের ইচ্ছা থাকিলেও আমি রঙ্গমঞ্চে উঠিব না। 'Honest' স্বদেশী বড়লাটের ছাড় পাইয়াছে, কাব্য হইতে তাহারই দুইচারি কথা তুলিলে ক্ষতি কি ?

যেখানে সকলে পরের মঙ্গলে
আপনার সুখ আত্মকথা ভুলে
ভাবে স্বজাতিরে একপরিবার,
সুখী দুঃখী হয় সুখে দুঃখে তার ;
একের শরীরে লাগিলে আঘাত,
অন্যের নয়নে হয় অশ্রুপাত ;
লাগিলে আঁচড় একের শরীরে
বিঁধে তার জ্বালা জাতীয় অন্তরে ;
যেখানে জনেক লভিলে গৌরব,
ঘরে ঘরে হয় জাতীয় উৎসব ;
যেখানে একের হ'লে অপমান,
মর্ম্মাহত হয় সকলের প্রাণ ;
স্বজাতির স্বার্থ, স্বজাতির মান
রাখিতে যেখানে স্বার্থ-বলিদান ;
সাধিতে মঙ্গল স্বজাতির তরে,
রাজ্য-ধন-যশে ভ্রূক্ষেপ না করে ;
পাইতে জাতীয় ক্ষুদ্র অধিকার
ধনপ্রাণ সবে ছাড়ে আপনার ;
জাতীয় কল্যাণে যেখানে সকলে
একপ্রাণে খাটে, এক মন্ত্রে বলে ;
সকলের প্রাণে বিঁধে একব্যথা,
একই চিন্তায় ঘুরে সব মাথা ;
যেখানে নীচতা নাহি পায় স্থান,
চরিত্রের বলে সবে বলীয়ান ;
প্রতিজ্ঞায় সবে অচল অটল,
পবিত্র সঙ্কল্প স্থির হিমাচল ;
যেখানে বারেক বাহিরিলে কথা
প্রাণান্তে তাহার ঘটেনা অন্যথা ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, দেহ, প্রাণ, বল
নিযুক্ত যেখানে পরার্থে কেবল,—
সেই পুণ্যভূমি, ধন্য সেই জাতি,
শক্তি সুপ্রসন্ন সে জাতির প্রতি।

ষোড়শী

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে আর একরূপ বিড়ম্বনা। গ্রন্থের নাম 'ষোড়শী'। তা ষোড়শী আমার কাছে কেন ? এইরূপ কৈফিয়তের উত্তর দিবার জন্যই যেন ভূমিকার প্রথমেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—এই গ্রন্থে আমার ষোলটি গল্প প্রকাশিত হইল, তাই ইহার নাম রাখিলাম 'ষোড়শী'। আমরা কিন্তু বোধকরি, অশ্লীলতানিবারণী সভার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য, গ্রন্থকার এইরূপ চতুরতা করিয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই ষোড়শী রূপসী লইয়া ঘটনা-গ্রন্থন। ষোলটি গল্পের আটটিতে ষোড়শীই জান্। দলিলি প্রমাণ দেখাইয়া দেওয়াই ভাল।

১ম গল্প (১ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে)—'গৃহে ষোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে।' এই ষোড়শীকেই তাঁহার স্বামীর চুরি করার গল্প। গল্প ভাল ; লেখা বেশ।

৩য় গল্প (৫ পৃষ্ঠায়)—'তরঙ্গিণী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। বৈচিত্র্যের জন্য বোধহয় এক বৎসর বাড়ানো হইয়াছে।

৫ম গল্প (৮৬ পৃষ্ঠায়)—'এই বয়সেই বেচারি বিদেশে স্বামীঘর করিতে আসিয়াছে।' কোন্ বয়সে, তাওকি আর বলিতে হয় ?

৬ষ্ঠ গল্প (১২৪ পৃষ্ঠায়)—স্বামীর 'কি দুঃখ শুনিবার জন্য চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।' এবার দুডিগ্রী কম।

৭ম গল্পের প্রথমেই 'হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিমার মত কন্যা মনোরমা পনেরো বৎসরের বেলায় বিধবা হইয়া গেল।' কাজেই পরবৎসর ষোড়শী বিধবা। গল্পের শেষ কথাগুলি শুনিলে বুঝিবেন, ব্যাপার কি ?

'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া

বর ও কন্যাকে আশীর্বাদ করিলেন।' এই গল্পের সমালোচনা গ্রন্থকার নিজেই করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, 'শশীর পিতামাতা বড় অদূরদর্শী।...ইহাদের নিভৃত সাক্ষাতের অবসর দেওয়া অবশ্যই তাঁহাদের উচিত ছিল না।' আর তাঁহার কলুগিন্নী এইরূপ সাক্ষাতের পরিণাম (বিধবাবিবাহ) লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে,—'কলিকালে আবার ধর্ম আছে, না নিষ্ঠা আছে।...যে আগুনে হাত দেবে, সে নিজেই পুড়ে মরবে।' আমাদেরও সমালোচনা উহাই।

আর খতিয়ান করিব না। এখন জিজ্ঞাসা করি, কেন তোমরা কুমারী, সধবা, বিধবা, বহুধবা ('সচ্চরিত্র' গল্পে গ্রন্থকার তাহাদেরও ছাড়েন নাই) ষোড়শী লইয়া কারবার করিবে? এখন বুড়োবয়সের দোষে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি, তাহা নহে। ভোর 'যুবত্ব' সময়ে বঙ্কিমবাবুকে বলিয়াছিলাম, ভিক্টর হুগো যেমন নাণ্টীথ্রীতে একটি মাতৃছবি দিয়াছেন, আপনি কেন সেইরূপ কিছু দেন না। সতীশবাবুর মা এক টুকরা কমলমণিকে লইয়া আমাদের ত আশা মিটে না! বঙ্কিমবাবু কার্যত কোন উত্তর দেন নাই। কিন্তু তাঁহার পরে, তোমরা অনেকেই দেখিতেছি গল্প লিখিতে অগ্রসর; 'ষোড়শী'র গ্রন্থকার প্রভাতবাবু (বড় দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাকে চিনি না) বেশ ভাবুক, সামাজিক, অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ, লিখনপটু; তাঁহার লেখায় সুন্দর ভঙ্গি আছে; ফল্গুস্রোতের মত বিদ্রূপের গতি আছে। তাঁহার যখন এত গুণ, তখন তিনি কেন কেবল ষোড়শী আর ষোড়শী করিবেন, কেন বর্ষীয়সী বাঙ্গালি মার চিত্র অঙ্কন করিবেন না? ভালবাসা ত আর দাম্পত্যপ্রণয়ে বা যৌবযোজনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। বরং এমনও অনেকে বলেন যে, মার ভালবাসাই ভালবাসা। অনেক সময় মাতা প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখেন না। ব্যভিচারিণী 'কাশীবাসিনী'র গল্পে সেই কথাই গ্রন্থকার একরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ষোলটি গল্পের মধ্যে একটি কুলটা মার কাহিনীই কি যথেষ্ট? কখনই না।

বাঙ্গালি বহুকাল হইতেই মাকে চিনিয়াছিল। ইংরাজি সাহিত্যসেবনে বিকৃতমস্তিষ্ক হইবার পূর্বে 'মা মা' করিয়া বাঙ্গালি পাগল হইত। আর ছড়ায়, গানে, যাত্রায়, পাঁচালিতে—কি মাতৃগাথাই না গাহিয়া রাখিয়াছে! মহাশক্তি মা—কিন্তু সেই মার উপর আর একডিগ্রী মা বাঙ্গালি চড়াইয়াছে। গিরিরানী মেনকা বাঙ্গালির অপূর্ব সৃষ্টি। সংস্কৃত সাহিত্যের যশোদা বাঙ্গালির হস্তে কত মোলায়েম, কত ভাবময়ী—তাহাও কি আবার লিখিয়া বলিতে হইবে? যশোদাকে না দেখিলে ভূতভাবন ভগবান্‌কে কি কেহ নীলমণি গোপাল বলিয়া কোলে টানিতে সাহস করিত? রামপ্রসাদ মার নামে যে জীবনী-শক্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রসাদে বাঙ্গালি এখনও নড়িতেছে। আর সেই মাকে তোমরা তোমাদের সাধের সাহিত্য হইতে বিতাড়িত করিয়া রাখিবে? তুমি পথেঘাটে বলিবে বন্দে-মাতরম্, আর সাহিত্যে কেবল লিখিবে, বন্দে ষোড়শীং রূপসীং প্রেয়সীম্! ছি! তুমি আপনাকে আপনি চিন না। ইংরাজি সাহিত্যের কুহকের মোহে তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ঐ মোহ কাটাইতে যত্ন কর। সাহিত্যে মাকে ভুলিও না। যে-রাম বসু কিশোরকিশোরীর বিরহগীতি গাহিয়াছেন, তিনিও ত আগমনীগানে, মেনকার উক্তিতে নানাবিধ মাতৃছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। তুমিও যত্ন করিলে, সেইরূপই করিতে পারিবে, তবে কিনা একবার চোখে-মুখে জল দিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিতে হইবে, দারুণ মোহ ভাঙ্গিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদি-প্রণীত

সমালোচনার জন্য তৃতীয় পুস্তক 'জিজ্ঞাসা'। গ্রন্থকার সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত, আমার নিকট ত বটেই। তিনি পণ্ডিত। তাঁহার কৃত এই গ্রন্থ, কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি; গ্রন্থের নামকরণ বুঝাইবার জন্য ত্রিবেদী বলিয়াছেন, 'গ্রন্থকারের এই প্রয়াস জিজ্ঞাসা মাত্র।' তাহাতেই বুঝিয়াছি যে, এই তৃতীয় গ্রন্থের সমালোচনাও আমার পক্ষে বিষম বিড়ম্বনা। দার্শনিকের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আমার সম্ভাবনা কোথায়? জীবনসমস্যার

অধিকাংশ বিষয়ে আমরা ধর্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করি ; এই গ্রন্থ শাস্ত্রসীমা স্পর্শ করে নাই। বল, কি বুদ্ধিতে আমি এই বিজ্ঞান গ্রন্থ নাড়াচাড়া করি ? ভরসার মধ্যে এই,—গ্রন্থকার জিজ্ঞাসায় নিরস্ত হন নাই,—তিনি অনেক কথা নিঃসংশয়ে প্রচার করিয়াছেন। কিরূপ তাহা দেখাইতেছি—জড় ও জীবের মধ্যে যে ব্যবধান, 'আজ বিজ্ঞান তাহা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, কিন্তু দুই দিন পরে, এই ব্যবধান লঙ্ঘিত হইবে সংশয় অল্প।...পার্থক্য কেবল জটিলতায়। জটিলতার শৃঙ্খল মুক্ত হইবে সংশয় নাই।' এরূপ স্থলে গ্রন্থকার জিজ্ঞাসু নহেন, তাঁহার সংশয় নাই। বলিতে গেলে বলা যায়, গ্রন্থকার এইসকল স্থলে 'দেহাত্মবাদী' ; এখন পাঠকের পক্ষে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তাই কি ? সাংখ্যে ও বেদান্তের শঙ্করভাষ্যে, জড় ও জীবের মধ্যে পার্থক্য স্বীকৃত নহে বলিলেও চলে। এই গ্রন্থে ও অন্যান্য লেখায় ত্রিবেদী সাংখ্য-বেদান্ত-অনুশীলনের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রে জড়জীবের পার্থক্য স্বীকৃত। পূর্বেই বলিয়াছি, ত্রিবেদী পণ্ডিত, তবে তাঁহাতে গৌতম-সূত্র-পাঠের পরিচয় না পাইব কেন ? এও ত জিজ্ঞাসা। ত্রিবেদী বলিতেছেন, 'এই এক এব সদ্বস্তু, ইহার স্বরূপ কি ? ইহা সৎ, ইহা অস্তি, ইহা সৎপদার্থ—তথাস্তু। ইহা চিৎ, ইহা চিন্ময় পদার্থ—midstuff—তথাস্তু। ইহা—আনন্দ,—তাই কি ?' এই যে জিজ্ঞাসা, দর্শন-বিজ্ঞান কি ইহার উত্তর দিতে কখন পারিবে ? উত্তর আছে কেবল তোমাদেরই কাছে,—ব্রাহ্মণের কাছে। তোমাদের মুখেই শুনিয়াছি—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। বারবার বলিতেছি, আমার দ্বারা এ সকল কথার আলোচনা সম্ভবে না, তবে ধ'রেভদ্র ঘটাইলে আর কি করা যায় ? গ্রন্থকার একস্থলে মীমাংসা করিয়াছেন, 'সৌন্দর্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ।' ঠিক কথা। এই সৌন্দর্যপিপাসা বুঝিলেই, ও ভাবিয়া দেখিলেই অনেক কথা বুঝা যায়। এদিকে, আমার প্রাণে যেমন সৌন্দর্য-পিপাসা, ওদিকে তেমনই সুন্দর বিরাজমান ; সেখানে একে অনেক ; একত্বে বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যে একত্ব—আর এক দিক্ দিয়া বুঝিলেই বুঝা যায় যে, বিশৃঙ্খলায়,—শৃঙ্খলা। আবার সেইটি আর একরূপে দেখিলে, দেখা যায় যে, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের আধিপত্য। এই যে সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা, মঙ্গল, ইহার উপলব্ধিতেই আনন্দ ; সৌন্দর্যপিপাসা যেমন মনুষ্যত্বের অঙ্গ, এই সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা, মঙ্গলের উপলব্ধিও মনুষ্যত্বের অঙ্গ। ইহার একরূপ ক্রম আছে, বিভাগ আছে,—পশু হইতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য মনের মধ্যে সৌন্দর্য বোধ করেন। তাহাই আনন্দের প্রথম সোপান। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে বুঝেন শৃঙ্খলা। তাহাই আনন্দের দ্বিতীয় সোপান। আর ধার্মিক আপনার আত্মাতে উপলব্ধি করেন—মঙ্গল ! পুরোমাত্রায় পান আনন্দ। মঙ্গল না বুঝিলে ধর্ম বুঝা যায় না। শিষ্যকে সৌন্দর্য উপভোগ করিতে শিখাইবে ; শৃঙ্খলা বুঝাইয়া দিবে ; দেখাইবে মঙ্গলময়ের রাজ্যে মঙ্গলেরই লীলাখেলা। তবে ধর্ম দাঁড়াইবে—প্রকৃত আনন্দ আসিবে।

সচ্চিদানন্দের আনন্দে (জিজ্ঞাসা) সংশয় উত্থাপন হওয়াতে এত কথা মনে আসিল। ধর্মহীন বিজ্ঞান কখন এই আনন্দে পৌঁছিবে কিনা, জানি না। তবে আমরা হিন্দু,—শাস্ত্রবাদী, কাষ্ঠ বিজ্ঞান কি-বলিবে, না-বলিবে, তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

আর একটা বড় কথায়, দুইটা ছোট কথা বলিব। ডারূউইনের পর প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) দর্শন-বিজ্ঞানের জান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গ্রন্থেরও অনেকস্থলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দোহাই আছে। তবে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রাকৃতিক নির্বাচন যে, কোন স্থান পাইতে পারে না, তাহাও গ্রন্থকার সুন্দর দেখাইয়াছেন।

তবে যেন বোধহয় 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' এই কথাটার মোহ তিনি একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। দুইটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি,—

১) 'যাহাই হউক, সৌন্দর্য ও তদনুভব-জাত সুখ নহিলে মানুষের জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য হয় ; তাহাতেই মানুষের এই সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষমতা জন্মিয়াছে, এই অনুমান বোধ করি অসঙ্গত নহে।'

২) 'এই হিসাবে মানুষের মন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, অসুন্দরকে সুন্দর মূর্তি দেয়। সৌন্দর্য কোন বস্তুর প্রকৃতিগত

ধর্ম নহে। এই হিসাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনই জগৎকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষের ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছাকে ফলবতী করিবার জন্য চেষ্টা—এই দুইটাকে জড়াইয়া প্রাকৃতিক নির্বাচন নাম দিলে, আমরা বিশেষ আপত্তি করি না। কিন্তু এইরূপ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে জীবনসংগ্রাম (struggle for existence) আছে, এইরূপ বলিলে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। উনবিংশ শতাব্দীর কতকগুলি কৃষ্ণের জীব পেটের দায়ে পৃথিবীময় দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি করিতেছে, এবং তাহারা আপনা আপনি আপনাদিগকে উন্নত বলিয়া স্পর্ধা করিয়াছে বলিয়াই যে মারামারি কাটাকাটি উন্নতির মূল,—এ কথা একেবারেই স্বীকার করা যায় না। কলাবিদ্যা বা সৌন্দর্য-সৃষ্টি, পেটের দায়ে মারামারিতে করিতে হয় নাই। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, 'সৌন্দর্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ।' সেই পিপাসার নিবৃত্তি মারামারি হুড়াহুড়িতে হয় না—প্রত্যুত শান্তিতেই হইয়া থাকে। দাম্পত্যদায়ে কতকটা সৌন্দর্য-সৃষ্টি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সমস্ত বুঝানো যায় না। বাকিটা বুঝাইবার জন্য আর যাহা বলিতে হয় বল, কিন্তু জীবনসংগ্রাম তাহার মূল—বলিও না। গ্রন্থকার তাহা বলেনও নাই; তবে নাকি সৌন্দর্যতত্ত্বে তিনি একরূপ প্রাকৃতিক নির্বাচন আনিয়াছেন, তাহাতেই দুটা কথা বলিতে হইল।

বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) ৭ম বর্ষ শ্রাবণ ১৩১৪

ধ্রুবতারা

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ-প্রণীত

বহুকাল পূর্বে বঙ্গে সামাজিক উপন্যাসের আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ করি ৫৫ বৎসর পূর্বে 'মাসিক পত্রিকা' * নামে মাসিক পত্রিকায়, 'আলালের ঘরের দুলালের' সূত্রপাত হয়। ইহাতে প্রচলিত সমাজের ঘটনাবলি উপন্যাস-আকারে সাজানো গোছানো থাকে; ইংরাজিতে এমন গ্রন্থ বিস্তর। আবার ইংরাজীতে Historical Romance বা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া একখানি গ্রন্থ আছে; ঐ গ্রন্থ-অবলম্বনে রামকমলের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' লিখিত হয়, ভূদেব-বাবুর 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয়ক বিনিময়' লিখিত হয়; এখনও শ্রীমান্ হারানচন্দ্র * এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লিখিয়াছেন, কিন্তু 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কথাটা প্রথমে 'দুর্গেশনন্দিনী'র মলাটে বড় জ্বল্ জ্বল্ করিয়াছিল। আমরা এমন বহুতর লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীর ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিতেন।

কিন্তু শেষ-জীবনে বঙ্কিমবাবু ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন। রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিলেন, "আমি পূর্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশ-নন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই তাহা বলা বাহুল্য।"

সুতরাং বঙ্কিমবাবুর ফতোয়া ও স্বীকারোক্তিমতে, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অতলে গেল; যাউক;—কিন্তু সামাজিক উপন্যাস মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। এইগুলিকেই আমি ঔপন্যাসিক ইতিহাস নাম দিয়াছিলাম,—বলিয়াছিলাম যাহা হইতেছে তাহাই উপন্যাসের অবয়বে এইগুলিতে বিন্যস্ত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর করের পরিচয়-প্রদানের অবসরে এই সকল কথা বলি, সেই সময় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের উল্লেখমাত্র করিয়াছিলাম। যতীন্দ্রবাবু 'সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচারে' এবং 'উড়িষ্যার চিত্রে' প্রভৃত যশ সঞ্চয় করিয়াছেন। আর তিনি-যে যশের যোগ্য পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাই সুবিধার কথা—তিনি সমালোচকের উৎসাহের ভিখারী নহেন।

'উড়িষ্যার চিত্রে' গ্রন্থকারের ফটো তুলিবার ক্ষমতার আমরা প্রথম পরিচয় পাই; বড় আহ্লাদের বিষয়, সেই ক্ষমতা এবার বাড়িয়াছে ব্যতীত কমে নাই। এই গ্রন্থে

* টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত।

* সেক্সপিয়ারের গল্প-লেখক রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত

যতীন্দ্রবাবু, গণেশ-বন্দনার মত, প্রথমেই কলিকাতার একটি মেসের ফটো তুলিয়া দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালির দুর্ভাগ্যবশে কলিকাতার মেস প্রায় সকলেরই পরিচিত সামগ্রী ; এবার কেহ দুঃখ করিতে পারিবেন না যে উড়িষ্যার চিত্র ঠিক হইল-না-হইল, আমরা কেমন করিয়া বলিব ? কলিকাতার মেসে যাহার পদার্পণ হয় নাই, তাহার জন্মই বৃথা। আর সেই পাকা উঠানের এক কোণে ঠোঙ্গাতে ও ভাতেতে গাদা করিয়া রাখা ; নিচের তলায় অন্ধকার ঘরে ঠাকুর ও চাকরের তেলকুচকুচে অঙ্গে মসীময় বসন-বিলাস ; আর উপর তলার ঘরে ৩॥ পায়া টেপায়ের উপর Ganotর বিজ্ঞান গ্রন্থের উপর বুরুষ ও ত্রিকোণ মুকুর—এ সকল কি ভুলিবার জিনিস গা ? এ হেন সুপরিচিত মেসের চিত্র সর্বাগ্রে ধরিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, দেখুন দেখি ঠিক হইয়াছে কি না ? সকলকেই বলিতে হইবে, হাঁ ঠিক বটে। কলিকাতার সম্প্রদায়-বিশেষের বৈঠকখানা, ড্রইংরুম প্রভৃতি সকল চিত্রেই, এবং পল্লীগ্রামের শান্ত চিত্রে গ্রন্থকার সিদ্ধহস্ত। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের অন্তঃপুরে, যখন বধূরা পরস্পর গোপনে আলাপ করেন, তখন সেই দৃশ্যের চিত্র অঙ্কনেও গ্রন্থকারের যেমন দক্ষতা, আবার শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা যখন মাথামুণ্ড লইয়া তর্ক-বিতর্ক করেন, তখনও গ্রন্থকারের সেইরূপ নিপুণতা। গ্রন্থের সর্বত্রই গ্রন্থকারের সতর্ক চক্ষু, সহৃদয় প্রাণ, লিপিপটু লেখনী এবং যাহার-মুখে-যেমন-সাজে সেইরূপ ভাব ও ভাষা —দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তিনি জীবনে একবার মাত্র আড়ি পাতিয়াছিলেন ; এ অতিরিক্ত বিনয় আমাদের ভাল লাগিল না ; আমরা দেখিতেছি, আড়িপাতাই তাঁহার কাজ ; সকল ঘটেই তিনি ঘটক। আমরা আশীর্বাদ করি তিনি চিরজীবনই যেন এইরূপ আড়ি পাতিয়া স্বভাবের ও সমাজের রহস্য দেখিয়া, আস্তে আস্তে টিপি টিপি হাসিয়া আমাদিগের নিকট সেই আড়িপাতার ফল জাহির করেন।

এখন, অগ্রে 'ধ্রুবতারা'র গল্পটি অতি সংক্ষেপে বলিব ; নহিলে পাঠকের ফাঁকা লাগিবে।

ফরিদপুর সদরের দেড় ক্রোশ মধ্যে কাজলপুর গ্রাম। সেই গ্রামের কায়স্থ বংশীয় দত্ত বাড়ীর উপেন্দ্রনাথের ভিন্ন গ্রামের বনলতা নামে একটি বালিকার সহিত বিবাহ হইল। বনলতা বনলতাই বটে। মনে করিবেন, দুষ্মন্ত কি বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—'বুঝিলাম আজি বনলতার কাছে উদ্যানলতা পরাজিতা হইল।' এ সেকালের কথা ; তখন নায়ক চাহিত নায়িকার স্বচ্ছ নির্মল হৃদয়, তাহাতে নায়ক আপনার ফটো প্রতিফলিত করিত। মুকুরে একটি ছবি পড়িলেই আর কাহারও চিত্র তাহাতে ধরিত না। এখন তরুণ নায়ক চান তরুণীর accomplishments হাবভাব বিভ্রম, বিলাস কলা ও কায়দা। চান—খেলোয়াড় ; নায়িকার হস্তে নায়ক খেলানা হইতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন। সুতরাং এবার উদ্যানলতার আওতায় বনলতাকে কাজেই ম্রিয়মাণা হইতে হইয়াছে।

বিবাহের সময় বনলতার বয়স্ বার বৎসর। উপেনের তখন ফার্স্ট ইয়ার—কাজেই ১৬৷১৭। ক্রমে দুইএক বৎসর গেল। উপেনের পিতার মৃত্যু হইল। সংসারের অবস্থা এরূপ হইল যে উপেন যদিও ২৫৲ টাকার বৃত্তি পাইল, তথাপি tuition করিয়া কিছু না আনিলে উপেনের ও তাহার ভ্রাতা জ্ঞানের কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা চলে না।

একটি, দুইটির পর, তিনেরটি একরকম জুটিল। একজন ব্রাহ্মের দুইটি ছেলে পড়াইতে হইবে ; আর তাঁহার ভগিনীর বয়স ১৫৷১৬—চারুলতা নাম ; সে হইল উপেনের 'ফাও' শিষ্যা। চারুলতা গায় বাজায় ইংরাজি পড়ে, আর কি করে-না-করে, আমি ঠিক বলিতে পারিব না। তবে গোড়ায় যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই বটে, চারুলতা—উদ্যানলতা ; কাটাছাঁটা, ফিটফাট, লোহার ফ্রেমে তাহার দেহ ঝুঁকিয়া আছে ; তাহার নিচে দিয়া লাল কাঁকরের ইট সাজানো পথ। এই একালের উদ্যানলতার আওতায়, দূর পল্লীগ্রামের বনলতা ম্রিয়মাণা হইতে লাগিল।

বিবাহের পূর্ব হইতেই বুঝা গিয়াছিল, উপেন ছোকরা এখনকার দশ জন, শত জন, সহস্র জন ছাত্রের মত শিক্ষাবায়ুগ্রস্ত। সে দুইজন বৈষ্ণবীর সঙ্গে একজন বুড়ো বৈরাগীকে দেখিয়া চটিয়া লাল। সে বলে, ইহাদের ভিক্ষা দিলেই পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। [যে দেশে ভিক্ষা দেয়

না, সে দেশে পাপ কি আমাদের দেশের চেয়ে কম ?] সে নব বধূকে বোর্ডিংএ রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাহার বন্ধু বীরেন তাহাকে বলিয়াছিল, 'তোমার মাতা যে-গৃহের কর্ত্রী—তোমার বড়মা যে-গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই-গৃহের কাছে বোর্ডিংস্কুল কোন্ ছার?' কিন্তু এমন করিয়া উপেনকে আগে কেহ শিখায় নাই। যে উচ্চশিক্ষাবিষে বাঙ্গালার ছাত্রবৃন্দ জর্জরিত, উপেনও তাহাতেই অভিভূত।

এই ত এখনকার দিনের উপেন; সেই উপেন একেবারে কেয়ারী-কুঞ্জ-সুশোভিতা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিতা উদ্যান-লতার সম্মুখে স্থাপিত হইল। তাহার মোহ লাগিল। যাহার মোহ হয়, সে কি তাহা বুঝে ? বুঝে না। সে মনে করিল, আমি বুদ্ধিমান্ লোক, বুদ্ধি-বিবেকে ইহাকে appreciate করিতে পারিতেছি। সে বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলিল, এটা আমার Intellectual love—বুদ্ধির ভালবাসা।

মূল ঘটনা-সংস্থানে কিছু বিশেষত্ব নাই; স্ত্রীস্বাধীনতার মঙ্গলে, কত যুবক যে ছেলে পড়াইতে গিয়া, আপনার মাথা খাইয়াছে, তাহার সীমা নাই। সুতরাং ঘটনা-সংস্থানে কোন বিশেষত্ব নাই; তবে যেরূপ নিপুণতার সহিত, যেরূপ দক্ষ হস্তে উপেন্দ্রের অধঃপতন গ্রন্থকার চিত্রিত করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া যায় না, কেবল প্রশংসা করাই চলে।

উপেনের মানসিক অধঃপতন যখন পূর্ণ হইয়াছে, তখন অরুণের উদয় হইল। মিস্টার অরুণ ব্যানার্জি ব্যারিস্টার হইয়া কলিকাতায় দেখা দিলেন। চারুলতার ভ্রাতা পরেশবাবুর বাড়ী অরুণ আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন। খেলওয়াড় আবার নূতন খেলানা পাইল। খেলিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের Intellectual loverএর, আর তাহা ভাল লাগিল না। অরুণকে তাড়াইতে পারিলে, এখন উপেন বাঁচে। হায় রে Intellectual! তোর দশাই এই।

অরুণের সঙ্গে চারুলতার খেলা কিছু বেশি বেশি দেখিয়া উপেন একেবারে উন্মত্ত হইল। সে কলিকাতার সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া, রোমিওর মত কেবল বাতায়ন নিরীক্ষণ করে, আর মনে মনে আওড়ায় It is the east and Juliet is the sun; arise fair sun—পাহারাওয়ালা ত কবিত্ব বুঝিল না; সে চোর বলিয়া সন্দেহ করিল; উপেনকে অরুণ-চারুর সম্মুখে লইয়া গেল। জান-পচান আছে দেখিয়া পাহারাওয়ালা চলিয়া গেল। উপেনের এই লাঞ্ছনায় মাথা ঘুরিয়া গেল; সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেল। ...এততেও কিন্তু ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে পারিল না। চারুলতাকে মন হইতে তাড়াইতে পারিল না।

একটু আরোগ্যলাভ করিয়া জানিল, সে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে, তিন বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাস করিয়াছে,—আর বিলাত যাইবার জন্য বৃত্তিও পাইবে।

উপেন ও তাহার বন্ধু বীরেন প্রভৃতি পূর্বেই জানিত অরুণ ব্যানার্জির নামে বিলাতে বিবাহের চুক্তি-ভঙ্গের নালিশ হইয়াছিল। বীরেনের কাছে উপেন প্রতিজ্ঞা করিল, সে বিলাত গিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অরুণকে নিশ্চয়ই ধরাইয়া দিবে, আর অরুণের পূর্বচরিত্র প্রকাশ করিয়া চারুলতাকে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিবে।

একে ত সেই উপেন্দ্রনাথ, তাহার পর তাহার শিক্ষা-বিভ্রাটের গরমি, আবার তাহার পর অসহায়া অবলাকে বঞ্চকের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার মোহ—এই ত্র্যহস্পর্শে সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল। বৈষ্ণব বৈরাগীকে সমাজের নর্দমা বলিয়া উপেন্দ্রচন্দ্র সেই নর্দমা পরিষ্কার করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন; কোথায় রহিল এখন সে সমাজ, কোথায় রহিল কাজলপুরের প্রত্যাশা, কোথায় রহিল দত্তপরিবারের সে শান্তি, সে দয়া, সে আতিথ্য, আর কোথায় রহিল সেই বিধাতার বনলতা? সকল ফেলিয়া সকল পদদলিত করিয়া, দত্ত-পরিবারের সকলকে কাঁদাইয়া, বনলতাকে মুসড়াইয়া দিয়া, উপেন্দ্র—অসহায়ার উদ্ধার-সাধন-জন্য এখন বিলাতযাত্রী। হায় কলিকাল! তুমিই অধর্মকে ধর্মচ্ছদে সজ্জিত করিতে পার।

উপেনকে এই অধর্মের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য উপেনের দাদা মহেন্দ্র সকলকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। উপেন কাহারও কথা রক্ষা করিল না—এখনকার ছেলেরা কথা রক্ষা করাকে স্বাধীনতার ব্যতিক্রম বলিয়া বুঝে। যখন উপেনের বিলাত যাওয়াই স্থির হইল, তখন বনলতা বিদায়-

কানে বলিল,—'যদি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া চারুকে বিবাহ করিতে পার, তবে তাহাই করিও। আমি আর তোমার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমাকে আসিয়া আর দেখিতে পাইবে না। আমি আজ তোমার চরণে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছি। পরমেশ্বর করুন, আমি যেন আরজন্মে তোমাকেই স্বামী পাই, আর যেন তোমাকে সুখী করিতে পারি।'

এতক্ষণ কান্না চাপিয়া রাখিয়া, এখনকার ছেলেদের হক-না-হক নিন্দা করিয়া, শিষ্টশান্ত হইয়া বেশ সমালোচনা করিতেছিলাম; আর ত এ ভাব রক্ষা করিতে পারি না; এখন কান্না চাপিতে কলহের ভাব মনে উঠিতেছে, কলহের ভাব চাপিতে যাইয়া কান্না পাইতেছে। কলহ গ্রন্থকারের সঙ্গেও বটে, তাঁহার বনলতার কথাতেও বটে।

বৎসে বনলতা! তুমি যখন পরজন্মে স্বামীকে সুখী করিবার বাঞ্ছাপূরণের জন্য বাঞ্ছাময়ের কাছে জানাইতেছ, তখন ইহজন্মের আশা ত্যাগ করিতেছ কেন? পরজন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পার, আর তিন বৎসর তিষ্ঠিতে পার না! কেন বাছা তুমি হিন্দুর মেয়ে হইয়া, এমন আশু ফল-প্রত্যাশিনী হইবে? সে যেখানে যাউক, যাহাই করুক, তুমি যখন তাহাকে ধরিয়াছ, তখন সে তোমারই; সে বাঁকুক চুরুক, তাহার আর কোথাও যাইবার উপায় নাই; এ যদি না হয়, তাহা হইলে প্রেম মিথ্যা, সতীত্ব মিথ্যা, হিন্দুর হিন্দুত্ব মিথ্যা, ভগবান্ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। তুমি হিন্দুর মেয়ে তাড়াতাড়ি কেন করিবে বাছা? তোমার সিঁথের সিন্দুরের শোভাই—সহিষ্ণুতায়।

বেটী কিন্তু বুঝিল না। এখনকার দিনের মেয়ে কিনা! এখন ছেলেগুলাও যেমন গোঁয়ার-গোবিন্দ, মেয়েগুলাও তেমনই একগুঁয়ে। তুমি সূর্যমুখী—স্বামীকে বাগাইতে পারিলে না; অমনই কুলের বাহির হইয়া পড়িলে; কেন গা? 'না, আমি তাঁহার সুখের পথে কণ্টক হইব না।' বটে,—দেখো অভিমান কর নাই ত? বেশ করিয়া আপনার হৃদয় বুঝিয়া দেখ দেখি—অভিমান কোথাও নাই ত? তুমি কুন্দনন্দিনী বিষ খাইয়াছ—অভিমান কর নাই ত? তুমি কি বলিতেছ,—'ভগবতি বসুন্ধরে দেহি মে অন্তরম্'—এ ত অভিমানেরই ভাষা। আবার ও কাহাকে কি বলিতেছে? 'অথ কথং আর্যপুত্রেন স্মৃতোয়ং দুঃখ-ভাগিজনঃ?' একটু অভিমান এখনও রহিয়াছে নয়? আছে বৈকি; থাকে বৈকি; অভিমান যে প্রণয়ের মানরজ্জু। তবে অভিমান বৃন্দাবনে যতটা থাকে, প্রভাসে ততটা থাকে না, সময়ে কমাইয়া দেয়; সেই জন্য আশু-ফল-প্রয়াসী হইতে নাই, তাড়াতাড়ি করিতে নাই—সময়ের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে হয়।

আসল কথা কি জানো, বাছারা! সতীত্ব একটি বিন্দু নহে, একটি রেখা নহে; সতীত্ব একটি বিশ্ব-গোলক। বিন্দু উহার কেন্দ্র বটে, কিন্তু বিন্দুকে পরিধি করিও না। বিন্দু তোমার হৃদয়ে বটে, হৃদয় তোমার ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সতীত্বের অধিকার বিশ্বব্যাপী। সময়ে উহা ব্যাপিয়া পড়ে, ফুটিয়া উঠে, সৌরভ বিস্তার করে; সতীত্বের কুঁড়ি লইয়া তুমি মরিবে কেন? না, দাও, ফুটিতে দাও। সতীত্ব অমর। ও ত মরে না, তবে তুমি সতীলক্ষ্মী, সেই সতীত্বের আধার,—তুমি মরিতে যাইবে কেন? দক্ষালয় হইতে যাইতে চাও, যাও, কিন্তু শিবহৃদয় হইতে সরিতে পাইবে না। আবার বলি, তুমি যখন উপেনকে ধরিয়াছ, তখন তাহার সাধ্য কি যে সে তোমাছাড়া চিরদিন থাকিতে পারে? ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।

বেটী কিন্তু বুঝিল না। যে মরিবে, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় কি? পারা গেল না। রোগ করিয়া, ঔষধ না খাইয়া, সেবা না লইয়া, বনলতা শুকাইতে লাগিল। শেষে উপেনের ফটোখানি ধ্যান করিতে করিতে ক্ষুদ্র সতীলোকে চলিয়া গেল।

কাহাকে কি বলি বল? ক্ষুদ্র নরনারীর প্রাণপাত করিলে অপরাধ হয়; আর হিন্দুনারীর ব্রতপাত করিলে, কাহারও কিছু হয় না? তোমার ব্রত কি? তুমি আজীবন স্বামীর সেবা করিবে, তুমি যদি অভিমানে সে সেবা ভঙ্গ কর, তোমার ব্রতপাত হইল। ঘোর অধর্ম হইল। তাই বলিতেছি কাহাকে কি বলি বল।

কাহিনীর অনুসরণ আর করিব না। কেন-না ক্ষীণা পবিত্রা স্বচ্ছস্রোতস্বতীর বিচরণক্ষেত্র দেখাইতে গিয়া গ্রন্থকার

অনেক ঝোড়ঝঙ্কার, বনজঙ্গল দিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। এরূপ না করিলে, শুনিতে পাই বই লেখা নাকি ভাল হয় না। তাই হ'বে।

চারুলতা,—তা বলিয়া ঝোড়ঝঙ্কার নহে। চারুলতা গল্পের প্রয়োজনীয় পদার্থ। উদ্যানলতায় অতৃপ্ত হইয়াই বনলতার স্বভাব-সৌন্দর্য বুঝিতে পারি। চোরা-সিঙ্গি দিয়া দশভুজা প্রতিমার প্রতিভা উজ্জ্বল করিয়াছ; ভালই ত; দুইখানি নৈবেদ্য উহাদের দিবে, তাও দাও,—জগন্মাতার প্রতিদ্বন্দ্বীদের গৌরব করা চাই বৈকি। কিন্তু গ্রন্থকারের টান যেন, উহা অপেক্ষাও কিছু বেশি। সে সকলই মার্জনা করিতাম, যদি যে-দিন উপেন উন্মত্তভাবে পুলিশ-কর্তৃক চারুর সম্মুখে নীত হইল, সে দিন যদি চারুতে আর একটু মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইতাম। পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপলোক এনকো পছনত্যা হ্যায়?' এই কথাতে চারুর মুখ গম্ভীর হইল। সে কোন কথা বলিল না। এমন মনুষ্যত্বহীনার আবার ধ্রুবতারা কি? স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী দেখার খাতিরে আমরা বনজঙ্গল বেড়াইতে স্বীকার, কিন্তু মিস্টার চকরাভর্তির ঝোড়, নূতন সংস্করণে যেন একেবারে কাটিয়া ছাঁটিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ। চকরাভর্তি একটা কিম্ভূতকিমাকার বীভৎস পাপিষ্ঠ, কাব্যজগতের পয়োনালীতেও উহার স্থান হইতে পারে না। সমাজে যাহা আছে—তাহার সমস্ত কি তবে লিখিতে হইবে? না, নিশ্চয়ই না। শ্মশানের চিত্র দেখিয়া থাকিবেন কিন্তু পুরীষের চিত্র হয় কি? হয় না।

বাস্তবিক চকরাভর্তি এই পুস্তকের কলঙ্ক—এই কলঙ্ক যতীনবাবু এবার যেন মুছিয়া ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবতী যায় যাউক, তাহাতেও গ্রন্থের ক্ষতি হইবে না।

শান্তির চিত্র অপেক্ষা গ্রন্থে অশান্তির চিত্র—অধিক জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে—এটি গ্রন্থের দোষ। শেষের একটা আল্‌গা কথায় এই দোষটা আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বিষাদময় সংসারে মানব-জীবনের সান্ত্বনা কি?' বাস্তবিক কি সংসার বিষাদময়? যতীনবাবুর প্রশস্ত হৃদয়ের ধারণা যে এইরূপ তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন-না ইহার একটু পূর্বে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'দত্তদিগের পুণ্যের সংসার, ক্রমে তাহার অবস্থা আবার ফিরিল।' অর্থাৎ পুণ্য থাকিলেই পরিণামে ভাল হয়। তবে আবার বিষাদময় কেন? যাহাই হউক, আমরা ওটা একটা আল্‌গা কথার মত ধরিলাম।

গ্রন্থকার গুণী, তাঁহার রচনায় সহস্র গুণপনা আছে; তবে কেন কতকগুলা আবর্জনায় এ হেন অপূর্ব গ্রন্থ মলিন হইয়া থাকিবে? সেই জন্য আবার বলি, পাপের চিত্র কমাইয়া দাও, পুণ্যের চিত্র জ্বলন্ত হইয়া উঠুক; পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীর কলগান আমরা সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়া প্রাণমন আরও জুড়াইতে থাকি।

পূর্ণিমা ১৩১৫

অনাথবন্ধু

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়-প্রণীত *

অনাথবন্ধু। উপন্যাস। হুগলী বুধোদয়যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ১।০ পাঁচসিকা। এই গ্রন্থের ২০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—'উপন্যাসখানি নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু যেরূপ প্রশংসা হইল, ও যেরূপ বিক্রয় হইল, তত ভাল নয়। আর ইতিহাসখানি, যাহা অধিক পরিশ্রমের এবং অনেক পাণ্ডিত্যের ফল—যাহা বাঙ্গালা ভাষার একটি বিশেষ আদরের জিনিস হইবার কথা—তাহার বিক্রয় হইল না।' অন্য স্থানে আছে—'এ দেশে বেদ-প্রচারককেও এক সময়ে নাটক লিখিয়া বেদ মুদ্রণের খরচা তুলিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।'

আমরা বোধ করিতেছি, এইরূপ দুর্দশার জন্যই 'অনাথবন্ধু' গ্রন্থ উপন্যাসচ্ছলে এবং উপন্যাস-পরিচয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক অনাথবন্ধু উপন্যাস নহে—ইতিহাস। কিন্তু পাছে তোমরা ইতিহাস নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠ, এই জন্য একটা গল্পের কাঠামো খাড়া করিয়া, তাহারই উপর ইতিহাসের গড়ন-পিঠন, চিত্রবিচিত্র করিয়াছেন। গল্পটি এই—রামজয় চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্র ও এক কন্যা। অনাথবন্ধু জ্যেষ্ঠ, রজনী মধ্যম এবং সংসার

* প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না।

কনিষ্ঠ। কন্যার নাম নলিনী। জামাতার নাম আনন্দনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা সূর্যকুমার মুখোপাধ্যায় দু পয়সা করিয়াছেন। অনাথবন্ধু উকীল, রজনী ডাক্তার, আর সংসার যদিও ইংরাজি পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ৺কাশীধামে একরূপ অধ্যাপনাই করিতেন। অনাথবন্ধুর স্ত্রী মহামায়া, রজনীর স্ত্রী কিরণশশী।

রামজয় চট্টোপাধ্যায়দিগের, সূর্যকুমার মুখোপাধ্যায়-দিগের এবং কিরণশশীর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীপতি প্রভৃতির পারিবারিক সুখদুঃখের কয়েক বৎসরের বিবরণ এই গ্রন্থের গল্প বা কাঠামো। অল্প বয়সে বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়া, এবং চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ও যশস্বী হইয়া—অমায়িক বিনয়ী যুবক ডাক্তার রজনীনাথের হঠাৎ অপমৃত্যু—গ্রন্থের মূল ঘটনা। বালবিধবা কিরণশশীর পিতৃপরিবার হইতে প্রাপ্ত প্রবৃত্তির ধীরে ধীরে পরিবর্তন ও এই বালবিধবার পারিবারিক চরিত্র ধীরে ধীরে সঙ্গঠন, এই গ্রন্থের লক্ষ্য এবং গ্রন্থকারের কৃতিত্ব। গ্রন্থের গল্প অতি সামান্য, নগণ্য বলিলেও চলে, কিন্তু গ্রন্থের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি সত্যসত্যই অসামান্য। সমস্ত প্রকরণই শাস্ত্রসঙ্গত, সময়োচিত, সময়োপযোগী এবং একান্ত ঐতিহাসিক। গ্রন্থে কল্পনার লীলালহরী অতি অল্প থাকিলেও, ঐতিহাসিকের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণদর্শন ইহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে দেদীপ্যমান।

'অনাথবন্ধু' যদি গল্পের গ্রন্থ, তবে তাহা ইতিহাস হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—কাব্য বল, নাটক বল, উপন্যাস বল, ইতিহাস বল, এইরূপ গ্রন্থ লিখিবার শক্তি দ্বিবিধা। এক সৃষ্টিশক্তি, আর দৃষ্টিশক্তি। সৃষ্টি-শক্তিতে নবনব সৌন্দর্যের উন্মেষণ হয়, সেই সৌন্দর্যে লোকে আকৃষ্ট হয়, নিজে সুন্দর হয়। গ্রন্থকার চরিতার্থ হন। দৃষ্টিশক্তি-দ্বারা সংসারের গতি, মতি, আলোক, ছায়া, সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ—লোককে দেখাইয়া দেওয়া হয়; লোকের বিবেচনাশক্তি খেলিতে থাকে, লোকে মন্দ ছাড়িয়া ভালর দিকেই যায়। এই দুই শক্তির মধ্যে 'জ্যেঠ, কনিঠ, লখই না পারই।' বাল্মীকি, বেদব্যাস—সেক্সপিয়ার, ভিক্টর হুগোতে—সৃষ্টিশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি উভয়ই সমান প্রখরা। তাঁহাদের গ্রন্থগুলিও তেমনই প্রোজ্জ্বলা।

কাব্য-উপন্যাসে সৃষ্টিশক্তির, ইতিহাস-বিজ্ঞানে দৃষ্টিশক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কাব্য-উপন্যাসে সৃষ্টির প্রাধান্য বলিয়া কাব্যাদি সর্গে বিভক্ত। ইতিহাস-বিজ্ঞানে দৃষ্টির প্রাধান্য বলিয়া ঐ সকল সংস্কৃতে দর্শন বলিয়া অভিহিত। কবি সৃষ্টিকারক; দার্শনিক দৃষ্টিকারক। সৃষ্টি ও দৃষ্টি লইয়াই সমগ্র সাহিত্য শাস্ত্র।

সামাজিক ঘটনা-পরম্পরার উপর দৃষ্টিশক্তি সঞ্চালিত হইলে, হয়—ইতিহাস। এইজন্য রামায়ণ-মহাভারত পূর্ণ ইতিহাস। এমন দুইখানি ইতিহাস জগতে আর নাই।

বাঙ্গালায় ইতিহাস-রচনা অতি অল্পই হইয়াছে বা হইতেছে। ইংরাজির অনুকরণে যে সকল স্কুলপাঠ্য 'ইতিহাস' সঙ্কলিত হইতেছে, তাহাতে 'ইতিহ' 'অস' কোন একটি সমাজের প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাই না। যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া যায়—'আলালের ঘরের দুলালে' এবং 'হুতোমপ্যাচার নক্সায়'।

'অনাথবন্ধু' গ্রন্থে বর্তমান বঙ্গসমাজের মধ্যবিত্ত ভদ্র-পরিবারের ইতিহাস প্রচুরপরিমাণে আছে। এখনকার দিনের ভদ্রপরিবারের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিপদ্, সম্পদ্, রোগ, শোক, সদাচার, অনাচার, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি—প্রকৃত ফটোগ্রাফ ইহাতে ধারাবাহিকরূপে দেওয়া হইয়াছে। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বর্ষীয়ান্-বর্ষীয়সী, সকলেই 'অনাথবন্ধু' হইতে কিছু-না-কিছু শিক্ষা করিতে পারেন। আজিকালিকার গৃহস্থ বাঙ্গালিকে শাস্ত্রসঙ্গত, সমাজনীতি-সঙ্গত গৃহস্থালি শিক্ষা দেওয়াই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য, আমরা বেশ বলিতে পারি সে উদ্দেশ্য সম্যক্ চরিতার্থ হইয়াছে।

পূর্ণিমা

বাঙ্গালা অভিধান

(সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান)

৺ রামকমল তর্কালঙ্কার-প্রণীত

রাম না হইতে ষাটি হাজার বৎসর
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বরচিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ঐ প্রসিদ্ধ শ্লোকের প্রতিবাদে বলেন যে,

বাল্মীকি দেখিলেই ঐ কথার অসারতা উপলব্ধি হয়, মহর্ষি যে একজন সমসাময়িক রাজার বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাই বোধ হয়। ন্যায়রত্নের গ্রন্থের এই স্থল পাঠ করিয়া আমাদের একজন ব্যঙ্গপ্রিয় বন্ধু বলেন, 'ঐ কথার প্রতিবাদ করা ন্যায়রত্নের পক্ষে ভাল হয় নাই, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য না হইতেই যখন তাহার ইতিহাস লিখিতেছেন, তখন সেই ইতিহাসে আবার ও কথার প্রতিবাদ কেন? আমরা কি বলিতে পারি না—

না হইতে বঙ্গদেশে সাহিত্য-আভাস
অনায়াসে ন্যায়রত্ন লিখেন ইতিহাস।'

বঙ্গসাহিত্যের দরিদ্রতার উপর এই শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষপাতের পর আজি আঠার উনিশ বৎসর গত হইয়াছে, এখন সেই 'অনাগত' সাহিত্য আগত-প্রায় বলিলে চলে। এখন বিদ্যাপতি প্রভৃতির প্রাচীন কাব্য সকল, বঙ্কিমবাবু প্রভৃতির নব্য নভেল সকল ইংরাজিতে অনূদিত হইয়া বৈদেশিক জগতের সম্মুখে নীত হইয়াছে, বৈদেশিক কোন কোন শিক্ষালয়ে এখন বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপনা হয়, বিদেশী কেহ এখন ভারতীয় ভাষা শিখিতে চাহিলে বঙ্গভাষা শিক্ষা করেন, অনেক বিদেশী বিচারক আপনার বঙ্গভাষিত্বের গৌরবে আপনাকে স্পর্ধান্বিত মনে করেন। এই সময়ে ভাষার অবস্থোচিত একখানি অভিধান হইলে বড় ভাল হয়। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত, তাহাতে বঙ্গভাষার অভিধানে সংস্কৃত বহুতর শব্দের সন্নিবেশ নিতান্ত আবশ্যক। ফলত বঙ্গাভিধান অংশত সংস্কৃতাভিধান হওয়া চাই। সংস্কৃতের গৌরব এই যে, ইহাতে অধিকাংশ শব্দই প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে সার্থকভাবে নিষ্পন্ন। সুতরাং বঙ্গাভিধানে সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন আবশ্যক; প্রাকৃত বা যাবনিক বা ম্লেচ্ছ শব্দেরও সেইরূপ করিতে পারিলে ভাল হয়।

বলিতে আহ্লাদ হয়, পণ্ডিতবর ৺রামকমল বিদ্যালঙ্কার-প্রণীত প্রকৃতিবাদ অভিধানের সচিত্র চতুর্থ সংস্করণ আমাদের বঙ্গভাষার অভিধানাভাব অনেক পরিমাণে পূরণ করিয়াছে। 'সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান' বৃহৎ আকারে (সুপার রয়াল আট পেজী ফর্মার) সতের-শ-পৃষ্ঠা পরিমিত, দশ টাকা দামের ওয়েবস্টরের ইংরাজি অভিধানের মত। দেখিলেই আহ্লাদ হয়—মনে একটু আত্মগৌরবের উদয় হয়। যিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইতিহাস দেখিয়া উপহাসে ভ্রূকুটি করিয়াছিলেন, এই বৃহদভিধান দেখিয়া তাঁহাকেই আহ্লাদে হাসিতে হইয়াছে।

এত বড় বৃহৎ ব্যাপারে বিস্তর ত্রুটি অবশ্যই আছে, কিন্তু প্রতি সংস্করণে যে এই অভিধানের ক্রমিক উন্নতি হইবে, এই চতুর্থ সংস্করণ দেখিয়া এরূপ ভরসা করা এবং সাধারণকে দেওয়া বিশেষ অন্যায় হইবে না। একটি বিশেষ ত্রুটির কথা বলিব। পারিভাষিক শব্দ সকলের যেরূপ ভাবে সাধারণত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে শব্দার্থ অনেক স্থলে বিশদ হয় নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

'নাড়ী বঙ্কয়; সং, ক্লীং; ঘটিকাজ্ঞানার্থ বলয়াকার যন্ত্র, লগ্নাদি জ্ঞানার্থ নাড়ীরূপ কাল জ্ঞানোপায় যন্ত্রবিশেষ।'

যন্ত্রটা যে কিরূপ তাহার ত কিছুই বুঝিলাম না—কিন্তু অভিধানকার কিছু বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। আসল কথা, পারিভাষিক শব্দের এবং দ্রব্যবাচক শব্দের অধিকতর বিশদ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

যেমন ত্রুটি বিস্তর, তেমনই গুণও বিস্তর। একরূপ ত্রুটির কথা বলা হইল, একরূপ গুণের কথা বলি।

চৈতন্যচরিতাদি বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থে অনেক শব্দ এরূপ অর্থে ব্যবহার আছে যে, এখন আর সেই সকল শব্দের সেরূপ ব্যবহার হয় না; সুতরাং সেই সকল স্থলে ভাবার্থ পরিগ্রহ করা কঠিন হয়। এই অভিধানে সেই সকল প্রাচীন অর্থ দেওয়া আছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

'অঙ্গীকার (অঙ্গ-কার [কৃ করা + অ(ঘঞ্)—ভাবে] করণ। যাহা অঙ্গে ছিল না তাহাকে স্বীয় অঙ্গ করা। ঈ (চ্বি—অভূততদ্‌ভাবার্থে)—সং, পুং,

১। পূর্বে যাহা অঙ্গে ছিল না তাহা স্বীয় অঙ্গকরণ;
যথা— "পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতরি
রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করি।

* * *

নবদ্বীপে শচীগর্ভে শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু।"
(চৈতন্যচরিতামৃত)

২। দিব করিব যাইব উল্লেখ করিয়া প্রতিজ্ঞা করা, স্বীকার, স্বীকরণ, অঙ্গীকরণ, প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রবণ।'

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্নদামঙ্গলাদি গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা এই অভিধানের নানা গুণের মধ্যে একটি গুণ।

ফলকথা, ইহাতে গুণ-দোষ যতই থাকুক বাঙ্গালার একখানি বিশিষ্টরূপ অভিধানের বিশেষ অভাব হইয়াছিল, সেই অভাব প্রকৃতিবাদ অভিধানে অনেক পরিমাণে পূরিত হইয়াছে, এই জন্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পুত্র আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। এরূপ অতি-প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অচিরকাল-মধ্যে বহুল প্রচার হইলেই আমাদের এই ধন্যবাদ সার্থক হইবে।

['সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান'-এর এই চতুর্থ সংস্করণ-খানি সাহিত্যাচার্যের বাড়ীতে এখনও আছে, তবে আর অধিককাল রাখা অসম্ভব—এমনি জীর্ণ অবস্থা। এইখানি তিনি সর্বদা ব্যবহার করিতেন; তাঁহার হাতের বহুতর সংশোধন, টিপ্পনী ও নূতন শব্দযোজনা গ্রন্থের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।]

নবজীবন ৫ম ভাগ — জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬

The Bhagabad Gita

Translation in English Rhyme

By Rai Bahadur Bireswar Chakravarty

ইংরাজি পদ্যগ্রন্থের সমালোচনা আমার দ্বারা হইতে পারে না, তবে নাকি পরমারাধ্য গ্রন্থ গীতার অনুবাদ, কিছু না বলিলে প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে। কাজেই দুকথা বলিতে হইতেছে। বাইবেল গ্রন্থ বহুতর ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, এমন অন্য কোন গ্রন্থেরই হয় নাই। কিন্তু বাইবেলের পর গীতা। বহু ভাষায় গীতার অনুবাদ আছে; ইংরাজি পদ্যে গীতার অনুবাদ করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় ধন্য হইয়াছেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পণ্ডিত পুত্র (I. S. Chakravarty, M. A., F. R. A. S.) তাঁহার অপূর্ব জীবনী-সহ সেই অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন।

গীতায় দ্বৈতবাদের শ্লোক চতুষ্টয় এবং ইংরাজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া চক্রবর্তীর কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছি।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৫।১৬

Two persons do exist, so people say,
One wastage knows, the other no decay.
The first is matter dead that blindly goes,
And lesser soul is what no wastage knows.

তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি ঠিক অনুবাদ নহে; চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে কূটস্থ শব্দের অনুবাদ নাই।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৫।১৭

There is a person too superior far,
To both the soul supreme, whose virtues are
The best, this world without decay pervades
The threefold worlds which he supports and shades.

আবিশ্য—pervades, বিভর্তি—supports and shades, ভাল কথা।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫।১৮

As I beyond the wasting line secure
And also do excel the wasteless pure,
In Veds and worlds am I the person best
By sages called, who find in me their rest.

শেষের কথা কয়টি বাড়ানো, কিন্তু তাহাতে ভাবের অভিব্যক্তিই হইয়াছে।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৫।১৯

And Me the person best, the man who knows
From blind attachments free, to Me he grows
Devoted and resigned in every sense;
And gains all knowledge too, O! Bharat thence.

সুন্দর কথার সুন্দর অনুবাদ। এইরূপ অনেক স্থলেই। চক্রবর্তী স্বনামখ্যাত পুরুষ। গীতার এই অনুবাদ তাঁহার নামে অধিকতর সুখ্যাতি সঞ্চিত করিবে বলিয়াই মনে হইতেছে।

জাহ্নবী ৩য় বর্ষ কার্তিক ১৩১৪

বাঙ্গালীর বল

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত

এই গ্রন্থের অপূর্ব উৎসর্গপত্র উদ্ধৃত করিতেছি

'পরমারাধ্য

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পিতৃব্যদেব

চরণাম্বুজেষু।

কাকা,

আপনার নিকট শুনিয়াছি, স্বর্গেমর্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া যাহা আপনার নিকট শিখিয়াছি তাহা আপনার চরণোদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

প্রণত সেবক

শচীশ'

সুন্দর! এমন ভক্তিমাখা, বিনয়ভরা, অথচ এককণা-অহঙ্কার-জড়িত উৎসর্গপত্র দেখি নাই। ইহাতে গ্রন্থকারের আশা-আকাঙ্ক্ষা সকলই আছে। 'স্বর্গেমর্ত্যে সম্বন্ধ আছে।' আছেই ত। রাখিতে পারিলেই আছে, রাখিতে জানিলেই আছে। সেই স্বর্গের বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এই মর্ত্যের শচীশ-চন্দ্রের সম্বন্ধ এই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান। ইহাই এই গ্রন্থের সমালোচনা; প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট মনে করি। সাত শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালির বাহুবলের পরিচয় জানিয়া এখন কিছু লাভ নাই। নবীন গ্রন্থকারকে উপলক্ষ করিয়া একটা প্রাণের কথা এই অবসরে আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। বাঙ্গালির জাতীয় পতাকা-বর্ণনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

পতাকাটি অতি সুন্দর। নীল রেশমের উপর সোণার কাজ, ধারে ধারে মুক্তার ঝালর। মধ্যস্থলে একখানি সুবর্ণময় উজ্জ্বল চিত্র। চিত্রের নিম্নভাগে ধান্যশীর্ষগুচ্ছ। শীর্ষোপরি চতুর্ভুজা বঙ্গমাতা। মা রত্নভূষণমণ্ডিতা, কিন্তু আলুলায়িত-কুন্তলা। মায়ের দক্ষিণ করদ্বয়ে বেদ ও শঙ্খ। অপর হস্তদ্বয়ে পুষ্পমাল্য ও খড়্গ। মাথার উপর রবিকিরণোজ্জ্বল নীল আকাশ, পদনিম্নে কমলপ্রফুল্ল হিল্লোলিত তরঙ্গিণী। ধান্যশীর্ষমূলে সম্পৃক্ত মুক্তাক্ষরে লিখিত ছিল—

তুমি মা আরাধ্য, তুমি মা ব্রত,
তোমারি সেবায় থাকিব নিরত;
তোমরি বেদনা স্মরণে সতত
রাখিব গাহিব 'জয়তি ভারত';
গাওরে সবে 'জয়তি ভারত'।

আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যদি 'জয়তি ভারত' তবে বঙ্গমাতা কেন? বঙ্গ খণ্ডিত করিয়া খালি সরকার দোষী তবে ভারতমাতাকে খণ্ডিত করিয়া তোমরা শ্লাঘা করিবে কেন? আমরা যদি বঙ্গমাতার সন্তান তবে গঙ্গাধর তিলক কি আমাদের বৈমাত্রেয়? যদি বঙ্গমাতাই আমাদের সর্বস্ব তবে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন কি আমাদের কিছুই নহে? ভীমার্জুন কি আমাদের বিদেশী; বড় গোলে পড়িয়াই এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছি।

জাহ্নবী ৩য় বর্ষ কার্তিক ১৩১৪

A Dying Race

(মরণোন্মুখ জাতি)

ডাক্তার লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল ইউ. এন. মুখার্জি সম্প্রতি একখানি প্রায় একশত পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তক ইংরাজিতে প্রকাশিত করিয়াছেন; নাম দিয়াছেন, **A Dying Race**—ভাব হইতেছে, এই বাঙ্গালার হিন্দুজাতি মরণোন্মুখ জাতি, ইহারা মরিতে বসিয়াছে। গ্রন্থকারের শেষ কথা কয়টি আমরা অগ্রে উদ্ধৃত করিব।

The Mehomedans have a future and they believe in it—we Hindus have no conception of

it. Time is with them—time is against us. At the end of the year they count their gains, we calculate our losses. They are growing in number, growing in strength, growing in wealth, growing in solidarity,—we are crumbling to pieces. They look forward to a united Mehomedan world—we are waiting for our extinction.

The wages of sin is death. We Hindus have sinned deeply, damnably against the laws of God and nature, and we are paying the penalty.

ভাব এই—(বাঙ্গালার) মুসলমানদের সকলরূপ উন্নতি হইতেছে, আমরা মরিতে বসিয়াছি ; পাপে মৃত্যু নিশ্চিত ; আমরা হিন্দুরা মহাপাপে পাপী—ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমরা মহা পাপ করিতেছি ; সেই পাপের ফলে এখন আমাদের মরণ নিশ্চয়।

এ সকল কথায় কাহারও বিরোধ হইতে পারে না। আমাদের ত নয়ই। অধর্মে হিন্দুর অধঃপতন—ও-কথা মিছা করিয়া বলিলেও আমরা কৃতার্থ হই। গ্রন্থকার যে-ভাবে অধর্মের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা যদিও সে-ভাবে বলি না, কিন্তু অধর্মে হিন্দুর অধঃপতন—এ কথাটা ঠিক। সাধারণভাবে বুঝিলে, মুসলমান আমাদের অপেক্ষা স্বধর্মপরায়ণ। কাবুলের আমীর হইতে সামান্য মাটিকাটা কুলি পর্যন্ত, যে-অবস্থারই মুসলমান হউক, নেমাজের সময় হইলে নেমাজ করিবেই, তা যেখানে-যে-ভাবেই থাকুক ; আর আমাদের ব্রাহ্মণমণ্ডলী অপরাহ্নে সভায় গিয়া, রাত্রি নয়টা পর্যন্ত সভায় অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা করিবেন—ইচ্ছায় সায়ং সন্ধ্যা বন্ধ করিয়া। মুসলমান আপনার ধর্ম, আপনার আচার রক্ষা করিতে জানেন, সে-মুসলমানের উন্নতিতে আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেরই মর্যাদা রক্ষা হইতেছে ; আমাদের অনাচারী সম্প্রদায় এ সকল দেখিয়াও শিখিতে পারেন।

কিন্তু আর একটা কথা বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য আমরা এই কথা তুলিয়াছি ; একটু পিছাইয়া না গেলে, সে কথা ফুটিবে না।

স্বদেশীরা সাধারণত বলেন, আমরা দেশের লোকের (ঐহিক) উন্নতির চেষ্টা করিব, কাহার কি ধর্ম সে কথা ভাবিব না, ধর্মের সহিত আমাদের কোন সংশ্রব নাই। সুরেন্দ্রবাবুর 'বেঙ্গলি' পত্রে ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট কথা ছিল, এখনও মধ্যে মধ্যে থাকে যে, আমরা হিন্দু-মুসলমানে মিলিয়া আহার-বিহার করিব, করিলে স্বদেশীর বাঁধন দৃঢ়তর হইবে। ইহাতে যদি কাহারও ধর্মে বাধে, তবে সেই ধর্ম দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে, করিয়া দৃঢ়তর করিতে হইবে।

আমাদের গ্রন্থকার একজন বিলাত হইতে পাসকরা বড় ডাক্তার, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল। এই পুস্তিকা প্রবন্ধাকারে বেঙ্গলি পত্রেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানকে যে তিনি পৃথক্ চক্ষে দেখিবেন, এমন মনে করা যায় না। কিন্তু গ্রন্থের আগাগোড়াই কেবল হিন্দু-মুসলমানে তুলনা, মুসলমানের উত্থানের ও হিন্দুর অধঃপতনের বার্তা। তিনি জলের মত অতি প্রাঞ্জল ইংরাজিতে নানাভাবে সরকারি নানা বিবরণী হইতে, নানা ইতিহাস হইতে সংকলন করিয়া অতি দক্ষতা-সহকারে এই বার্তা বিঘোষিত করিয়াছেন ; ইংরাজি-নবিশ বাঙ্গালি যদি এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের শুভগ্রহের উদয় হইয়াছে বলিতে হইবে। দেশের জল ভালরূপ নিকাশি হয় না বলিয়া আমরা ছয়মাস কাল ভিজা মাটিতে বাস করিতে বাধ্য হই ; নদী, খাল, পুষ্করিণী, কূপ কাটানো হয় না বলিয়া আমরা স্নানপানের জল ভাল পাই না, আমাদের আলস্যে বাস্তুদেশে জঙ্গল বাড়িয়াছে বলিয়া আমরা প্রচুর রৌদ্রতেজ পাই না, বায়ু-চলাচল ভাল হয় না, বাঙ্গালার আকাশ পর্যন্ত দূষিত বিষ পরিপূরিত হইয়া উঠে ; তাহার পর পূরোপেট আহার আমরা কেহই পাই না, কাজেই আমরা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছি। এ সকল কথা যদি ইংরাজি-নবিশ বাঙ্গালি বুকের ভিতর বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে এই সকল রাজনীতির আন্দোলনের দায় হইতে আমরাও রক্ষা পাই ; আর আমাদিগকে অন্য দিকে নিবিষ্টমনা দেখিলে সরকার বাহাদুরও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন।

বাঙ্গালার হিন্দু বাঙ্গালিকে মরণের দিকে অগ্রসর বুঝিয়া কি স্বদেশী কি স্বধর্মী কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। স্বদেশী যে মনে করিবেন, বেশ ত মুসলমানের শ্রীবৃদ্ধি

হইতেছে, তাহাতেই আমাদের লাভ, তাহা কেহ মনে করিতে পারেন না; এই গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। মানব ঘোরতর স্বদেশী হইলেও যে স্বধর্মীর দিকে এক একটু টান থাকে, তাহা দেখা যাইতেছে।

তবে প্রকৃত বিশ্বাসী হিন্দু এরূপ মনে করিতে পারেন বটে যে, আমরা সংখ্যায় কমিতেছি, তাহাতে কি হইল? আমরা পুরাণে শুনিয়াছি দক্ষ, কশ্যপ প্রভৃতি কয়জন প্রজাপতি হইতেই এই বিশ্বসংসারের মানব-সৃষ্টি। ইতিহাসে দেখিতেছি, বড়-জোর হয়ত বার শত বর্ষ পূর্বে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতেই এই কুলীন ব্রাহ্মণগোষ্ঠী বাঙ্গালা ছাইয়া রহিয়াছে। কাব্যে শুনিয়াছি, যখন ব্রাহ্মণ ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন, 'তখন তাহারা ক'জন ছিল?' অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যায় তাঁহারা নাকি ভারতে আসিয়াছিলেন। বায়রন তাঁহার কাব্যে উদ্দীপনার ভাষায় লিখিয়াছিলেন—

> Of the three hundred, grant but three
>
> To make another Thermopylæ.

সুতরাং সংখ্যায় কমিলে আমাদের ভয় কি? সমগ্র জগতে এক লক্ষের কিছু বেশি পারসী আছেন; সমগ্র ভারতে ৭৫ হাজার; বোম্বাই প্রদেশে ৫৫ হাজার, কিন্তু তাহারা কেমন প্রবল জাতি। স্যর জেম্‌সেটজি জিজিভাই, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ, টাটা প্রভৃতি মহাত্মগণের দাতৃত্ব গুণে এই মুষ্টিমেয় জাতি কেমন উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আমাদের কথা অতি বিশদ ইংরাজিতে প্রসিদ্ধ লেখক রস্কিন বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, আত্মরক্ষার (আমরা বলি ধর্মরক্ষার) ক্ষমতা কখনই সংখ্যার উপর নির্ভর করিতে পারে না। সংখ্যায় হয় না, একতায় হয়; এবং সে একতা ধর্মবন্ধনের একতা হওয়া চাই। অধর্মের একতায় কোন কাজই হয় না। রস্কিন লিখিতেছেন—

> And then, observe further, this true power, the power of saving, depends neither on multitude of men, nor on extent of territory. We are continually assuming that nations become strong according to their numbers. They indeed become so if those numbers can be made of one mind; but how are you sure you can stay them in one mind, and keep them from having north and south minds? Grant them unanimous, how know you they will be unanimous in right? If they are unanimous in wrong, the more they are, essentially the weaker they are. Or, suppose that they can neither be of one mind, nor of two minds but can only be of no mind? Suppose they are a mere helpless mob; tottering into precipitant catastrophe, like a waggon-load of stone when the wheel comes off. Dangerous enough for their neighbours, certainly, but not 'powerful'.

মানুষের মত মানুষ দশজন থাকিলে যাহা হয়, আমাদের মত শত সহস্র অকর্মণ্য লোক থাকিলে, তাহার শতাংশ হয় না। তবে কিনা আমাদের দেশে ধর্ম ভিন্ন মনুষ্য-গঠনের শক্তি অন্য কোন পদার্থে নাই। নাই বলিয়াই এত কথা কহিতে হইতেছে। আমাদের মত অকর্মণ্য লোকের সংখ্যা কমিলে ক্ষতি ত নাই-ই, বোধ করি লাভ আছে; প্রকৃত হিন্দু কখন মরিবে না; তাহাদের ধর্ম—সনাতন, সমাজ—সনাতন,—সেই ধর্ম সেই সমাজে থাকিয়া মানিলে জাতিও অমর।

বঙ্গদর্শন আশ্বিন ১৩১৬

নবপর্যায় ৯ম বর্ষ

দীপ-নির্বাণ

'দীপ-নির্বাণ' নামে একখানি অভিনব নভেল আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। শুনিয়াছি, এখানি কোন সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের কথা। এরূপ লেখার ভঙ্গি, বঙ্গদেশে বলিয়া নয়, অপর সভ্যতরদেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকর্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করি, তিনি যেন ভাষা একটু সংযত করেন, তাহা হইলে তাঁহার অপূর্ব ভাবগুলি আরও পরিপুষ্ট দেখাইবে।

নমুনাস্বরূপ আমরা গ্রন্থ হইতে পদ্য-গদ্য উভয়বিধ লেখা, ও হাসি-কান্না উভয়বিধ উচ্ছ্বাস উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

যমুনার প্রতি

কাহে লো যমুনা, নাচত খেলত,
আজু বিলাসে বিকম্পিত কায়,
মৃদু মৃদু পবনে, হিয়া তুয়া সঘনে,
কাহে লো জগমগ ভায়।
কাহে লো চন্দ্রমা, বরষিয়ে মধুরিমা,
শোভয়ে তুঝ হৃদে আজি,
ধিক্ লো যমুনা, বিনে সে কানাইয়া,
মাতল নব সাজে সাজি।
অব তো লো তুয়া কূলে, মোহন কদমতলে,
নাহি খেল শ্যাম মুরারি,
অব তো বাঁশরী বোল, উছলি না ভুলায়ে,
ব্রজপুর গোপিনী নারী।
কদম্ব-কেশর কম্পয়ি থর থর,
ঝর ঝর ঝরল হুতাশে,
মাধবী লতিকা হায়, লুণ্ঠিত ধরণী,
অব নাহি মাধুরী বিকাশে।
নিকুঞ্জে অলিকুল, রোতে রোতে গুঞ্জত,
কোয়েলা কুহরে বিলাপে,
রমণী পরাণ মুঝ, নাহি তো জুড়ায়ত,
জারল বিরহ-উতাপে।
তবে লো যমুনা
কাহার মুরতি, দেখিয়ে ফুরতি;
হইল তোর?
কোন সুখে আজ, পাওয় লো তুই,
আমোদে হৃদয় হইল ভোর।
নব প্রেমা তুয়া, সুখ উপজত,
নেহারি মোর হিয়া দহল লাজে,
কিসি কো সোহাগে, ধিক্ লো যমুনা
সাজত আজু এ মোহন সাজে।

স্থানেশ্বরের যুদ্ধের পর।

চারিদিক্ অন্ধকারময়—চারিদিক্ শূণ্যময়—স্থানেশ্বর অদ্য শ্মশানময়—কেবল মধ্যে মধ্যে যবনদিগের আহ্লাদ কোলাহল, হিন্দুদিগের আর্তনাদ, আহতদিগের কাতরধ্বনি ও শিবার অশিব চীৎকার দিগ্‌দিগন্ত হইতে উত্থিত হইয়া গগনমার্গ বিদারণ করিতে লাগিল।

সেই অবধি সেই শ্মশানক্ষেত্র ক্রমে বর্ধিতকায় হইয়া হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি-মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতক্ষেত্র শ্মশানক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া উঠিল, চারিদিক্ হইতেই সেই শিবার অশিব চীৎকার, সেই আহতদিগের আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দীপশূন্য ভারতের চতুর্দিক্ ক্রমে নিশার ঘোর অন্ধকারে আবরিত হইয়া আসিল। কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল মধ্যে মধ্যে কোথাও বা দূরপ্রান্তে দুই-একটি প্রজ্বলিত চিতানলে পাষাণ-হৃদয়কেও সন্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। কোথাও-বা অবিশ্রান্ত আলেয়ার আলোকে নেত্র ঝলসিত করিতেছে।

['দীপ-নির্বাণ' স্বর্ণকুমারী দেবী-প্রণীত; প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকর্ত্রীর নাম ছিল না। ১৮ বৎসর বয়সে ইহা লিখিত হয়; বঙ্গসাহিত্যে ইহাই মহিলা-রচিত আদি উপন্যাস।]

৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮৩] [সাধারণী ৭ ভাগ, ২৪ সংখ্যা

বঙ্গদর্শন-এ 'প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন'-এর নির্বাচিত অংশ

[সাহিত্যাচার্য বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' করিতে আরম্ভ করেন ২য় বর্ষের ৭ম সংখ্যা, অর্থাৎ কার্তিক ১২৮০ হইতে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সমালোচনের সূত্রপাত হয়, ১ম বর্ষের ৮ম সংখ্যা, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ১২৭৯ হইতে; তখন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই সমালোচন লিখিতেন। পৌষ ১২৮১ পর্যন্ত সাহিত্যাচার্য এই সমালোচন-লেখা চালাইয়াছিলেন। মাঘ ১২৮১ (৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা) 'সম্পাদকীয় উক্তি' লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন।]

গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু—মীর মসাঃরফ হুসেন-প্রণীত।

গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও

বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।

ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক্—পরস্পর পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না—কেবল উর্দু ফারসীর চালনা করিবেন, তত দিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন-না জাতীয় ঐক্যের মূল—ভাষার একতা। অতএব মীর মসাঃরফ হুসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালির পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন। (পৌষ ১২৮০)

*

হেমলতা নাটক—শ্রীহরলাল রায় প্রণীত। ১২৮০।

আধুনিক প্রকৃত নাটক সমালোচন করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিল না ; বোধ হয় শীঘ্র ঘটিবে না। অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত চিত্র করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। ধারা-বাহিক কথোপকথন-দ্বারা সুন্দর গল্প-রচনা নাটকের অবয়ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাটকের জীবন নহে। অন্তঃপ্রকৃতি-দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয় ও কিরূপে চালিত হয়, তাহা প্রদর্শনই নাটককারের প্রধান কার্য। সেইরূপ বহিঃ-প্রকৃতি-দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয় তাহা প্রদর্শন করাই নভেল-রচয়িতার প্রধান কার্য।

উত্তরচরিতের তৃতীয়াঙ্কে এই দুই বিভিন্ন ভাবের আমরা সুন্দর উদাহরণ পাইতে পারি। ছায়ারূপিণী সীতা জনস্থানে প্রবেশ করিয়াছেন ; পূর্বসুখানুস্মৃতিক্রমে অন্তর্বিচলিতা হইয়াছেন ; কিন্তু এরূপ মানস চালন নাটক নহে ; ইহা নভেল। যখন মত্তহস্তী আসিয়া সীতার পঞ্চবটী-বাস-সময় পালিত করিশাবকের প্রতি আক্রমণ করিল, বাসন্তী দেখিতে পাইয়া, 'সর্বনাশ হইল, সীতার পালিত করভকে মারিয়া ফেলিল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, সীতা মোহবশত যখন 'আর্যপুত্র, আমার পুত্রকে রক্ষা কর' বলিয়া রামকে সম্বোধন করিলেন, তখনও উত্তরচরিত নভেল, নাটক নহে। বাসন্তী-মুখ-নির্গত শব্দ-শ্রবণে সীতা মানস চালিতা হইয়াছিলেন—বাসন্তীর বাক্য-ঘাতে নহে। ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে নাটক হয় না। আবার যখন রাম বিমান রাখিতে বলিলে সীতা তাঁহার গম্ভীর স্বর শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'একি! কে এ জলভরা মেঘের মত স্তনিত গম্ভীর শব্দ করিল? আমার শ্রবণ-বিবর ভরিয়া গেল! আজি এ মন্দভাগিনীকে কে সহসা আহ্লাদিত করিল?'—তখনও সীতা নভেলের নায়িকা। এদিকে পঞ্চবটী-দর্শনে রামের শোক-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে ; রাম 'সীতে, সীতে' বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন ; এ শোক নভেলের শোক, এ উচ্ছ্বাস নভেলের উচ্ছ্বাস। কিন্তু বাসন্তী যখন রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?' তখনই প্রকৃত নাটক আরম্ভ হইল। দুই অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত হইতে লাগিল। প্রশ্ন শুনিয়া রাম ভাবিতে লাগিলেন, 'বাসন্তী "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? আর প্রথমেই কুমার লক্ষ্মণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?' এইরূপ অন্তঃচালন নাটকের জীবন।

বাসন্তী আঘাত করিতেছেন,—'আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন?' আঘাতের ফল—'লোকে বুঝে না বলিয়া।' পুনরায় আঘাত 'কেন বুঝে না?' আঘাতে অবসন্ন অন্তঃপ্রকৃতি উত্তর দিল, 'তাহারাই জানে।' পুনর্বার কঠোর আঘাত—'নিষ্ঠুর! দেখিতেছি কেবল যশ তোমার অত্যন্ত প্রিয়!' রাম-প্রকৃতি ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার কিছু পরেই আবার বাসন্তী-হৃদয়ে প্রতিঘাত হইল। রামশোক-প্রবাহের উল্টা বান বাসন্তী-হৃদয়ে আঘাত করিল ; বাসন্তী রামকে ধৈর্যাবলম্বন করিতে বলিলেন ; কিয়ৎক্ষণ পরে রামকে অন্যত্র উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতই নাটকের জীবন। দুরদৃষ্টক্রমে বাঙ্গালা ভাষার কোন নাটকেই এরূপ চাঞ্চল্যের চিত্র দেখিতে পাই না। হেমলতা নাটকেও নাই। এক ব্যক্তির কথাক্রমে অন্য ব্যক্তির অল্প পরিমাণে মানস পরিবর্তন

হইলেই যদি যথেষ্ট হইত তাহা হইলে হেমলতা উত্তম নাটক হইত। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। প্রধান প্রধান নাটকে একটি অথবা একাধিক প্রকৃতি অন্য প্রকৃতিকে ক্রমে ক্রমে চালিত করিয়া একদিকে লইয়া যায়। ভূতযোনির নৈশ উপদেশে, ওফিলিয়ার পিতৃপরামর্শ মত উত্যক্ত বাক্যে ও নিজ অন্তঃপরীক্ষায় হ্যামলেটকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, পাঠক স্মরণ করুন। ডাকিনীগণের ভবিষ্যদ্‌বচনে, লেডি-ম্যাকবেথের উত্তেজনে, ম্যাকবেথকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, পাঠক স্মরণ করুন। এরূপ কিছুই হেমলতা নাটকে নাই। তথাপি হেমলতা নাটক, প্রকৃত নাটক না হউক পাঠ্য পুস্তক বটে; পাঠ্য কাব্যও বটে। রসপূর্ণ উপন্যাস-রচনা নিতান্ত সামান্য ক্ষমতার কর্ম নহে। হেমলতা নাটক রসপূর্ণ উপন্যাস বটে, ইহাতে বীররস, করুণরস উভয় মিশ্রিত হইয়া আছে।

উপন্যাস রসপূর্ণ বটে কিন্তু লেখায় তেমন রস নাই। এটি এই গ্রন্থের প্রধান দোষ। গ্রন্থের কতকগুলি গুণ আছে। ইহার ভাষা সুন্দর, সরল। উপন্যাসটি সুন্দর গ্রথিত। অশ্লীলতাদি কোন দোষ ইহাতে নাই।

উপন্যাস ভাগে একটি মাত্র দোষ আছে। কমলাদেবীকে উপন্যাস-মধ্যে স্থান দান করা। মাতৃস্নেহ করুণরসের আদর্শ বটে, কিন্তু এ মাতৃস্নেহ গ্রন্থের ঘটনাবলির সহিত কিমিয় সংযোগ লাভ করিতে পারে নাই। জলের উপর তৈলের ন্যায় কমলাদেবী ঘটনাপুঞ্জ-মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন।

যাহা হউক সকল দিক্ বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, হেমলতা নাটক এখনকার প্রচলিত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম। ইহার পাঠকালে মনোমধ্যে নানা রসের উদয় হয় এবং বোধ হয় অভিনীত হইলে সম্পূর্ণ মনোরঞ্জক হইবে। ইহা নাটক না হইয়াও অভিনয়-যোগ্য। ভরসা করি ন্যাশনাল থিয়েটার মোহন্ত নাটক, নবীন নাটক, নাপিতেশ্বর নাটক পরিত্যাগ করিয়া হেমলতা নাটকের ন্যায় বিশুদ্ধ সরল রসপূর্ণ উপন্যাসের অভিনয় করিয়া কৃতবিদ্যের মনোরঞ্জন ও সাধারণের উপকার-সাধনের চেষ্টা করিবেন।

অমরনাথ নাটক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরি-প্রণীত।

আমরা এই গ্রন্থ-সমালোচনায় অক্ষম। গ্রন্থকারের কোন দোষ নাই—দোষ আমাদের। আমরা ইহা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। পড়িব, এই ভরসায় কয় মাস এই গ্রন্থ ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। নাটকখানি ২৯৪ পৃষ্ঠা। মনুষ্য-জীবন নশ্বর —চিরজীবী কেহ নহে। এ ক্ষণিক জীবনের কিয়দংশ তিনশত পৃষ্ঠা নাটক পাঠ করিয়া অতিবাহিত করায় কোন পাপ আছে কিনা—এই মীমাংসায় আমাদের কয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। এখনও আমরা কোন সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। যদি ভবিষ্যতে আমরা এরূপ মীমাংসা করি যে, তিনশত পৃষ্ঠা নাটক পাঠ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য-জীবনের কিয়দংশ অতি-বাহিত করায় পাপ নাই, তবে আমরা ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে ভরসা করি যে আমরা গ্রন্থ না পড়িয়া প্রশংসা করিলাম না, পাঠকগণ ইহার জন্য আমাদের কাছে উপকৃত হইবেন। এবং না-পড়িয়া যে নিন্দা করিলাম না, এ জন্য গ্রন্থকার উপকৃত হইবেন। যদি গ্রন্থকার ক্ষুণ্ণ হন তবে আমরা তাহাতেও প্রস্তুত আছি। (মাঘ ১২৮০)

*

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী—প্রহসন, শ্রীদক্ষিণা-রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত।

প্রথম অঙ্কে দেখিলাম যে কলিকাতার কোন বিখ্যাত ভদ্র বংশের গ্লানি আছে। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখিলাম, বেশ্যালয়ে মদ্যপানের বর্ণনা। আর আমরা পড়িলাম না। বোধ করি কেহই অত দূরও পড়িবেন না। কতদিনে এই সকল ঘৃণিত পুস্তক-প্রণয়ন রহিত হইবে? এই সকল পুস্তক প্রণেতৃগণ অবশ্য মনে মনে বিবেচনা করেন, আমাদিগের গ্রন্থে বড় রস আছে, এবং আমরা উত্তম নীতিশিক্ষা দিতেছি, কেন-না এরূপ কোন বিশ্বাস না থাকিলে গ্রন্থ প্রচারিত করিবেন কেন? এই বিশ্বাস ভূমণ্ডলে অতি আশ্চর্য বিষয় সন্দেহ নাই। (ফাল্গুন ১২৮০)

হরবোলা ভাঁড়—প্রথম ভাগ। প্রথম সংখ্যা। জি. পি. রায় এণ্ড কোং। ১৮৭৪।

অনেকগুলি চিত্র ইহাতে আছে। 'পঞ্চ্' নামক ইংরাজি পত্রের চিত্রের অনুকরণে এই সকল চিত্র প্রণীত হইয়াছে। চিত্রগুলি উত্তম হইয়াছে। ভাঁড়ের একটি কবিতা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাহাতে পাঠকেরা তাঁহার চরিত্র ও প্রতিজ্ঞা বুঝিতে পারিবেন।

বোকা চতুর, আমীর ফতুর, ধাড়ী বকনা ছানা।
নিক্তি কোরে কোরবো ওজন, ওজন থাকবে জানা॥
বাজারুজড়ো পাজি পুঞ্জড়ো যে যেখানে আছে।
কেউ এসো না কেউ এসো না এ মুষলের কাছে।
বাবা এ মুষলের কাছে॥
ঘোরে বন বনা বন, ঠন ঠনা ঠন, ধর্ম্মমুষল ঘাড়ে।
যদি মুণ্ডু ঘুরাও ঘুরবে মুণ্ডু, আটকা পোড়বে ভাঁড়ে॥
রেখো জোয়ার মুখে ধর্মতরী সামলে ফেলো দাঁড়।
মাভৈ মাভৈ ভয় কোরো না অভয় দিচ্ছে ভাঁড়॥

আমরা শুনিয়াছি, এ মুষল কোন যোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। অতএব আমরা যে দুই একটা পরামর্শ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা প্রয়োজনীয় না হইলেও হইতে পারে। তবে একটা স্থূল কথা বলিয়া রাখিলে ক্ষতি নাই। গালি এবং ব্যঙ্গ দুইটি পৃথক্ বস্তু, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। গালি ভদ্রের পরিহার্য, তদ্দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধ হয় না। ব্যঙ্গ সকলের আনন্দদায়ক এবং সুলেখকের হস্তে তাহা মহাস্ত্র। অনেক লেখক গালিকেই ব্যঙ্গ মনে করেন; পক্ষান্তরে অনেক পাঠক ব্যঙ্গকে গালি মনে করেন। আবার অনেকে নিরর্থক ছ্যাব্‌লামিকে ব্যঙ্গ মনে করেন। আমরা ভরসা করি, ভাঁড়ের এ সকল দোষ ঘটিবে না।

*

তীর্থ মহিমা—নাটক। শ্রীনিমাইচাঁদ শীল-প্রণীত। ১২৮০।

এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। গ্রন্থকারের নিবাস চুঁচুড়া। চুঁচুড়া হইতে 'সাধারণী' প্রকাশিত হয়। বোধ হয়, সমালোচনার জন্য একখণ্ড তীর্থ মহিমা সাধারণীকে প্রদত্ত হয়। সাধারণী-লেখক গ্রন্থকার তাঁহার একজন সম্ভ্রান্ত বন্ধু ও প্রতিবেশী বলিয়া গ্রন্থ সমালোচনা করেন না। কিন্তু উৎসর্গ পত্রের সমালোচনা করেন। খড়দহের একজন গোস্বামীকে ঐ গ্রন্থ উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। সোজা বুঝিলে, উৎসর্গপত্রে কতকগুলি অত্যুক্তি আছে। সাধারণী-লেখক সোজা লোক নহেন, কিন্তু এবার সোজা বুঝিলেন। তিনি অত্যুক্তি দোষগুলি দেখাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ নানা দিক্ হইতে নানা পত্রে নানা ভঙ্গির পত্র প্রেরিত হইতে লাগিল। সাধারণীতে কয়খানি প্রতিবাদাত্মক পত্র প্রকাশিত হইল। একখানিতে সাধারণী কিছু টীকা লিখিলেন। টীকায় অসন্তোষের কথা কিছু আমরা দেখি নাই, কিন্তু নিমাইবাবু অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সাধারণীতে একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার সমুদয়াংশ আমরা উদ্ধৃত করিতে পারি না; তাহার সারমর্ম আমরা এই বুঝিলাম যে, নিবাইবাবু বড় রুষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে আর সাধারণী-লেখককে বন্ধু বা প্রতিবেশী বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

এইরূপে সমালোচনার দায়ে সাধারণী অমূল্য রত্ন-স্বরূপ নিমাইবাবুর বন্ধুত্ব-গৌরব হারাইলেন, 'like the base Judæan threw away' ইত্যাদি। এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য, সাধারণী যদি এ গ্রন্থের উৎসর্গপত্র মাত্র সমালোচনা করিয়া এত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তবে আমরা সমগ্র গ্রন্থ সমালোচনা করিলে না জানি কি বিপদে পড়িব? কেন-না নিমাইবাবু বলিতে দিন বা না দিন, আমরাও মনে মনে স্পর্ধা করি যে, আমরা নিমাইবাবুর বন্ধু-মধ্যে গণ্য; আর বঙ্গদর্শনের কার্যালয় চুঁচুড়ার অপর পারে, এজন্য কখন কখন আপনাদিগকে তাঁহার প্রতিবেশী বলিয়াও শ্লাঘা করিতে পারি। আমাদের এ সকল অহঙ্কার লোপ পায় আমাদের এমন ইচ্ছা নহে—এজন্য তীর্থমহিমার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। ভরসা করি, এক্ষণে আমরা নির্বিঘ্নে নিমাইবাবুর বন্ধু ও প্রতিবেশী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারিব। (চৈত্র ১২৮০)

*

নিদান—অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মাধবকর-প্রণীত সংস্কৃত রোগ-নিশ্চয়-নামা গ্রন্থ। শ্রীউদয়চাঁদ দত্ত কর্তৃক অনূদিত।

আমরা সর্বদাই মনে করি যে এখনকার ইউরোপীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত বাঙ্গালি চিকিৎসকেরা যদি আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তবে কিছু

উপকার হইতে পারে। প্রথম উপকার, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বিজ্ঞান-পারদর্শিতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় উপকার, প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই কি? বলিতে পারি না; আমরা বিশেষজ্ঞ নহি। তবে দেখিতেছি, দেশী চিকিৎসা অদ্যাপি বিলাতি চিকিৎসার প্রতিযোগিনী হইয়া প্রচলিত আছে—বিলাতি চিকিৎসার প্রচার সত্ত্বেও দেশী চিকিৎসার মান আজিও বজায় আছে—কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিত? দেশী ভূতত্ত্ব, দেশী জ্যোতিষ, দেশী গণিত, সকল প্রকারের দেশী বিজ্ঞান, দেশী প্রাচীন ভাষা পর্যন্ত বিলাতি বিজ্ঞান —বিলাতি ভাষার কাছে দাঁড়াইতে পারিতেছে না; কেবল দেশী দায়, মীমাংসা শাস্ত্র এবং দেশী চিকিৎসা শাস্ত্র অদ্যাপি প্রবল। কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিতে পারে?

সে যাহাই হউক উদয়চাঁদবাবুর এই উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ভরসা করি, অন্য চিকিৎসকেও এই পথে গমন করিবেন। আমরা যত দূর দেখিয়াছি, অনুবাদ উত্তম হইয়াছে। নিদান-লিখিত রোগ সকলের ইংরাজি নাম টীকায় সন্নিবেশিত হওয়াতে আরও ভাল হইয়াছে। 'নিদান' নাম শুনিলেই অনেকে ইহা দেখিতে ইচ্ছুক হইবেন সন্দেহ নাই। ইহার মূল্যও অল্প—১৲ টাকা মাত্র এবং গ্রন্থ বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। (বৈশাখ ১২৮১)

*

রসকাদম্বিনী—অর্থাৎ সংস্কৃত অমরুশতক কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ।

সংস্কৃত অমরুশতক কাব্য আদি-রসপ্রধান। প্রকৃত আদিরস জগতের একটি দুর্লভ পদার্থ। ইহা পবিত্র, বিশুদ্ধ, অমূল্য। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এই আদিরস চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইংরাজিতে নানা স্থানে চমৎকার আদিরস পাওয়া যায়। অন্ধকবি মিল্টন যখন ইদন উদ্যান-মধ্যে প্রথম নবদম্পতীকে সৃষ্টি করিয়া মনোহর গন্ধবাহী প্রভাতকালে তাহাদিগের দৃশ্য উন্মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাতে কি অপূর্ব আদিরস সঙ্ঘটিত হইয়াছে। সরলা নিষ্পাপা লোক-মাতা নিদ্রা যাইতেছেন, আদিপুরুষ প্রত্যেক লোমকূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেন, অলকাবলির উপরি প্রভাত-সমীরণ নৃত্য করিতেছে, নিমীলিত নয়নোপরি অলকাবলি ঝল্‌ঝল করিতেছে, আদম সযত্নে তাহা সরাইয়া দিতেছেন; এই চিত্র সমধিক মনোহর, ইহা অতুল্য—অমূল্য। সেইজন্য আদিরসের প্রধানত্ব।

কিন্তু এই আদিরসের বিকৃতি আছে; পৈশাচিকী বিকৃতি আছে। একটা সামান্য কথায় বলে যে, মন্দ দ্রব্য কোনরূপে সেবন করা যায়, কিন্তু ভাল দ্রব্য মন্দ হইলে তাহা একেবারে অসহ্য হয়। ঘোল খাওয়া যায়, দুধ ছিঁড়িয়া গেলে, তাহা আর কাহার সাধ্য যে গলাধঃকরণ করে? আদিরস সম্বন্ধেও সেইরূপ। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এবং বাঙ্গালা অনেক গ্রন্থে আদিরসের কুৎসিত বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অমরুশতকেরও অনেকগুলি শ্লোক নিতান্ত অশ্লীল। অনুবাদক বলেন যে, একশত শ্লোকের মধ্যে কেবল পাঁচটি অশ্লীল; তিনি সেই পাঁচটির অনুবাদ করেন নাই। অন্যগুলি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, 'অনেকে মনে করেন এই শতক অশ্লীলতা-দোষে দূষিত,' 'উহা তাঁহাদের ভ্রান্তি মাত্র,' 'এরূপ কাব্যও যদি অশ্লীল হয়, তবে আদিরসের কবিতা মাত্রই তাদৃশ দোষে দূষিত হইতে পারে।' আমরা অনুবাদক মহাশয়ের মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না; মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, অমরুশতক অশ্লীলতা-দোষে দূষিত—এমন কি ইহার মঙ্গলাচরণ-সূচক প্রথম শ্লোকটিই কিঞ্চিৎ অশ্লীল। সেই অশ্লীল ছত্রটি পরিবর্তন করিয়া আমরা বঙ্গদর্শন-পাঠককে (পাঠিকাকে নয়) আশীর্বাদ-ছলে সেই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম।

এই অলকগুলি ললাটে পড়িছে ঝুলি,
মণিময় কাণবালা দোলে ঝলমলে,
বিন্দু বিন্দু ঘর্মজল, ফুটে যেন মুক্তাফল
তিলক পুছিয়া যায় সেই ঘর্মজলে।
ঢুলঢুল মিটিমিটি, সেই কামিনীর দিঠি,
অলস আবেশে আর শ্রম প্রেমভরেতে,
মুখখানি হোক তারি, তোমার মঙ্গলকারী
কি কাজ কেশব শিব ব্রহ্মাদি দেবেতে?

অমরুশতক কাব্যের বিশুদ্ধতা-সম্বন্ধে অনুবাদক মহাশয়ের সহিত এক মত হইল না বলিয়া আমরা তাঁহার রুচির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা না করিলে আমাদের অধর্ম হইবে। রসকাদম্বিনী-কারের অনুবাদ-ক্ষমতা অতি সুন্দর। অনূদিত গ্রন্থ অনেক সময়েই নীরস, কটমট এবং বিস্তার-বিশিষ্ট হয়, এরূপ হইয়া হয়ত মূলের ভাব কিছুই থাকে না, কিন্তু রসকাদম্বিনী সেরূপ নহে। ইহার রচনা অতি সহজ, সুমিষ্ট এবং ইহাতে মূলের সকল কথাগুলি না থাকুক অমরুশতকের ভাবটি ইহাতে সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে। নিজের কবিত্ববোধ না থাকিলে কখন এরূপ হইত না, রসকাদম্বিনীকার একটি ক্ষুদ্র কবি। এত কথা বলিয়া যদি দুইচারিটি শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করি তাহা হইলে বিশেষ দোষ না হইলেও না হইতে পারে। দুইটি মানের-কবিতা দেখুন। এ মান শ্রীমতীর দুর্জয় মান নহে। ইহা মান—অভিমান নহে। তুষার নিজে লুপ্ত হইয়া পানীয় জলের শীতলতা বৃদ্ধি করে বলিয়াই তুষারের আদর। এই মান-তুষার প্রণয়িনীর হৃদয়-সরসীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ গলিয়া গিয়া প্রণয়-ভাণ্ডার শীতল করে বলিয়াই এ মানের আদর। এই মান প্রণয়রূপ গানের পক্ষে প্রকৃতই মান। মানের ঘায়ে অনেক বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু এই মান না থাকিলে প্রণয়-গানের লয়সঙ্গতি হয় না।

প্রথম মানে কেবল হাসি—

স্ত্রীপুরুষ দুজনায় বিমুখে মানের দায়
শুয়ে র(ই)ল বিছানায় মৌনব্রত ধরি,
সাধিতে উতলা মন তথাপি না ছাড়ে পণ
আপন গৌরব-ধন রাখে যত্ন করি।
ক্রমে কিছু উচ্চ শিরে আড়চোখে ধীরে ধীরে
দোঁহে দোঁহাপানে ফিরে লাগিল দেখিতে,
চোখে চোখে হ'ল মিল ভাঙ্গিল মনের খিল
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গিল হাসিতে হাসিতে।

দ্বিতীয় মানে হাসি-কান্না—

দেখিত নিরখি মোরে বিধুমুখী কি আচরে
এই ভেবে চুপে আমি রহিনু যতনে
প্রেয়সীও তাই হেরি মানেতে হইল ভারি
মনে কৈল এ ধূর্ত কি করে মোর সনে।
এইরূপ দুইজনে বিস্মিত নয়নার্পণে
পরস্পর দেখিতেছি হেন অবস্থায়
আমি হাসিলাম ছলে সে নারীও অশ্রুজলে
ভাসিয়া ধৈরজ-শূন্য করিল আমায়।

এইস্থলে এইরূপ মানের একটি উদাহরণ তুলিব—রসকাদম্বিনী হইতে নহে।

তৃতীয় মানে ঘোর বিপদ্—

মনে মনে সাধরে।
কে আগে সাধিবে বল, ঘটিল প্রমাদ রে।
নয়নেতে লাজ অতি, হৃদয় ব্যাকুল,
উভয়ে ত্যজিতে নারে মান অনুরোধ রে।

চতুর্থে, এ মানেও ঘোর বিপদ্ বটে কিন্তু কেবল এক-জনের।

ভুরু বাঁকাইয়া রই তথাপি অমনি সই
উতলা হইয়া আঁখি তারি পানে ধায় লো
চিত্ত ত কর্কশ করি তথাপি যে সহচরি!
অঙ্গ শিহরিয়া উঠে তার কি উপায় লো?
বাক্য-রোধ করি বটে তবু বিশৃঙ্খলা ঘটে
পোড়া মুখে হাসি পায় রাখা নাহি যায় লো,
যদি সে জনের সনে দেখা হয় তবে মেনে
মানের নির্বাহ করা ঘটে বড় দায় লো॥

তবে ইনি একলা মান করিতে চান? মানিনী বটে।

পঞ্চমে আর এক প্রকার মান, কেবল কান্না।

মান করে কি প্রকারে আনল সখীরা তারে
পূর্বে তাহা শিক্ষা দেয় নাই,
অঙ্গভঙ্গি বাঁকা কথা যে সব মানের প্রথা
নাহি জানে বালা কিছু তাই।
কান্তের প্রথম দোষে সে বালা কেবল রোষে
কি করিবে লাগিল কাঁদিতে,
অশ্রুধারা দর্দরে কপোল বহিয়া ঝরে
বন্যা যেন আসিল আঁখিতে।

সেই বন্যার জল যে বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দিয়াছে সেই জানে আদিরস কি। (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)

*

রিপুবিহার—শ্রীমহিমচন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত।

এখানি কাব্যগ্রন্থ। ভূমিকা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে—'সাহিত্য-সংসার-মধ্যে কাব্য একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান-স্বরূপ, তাহাতে বিমল পরিমল পরিপূরিত পদ-প্রসূনরাজী সর্বদা বিকশিত হইয়া সুরসিক ভাবুক ভ্রমণকারীর চিত্ত অনুরঞ্জিত করে। আমি একদা ভাবুক ভাবে ঐ মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কষ্টে তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি……' ইত্যাদি।

আর কি গ্রন্থের পরিচয় দিতে হইবে? যদি হয়, তবে একস্থান হইতে নিম্নলিখিত কয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিলাম।

> রিপুদল দুরাচার কদাচারে রত।
> বিষম বিলাসী—মতি না হয় বিগত॥
> প্রভুতা প্রভুত মান, করেছে প্রয়াণ।
> তাহাতে তাড়িত হয়ে মনে অভিমান॥
> বিশঙ্ক বিপক্ষগণ, বলিষ্ঠ প্রধান।
> সহজ ত 'নয় ভারী, বিজয় বিধান'॥
> কেমনে এমন ধনে, হইবে বিরত।
> অচির-উদিত-ভানু, চির অস্তগত॥
> বাসনা বিরোধ হেতু বিরোধীর সনে।
> ভাবিয়া ভয়াল দলে, ভয়োদিত মনে॥ ইত্যাদি

পাঠক কি ইহার কিছু বুঝিয়াছেন? না বুঝিয়া থাকেন, 'প্রভুতা প্রভুত' এবং 'ভাবিয়া ভয়াল দলে, ভয়োদিত মনে' পড়িয়া সুখী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা ইহা পড়িয়া বলিতে পারি যে, সাহিত্য-সংসার-মধ্যে কাব্য একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান-স্বরূপ; ইহাতে রিপুবিহার প্রভৃতি নানা প্রকার আগাছা জন্মে। আগাছাগুলি কাটিয়া আখা ধরানো গৃহস্থ লোকের কর্তব্য। (আষাঢ় ১২৮১)

*

রামোদ্বাহ নাটক—অর্থাৎ রামের সহিত সীতার বিবাহ-বর্ণন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত।

অশুভক্ষণে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণীত করিয়াছিলেন। ভরসা ছিল, বাঙ্গালার অঙ্গুলি-কণ্ডুয়ন-ব্যাধিগ্রস্ত মহাশয়েরা বিষয়াভাবে কাব্য-নাটক-রচনায় বিমুখ হইবেন। কিন্তু রামায়ণ থাকিতে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। রামের বিবাহ, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, রামের যুদ্ধ, কুশীলবের যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়াবলম্বন করিয়া অসংখ্য অপাঠ্য কাব্য-নাটকের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রে রত্ন আছে বলিয়া অধ্যবসায়শালী বাঙ্গালি কবিগণ অবিরত লোণাজল সেচিতেছেন। সম্প্রতি আর একখানি রামোদ্বাহ নাটক উপস্থিত। রামোদ্বাহ বলিলে কেহ যদি না বুঝিতে পারেন, এই জন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'অর্থাৎ শ্রীরামের সহিত সীতার বিবাহ বর্ণন।' আমরা গ্রন্থকারের নিকট বিশেষ বাধ্য হইলাম। পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ এই নাটক হইতে একটি কৌশল্যা-বিলাপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কৌশ—[কপালে করাঘাত করিতে করিতে] যা! আবার আমার কপালে একি হলো। মহারাজ এই কথা কইতে কইতে এমন হলেন কেন! (গাত্রে হস্তস্পর্শ করিয়া) শক্তমক্ত দেখ্‌ছি যে! কি করি! মহারাজ বুঝি পুত্র-শোকে প্রাণ পরিহার কল্লেন! (চরণস্পর্শ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) মহারাজ! আপনি গাত্রোত্থান করুন, আপনার ভূমিশয্যা কেন? এরূপ অবস্থাবলোকনে বিষবিন্দুর ন্যায় আমার নয়নে দরদরিত বারিধারা বরিষণ হচ্চে। হৃদয়বল্লভ! ত্বরায় গাত্রোত্থান করুন। আপনাকে নীতিশিক্ষা দেওয়া অবলাঙ্গনার বিধেয় নয়। আপনি এত কাতর হবেন না। অগ্রে প্রাণধন রঘুমণির তত্ত্বানুসন্ধানে সংখ্যাতিরিক্ত যুদ্ধোৎসাহী সেনাদিগকে পাঠাইয়া দিন; পরে যাহা কর্তব্যাকর্তব্য তাই কর্‌বেন—(চরণ পরিত্যাগ পূর্বক বাম গণ্ডে হস্ত দিয়া) আহা! গুণমণি রাম বিনা যেন আমাকে বৎসহারা গাভীর ন্যায় করেচে! আর তৃষিতা চাতকিনী যদ্রূপ কাদম্বিনী-সন্দর্শনে প্রফুল্লিতা হয়ে ঊর্ধ্বদৃষ্টে অবিরত চঞ্চুব্যাদান করিতে থাকে আমিও তদ্রূপ নীলমণির আসার আশায় রাজপথাবলোকন করিতে থাকি। আহা! আমার হৃদয়-আকাশে আর কি সে রামচন্দ্রের উদয় হবে! তিনি যে অস্তাচলে!—তবে বাঁচনে সুখ কি…

ত্রুটি কি? ইহাতে কপালে করাঘাত আছে, চরণস্পর্শ আছে, ভূমিশয্যা আছে, বিষবিন্দু আছে, হৃদয়বল্লভ আছে, চাতকিনী আছে, কাদম্বিনী আছে, নীলমণি আছে, নাই কি? যদি কিছুর অভাব থাকে, তবে এক 'আসার আশায়'

তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। সাধারণীর তেলেভাজা চাণাচুর কোথায় লাগে? (শ্রাবণ ১২৮১)

তারাবাই—ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

গ্রন্থকার গ্রন্থখানি বঙ্গমহিলাকে উপহার প্রদান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

'হয় যেন বঙ্গনারী সবে বীরাঙ্গনা
গঙ্গাধর শর্মণের একান্ত বাসনা।'

আমাদেরও একান্ত বাসনা যে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ সফল হয়। সুতরাং কর্কশ কঠিন সমালোচনায় কোমল করে প্রদত্ত উপহার-রত্নের আর গৌরব লাঘব করিব না। বাস্তবিক গ্রন্থখানিতে প্রশংসা অপ্রশংসার কিছুই নাই। বীররসপ্রধানা নায়িকা তারাবাই বলিতেছেন—নায়ককে বলিতেছেন—

'গুলঞ্চর পতিনিষ্ঠা দেখে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যেন আমি তার মতন অনন্ত বাহুশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, নারীজীবনের সার পতিরূপ সারাল নিমতরুকে চিরকাল বক্ষস্থলে ধারণ করি…'—এমন পিত্তনাশক উপমা কস্মিন্ কালে দেখি নাই!! (আশ্বিন ১২৮১)

৮০

'পূর্ণিমা'য় প্রাপ্ত ২৮খানি নির্বাচিত ও বর্ণমালানুক্রমে সজ্জিত মাসিক সাহিত্যের এবং

খ

কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত সমালোচন

ক

(বর্ণমালানুক্রমে)

উৎসাহ—এখানি একখানি এই বর্ষের নূতন মাসিকপত্র ও সমালোচন, বৈশাখ হইতেই প্রকাশিত হইতেছে, আমরা আষাঢ় হইতে কার্তিক-অগ্রহায়ণ (একত্র) সংখ্যা পর্যন্ত পাইয়াছি। ইহাতেও অনেকগুলি লেখক একত্র হইয়াছেন; উৎসাহ উৎসাহেই চলিতেছে। প্রতি সংখ্যার প্রথমেই 'অজ্ঞেয়বাদ' নামক বিজাতীয় দার্শনিক মত বিবৃত হইতেছে। কিন্তু কেন, কি উদ্দেশ্যে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ফল কথা উৎসাহের বাদীস্বর জান্ সুর যে কি তাহা ধরিতে পারিলাম না। কি সুরে যন্ত্র বাঁধিয়াছেন, তাহা ধরিতে না পারিলে প্রকৃত সমালোচনা চলে না। গুটিদুই ছোট কথা বলিতেছি।

ভাদ্রের উৎসাহে গাছপালার পচানি সারকে, ইংরাজির নামকরণানুসারে 'সবুজ সার' নাম দিয়া সেই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে। তাহাতে ইংরাজি হইতে অনেক কথা, কানপুর, নাগপুর, ডুমরাও প্রভৃতি স্থলের সরকারী কৃষিক্ষেত্রের কথা আছে, অথচ আমাদের দেশে যে ধঞ্চে ছিটাইয়া দিয়া চারাগুলা একটু বড় হইলে, গোড়া কাটিয়া দিয়া পচানি সার করা হয়, তাহার ভালমন্দ বিচার দূরে থাকুক, উল্লেখই নাই। ধঞ্চে লেগুমেন জাতীয় বটে এবং চাষারা উহাতে অঙ্গারজান কি পরিমাণে আছে, না আছে, তাহার কিছুই জানে না, কিন্তু পচানি সারের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

উৎসাহের কয়জন লেখকের পদ্য লিখিবার ক্ষমতা বেশ আছে, এখন যদি পদ্যের প্রাচীন রীতিনীতি বেশ মানিয়া চলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। সকল বিষয়েই স্বেচ্ছাচারে শক্তির হ্রাস হয়—এই কথাটি মনে রাখিতে পারিলেই ভাল।

উৎসাহের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার অবসরে আমরা বলিয়াছিলাম যে, 'উৎসাহের বাদীস্বর জান্ সুর যে কি তাহা ধরিতে না পারিলে প্রকৃত সমালোচনা চলে না। গুটিদুই ছোট কথা বলিতেছি।' উত্তরে মাঘের উৎসাহ বলিতেছেন, 'সরকার মহাশয় বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে আজকাল এ দেশ হইতে ওস্তাদি, খেয়ালাদি উঠিয়া গিয়া, জঙ্গলা রাগ রাগিণীরই প্রাধান্য হইয়াছে। মাসিক পত্রিকাগুলি সমস্তই জঙ্গলা রাগিণীতে বাঁধা, সাধাসুর তাহাতে প্রায়ই বাজিবার অবসর পায় না। দৃষ্টান্তের জন্য অন্যত্র যাইবার আবশ্যক নাই; বর্তমান সংখ্যায় পূর্ণিমায় বাঙ্গালির ইতিহাস প্রবন্ধ কোন্ সুরে বাঁধা, কেহ ধরিতে পারিয়াছেন কি?'

কোন প্রবন্ধ-বিশেষের সুরের কথা, অথবা লক্ষ্যানুসরণের প্রণালী-পদ্ধতির কথা, আমরা বলি নাই, সে ত চাই-ই, নতুবা প্রবন্ধই হইবে না। প্রবন্ধলেখকগণের নিকট

হইতে তাহা আমরা চাই, এবং অনেক সময় পাইও বটে। তাহা ছাড়া, মাসিক পত্রের সম্পাদকগণের উপর আমাদের কিঞ্চিৎ দাবি আছে। কোন এক মাসে যে প্রবন্ধগুলি একত্র বাহির হইবে, সেগুলির মধ্য দিয়া আমরা একখানি স্বর বলুন, সূত্র বলুন, প্রণালী বলুন, পদ্ধতি বলুন, কোন একটা বন্ধনী থাকা—আমরা দেখিতে চাই। ঐ পৌষ মাসেই, নব্যভারতকে উপলক্ষ করিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, 'প্রতি মাসে নানাবিধ সুপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে থাকে, তবে কোন বিশেষ সূত্রে সেগুলি গাঁথিবার চেষ্টা নব্যভারতে নাই। প্রবন্ধগুলি রুচি-বিরুদ্ধ বা নীতি-বিরুদ্ধ না হইলেই সম্পাদক পত্রে স্থান দান করেন।' কোন একখানি স্বরে বাঁধা, কোন একরূপ সূত্রে গাঁথা, মাসিকপত্র আমরা দেখিতে চাই। ভারতীর স্বর আছে—ক্ষীণ বটে। বামাবোধিনীর স্বর আছে—সহজ বটে। সমাজ ও সাহিত্যের স্বর—নাম সঙ্গত। সনাতন ধর্মকণাও তাহাই। সাবিত্রীর স্বর আছে স্পষ্ট—পন্থার আছে অস্পষ্ট। ফল কথা অনেক মাসিকেরই ক্ষীণ হউক, হীন হউক, স্পষ্ট হউক, অস্পষ্ট হউক, স্বর আছে। এতকালের প্রবীণ উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র নব্যভারতের নাই, সে এক মহা দুঃখ, মহা কষ্ট। আর তোমরা নবীন 'উৎসাহে' 'প্রদীপ' হস্তে অবতীর্ণ, তোমাদের থাকিবে না কেন?

জঙ্গলার প্রাধান্যের কথা ভুলিব কেন? কিন্তু জঙ্গলা রাগিণীর জান্ নাই, এ কথা মানি না। বাঙ্গালি, কখনই ধ্রুপদী বা খেয়ালী নহে। বাঙ্গালা বহুদিন হইতেই জঙ্গলা। তা বলিয়া কি বাঙ্গালির জান্ নাই—প্রাণ নাই? তাও কি কখনও হয়? 'ওস্তাদি খেয়ালাদি' উঠিয়া গিয়াছে। কীর্তন ত আছে! হয় হউক, কীর্তন জঙ্গলা, কীর্তনের জান্ ত আছে, প্রাণ ত আছে। তবে বাঙ্গালির থাকিবে না কেন, বাঙ্গালির মাসিক পত্রগুলি জঙ্গলা বলিয়া, সেগুলির জান্, প্রাণই বা থাকিবে না কেন? আর বিশেষ বিশেষ প্রণালী-পদ্ধতিই বা থাকিবে না কেন?

এখন সামঞ্জস্যের নাম করিয়া, বৈচিত্র্যের দোহাই দিয়া, নানাবিধ 'অসামঞ্জস্য' সামগ্রী একত্র সমাবেশের চেষ্টা হইতেছে বলিয়াই আমাদিগকে এত কথা বলিতে হইতেছে। পূর্বে ছোটবড় সকলেই আপনার বিশেষত্ব আপনি রাখিতে পারিত; অনেকেরই একটু-আধটু নিজস্ব ছিল। যাত্রার দল, চিরকালই জঙ্গলা, কিন্তু তবু মদন মাস্টারের ভৈরবী জান্, গোপাল উড়ের কালাংড়া জান্, এইরূপ অনেকেরই কিছু-না-কিছু ছিল। এখন কিন্তু বৈচিত্র্যের দোহাই দিয়া জান্ নষ্ট করা হইতেছে। দেখুন, মতিলাল রায়, রসিকমোহন প্রভৃতির প্রবল দল। অনেক বালক সুকণ্ঠ, সুরে তালে পটু, ভাল ওস্তাদের কাছে শিক্ষিত। গায়ও ভাল—কিন্তু পালার সুরের গাঁথুনি নাই। একখানি খেয়াল-ভাঙ্গা সুর, তার পরের গানেই মনসার গানের সুর। আমাদের নবীন মাসিক পত্রের কয়েকখানির সেই দশা হইতেছে দেখিয়াই দুঃখ করিতেছি। একবার যদি বিজ্ঞ সম্পাদকগণ স্বর বাঁধিয়া দল গুছাইয়া লন, তাহা হইলে আর আমাদের এই গুরুতর বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইতে হইবে না।

*

উদ্বোধন—ধর্ম ও দর্শনের দিকে যেন বাঙ্গালির একটু খর দৃষ্টি পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পত্র উদ্বোধন। থিয়সফির পত্র পন্থা। ভারত ধর্মমহামণ্ডলের মাসিক মুখপত্র ধর্মপ্রচারক। ধর্মপ্রচারক আটাইশ বৎসরের কাগজ, এখন ভারত ধর্মমহামণ্ডলের মুখপত্র হইয়াছেন।

উদ্বোধনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত প্রতি সংখ্যায় থাকে। থাকাই চাই। আরও বেশি বেশি থাকিলে ভাল হয়। ও-সুধামাখা কথা যত অধিক থাকে, ততই ভাল। অমন জীবনী ত আর দেখিলাম না। আমরা প্রবৃত্তি-বশে এই পঞ্চাশ বৎসরে বহুতর ভদ্র-অভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গৃহি-সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি; কিন্তু পরমহংসদেবের মত মানব দেখি নাই। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়াতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (বা চিরঞ্জীব শর্মা) ব্রাহ্ম মহাশয়ের কৃপায়, এক দিন আট ঘণ্টাকাল, পরমহংস দেবের সাক্ষাৎ পাই, অর্ধঘণ্টা আলাপ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেই অধম জীবন সার্থক মনে করিতেছি। এতটা সাত্ত্বিক ভাব আর কোন মানবে দেখিয়াছি, মনে হয় না। তাঁহার কথামৃতচরিত নিয়ত নিস্যন্দিত হউক, এই উত্তপ্ত বঙ্গভূমিতে শান্তি দান করুক—ইহাই মনের বাসনা।

*

উপাসনা—এবার একখানি সুন্দর মাসিক পত্রের তিন সংখ্যা আমরা নূতন পাইয়াছি। আমার পক্ষে একেবারে নূতন, আমি পূর্বে কখনও উপাসনার চেহারা পর্যন্ত দেখি নাই। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যাহার কর্ণধার, রাজশ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র যাহার স্বত্বাধিকারী, সে মাসিক পত্র যে ভাল হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু কেবল নাম-ডাকের জন্য ভাল বলি না,—প্রবন্ধগুলি বেশ লেখা, বিশেষ বঙ্কিমবাবুর বিশেষত্ব প্রবন্ধ বড়ই ভাল লাগিল। তবে উপাসনার কোন বিশেষত্ব আছে কিনা, এই তিন সংখ্যা দেখিয়া কিরূপে বুঝিব? প্রার্থনা করি, যেন বিশেষত্ব থাকে; এবং উপাসনা ফুলের তোড়া না হইয়া, ফলের বাগান হয়।

উপাসনা—পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এখনও বুঝিতে পারি নাই, উপাসনার গতি কোন দিকে। একস্থানে পড়িলাম—'উপাসনা পত্রিকা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য পরিচালিত হইয়া থাকে; এইজন্য উপরি উদ্ধৃত ইংরাজিটুকুর অনুবাদ না দিলেও চলিতে পারে।' এখানে শিক্ষিত অর্থ ইংরাজিতে শিক্ষিত। কেবল ইংরাজি শিখিতে কি এত বেদান্ত-বিচার, 'পরলোক রহস্য' এবং 'দেবতা ও মানুষ' লইয়া কাল কাটাইতে পারেন? আমাদের বোধ হয় পারেন না। নতুবা উপাসনা সুন্দর হইয়াও তেমন আদর পান নাই কেন?

উপাসনা—পৌষ মাঘ—মাঘ মাসে মুদ্রারাক্ষসের সুদীর্ঘ সমালোচনা, বোধ করি, শেষ হইল। সমালোচনা সমীচীন, তবে মুদ্রারাক্ষসের সময়-নির্ণয় করিতে গিয়া লেখক অনর্থক একটু অধিক পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন; যাউক তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু শকুন্তলার নিন্দাকল্পে উপসংহারে যে একটা কথা বলিয়াছেন, তাহা না বলিলেও চলিত। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল প্রভৃতি আদিরসপূর্ণ নাটকাপেক্ষায় নীতিপ্রধান বীররসপূর্ণ নাটকের অধ্যাপনা যে সমীচীন এবং মঙ্গলকর তাহা হয়ত অনেকেই স্বীকার করিবেন।' গেটে এবং রবীন্দ্রনাথ—তোমরা এইবার রসাতলে যাও।

*

এডুকেশন গেজেট—১৩০৪ শ্রাবণের কয় সপ্তাহ শব্দ-সমালোচনা হইতেছে। পাঠ করিয়া, আমাদের পুরাতন গল্প সকল মনে পড়িল। 'হা! বড়া' বলিয়া বৃদ্ধারমণীর চীৎকার, শস্যগুলি 'কাল্ কাটা' বলিয়া সাহেবের নিকট কৃষকের পরিচয়-দান ইত্যাদি কথা অনেকেই অবশ্য জানেন। আবার হয়ত কেহ কেহ এরূপ গল্পও শুনিয়া থাকিবেন যে ছোটভাই বিদ্যালয়ের ছাত্র, কিছু উপর-চালাক। নিয়তই দাদাকে প্রশ্ন করে, এটা কেন হইল; ওটা কেন এরূপ হইল? দাদা ব্যতিব্যস্ত। একদিন সেই ছোটভাই সেই দাদাকে প্রশ্ন করিল, 'দাদা আমাদের গ্রামের নাম আগড়পাড়া হইল কেন,?' দাদা বুঝাইয়া দিলেন—'দেখ্‌ছ না ভাই! একদিকে খড়দা, ওদিকে এঁড়েদা—কাজেই মাঝে আগড়পাড়া না থাকিলে খড় থাকে কৈ ভাই?' আমাদের কিশোর জীবনের একদিনের গল্প একটাও এইখানে বলি। তখন আমরা এণ্ট্রান্স শ্রেণীতে পড়ি, বয়স্ ১৫ বৎসর। হেডমাস্টার টি. পি. মানুয়েল সাহেব, জাতিতে আরমানি। ইংরাজি, ফরাসি ছাড়া, বাঙ্গালা, হিন্দী, পারসী, আরবী, আরমানি প্রভৃতি এশিয়ার অনেক ভাষা জানিতেন। আমাদের (ছাত্রদের) সঙ্গে অতি আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিতেন। আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পানফল' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? আমি ইংরাজি বিদ্যালয়ের 'বুদ্ধিমান্' ছাত্র কাজেই কিঞ্চিন্মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া অমনই বলিলাম—'পানের মত আকারের ফল।' তিনি বলিলেন, 'পানের আকারে ও পানফলের আকারে কি সাদৃশ্য আছে?' আমি বলিলাম, 'আমাদের দেশে পানের খিলি যেরূপ আকারে সচরাচর প্রস্তুত হয়, পানফলের আকার ঠিক তাহার অনুরূপ।' বস্ চুকিয়া গেল। আমার মনে রহিল, বেশ করিয়া সাহেবকে শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝাইয়াছি। এখন, সেই সময়ে পিতৃদেব ৺পূজাবকাশে বাটীতে ছিলেন, সন্ধ্যার সময় তিনি আমার মুখে এই গল্প শুনিয়া বলিলেন, 'সমস্তই ভুল বলিয়াছ, পানফলের ব্যুৎপত্তি পানি-ফল = জলের ফল।' তখন আমি লজ্জিত হইয়া হেটমুখ হইলাম। নিজ জীবনের প্রৌঢ় কালের একটি কথা এই সঙ্গে বলি। নিজের শ্লাঘার জন্য

নহে, যে কথাটা বুঝাইবার জন্য এত কথা লিখিতেছি—সেই কথাটার জন্যই গল্পটা বলা। স্বর্গীয় ভূদেববাবু এডুকেশন-গেজেটে, 'যবেস্থবে' কথার ব্যুৎপত্তি জিজ্ঞাসা করেন। কতলোকে কতকি যে বলিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই। শেষে আমরা বলি, 'ন যজৌ ভাবে ন তস্থৌ ভাবে' হইতে 'যবেস্থবে' কথাটা হইয়াছে—তাহাই তিনি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন।

৮ই শ্রাবণের এ. গেজেটে একজন পত্রপ্রেরক লেখেন যে বাঙ্গালা ভাষার ব্যুৎপত্তির সমালোচন হওয়া ভাল, হইলে অক্লেশে বালকদিগের জন্য বেশ একখানি 'সাহিত্যামোদ-প্রদ' পাঠ্য-পুস্তক হইতে পারে। এই ভূমিকার পর, 'হাড়পেকের বোঝা,' 'অস্থিত পঞ্চম,' 'মচ্ছি ভঙ্গ,' প্রভৃতি কয়েকটি চলিত কথার ব্যুৎপত্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং পরের গেজেটে দুইজন পত্রপ্রেরক প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছেন। সেই উত্তরগুলি পড়িয়াই আমাদের হাবড়া-কাল-কাটার গল্প মনে পড়িয়াছিল। যেরূপ জ্ঞান, গরিমা, চিন্তাশক্তি থাকিলে, বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি-সমালোচনায় কথঞ্চিৎ অধিকার হইতে পারে, তাহার কিছুরই পরিচয় পত্র-প্রেরকদ্বয়ের পত্রে পাওয়া যায় না। উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি। 'হাড়পেকের বোঝার' দুইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। 'পাকা হাড়ের বোঝা।' —হাড়ো (নামক) পাইকের বোঝা। দ্বিতীয় অর্থটি বিশদ করিবার জন্য হাবড়ার মত একটি গল্প আছে। কিন্তু 'পেকে' যে কৃষক-দিগের নিত্য ব্যবহার্য মাথা হইতে গাপর্যন্ত ঢাকিবার একটা জিনিস—সে জ্ঞানই পত্রপ্রেরকের নাই। সেটা প্রকৃতই একটা বোঝা ; তাহার উপর হাড়ের মত হইলে, নিতান্ত অসহনীয় বোঝা হইয়া পড়ে। কাজেই 'হাড়পেকের বোঝা।' অর্থ অতি সহজ। 'জরাজীর্ণ দেহ ভার'ও নয় —অতিরিক্ত পরিশ্রমের কার্যও নয়। কেবল মাত্র গুরুভার।

'অস্থির পাটীগণিত', 'অস্থির পঞ্চক'—পাটীগণিতের একপ্রকার অঙ্ক। 'অস্থির পাটীগণিত' ইংরাজিতে Arithmetic of Infinites. 'অস্থির পঞ্চক' Indeterminate Equation ; চারিজন সন্ন্যাসীর রুটি খাওয়ার অঙ্ক —অস্থির পঞ্চক। অস্থির পঞ্চককে কখন কখন অস্থিত পঞ্চমও বলে। এরূপ কোন কথার উল্লেখ না করিয়া পত্রপ্রেরক 'পঞ্চম' অর্থ 'পঞ্চম স্বর' ধরিয়া লইয়া—ফের এক হাবড়ার গল্প দিয়াছেন। সেইরূপ 'মচ্ছি ভঙ্গে' মচ্ছি অর্থ মৎস্য ধরিয়া লইয়া ডানাভাঙ্গা মৎস্য আনিয়া একরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু 'মচ্ছি ভঙ্গ' বা 'মস্তিভঙ্গ' অর্থ বিমর্ষ বা মর্ষভঙ্গ মাত্র।

শব্দের ব্যুৎপত্তির রীতিমত আলোচনা হয় ভালই, কিন্তু এরূপ সমালোচন-বিড়ম্বনা না হওয়াই ভাল। ছেলেপিলে ইংরাজির কল্যাণে এমনই ভয়ানক ডেঁপো হইতেছে, তাহার উপর এই সব অপশিক্ষায় একেবারে অসার অকর্মণ্য হইবে। এডুকেশন গেজেটের পরিচালকগণকে একান্ত অনুরোধ, তাঁহারা যেন আর একটু দেখিয়া শুনিয়া, এরূপ আলোচনা পত্রস্থ করেন। অলমতি বিস্তরেণ।

*

কৃষক—আষাঢ় পর্যন্ত। ভাল চলিতেছে বলিতে হইবে। এই উপলক্ষে এই সময়ে একটা কথা বলিতে চাই। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি বিষয়ে কেবল সাধারণ ভাবে প্রবন্ধ না লিখিয়া, মধ্যে মধ্যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রের বা কারখানার বা কারবারের বিবরণ দিলে ভাল হয়। অমুক—অমুক স্থানে ২০০ বিঘা জমি লইয়া চাষ করেন, জমির খাজানা এত, সরঞ্জামি এত, মাসিক খরচ এত, প্রথম বৎসরে লোকসান, দ্বিতীয় বৎসরে, তথৈবচ—তৃতীয় বৎসরে খরচ উঠিল, সুদ পোসাইল না। এত টাকার অমুক কারবারে পরিদর্শনের অবহেলায়, চুরি হইল—কারবার নষ্ট হইল। এই সকল কার্যে এখন লাভের অপেক্ষা লোকসান বেশি ; তা বলিয়া দমিত হইবে না। তবে লোকসানের ইতিহাস রাখিতে হইবে, নতুবা শিক্ষা হইবে কি করিয়া। বাঙ্গালিকে অগত্যা যখন কৃষিতে যাইতে হইবে, তখন কৃষির ক্ষতির ইতিহাস দিন থাকিতে শিক্ষা করা ভাল।

*

চুঁচুড়া বার্তাবহ-এর অফিসের পার্শ্বে বারিকে কাছারি আসিল। অথচ বার্তাবহ 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতি অবলম্বন করিলেন। দুর্ভাগ্য !!

জাহ্নবী—ফাল্গুন পর্যন্ত। জাহ্নবী, কেন বলিতে পারি না, এ বৎসর বড় পিছাইয়া পড়িয়াছিল; এখন যে শুধরাইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। পৌষের জাহ্নবীতে **'শব্দসিন্ধু'** অভিধানের পরিচয় পাইয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত দেশজ, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, হিন্দী, পোর্টুগিজ, ডেনিস্, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজি প্রভৃতি যাবতীয় শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, অর্থ, শিষ্ট-প্রয়োগ-সম্বলিত বাঙ্গালা অভিধান; শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ-সঙ্কলিত। প্রকাশক মেসার্স বি. ব্যানার্জি এণ্ড কোং। মূল্য ১৷৹।' পাঁচ সিকায় যে এমন একখানি অভিধান পাওয়া যায় তাহা শুনিলেও আহ্লাদ হয়। প্রবন্ধে এই অভিনব অভিধানের সমালোচনা ও পরিচয় দেওয়া আছে। অধুনা অপ্রচলিত শব্দের পরিচয়ে—'ওতু' শব্দ দেওয়া হইয়াছে। অর্থ বিড়াল। আমরা জানি বিড়াল অর্থে ওতু শব্দ সংস্কৃত—তবে আবার অধুনা অপ্রচলিত কি? 'টিটি'—প্রচারিত, পরিজ্ঞাত। সমালোচক বলিতেছেন কথাটি খারাপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়—Famous নহে Notorious. আমরা বলি, তাহা নহে। ভালমন্দ দুই অর্থেই ব্যবহার হইতে আমরা অনেক বার শুনিয়াছি। গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ মহাশয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বৃহৎ সরোবর কাটাইয়া দেন। 'চারিদিকে টিটি পড়িয়া গেল।' অর্থাৎ চারিদিকে তাঁহার যশ ঘোষিত হইল। 'টিটি' বোধ করি 'ডিণ্ডিম' শব্দ হইতে

ধর্ম্ম প্রচারক এখন ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের পত্র। ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল আমাদের ভয়ের বিষয়। আমাদের ভয় বাড়িয়াছে All-India Doputation-এ—ধর্ম্ম মহামণ্ডলে রাজনীতির চর্চা কেন? ভয় বাড়িয়াছে চৈত্র সংখ্যার (তাহার পর আর পাওয়া যায় নাই) শুভ সংবাদে; শুভ সংবাদ কি জানেন—৺ কাশীধামে খরিদ-বিক্রয়ে বড় প্রতারণা। যাহাতে কি কাশীবাসী জনসাধারণ, কি মফস্বল-বাসী, কি স্থানীয় রহস্যানভিজ্ঞ যাত্রিবর্গ, কাশীবাসী ব্যবসায়ীর দ্বারা প্রতারিত না হন, সেই উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম সভা সমিতি কার্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। কি সর্ব্বনাশ! এ যে ব্যবসার বিজ্ঞাপন!! ভয় বাড়িয়াছে,—বর্ণ-নির্ণয় প্রবন্ধে। কেন বলিতেছি। বঙ্গের কায়স্থ বঙ্গের ব্রাহ্মণের সেবক অথচ রক্ষক; এই মোটা কথাটা কায়স্থ ব্রাহ্মণ উভয়েই ভুলিয়া যাওয়াতে বাঙ্গালায় বিষম বিড়ম্বনা উপস্থিত। প্রবন্ধে সেই বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাহাতেই আরও ভয়।

ধর্ম্ম প্রচারক—(আশ্বিন) হইতে নবদ্বীপ সমাজের অনুষ্ঠান-পত্র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ নবদ্বীপ সমাজে যোগ দিলে মহতী কীর্ত্তি স্থাপিত হইবে। আমরা স্বদেশ চিনিতে পারিব।—

'আমাদেয় বর্ণাশ্রম সমাজ রক্ষা করিতে হইলে, ব্রাহ্মণ রক্ষার উপায় বিধান করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইলে বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষা হইবে; কেন-না সমুদয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই ব্রাহ্মণের অধীন। ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু, অধিনায়ক এবং সৎপথের প্রদর্শক। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরাও প্রায়শঃ ধনহীন ও আশ্রয়হীন হইয়া এবং কচিৎ বা লোভাদির বশীভূত হইয়া সমাজ-রক্ষা-বিষয়ে শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রব্যবসায়িগণের মধ্যে একতার হানি হইয়াছে, এবং তাহার ফলে অনেকেই জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সামাজিক বিশৃঙ্খলার সহায়তা করিতেছেন। এই স্বাতন্ত্র্যের এবং বিচ্ছিন্ন ভাবের প্রতিকারার্থে প্রথমতঃ শাস্ত্রব্যবসায়িগণের মধ্যে একতা স্থাপনের চেষ্টা করাই নবদ্বীপ সমাজ প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রাধ্যাপক মহাশয়গণ সমাজ-গুরু-স্বরূপে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এবং স্ব স্ব মর্য্যাদা রক্ষায় যত্নশীল হইলে ক্রমশঃ সমাজ-প্রবিষ্ট সমস্ত দোষেরই পরিহার হইবে—এ আশা দুরাশা নহে। সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া শাস্ত্রব্যবসায়ী কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি বঙ্গদেশের সকল স্থানের অধ্যাপক মহাশয়দিগকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যিনি যে স্থানে থাকিয়াই প্রাচীন রীতি অনুসারে স্বাধীন ভাবে শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছেন, তিনি এই নবদ্বীপ সমাজভুক্ত হউন এবং সকলে মিলিয়া বঙ্গদেশে বর্ণাশ্রম সমাজের প্রকৃত অধিনায়কতা করুন, ইহাই বাঞ্ছিত এবং প্রার্থনীয়। সামান্যাকারে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার যাহাতে উৎকর্ষ হয়, স্ব স্ব সম্প্রদায়বিহিত সদাচারের সুপ্রতিষ্ঠা হয়,

সদ্‌ব্রাহ্মণগণের তপস্যার সুযোগ হয়, ব্রহ্মচর্যের পুনঃপ্রবর্তন হয় এবং বেদবেদাঙ্গের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিধান হয়—তদর্থেই নবদ্বীপ সমাজ সর্বতোভাবে যত্নবান্‌ হইবে। যিনি স্বকীয় অভ্যুদয়, সমাজের মঙ্গল এবং ধর্মবিদ্রোহ ও সমাজ-বিদ্রোহের বারণ ইচ্ছা করেন তিনি এই লোকহিতকর কার্যে অগ্রসর হইবেন।'

*

নব্যভারত—১৫শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩০৪। আমাদের ধন্যবাদের পাত্র এই নব্যভারতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। অন্য গুণপনার কথা ধরি না, অন্য কৃতিত্বের কথা আজি বলিতেছি না, নব্যভারত যে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল ইহাই দেবীপ্রসন্নের প্রধান কৃতিত্ব। এই চিরস্থায়ী দারুণ দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে, সাহিত্য-সেবকগণের অবসাদ-ক্ষেত্রে* সাহিত্যপ্রিয়গণের বিষাদ-ধ্বনি-মধ্যে এক দেবীপ্রসন্নই মুখরক্ষা করিতেছেন; আবার বলি, তিনি আমাদের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

নব্যভারত—ভাদ্র ও আশ্বিন (একত্র), কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যা। নব্যভারত উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র, প্রতিমাসে নানাবিধ সুপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে থাকে। তবে কোন বিশেষ সূত্রে সেগুলি গাঁথিবার চেষ্টা নব্যভারতে নাই। প্রবন্ধগুলি রুচি-বিরুদ্ধ বা নীতি-বিরুদ্ধ না হইলেই সম্পাদক পত্রে স্থান দান করেন। তিনি স্বয়ং লিপিকুশল, কিন্তু তাঁহার রচনা-বৈচিত্র্য আজিকালি নব্যভারতে প্রায়ই দেখা যাইতেছে না। বড়ই উৎসাহে-সাহসে, আশায়-আকাঙ্ক্ষায়, উদ্যমে-উদ্যোগে—দেবীপ্রসন্ন সংসার-ক্ষেত্রে এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, কিন্তু নানাদিকে তিনি বিড়ম্বিত হইয়াছেন। হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতকগুলি হিন্দু-সন্তান, ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি সাধু সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন, এইরূপ একটা ধারণা; এক সময়ে অনেক ভদ্র সন্তানের মনে উদয় হইয়াছিল। এই ধারণা একটি বিষম বিড়ম্বনা। অনেকের সঙ্গে যুবা বয়েসেই দেবীপ্রসন্ন এই বিষম বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত। স্বয়ং সরল ও সত্যপ্রিয়, তাঁহার সাধের সমাজে চারিদিকে কপটতা, মিথ্যাচার, অনাচার, ভ্রষ্টাচার দেখিয়া দেখিয়া, দেবীপ্রসন্ন সংসার বিষময় বোধ করিতেছেন। সেই বিষ স্বয়ং সেবন করিতেছেন এবং নব্যভারতে সেই বিষ উদ্গিরণ করিতেছেন।

ভাদ্র আশ্বিনের সংখ্যায় 'কি লিখিব' প্রবন্ধে, রাজ-নৈতিক বিভ্রাটের পরিচয় এবং ক্রোড়পত্রে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কীর্তিকলাপের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ; কার্তিকের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর পঠিত 'ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধের ভূমিকায়, সেই কীর্তির আবার পুনরুক্তি, আর অগ্রহায়ণের সংখ্যায়, 'দেশের উপরকার দশজনের' উপর আক্রোশ। এই সমস্ত প্রবন্ধই উদ্গিরিত বিষ—বিষ—হলাহল। দেবীপ্রসন্ন সংসারে দেখিতেছেন বিষ, সংসার হইতে লইতেছেন বিষ, আর সাহিত্যপত্রে বিস্তার করিতেছেন—সেই বিষ। দেবীপ্রসন্নের মত সরল সত্যনিষ্ঠ লোকের এরূপ পরিণাম অতি শোচনীয়। সংসার বিষময় নয় রে ভাই! বিষময় নয়! সংসারে বিষ আছে বৈকি! কিন্তু সে ঔষধের জন্য। সমস্ত বিষেই কি ঔষধ হয়? তা হয় না, জানি। কিন্তু করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়।

---

* এই অবসাদের বর্ণনা নব্যভারতের এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ 'বিয়োগ যোগ' হইতে উদ্ধৃত হইল। ভাষার জন্য সত্যসত্যই দেবীপ্রসন্নের হৃদয় কাঁদে, সেই দেবীপ্রসন্নের ভাষা এই স্থানে জ্বলন্ত হইয়াছে।

'বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন এবং প্রচার, অক্ষয়চন্দ্রের নবজীবন, যোগেন্দ্রনাথের আর্যদর্শন, কালীপ্রসন্নের বান্ধব, রবীন্দ্রনাথের সাধনা,—এ সকল প্রধান পত্রের তিরোধানের কারণ, গ্রাহকগণের অসীম দয়া! চন্দ্রনাথ আজ স্কুলপাঠ্য লেখেন পাঠকগণের অসীম দয়ায়; কেন-না শুনিয়াছি, যে-শকুন্তলা-তত্ত্বের জন্য তিনি দেশ-বিখ্যাত সেই শকুন্তলা-তত্ত্বের প্রথম সংস্করণের শত খণ্ড পুস্তকও বিক্রীত হয় নাই! অক্ষয়চন্দ্র ও হেমচন্দ্র আজ সাহিত্য-ক্ষেত্র পরিতাপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যোগেন্দ্রনাথ ডেপুটীগিরি করিতেছেন, রজনীকান্ত, চন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ স্কুলপাঠ্য লিখিতেছেন, কালীপ্রসন্ন, ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং নবীনচন্দ্রের সাহস এবং বুকের বল অধিক, তাই তাঁহারা সহ্য করিয়াও, রাশি রাশি অর্থ ঢালিয়াও মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন! ঠাকুরদাস অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া চাকরীর উমেদারী করিতেছেন, জ্ঞানেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র চাকরীতেই সুখী হইতেছেন!'

আর সেই চেষ্টাই চেষ্টা। 'উপরকার দশজন' লইয়া সমাজ হয় না। 'উপরকার দশজনে' কোন সমাজেরই কিছু করিতে পারে না। স্পষ্ট করিয়া বুঝ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা এইরূপ দশজনে হিন্দু-সমাজের কিছু করিতে পারেন কি? কিছুই পারেন না। যাঁহারা সেলুনে চড়েন, তাঁহাদের লইয়া হিন্দু-সমাজ নহে, যাঁহারা ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসে চড়েন, তাঁহাদের দ্বারাও হিন্দু-সমাজের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ওরে ভাই! এই ইণ্টার্মিডিয়েট আর থার্ড ক্লাস লইয়াই সমাজ। ইহারই মধ্যে দেখিবে সদাচারী, স্বধর্মরত, মিতব্যয়ী, সংযমী মহাপুরুষ সকল নীরবে বিরাজ করিতেছেন। হিন্দুর হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। সনাতন ধর্মিগণ চিরদিনই থাকিবে। সনাতনে বিশ্বাস করিয়া হিন্দু রাজার ভ্রূকুটি, কৃতবিদ্যের চীৎকার, দশের অনাচার—সকলই সহ্য করিবে। যে যত সহ্য করিতে পারে, সে তত মনুষ্য-নামের যোগ্য। হিন্দু সকল জাতি অপেক্ষা সহিষ্ণু, এই জন্য হিন্দু মহাপুরুষ, তুমি মহাবংশজাত হইয়া দুদিনের জ্বালায় ছটফট্ করিবে কেন?

পন্থা—এখানি ধর্মপ্রধান মাসিক পত্র। অবতরণিকার উপসংহারে অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার লিখিয়াছেন, 'আমরা সাধ্যানুসারে ধর্মের নিগূঢ় সত্যগুলি সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিব।...এবং যাহাতে লোকের মন হইতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণভাব তিরোহিত হইয়া সনাতন হিন্দু ধর্মের উদারভাব উদয় হয় সাধ্যানুসারে তাহার যত্ন করিব।'

পন্থার মলাটের উপর প্রতিমাসেই পঞ্চকোণী যন্ত্রচিহ্ন থাকে। আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে—উহা কি সাম্প্রাদায়িক চিহ্ন নহে? বাস্তবিক মানুষ মনে করিলেই সাম্প্রদায়িকতার হাত এড়াইতে পারে না। সকল সম্প্রদায় এক করিবার বা সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট করিবার চেষ্টা সনাতন ধর্মে নাই, কখন ছিল না, কখন হইবে না। তবে অন্য সম্প্রদায় সকল কিছু নহে, তাহাদের দ্বারা কোন কাজ হয় না, এরূপ বিশ্বাস সনাতন ধর্মীরা করেন না, কাজেই অন্য সম্প্রদায়ের লোককে ঘৃণা করেন না। সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট করিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বই থাকে না। যেমন তোমাতে আমাতে বিভেদ স্বাভাবিক, তেমনই এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বিভেদ স্বাভাবিক। যে কোন শক্তিমান্ পুরুষ সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট করিতে গিয়াছেন, তিনিই একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। সনাতন ধর্ম উদার বটে—সঙ্কীর্ণ নয় বটে—কিন্তু তবু ইহার বিশেষত্ব আছে বৈকি; সেই বিশেষত্বই ইহার সাম্প্রদায়িকত্ব। তাহা এড়াইবার উপায় নাই। এড়াইবার চেষ্টাও করিতে নাই।

পন্থার প্রকরণ-পদ্ধতি-সম্বন্ধে দুইএকটি কথা বলিবার আছে—

এই যে ধারাবাহিকরূপে 'মৃত্যু-রহস্য' প্রকাশিত হইতেছে, উহা কি বাস্তবিকী ঘটনা? না ইংরাজি হইতে ভাব-সংগ্রহ? সকল প্রবন্ধেই নাম দেওয়া আছে, এইগুলিতে কেবল 'শ্রীভঃ' বলিয়া সঙ্কেত আছে। আর লেখক নিজেই বলিয়াছেন, তিনি পাত্রপাত্রীদের নামধাম পরিবর্তন করিয়া লিখিতেছেন; আবার জিজ্ঞাসা করি ঘটনাগুলি কি প্রকৃত? মনুষ্যের সূক্ষ্ম দৃষ্টি হইলে, মনুষ্য-চিন্তা সকল কি অবয়বিরূপে দেখিতে পাওয়া যায়? 'শ্রীভঃ' নাকি সেইরূপ দেখিয়াছেন, তাহাতেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

আর একটি কথা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ধারাবাহিকরূপে 'অলৌকিক ঘটনাবলী' লিখিতেছেন। অলৌকিক ঘটনায় আমাদের দেশের সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর লোকের অতিরিক্ত বিশ্বাস আছে—এত আছে যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ বুঝানো দায়। যিনি ন্যায়শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়, কারণের কারণত্বের সম্বন্ধে তিনঘণ্টা বিচার করিতে পারেন, তিনিও অলৌকিক ঘটনায় অতিরিক্ত বিশ্বাসী। অবতরণিকায় লেখা হইয়াছে 'অন্ধ বিশ্বাস ধর্মের অবনতির কারণ।' তাহা যদি হয়, তাহা হইলে, অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা ছাপার অক্ষরে দেখিয়া সেই অন্ধ বিশ্বাস কি আরও বাড়িবে না? আমরা বলি যাহাতে দেবতা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়, এমন সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলে ভাল হয়—সিন্দুরেপটীর পেতনীর কথা আর কেন?

পন্থা—ভাল। যাহাতে আরও ভাল হয় সেই জন্য

আমরা যথাসাধ্য সৎ পরামর্শ প্রদানের চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

পন্থা—পৌষ—মালভূমিতে নহে, সমতল ভূমিতেও নহে, নিম্ন বন্ধুর ভূমিতে। আবার স্থানে স্থানে দেখিলাম রত্নকণিকা, সাধনা, হিন্দুধর্ম প্রভৃতি স্থলে নীতির রাজপথ গ্রাণ্ডট্রঙ্কের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। যতক্ষণ না ওভরসিয়ারের রিপোর্ট পাইতেছি ততক্ষণ চুপ করিয়া থাকিব।

*

পল্লীচিত্র—২য় বৎসরের ১ম সংখ্যা ও ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ও আশ্বিনের। বাগেরহাট হইতে প্রকাশিত। এই ক্ষুদ্র পত্রিকা রত্নকণিকা। ভাবে ভাষায় অনেক স্থলে কাঁচা হাতের পরিচয় থাকিলেও, সম্পাদক, প্রকাশক ও লেখকগণের উদ্যম, উদ্যোগ, সাহস এবং যত্নের প্রশংসা একমুখে করা যায় না। ইহার উপর যদি নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় থাকে, অগ্রে শিক্ষা করিয়া তবে শিক্ষা দিব—এই জ্ঞান যদি বলবৎ থাকে, তবে ভরসা করা যায়, পল্লীচিত্র দুইচারি বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার পল্লীমধ্যে সৎশিক্ষা-বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপাদান হইবে। আরও ভরসা করা যায়, পল্লীচিত্র শহরের আবর্জনা হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন এবং ইংরাজি কথাটা মনে রাখিবেন, God made the country, man made the town.—পল্লী, প্রান্তর ভগবানের,—নগর, চত্বর মানবের মাত্র।

*

প্রবাসীর কথা প্রথমেই বলিতে হয়। প্রবাসী উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। ছাপা কাগজ ও চিত্রের ত তুলনাই হয় না। লেখাও অনেক সময়ে ভাল; তবে সংস্করণের দিকে প্রবাসীর একটু বেশি ঝোঁক আছে। তা থাকিবারই কথা—সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উন্নতিশীল ব্রাহ্ম। সংস্কারক দলের একখানি পত্র থাকে, তা ভাল—মতামত বুঝিতে কষ্ট হয় না, তবে শাস্ত্রের নামে সংস্করণ চালানো যেন কেমন কেমন লাগে। এই সংখ্যা হইতেই একটা নমুনা দিতেছি—শুভ বিবাহ তত্ত্বের সমালোচনায় বলা হইয়াছে 'শাস্ত্র বচন যত উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে শাস্ত্র-প্রণয়ন কালে এ দেশে বালিকা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না।' এইটি জুলুম। বল, বালিকা-বিবাহ ভাল নয়, তাহার এই এই যুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শাস্ত্র-প্রণয়ন কালে বালিকা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না—এ কথার কোন মূল পাওয়া যায় না। পুরুষের বেশি বয়সে আর মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হয়, ইহাই যেন শাস্ত্রের অভিমত বলিয়া বোধ হয়। আমরা প্রবাসীর ঝোঁক দেখাইবার জন্য এই কথার উল্লেখ করিলাম মাত্র। এটি উদ্বাহতত্ত্বের সমালোচনা নহে। সে পুস্তক দেখিই নাই। প্রবাসীর চিত্রগুলি—সুন্দর, অতি সুন্দর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ দিলে, যেন সোণায় সোহাগা হয় বলিয়া বোধ হয়। উড়িষ্যার পাঠশালার চিত্রে উড়িয়া বালকেরা পাঠশালায় বসিয়া তাড়ী পত্রে লিখিতেছে এইরূপ হইলে ভাল হইত।

প্রবাসীর 'গোরা' নামে গল্প রবিবাবুর লেখনী-প্রসূত। গোরা গল্পে মানব-চিন্তার যেরূপ বিশ্লেষণ হইতেছে, সেরূপ বিশ্লেষণ, বাঙ্গালা ভাষায় ত নাই-ই ইংরাজিতেও অল্প দেখা যায়। ভিক্টর হুগোতে আছে। এইরূপ বিশ্লেষণে রবিবাবু অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতেছেন। এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানব-চিন্তার ব্যবচ্ছেদ করা অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দর্শীর কার্য, কিন্তু এরূপ ব্যবচ্ছেদ দর্শনের অঙ্গ, বোধ করি কাব্যের অঙ্গ নহে। কাব্যানুমোদী চান, (Synthesis) প্রতিমা, তাহাতে সূক্ষ্ম শিল্প অবশ্যই থাকা চাই, কিন্তু সে সমস্ত শিল্প প্রাপ্তকেন্দ্র হইয়া সংযত ভাবে থাকিবে। আর যাহা কেন্দ্রগত আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে দার্শনিক ভাল বাসেন। দার্শনিক পাঠক সকল দেশেই কম, আমাদের দেশে আবার নিতান্ত কম; কাজেই গোরা গল্পের অদ্ভুত বিশ্লেষণ তাঁহাদের ভাল লাগিতেছে না। এই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া যদি দুই-চারিটি প্রতিমা ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে গোরার গল্প সমধিক আদরের সামগ্রী হইবে।

প্রবাসী—রাজসাহী কলেজের আরবীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্‌দুল সয়ীদ খাঁ, রাজসাহীর বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনে, 'বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা কি?' বিষয়ে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, চৈত্র সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

মৌলবী সাহেব নিজের উত্থাপিত প্রশ্নের অতি সদুত্তর দিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছেন—'সুতরাং বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রগণকে সর্ব প্রথম কিছু বাঙ্গালা শিখাইয়া বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে আরবী ও ইংরাজী শিক্ষা দিলে, সময়ও অল্প লাগিবে, এবং আমার বিশ্বাস শিক্ষাও ভাল হইবে। এ কথাগুলি চিন্তাশীল মুসলমানগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?' আমাদের বিশ্বাস মুসলমানগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিলে, ভাল করিবেন। প্রবন্ধ ও পরামর্শ সমীচীন। এই প্রবন্ধে লিখিত দুই-একটি কথায়—দুই-একটা কথা বলিব। এই 'কলম' কথাটা ধরুন। পারসীতে কলম্ কথা আছে থাকুক। কিন্তু এটা কি সংস্কৃত মূলক নহে? 'ক' শব্দে জল; যে জলে বা জলের ধারে খাড়া হইয়া, 'লম্ব' হইয়া উঠে, তাহার নাম 'কলম্ব' মানে 'শর'। শর মানে শর কাঠিও বটে, বাণও বটে। কলম্ব শব্দে শর কাঠিও বটে বাণও বটে। আর 'ক' শব্দে জল, যে জলে লম্বী হইয়া পড়িয়া থাকে—সে 'কলম্বী'—কল্মী শাক। এই শাকের ডাঁটা হইতে কলমীর কলম্ হয়। কলম্বর বা শরের এবং কলম্বীর বা কলমীর কলম্—দুই প্রচলিত আছে। এখনও কি বলিতে পারা যায় যে প্রাকৃত কলম্ শব্দ সংস্কৃত মূলক নহে, পারসী মূলক?

মাণিকচাঁদের গানে দুই-একটা মুসলমানি শব্দ দেখাইয়া, মৌলবী সাহেব ইঙ্গিতে বলিতেছেন, ঐ গান নিশ্চয়ই মুসলমানের বাঙ্গালা-বিজয়ের পরে। একথাও ঠিক নহে। একটি খাঁটি হিন্দু গান মুসলমান-মধ্যে প্রচলিত হইলে, তাহাতে যে দুই-চারিটা মুসলমানি কথা মিলিয়া যাইবে না—এমন হইতে পারে না। আর 'কইতর'শব্দ—সংস্কৃত মূলক, কপোত শব্দ হইতে আসিয়াছে। পুরাবিদ্‌গণ মাণিকচাঁদের ও গোবিন্দচাঁদের যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা গানে দুইটা মুসলমানী শব্দ দেখাইয়া খণ্ডিত হয় না।

প্রবাসীতে ও **বঙ্গদর্শনে** 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন-কলঙ্ক' তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় আজি কয়বৎসর ধরিয়া, আমাদের দেশের লুপ্ত বা বিকৃত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের বা সংস্করণের ধারাবাহিক চেষ্টা করিয়া আমাদের সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে ঐ কলঙ্ক-মোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবার বিশেষ করিয়া ঐ কথার আলোচনা করিয়াছেন। ভালই হইয়াছে। কিন্তু মৈত্রেয় মহাশয়ের লেখনভঙ্গিতে কেমন একটু যেন সমীচীনতার অভাব বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা জানাইতেছি—মৈত্রেয় বলিতেছেন, 'মিন্‌হাজ……লিখিয়া গিয়াছেন, যাহারা বক্তিয়ারের সহিত বিজয়-যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদের মুখে মিন্‌হাজ এই কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন।' ইহার চারি পঙ্‌ক্তি পরে,—'ইহার মূল প্রমাণ মিন্‌হাজের গ্রন্থ—এক মাত্র প্রমাণ মিন্‌হাজের গ্রন্থ—তাহাও একমাত্র বৃদ্ধ সৈনিকের পুরাতন আখ্যায়িকা।' 'তাহাদের' বহুবচন হইতে 'এক মাত্র'—কিরূপে আসিল তাহা বুঝা যায় না। ইহার চারি পঙ্‌ক্তি পরে, 'তিনি (সেই সৈনিক) তখন অশীতিপর বৃদ্ধ—তাঁহার সত্য-নিষ্ঠা বা আত্ম-গৌরব-ঘোষণার প্রলোভন কতদূর প্রবল ছিল, এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার সম্ভাবনা নাই।' অর্থাৎ সৈনিক মিথ্যাবাদী হইতে পারে। ভাল, ইহার একপৃষ্ঠা পরে—'মিন্‌হাজের কাহিনী আদৌ কোনও বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট হইতে সংকলিত, অথবা তাঁহার কপোল-কল্পিত মাত্র তদ্বিষয়েও সন্দেহ-শূন্য হইবার উপায় নাই।' অর্থাৎ মিন্‌হাজও মিথ্যাবাদী হইতে পারেন। লেখার এরূপ ভঙ্গি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের পক্ষে ভাল কি?

একটু একটু করিয়া বাঙ্গালার মাসিক সাহিত্যে বিজ্ঞান চর্চা প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে। পৌষের বঙ্গদর্শনে ঈথরের পরিচয় আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ঈথর এবং প্রাচীন দার্শনিকগণের 'ব্যোম' একই পদার্থ বটে। তবে শব্দকে আকাশের গুণ যে দার্শনিকগণ বলেন, সেটা কিছু ঈথরে আরোপ করা যায় না। যেখানে বায়ু নাই, সেখান হইতে শব্দ আসে কিনা, এ কথা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। আর 'শব্দব্রহ্ম' এ কথাই বা বিজ্ঞান বুঝিবে কিরূপে? আদি শব্দ বুঝিলে, তখন শব্দ আকাশের গুণ কিনা বুঝা যাইতে পারে। পৌষ, মাঘের প্রবাসীতে বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী আছে—বিজ্ঞানে ও কবিত্বে মাখামাখি—খাঁটি বিজ্ঞান নহে।

আজিকালি বোমা-বারুদ-বিভ্রাটে প্রায় ভদ্রলোক মাত্রেই উন্মনা হইয়াছেন; মাসিক পত্রগুলিতে দেখা যাইতেছে, 'ধর্ম' নাম দিয়া বা অনুশাসন নাম দিয়া—দেশদ্রোহিদলকে শান্ত হইতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ভাল কথা। কিন্তু আসল স্থানে কেহই আঘাত করিতেছেন না। ঘোরতর শিক্ষা-বিভ্রাটে হিন্দু যুবক বালকেরা বিড়ম্বিত হইতেছে—তাহার প্রতীকারের কোন চেষ্টাই নাই। খৃস্টান বালকে কতকটা খৃস্টানী উপদেশ পায়; মুসলমান বালকেও স্বধর্মের কিছু কিছু উপদেশ পায়—অভাগা হিন্দু সন্তানেরাই একেবারে বিড়ম্বিত হয়। একটা 'জাতীয়' কথার মোহে সকলকেই আচ্ছন্ন করিয়াছে। শিক্ষা স্বতন্ত্রধর্মী (Denominational) হইলে সর্বনাশ হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা—তাঁহারা চান শিক্ষা সাধারণ-ধর্মী (National)। এই একটা ন্যাশানাল কথার কুহকে সকলেই জ্ঞানহারা হইয়াছেন। হিন্দুর ছেলেকে হিন্দুয়ানি—মুসলমানের সন্তানকে মুসলমানী—খৃস্টানের ছেলেকে খৃস্টানী—এইরূপ স্বতন্ত্র শিক্ষা না দিয়া যে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না। আর ধর্ম বাদ দিয়া যে শিক্ষা হইতে পারে, তাহাও বুঝি না। আর চক্ষে দেখিতেছি, শিক্ষা-বিভ্রাটে হিন্দুসন্তান—মহা বিকৃত-মনা হইতেছে। ইহার সদ্যঃপ্রতীকার একান্ত আবশ্যক। আশুতোষের অকাল মৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি, ভাবিত হইয়াছি, কিন্তু এরূপ আর না হইতে পারে, তাহার জন্য কি করা হইতেছে? কিছুই না। আমরা পুলিশের উপর সমস্ত রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। সে ত ভাল নয়। যাহাতে আসল স্থানে আঘাত পড়ে, তাহার উদ্যোগ করিতে হইবে; বিষম শিক্ষা-বিভ্রাট হইতে বালক, যুবক যাহাতে নিষ্কৃতি পায়, তাহা করিতে হইবে। হিন্দুর ছেলেকে হিন্দুয়ানিতে বর্ধিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা এই পাপের কি পরিণাম হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

মাসিক পত্রের সমালোচনায় অনেক বড় কথা তুলিলাম, এখন একটা হাসির কথা বলি। ভাদ্র মাসের **প্রবাসীর** একটি প্রবন্ধের পাদটীকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন, সুপারি শব্দ—বাঙ্গালা। অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, ঠাকুর মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'সুপারি' যাবনিক সফর শব্দ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না কি? অবশ্য—শুধু জিজ্ঞাসা করেন নাই—কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার যথেষ্ট কারণ দর্শাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু এই জন্য মাঘের প্রবাসীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—কিন্তু প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিতেছেন—'সুপারি বাঙ্গালা ভাষার একটা আটপহুরিয়া শব্দ, এই-যা আমি জানি; তবেই তাহা যে আসিয়াছে কোথা হইতে, তাহা তিনিই বা কিরূপে জানিবেন, আর আমিই বা কিরূপে জানিব?' উত্তর পড়িয়া হাসি আসিল, সে-কালের কবির লড়ায়ের একটা গল্প মনে পড়িল। নিতাই দাস ও নীলু পাটনীতে বাদ হইতেছে—নিতাই আসর লইয়া যশোদা ভাবে গাহিল—

ওরে নীলমণি! কি কথা শুনি!
তোর নাকি নূতন বাপ নূতন মা হয়েছে এদানী?
ইত্যাদি;

তাহাতে নীলমণি পাটনী পুরাণের কথা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, উত্তর দিল—

আমি জাত্‌ পাটনী, বাই তরণী,
গোঁদলপাড়ার টেঁকে রই।
ব্রজের সে নীলমণি নই।

যোগেশবাবু কত পাণ্ডিত্য করিলেন, আমাদের পাটুনী ঠাকুর মহাশয়, সে সকল পাণ্ডিত্যের কাছ দিয়া না গিয়া বলিলেন—

দেশী কথা সুপারি, এই মাত্র বল্‌তে পারি,
আমি পণ্ডিত টণ্ডিত নই।
বোল্‌পুরের বনে রই॥

*

বঙ্গদর্শন-কে (প্রবাসীর কথা অগ্রে বলা হইল বলিয়া) আমরা উপেক্ষা করিলাম, এমনটা কেহ যেন মনে না করেন। নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে পুরাতন পর্যায়ের মত ভ্রুকুটি-কুটিল ভ্রূভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গে, অধরে মধুর হাসি না থাকুক, বঙ্গদর্শন বাঙ্গালা মাসিকের গৌরব রক্ষা করিতেছে।

বঙ্গদর্শনের কথায় * শ্রীশচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর জন্য আমরা শোক প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শ্রীশচন্দ্রের সেই চারিদিকে কালিভরা উজ্জ্বল চক্ষুর বুকভরা চাহনি আর ত দেখিতে পাইব না! বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণের উপর পোড়া কালের কুটিল কটাক্ষপাত বড় বিষম হইয়া উঠিল। এই উপলক্ষে 'স্মরণে' শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতা বড় সুন্দর।

*

বামাবোধিনী—(শ্রাবণ ১৩০৪)—'পরার্থের সূত্রপাত —বিবাহ' প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হইয়াছে, 'যেমন মানুষ যত শিশু ততই স্বার্থপর, তেমনই যে জাতির যতই বাল্যভাব সে জাতি ততই স্বার্থপর।' এ সকল কথা বাস্তবিক কি আমরা বুঝিতে পারি? 'বৃদ্ধ জাতি' 'বালক জাতি' সত্য সত্যই বুঝি কি! কুকী, নাগা প্রভৃতি যাহারা শত সহস্র বর্ষ প্রায় একরূপই রহিয়াছে, তাহারা বৃদ্ধ, না বালক? আর রুষ, জর্মান প্রভৃতি যাহারা পতঙ্গের মত নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে, তাহারা বালক, না বৃদ্ধ? তাহার পর কুকী-নাগা বেশি স্বার্থপর, না রুষ-জর্মান বেশি স্বার্থপর? সত্য সত্যই কি এ সকল কথার আমরা উত্তর দিতে পারি? না কেবল ইংরাজির চর্বিতচর্বণ গলাধঃকরণ করিতে গিয়া, কেবল আত্মাদর নষ্ট করি? আমার মতে আমাদের মত আদার বেপারীদের জাহাজের খবর রাখা কেবল ধৃষ্টতা মাত্র।

দেখিতেছি **বামাবোধিনী**তে **'বিধবা-বিবাহ'** বিষয়ে চর্চা হইতেছে; প্রবন্ধে 'পূর্ব প্রকাশিতের পর' লিখিত আছে। পূর্বে কি ছিল, না ছিল, মনে নাই, বা দেখি নাই, এবার যাহা আছে, তাহারই উপর দুইচারিটি কথা বলিব। আমরা বিধবা-বিবাহের বিরোধী, কিন্তু তা বলিয়া প্রবন্ধ লেখকের ভাবভঙ্গির ও ভাষার প্রশংসা করিতে ছাড়িব না। তিনি বেশ ধীরে সুস্থে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন, 'ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ ভক্তির পাত্রী ও প্রশংসনীয়া বলিয়া ধর্মপরায়ণা, পতিপরায়ণা বিবাহিতা বিধবাগণকে নিন্দার বা ঘৃণার চক্ষে দেখিলে,—তাহা কি বাতুলের কার্য নয়?' আমরা একটি প্রশ্ন করিব। যে সকল দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, তা ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্য দেশেই হউক, আর নিউজিলাণ্ড ফিজিলাণ্ড প্রভৃতি অসভ্য দেশেই হউক, সেই সকল দেশে একই অবস্থাপন্ন দুইজন বিধবার মধ্যে, একজন যদি পরে বিবাহ করে, আর একজন ব্রহ্মচর্য করিয়া কাটায়, তবে সেই সকল দেশেই সেই শেষোক্ত বিধবাকে পূর্বোক্ত বিধবা অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি করে কিনা? যদি করে, তবে আপনি যাহাকে বাতুলতা বলিতেছেন, তাহা পৃথিবীময় পরিব্যাপ্তা বলিতে হইবে। আপনিই বলিতেছেন 'ব্রহ্মচর্যই বৈধব্যাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ব্রত;' সেই শ্রেষ্ঠ ব্রত যাহাতে সকলে গ্রহণ করে, সেই চেষ্টাই ত শাস্ত্র ও সমাজ করিবেন?

লেখক সমগ্র পুরাণ ইতিহাস হইতে চারিটি বিধবা-বিবাহের কথা বলিয়াছেন; বলিয়াছেন, আর পাওয়া যায় না। ১) মদনপত্নী মায়াবতী, ২) বালীপত্নী তারা, ৩) রাবণপত্নী মন্দোদরী, ৪) নাগকন্যা উলুপী। বাস্তবিক এই দৃষ্টান্তগুলি, বিধবা-বিবাহের পক্ষে যায়, না বিপক্ষে যায়? মদনপত্নী দেবতা—কথাই আছে,—

দেবতার বেলা লীলাখেলা,
পাপ হয় মানুষের বেলা।

বিশেষ মায়াবতী পূর্ব পতিকেই দ্বিতীয় বার পতিত্বে পাইয়াছিলেন, সেরূপ পাইবার সম্ভাবনা আছে কি?

তাহার পর, তারা, মন্দোদরী এবং উলুপী। তারা—বানরী। মন্দোদরী—রাক্ষসী। উলুপী—নাগকন্যা। এই সকল অনার্যা নারীর, এই সকল অনার্য কাণ্ড হইতে কি আর্যগণের সামাজিক ব্যবহার শিখিতে হইবে? কথা হইতেছে বর্ণাশ্রমীর উচ্চশ্রেণীর বিধবা-মধ্যে পুরুষান্তর গ্রহণ কখন প্রচলিত ছিল না; থাকিলে—তাহার মন্ত্র থাকিত, সম্প্রদানের বিধি থাকিত, সম্প্রদানকালে কোন্ গোত্রের উল্লেখ করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট বলা থাকিত; আর কত কি থাকিত। দেখুন, এক দত্তক-গ্রহণ, কোটির মধ্যে এক জনকে গ্রহণ করিতে হয় কিনা সন্দেহ; কিন্তু তাহার কত বিধি, বিধান, বিচার দেখুন দেখি—আর বিধবার

* শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সুসাহিত্যিক এবং বঙ্গদর্শনের (নবপর্যায়) প্রকাশক ছিলেন। বঙ্গদর্শন 'মজুমদার লাইব্রেরী' হইতে প্রকাশিত হইত।

বিবাহ হইলে, কোন্ পক্ষের সন্তান কিরূপ ভাগে কোন্ স্বামীর বিষয় পাইবে, তাহার কোন কথা নাই কেন? এই যে মন্ত্র নাই, বিধি-ব্যবস্থা নাই এ কথা ভৃগুসংহিতায় ধরা হইয়াছে; কিন্তু বুঝালে বুঝিবে না—তাহার আর উপায় কি?

লেখক লিখিয়াছেন, 'এ দেশে মুসলমান সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।' আমরা বলি সর্ব শ্রেণীর মধ্যে নহে। সৈয়দ গোষ্ঠীমধ্যে একেবারে নাই।

লেখক এই বিষয়ে শাস্ত্র জানিবার জন্য সকলকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবা-বিবাহ' বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতে বলিয়াছেন। আমরা নির্বন্ধাতিশয়-সহকারে নিবেদন করি, যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তক পড়িবেন, তাঁহারা সেই সঙ্গে যেন আর দুইখানি পুস্তক পড়েন।

১। ভূতপূর্ব সব্‌জজ এখন স্বর্গগত নফরচন্দ্র ভট্ট-বিরচিত 'বিধবা-বিবাহ' বিষয়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নাই। ১২৯২ সালে মুদ্রিত।

২। 'বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ'—শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্মা-প্রণীত। ১২৯৩ সালে মুদ্রিত। প্রসন্নকুমার শর্মা—প্রসন্নকুমার দানীয়েল। তৎকালের District Engineer, ময়মনসিং।

বামাবোধিনী—ভাদ্র ও আশ্বিন—বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী লেখক উন্নতিশীল মহাশয়দিগকে, তাঁহাদের সৎসাহস নাই বলিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'হিন্দুসমাজে যাঁহারা উদারতার পরিচয় দেন ··· তাঁহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ দিতে বা করিতে কয়জনকে দেখা যায়? হায়! এমন করিয়া কি তাঁহারা সমাজকে উন্নত করিবেন?' লেখককে কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তি হয়—এত কথা এত লোককে বলিলেন, নিজের নামটি প্রকাশ করিতে 'সৎসাহস' হইল না কেন? 'হায়! এমন করিয়া কি সমাজকে উন্নত করিবে?'

*

বিদ্যোদয়ঃ—সংস্কৃতমাসিকপত্রম্। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪। এই বিদ্যোদয়ে, যেমন সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্বের পরিচয় আছে, তেমনই আমাদের সাধারণ বাঙ্গালির বা সংস্কৃতজ্ঞ অসাধারণ বাঙ্গালির অসারতার ও অকর্মণ্যতার পরিচয় আছে; কেন-না ভাটপাড়ার এই বিদ্যোদয় হইতেছেন, The Sanskrit Critical Journal of the Oriental Nobility Institute, Woking, England. অর্থাৎ ইংলণ্ডের ওয়কিং নগরে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্তবংশীয় জনগণের (উপকারার্থ) যে সভা আছে, বিদ্যোদয় হইতেছেন, সেই সভার সংস্কৃত সমালোচনা পত্র। আরও খোলা কথায় বলি, সেই ওয়কিং নগর হইতে কলিকাতায় হুণ্ডী আসে, সেই টাকায় বিদ্যোদয় ছাপা হয়। একখানি ষোলপাতার মাসিক সংস্কৃত পত্র, বাঙ্গালি বিদেশ হইতে ভিক্ষা না করিয়া চালাইতে অক্ষম। আমরা বাহাদুর বটি!

*

বিশ্বজীবন—ইহাতে 'রাজা রাধাকান্ত দেবের ধর্মমত' এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"রেভারেণ্ড ডল সাহেবের নাম অনেকের নিকট পরিচিত। ডল মহোদয় একদা রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। তদীয় দেবমন্দিরে বিগ্রহ-দর্শন করিয়া উক্ত পাদ্রীসাহেব রাজা বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মহাশয় কি পুতুল পূজা করেন?' তিনি বলিলেন, 'না, মানুষ কখন পুতুল পূজা করিতে পারে না। আমার বালকগণের জন্য মন্দিরে পুতুল রাখিয়াছি।' তৎপরে রাজা বাহাদুর ঈষৎ হাস্য করিয়া ডল সাহেবকে বলিলেন, 'আপনারা কি আপনাদিগের বালকগণকে পুতুল দেন না?' ডল বলিলেন, 'খেলিতে দি, পূজা করিতে নয়।' তৎপরে রাজা বলিলেন, 'আমাদের বালকেরা পুতুলের সহায়তা ব্যতীত যত দিন না প্রকৃত পূজায় সমর্থ হয়, তত দিন আমরা তাহাদিগকে পূজা করিবার জন্য পুতুল দিয়া থাকি।' তখন ডল সাহেব বলিলেন, 'তবে দেখিতেছি আপনি পৌত্তলিক নহেন; যদি আপনি পুতুল-পূজা না করেন, তবে কাহার পূজা করেন?' রাজা বাহাদুর বলিলেন, 'আমি আমার ধর্মের পূজা করিয়া থাকি। আমার ধর্ম সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও নির্বাণ। ঈশ্বরের সহিত এক স্থানে বাস করা, ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া, ঈশ্বরের সহিত

সর্বদা যুক্ত থাকা এবং পরিশেষে দগ্ধেন্ধন অনলের ন্যায়, ক্রমশঃ ঈশ্বরে বিলীন হওয়া'।" প্রাগুক্ত আখ্যায়িকা-দ্বারা রাজা বাহাদুরের ধর্মমত পরিস্ফুট হইতেছে।

রাজা বাহাদুরের সহিত রেভারেণ্ড ডল সাহেবের কথোপকথন কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিতে পারি না। রাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পর, তাঁহার স্মরণার্থ ১৮৬৭ সালের মে মাসে কলিকাতায় যে মহতী সভা হয়, সেই সভায় স্বয়ং ডল সাহেব ঐরূপ কথোপকথনের উল্লেখ করেন; আমরা সেই বৎসর বি. এ. পাস করিয়াছি, সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। ডল সাহেবের কথাগুলি বেশ স্মরণ আছে, আর তাঁহার আবেশের মত ভাবভঙ্গি ভুলিবার নহে। ডল সাহেবকে রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন—'Don't you give dolls to your children?' ডল সাহেব উত্তর করেন, 'Yes, Raja, to play with, not to worship.' তাহার পর রাজা বাহাদুর যে কোন প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, এমন কথা ডল সাহেব বলেন নাই। কথোপকথন যেন ঐখানেই শেষ হইল। তাহার পর ডল নিজের মত বলিলেন—Raja's religion was—সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য and নির্বাণ। এটি ডল সাহেবের নিজ মত—রাজা বাহাদুরের নিজ উক্তি নহে। ধাতুময় বা শিলাময় অথবা অন্য কোনরূপ বিগ্রহ যে কেবল পুত্তলিকা মাত্র এবং কেবল বালকের উপযোগী, রাজা বাহাদুরের এমন ধর্মমত ছিল না। তিনি বিগ্রহোপাসনায় বিশ্বাসী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল-মধ্যে কোন গোরা বা অফিসার বা অন্য কোন ব্যক্তি সামান্য পাখীটি পর্যন্ত মারিতে পারে না। তাঁহার জীবনী-মধ্যে তাঁহার এই কীর্তিরও কথা উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত।

*

বীণাপাণি—'ঈশ্বরোপাসনা' বলিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার প্রথম প্রবন্ধের প্রথম তিন পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

'সকৃৎ শ্রবণ মাত্রেই অন্বয়ী প্রমাণে (directly) যাহাদের সত্তানুভূতি হয়, অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত অধ্যাসের জলন্ত প্রদীপ তাহাদের চকিতেই নির্বাপিত হইয়া যায়;' এক বর্ণ বুঝা গেল না। যদি বুঝাই না যায়, তবে লিখিবার প্রয়োজন কি? এই 'ঈশ্বরোপাসনা' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে—কত বেদ, বেদান্ত, দর্শন মীমাংসার কথা আছে, কিন্তু ভাষা প্রাঞ্জল হইল কিনা, বিশদ হইল কিনা, সে দিকে লেখকের দৃষ্টিই নাই। আমাদের একান্ত অনুরোধ নব্যলেখকেরা ভাষা-বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হন। তাঁহাদের অবহেলায় সর্বনাশ হইতেছে। এক দিকে 'প্রাকৃত' বলিয়া পণ্ডিতের অবহেলা, অন্য দিকে ইংরাজি নবিশের উপহাস, এই উভয়-সঙ্কট-মধ্যে অতি অপ্রশস্ত পথে, ক্ষীণ অবয়বে, বঙ্গভাষা ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। অতি সন্তর্পণে মাতৃসেবা করিতে হয়; তোমরা পাঁচ জন সুসন্তান, মায়ের ধাতু না বুঝিয়া, অবস্থা না দেখিয়া, দুষ্পাচ্যপথ্য প্রদান করিয়া, বিষম বিষময় ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া, যদি সেই শীর্ণদেহে ক্ষীণপ্রাণে বিকার ঘটাও, তবে আর কে রক্ষা করিবে? তাহাতেই বলিতেছি, তোমাদের প্রকরণ-পদ্ধতিতে সর্বনাশ হইবে।

একদিকে ঐরূপ দর্শনের নামে ভাষার উপর উৎপাত, অন্যদিকে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া মাতৃভাষার উপর বিষম উৎপাত হয়, এই উভয়বিধ অত্যাচার হইতে লেখকগণ সাবধান না হইলে, ভাষার দুরবস্থাই হইবে।

*

ভারতী—বৈশাখ (১৩০৪)—এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়-লিখিত 'মীরকাসিম' প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবুকে তীব্র আক্রমণ করা হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু বঙ্গসাহিত্য-সেবক অনেকেরই গুরুস্থানীয় হইলেও তিনি যে কাহারও সমালোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারেন না, এ কথা কেহই বলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বা রাজেন্দ্রলাল, মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র, ইঁহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা হইলে, সাহিত্যের সৌভাগ্যেরই কথা। কিন্তু সেই সমালোচনাতে ঝাল যেন না থাকে, বিষ যেন না থাকে। এই ত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' নাম দিয়া আড়াইশত পৃষ্ঠা পরিমাণ গ্রন্থে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' নামক তিনখানি কাব্যের সুদীর্ঘ প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন; যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলির যে সদুত্তর

হইবে, এমন মনেই হয় না। কিন্তু কৈ ঝাল ত বড় দেখিলাম না। বিষ ত একেবারেই নাই। এমনই ত হওয়া চাই। বিশেষ বঙ্কিমবাবু ইহলোকে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয়ের আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

মৈত্রেয় মহাশয়ের একটি ভ্রমশিক্ষা হইয়াছে। তিনি বলেন, 'ইতিহাস লইয়া কাব্য, উপন্যাস যাহা ইচ্ছা রচনা করিতে পারি, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিতে আমরা চিরদিন বাধ্য।' আমরা বলি, তা নয়। ইতিহাস Traditional প্রাকৃত, কাব্য ideal অতি প্রাকৃত বা পরাকৃত। কাব্য কেবল মাত্র traditional প্রাকৃত হইলে, তাহাতে ideal অতি প্রাকৃত না থাকিলে, সে কাব্য অতি নিকৃষ্ট কাব্য হয়। বঙ্কিমবাবু সেরূপ কাব্য লিখিতে প্রয়াস পান নাই, তিনি Romance লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, Novel লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং তিনি 'ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিতে বাধ্য' ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থগুলি Historical Romance,—Historical Novel নহে।

মৈত্রেয় মহাশয়ের কাব্য এবং ইতিহাসের প্রকৃতি-সম্বন্ধে ভ্রমশিক্ষা থাকায় চন্দ্রশেখরের বিজ্ঞাপনের কদর্থ করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমবাবু যেন বলিয়াছেন, 'এই গ্রন্থে যদি সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসের বিপরীত কিছু দেখিতে পাও ত মনে কিছু করিও না, তাহাও ইতিহাস, তবে তোমার দুর্ভাগ্য বলিয়া দুর্লভ ইতিহাস পড় নাই।' ইহা বিজ্ঞাপনের কদর্থ। এইরূপ হইলে সদর্থ হইবে। '—মনে কিছু করিও না, তাহার কতক দুর্লভ ইতিহাস মুতক্ষরীনে পাইবে—আর কতক অবশ্যই আমার কল্পনাপ্রসূত, কেন-না আমি কাব্য লিখিতেছি।' এইরূপ ভাবে বিজ্ঞাপনটি বুঝিলে বঙ্কিমবাবু প্রধান চার্জে নিশ্চয়ই নিরপরাধ সাব্যস্ত হইবেন।

দ্বিতীয় চার্জে 'বঙ্কিম মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন।' আমি ভরসা করি, জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার বহুতর মুসলমান 'বন্ধু'র প্রত্যেকেই এই কথার প্রতিবাদ করিবেন। তিনি বিচার-কার্যে প্রায় সমগ্র জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহার কাছে কার্য করিয়াছেন, এমন সমস্ত উকীল মোক্তার আমলারাও একথার প্রতিবাদ করিবেন; তিনি মুসলমানের অনুকূলে-প্রতিকূলে বিস্তর বিচার করিয়াছেন, কেহ কখন যে তাঁহার মুসলমান বিদ্বেষ দেখিয়াছে, এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না। সামাজিক ও বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রে এবং কবি বঙ্কিমচন্দ্রে যে এমন একটি গুরুতর বিষয়ে, বিষম বৈপরীত্যভাব ছিল, একথা আমরা মানি না। তাঁহার গ্রন্থে তিনি মীরকাসিমের উপর প্রচুর শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, তাহার পর যদি সেই মীরকাসিমের চরিত্র পূরণ করিতে গিয়া, তিনি তাঁহাকে অশ্রদ্ধেয় করিয়া থাকেন, তাঁহার গ্রন্থ গোল্লায় গিয়াছে, একথা দশবার বলিতে পার, কিন্তু তা বলিয়া বঙ্কিম মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন, একথা বলিও না। মৈত্রেয় মহাশয়ের উপসংহারই আমাদের উপসংহার। 'জীবিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাও যেমন অন্যায় মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাও তেমনই অন্যায়—কাহারও সেরূপ অধিকার নাই।'

ভারতী—জ্যৈষ্ঠ (১৩০৪)—প্রবন্ধ—'আনন্দময়ী'। আনন্দময়ী, বিক্রমপুর জপসার বৈদ্যজমীদার রামগতি রায়ের কন্যা। ১৫০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উত্তম জানিতেন। তাঁহার পিতা রামগতি রায় এবং খুল্লতাতদ্বয় রাজনারায়ণ রায় ও জয়নারায়ণ রায় সকলেই গ্রন্থকার। আনন্দময়ীও উত্তম কবিতা লিখিতেন। তাঁহার রচিত 'বাসি-বিবাহ' বর্ণনা এই ভারতীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিতার ছন্দ বেশ, সংস্কৃত পদপূর্ণ, এবং বেশ জমাট গাঁথনি। জয়নারায়ণ-কৃত 'হরিলীলা' গ্রন্থ হইতে দুইটি বাঙ্গালা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, আনন্দময়ীর সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে। শ্লোক দুইটি এই—

অত্রি-পুত্র জর-নেত্র ষড়াননানন।
বসুমতী শাকে পুঁথি হল সমাপন॥

* * *

নারায়ণ প্রভুপদে করি দঢ় মন।
ষোড়শ চৌরান্বৈ শাকে পুস্তক লিখন॥

এই 'ষোড়শ' পাঠ স্পষ্টত ভুল। 'ষোল শ' হইবে। লেখক তাহাই অবশ্য ধরিয়া লইয়াছেন এবং ১৬৯৪ শাকে হরিলীলা গ্রন্থ লেখা হয়, স্থির করিয়াছেন। কিন্তু 'অত্রি-পুত্র'

ইত্যাদি শ্লোকের কোন অর্থই করা হয় নাই। আমরা যথাসাধ্য অর্থ করিতেছি—অত্রি-পুত্র = চন্দ্র = ১। জ্বর-নেত্র = ৬ (জ্বর ত্রিশিরা, সুতরাং জ্বরের ছয়টি চক্ষু)। যড়াননানন = যড়াননের আনন = ৬। বসুমতী = ১। সুতরাং অঙ্কস্য বামাগতি বলুন, আর নাই বলুন—আমরা শ্লোক হইতে পাইলাম ১৬৬১। অর্থাৎ 'হরিলীলা' গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ১৩ বৎসর পূর্বে লেখা। আজি হইতে ১৫৮ বৎসর হইল। পলাশীর যুদ্ধের ১৮ বৎসর পূর্বে। এত কথা বলিয়া আনন্দময়ীর 'বাসি-বিবাহের' দুই-চারি ছত্র নমুনা না দিলে ভাল দেখায় না। যখন বর আসিয়া দাঁড়াইল, তখন—

হেরে চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে পরোক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে ॥
কতি প্রৌঢ় রূপা ও রূপে মজন্তী।
হসন্তী, স্খলন্তী, দ্রবন্তী, পতন্তী ॥

বেশ নয়? শেষ দুই ছত্র যেন একটু উড়ে উড়ে।

ভারতী—আষাঢ় (১৩০৪)—প্রথম প্রবন্ধ 'সতীর খেলা'—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ-লিখিত। এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ বীভৎস, বিকৃত রুচির পরিচায়ক, একরূপ উন্মাদের প্রলাপ। ভারতীতে এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়। শ্রীঅপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এডুকেশন গেজেটে এই প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'আর মর্মাহত হইয়াছি বঙ্গসাহিত্যের দুরবস্থায়।' বাস্তবিক মর্মাহত হইবারই কথা। আজিকালি ভাল কাগজে, ভাল ছাপায় এত এলোমেলো কথা ছাপা হইতেছে যে তাহাতে বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে। যাঁহারা সমাজ, সাহিত্য, ভাষা বা ব্যাকরণ—ইহার কোন একটির ধার ধারেন না, তাঁহারা সকলেই সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। একথা 'আমি' বলিলে, অনেকে হয়ত রাগ করিবেন, অনেকে আমাকে দাম্ভিক বলিবেন, তা বলুন, আমাকে যাহাই বলুন, আমি দুঃখ প্রকাশ না করিয়া এই কয়বৎসর কাটাইয়াছি; কিন্তু এখন সেই জন্য আমার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। বঙ্গসাহিত্যের দুরবস্থার কথা ভাবিতে গেলে, বাস্তবিকই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। আমার সম্মুখে 'ভারতী' এখনও খোলা রহিয়াছে, এই ভারতী হইতে আরও দুই-চারিটি দুঃখের কথা বলি।

'প্রবাদ-প্রসঙ্গে' খয়ে বন্ধনের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—'অগ্রপশ্চাৎ সকল দিকেই অসুবিধায় পড়া, ইংরাজিতে Between two fires বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই।' কিন্তু 'খয়ে বন্ধন' বলিতে ওরূপ অর্থ হয় না। 'খয়ে বন্ধন' বলিতে বোকার বা বোকামির বন্ধন। যাঁহারা ভারতীর মত পত্রে প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহারা যে এরূপ ভ্রম করিতে পারেন, সে জ্ঞানই আমার ছিল না। অবিনব জ্ঞান লাভে আমি মর্মাহত।

এই ভারতীতে 'কবির মালঞ্চ' আছে। তাহার আরম্ভ—

'হাসরে—ফোটরে,
হাসি হাসি ফোটরে,
অত জড়সড় হয়ে, কেন তুমি থাকরে?
কেন, কেন ফুল!
সোণার বরণ ধ'রে হোস্‌রে আকুল?'

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির—ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের ভাষার কি এই পরিণাম হইল? কাঁদিতে ইচ্ছা করে না?

ভারতী—বত্রিশ বর্ষ চলিতেছে। ইদানী ভারত-মহিলা-কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। আমরা শ্রাবণ সংখ্যা পর্যন্ত পাইয়াছি। ৫।৬ জন সম্ভ্রান্ত মহিলা নিয়মিত লেখিকার মধ্যে। ভালই চলিতেছে। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার মহাশয় ভারতীতে বাঙ্গালার গীতকথা, তন্মধ্যে 'পুষ্পমালা' প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি যেরূপ কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ঠাকুরমার ঝুলির যে পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিয়াছেন, দক্ষিণাবাবু যেন সেগুলি লক্ষ্য করিয়া আপনার গন্তব্য পথ স্থির করেন। আমাদের দেশের প্রধান গীতকথা বা রূপকথা নিখুঁত হইয়া প্রকাশিত হয়, সংগ্রাহকের অবশ্যই সে ইচ্ছা থাকে, সেই ইচ্ছা হইতে কার্যের পন্থা স্থিরকরণের জন্য আমরা ঐ অনুরোধ করিলাম।

ভারতী—আশ্বিন—চন্দ্রে কলঙ্ক—ভারতীতে ভুল।

তাহাতে আবার শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত 'হাম্বির' প্রবন্ধে। 'একদিন ঘোর অমাবস্যার রাত্রি, বনের মধ্য দিয়া পথ দেখে চলা অসম্ভব, হাম্বির একটা প্রকাণ্ড শাল গাছে চড়লেন ··· হাম্বির নিজেকে বেশ ক'রে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ্রা গেলেন। অনেক রাত্রে হাম্বিরের ঘুম ভাঙ্গিল— ··· আকাশের মাঝখানে চাঁদ এখনও ঝলমল করছে।' এমন ভুল এ প্রবন্ধে থাকিবে কেন? পর প্রবন্ধ 'মহিলা-শিল্প-সমিতি'। এই প্রবন্ধে সখী-সমিতির ও মহিলা-শিল্পাশ্রমের প্রতিষ্ঠার অব্দ দিতে বিষম ভুল হইয়াছে। দুইটিই ১২১৩ সালে লেখা হইয়াছে। মাঝের কথাগুলি পড়িলে, বোঝা যায় তাহা হইতেই পারে না। ভারতীর ভুল বলিয়াই এত খুঁটিনাটি করিলাম—সম্পাদিকা মার্জনা করিবেন।

ভারতী—কার্তিক—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বড় সুন্দর প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন—'কি ও কেন'। —ভারতের কলাশিল্প জিনিসটা কি ও কেন তাহার আলোচনা করিতে হয়। এমন কেনর যে উত্তর দিতে হয়, এটি আমাদের অদৃষ্ট। এখন পিতামাতার সেবায় নিত্যপরাঙ্মুখ যুবকগণ 'স্বদেশী'র নৈমিত্তিক সেবা করিয়া প্রশংসা প্রাপ্ত হয়, বৃদ্ধ পিতামাতার সেবায় স্বগ্রামে থাকিলে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। দেশের তাঁতির কাপড় পরিলে ভ্রূকুটিপাত সহ্য করিতে হয়। অবনীন্দ্রবাবু যে ভারতের চিত্র-শিল্পের সেবাপরায়ণ হইয়া কৈফিয়ৎ-গ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা বিচিত্র নহে। কৈফিয়ৎও নরম-গরম কার্যঙ্কাগে ভাল হইয়াছে। তবে ভারতীয় চিত্র-শিল্প বা ভাস্কর্য জিনিসটার বৈচিত্র্য কি তাহা তিনি বুঝাইয়া দেন নাই,—রাগিয়া বলিয়াছেন, কাণাকে আর কি বুঝাইব? কথাটা ঠিক—কিন্তু রাগ করিলে চলিবে না। অবনীন্দ্রবাবু কেবল তুলিকাধারী চিত্রকর নহেন, তিনি বুঝাইবার জন্য যখন লেখনী ধারণ করেন, তখনও সিদ্ধ হস্তে সেই লেখনী চালনা করিয়া থাকেন। আমরা অন্ধ বটে কিন্তু তাঁহার সিদ্ধ হস্তের পদ্মমধুকরী লেখনীর চালনায় আমাদের চক্ষু ফুটিবে—অন্ধকে দয়া কর, বাবা—ভারতীতে প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতীয় চিত্র-শিল্প জিনিসটা কি, তাহা ভাল করিয়া আমাদের বুঝাইয়া দিন।

ভারতী-তে—অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘের—আচার্য বসুর অদ্ভুত আবিষ্কারের পরিচয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়, জীব, উদ্ভিদ্ এবং ধাতু, প্রস্তরাদি কতকগুলি জড়পদার্থ তড়িৎ-সঞ্চালনে সমানে সাড়া দেয়, মাদক-সেবনে মাতিয়া উঠে, বিষ-প্রয়োগে মরিয়া যায়। ইহাতেই বুঝা যায় যে সাড়া দিবার শক্তি সর্ববিধ জড়ে নাই। যেটা মরে সেটা ত আর সাড়া দেয় না। ব্রহ্মবাদের সহিত এই আবিষ্কারের কোন সম্বন্ধ নাই। কেহ কেহ এইরূপ একটা কথা বলিয়াছেন বলিয়া, এ কথাটা বলিতেছি। সমস্ত পদার্থবিজ্ঞানের মূলে তাড়িত শক্তির লীলাখেলা—ছোট ছোট তাড়িত যন্ত্র যত দিন না পল্লীগ্রামের স্কুল পাঠশালে অধিষ্ঠিত এবং চালিত হয়, তত দিন দেশে বিজ্ঞানের ভিত্তি বসিবে না। কলিকাতার বিজ্ঞান সভা প্রভৃতি কেবল উপর তলার কাণ্ড —নিচেতলা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

ভারতী—ফাল্গুন ও চৈত্র—ভারতী আগামী বর্ষ (১৩১৬) বর্ধিত গৌরবে প্রকাশিত হইবে। তাহাই হউক। যে কথা কোন মাসিক পত্রে প্রায় খুঁজিয়া পাই না, তাহা চৈত্রের ভারতীতে পাইয়াছি—'প্রজার স্বাস্থ্য ও রাজা।' ভারতী বলিতেছেন, 'আজি পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়া প্রকোপে পীড়িত। এই কারণে দেশের কত গ্রাম পরিত্যক্ত, কত জনপদ জনহীন এবং সমগ্র জাতি রুগ্ণ, দুর্বল ও নির্জীব। কিন্তু এতকাল গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার অবসর লাভ করেন নাই।' তাহার পর লালগোলার রাজা যে মুর্শিদাবাদ জেলার অস্বাস্থ্যকর স্থান সকলের উন্নতির জন্য লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ আছে। পরিশেষে ভারতী উপসংহার করিতেছেন—'আমাদের প্রার্থনা যে, গভর্নমেণ্ট এখনও এ কর্তব্য-সাধনে মনোযোগী হউন, এবং তাঁহাদের উপেক্ষার ফলে অকারণ প্রজা-নাশ নিবারণ করুন।'

*

ভুবনমোহিনী প্রতিভায় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এতকাল পরে আবার পদ্য লিখিয়াছেন—'জলপ্লাবন'। যখন সাধারণীতে 'পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী', 'অকৃতজ্ঞ শুক' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, তখন একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল

—তখন লোকে জানিত ভুবনমোহিনী দেবী লিখিতেছেন। সেই একদিন আর এই একদিন। এখন লোকে জানে ভুবনমোহিনীর প্রতিভা, তাঁহার স্বামী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজে লিখিয়া স্ত্রীর নামে কবিতা বাহির করিয়া দিলেন, বাহবাও খুব পড়িয়াছিল কিন্তু টেঁকিল না। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে সাহিত্য তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। অনেক দিনের পর আবার পদ্য দেখিলাম—পূর্বপরিচিত বলিয়া মায়া হইল কিন্তু পাঠ করিয়া তৃপ্তি হইল না। যাঁহারা ৺গঙ্গাচরণ সরকারের ঋতুবর্ণনে ঝড় পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের ইহাতে তৃপ্তি হইবে না। তুলনা করিবেন?

ভীমাকারভাবে করিয়া গর্জন
স্বন্ স্বন্ নাদে গরজি গভীর
প্রভূত প্রবাহে এল প্রভঞ্জন,
কাঁপে চরাচর হইয়া অধীর। (গঙ্গাচরণ)

নিশ্বাস প্রশ্বাসে বহিছে পবন!
মহাঘোর রব শন্ শন্ শন্।
বজ্র হুহুঙ্কার করিয়া ভীষণ,
সমস্ত ভুবনে ভ্রমিছ অদ্ভুত! (নবীনচন্দ্র)

*

মহাজন বন্ধু—আমরা আষাঢ় পর্যন্ত পাইয়াছি। সম্পাদক পাকালোক তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে কোন কোন প্রবন্ধে একটু আত্মম্ভরিতার ছায়া, আবার কোথাও বিশেষ অনবধানতা দেখা যাইতেছে। সম্পাদক ফাল্গুন-চৈত্রের খণ্ডে বালকগণকে 'উদ্দেশ্য স্থির করিতে' পরামর্শ দিয়াছেন। বড় ভাল কথা। এই সংখ্যায় আর এক স্থানে বলিয়াছেন, 'ব্যবসায় ও বাণিজ্য এক কথা নহে। স্বদেশে বা ঘরে দোকান করাকে ব্যবসায় বলে, জাহাজে পণ্য দ্রব্য বোঝাই দিয়া তাহা বিদেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করাকে বাণিজ্য বলে।' চাষ এবং ব্যবসায় করিলে, 'পরমায়ু বৃদ্ধি, জীবন-সংগ্রাম নাই, অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ইহাতে দেশের অবস্থা হীনপ্রভ হইবে, বন্দর থাকিবে না, পল্লীগ্রামের মত দেশ হইবে। আর বাণিজ্যে, বিলাস আছে; টাকা আছে··· ভয়ানক জীবন-সংগ্রাম, কেবল "নাই" "নাই" শব্দ, বাসনা অতিরিক্ত।' সম্পাদকের অবশ্য বাণিজ্যের দিকেই টান; তিনি বলেন, 'এই পন্থায় জ্ঞানের উচ্চ সীমায় যাওয়া যায়, চাষ ও ব্যবসায়ে জ্ঞান নাই।' এই শেষ কথাটা যদিও আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ও-কথা লইয়া গোল তুলিব না। ধরিলাম, ঐরূপ ঐ দুই পন্থাই আছে। আমরা প্রবৃত্তি ও পাত্র বিশেষে, ঐ দুই পন্থাই কি অবলম্বন করিতে পারি না? আমার বোধ হয়, স্বচ্ছন্দে পারি। মনে করুন, একদল যুবক মনে করে যে আচার ধর্মের অঙ্গ, মনে করে সন্তোষ ও শান্তি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য; তাহারা আরও মনে করে যে বিদেশে বাণিজ্য করিতে গেলে আচারভ্রষ্ট—কাজেই ধর্মভ্রষ্ট হইতে হয়; তাহারা যদি জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়া না পড়িয়া, অল্পে সন্তুষ্ট হইতে শিক্ষা করে, চাষবাস ব্যবসায় করে, এবং শান্ত, শিষ্ট ও দীর্ঘজীবী হয়,—তাহাতে বঙ্গদেশের ক্ষতি কি? বলিতে পার, তবে ও-পন্থায় কে যাইবে? বাঙ্গালায় হিন্দুর অর্ধেক মুসলমান, বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করিতে মুসলমানের আচারে বাধে না; মুসলমান (বা ব্রাহ্ম) এই জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন, বাহির হইতে আনিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করিতে থাকুন, ঐরূপ উন্নতি তাঁহাদেরই হউক। দেশের অবস্থা হীনপ্রভ হইবে কেন, বন্দরগুলি উঠিয়া যাইবে কেন? বাস্তবিক হইতেছেও তাই। এই হুগলী জেলায়, বাব্‌নান ও জনাই অঞ্চলের মুসলমানেরা অস্ট্রেলিয়ায় ব্যবসায় (থুড়ি! বাণিজ্য) করিয়া, বেশ দুপয়সা উপার্জন করিতেছে। তবে আমাদের দেশের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই শান্তি প্রয়াসী, তাই উহারাই আবার বৃদ্ধ বয়সে, চাষ করিতেছে, গ্রামে ব্যবসায় করিতেছে।

বাস্তবিক দেশশুদ্ধ লোক জাতি, কুল, ধর্ম, আচার খোয়াইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি কর, এ উপদেশ সমীচীন নহে। দেশ যখন আচারী অনাচারী—উভয়েরই, তখন আচারবান্ হিন্দুসন্তান 'ভব ঘুরে' নাই হইল। ধন বৃদ্ধি করিতে না পারিয়া যদি শান্তি বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহাতে দেশের মঙ্গল, না, অমঙ্গল? শান্ত, শিষ্ট, সংযমী, অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া হিন্দুসন্তান যদি আপনার চাষবাস লইয়া, গ্রাম লইয়া, জেলা লইয়া থাকে,—তাহা হইলে বাঙ্গালার শ্রী ফিরিয়া যাইবে; জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া, অস্বাস্থ্যকর

জলে ভরিয়া, দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, এমন দিনে দেশের দিকে গতিমতি হইলে, দেশ রক্ষা হইবে; নাই বা হইল উন্নতি। উন্নতি আগে? না রক্ষা আগে? আগে রক্ষা হোক, তবে উন্নতির কথা ভাবিও। তুমি বলিবে ধন বৃদ্ধি না হইলে, রক্ষা অসম্ভব; আমি তোমার কথায়,—তোমাকেই বলি, ধন বৃদ্ধি হইলে, নগর বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কলিকাতার বৃদ্ধি হইবে, দেশের কি? আর ধন বৃদ্ধি কিছু আমরা বন্ধ করিতে বলি না; বলি কেবল, যাহার পন্থায় বাধে না, প্রবৃত্তিতে কুলায়, সে তাহাই করুক। কিন্তু যে সংযমী হইতে চায়, তাহাকে বিলগ্রামী হইতে বলিবে কেন? তা বলিও না—ওরূপ উপদেশ জাতিনাশা, হিন্দুর সর্বনাশা। হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় থাকিলে, সংযমীর সংযম থাকিলে, অল্পে সন্তুষ্টি থাকিলে, তবে জগতে শান্তি থাকিবে—নতুবা কেবলই 'নাই' 'নাই' আর মারামারি।

এই যে-সকল কথা আমরা তুলিতেছি, এগুলি মহাজন বন্ধুর বিরোধে বলা নয়; মহাজন বন্ধু ইচ্ছা করিয়া এক পিঠ দেখাইতেছেন, আমরাও ইচ্ছা করিয়া অন্য পিঠ দেখাইলাম। ইহার পরে যে দুইটি কথা বলিতেছি, তাহা কিন্তু মহাজন বন্ধুর প্রকরণ-পদ্ধতির বিরোধে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'চাঁইবাসা' প্রবন্ধ—'বন্ধুর' কলঙ্ক। শেষের পাঁচ পঙ্ক্তি ছাড়া সমগ্র প্রবন্ধ পূর্ণিমা হইতে গৃহীত, কিন্তু অস্বীকৃত; আর যেখানে অদল-বদল করিয়াছেন, সেখানে দেব গড়িতে বানর হইয়াছে। এটা সম্পাদকের ভয়ঙ্কর অনবধানতা। 'ভারত মহিলার' সমালোচনা করিতে গিয়া সম্পাদক হক্-না-হক প্রবাসী-সম্পাদককে গালি দিয়াছেন। ইহাতে বিষম রুচি-বিকার প্রকটিত হইয়াছে; আর ভারত মহিলাকে প্রবাসী অপেক্ষা সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট বলায়, সত্যের অবমাননা হইয়াছে—তাহাতেই বলিতেছিলাম সম্পাদকের শুভ্র বসনের উপর, এইরূপ আত্মম্ভরিতার কৃষ্ণচ্ছদ কেন?

মহাজন বন্ধু—(ভাদ্র আশ্বিন); ভাদ্র সংখ্যার প্রথমেই মহাজন বন্ধু লিখিয়াছেন, 'ভারতের যে দলের সহিত গভর্নমেণ্টের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সেই শিক্ষিত দলের একজন মনস্বী গত শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা নামক মাসিক পত্রে মহাজন বন্ধুর সমালোচনা করিয়াছেন।' আমি নাম দিয়া পূর্ণিমায় লিখি, তথাপি মহাজন বন্ধু 'মনস্বী' বলিয়াছেন, এ সার্টিফিকেট মাথায় পাতিয়া লইলাম, কিন্তু যে দলের সহিত গভর্নমেণ্টের বিরোধ সেই দলের আমি একজন—এই বিষম কথার আন্তরিক প্রতিবাদ করিতেছি। ভয়ে নহে, সত্যের মুখ চাহিয়া। আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমার মত মতাবলম্বী অন্তত লক্ষ লোক আছেন, আমি তাঁহাদের মুখ চাহিয়া বলিতেছি, আমরা ঘোরতর স্বদেশী সুতরাং শান্তিপ্রিয়। গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নাই। বয়কট করিয়া, ইংরাজ সওদাগরদিগের পকেটে হাত দিয়া, (সুরেন্দ্রবাবুর ভাষায়) গাঁট কাঁটার কার্য করিয়া ইংরাজ জাতির মত আমাদিগের দুর্দশার দিকে আকৃষ্ট করিব, করিয়া ভগ্ন বঙ্গ জোড়া লাগাইব,—এমন দুরাশা আমরা কখন করি নাই, করিব না। সুতরাং আমাদের সহিত গভর্নমেণ্টের বিরোধ নাই।

১। আমরা শান্তি-প্রিয়; কাজেই কৃষির উন্নতির ও বিস্তৃতির পক্ষপাতী, গভর্নমেণ্টও কৃষির পক্ষপাতী। কৃষিতে শান্তি ও পল্লীর উন্নতি আছে, মহাজন বন্ধু পূর্বেই স্বীকার করিয়াছেন।

২। আমরা বিলাতি লবণ বা যাভার চিনি চাহি না—আহারে অপবিত্র সংস্পর্শ হওয়ার আশঙ্কায়। ইহাতে গভর্নমেণ্টের সহিত বিরোধিতা কিছু নাই। লবণ এখন আসে জর্মনী হইতে; চিনি আসে যাভা বা মরীচি দ্বীপ হইতে।

৩। দেশী হউক, বিদেশী হউক আমরা সকলরূপ বিলাসের দ্রব্য ত্যাগ করিতে সকলকে পরামর্শ দিই—নতুবা আমরা ব্যয়-সঙ্কুলান করিতে পারি না।

৪। আমরা ফঙ্গবেণে, চক্চকে জিনিস ত্যাগ করিতে বলি; বালকত্ব পরিহার করিতে হইবে বলিয়া। আর কতকাল ছেলেখেলা করিয়া কাটাইব বল? এই সকল জিনিস বিদেশ হইতেই বেশি আসে।

৫। বিপুল মূলধনে বড় বড় কাপড়ের কল বা অন্য কল বসিলে ভারতের বা বঙ্গের উন্নতি হইবে, এমন বিশ্বাস বা ধারণা আমাদের নাই। জগৎ জুড়িয়া বড় বড় কল-কারখানা আছে, সর্বত্রই দেখা যায়, কলকারখানার কল্যাণে

মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক খুব ধনী হইতেছে, আর লক্ষ লক্ষ লোক দীন হীন দাসত্বে নিযুক্ত আছে—কতকগুলির আবার সে দাসত্বও জুটে না, তাহারা ভবঘুরে বা ভিক্ষুক, অথবা চোরদস্যু হইতেছে। এইরূপ নাগরিক উন্নতির আমরা প্রয়াসী নহি। আমরা পল্লীর উন্নতি চাই। কাঁটাগোড়ে বা কাঞ্চননগরে, প্রেমচাঁদ বা দ্বারিকা বিশ পঞ্চাশ জন কারিগর লইয়া যে কারখানা করেন, তাহারই উন্নতি এবং অল্প বিস্তর বিস্তৃতি দেখিতে আমরা চাই—বর্মিংহাম বা শেফীল্ডের মত লক্ষ লক্ষ কুলিমজুর লইয়া কারখানা বসাইতে আমরা চাহি না। ইহাতেও গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই। আসল কথা ইংরাজের সঙ্গে বা ইংরাজ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে, এই সকল ব্যাপারে আমাদের কিছু মাত্র বিরোধ নাই। আমাদের বিরোধ ইংরাজের সঙ্গে নহে, ইংরাজিয়ানার সঙ্গে। আমরা অশনে বসনে, কাজ কারবারে, ব্যবসায় বাণিজ্যে কিছুতেই ইংরাজিয়ানা ভালবাসি না; ইচ্ছা করি, সকলেই ঐরূপ ইংরাজিয়ানা পারতপক্ষে পরিহার করেন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এইরূপ স্বদেশী ও স্বধর্মী ছিলেন, কৈ তাঁহারা ত কখন পাঠান রাজের বা মোগল বাদশাহের বা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত এই সকল ব্যাপারে বিরোধ করেন নাই। আমরাই-বা এখন করিব কেন?

একে ত দশ বিশ জন মাথাপাগলা লোকের পাগলামির জন্য আমরা সমগ্র বঙ্গবাসী শাসক সম্প্রদায়ের কাছে অবিশ্বাসী হইয়াছি, তাহার উপর আমাদের একজন বাণিজ্য-পাগলা প্রবীন **'মহাজন বন্ধু'** আছেন, তাঁহার জ্বালায় আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাঁহার ভঙ্গি দেখিয়া আমরা অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় বলিয়াছিলাম—মানুষ স্বদেশী হইলে রাজদ্রোহী হইবে কেন? মাঘ মাসে বলিয়াছিলাম, 'মহাজন বন্ধুর একটা বিষম দোষ দেখিতেছি, মহাজন বন্ধু আপনাকে বাদ দিয়া সকলকেই রাজদ্রোহী বলিতে চাহেন। পূর্ণিমার উপর (বিশেষ আমার উপর) ঐরূপ দোষ আরোপ করেন।' বলিয়াছিলাম, 'কোথায় কোন্ লেখিকা একটা পদ্য লিখিতে গিয়া, অনর্থক অতিরঞ্জন করিলেন, তাই ধরিয়া সম্পাদককে কি গালি দিতে আছে?' আদুরে ছেলে একটু কাঁদিতেছে—যদি কেহ বলিল, 'না ভাই কেঁদ না' অমনি চীৎকার করিয়া আরও কাঁদিয়া উঠে। আমাদের প্রবীণ আদুরে গোপালেরও তাই হইয়াছে—কোন একজন লেখিকার পদ্য লইয়া সম্পাদককে গালি দেওয়া ভাল হয় নাই বলিয়াছিলাম—অমনই পূর্ণিমার পৃথক্ লেখকের নাম দেওয়া একটি পদ্য লইয়া, আমি পূর্ণিমার সম্পাদক নহি,—আমাকে বিদ্রোহী প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কেন দাদা! এত জিদ কেন বল দেখি! আমি বিদ্রোহী স্থির হইলে—তোমার বাণিজ্যের কিছু বৃদ্ধি হইবে? আমি যে পূর্ণিমার সম্পাদক নহি—তাকি তুমি বুঝ না? আমি যদি সম্পাদক হইতাম—তাহা হইলে 'মৃত্যুর পর' ক্রমাগত পর পর চলিত কি?

তাহার পর 'মহাজন বন্ধু' বলিতেছেন, 'আহারে অপবিত্র সংস্পর্শ হওয়ার আশঙ্কায় ইঁহারা এখন (বিদেশী লবণ চিনি) চাহেন না, এতদিন নাসিকায় সর্ষপ তৈল প্রদানপূর্বক নিদ্রা যাইতেছিলেন।' না ভাই! ও কথা গায়ে লাগিল না—আমরা আধুনিক স্বদেশী নহি—আমরা বনেদী স্বদেশী। প্রমাণ—বড়বাজারেই সৈন্ধবের দোকানে বা চিনির আড়তে অবশ্য পাইবে। ফলকথা মহাজন বন্ধু—পিকেটিং করার দোষগুণ, অন্য লেখকদের লেখার দোষগুণ, আধুনিক স্বদেশীর দোষগুণ, মজুরদের চারি পয়সা দিয়া পদ দলিত করিবার দোষগুণ, রুষিয়ান নিহিলিস্টদিগের দোষগুণ, জাতীয় বিদ্যালয়ের দোষগুণ,—আধুনিক বাতাসের সমস্ত দোষগুণ আমার উপর চাপাইয়া, আমাকে মনস্বী বিশেষণে বিশেষিত করিয়া—তাহার পর যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন—ছি! এমন করিয়া কি বাদ-প্রতিবাদ চলে? আর চলিবেও না।

*

মুকুল—কার্তিক। বালক-বালিকাদিগের জন্য সচিত্র মাসিক পত্র। চতুর্দশ বৎসর চলিতেছে—উত্তম। কিন্তু ইহাতে বিলাতের পার্লামেণ্টের কথা কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য এই যে, কেবল ছেলেপিলে বলিয়া নয়, যুবকেরা পর্যন্ত দেখা যায়, দেশের কিছুই জানে না। তাহারা পঞ্চায়ৎ জানে না, তাহাদের পার্লামেণ্ট কি তাহা

বুঝানর প্রয়োজন কি? যাহাতে সমাজের পরিচয়, দেশের পরিচয়—এখন অপেক্ষা অধিকতররূপে ছাত্রেরা পায়, তাহার উপায় করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

*

সখা ও সাথী—১৪শ বর্ষ, ৫ম হইতে ৭ম সংখ্যা। প্রধানত বালকোপযোগী বটে কিন্তু প্রবীণের যে দেখিবার কিছু না থাকে এমন নহে। ছবিগুলি বেশ ভাল, তবে ইহার পূর্বে যেন আরও ভাল হইত বলিয়া মনে হইতেছে। এই যেসব শীকারের গল্প, খবরের বোতলের গল্প, এগুলা ত ইংরাজি হইতে লওয়া? তা যদি হয়, তবে সেই ভাবে লিখিলে ক্ষতি কি? আমাদের বোধ হয়, লেখাই ভাল।

বানরে কি কাঁকড়া খায়? খায় না; তবে ছবিখানা বদ্‌লিয়া শৃগালের বুদ্ধির পরিচয়ে কবিতা লিখিলেই ভাল ছিল। বালককাল হইতে একটা ভুল শিক্ষাও ভাল নয়।

*

সাহিত্য—৮ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা। সাহিত্য পূর্ণিমা-কার্যালয়ে বোধ করি আসে না—আসিলে অবশ্য দেখিতে পাইতাম, এখানি পূর্ণিমা-কার্যালয় হইতে ক্রীত 'সাহিত্য'। যে প্রবন্ধ হইতে আমরা নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে নাম না থাকিলেও নিশ্চয়ই উহা প্রসিদ্ধ পঞ্জিকা-সংস্কারক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। এ মাসের লেখক-গণের নামের মধ্যে তাঁহার নাম আছে। তিনি নব্য লেখক নহেন, বিজ্ঞ, বর্ষীয়ান্, আমাদের সুপরিচিত, কোনরূপ অপবুদ্ধিতে তাঁহার ভাষার সমালোচনা করিতেছি—তিনি কখনই মনে করিবেন না। 'ধূমকেতু' সম্বন্ধে তিনি 'সাহিত্যে' লিখিতেছেন—

'এই কোষগুলি পার্থিব বাষ্পবৎ পদার্থ নহে; কারণ, উহা বাষ্পবৎ পদার্থ হইলে, তদ্দ্বারা আলোকের বিবর্তন দৃষ্ট হইত। বোধ হয়, এগুলি কোন প্রতিঘাত। বলবিশেষ দ্বারা গর্ভ হইতে সূর্যাভিমুখে বিক্ষিপ্ত হয়, যেমন বৈদ্যুতিক অবস্থাপন্ন কোনও পরিচালক হইতে বৈদ্যুতিক প্রতিঘাত কর্তৃক লঘিষ্ঠ কণা সকল অপাকৃত হয়। আর প্রতিঘাতী বলের সাময়িক বিরাম বা হ্রাস-প্রযুক্ত উপর্যুপরি কোষ ব্যবহিত শ্যামপত্তিকার উৎপত্তি ঘটে।'

সাধারণ পাঠকে বিচার করুন, আমরা সমালোচনা করিব না।

*

সাহিত্য-সংহিতা—অগ্রহায়ণ—এই সংখ্যায় শ্রীঅচ্যুতা-নন্দ সরস্বতী একটি অদ্ভুত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—'গৌরাঙ্গের যতিভাব না গোপীভাব'। লেখক বাবাজী দেখিতেছি মধুর রসের উপর খড়্গহস্ত, কিন্তু তিনি যে-ভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে দাস্য-সখ্য কোন রসই তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি লিখিয়াছেন, 'ভগবানের সহিতও যাহারা পার্থিব সুখভোগ করিতে চাহে, তাহারাও যদি ভক্ত হয়, তবে ঐ প্রকার ভক্তির অস্তিত্ব এই মুহূর্তেই জগৎ হইতে উঠিয়া যাউক।'—যদি কেহ বলে ভগবান্ হইতে আমাদের ভরণ-পোষণ হইতেছে, তিনি আমাদের পিতা বা মাতা —ইহাতে কি পার্থিব সুখভোগের কথা রহিল না? অবশ্য রহিল, সুতরাং এমন ভক্ত জাহান্নবে যাউক। যাহারা তাঁহাকে রাজার রাজা বলে, প্রভুর প্রভু বলে—সকলেই —হিন্দু মুসলমান্ খৃস্টান—সকল ভক্তই জাহান্নবে যাউক, থাকুক কেবল সরস্বতী-সম্প্রদায় অর্থাৎ সকলরূপ ভক্তিই জগৎ হইতে যাউক—থাকুক কেবল Unknown- এবং Unknowable-ভক্তদিগের সম্প্রদায়—বেশ কথা!!

সাহিত্য-সংহিতা (সাহিত্য সভার মাসিক পত্র)। শোভাবাজারের রাজাদের কল্যাণে সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সভা আছে—তাহাই সাহিত্য সভা। সংহিতা তাহারই মুখপত্র। সে ভালই। যেখানে মন ভাঙ্গিয়াছে —সেখানে দেহ আর এক হইয়া থাকিবে কিরূপে? দেখিতেছি সাহিত্য সংহিতায়—সাহিত্য সভায় পঠিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—অন্য প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়, এবং প্রাচীন বঙ্গগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীর' ও 'ধর্মমঙ্গলের' খণ্ডশ প্রকাশ দেখিলাম। ৺যোগেন্দ্রচন্দ্রের* চেষ্টায়—ধর্মমঙ্গল বঙ্গগৃহস্থের ঘরে ঘরে উঠিয়াছে—আরও কি ধর্মমঙ্গলের প্রচার আবশ্যক? জানি না—হয়ত কিছু নূতনত্ব আছে। তা থাকুক—এই খণ্ড ধর্মমঙ্গলে যে স্পষ্ট

* 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

ছাপার ভুল অনেক রহিয়াছে—তাহার উপায় কি? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নীলু দম্‌কাকে, তাহার গান শুনিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'নীলু আজিএকিতাল ?' নীলু জোড় হস্তে উত্তর করিয়াছিল, 'আজ্ঞে, আজি বেতাল।' তাই নাকি?

*

সাহিত্য-সেবক—(আষাঢ়,১৩০৪) কিরূপ সাহিত্য-সেবা করিতেছেন তাহা প্রথম প্রবন্ধ রথযাত্রা রহস্তের প্রথম তুই পৃষ্ঠা পড়িলেই বুঝা যায়।—'জগন্নাথ দেব সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অর্ধ বিকাশ বলিলে বলা যায়। গণেশ পুরাণের মতে এই উৎসব (রথযাত্রা) বৌদ্ধধর্মানুগত বলা অন্যায় নহে কিছুই বুঝা গেল না, অথচ ইহারই নাম সাহিত্য-সেবা!

পর পৃষ্ঠায়, 'শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-বিদ্যাধরোরগৈঃ।
সেব্যমানং সদা দারু কোটি-সূর্য-সমপ্রভম্‌॥

কোটি সূর্য-সদৃশ লাবণ্য অথচ জগন্নাথদেবের কৃষ্ণমূর্তি। অনুমান হয়, বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইবার পর পূর্ব কথা চাপা পড়িয়া থাকিবে।' এইরূপ লেখা ছাপিয়া মাসিক পত্র লিখিয়া কি সাহিত্যের সেবা হইতেছে? অতঃপর সাহিত্য-সেবকের সমালোচনা করিতে আমরা আর পারিব না।

—কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ। পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, স্বদেশী নামে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও সাহিত্য-বিষয়ক হইয়াও প্রধানত সাহিত্য-পত্র বটে। এই তিন মাসে ৩।৪টি মাত্র শিল্প, বাণিজ্য ও গোশালার প্রবন্ধ আছে। ইহা ঠিক নয়। কিন্তু স্বদেশীর এইরূপ এবং অন্যরূপ ত্রুটি দেখিয়া **'মহাজন বন্ধু'** (কার্তিকের) 'স্বদেশী সাবধান' বলিয়া যে ঝাল ঝাড়িয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে। মহাজন বন্ধুর একটা বিষম দোষ দেখিতেছি, মহাজন বন্ধু আপনাকে বাদ দিয়া সকলকেই রাজ-দ্রোহী বলিতে চাহেন। পূর্ণিমার উপর (বিশেষ আমার উপর) ঐরূপ দোষ আরোপ করেন। অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছি যে তাঁহার ওরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এখন দেখিতেছি মহাজন বন্ধু স্বদেশীর উপর লাগিয়াছেন। কোথায় কোন্ লেখিকা একটা পদ্য লিখিতে গিয়া অনর্থক অতিরঞ্জন করিলেন, তাই ধরিয়া সম্পাদককে কি গালি দিতে আছে? মহাজন বন্ধু এই সংখ্যায় আর একটা বড় গোল করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, একটা কলঙ্কের কথা ইংরাজের নামে বাহির হয় যে 'ইংরাজ স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য এ দেশী তাঁতিদের আঙুল কাটিয়া দিয়াছিল।' আমরা যতদূর জানি এমন মিথ্যা আরোপ কেহ করে নাই। তাঁতিরা বেগারে তাঁত বোনা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আপনাদের আঙুল আপনারা কাটিত। এইরূপ একটা কথা ইংরাজিতে অনেক স্থলে থাকিতে পারে; 'দেশের কথা'য়* প্রথমে বাঙ্গালায় ছাপা হয়। ইংরাজ কোম্পানী ঢাকায়, কাশীম-বাজারে, শান্তিপুরে, ধনেখালিতে, শ্রীরামপুরে, বালেশ্বরে, পিপলাইতে কাপড়ের বুনানি, চালানি বিক্রয়ের কারবার করেন। পিপলাই অঞ্চলের তাঁতিরা নাকি সেই সকল কারখানায় কার্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ঐরূপ উপায় অবলম্বন করে। এ কথার চর্চায় এখন কোন ফল নাই।

হিন্দুপত্রিকা—মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা। বৈশাখে বলিয়াছিলাম সাময়িক সাহিত্যে ধর্মচর্চা যথেষ্ট হইতেছে, কিন্তু যে-ভাবে হওয়া উচিত, সে-ভাবে যেন হইতেছে না। এইবার হিন্দুপত্রিকা হইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। শাণ্ডিল্য সূত্র প্রবন্ধে দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় লেখক বলিতেছেন,—'ঈশ্বরে পরা অর্থাৎ অত্যন্ত অনুরক্তিকেই ভক্তি বলে।' এই ব্যাখ্যা ভুল। লেখক ভবদেব-কৃত ভাষ্য দেখিলেই বুঝিবেন। আমরা যে প্রাচীন টীকা-ভাষ্য না দেখিয়া শাস্ত্র বুঝিতে যাই—সেইটাই আমাদের ভুল।

*

খ

১৩১৫ বৎসর ত জ্বালাইয়া পোড়াইয়া, হাসাইয়া কাঁদাইয়া চলিয়া গেল, বর্ষ শেষ করিয়া আমাদের কিন্তু বর্ষের হিসাব মিটাইতে হইতেছে। পূর্বে সমালোচনা করা আমার একটা রোগ ছিল, এখনও দু'একখানি গ্রন্থের

* সখারাম গণেশ দেউস্কর-প্রণীত।

সমালোচনা করি, সেই জন্যই হউক, অথবা আমাকে কেহ কেহ ভালবাসার চক্ষে দেখেন, বলিয়াই হউক, কোন কোন গ্রন্থকার আমাকে তাঁহাদের কৃত গ্রন্থ এখনও পাঠাইয়া দেন —আমি এমনি অলস পাষণ্ড, অনেক সময় সকলগুলি পড়িতেই পারি না, হয়ত একখানা পোস্টকার্ডে প্রাপ্তিস্বীকার করাও হয় না। এখন কিন্তু বর্ষশেষে মনে হইতেছে যে যেমন তেমন করিয়া একটা হিসাব মিটাইতে পারিলে ভাল হয়। 'ধ্রুবতারা'র সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছি; কিন্তু গ্রন্থকারের ঋণ হইতে সমালোচনায় কি মুক্তি পাওয়া যায়? তা কিছুতেই যায় না—সেইজন্য বর্ষশেষে আবার কিছু সুদ দিতেছি। ধ্রুবতারা '১৪ সালের গ্রন্থ '১৫ সালে আমরা পাইয়া সমালোচনা করিয়াছি—এই '১৬ সালে সংস্কৃত সংস্করণ পাইয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ করিবার অবসর পাইব, এমন আবদার রাখি।

'১৩ সালের একখানি উপন্যাস, '১৫ সালে পাওয়া গিয়াছিল—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ-প্রণীত **নববোধন**। গ্রন্থকার আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি গ্রন্থের উদ্দেশ্য বেশ বুঝিতে পারি নাই—সমালোচনা করিতেও পারিলাম না। ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার প্রণীত ও '১১ সালে প্রকাশিত **মোগল বংশ** এবং '১২ সালে প্রকাশিত **রিয়াজউস্-সালাতিন** (অনুবাদ) এই দুইখানি অপূর্ব গ্রন্থ আমাকে উপহার দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমি পারসী জানি না—আমা কর্তৃক এই দুই গ্রন্থের সমালোচনা হওয়া অসম্ভব। তবে 'যার গল্প করিতে কত আনন্দ!' এ কথা বুঝি—বলি, সার কথা লইয়া যত আন্দোলন হয়, ততই ভাল। এইরূপ আন্দোলনের সুযোগ দিয়াছেন-বলিয়া আমরা গুপ্ত মহাশয়কে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। আর ধন্যবাদ দিতেছি তাঁহার '১১ সালে লিখিত এই বৎসর প্রাপ্ত **হজরত মোহাম্মদ** নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া ও পাঠ করিয়া।

সায়রুল মোতাখরীন—৺গৌরসুন্দর মৈত্র-কর্তৃক মূল পারস্য পুস্তক হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত। প্রকাশক শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ছাপ-মারা এইখানি পাওয়া গিয়াছে। মলাটে ছাপানো আছে নমুনা। কোন মৃত ব্যক্তির কৃত কার্য সমালোচনা চলে না। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মহাজীবন্ত জিনিস; তাঁহারা নমুনা পাঠানতেই বোধ হয় যেন সমালোচনা ইচ্ছা করেন। বহুদিক হইল বঙ্কিমবাবু এই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এত দিন পরে সেই অনুরোধ রক্ষা হইতেছে—বিলম্বে কার্য সিদ্ধি মনে করিয়া, আমরা নমুনা পাইয়াই মহা আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু গোড়াটা খানিক পড়িতে না পড়িতেই হর্ষে বিষাদ হইল। অনুবাদের ভাষা নিতান্ত অস্পষ্ট ও খাপছাড়া রকমের। তাহার পর ব্রিগ্‌স্ কৃত অনুবাদ বাহির করিলাম—অনেক স্থানেই মিলে না। যেখানে ইংরাজিতে আছে Four hours before day break—সেখানে বাঙ্গালায় আছে 'দিবা চারি দণ্ড অতীত হইলে;' বাঙ্গালা পড়িলে মনে হয়, বাদশাহ্ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ কামবক্শকে, বিজাপুর যাইতে ১৭ই জিলকদ সোমবার আদেশ করেন; ইংরাজি পড়িলে বোধ হয়, তাহার পূর্ব বৃহস্পতিবারে আদেশ করিয়াছিলেন যে সোমবারে তাঁহাকে বাহির হইতে হইবে।

আমাদের বিষম বিপদ্। পারসী জানি না, বাঙ্গালা ইংরাজির এ গোল কিরূপে মিটাইব?

অনেক সময় কেহ কোন বিষয়ে কথা কহেন না, সকলেই হয়ত প্রশংসা করেন, কাজেই কোনরূপ খট্‌কার কথা বলা আমরা বিপদ্ মনে করি। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের **ঠাকুর দাদার** ও **ঠাকুরমার ঝুলি** লইয়া আমি এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত। এই দুই গ্রন্থে বাঙ্গালা শব্দ বানানের যে কোন নিয়ম আছে, আমি বুঝিতে পারি নাই। গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিলাম, তাঁহার কথাও ভাল বুঝিতে পারি নাই। বানানে কত গোল তাহা কটকের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় দেখাইয়া দিয়াছেন। ছেলেদের হাতে এই সকল পুস্তক দিতে হইবে, তাহারা দেখিবে যে, 'চক্ষে', 'চোক্ষে' 'চোখে'—ইত্যাদি সকল রকমই বানান চলে; তাহারা বানান শেখা একটা পণ্ডশ্রমের কার্য মনে করিবে। তাহার পর ভাষার কথা বলি,—'রাজা ঘিরিবন্ধী সারিবন্ধী করিয়া সোনার ঝালর চাঁদোয়া উঠাইলেন, চাঁদোয়ার নীচে

ঘিয়ের অষ্টছত্রিশ বাতি দিলেন, ঢয় ঢুলী বাজা বাগ্যি, পাইক সিপাই দিয়া পাঁচ পাঁচ আগুনের কুণ্ড, একশ' এক গায়েনের গা'না—সারা রাত খাড়া-পাহারা, হুকুম দিলেন।'

'ঘিরিবন্ধী' কাহাকে বলে? 'অষ্টছত্রিশ' কি? 'ঢয় ঢুলী' কিরূপ ঢুলী? 'বাজা বাগ্যি'—'বাজা'—ক্রিয়া, না সংজ্ঞা? 'বাজা বাগ্যি' মানে—বাদ্য বাজাও? না—বাজনা বাদ্য?—'ঢয় ঢুলী বাজা বাগ্যি'—কিরূপে অন্বয় করিব? 'গায়েনের গা'না—এক 'গান' বলা চলে, নতুবা 'গাওনা' বলা চলে; 'গা'না' এ কিরূপ ভাষা? এইরূপ শত স্থলে, বোধ করি সহস্র স্থলে আছে। চারি ছত্র উদ্ধৃত করাতেই অবশ্য পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছে। কিন্তু কি করি বলুন? বড় বড় লোকে বলিতেছেন, এই গ্রন্থ গৃহে গৃহে বিরাজিত হউক—তাই শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা কি ভাল? গ্রন্থদ্বয়ের কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, ছবিগুলি খুব সুন্দর, কিন্তু এইরূপ ভাষা ও বানান সমেত এই পুস্তক ছেলেদের হাতে যাওয়া ভাল কি? যদি না হয়, আর দুজন দশজনে সেই কথা মুখ ফুটিয়া বলুন। ছেলেদের মুখের দিকে তাকাইয়া, মাতৃভাষার মুখের দিকে তাকাইয়া যাহা বলা উচিত তাহাই বলুন—ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

পূর্ণিমা আফিস হইতে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ সমালোচনার জন্য আমার নিকট পাঠানো হয়, আমার প্রথামত তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। আজি ইচ্ছাপূর্বক যখন হিসাব মিটাইতেছি, তখন সেই দুইখানি পুস্তকই-বা কি অপরাধ করিল? শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত, ১৩১০ সালে প্রকাশিত **বেলা** আর তাঁহারই রচিত ১৩০৪ সালে প্রকাশিত **পরিমল**। বাঙ্গালার মুদ্রাযন্ত্র-গগন হইতে অবিরল কবিতা বৃষ্টি হয়। কিন্তু এই 'বেলা' ও 'পরিমল' সেইরূপ সাধারণ বর্ষার বৃষ্টি নহে; দাশরথি বলিয়াছেন,—

তুলা রাশি মাসে, তিথি অমাবস্তে,
স্বাতি নক্ষত্রে,—যে বারি বরিষে,
সে বারি বরিষে কি বরিষার জলে?
কৃষ্ণের প্রেম কি পায় সকলে গো?
রাধার প্রেম কি পায় সকলে?

না, কৃষ্ণের প্রেমও সকলে পায় না; গিরিজানাথের মত অপূর্ব কবিত্ব শক্তি ও ভাবের অভিব্যক্তি সকলে পায় না; আমাদের সৌভাগ্যে আমরা স্বাতি নক্ষত্রের জলের মত এই-রূপ কাব্য পাইয়াছি।

একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের পরিচয় দিয়া আমরা এই পালাতে একটি গাঁটি দিব। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষার ঐকান্তিক সেবায় জীবন যাপন করিয়া আমাদের সকলেরই কাছে সমাদরের পাত্র হইয়াছেন। ১৩১৫ সালের প্রথমেই তিনি একখানি ক্ষুদ্র গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, নাম **জড়ভরত।** প্রাচীন জড়ভরতের উপাখ্যান অতি বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল, প্রসাদ-গুণে-পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ভারতের প্রাণের কথা ইহাতে প্রাণের ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, গ্রন্থ ক্ষুদ্র—কিন্তু হীরার টুক্‌রা। সকলেরই একবার এই ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িয়া দেখা কর্তব্য।

[চট্টগ্রাম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণের 'পরিশিষ্টে' সভাপতি সাহিত্যাচার্য-কৃত আরও ২৫।৩০খানি পুস্তকের অতিসংক্ষিপ্ত সমালোচনা আছে।]

প্রথমার্ধ সমাপ্ত